মাওলানা মুহাম্মদ উসমান গনী
শায়খুল হাদীস মাজাহিরুল উলূম
(ওয়াকফ) সাহারানপুর, ভারত

নাসরুল বারী

শরহে সহীহ্ আল বুখারী

(বাংলা-১ম খণ্ড)

অনুবাদ ও সম্পাদনা
মাওলানা নো'মান আহমদ
মুহাদ্দিস জামি'আ রাহমানিয়া, ঢাকা
পরিচালক : জামিয়া কাসেমিয়া, ঢাকা



আনোয়ার লাইব্রেরী
[একটি রুচিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫০২৭৫৬৩, ০১৯১৩৬৮০০১০

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০৮, তৃতীয় মুদ্রণ : জুলাই ২০১১

নাসরুল বারী শরহে বুখারী (বাংলা ১ম খণ্ড)

মূল ❑ মাওলানা মুহাম্মদ উসমান গনী
শাইখুল হাদীস, মাজাহিরুল উলূম সাহারানপুর, ভারত
অনুবাদ ও সম্পাদনা ❑ মাওলানা নোমান আহমদ
মুহাদ্দিস, জামিয়া রহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রকাশক ❑ মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
আনোয়ার লাইব্রেরী, ১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ❑ ৫৫০.০০ টাকা

আল ইহদা

স্নেহের ছোট বোন মরিয়ম,
জাহানারা ও আফরোজার -
সুন্দর সুখী জীবন কামনায়

-ভাইয়া

প্রকাশকের আরজ

الحمد لله رب العالمين والصلوة على سيد المرسلين

আলহামদুলিল্লাহ! দীর্ঘ অপেক্ষার পর নাসরুল বারী শরহে বুখারী (বাংলা -১ম খণ্ড) প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ৮ম খণ্ড প্রকাশিত হয়ে আলেম সমাজে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। আমাদের আনোয়ার লাইব্রেরীর জন্য এ এক পরম সৌভাগ্য।

ইমামুল মুহাদ্দিসীন মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী র. সংকলিত সহীহ বুখারীর উঁচু মর্যাদা ও অবস্থান কারো অজানা নয়। উলামায়ে উম্মতের মতে اصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري.

দিবালোকের ন্যায় এ কথা স্পষ্ট যে, মুহতারাম সংকলক ইমাম বুখারী র. এর ইখলাস ও একনিষ্ঠতাই সংকলনটিকে বিশ্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের মর্যাদায় সমাসীন করেছে। প্রকাশের পর থেকেই আরবী, উর্দূ অনেক ভাষায় এর বহু ব্যাখ্যা, ভাষ্য, অনুবাদ ও টীকা সম্বলিত গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ভাষায় পর্যাপ্ত সহায়ক গ্রন্থ থাকলেও বাংলা ভাষায় বুখারী শরীফের সহায়ক ব্যাখ্যাগ্রন্থ নেই বললেই চলে। আর বর্তমান ইলমী অবনতির যুগে বিপুল সংখ্যক ছাত্রের জন্য তা অপরিহার্য। বিষয়টির সম্যক বিবেচনা করে দীর্ঘ দিনের এই শূণ্যতা পুরণের জন্য শাইখুল হাদীস আল্লামা উসমান গণী দা. বা. রচিত বুখারী শরীফের সুবিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ নাসরুল বারীর অনুবাদ করেছেন মুহতারাম উস্তাদ প্রথিতযশা লেখক, গবেষক, আলিম হযরত মাওলানা নোমান আহমদ সাহেব। আশা করি গ্রন্থটি বুখারী শরীফের সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে তাকমীল ও হাদীস বিভাগের ছাত্রদের উপকারে আসবে।

গ্রন্থটির মুদ্রণ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ভাতিজা মোস্তফা কামাল অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। আরো অনেকেই বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন। সবাইকে কৃতজ্ঞতা ও মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

কাজ অনেক বড়। অপরদিকে মানুষ হিসেবে ভুলত্রুটি হওয়া হওয়াই স্বাভাবিক। তাই অনিচ্ছাকৃত বিচ্চুতিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখলে কৃতজ্ঞ হব। আর কোন অসঙ্গতি বা ত্রুটি দৃষ্টি গোচর হলে জানানোর জন্য অনুরোধ করছি। আল্লাহ তা'আলা সংশ্লিষ্ট সকলের শ্রম কবুল করুন। মূল কিতাবের মত সহায়ক গ্রন্থকেও মাকবুলিয়্যাত দান করুন।

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم

বিনয়াবনত

(মাওলানা) আনোয়ার হোসাইন

শিক্ষক ঃ জামি'আ আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম,

ফরিদাবাদ, ঢাকা-১২০৪।

তারিখ ২৯/০৪/২০০৭

অনুবাদকের আরজ

حامدا ومصليا ومسلما

شكر نعمتهائي تو جندانكه نعمتهائي تو

عذر تقصيرات ما جندانكه تقصيرات ما.

আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর অসীম মেহেরবাণী। দীর্ঘ মেহনতের পর নাসরুল বারী শরহে বুখারী বাংলা প্রথম খণ্ডের কাজ সমাপ্ত হল। ইতোপূর্বে নাসরুল বারী শরহে বুখারী ৮ম খণ্ড বেরিয়েছে। পাঠক মহল থেকে আশাতীত সাড়া পেয়েছি। কুরআন মজীদের পর বিশুদ্ধতম গ্রন্থ সহীহ বুখারী। ভারতীয় উপমহাদেশে এর একটি প্রসিদ্ধ উর্দু ব্যাখ্যাগ্রন্থ নাসরুল বারী শরহে বুখারী। এটি ছাত্র উস্তাদ এবং জনসাধারণের জন্য সমানভাবে উপকারী। তাই এই ব্যাখ্যাগ্রন্থের বাংলা অনুবাদে হাত দেই। পরিশ্রম করতে হয়েছে প্রচুর। অবশ্য বুখারী শরীফের বরকত যে, অনুবাদ কর্মে প্রচুর সাহস পেয়েছি। আমার মত দুর্বল বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা বুখারী শরীফের খেদমতে লাগিয়ে রেখেছেন এর শুকরিয়া আদায়ের ভাষা আমার নেই। ঐতিহ্যবাহী জামি'আ আরাবিয়া ফরিদাবাদের সুযোগ্য উস্তাদ স্নেহভাজন শিষ্য মাওলানা আনোয়ার হোসাইন অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তা প্রকাশ করছেন। তার প্রতি আন্তরিক মুবারকবাদ। আনোয়ার লাইব্রেরীর পরিচালক ভাজিতা মোস্ত ফা অনেক আগ্রহ দেখিয়েছে এবং তাগাদা দিয়ে কাজ তরান্বিত করেছে। এতে আমিও উপকৃত হয়েছি। এমনিভাবে আগে অনেকে সহযোগিতা করেছেন। তাদের সবার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ। আল্লাহ তা'আলা সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। এ গ্রন্থটিকে মূল গ্রন্থের ন্যায় কবুলিয়্যাতের মর্যাদা দান করুন। আমীন!!

কোন ভুল ত্রুটি নজরে পড়লে আশা করি পাঠক/পাঠিকা মুক্তমনে অবহিত করবেন। ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে সংশোধনের আশা রাখি।

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.

নিবেদক
নোমান আহমদ
মুহাদ্দিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
সাত মসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
তারিখ ২৯/০৪/২০০৭ইং

অভিমত

ফকীহুল ইসলাম খতীবে মিল্লাত
আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুফতী মুজাফফর হুসাইন দা. বা.
নাজিমে আ'লা জামি'আ মাজাহিরুল উলূম (ওয়াকফ) সাহারানুপুর।

بسم الله الرحمن الرحيم

হাদীসের সমস্ত কিতাবের মধ্যে জামি' সহীহ বুখারীর বিভিন্ন ধরণের বৈশিষ্ট্য, বিশুদ্ধতা ও মকবূলিয়াতের দিকে লক্ষ করলে এর যে উঁচু মর্যাদা রয়েছে তা দিবালোকে সূর্যের চেয়ে স্পষ্ট। এজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিসের মত হল, আল্লাহর কিতাবের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধতম গ্রন্থ হল জামি' সহীহ বুখারী।

মুহাদ্দিসীনে কিরাম র. সর্বযুগে দরস, তাদরীস, টীকা, ব্যাখ্যা, অনুচ্ছেদ ও শিরোনাম ইত্যাদির তাত্ত্বিক বিশ্লেষন ইত্যাদি দৃষ্টিকোন থেকে এ কিতাবের প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। উর্দু ভাষায় অনেক আলিম স্ব স্ব আন্দাযে এ গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখেছেন। তাতে নিজ নিজ দৃষ্টিকোন থেকে এ গ্রন্থের খেদমত করেছেন।

এ ধারায় সম্মানিত সাথী আলহাজ্ব আল্লামা উসমান গণী, মুহাদ্দিস মাজাহিরুল উলূম (ওয়াকফ) সাহারানপুরও উর্দু ভাষায় প্রথমত বুখারী দ্বিতীয় খন্ডের ব্যাখ্যা তৈরী করেছেন। কারণ, এ অংশের কোন ব্যাখ্যাগ্রন্থ সাধারণত উর্দু ভাষায় ছিল না। আল্লাহর অনুগ্রহ মাওলানার এই আন্তরিক চেষ্টা মাকবূল হয়েছে।

মাওলানা সে ধাঁচে প্রথম খণ্ডের বক্ষমান এব্যাখ্যাও তৈরী করেছেন। ইনশাআল্লাহ উস্তাদ ছাত্র সবার জন্যই উপকারী হবে। আল্লাহ তা'আলা মাওলানার এ চেষ্টাও কবূল করুন এবং সৌভাগ্যের উপকরণ বানান। আমীন!

বান্দা মুজাফফর হুসাইন মাজাহিরী
নাজিমে আ'লা
(ওয়াকফ) সাহারানপুর ইউপি
১০ রজব ১৪১৭ হিজরী

অভিমত

হযরত মাওলানা আলহাজ্ব হাকীম মুহাম্মদ ইসলাম আনসারী

মুহতামিম মাদরাসা নূরুল ইসলাম মীরাঠ

খলীফা হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারী তাইয়্যিব সাহেব র.

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد...

হাদীসে নববীর সংকলিত গ্রন্থরাজিতে সহীহ বুখারীর যে মাকবূলিয়্যাত আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন তা দিবালোকে সূর্যের চেয়ে স্পষ্টতর। উম্মতে মুহাম্মাদিয়া এ গ্রন্থটির প্রতি যতটা মনোযোগ দিয়েছেন, আল্লাহর কিতাবের পর এর কোন নজির পাওয়া যায়না। যেমনিভাবে কুরআনে কারীমের পর বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে এর মর্তবা, তেমনিভাবে উম্মতে ইসলামিয়া এটাকে আল্লাহর কিতাবের পর সর্বযুগে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছে। এর এত ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন যে, আকল হয়রান। আল্লামা কিরমানী, আল্লামা খাত্তাবী, আল্লামা নাজমুদ্দীন নাসাফী, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী এবং আল্লামা কাসতাল্লানী র. এর রচনাবলীতে ব্যাপক এবং বড় বড় মুহাদ্দিসীনে কিরামের মুখে মুখেই প্রসিদ্ধ । কুরআনের পর বিশুদ্ধতম এ মহাগ্রন্থের খেদমত সব মুহাদ্দিস স্ব স্ব যুগে করেছেন এবং করে আসছেন। কিন্তু মিরাঠের এক সুমহান এবং মাকবূল দরসগাহ নূরুল ইসলামের মুহতামিমীর দায়িত্বের কারণে এ অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, বর্তমান যুগে কয়েকটি কারণে বিশেষত ছাত্রদের মধ্যে সাহস ও মেহনতের স্বল্পতা ও অলসতা রয়েছে এর দাবী হল, পূর্ণ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা হানাফী দৃষ্টিকোন থেকে করা নেহায়েত জরুরী। হাদীসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থরাজির তরজমা এবং ব্যাখ্যাগ্রন্থ অন্যরাও করেছেন। তবে প্রয়োজন আরো অনেক কিছুর।

নিঃসন্দেহে হানাফী উলামায়ে কিরামেরও কিছু ব্যাখ্যাগ্রন্থ উর্দু ভাষায় ছাপা হয়েছে। বিশেষত আল্লামা আনওয়ার শাহ র. এর বাণী ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষন আনওয়ারুল বারী নামে, হযরত আল্লামা ফখরুদ্দীন র. এর ক্লাসিক্যাল বক্তব্য ঈযাহুল বুখারী নামে ছাপা হয়েছে। কিন্তু সহীহ বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডও পূর্ণাঙ্গ হয়নি।

পূর্ণ হওয়া তো দূরের কথা প্রায় ২৫ বছরেরও বেশি অতিক্রান্ত হয়েছে, অথচ এ পর্যন্ত বুখারী শরীফের প্রথম চার পারা ছাপা হয়েছে।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, আমাদের মুহতারাম আল্লামা উসমান গণী সাহেব মুহাদ্দিস মাজাহিরুল উলূম (ওয়াকফ) সাহারানপুর, বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ড থেকে শুরু করেছেন। এর দ্বারা জনাবের ছাত্রদের প্রতি নেহায়েত ভালবাসা ও সহমর্মিতার আন্দাজ হয়। কারণ, হাদীসের ছাত্রদের প্রথম খণ্ডের প্রয়োজন তো কিছুটা পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় খন্ডের জন্য ছাত্ররা পেরেশান হয়ে যায়। আমাদের আল্লামা নাসরুল বারী শরহে বুখারীর দুই খণ্ড (কিতাবুল মাগাযী পূর্ণাঙ্গ এবং কিতাবুত তাফসীর পূর্ণাঙ্গ) ছাপিয়ে ছাত্রদের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। আল হামদুলিল্লাহ! আশাতীত গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। আহলে ইলম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে গ্রহণ করেছেন, এসব আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের অনুগ্রহ এবং রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসের সোনালী মোতির বরকত। এবার আল্লামা কয়েকজন বন্ধু ও আন্তরিক দোস্তের বারবার অনুরোধে বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ডের ব্যাখ্যা শুরু করেছেন। আল হামদুলিল্লাহ খুব মধ্যপন্থায় তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন। ব্যাখ্যাটি না অধিক দীর্ঘ যাতে ছাত্রদের বিরক্তি আসে, আর না এতটা সংক্ষিপ্ত যে পিপাসা থেকে যায়। আমি দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা উলূমে নবুওয়াতের পিপাসার্তদের পিপাসা এর দ্বারা নিবারণ করুন। মূলের ন্যায় এটিকে কবূলিয়্যত দান করুন।

وما ذلك على الله بعزيز وصلى الله على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين.

این دعاء از من و از جملهٔ جهان آمین باد ÷

হাকীম মুহাম্মদ ইসলাম আনসারী

মুহতামিম মাদরাসা নূরুল ইসলাম মীরাঠ

দু কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي شرح صدورنا للاسلام وجعلنا من امة حبيبه سيد الانام عليه افضل الصلوة والسلام وادرجنا في سلسلة خدام دينه القويم ووقف اقلامنا لتشريح حديث نبيه الكريم، اشهد ان لا اله الا الله وحده واشهد ان سيدنا محمدا عبده ونبيه الذي لا نبي بعده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وازواجه وذرياته اجمعين صلوة وسلاما مسلسلين متواترين دائمين غير منقطعين الى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين! ويا اكرم الاكرمين! ويا اجود الاجودين!.

দীন অকর্মন্য বান্দা না এর যোগ্য ছিল যে, আল্লাহর কিতাবের পর বিশুদ্ধতম গ্রন্থ সহীহ বুখারীর শরাহ লেখার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে। তবে এ জালিম ও অজ্ঞ বান্দা স্বীয় অনুগ্রহশীল প্রভুর উদার রহমতের যোগ্যতাহীন আকাঙ্খী হয়েছে। অন্যথায় -

کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل ÷ نسیم صبح تیری مہربانی.

কিন্তু হক তা'আলা রাব্বুল আলামীন যখন কাউকে স্বীয় ফযল ও করমে সম্মানিত করতে চান, কোন ইযযত ও মর্যাদা দান করতে চান. তখন তার জন্য কোন যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। সেটা তো সর্বদা পেয়েই যায়।

داد حق را قابلیت شرط نیست ÷ بلکه شرط قابلیت داد اوست.

অনাদি চিরন্তন আল্লাহর সীমাহীন শোকর আদায় করছি, শুরু থেকেই তিনি তা'লীমী খেদমতের মর্যাদা দান করেছেন। প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে ১৯৫৫ইং এ আমি বিহার প্রদেশের কেন্দ্রীয় মাদরাসাগুলোর মধ্য থেকে একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদরাসা রশীদুল উলূম চিত্রায় মুসলিম শরীফ ও তিরমিযী শরীফ ইত্যাদির অধ্যাপনা করেছি। অতঃপর কয়েক বছর মাদরাসা হুসাইনিয়া গিরিডে এবং মাদরাসা হুসাইনিয়া দীঘী জিলা ভাগলপুরে মধ্যম

পর্যায়ের গ্রন্থাবলী পড়ানোর পর ১৯৬৩ ইংরেজীতে এ মাদরাসা আলিয়া ফাতহিইয়্যা ফুরফুরা শরীফ জিলা হুগলী থেকে একাধিক চিঠি আসে। হাদীসের দরস দানের সুযোগকে গনীমত মনে করে ফুরফুরা শরীফ উপস্থিত হয়ে দীনি ও প্রশান্ত পরিবেশ দেখে প্রায় ১২ বছর সেখানে অবস্থান করি। দরসে হাদীসে রত থাকি। বেশিরভাগ আমার দায়িত্বে থাকে বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড ও তাফসীরে কাশশাফ ইত্যাদির ক্লাশ। এখানেও স্বীয় রীতি অনুসারে লেখা ও রচনা অনুবাদ ও ব্যাখ্যার ধারা অব্যাহত রাখি। তাফসীরে কাশশাফের নেসাব পরিমাণ অংশের জটিল স্থানগুলোর ব্যাখ্যা বিশেষত আলিয়া বোর্ডের অতীত বছরগুলোর প্রশ্নাবলীর উত্তর 'আশ শাফফাফ নোট কাশশাফ', 'আত তাকরীরুল কাফী' নোট বায়যাবী দু খণ্ডে হিদায়া ৩য় খণ্ড ও হিদায়া ৪র্থ খণ্ডের নোট 'সিকায়া' নামে সে মাদরাসা ফাতহিইয়্যা ফুরফুরা শরীফে থাকা কালে লিখেছি। হিন্দুস্তানের প্রসিদ্ধ কুতুবখানা হাজী মুহাম্মদ সাঈদ তাজের কুতুব ওয়েল্সলি ষ্ট্রেট কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং বারবার ছাপা হয়েছে।

তাছাড়া বুখারী শরীফের প্রশ্নত্তোর তুহফাতুল বিহারী নোট সহীহুল বুখারীও তৎকালীন যুগে উপরোক্ত কুতুবখানার মালিক ভাই ফরীদ সাহেবের ফরমায়েশ অনুযায়ী আমি লিখেছিলাম। তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল আবার সংশোধন ও সম্পাদনাও হয়েছিল, শুধু ছাপা বাকী ছিল। তখন আমি কলকাতা ছেড়ে কয়েক বছর পর গুজরাটের প্রসিদ্ধ মাদরাসা দারুল উলূম তারাপুরে এসে পৌঁছি। সেখানে সহীহ বুখারী শরীফ কামিল এবং পূর্ণ তিরমিযী শরীফের দরস আমার দায়িত্বে অর্পন করা হয়।
এখানে প্রকৃত অবস্থা উল্লেখ না করে পারছি না যে, মাদরাসা দারুল উলূম তারাপুর শিক্ষাগত মানদণ্ডের দৃষ্টিকোন থেকে গুজরাটের একটি বড় কেন্দ্র। বহিঃ রাষ্ট্রের ছাত্রদেরকে দু বেলা খাবার ছাড়াও নাস্তা ও চায়ের ব্যবস্থা মাদরাসার পক্ষ থেকে রয়েছে। হযরত মুহতামিম সাহেব বলেন, এর ফলে সমস্ত ছাত্র পূর্ণ স্বতস্ফূর্ততার সাথে ক্লাশে অংশ গ্রহণ করে।

দারুল উলূম তারাপুরের প্রতিষ্ঠাতা ও মুহতামিম হযরত মাওলানা আবদুল আহাদ দা. বা. একজন আল্লাহ ওয়ালা বুযুর্গ। সাথে সাথে ভাল আলিম ও এযুগের বড় মুহাদ্দিস। নিঃসন্দেহে অধিকার ছিল বুখারী শরীফ পড়ানোর তাঁরই। কিন্তু মাদরাসার গোটা ব্যবস্থাপনা ও দায়দায়িত্ব একাকী বহন করার পর নির্মাণ উন্নয়নের চিন্তা ফিকিরের কারণে বুখারী, তিরমিযী অধমের দায়িত্বে ন্যাস্ত করেন। নিজে মুহতামিমীর দায়িত্ব সংক্রান্ত নেহায়েত ব্যস্ততা সত্ত্বেও ত্বহাবী শরীফ ইত্যাদি দরস দেন। মুহতামিম সাহেবের একটি বৈশিষ্ট্য এটিও যে, তিনি শিক্ষাগত তত্ত্বাবধানের দিকে পূর্ণ মনোযোগ দেন।

অধম অধিকাংশ সময় দেখেছে যে, উস্তাদগণ সবক পড়ান আর মুহতামিম সাহেব শ্রেণী কক্ষের সামনে চল্লিশ কদম হাঁটছেন। বাহ্যত নজর নিচের দিকে কিন্তু পূর্ণ মনোযোগ উস্তাদগণের বক্তব্যের প্রতি। যদি কোন শিক্ষকের মধ্যে অসহনীয় অপরিপক্কতা দেখেন, তবে তাকে শা'বান মাসেই দায়মুক্ত করে দেন।

অধম দু বছরের বুখারী অধ্যাপনায় দেখেছে, প্রথম খণ্ডের ব্যাখ্যা গ্রন্থ যেমন ঈযাহুল বুখারী, ফযলুল বারী, আনওয়ারুল বারী ইত্যাদি ছাত্ররা কিনে অধ্যয়ন করে। কিন্তু বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডের কোন উর্দু শরাহ পাওয়া যায় না। অথচ প্রথম খণ্ড অপেক্ষা বুখারী দ্বিতীয় খণ্ড বেশি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, অর্ধ পারার পর কিতাবুল ওযু থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রথম খণ্ড ফিকহী মাসায়িল (পবিত্রতা, নামায, যাকাত ও হজ্ব ইত্যাদি) রয়েছে। যা প্রায় পাঁচ বছর পর্যন্ত নূরুল ঈযাহ থেকে হিদায়া পর্যন্ত ছাত্ররা অধ্যায়ন করে। অতঃপর মিশকাতে পরিপূর্ণরূপে এসব মাসায়িল ছাত্রদের সামনে এসে যায়। কিন্তু বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনাগুলো সম্পূর্ণ নতুন হয়ে থাকে।

বস্তুত এ ধারণা শুধু দীন লেখকেরই নয়। বরং দেশের একজন বড় মুহাদ্দিস আল্লাহ ওয়ালা বুযুর্গ অর্থাৎ, শায়খুল হাদীস হযরত আলহাজ্ব মাওলানা আবদুল হক আ'জমী সাহেব দা. বা. এর নিকট আমি নিজে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লামা সাহেব! বুখারী দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম খণ্ডের তুলনায় বেশি জটিল।

দাওরায়ে হাদীসের ছাত্ররা বারবার জিজ্ঞেস করেছে, হযরত! কি দেখব? কোন শরাহ? এর জন্য দিক নির্দেশনা দিন। অধম সর্বদা اصح السير এর পরামর্শ দিয়েছে। কারণ, শায়খুল আরব ওয়াল আজম আমার শায়খ ও উস্তাদ শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী র. বুখারী দ্বিতীয় খণ্ড দেখার জন্য আসাহহুস সিয়ার অধ্যয়নের নির্দেশ দিতেন। কিন্তু হাদীস শরীফের অনুবাদ ও ক্লাসের সময় যে সব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, সেগুলোর উত্তর শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ইত্যাদির অভিযোগ থেকে যায়। ফলে অধম আচলশূণ্যতা ও ইলমী স্বল্পতার অনুভূতি সত্ত্বেও নাসরুল বারী শরহে বুখারী নামে বুখারী দ্বিতীয় খণ্ডের ব্যাখ্যা আল্লাহর উপর ভরসা করে আরম্ভ করে দেয়া। দু বছর পর্যন্ত নীরবে ফুরসতের সময় কাজ করতে থাকি। যখন উল্লেখযোগ্য একটি অংশ তথা বুখারী দ্বিতীয় খণ্ডের ১৬ পারা পূর্ণাঙ্গ এবং ১৭ পারার অর্ধেকের বেশি হয় তখন জনাব মুহতামিম আলহাজ্ব মাওলানা আবদুল আহাদ কাসেমী দা. বা. কে দেখিয়েছি।

মুহতামিম সাহেব আনন্দ প্রকাশ করে দ্বিতীয়বার দেখে দেয়ার জন্য প্রায় এক সপ্তাহ এর অধিক সময় দিয়েছেন। অতঃপর আমি লেখার জন্য লিপিকারের নিকট অর্পন করি। এদিকে কিতাবুল মাগাযী শেষ করার কাজে রত হই। দারুল উলূম তারাপুর অবস্থানকালে আমার নিয়ম ছিল শা'বান এবং

শাওয়াল অর্থাৎ, বাড়ীতে আসা যাওয়ার সময় স্বীয় পীর মুরশিদ ফকীহুল উম্মত খতীবে মিল্লাত হযরত আলহাজ্ব শাহ মাওলানা হাফিজ কারী মুফতী মুজাফফর দা. বা. এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে এক সপ্তাহ/ দশ দিন থেকে উপকৃত হই। এরপর বাড়ীতে অথবা মাদরাসায় যাই। কিন্তু প্রতিবছর ও বারবার মনের আকাঙ্খা হত, যদি আমার মুরশিদ ও মুরব্বী মুফতী সাহেব দা. বা. এর কাছে থাকার সুযোগ হত! ফলে মাওলানা নযর তাওহীদ চিত্রাবীর নিকট এ আকাঙ্খা বারবার প্রকাশও করেছি। ইতোমধ্যে মাদরাসা মাজাহিরুল উলূম (ওয়াকফ) সাহারানপুর ইখতিলাফের শিকার হয়। বাহ্যতঃ এটাকে একটি বড় দুর্ঘটনাই মনে করা উচিত। যার ফলে মাদরাসা মাজাহিরুল উলূম দু টুকরো হয়ে যায়। সহীব বুখারী ও মুসলিমের উস্তাদ হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস মু. আ. জাদীদ মাজাহিরুল উলূমে চলে যান। তখন অধমকে হযরত নাজিম সাহেব দা. বা. নির্দেশ দিলেন, এবার গুজরাট থেকে সমস্ত সামানপত্র সাথে নিয়ে চলে আস এবং মাদরাসা মাজাহিরুল উলূমে আমাদের সাথে থাক। ফলে মনের আকাঙ্খা পূর্ণ হয়। অধম মাদরাসায় হাজির হয়ে যায়। অধমের দায়িত্বে বুখারী দ্বিতীয় খণ্ড ও মুসলিম শরীফ পূর্ণাঙ্গ এবং ত্বহাবী শরীফের সবক অর্পন করা হয়। লেখার এ সময় পর্যন্ত এগুলো অধমের অধ্যাপনার আওতায় রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

মোটকথা, বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডের উর্দু ব্যাখ্যা নাসরুল বারী কিতাবুল মাগাযী অধিকাংশ গুজরাটের প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র দারুল উলূম তারাপুরেই লিখে লিপিকারের নিকট অর্পণ করেছিলাম। কিন্তু এটি পূর্ণাঙ্গ করেছি হিন্দুস্তান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষালয় মাদরাসা মাজাহিরুল উলূম (ওয়াকফ) সাহারানপুরে।

শুকরিয়া

এবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জটিল প্রশ্ন ছিল, সাড়ে পাঁচশত পৃষ্ঠার লেখা ও ছাপার জন্য অর্থ আসবে কোত্থেকে? এদিকে লিপিকার লেখার টাকা চাইতে আরম্ভ করে। কিছু টাকা দিয়েও দেই। কিন্তু মামুলি বেতন দ্বারা পরিবারের প্রয়োজনীয় ব্যয় পূর্ণ করাও জটিল ছিল। সে জন্য লিপির টাকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে লিপিকার লেখা বন্ধ করে দেন এবং লিপিবদ্ধ পাণ্ডুলিপির অংশ ফেরত দানের জন্য টাকা আদায়ের শর্তারোপ করেন। নেহায়েত উদ্বেগজনক বিষয় ছিল, আল্লাহ তা'আলা একজন আলিমে দীন বুযুর্গকে মনোযোগী করে দেন অর্থাৎ, মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব মাজাহিরী মু. আ. নাজিম মজলিসে খায়ের সূরত পঁচিশ হাজার ভারতীয় রুপির বিরাট অংক দিয়ে তিনি উদ্বুদ্ধ করেন। অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ এই করেছেন যে, এই টাকার কিতাব মজলিসে খায়ের সূরতের ঠিকানায় ছেপে পাঠিয়ে দিতে বললেন।

যেহেতু আমার নিকট কোন টাকা ছিল না, ফলে মুরশিদ হযরত মাওলানা মুফতী সাহেব দা. বা. নাজিমে আলা মাদরাসা মাজাহিরুল উলূম (ওয়াকফ) সাহারানপুর কোন দানবীর ব্যক্তির নিকট থেকে বাকী টাকা এনে দিয়েছেন। কিতাবুল মাগাযী পূর্ণাঙ্গ ছেপে আসে।

আল্লাহর নামে দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ, কিতাবুত তাফসীর শুরু করি। ইতোমধ্যে সম্মানিত এক সাথী জনাব মাওলানা মুহাম্মদ ইসলাম মু. আ. নাজিমে আলা দারুল উলূম শাহ বাহলূল সাহারানপুর পরামর্শ দিলেন এবং জোরদারভাবে বারবার অনুরোধ করলেন, এরপর যেন বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ড প্রথম ফুরসতেই লেখি। অধম প্রতিশ্রুতিও দেয় যে, আপনার পরামর্শ নির্দেশের পর্যায়ভূক্ত। ইনশাআল্লাহ তাই হবে।

কিন্তু কিতাবুত তাফসীর কিতাবুল মাগাযী অপেক্ষা বড় ভলিয়মের হয়ে যায়। পাণ্ডুলিপিতে অনেক কাটছাট ও সংক্ষেপের পরেও প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠার এক খণ্ড হয়। এরপর লেখা ও ছাপার জন্য অর্থের চিন্তায় ধরে। তাছাড়া লেখার পারিশ্রমিক দ্বিগুণ হয়ে যায়। নেহায়েত উদ্বিগ্ন ছিলাম, কিন্তু সমস্ত আসবাব সৃষ্টি কারক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার পুরানো বুজুর্গের মাধ্যমে এ ফিকির দূর করলেন। আলহাজ্ব মাওলানা আবদুল আহাদ কাসেমী মু. আ. ঋণরূপে বিশ হাজার রুপি আমাকে দেন। পূর্ণ গুজরাটের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র দারুল উলূম কেন্থারিয়ার মুহতামিম আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল দা. বা. কিতাবের বিনিময়ে সাড়ে বার হাজার রুপি দেন। মাওলানা মুফতী সাহেব দা. বা. নাজিমে আলা মাদরাসা মাজাহিরুল উলূম (ওয়াকফ) সাহারানপুর বাকী টাকা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন, অনুগ্রহ করেছেন।

বড়ই অকৃতজ্ঞতা হবে যদি স্বীয় বন্ধু মাওলানা আবদুর রহমান বুলন্দশহরী সাবেক মুদাররিস মাজাহিরুল উলূম (ওয়াফকের) -এর শুকরিয়া আদায় না করি। তিনি যথার্থ সময়ে দশ হাজার রুপি পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করছি, হে বিশ্ব প্রভু! এসব অনুগ্রহকারীদের দু জাহানে স্বীয় অসীম ভাণ্ডার থেকে আপন শান অনুযায়ী সমস্ত উন্নয়নে পরিপূর্ণ করে দিন। আমীন!

তাছাড়া পাঠকদের নিকট আবেদন তারা যেন এসব সহযোগী উলামায়ে কিরাম ও তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে নেক দু'আয় কখনো না ভুলেন, অন্তরের গভীর থেকে নেক দু'আ করেন। আল্লাহ তা'আলা যেন সে সব বুযুর্গের জান ও মালে বরকত দেন। আমীন! সুম্মা আমীন!!

আহকার মুহাম্মদ উসমান

সূচীপত্র

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	সহীহ বুখারী সংকলন	১০০
	বুখারীর ছুলাছিয়াত	১০১
	সহীহ বুখারীর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব	১০১
	বুখারী শরীফ খতমের বরকত	১০১
	বুখারীর শিরোনামগুলোর গুরুত্ব	১০১
	সিহাহ সিত্তা	১০৫
	ইমামগণের শর্তাবলী	১০৫
	বর্ণনাকারী পাঁচ প্রকার-	১০৬
	সহীহ বুখারী ও মুসলিমের তুলনা এবং সিদ্ধান্তমূলক উক্তি	১০৭
	কপির বিভিন্নতা ও ইখতিলাফের কারণ	১০৮
	আল্লামা ফিরাবরী র.	১০৯
	ফিরাবরীর কপিগুলো বিভিন্নতার কারণ	১০৯
	একটি ভুল বুঝাবুঝির নিরসন	১১০
	ইমাম বুখারী র.-এর ত্রুটিসমূহ	১১০
	সনদের বিবরণে ভুল-ত্রুটি	১১৩
	হাদীসের মূলপাঠে ভ্রম	১১৫
	মাসায়েল উৎসারণে ভ্রম	১১৮
	জরুরী সতর্কবানী	১১৯
	বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ	১২০
	১. উমদাতুল কারী, প্রসিদ্ধ আইনী	১২০
	২. ফাতহুল বারী	১২০
	গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা	১২১
	দুধপান সংক্রান্ত মাসআলা	১২৫
	সনদ ধারা	১২৬
	আমার সনদ	১২৬
	তারকীব	১২৯
	একটি প্রশ্ন	১২৯
	উত্তর	১৩০
	গ্রন্থকারের গুরুত্বপূর্ণ সূচনা	১৩১
	অনুচ্ছেদ	১৩৫
	পরিভাষা	১৩৫
	ব্যাখ্যা	১৩৫

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	পরিভাষা	১৩৫
	নামকরণের কারণ	১৩৫
	প্রশ্ন	১৩৫
	উত্তর	১৩৫
	এমতাবস্থায় দ্বিতীয় প্রশ্ন হল	১৩৬
	মুহাদ্দিসীনে কিরামের পরিভাষা	১৩৭
	বুখারীর শিরোনামসমূহ	১৩৭
	বুখারীর শিরোনামগুলোর উপর রচনাবলী	১৩৭
	শিরোনামের উদ্দেশ্য	১৩৮
	الوحي	১৪০
	ওহী শব্দের প্রয়োগ	১৪০
	শরঈ ওহী	১৪১
	ওহীর বিভিন্ন প্রকার	১৪১
	الى رسول الله صلى الله عليه وسلم	১৪৩
	নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য	১৪৩
	উপকারিতা	১৪৪
	صلى الله عليه وسلم	১৪৪
	মাসআলা	১৪৪
	قول الله عز وجل	১৪৪
	আয়াত নির্বাচনে ইমাম বুখারী র.-এর পারদর্শিতা	১৪৫
	শিরোনামের সাথে আয়াতের মিল	১৪৬
	প্রশ্নোত্তর	১৪৭
	সহীহ বুখারীতে হাদীসের পুনরাবৃত্তি	১৪৮
	শিরোনামের সাথে মিল	১৪৮
	হুমাইদী	১৫১
	গুরুত্বপূর্ণ একটি ফায়দা	১৫১
	ابن শব্দের হামযা সংক্রান্ত মূলনীতি	১৫১
	মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম তাইমী	১৫২
	সতর্কবানী	১৫২
	হাদীসের ব্যাখ্যা	১৫২
	انما الاعمال بالنيات	১৫২

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা নং

ঈমান পর্ব

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	হাদীসের পুনরাবৃত্তি	৩১৯
	শব্দরাজির ব্যাখ্যা	৩১৯
	হাদীসের ব্যাখ্যা	৩১৯
	উপকারিতা	৩২০
	হাদীসের পুনরাবৃত্তি	৩২১
	শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল	৩২১
	একটি প্রশ্ন	৩২১
	উত্তর	৩২১
	আরেকটি প্রশ্ন	৩২১
	উত্তর	৩২১
১৬. পরিচ্ছেদ ঃ	লজ্জা ঈমানের অংশ	৩২২
	শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল	৩২২
	হাদীসের পুনরাবৃত্তি	৩২২
	যোগসূত্র	৩২২
	হাদীসের ব্যাখ্যা	৩২২
১৭. পরিচ্ছেদ ঃ	যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে। (৯ ঃ ৫)	৩২৩
	শিরোনামের সাথে মিল	৩২৩
	হাদীসের পুনরাবৃত্তি	৩২৩
	ব্যাখ্যা	৩২৩
	প্রশ্ন	৩২৪
	উত্তর	৩২৪
	প্রশ্ন	৩২৪
	উত্তর	৩২৪
	নামায বর্জনকারীর হুকুম	৩২৪
	ইমামত্রয়ের প্রমাণ	৩২৫
	উত্তর	৩২৫
	উত্তর	৩২৬
১৮. পরিচ্ছেদ ঃ	যে বলে 'ঈমান আমলেরই নাম'	৩২৭
	যোগসূত্র ও লক্ষ-উদ্দেশ্য	৩২৭
	ঈমান আমল হওয়ার প্রথম দলীল	৩২৮
	দুটি প্রশ্নোত্তর	৩২৮

ইল্‌ম পর্ব

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	হাদীসের পূনরাবৃত্তি	৪৬৪
	ব্যাখ্যা	৪৬৫
	প্রশ্ন	৪৬৫
	উত্তর	৪৬৫
	হক্বপন্থী দল দ্বারা কোনটি উদ্দেশ্য?	৪৬৫
৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ	ইলমের ক্ষেত্রে সঠিক অনুধাবন	৪৬৬
	যোগসূত্র	৪৬৬
	শিরোনামের সাথে মিল	৪৬৬
	হাদীসের পূনরাবৃত্তি	৪৬৬
	ব্যাখ্যা	৪৬৬
৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ	ইলম ও হিকমতের ক্ষেত্রে সমতুল্য হওয়ার আগ্রহ	৪৬৭
	পূর্বের সাথে যোগসূত্র	৪৬৭
	শিরোনামের সাথে মিল	৪৬৭
	হাদীসের পূনরাবৃত্তি	৪৬৭
	ব্যাখ্যা	৪৬৭
	হাসাদ ও গিবতার মাঝে পার্থক্য	৪৬৮
৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ	সমুদ্রে খিযির আ.-এর কাছে মূসা আ.-এর যাওয়া	৪৬৯
	পূর্বের সাথে যোগসূত্র	৪৬৯
	শিরোনামের উদ্দেশ্য	৪৬৯
	শিরোনামের সাথে মিল	৪৭১
	হাদীসের পূনরাবৃত্তি	৪৭১
	ব্যাখ্যা	৪৭১
	সতর্কবানী	৪৭৩
৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ	নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি ঃ হে আল্লাহ্! আপনি তাকে কিতাবের ইলম দিন	৪৭৩
	হাদীসের পূনরাবৃত্তি	৪৭৪
	পূর্বের সাথে যোগসূত্র	৪৭৪
	শিরোনামের উদ্দেশ্য	৪৭৪
	হাদীসের সাথে মিল	৪৭৪
	ব্যাখ্যা	৪৭৪
৬০. পরিচ্ছেদ ঃ	বালকদের কোন্ বয়সের শোনা গ্রহণীয়	৪৭৫
	হাদীসের পূনরাবৃত্তি	৪৭৫

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	পূর্বের সাথে যোগসূত্র	৫৬৩
	শিরোনামের উদ্দেশ্য	৫৬৩
	শিরোনামের সাথে মিল	৫৬৩
	হাদীসের পূনরাবৃত্তি	৫৬৪
	শব্দ বিশ্লেষন	৫৬৪
	ا:١٨ه শব্দের তাত্তিক বিশ্লেষন	৫৬৪
	ব্যাখ্যা	৫৬৪
৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ	রাতে ইলমের আলোচনা করা	৫৬৫
	যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য	৫৬৫
	শিরোনামের সাথে মিল	৫৬৬
	হাদীসের পূনরাবৃত্তি	৫৬৬
	হাদীসের ব্যাখ্যা	৫৬৬
	হযরত খিযির আ. এর জীবন সংক্রান্ত আলোচনা	৫৬৬
	শিরোনামের সাথে মিল	৫৬৭
	হাদীসের পূনরাবৃত্তি	৫৬৮
	بِتُّ শব্দের তাত্ত্বিক বিশ্লেষন ও তা'লীল	৫৬৮
	ব্যাখ্যা	৫৬৮
৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ	ইলম মুখস্থ করা	৫৬৯
	যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য	৫৬৯
	শিরোনামের সাথে মিল	৫৬৯
	হাদীসের পূনরাবৃত্তি	৫৬৯
	হযরত আবূ হুরায়রা রা.	৫৭১
	শিরোনামের সাথে মিল	৫৭১
	হাদীসের পূনরাবৃত্তি	৫৭১
	প্রশ্ন	৫৭২
	ব্যাখ্যা	৫৭২
	শিরোনামের সাথে মিল	৫৭৩
৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ	আলিমদের (কথা শোনার) জন্য লোকদের চুপ করানো	৫৭৩
	যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য	৫৭৩
	শিরোনামের সাথে মিল	৫৭৪
	হাদীসের পূনরাবৃত্তি	৫৭৪
	প্রশ্ন	৫৭৪

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين .

ভূমিকা

আহলে ইলম আকাবির ও মাশায়েখে দরসের চিরাচরিত নিয়ম হল, তারা প্রতিটি শাস্ত্র এবং প্রতিটি কিতাবের শুরুতে বিশেষতঃ ইলমে হাদীসের শুরুতে মুকাদ্দামারূপে এর সূচনামূলক কিছু আলোচনা করেন। যাতে অন্তর্দৃষ্টির আলোকে কিতাবের সূচনা করা সম্ভব হয়। এ আলোচনা সমষ্টিকে বলে رؤس ثمانية

এখানে মোট আটটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়-

১. ইলমের সংজ্ঞা

২. আলোচ্য বিষয়

৩. লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

৪. নামকরনের কারণ

৫. ইলমের ফযীলত

৬. হাদীস সংকলনের বিভিন্ন প্রকার

৭. ইলমের সংকলন ইতিহাস

৮. সমজাতীয় উলূমে তার স্থান ইত্যাদি।

এ যুগেও সমস্ত মুহাদ্দিসীন এদিকে মনোযোগী হয়ে উপকারী মনে করে স্বস্ব অন্তর্দৃষ্টি অনুযায়ী হাদীস গ্রন্থরাজির শুরুতে কিছু আলোচনা অবশ্যই করেন। আমি এ ভূমিকায় উপরোক্ত আটটি বিষয় ছাড়াও এ ইলম সংক্রান্ত আরো কিছু জরুরী কথা বলার জন্য মনস্থ করেছি। ফলে এ মুকাদ্দামার আলোচনাগুলো رؤس ثمانية এর ক্রমবিন্যাসের চেয়ে কিছুটা ভিন্নপ্রকৃতির হবে।

১. ইলমে হাদীসের সংজ্ঞা ঃ

হাদীসের আভিধানিক অর্থ হল কথা। অর্থাৎ, আভিধানিক ভাবে সর্বপ্রকার কথাকেই হাদীস বলে। পরিভাষায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাণী, কর্ম, সম্মতি ও হাল অবস্থাকে হাদীস বলে। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী র. বলেন-

الحديث فى عرف الشرع ما يضاف الى النبى صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او صفة او تقريرا كانه اريد به مقابلة القرآن لانه قديم .

অর্থাৎ, শরীয়তের পরিভাষায় সে সব জিনিসের নাম হাদীস, যেগুলো নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত। চাই বাণী হোক বা কর্ম কিংবা গুন অথবা মৌন সম্মতি। তাকরীর তথাল শুধু হাদীসের সংজ্ঞা। এবার ইলমে হাদীসের সংজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করুন। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী র. এর সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন-

فهو علم يعرف به اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله واحواله .

অর্থাৎ, ইলমে হাদীস এরূপ এক বিদ্যার নাম, যদ্বারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, কর্ম ও হাল অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়।

আল্লামা কিরমানী র.ও এ সংজ্ঞাই বর্ণনা করেছেন।

ইলমে হাদীসের বিভিন্ন প্রকার

সাধারণতঃ ইলমে হাদীসের প্রকার ষাটের অধিক বর্ণনা করা হয়। কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের সামনে সমস্ত প্রকারের আলোচনা হয় না। বরং শুধু রেওয়ায়াতে হাদীস ও দেরায়াতে হাদীস সম্পর্কে আলোচনা হয়। আল্লামা ইবনুল আকফানী র. ইরশাদুল কাসিদে লিখেছেন- ইলমে হাদীস প্রথমত দুই প্রকার-

১. ইলমে রেওয়ায়াতুল হাদীস,
২. ইলমে দেরায়াতুল হাদীস।

ইলমে রেওয়ায়াতুল হাদীস

هو علم يشتمل على نقل احواله صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او تقريرا او صفة

অর্থাৎ, ইলমে রেওয়ায়াতুল হাদীস বলে, যে বিদ্যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী বর্ণনা করা হয়। চাই তাঁর বাণী হোক বা কর্ম কিংবা মৌনতা বা কোন গুন।

এই সংজ্ঞায় আহওয়াল শব্দটি ব্যাপক। এতে ঐচ্ছিক ক্রিয়াকর্ম ছাড়া অনৈচ্ছিক কাজ কর্মও অন্তর্ভুক্ত। যেমন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈহিক গঠনপ্রকৃতি, তাঁর চালচলন, কথাবার্তা, জন্ম ও ওফাতের ঘটনাবলী ও বিবরণ সবই অন্তভুক্ত। এ জন্য সাধারণভাবে ইলমে হাদীসের সংজ্ঞা নিম্নোক্ত ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ-

الحديث ما اضيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او تقريرا او صفة حتى الحركات والسكنات فى اليقظة والمنام .

ইলমে দেরায়াতুল হাদীস

যে বিদ্যায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, কর্ম ও হাল-অবস্থার ব্যাখ্যা জানা যায়। অর্থাৎ, হাদীসের শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝা, তা থেকে মাসায়েল উৎসারণ, বাহ্যত পরস্পর বিরোধী হাদীসগুলোতে সামঞ্জস্য বিধান ইত্যাদির নাম দেরায়াতুল হাদীস।

হাদীসও সুন্নাতের পার্থক্য

হাদীসের প্রয়োগ হয় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত ক্রিয়াকর্মের উপর। এতে অনুকরণযোগ্য ও নিষিদ্ধ উভয় প্রকার অন্তর্ভুক্ত। অনুকরণ নিষিদ্ধ বলতে বুঝায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্যাবলী। যেমন- একই সময়ে ৯ জন স্ত্রী বিবাহ বন্ধনে রাখা, লাগাতার

রেখা রাখা ইত্যাদি। এসব কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য। উম্মতের কারো জন্য একই সময়ে চারের অধিক স্ত্রী রাখা জায়েয নেই, সম্পূর্ণ হারাম।

মোটকথা, হাদীস শব্দটি উভয় প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুন্নাত এর পরিপন্থী। কারণ, সুন্নাত শব্দের প্রয়োগ হয় শুধু অনুসরণযোগ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে। যেসব বিষয়ের অনুসরণ নিষিদ্ধ, সেগুলোর ক্ষেত্রে সুন্নাতের প্রয়োগ হয় না। এ জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ রয়েছে-

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين .

আরেক হাদীসে এসেছে-

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله.

এখানে তিনি حديث رسوله বলেননি।

উপরোক্ত বিস্তারিত বিবরণ থেকে জানা গেল, হাদীস ও সুন্নাতের মাঝে আম খাস মুতলাকের সম্পর্ক। হাদীস আম, সুন্নাত খাস।

হাদীস ও খবর

কারো কারো মতে উভয়টি মুসাবী ও মুতারাদিফ (সমার্থক)। কিন্তু প্রধান উক্তি হল, এতদুভয়ের মাঝে উমুম খুসুস মুতলাকের সম্পর্ক। খবর আম, হাদীস খাস। খবরের প্রয়োগ হাদীস ছাড়া রাজা-বাদশাদের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। রাজা-বাদশাদের ইতিহাসকে হাদীস বলা যায় না। খবর আম হওয়ার কারণে সংবাদগুলোকে আখবার বলে। কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীস ও খবর, এরূপভাবে আছর ও সুন্নাত প্রত্যেকটিকে অপরটির ক্ষেত্রে প্রচুর ব্যাবহার করেন। যেমন- ইমাম ত্বাহাবীর গ্রন্থ শরহে মা'আনিল আছার এবং হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব মুনতাকাল আখবার মিন কালামি সাইয়্যিদিল আবরার এর প্রমাণ।

হাদীসে কুদ্সী

কুদ্সী শব্দটি কুদসের দিকে সম্বন্ধযুক্ত। قدس শব্দটিতে কাফ ও দালে পেশ, আবার দালে জযম সহ ব্যবহৃত হয়। উভয় অবস্থাতে এর অর্থ হল পবিত্রতা। এ থেকেই بيت المقدس ও ارض مقدسه শব্দ গৃহীত। আসমায়ে হুসনা তথা আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নামগুলোর একটি হল কুদ্দূস। এর অর্থ হল, সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটিমুক্ত।

হাদীসসমূহকে কুদসের দিকে সম্বন্ধ করার অর্থ এটাই যে, এসব হাদীসের অর্থ আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বন্ধযুক্ত। এ কারণে হাদীসে কুদসীসমূহকে আহাদীসে ইলাহিয়া ও আহাদীসে রব্বানিয়াও বলা হয়।

হাদীসে কুদসী বলে, যেটি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলা থেকে সরাসরি জিবরাঈল আ.-এর মাধ্যম ছাড়া ইলহাম কিংবা সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন। যেমন- সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে-

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب كتابا قبل ان يخلق الخلق
ان رحمتى سبقت غضبى فهو مكتوب عنده فوق العرش . بخارى ٢:١١٢٧.

মোটকথা, যে হাদীসে সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বন্ধ রয়েছে, সেটিকে বলে হাদীসে কুদসী। আর যেটিতে আল্লাহ তা'আলার দিকে সুস্পষ্ট ভাষায় সম্বন্ধ নেই, সেটি হল হাদীসে নববী।

হাদীসে কুদসী ও কুরআনে পার্থক্য

কুরআনে হাকীম ও হাদীসে কুদসীতে কয়েক পদ্ধতিতে পার্থক্য বর্ণনা করা হয়-

১. কুরআন মজীদ অলৌকিক। এর দ্বারা চ্যালেঞ্জ পেশ করা হয়। অন্য কেউ এ চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে পারেনা। হাদীসে কুদসী অনুরূপ নয়।

২. কুরআন মজীদের শব্দ, অর্থ উভয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়া জরুরী, হাদীসে কুদসীতে শুধু অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়া জরুরী।

৩. হাদীসে কুদসীর সম্বন্ধ যেমনিভাবে আল্লাহর দিকে হয়, তেমনিভাবে সংবাদদাতা হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকেও হয়। কিন্তু কুরআনে কারীমের সম্বন্ধ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে করা যায় না।

৪. কুরআনে কারীম সর্বযুগে সর্ব শ্রেণীতে মুতাওয়াতির রূপে বর্ণিত। কিন্তু হাদীসে কুদসীর মর্যাদা অনুরূপ নয়।

৫. কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত দ্বারা নামায আদায় হয়, হাদীসে কুদসী দ্বারা হয় না।

৬. কুরআনে কারীম অস্বীকারকারী কাফির। হাদীসে কুদসী অস্বীকারকারী কাফির নয়।

২. হাদীসের আলোচ্য বিষয়

আল্লামা আইনী র. বলেন-

فموضوع علم الحديث هو ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث انه رسول الله صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ, হাদীস শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হল, আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্তা ।

এ শর্তারোপের কারণে সমস্ত প্রশ্নের অবসান ঘটে।

৩. লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

১. ইলমে হাদীসের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হল-

الاهتداء بهدى النبى صلى الله عليه وسلم-

অর্থাৎ, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী সুপথ প্রাপ্তি।

২. আল্লামা কিরমানী র. বলেন- الفوز بسعادة الدارين

তথা উভয় জাহানের সৌভাগ্য অর্জন।

আল্লামা কিরমানী র.-এর উক্তি দ্বারা ইজমালীভাবে ইলমে হাদীসের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জানা গেল। কিন্তু বিস্তারিতভাবেও এর বিবরণ দেয়া যায়।

তত্ত্বজ্ঞানীদের তাহকীক হল, ইলমে হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ ফায়দা হল, যারা হাদীস চর্চায় রত, তাদের মধ্যে সাহাবিয়্যতের শান সৃষ্টি হয়।

اهل الحديث هم اهل النبى وان ÷ لم يصحبوا نفسه انفاسه صحبوا

৩. হযরত শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া র. বলেন- ইলমে হাদীসের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের জন্য শুধু এতটুকু যথেষ্ট যে, তাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবনী ও বাণীগুলো রয়েছে। আমরা রাসূল প্রেমিক, তাঁর সাথে প্রকৃত মহব্বতের দাবীদার। মূলনীতি হল, যখন কেউ কারো প্রতি

ভালবাসা পোষণ করে, তখন প্রেমাষ্পদের দেশ, তাঁর বাড়ী,ঘর, দ্বার-প্রাচীর এমনকি সমস্ত নিদর্শনের সাথেও মহব্বত সৃষ্টি হয়, তার আলোচনায় মজা লাগে। প্রেমাষ্পদের চিঠি কখনো চুম্বন করে, কখনো চোখে লাগায়, একেকটি বাক্যের পুনরাবৃত্তি করে। প্রতিবার পুনরাবৃত মিসরীর মজা লাভ করে। তার প্রতিটি উচ্চারণে কুরবান হয়। যেহেতু আমরা রাসূল প্রেমিক, তাঁর মহব্বত আমাদের অন্তরে সমস্ত মাখলূকের চেয়েও বেশী, অতএব, ইলমে হাদীস এজন্য আমাদের পড়া উচিত যে, এটি প্রেমাষ্পদের কালাম। সে প্রেমাষ্পদের সাথে এর সম্পর্ক। মহব্বতের সাথে তা পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই মজা অনুভুত হবে।

অতঃপর শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া র. বলেন- ইলমে হাদীসের সংজ্ঞার সারমর্ম হল, চিন্তা-ফিকির, আলোচ্য বিষয়ের সারনির্যাস হল, আজমত ও মাহাত্ম্য, লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সারকথা হল, মজা অনুভব করা।

অতএব, যদি চিন্তাফিকির, আজমত ও মহব্বতের সাথে হাদীস পড় তবে ইনশাআল্লাহ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। অন্যথায়, যেমন নিয়ত তেমন বরকত। -ইমদাদুল বারী ঃ ১/২৯।

৪. যারা হাদীস চর্চায় রত তাদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী র. পঠন, পাঠন ও তাকমীলে সুলুকের পর হারামাইন শরীফাইন সফর করেন। সেখানে তাঁর কিছু সুসংবাদ পরিলক্ষিত হয়। রূহানী ফুয়ূয অর্জিত হয়। এগুলো তিনি স্বীয় গ্রন্থ ফুয়ূযুল হারামাইনে সংকলন করেছেন।

এর এক স্থানে তিনি লিখেন- 'আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীনা মুবারকের দিকে মনোযোগী হলে আমার নিকট অনুভুত হল, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জ্যোতির্ময় বক্ষ থেকে নূরের রেখা বের হচ্ছে এবং ইলমে হাদীস চর্চায় রত প্রতিটি অন্তর পর্যন্ত এই নূরানী রেখা পৌঁছে যাচ্ছে।'

অতঃপর হযরত শাহ সাহেব র. বলেন- 'আমার গ্রন্থপাঠক! তোমাদের জন্য জরুরী হল, হাদীস চর্চায় রত থাকা। এর ফলে তোমাদের বক্ষের সাথে সে জ্যোতির সম্পর্ক কায়েম থাকবে। হাদীস চর্চায় মগ্নতা জরুরী, চাই দরস-তাদরীসের ছুরতে হোক, অথবা লেখা ও রচনা অথবা অধ্যয়ন- সর্বাবস্থায়।'

৪. নামকরণের কারণ

এ শাস্ত্রটিকে হাদীস নামকরনের কারণ কি? অর্থাৎ, আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থে সম্পর্ক কিরূপ? এ ব্যাপারে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে।

১. হাদীসের আভিধানিক অর্থ হল, কালাম বা বাণী। পারিভাষিক অর্থ হল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী। বাকী রইল, এখানে একটি প্রশ্ন হয়, হাদীস তো শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী নয়। তাঁর কাজ কর্ম ও জীবনীও হাদীস। এর উত্তর হল, জীবনী ও কাজকর্মগুলোকে প্রবলতার ভিত্তিতে হাদীস বলা হয়।

২. হাদীস মানে নশ্বর

قال العلامة السيوطى فى التدريب ص ٢٤ الحديث اصله ضد القديم وقد استعمل فى قليل الخبر وكثيره لانه يحدث شيئا فشيئا.

অর্থাৎ, মূল অভিধানে হাদীস (নশ্বর) কাদীম (অবিনশ্বর) এর বিপরীত। এ জন্য প্রতিটি নশ্বর বিষয়কে হাদীস বলা যায় কম হোক বা বেশি। কারণ, হাদীস শব্দটিও নশ্বরতা বুঝায়। খবরও একবারে

আসে না; বরং একের পর এক আসে। যেহেতু আল্লাহর কালাম কাদীম বা অবিনশ্বর, সেহেতু রাসূলের কালামকে বলে হাদীস।

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি ও কর্মকে হাদীস বলা হয় স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী থেকে। ইরশাদে নববী রয়েছে- حدثوا عنى ولاحرج

সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে রয়েছে -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عنى بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين .

৫. ফযীলত

মর্যাদা ও ফযীলতের দিক দিয়ে হাদীসের স্তর দ্বিতীয় নম্বরে, প্রথম স্তরে হল, আল্লাহর কিতাব কুরআনে কারীম। উসূলে ফিকহের গ্রন্থরাজিতে এটিকে দ্বিতীয় মূল উৎস সাব্যস্ত করা হয়েছে। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রা.-এর হাদীসে আছে-

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه الحديث (ابو داؤد ج٢ ص ٥١٥)

ইমাম তিরমিযী র.ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তিকে তরতাজা ও প্রফুল্ল রাখুন, যে আমার হাদীস শুনেছে, অতঃপর তা সংরক্ষন করেছে অন্যদের নিকট পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে।

অতএব, ইলমে হাদীসের ফযীলতের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, হাদীস চর্চায় রত ব্যক্তির জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দো'আ রয়েছে।

ইলমে হাদীস সমস্ত দীনি ইলমের মূলভিত্তি। এটি কুরআন মজীদের তাফসীরও, আবার ইলমে ফিকহের মূল-উৎসও, তাসাওউফের মূলভিত্তিও।

৬. হাদীস গ্রন্থরাজির বিভিন্ন প্রকার

ইলমে হাদীসে বিভিন্নভাবে গ্রন্থ লেখা হয়েছে। মুহাদ্দিসীনে কিরাম বিভিন্নভাবে ও বিচিত্র পদ্ধতিতে হাদীস সংকলন করেছেন। এ কারণে হাদীস সংক্রান্ত গ্রন্থরাজি প্রণয়ন ও মাসায়েল বিন্যাসের দিক দিয়ে অনেক প্রকার। তন্মধ্যে প্রত্যেকটির বিভিন্ন পারিভাষিক নাম রয়েছে। এখানে সবগুলোর বিবরণ দেয়া মুশকিল। এ জন্য শুধু কয়েকটি প্রসিদ্ধ প্রকারের বিবরণ দেয়া হল। এগুলোর প্রয়োজন বেশি হয়। হাদীস গ্রন্থরাজির প্রসিদ্ধ প্রকার সাতটি।

১. আল্‌জাওয়ামি'। শব্দটি جـامـع -এর বহুবচন। জামি' বলা হয় হাদীসের সে গ্রন্থকে যাতে অষ্ট বিষয় সংক্রান্ত হাদীস সংকলন করা হয়। এগুলোকেও একটি কাব্যে একত্রিত করেছেন-

سیرآداب وتفسیر وعقائد ÷ فتن احکام واشراط ومناقب

১. সিয়ার শব্দটি سيـــــــــرت এর বহুবচন। অর্থাৎ, যে সব বিষয় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনী সংক্রান্ত।

২. আদাব। শব্দটি আদবের বহুবচন। অর্থাৎ, সামাজিক শিষ্টাচার। যেমন- খানা-পিনার আদব।

৩. তাফসীর। অর্থাৎ, যেসব হাদীস কুরআন মজীদের তাফসীরের সাথে সংশ্লিষ্ট।

৪. আকাইদ। অর্থাৎ, আকাইদ বা ধর্মবিশ্বাস সংক্রান্ত হাদীসসমূহ।

৫. ফিতান। ফিতনার বহুবচন। অর্থাৎ, সেসব মহাঘটনা, যেগুলো সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাহ ভবিষ্যদ্বাবাণী করেছেন।

৬. আহকাম। তথা ফিক্বহী, আমলী বিধিবিধান।

৭. আশরাত। অর্থাৎ, কিয়ামতের আলামতসমূহ।

৮. মানাকিব। এটি منقبة -এর বহুবচন। তথা মহিলা-পুরুষ সাহাবী এবং বিভিন্ন গোত্রের ফাযায়েল।

মোটকথা, যে কিতাবে এ অষ্ট বিষয় থাকবে, সেটিকে জামি' বলা হয়।

সিহাহ সিত্তায় সহীহ বুখারী ও তিরমিযী সর্বসম্মতিক্রমে জামি'। অবশ্য সহীহ মুসলিম সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। তবে সহীহ ও হক্ব কথা হল, এটিও জামি'।

২. সুনান। হাদীসের সেসব গ্রন্থ, যেগুলোতে আহকামের হাদীসগুলোকে ফিকহী অধ্যায়ের ক্রমানুসারে সংকলন করা হয়েছে। যেমন - নাসাঈ, আবু দাঊদ, ইবনে মাজাহ ইত্যাদি। এ হিসেবে তিরমিযী শরীফকেও সুনান বলা যেতে পারে। কারণ, এর বিন্যাস ফিকহী ক্রমানুসারে হয়েছে। এ কারণে ঈমান পর্ব থেকে গ্রন্থ শুরুর পরিবর্তে পবিত্রতা পর্ব দ্বারা তিরমিযীর সূচনা হয়েছে। এ কারণে সুনানে আরবাআ' তথা সুনান চতুষ্টয় বলে এই চারটি গ্রন্থই উদ্দেশ্য হয়। অর্থাৎ, নাসাঈ,আবু দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ।

৩. মাসানীদ। শব্দটি مسند এর বহুবচন। অর্থাৎ, হাদীসের সেসব গ্রন্থকে বলে, যেগুলোতে সাহাবায়ে কিরামের ক্রমানুসারে হাদীস সংকলন করা হয়েছে। অর্থাৎ, এক সাহাবীর সমস্ত রেওয়ায়াত একত্র করা হয়েছে। চাই যে কোন মাসআলা সংক্রান্ত হোক না কেন। অতঃপর আরেকজন সাহাবীর, তারপর অন্য সাহাবীর রেওয়ায়াত সংকলন করা হয়েছে। এভাবে সমস্ত সাহাবীর হাদীস একত্র করা হয়েছে। আবার এ ক্রমবিন্যাসেও বিভিন্ন ছূরত রয়েছে। কেউ কেউ আদ্যাক্ষরের প্রতি লক্ষ করেন। অর্থাৎ, সর্বপ্রথম সে সব সাহাবীর রেওয়ায়াত সংকলন করেন, যাঁদের নামের শুরুতে আলিফ রয়েছে। এমতাবস্থায় হযরত উসামা ও আনাস রা. আসবেন সর্বাগ্রে।

কেউ কেউ আগে ইসলাম গ্রহনের দিকে লক্ষ্য করেন। অতএব, যিনি আগে ইসলাম গ্রহণ করবেন, তিনি অগ্রাধিকার পাবেন। তার রেওয়ায়াত আগে সংকলন করা হবে। অতঃপর এই ধারাবাহিকতায় সামনে চলতে থাকবে। তবে মুসনাদের এ প্রকার বর্তমানে পাওয়া যায় না।

কোন কোন মুহাদ্দিস সাহাবায়ে কিরামের মর্তবার প্রতি লক্ষ্য করে মুসনাদ লিখেছেন। এগুলোতে সর্বপ্রথম খেলাফতের ক্রমবিন্যাসের উপর ভিত্তি করে খুলাফায়ে রাশিদীন, অতঃপর অবশিষ্ট আশারায়ে মুবাশশারা, অতঃপর বদরে অংশগ্রহনকারী সাহাবায়ে কিরাম, অতঃপর বাইআতে রিযওয়ানে অংশগ্রহনকারী, অতঃপর মক্কা বিজয়ের পূর্বে হিজরতকারী, এরপর মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণকারী, অতঃপর ছোট সাহাবীদের রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। অতঃপর পুরুষ কর্তৃক বর্ণিত নারীদের হাদীসগুলোকে এভাবে উল্লেখ করেন যে, প্রথমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণের হাদীস। কারণ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কন্যাগন থেকে রেওয়ায়াত পাওয়া যায় না। শুধু মাত্র স্বল্প সংখ্যক রেওয়ায়াত জান্নাতের নারী নেত্রী হযরত ফাতিমা যাহরা রা. থেকে বর্ণিত আছে। কারণ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশাতেই সমস্ত কন্যার ইন্তিকাল হয়। শুধু সাইয়্যিদা ফাতিমা রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর ছয় মাস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এর পর তারও ওফাত হয়ে যায়। এ জন্য তাঁর সূত্রেও রেওয়ায়াত বেশি নেই।

৪. মা'আজিম। শব্দটি মু'জামের বহুবচন। অর্থাৎ, এরূপ হাদীসগ্রন্থ যাতে উস্তাদের ক্রমবিন্যাস অনুপাতে হাদীস সংকলন করা হয়েছে। সব উস্তাদের সব হাদীস একত্রিত করা হয়েছে। চাই যে কোন বিষয়েরই হোক না কেন। যেমন- মু'জামে তাবারানী।

৫. জুয। সে হাদীসগ্রন্থ, যাতে শুধু একটি মাসআলা সংক্রান্ত হাদীসগুলো জমা করা হয়েছে। যেমন- ইমাম বুখারী র. এর জুযউল কিরাআত এবং জুযউ রাফইল ইয়াদাইন।

৬. মুফরাদ। ৭. গরীব। ৮. মুস্তাখরাজ। ৯। মুস্তাদরাক ইত্যাদি।

৭. সমজাতীয় উলূমে এর স্থান

উলূমের সমজাতীয় বিষয় নির্ধারিত আছে। এর প্রকাভেদ বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা হয়েছে। যেমন- এই ইলম আকলী (যৌক্তিক) না নকলী (ঐতিহ্যগত)? আকলী যেমন - মানতিক (যুক্তিবিদ্যা), ফালসাফা (দর্শন)। নকলী আবার দু প্রকার- শরঈ অথবা গাইরে শরঈ। অতঃপর শরঈ দু প্রকার- মৌলিক বা শাখাগত।

এ বিস্তারিত আলোচনার পর বলা হবে, ইলমে হাদীস নকলী, শরঈ ও আসলী। নকলী হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট। কারণ, এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী, হাল-অবস্থারই বিবরণ দেয়া হয়। শরঈ হওয়ার কারণ হল এটির উপর দীন ও শরীয়ত নির্ভরশীল। বিস্তারিত শরঈ বিধিবিধান এ থেকেই জানা যায়। আসলী হওয়ার কারণ উসূলে শরার এটি দ্বিতীয় মৌলিক বিষয়।

৮. শরঈ হুকুম

ইলমে হাদীসের শরঈ হুকম হল, যে এলাকায় শুধু একজনই মুসলমান, সেখানে ইলমে হাদীস পড়া ফরযে আইন। যেখানে অনেক মুসলমান থাকবে, সেখানে ফরযে কিফায়া। সুফিয়ান সাওরী র. বলেন-

لا اعلم علما افضل من الحديث لمن اراد به وجه الله تعالى ان الناس يحتاجون اليه حتى فى طعامهم وشرابهم فهو افضل من التطوع بالصلوة والصيام لانه فرض كفاية.

ইলমে ফিকহের হুকুমও তাই। কারণ, হাদীসের ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত বিবরণ ইসলামী আইনের উপরই নির্ভরশীল।

হাদীসের প্রামাণিকতা

সারা বিশ্বের উলামায়ে ইসলামের ইজমা' রয়েছে যে, কুরআন মজীদের পর পবিত্র হাদীস দীনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস ও মূলনীতি।

ইসলামে তার প্রথম শতাব্দি পর্যন্ত সহীহ হাদীসগুলোকে সর্বসম্মতিক্রমে সহীহ মনে করা হত, যতক্ষন না মু'তাযিলার আবির্ভাব ঘটে। তাদের দিল দেমাগে যুক্তির প্রবলতা ছিল। তারা হাশর, নশর, আল্লাহর দর্শন, আমলের ওজনদান এবং এ ধরনের আরো কিছু বিষয় সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে গ্রহনযোগ্য মনে করেনি। তারা তাদের এই স্বভাবজাত ফাসাদের কারণে মুতাওয়াতির হাদীস ছাড়া অবশিষ্ট হাদীসগুলোকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে বসে। কুরআনের যেসব আয়াত নিজেদের রুচির পরিপন্থী দেখেছে, সেগুলোতে মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়েছে।

হাফিজ ইবনে হাযম র. বলেন, আহলে সুন্নাত, শিয়া, কাদরিয়া সমস্ত দল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসগুলোকে রীতিমত প্রামাণ্য মনে করে আসছিলেন, যতক্ষন না প্রথম শতাব্দিতে কালাম শাস্ত্রবিদ মু'তাযিলা ফিরকার উদ্ভব হয়, তারা এই ইজমার বিরোধিতা করে। -তারজুমানুস সুন্নাহ ঃ ১/৯২ - আল আহকাম ঃ ১/১১৪।

হাফিজ ইবনে হাজার র. আবু আলী জুব্বাঈ মু'তাযিলী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হাদীসের বিশুদ্ধতার জন্য আযীয হওয়া শর্ত। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হাদীস অস্বীকার দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য, দীন থেকে মুক্তি লাভ করা ছিল না। বরং তারা একটি মৌলিক ভুল করেছিল, যা তাদের দেমাগে একটি গলদ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯শতাব্দিতে যখন মুসলমানদের উপর পাশ্চাত্যজাতিগুলোর রাজনৈতিক মতবাদ চেপে বসল এবং তা বৃদ্ধি পেতে লাগল, তখন দীন সম্পর্কে অজ্ঞ মুসলমানদের এরূপ একটি স্তর বাস্তব লাভ করল, যারা পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনায় অসীম প্রভাবিত হয়েছিল, তারা মনে করত, দুনিয়ার উন্নয়ন পাশ্চাত্যের অনুকরণ ছাড়া অর্জিত হতে পারে না। ইসলামের বহু বিধিবিধান এ পথে প্রতিবন্ধক ছিল। সেহেতু তারা ইসলামে বিকৃতির ধারা শুরু করে। যাতে এটাকে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনার অনুকূল করা যায়। এই শ্রেণীকে বলে আহলে তাজাদ্দুদ বা আধুনিকতাপন্থী। এ দ্বারা পরিস্কার স্পষ্ট যে, এ যুগের ফিৎনা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অনুধাবনের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং অজ্ঞতা ও সত্যলংঘনের উপর নির্ভরশীল। এর উদ্দেশ্য ধর্মের বাঁধ ঢিলে করা এবং এটাকে এরূপভাবে পেশ করা, যাতে সব ধরনের ছাচে গড়ে তোলা যায়। এ জন্য এখন আর হাদীস অস্বীকারের জন্য কোন বড় দলিলের প্রয়োজনও নেই। বরং শুধু কয়েকটি হাদীসে সাধারণ সংশয় সৃষ্টি করে অবশিষ্ট সমস্ত হাদীসকে অপ্রামান্য করা হয়েছে।

ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ খান, মিসরে তাহা হোসাইন, তুর্কিতে জিয়া গোগ আসপ এ শ্রেণীর নেতা। এ শ্রেণীর উদ্দেশ্য ততক্ষণ পর্যন্ত অর্জিত হতে পারছিল না, যতক্ষণ পর্যন্ত হাদীসকে পথ থেকে না সরানো যায়। কারণ, হাদীসগুলোতে জীবনের প্রতিটি শাখা সংক্রান্ত এরূপ বিস্তারিত দিক নির্দেশনা রয়েছে, যেগুলো পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক। এ জন্য এ শ্রেণীর কিছু লোক হাদীসকে প্রমান মানতে অস্বীকার করেছে। এ শ্লোগান হিন্দুস্তানে সর্ব প্রথম স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং তার বন্ধু মৌলভী চেরাগ আলী তুলেছেন। কিন্তু তাঁরা হাদীস অস্বীকারের মতবাদকে প্রকাশ্যে পেশ করার পরিবর্তে এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন যে, যেখানে কোন হাদীস নিজের দাবীর পরিপন্থী পরিলক্ষিত হয়েছে, তার বিশুদ্ধতা অস্বীকার করেছেন। চাই এর সনদ যতই শক্তিশালী হোক না কেন। সাথে সাথে কোথাও কোথাও একথাও প্রকাশ করতে শুরু করেন যে, এসব হাদীস বর্তমান যুগে প্রামাণ্য হওয়া উচিত নয়। তাছাড়া কোন কোন স্থানে যে সব হাদীস দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি হয় সেগুলো প্রমাণ রূপে পেশও অব্যাহত রাখেন। একারণেই বাণিজ্যিক সুদকে হালাল করা হয়, মু'জিযাগুলোকে অস্বীকার করা হয় এবং অনেক পাশ্চাত্য মতবাদকে বৈধতার সার্টিফিকেট দেয়া হয়।

এরপর হাদীস অস্বীকারের মতবাদ আরো উন্নতি লাভ করে। এ মতবাদ কিছুটা সাংঘঠনিকভাবে আবদুল্লাহ চকড়ালবীর নেতৃত্বে সামনে অগ্রসর হয়। এ চকড়ালবী ছিলেন একটি ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা। নিজেকে তিনি আহলে কুরআন বলতেন। এর উদ্দেশ্য ছিল, হাদীসকে সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করা। এরপর আসলাম জয়রাজপুরী এই মতবাদকে আরো সামনে অগ্রসর করে দেয়। এক পর্যায়ে গোলাম আহমদ পারভেজ এই হাদীস অস্বীকারের ফিৎনার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এটাকে একটি সংঘবদ্ধ মতবাদ ও মাকতাবে ফিকিরের রূপদান করেন। যুবকদের জন্য তার লেখায় ছিল বিরাট আকর্ষণ। এই জন্য তৎকালীন সময়ে এ ফিৎনা সবচেয়ে বেশি ছড়িয়ে পড়ে। আমরা এখানে এই ফিৎনার মৌলিক মতবাদগুলোর উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

হাদীস অস্বীকারকারীদের তিনটি মতবাদ

হাদীস অস্বীকারকারীদের পক্ষ থেকে যে সব মতবাদ এ পর্যন্ত সামনে এসেছে, এগুলো তিন প্রকার পরস্পর সাংঘর্ষিক চিন্তাধারা।

১. কুরআন বুঝার জন্য হাদীসের প্রয়োজন নেই। প্রতিটি ব্যাক্তি স্বীয় ও বিবেক দ্বারা কুরআন মজীদ বুঝতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দায়িত্ব ছিল শুধু কুরআন পৌঁছানো। আনুগত্য ওয়াজিব শুধু কুরআনের। রাসূল হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য না সাহাবায়ে কিরামের উপর ওয়াজিব ছিল, না আমাদের উপর ওয়াজিব। (নাউযুবিল্লাহি) ওহী শুধু মাতলু (কুরআন শরীফ) ওহীয়ে গাইরে মাতলু (হাদীস) বলতে কিছু নেই।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব আহকাম বর্ণনা করেছেন, সেগুলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের সাথে বিশেষিত। প্রতিটি যুগের প্রতি লক্ষ করলে এসব আহকামে রদবদল করা যেতে পারে। অর্থাৎ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ ও আহকাম তাঁর যুগে প্রমাণ ছিল, আমাদের জন্য প্রমাণ নয়।

৩. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও উক্তি তথা হাদীস প্রমাণ। কিন্তু বর্তমান হাদীসগুলো আমাদের নিকট পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রে পৌঁছেনি। তাই আমাদের উপর এগুলো মানার দায়দায়িত্ব নেই।

হাদীস অস্বীকারকারীদের এসব পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক চিন্তাধারা দেখে জ্ঞানী-গুনীদের জন্য দুটির যে কোন একটি পথ অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। অর্থাৎ, হয়ত তাদের পাগল মনে করে, মা'যুর বলা হবে। অথবা বলা হবে, তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মতবাদ সুনির্দিষ্ট নয়, বরং তাদের এসব মেহনত পরিশ্রমের মতলব শুধু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাকে অস্বীকার করে সর্বদিক থেকে বলগাহীন স্বাধীন জীবন-যাপন করা। একারণে যে প্রকার সুযোগ পান, অনুরূপই কথা মুখ থেকে উচ্চারণ করেন। আগে কি বলেছেন, তার কোন পরওয়া করেন না।

এবার আমরা এই তিন প্রকার পরস্পর বিরোধী প্রতিটি মতবাদের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

১. প্রথম মত খণ্ডন

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْمِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلاً

'মানুষের এমন মর্যাদ নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যাতিরেকে, অথবা দূত প্রেরণ ব্যাতিরেকে।' -শুরা ঃ ৫১, রুকু ঃ ৬, পারা ঃ ২৫।

এই আয়াতে রাসূল প্রেরণের বিপরীতে অহীর উল্লেখ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল প্রেরণ ব্যতীত ওহী হয়ে থাকে। এটাই ওহীয়ে গাইরে মাতলু অথাৎ, হাদীস।

২. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ

'আপনি এ যাবৎ কিবলার অনুসরণ করছিলেন, সেটাকে এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, যাতে জানতে পারি কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে পেছনে ফিরে যায়। -বাকারা ঃ ১৪৩, রুকু ঃ ১, পারা ঃ ২।

এই আয়াতে কিবলা দ্বারা উদ্দেশ্য বাইতুল মুকাদ্দাস। এটিকে রুখ করার হুকুমকে আল্লাহ তা'আলা جعلنا শব্দ দ্বারা নিজের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। অথচ পূর্ন করআনে হাকীমে কোথাও বাইতুল

মুকাদ্দাসের দিকে চেহারা ফিরানোর হুকুমের উল্লেখ নেই। অবশ্যই এ নির্দেশ ছিল ওহীয়ে গাইরে মাতলু এর মাধ্যমে। আর এটাকেই নিজের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ওহীয়ে মাতলুর মত ওহীয়ে গাইরে মাতলুর হুকুমের উপর আমল করাও ওয়াজিব।

৩. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন -

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, যখন তোমরা ছিলে হীনবল।' -আলে ইমরান ঃ ১২৩।

এই আয়াতটি উহুদের যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। যাতে উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে ফিরিশতাদের অবতীর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অথচ কুরআনে বদরের যুদ্ধে এ ধরনের কোন ওয়াদার উল্লেখ নেই। এতে বুঝা গেল, ফিরিশতা অবতীর্ণ করার এই ওয়াদা ছিল ওহীয়ে গাইরে মাতলু তথা হাদীস দ্বারা।

৪. ইরশাদে রব্বানী রয়েছে -

عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ .

'আল্লাহ তা'আলা জানতেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে।' -বাকারা ঃ ১৮৭, রুক ঃ ৭, পারা ঃ ২।

এই আয়াতে রমযান মুবারকের রাত্রে সহবাসকে খেয়ানত আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে এর অনুমতি দেয়া হয়েছে। এতে বুঝা গেল, শুরু রমযান মুবারকের রাত্রে সহবাস করা হারাম ছিল। অথচ এই হুকুম কুরআনের কোথাও উল্লেখ নেই। এ হুকুম ছিল ওহীয়ে গাইরে মাতলুর মাধ্যমে।

৫. وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ الخ

'স্মরণ কর, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুই দলের এক দল তোমাদের আয়ত্বাধীন হবে।' -আনফাল ঃ ৭, রুকু ঃ ১৫, পারা ঃ ৯। এই আয়াতেও যে প্রতিশ্রুতির উল্লেখ রয়েছে, সেটি ওহীয়ে গাইরে মাতলু তথা হাদীসের মাধ্যমে হয়েছিল।

৬. وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِىُّ اِلَى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهِ اَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ

وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ اَنْبَاَكَ هٰذَا قَالَ نَبَّاَنِىَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ .

'স্মরণ কর, যখন নবী তাঁর স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিলেন। অতঃপর যখন তিনি তা অন্যকে বলেছিলেন এবং আল্লাহর নবী তা জানিয়ে দিয়েছিলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে অবহিত করেছেন, যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত।' -তাহরীম ঃ ৩, পারা ঃ ২৮।

এতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আয়েশা ও হযরত হাফসা রা.-এর পূর্ণ ঘটনা আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ করে দিয়েছেন। কুরআনের কোথাও এ ঘটনার উল্লেখ নেই। অবশ্যই এটা ছিল ওহীয়ে গাইরে মাতলুর মাধ্যমে।

৭. سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلَى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا

كَلامَ اللّٰهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ.

এ আয়াতে সুস্পষ্ট বিবরণ দেয়া হয়েছে যে, খায়বর যুদ্ধে মুনাফিকদেরকে অংশগ্রহণের অনুমতি না দেয়ার ফয়সালা আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই করেছিলেন। অথচ এই আয়াত ছাড়া এই ফয়সালার উল্লেখ কুরআনে কারীমের কোথাও নেই। এতে বুঝা গেল, এই ফয়সালা হয়েছিল হাদীসের মাধ্যমে।

৮. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِه وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ الخ

এই আয়াতে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায়িত্ব একজন ডাকপিয়নের ন্যায় শুধু সংবাদ পৌঁছে দেয়াই ছিল না। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিতাব ও হিকমতের শিক্ষক এবং মুসলমানদের আত্মশুদ্ধিকারকও ছিলেন। কিতাব শিক্ষার ফরয যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায়িত্বে আরোপ করা হয়েছিল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পদমর্যাদাগত দায়িত্ব কিভাবে আদায় করছিলেন? কুরআনের ছাত্র তথা সাহাবায়ে কিরাম কি রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাই করতেন না? যদি কিছু জিজ্ঞেস করেন, তাহলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তাদের উত্তরে কুরআনেরই কোন আয়াত তিলাওয়াত করে দিতেন? এই শিক্ষাপদ্ধতি কি যৌক্তিক হতে পারে যে, একজন শিক্ষক কোন গ্রন্থ শিক্ষা দিচ্ছেন, ছাত্ররা মূলপাঠ পড়া ও শ্রবণ ছাড়া কোন কথা জিজ্ঞাসাই করবে না? আর যদি জিজ্ঞাসাই করেন, তাহলে উস্তাদ কি এর উত্তরে গ্রন্থেরই মূলপাঠ করে দিবেন? নিজের মুখে কোন ব্যাখ্যা দিবেন না? শিক্ষকের দায়িত্ব হল, গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিষয়াবলী বিস্তারিত ও বিশদ ব্যাখ্যা দান, ছাত্রদের প্রশ্নাবলীর সমাধান পেশ, গ্রন্থের অর্থ ও বিষয় বিশদভাবে বুঝান।

যদি কুরআন মজীদের জন্য হাদীসের প্রয়োজনই না থাকে, প্রতিটি ব্যাক্তি স্বীয় ব্রেণ দ্বারা কুরআন বুঝতে পারেন, তবা পারভেজ সাহেব মা'আরিফুল কুরআন লিখে বেওকুফির প্রমাণ দিলেন কেন? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাখ্যা তো গ্রহণযোগ্য নয়, আর এই বেআদবের ব্যাখ্যা গ্রহনযোগ্য!

নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় বাণী ও কর্ম দ্বারা কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা দিতেন, সাহাবায়ে কিরামের জীবনের আত্মশুদ্ধি করতেন।

৯. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ ..الاية

এই আয়াতে কারীমা থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদমর্যাদাগত দায়িত্ব হল, কুরআনের বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ, দান।

১০. কুরআনে হাকীমের বিভিন্নস্থানে اَطِيْعُوا اللّٰهَ এর সাথে اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ শব্দ রয়েছে। যা স্পষ্ট ভাষায় হাদীসের প্রামাণিকতা বুঝায়। এ সম্পর্কে হাদীস অস্বীকারকারীরা সাধারনতঃ, বলে এই আনুগত্য শরীয়তে প্রমাণ হিসেবে নয়, বরং শাসক হিসেবে। অর্থাৎ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদগুলোর উপর আমল করা একজন শাসক হিসেবে স্বীয়যুগের লোকজনের উপর ওয়াজিব ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরও যে শাসক এসেছেন, তার আনুগত্য করতে হবে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয়।

এর উত্তর দুটি-

১. শাসকের আনুগত্যের আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে পরবর্তীতে করা হয়েছে। অর্থাৎ, أُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ অতএব, রাসূলের আনুগত্যকে এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না।

২. এখানে اَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ আয়াতে আনুগত্যের কারণ রিসালাত, শাসকত্ব নয়।

১১. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদগুলোর আনুগত্য শুধু ওয়াজিব নয়, বরং এর উপর ঈমান নির্ভরশীল।

১২. কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে পূর্ববর্তী নবীগণের হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের বাণীগুলোর উপর আমল তাদের উম্মতদের জন্য ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে। না মানার ফলে তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করা হয়েছে। এ বিষয়টি হাদীসের প্রামাণিকতার স্পষ্ট দলিল।

১৩. পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্য থেকে অনেকেই এরূপ হয়েছেন, যাদের উপর কোন কিতাব অবতীর্ণ হয়নি। যদি তাদের ইরশাদগুলোর উপর আমল ওয়াজিব না হয়, তাহলে তাদের কেন পাঠানো হয়েছে?

১৪. কুরআনে কারীম হযরত ইবরাহীম আ.এর স্বপ্নের ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। যাতে সন্তান জবাই এর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, আম্বিয়ায়ে কিরাম আ. এর স্বপ্নও ওহী হয়ে থাকে। স্পষ্ট বিষয়, এটাও ওহীয়ে গাইরে মাতলু।

যৌক্তিক প্রমাণাদি

কুরআন মজীদে প্রত্যেকটি জিনিসের ইজমালী বিবরণ রয়েছে। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হাদীসে রয়েছে। নামাযের পঞ্চ ওয়াক্ত, রাক'আত সংখ্যা, ফরয ও ওয়াজিবগুলোর বিস্তারিত বিবরণ, রোযা ও যাকাতের বিস্তারিত বিধিবিধান, হজ্জের আহকাম, কুরবানীর আহকাম, ক্রয়-বিক্রয়, গৃহস্থালী বিষয়, দাম্পত্য বিষয়, সামাজিক আইন কানুনের বিস্তারিত আলোচনা ও এগুলোর উপর আমলের পদ্ধতি সব বর্ণনা করেছে হাদীস। কাজেই হাদীস প্রমাণ না হলে اَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ এর উপর আমলের পদ্ধতি কি? যদি কেউ বলে, সালাতের অর্থ আরবী অভিধানে পাছা দোলানো (নৃত্য)। কাজেই اَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ এর অর্থ হল, নাচের আড্ডা কায়েম কর, তবে আপনার কাছে এর কি উত্তর?

তাছাড়া পেশাব-পায়খানা, কুকুর, শকুন ইত্যাদির হারাম হওয়ার বিষয়টি কুরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়নি। একারণে এই প্রশ্ন থেকে বাঁচার জন্য হাদীস অস্বীকারকারীরা এসব খবীস জিনিসের হালাল হওয়ার প্রবক্তা। বরং এডভোকেট মুহাম্মদ সাবীহ লিখেন যে, কুরআনে উল্লেখিত চারটি জিনিস ছাড়া বাকি সব জিনিস খাওয়া ফরয, খেতে অস্বীকার করা গুনাহ, আল্লাহর হুকুমের অবাধ্যতা।

-ইরশাদুল কারী - তুলু'য়ে ইসলাম, জুন ৫২ইং।

অর্থাৎ, (তাহলে) কুকুর, গাধা, শকুন, বিড়াল, ইদুর, এমন কি পেশাব-পায়খানা ইত্যাদি খাওয়াও ফরয।

এর দ্বারা স্পষ্ট, হাদীস অস্বীকারকারীরা গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য ফরয এবং সওয়াব মনে করে উপরোক্ত জিনিসগুলো বোধ হয় রাত-দিন মজা করে খেয়ে থাকে। আল্লাহ তাদের চেহারা কলঙ্কিত করুন।

২. আরবের পৌত্তলিকদের খাহেশ ছিল, আল্লাহর কিতাবকে রাসূলের মাধ্যমে প্রেরণের পরিবর্তে সরাসরি যেন তাদের উপর অবতীর্ণ করা হয়।

حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَءُهٗ

স্পষ্ট বিষয়, এমতাবস্থায় মু'জিযাও বেশি স্পষ্ট হত, মুশরিকদের ঈমান আনয়নের আশাও অধিক হত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এই পদ্ধতি অবলম্বন করেননি। প্রশ্ন হল, যদি হাদীসগুলো প্রমাণ না হয়, তবে রাসূল পাঠানোর ব্যাপারে যেন এই অটলতা অবলম্বন করা হল?

মূলত রাসূল এই জন্য প্রেরণ করা হয়েছে যে, শুধু কিতাব অনুধাবন জাতির সংশোধনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে না, যতক্ষন না এরূপ কোন শিক্ষক হন, যিনি এর অর্থগুলো নির্ধারিত করে দিবেন এবং স্বয়ং এর কার্যতঃ বাস্তব নমুনা হয়ে না আসেন। এটা তখন পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষন পর্যন্ত তার প্রতিটি বাণী ও কর্মের অনুসরণ ওয়াজিব না হয়। চিন্তার বিষয়, দীন ইসলামের কোন কোন বিধান এরূপ রয়েছে, যেগুলো কুরআনে হাকীমে উল্লেখ নেই, শুধু হাদীসে নববী দ্বারা প্রমাণিত। যেমন - পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য বিশেষ কালিমা দ্বারা আযান দেয়া, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামের প্রতীক হয়ে আছে এবং হয়ে থাকবে। এমনিভাবে নামাযে জানাযা, নামাযে জুমআ, দুই ঈদের নামায, খুৎবা ইত্যাদি।

৩. সাহাবায়ে কিরাম থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত সমস্ত উম্মত বিনা ব্যতিক্রমভূক্তিতে হাদীসগুলোকে প্রমাণ মেনে আসছেন। যদি তারা সবাই গোমরাহ হয়ে থাকেন এবং ১৪০০ সাল পর্যন্ত পারভেজ সাহেব ছাড়া ইসলাম অনুধাবনকারী আর কেউ সৃষ্টি না হয়ে থাকেন, তবে এটা চিন্তা করা উচিৎ যে, ১৪০০ বছর পর্যন্ত যে দীন কোন মানুষ দেখেনি, সেটি কিভাবে অনুসরণযোগ্য হতে পারে!

হাদীস অস্বীকারকারীদের প্রমাণাদি ও উত্তর

১. হাদীস অস্বীকারকারীরা তাদের প্রমাণে সর্বপ্রথম এ আয়াত পেশ করেন-

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

তাদের বক্তব্য হল, এই আয়াতের আলোকে কুরআন সম্পূর্ণ সহজ। অতএব, কুরআন বুঝা ও এর উপর আমল করার জন্য কোন প্রকার শিক্ষা- ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

এর উত্তর হল, কুরআনে কারীমের বিষয়বস্তু দুই প্রকার। কিছু কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলোর উদ্দেশ্য আল্লাহর ভয়, আখিরাতের ফিকির, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন এবং সাধারণ উপদেশমূলক কথাবার্তা। আর কিছু কিছু বিষয় আছে, যেগুলোতে বিধিবিধান ও শরীয়তের আইন-কানুন ও মূলনীতির বিবরণ দেয়া হয়েছে-

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

আয়াত প্রথম প্রকার বিষয়াবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট, দ্বিতীয় প্রকার বিষয়াবলীর সাথে নয়। এর প্রমাণ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ এর সাথে لِلذِّكْرِ এর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। যদি বিধিবিধান উৎসারণ করা ও সহজ হত, তবে এই শর্ত হত না। তাছাড়া সামনে বলা হয়েছে- فهل من مدكر, না هل من مستنبط ও هل من مجتهد।

তাছাড়া কুরআনে কারীমের আয়াতগুলোতে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, এ গ্রন্থ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া বুঝে আসতে পারে না। যেমন-

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ.

২. হাদীস অস্বীকারকারীরা বলেন, কুরআন বিভিন্ন স্থানে আয়াতগুলোকে বাইয়্যিনাত (সুস্পষ্ট প্রমানাদি) সাব্যস্ত করেছে। এতে বুঝা যায়, কুরআনের আয়াতগুলো স্পষ্ট, ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

এর উত্তর হল, এ বিষয়টি সর্বদা মৌলিক ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে আনা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল, তাওহীদ, রিসালত ও আখিরাতের প্রমানাদি এত স্পষ্ট যে, সামান্য মনোযোগেই অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করে ও বুঝে আসে। খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদের বিশ্বাসের ন্যায় নয় যে, গোটা বিশ্ব মিলে তা বুঝতে পারেনি। এর ফলে আহকামের বিষয়গুলোও সম্পূর্ণ সহজ অথবা এগুলোর ব্যাখ্যার জন্য কোন রাসূলের প্রয়োজন নেই- তা আবশ্যক হয় না।

৩. হাদীস অস্বীকারকারীরা বলেন -

اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ ألاية

আয়াতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অন্যান্য মানবের ন্যায় একজন মানুষ সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতএব, এ আয়াত স্পষ্ট যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ ওহীয়ে মাতলূর অনুসরণ করা ওয়াজিব। কিন্তু স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিক নির্দেশনা মেনে চলা ও তার উপর আমল করা ওয়াজিব নয়।

এর উত্তর হল, বস্তুতঃ এই প্রমাণটি পেশ করা হয়েছে আয়াতকে তার পূর্বাপর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে। মূলতঃ এই আয়াতটি সেসব পৌত্তলিকের উত্তরে এসেছিল, যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অলৌকিক বিষয়াবলী বা মু'জিযা দাবী করত। এর উত্তরে বলা হয়েছে, আমি তোমাদের মত একজন মানুষ। এজন্য স্বীয় মর্জি অনুযায়ী মু'জিযা দেখানোর ক্ষমতা আমার নেই, যতক্ষন না আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করবেন।

এর দ্বারা বুঝা গেল, مثلكم তে উপমা শুধু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত মু'জিযা প্রদর্শনে অক্ষমতার ব্যাপারে, সর্বদিক দিয়ে নয়।

দ্বিতীয়তঃ এ আয়াতে অন্যান্য মানুষের সাথে পার্থক্যের কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে ওহীকে। ওহী শব্দটি ব্যাপকরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে ওহীয়ে মাতলূ, গাইরে মাতলূ উভয়টিকে অন্তর্ভূক্ত করে। অতএব, এর দ্বারা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদের আনুগত্য ওয়াজিব না হওয়ার উপর প্রমাণ পেশ করা নিরর্থক।

৪. হাদীস অস্বীকারকারীরা সেসব ঘটনা দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেন, যেগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন আমলের উপর কুরআনে কারীমে ভর্ৎসনা অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন- বদরের যুদ্ধে বন্দিদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া। তাদের বক্তব্য হল, এ ঘটনায় কুরআন মজীদ স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্ত আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী হয়নি। এজন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি ও কর্মগুলোকে ব্যাপক আকারে কিভাবে প্রমাণ বলা যেতে পারে?

এর উত্তর হল, এসব ঘটনায় নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইজতিহাদী পদস্খলন ঘটেছিল। যে বিষয়ে ওহীর মাধ্যমে সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু যদি গভীরভাবে দেখা হয়, তবে

ঘটনাই হাদীসের প্রামানিকতা বুঝায়। কারণ, কুরআনে কারীম এই ইজতিহাদী পদস্খলনের ব্যাপারে যতক্ষণ পর্যন্ত সতর্ক করেননি, ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম এ হুকুমে তাঁর অনুসরণ করেছেন। যখন কুরআনের সতর্কবানী অবতীর্ণ হল, তখন তাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর প্রিয়ভাজন হিসেবে ভর্ৎসনা হয়েছে। বলা হয়েছে-

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَكُوْنَ لَه اَسْرى

কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের প্রতি কোন ভর্ৎসনা হয়নি কারণ, তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে নিজেদের দায়িত্ব আদায় করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব ছিল স্বয়ং তাঁর উপর।

৫. হাদীস অস্বীকারকারীরা আরেকটি ঘটনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করে। তাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার আনসারীদেরকে খেজুর গাছে পরাগায়ন থেকে নিষেধ করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম পরাগায়ন বর্জন করলে উৎপাদন হ্রাস পায়। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- انتم اعلم بامور دنياكم অর্থাৎ, এ ব্যাপারে আমার আনুগত্য তোমাদের উপর ওয়াজিব নয়।

এর উত্তর হল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীগুলোর দুটি দিক রয়েছে- ১. যেসব ইরশাদ তিনি রাসূল হিসেবে করেছেন। ২. যেসব বাণী ব্যক্তিগত পরামর্শ হিসেবে সম্পাদিত হয়েছে। انتم اعلم بامور دنياكم এর সম্পর্ক দ্বিতীয় প্রকার ইরশাদগুলোর সাথে। আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রথম প্রকার বানীগুলো। অতএব, এই প্রমাণ ঠিক নয়।

এর উপর প্রশ্ন হতে পারে, এটা বুঝা আমাদের জন্য কঠিন যে, কোন বাণীটি কোন হিসেবে? কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি ও কর্মগুলোকে ব্যাপক আকারে প্রমাণ বলা যায় না।

এর উত্তর হল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল ষ্ট্যাটাস হল, তিনি রাসূল। অতএব, তাঁর প্রতিটি উক্তি ও কর্মকে এ অবস্থানের উপর প্রয়োগ করে প্রমাণ সাব্যস্ত করতে হবে। কিন্তু কোথাও কোন প্রমাণ বা নির্দেশন যদি এরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, এটি ব্যক্তিগত পরামর্শের মর্যাদা রাখে, প্রকৃত ঘটনাও এটাই যে, পুরো হাদীস ভাণ্ডারে ব্যক্তিগত পরামর্শ, উদাহরণ হাতে গোনা কয়েকটি এবং এরূপ স্থানগুলোতে সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, এ বাণীটি শরঈ হুকুম নয়, বরং ব্যক্তিগত পরামর্শ। এ কয়েকটি স্থান ছাড়া বাকী সমস্ত বাণী রাসূল হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে এবং এগুলো প্রমাণ। -ইরশাদুল কারী, - দরসে তিরমিযী।

দ্বিতীয় মতবাদ খন্ডন

এই মতবাদ অনুযায়ী হাদীসগুলো সাহাবীদের জন্য প্রমাণ ছিল। কিন্তু আমাদের জন্য প্রমাণ নয়। এই মতবাদটি এত স্বতঃসিদ্ধ ভ্রান্ত যে, এর খন্ডনের জন্য বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন নেই। এর নির্যাস তো এই বের হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালত তো সাহাবী যুগ পর্যন্ত বিশেষিত ছিল। অথচ নিম্নোক্ত আয়াতগুলো সুস্পষ্ট ভাষায় তা প্রত্যাখ্যান করে।

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا.

'বলুন, হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল।' -সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৮।

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ.

'আপনাকে জগতের জন্য কেবল রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।' -হজ্জ ঃ ১০৭।

تَبَارَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا .

'তিনি কত মহান, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান তথা কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যাতে করে সে বিশ্ব জগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে!' -সূরা ফুরকান ঃ ১।

তাছাড়া মৌলিক প্রশ্ন হল, কুরআন বুঝার জন্য রাসূলের শিক্ষার প্রয়োজন আছে কি না? যদি না হয়, তাহলে রাসূল কেন প্রেরিত হয়েছেন? আর যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে বিস্ময়ের ব্যাপার হল, সাহাবীদের তো শিক্ষার প্রয়োজন, অথচ আমাদের শিক্ষার প্রয়োজন নেই! অথচ সাহাবায়ে কিরাম স্বয়ং কুরআন অবতরণের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছেন, অবতরণের কারণ সম্পর্কে, শানে নুযূল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন। কুরআন নাযিলের পরিবেশ তাদের সামনেই ছিল। আমরা এসব থেকে বঞ্চিত।

এর উত্তরে হাদীস অস্বীকারকারীরা সে পুরানো কথাই বলেন, যে মিল্লাতের কেন্দ্র হিসেবে ওয়াজিব ছিল, রাসূল হিসেবে নয়। এ বিষয়টি প্রথমেই রদ করা হয়েছে।

তৃতীয় মতবাদ খন্ডন

এই বক্তব্য সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে, হাদীসগুলো প্রমাণ ঠিকই, কিন্তু আমাদের নিকট তা নির্ভরযোগ্য সূত্রে পৌঁছেনি। এর উপর নিম্নোক্ত প্রমাণাদি রয়েছে-

১. আমাদের নিকট কুরআন সেসব মাধ্যমেই পৌঁছেছে, যেসব মাধ্যমে হাদীস পৌঁছেছে। এবার যদি এসব সূত্র অনির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে ুকরআন থেকেও হাত ধুয়ে ফেলতে হবে। হাদীস অস্বীকারকারীরা এর এই উত্তর দেন যে, কুরআনে কারীমের আয়াত, اِنَّـا لَـه لَحَـافِظُوْنَ (আমি এর হেফাজতকারী। -সূরা হিজর ঃ ৯) বলে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। হাদীস সম্পর্কে এরূপ কোন দায়িত্ব নেয়া হয়নি।

এর প্রথম উত্তর হল, اِنَّا لَه لَحَافِظُوْنَ আয়াতটিও আমাদের নিকট সেসব মাধ্যমেই পৌঁছেছে যেগুলো আপনার উক্তি অনুযায়ী অনির্ভরযোগ্য। এর কি প্রমাণ যে, এ আয়াতটি কেউ নিজের পক্ষ থেকে সংযোজন করেনি?

দ্বিতীয়তঃ এতে কুরআনের হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছে। আর কুরআন উসূলিয়্যীনের সর্বসম্মতিক্রমে শব্দ এবং অর্থের নাম। এজন্য এ আয়াতটি শুধু কুরআনের শব্দের নয়; বরং এর অর্থের সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। আর কুরআনের অর্থের শিক্ষা দেয়া হয়েছে হাদীসে।

এর সারমর্ম এই বের হল যে, কুরআন যিকর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই যিকরের বিশদ বিবরণদাতা। হাদীসে নববীসমূহ এর তাফসীর। অতএব, এই আয়াত দ্বারা হাদীসসমূহের হেফাজতের প্রতিশ্রুতিও বুঝা যায়।

হাদীস সংকলন

হাদীস অস্বীকারকারীরা বলেন যে, হাদীসগুলো তৃতীয় শতাব্দী হিজরীতে সংকলিত হয়েছে। এজন্য এগুলো আসল রূপের উপর অবশিষ্ট আছে বলে নির্ভর করা যায় না। কিন্তু এই বিভ্রান্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ, সর্বপ্রথম দেখা উচিত যে, হাদীস সংরক্ষণের প্রতি কিরূপ গুরুত্বারোপ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে এ পর্যন্ত করা হয়েছে। হাদীস সংরক্ষণের পদ্ধতি শুধু লেখাই নয়, বরং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য মাধ্যমও রয়েছে। তাহকীক দ্বারা জানা যায় যে, রিসালত যুগে এবং সাহাবায়ে কিরামের জামানায় হাদীস সংরক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত তিনটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে।

হাদীস সংরক্ষন

১. হাদীসের হেফাজতের প্রথম পদ্ধতি হল রেওয়ায়াত কণ্ঠস্থ করা। এর প্রতি এত গুরুত্ব আরোপ করা হত যে, সাহাবায়ে কিরাম হাদীসগুলোর দাওর করতেন। (একজন অপরজনকে শুনাতেন।) হযরত আনাস রা. বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবান মুবারক থেকে বহু হাদীস শুনতাম। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিস থেকে উঠতেন, তখন আমরা পরস্পরে হাদীসের দাওর করতাম। একবার একজন সব হাদীস বর্ণনা করতেন, অতঃপর দ্বিতীয়জন, অতঃপর তৃতীয়জন। অনেক সময় ষাট ষাটজন মজলিসে থাকতেন। তারা সবাই পালাপালা করে হাদীস বর্ণনা করতেন। এর পর আমরা যখন উঠতাম তখন আমাদের অন্তরে এসব হাদীস এরূপভাবে সুদৃঢ় হয়ে যেত, যেন আমাদের অন্তরে গেড়ে দেয়া হয়েছে। -মাজমা'উয যাওয়াইদ ঃ ১/১৬১।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন-

انما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

-মুকাদ্দামায়ে মুসলিম ঃ ১০, -ইবনে মাজাহ ঃ ১/৪।

এ পদ্ধতিটি সে যুগে নেহায়েত নির্ভরযোগ্য ছিল। শুধু নিজেদেরই নয়; বরং নিজেদের অশ্বগুলোর পর্যন্ত বংশ পরিক্রমা কণ্ঠস্থ করে ফেলতেন। এক এক জনের হাজার হাজার কাব্য মুখস্থ থাকত। অনেক সময় কোন একটি বিষয় শুধু একবার শুনে বা দেখে পরিপূর্ণরূপে কণ্ঠস্থ করে ফেলতেন। ইতিহাসে এর অগণিত উদাহরণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এক দুটি নিম্নে বর্ণিত হল।

সহীহ্ বুখারীতে হযরত জা'ফর ইবনে আমর আয্-যামরী রা. বর্ণনা করেন, একবার আমি উবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনুল খিয়ারের সাথে হযরত ওয়াহশী রা.-এর সাক্ষাতে গেলাম। উবায়দুল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন- আপনি কি আমাকে চেনেন? ওয়াহশী রা. বললেন- আমি আপনাকে তো চিনি না। তবে আমার এতটুকু স্মরণ আছে যে, আজ থেকে বহু বছর পূর্বে একদিন আদী ইবনুল খিয়ার নামক এক ব্যক্তির কাছে গিয়েছিলাম। সেদিন তার ওখানে একটি শিশুর জন্ম হয়েছিল। সে শিশুটিকে চাদরে মুড়িয়ে তার দুধ মাতার নিকট নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শিশুটির পুরো দেহ ঢাকা ছিল। শুধু পাগুলো আমি দেখেছিলাম। আপনার পাদুটো সে শিশুর পায়ের সাথে খুব বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

গভীর চিন্তার বিষয় হল, যে জাতি এত সাধারণ বিষয়গুলোকে এতটুকু নির্ভরযোগ্যতার সাথে মনে রাখে, তাঁরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি ও কর্মগুলোকে স্মরণ রাখার প্রতি কতটা গুরুত্বারোপ করবে? অথচ তাঁদের জন্য এগুলোকে তাঁরা মুক্তির পথ মনে করেন। বিশেষতঃ যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী তাদের সামনে এসেছিল-

نضر الله عبدا سمع مقالتى فحفظها ووعاها واداها الخ - رواه الشافعى والبيهقى فى المدخل ورواه احمد والترمذى وابوداؤد وابن ماجة والدارمى عن زيد بن ثابت (مشكوة المصابيح ،كتاب العلم ، الفصل الثانى: ج١ ص٣٥)

'আল্লাহ তা'আলা সে বান্দাকে তরতাজা ও প্রফুল্ল রাখুন, যে আমার কথা শুনে তা মুখস্থ করল ও সংরক্ষণ করল এবং তা পৌঁছে দিল।' -তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারিমী- আবুদ দারদা র. সূত্রে। -মিশকাত ঃ ১/৩৫।

হাফিজ ইবনে হাজার র. স্বীয় গ্রন্থ 'আল-ইসাবা'য় বর্ণনা করেন যে, একবার আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান হযরত আবূ হুরায়রা রা.-এর স্মরণশক্তির পরীক্ষা নিতে চেয়েছিলেন। তাঁকে ডেকে এনে হাদীস

বর্ণনা করার আবেদন করেন। হযরত আবু হুরায়রা রা. অনেক হাদীস শুনালেন। একজন লেখক তা লিখছিলেন। অতঃপর হযরত আবূ হুরায়রা রা. সেখান থেকে চলে গেলেন। আব্দুল মালিক পরবর্তী বছর তাঁকে পুনরায় ডাকালেন। তাঁকে বললেন- আপনি গত বছর যেসব হাদীস লিখিয়েছিলেন সে হাদীসগুলো সেই ধারাবাহিকতার সাথে শুনিয়ে দিন। হযরত আবূ হুরায়রা রা. পুনরায় হাদীস শুনাতে আরম্ভ করলেন। লেখক তাঁর লেখার সাথে এগুলো মেলাচ্ছিলেন। কোন জায়গায় একটি হরফ, একটি বিন্দু এবং ক্ষুদ্রাংশও পরিবর্তন করেননি। চরম ব্যাপার হল, যে ধারবাহিকতা ঠিক তাই ছিল- কোন হাদীস আগে পরে হয়নি।

এ ধরনের বিস্ময়কর ঘটনাবলী এর স্পষ্ট প্রমাণ যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অসাধারণ স্মরণশক্তি শুধু হাদীস সংরক্ষণের জন্য দান করেছিলেন। নিঃসন্দেহে এরূপ স্মরণশক্তি হাদীসের জন্য এতটাই নির্ভরযোগ্য মাধ্যম যেরূপ লেখা।

দ্বিতীয় পদ্ধতি আমল

সাহাবায়ে কিরাম হাদীস সংরক্ষণের দ্বিতীয় যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তা ছিল আমল। অর্থাৎ, তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি ও কর্মগুলোর উপর হুবহু আমল করে তা স্মরণ রাখতেন। অনেক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে, তারা কোন আমল করে বলেছেন-

هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি এরূপ করতে দেখেছি।) এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। কারণ, যে বিষয়টির উপর কেউ নিজে আমল করে সেটি পাথরের উপর খোদাইকৃত চিত্রের ন্যায় হয়ে যায়।

তৃতীয় পদ্ধতি লেখা

লেখার মাধ্যমেও হাদীস সংরক্ষণ করা হয়েছিল। ঐতিহাসিকভাবে হাদীস লেখা চারটি স্তরে বিভক্ত করা যায়।

১. বিক্ষিপ্তাকারে হাদীস লেখা,

২. কোন এক ব্যক্তি কর্তৃক হাদীস সংকলন করা, যার মর্যাদা হবে ব্যক্তিগত স্মারকের,

৩. হাদীসগুলোকে গ্রন্থাকারে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা ব্যতীত সংকলন করা।

৪. হাদীসগুলোকে গ্রন্থাকারে বিভিন্ন অধ্যায়ে সুবিন্যস্তরূপে সংকলন করা।

রিসালত যুগে সাহাবায়ে কিরামের জামানায় প্রথম দু'প্রকারের প্রচলন ভালরূপে হয়েছিল। হাদীস অস্বীকারকারীরা রিসালত যুগে হাদীস লেখার বিষয়টি স্বীকার করেন না। তারা মুসলিম শরীফে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। হাদীসটি হল,

لا تكتبوا عنى ومن كتب عنى غير القران فليمحه .

'তোমরা আমার কাছ থেকে আমার কথাগুলো লিখবে না। যে আমার কাছ থেকে কুরআন ছাড়া অন্য কিছু লিখবে সে যেন তা অবশ্যই মিটিয়ে ফেলে।' -মুসলিম ঃ ২/৪১৪।

হাদীস অস্বীকারকারীদের বক্তব্য হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হাদীস লিখতে বারণ করা এর প্রমাণ যে, সে যুগে হাদীস লেখা হয়নি। তাছাড়া এর ফলে এটাও জানা যায় যে, হাদীসগুলো প্রমাণ নয়। অন্যথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা গুরুত্ব সহকারে লিখতেন। কিন্তু বাস্তবতা হল, হাদীস লেখা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগে। এর কারণ ছিল, তখন পর্যন্ত কুরআনে কারীম কোন একটি কপিতে সংকলিত হয়নি; বরং বিক্ষিপ্ত আকারে সাহাবায়ে কিরামের

নিকট লিখিত ছিল। অপরদিকে সাহাবায়ে কিরামও তখন পর্যন্ত কুরআনের পদ্ধতি সম্পর্কে এতটা পরিচিত হননি যে, কুরআন এবং অকুরআনের মাঝে প্রথম দৃষ্টিতে পার্থক্য করতে পারেন। এমতাবস্থায় যদি হাদীসগুলো লেখা হত তাহলে কুরআনের সাথে সংমিশ্রণের আশংকা ছিল। এই আশংকার কারণে এবং এর পথ রুদ্ধ করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস লিখতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু যখন সাহাবায়ে কিরাম কুরআনের পদ্ধতি সম্পর্কে পুরোপুরি পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন, তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস লেখার অনুমতি দিয়ে দেন। যার বিভিন্ন ঘটনা হাদীসের গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত আছে।

১. জামি'তিরমিযীতে ইমাম তিরমিযী র. ইলম পর্বে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় কায়েম করেছেন- باب ما جاء في الرخصة فيه। তাতে হযরত আবূ হুরায়রা রা.-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন-

قال كان رجل من الانصار يجلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع من النبى صلى الله عليه وسلم الحديث فيعجبه ولا يحفظه - فشكى ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ! استعن بيمينك واوما بيده الخط - (جامع ترمذى : ٩١/٢)

এক আনসারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস শুনতেন। হাদীস তাকে বিস্ময়াভিভূত করত। কিন্তু তিনি তা মুখস্থ রাখতে পারতেন না। তিনি এ অভিযোগ করলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার কাছ থেকে হাদীস শুনি, সে হাদীস আমাকে বিস্ময়াভিভূত করে। কিন্তু আমি তা মুখস্থ রাখতে পারি না। এতদশ্রবণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার ডান হাতের সহযোগিতা নাও। এতে তিনি স্বহস্তে লেখার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।'

২. ইমাম আবূ দাঊদ র. স্বীয় সুনানে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণনা করেন-

كنت اكتب كل شئ اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه فنهتنى قريش وقالوا اتكتب كل شئ تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم فى الغضب والرضا - فامسكت عن الكتابة فذكرت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاومأ باصبعه الى فيه فقال اكتب فوالذى نفسى بيده ما يخرج منه الا حق (لفظه لابى داؤد : ج٢ ص ٥١٣ و ص ٥١٤ كتاب العلم)

'আমি সংরক্ষণের নিয়তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা শুনতাম সবকিছু লিখে ফেলতাম। তখন কুরাইশ আমাকে তা থেকে বারণ করলেন। তাঁরা বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা শুন সবকিছুই লিখে ফেল! তিনি তো মানুষ- ক্রুদ্ধ অবস্থায় ও স্বাচ্ছন্দ্য অবস্থায় কথা বলেন। তখন আমি লেখা থেকে বিরত হলাম। এ বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আলোচনা করলাম। ফলে তিনি স্বীয় আঙ্গুল দিয়ে মুখের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তাঁর শপথ, এ থেকে হক ছাড়া আর কিছু বের হয় না।'

৩. عن ابى هريرة رضـ ان النبى صلى الله عليه وسلم خطب فذكر قصة فى الحديث فقال ابو شاه - اكتبوا لى يا رسول الله ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابى شاه وفى الحديث قصة- هذا حديث حسن صحيح (ترمذى ج٢ ص ١٠٧ ابواب العلم - باب ما جاء فى الرخصة فيه) ورواه البخارى فى كتاب العلم تحت باب كتابة العلم ج ١ ص ٢١و ٢٣)

হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বক্তব্য রাখলেন। অতঃপর তিনি হাদীসে একটি ঘটনা উল্লেখ করলেন। তখন আবূ শাহ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটি আমাকে লিখে দিন। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমরা তা আবূ শাহকে লিখে দাও। এই হাদীসে একটি ঘটনা আছে। হাদীসটি হাসান সহীহ।'

অর্থাৎ, মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি খুতবা দিয়েছিলেন। আবূ শাহ ইয়ামানীর আবেদনের ফলে সেটি লিখিয়ে তিনি তাকে দিয়েছিলেন।

هذا ناسخ لحديث النهى عن الكتابة واجمع الامة على جوازها وقيل النهى عى جمعه مع الران فى صجيفة لئلا يخلط فيشتبه لانه كان وقت نزول القران فلما امن نسخ كذا فى المجمع وغيره (حاشيه ترمذى ج٢ ص ٩١)

এই ধরনের হাদীসগুলো এর স্পষ্ট প্রমাণ যে, হাদীস লেখা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা কোন সাময়িক কারণের ভিত্তিতে ছিল। যখন সে কারণ দূরীভূত হয়ে গেছে তখন এর অনুমতি বরং নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আল্লামা নববী র. হাদীস লিখতে নিষেধ সম্পর্কে আরেকটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। সেটি হচ্ছে, ব্যাপক লেখা কোন কালেই নিষিদ্ধ ছিল না; বরং কোন কোন সাহাবী এরূপ করতেন যে, কুরআনের আয়াতগুলো লেখার সাথে সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাখ্যা-তাফসীরও সে জায়গায় লিখে ফেলতেন। এ পদ্ধতিটি মারাত্মক আশংকাজনক ছিল। কারণ, এতে কুরআনের আয়াতের সাথে হাদীস মিশে যাওয়ার শক্তিশালী আশংকা ছিল। এজন্য শুধু এই পদ্ধতি সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। কুরআন থেকে আলাদা হাদীস লেখা সম্পর্কে কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। আল্লামা নববী র.-এর এই ব্যাখ্যা খুবই যুক্তিযুক্ত। এর সহায়তা নাসাঈ শরীফের একটি রেওয়ায়াত দ্বারাও হয়। হাদীসটি ইমাম নাসাঈ র. বর্ণনা করেছেন- كتاب الصلوة باب المحافظة على صلوة العصر-এ যে, হযরত আয়িশা রা. স্বীয় একজন গোলামকে কুরআনে কারীম লেখার নির্দেশ দিয়েছেন। যখন সে

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلوةِ الْوُسْطىٰ

আয়াতে পৌঁছল, তখন الوسطى শব্দের পর وصلوة العصر বাড়িয়ে লেখার জন্য (তিনি তাকে) নির্দেশ দেন। প্রকাশ থাকে যে, العصر শব্দটি কুরআনে কারীমের অংশ ছিল না; বরং ব্যাখ্যারূপে বাড়ানো হয়েছিল। তৎকালীন যুগে যেহেতু মূলপাঠ এবং ব্যাখ্যায় পার্থক্য করার সেসব চিহ্ন প্রচলিত ছিল না, যেগুলো পরবর্তীতে প্রচলিত হয়েছে, সেহেতু এই শব্দটি মূলপাঠের সাথেই লিখে দেয়া হয়েছে।

এতে বুঝা যায়, অন্যান্য সাহাবীও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যাগুলো হয়ত এভাবে লিখে থাকবেন। স্পষ্ট বিষয়, যদি এই প্রচলনের ব্যাপক অনুমতি দেয়া হত, তাহলে কুরআনের মূলপাঠ নির্ণয় এবং এর হেফাজত মাথা ব্যথার কারণ হয়ে যেত। বস্তুতঃ হাদীস লেখার নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে এই বিরাট আশংকার দ্বার রুদ্ধ করা হয়েছিল; কিন্তু কুরআনে কারীম থেকে আলাদা হাদীস লেখার প্রচলন সর্বযুগে অব্যাহত ছিল। এ কারণে সাহাবী যুগে হাদীসের কয়েকটি সংকলন ব্যক্তিগত স্মারক আকারে তৈরী হয়েছে। এর কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ–

১. আস সহীফাতুস সাদিকা

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. হাদীসের যে একটি সংকলন তৈরী করেছিলেন এর নাম রেখেছিলেন الصحيفة الصادقة। এটা ছিল সাহাবী যুগে সবচেয়ে বড় হাদীস সংকলন। এর হাদীসগুলোর মোট সংখ্যা নিশ্চিতরূপে জানা যায়নি। কিন্তু সহীহ বুখারী ঃ ২/২২ كتاب العلم باب كتابة العلم এ বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা রা.-এর একটি হাদীস দ্বারা এর উপর কিছুটা আলোকপাত হয়। তিনি বলেন-

ما من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم احد اكثر حديثا عنه (اى عن النبى صلى الله عليه وسلم) منى الا ما كان من عبد الله بن عمرو رض فانه كان يكتب ولا اكتب -

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবী আমার চেয়ে বেশি হাদীসের বাহক নেই, শুধুমাত্র আবদুল্লাহ ইবনে আমর ছাড়া। কারণ, তিনি লিখতেন আর আমি লিখতাম না।'

একটি প্রশ্নোত্তর

বুখারী শরীফের উক্ত বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর হাদীস সংখ্যা হযরত আবূ হুরায়রা রা.-এর হাদীস অপেক্ষা বেশি ছিল। হযরত আবূ হুরায়রা রা.-এর হাদীস সংখ্যা ৫৩৭৪। অতএব, ইবনে আমর রা.-এর হাদীস সংখ্যা সুনিশ্চিতরূপে এর চেয়ে বেশি হবে। অপর দিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর রেওয়ায়াত যেগুলো হাদীস গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে, সেগুলোর সংখ্যা হযরত আবূ হুরায়রা রা.-এর হাদীস থেকে কম। (আবূ দাঊদ ও হাকিমের বরাতে পুর্বে বর্ণিত হয়েছে যে,

كنت اكتب كل شئ اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা শুনতাম সবকিছুই আমি লিখে ফেলতাম।'

এর দ্বারা অনুমিত হয় যে, আস-সহীফাতুস সাদিকা-এর হাদীস সংখ্যা ৫৩৬৪ থেকে বেশি।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, স্বয়ং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর বর্ণিত হাদীস, যেগুলো বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে? অতএব, হযরত আবূ হুরায়রা রা. এটা কিভাবে বললেন যে, আমার চেয়ে তাঁর বেশি হাদীস মুখস্থ ছিল।

১. এর উত্তর হল, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. ইবাদতে বেশি সময় রত থাকতেন। শিক্ষা দান ও হাদীস বর্ণনার সুযোগ কম আসত।

২. হাদীস মুখস্থ থাকা অন্যদের নিকট সবগুলো বর্ণনা করাকে আবশ্যক করে না। বাস্তব ঘটনা এই যে, হযরত আবূ হুরায়রা রা. অবস্থান করেন মদীনায়। সেটি তৎকালীন যুগে ইলমে দীন অন্বেষীদের কেন্দ্র ছিল। এজন্য হাদীস বর্ণনা করার সুযোগ তাঁর বেশি হয়েছিল। এর পরিপন্থী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. ছিলেন শাম ও মিসরে, যেখানে ইলমে হাদীস অন্বেষীদের শরণাপন্ন হওয়ার এতটা সুযোগ ছিল

না। এজন্য হাদীস বেশি মুখস্থ থাকা সত্ত্বেও তাঁর বর্ণিত রেওয়ায়াত সংখ্যা হযরত আবূ হুরায়রা রা. কর্তক বর্ণিত সংখ্যা থেকে কম ছিল।

ইলমের কেন্দ্রসমূহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর ইলমের তিনটি কেন্দ্র ছিল- ১. মদীনা মুনাওয়ারা, ২. মক্কা মুয়াজ্জমা, ৩. কুফা। মক্কা মুকাররমার প্রধান শিক্ষক ছিলেন হযরত ইবনে আব্বাস রা.। মদীনা মুনাওয়ারায় হযরত ইবনে উমর রা. এবং যায়েদ ইবনে সাবিত রা., কূফায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. । - আ'লামুল মুয়াক্কিঈন।

মোটকথা, সহীফায়ে সাদিকা তৎকালীন যুগে হাদীসের একটি বিরাট সংকলন ছিল এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. এটাকে অত্যন্ত হেফাজতে রাখতেন। তাঁর ওফাতের পর এই সহীফা তাঁর প্রপুত্র হযরত আমর ইবন শু'আইব র.-এর নিকট হস্তান্তরিত হয়। যিনি অধিকাংশ সময় عن ابيه عن جده সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। বরং হাফিজ ইবনে হাজার র. 'তাহযীবুত্ তাহযীবে' ইমাম ইয়াহইয়া ইবন মাঈন ও আলী ইবনুল মাদীনী র.-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, যে হাদীস عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده সূত্রে এসেছে, সেটা মনে করবে 'সহীফায়ে সাদিকা'র হাদীস।

২. সহীফায়ে আলী রা.

আবূ দাউদ ঃ ১/২৭৮, كتاب المناسك باب فى تحريم المدينة -এর অধীনে হযরত আলী রা. -এর এই উক্তি বর্ণিত হয়েছে-

ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا القران وما فى هذه الصحيفة الخ

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কুরআন ও এই সহীফায় যা কিছু আছে তা ছাড়া আর কিছু আমরা লেখিনি।'

এই বিবরণটি বুখারীতে চার স্থানে, মুসলিমে দুই স্থানে এবং নাসাঈ ও তিরমিযীতেও বর্ণিত হয়েছে। হযরত আলী রা.-এর সহীফা তাঁর তলোয়ারের খাপে থাকত। এই রেওয়ায়াতের বিভিন্ন শব্দ দ্বারা বুঝা যায় যে, তাতে দিয়ত বা রক্তপণ-মা'আকিল, ফিদিয়া, কিসাস এবং জিম্মীদের বিধিবিধান, যাকাতের নেসাব এবং মদীনা তায়্যিবা হেরেম হওয়া সংক্রান্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩. কিতাবুস সাদাকা

এটি সেসব হাদীসের সমষ্টি যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন। এতে যাকাত, সাদকা, ওশর ইত্যাদির আহকাম ছিল। সুনানে আবূ দাউদ পাঠে জানা যায় যে, এ কিতাবটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় গভর্নরদের নিকট পাঠানোর জন্য লিখিয়েছিলেন; কিন্তু এগুলো প্রেরণের পূর্বেই তিনি ওফাত লাভ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর এ কিতাবটি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা.-এর নিকট ছিল, অতঃপর এসেছে হযরত উমর রা.-এর নিকট, অতঃপর তাঁর দুই সাহেবযাদা হযরত আবদুল্লাহ এবং উবায়দুল্লাহর কাছে এসেছে। এরপর তাদের নিকট থেকে নিয়ে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র. এটা কপি করিয়েছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহর নিকট হস্তান্তরিত হয়। হযরত সালিম র. থেকে ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী র. এটা মুখস্থ করেন ও অন্যদেরকে পড়ান। -আবূ দাউদ ঃ ১/২১৯।

তাছাড়া বিভিন্ন সাহাবীর নিকট লিপিবদ্ধ অনেক হাদীস ছিল।

৪. সহীফায়ে আমর ইবনে হাযম রা.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত আমর ইবন হাযম রা. কে নাজরানের গভর্ণর নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন, তখন তাঁর হাদীস সম্বলিত একটি সহীফা তাঁর নিকট অর্পণ করেছিলেন। এটি লিখেছিলেন হযরত উবাই উবনে কা'ব রা.। আবূ দাঊদ ইত্যাদিতে এ সহীফা থেকে বাছাইকৃত যেসব অংশ এসেছে সেগুলো দ্বারা বুঝা যায়, তাতে পবিত্রতা নামায, যাকাত, হজ্জ, উমরা, জিহাদ, সীরাত, গনীমত ইত্যাদি সংক্রান্ত হাদীস অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৯। সহীফায়ে সামুরা ইবন জুনদুব (রা.)

হাফিজ ইবন হাজার (র.) 'তাহযীবুত্ তাহযীবে' বর্ণনা করেছেন যে, সুলায়মান ইবন সামুরা (রা.) স্বীয় পিতা সামুরা ইবন জুনদুব (রা.) থেকে একটি বড় কপি বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র.) বলেন-

ان الرسالة التى كتبَها سمرةُ لأوْلادِهِ يوجدُ فيها علمٌ كثيرٌ.

'যে পুস্তিকাটি সামুরা রা. তাঁর সন্তানদের জন্য লিখেছিলেন তাতে প্রচুর বিদ্যা পাওয়া যায়।'

১১। সুহুফে আবূ হুরায়রা রা.

ইমাম হাকিম র. মুস্তাদরাকে এবং আল্লামা ইবন আব্দুল বার র. 'জামিউ বায়ানিল ইলমে' হযরত হাসান ইবন আমরের এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন- আমি হযরত আবূ হুরায়রা রা. -এর সামনে একটি হাদীস বর্ণনা করেছি। আবু হুরায়রা রা. এ হাদীস সম্পর্কে না ওয়াকিফ বলে প্রকাশ করলেন। আমি বললাম, আমি এ হাদীসটি আপনার কাছ থেকে শুনেছি। এর ফলে হযরত আবূ হুরায়রা রা. বললেন, যদি এ হাদীসটি আমি বর্ণনা করে থাকি তবে তা আমার কাছে লিখিত থাকবে। ফলে তিনি হাদীসের কিছু কিতাব বের করে আনলেন। সেগুলোতে তালাশ করার পর সে হাদীস পেয়ে গেলেন।

এতে বোঝা গেল, হযরত আবূ হুরায়রা রা. -এর নিকট তাঁর বর্ণিত সমস্ত হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল। যেন এর ফলে ৫৩৬৪টি হাদীসের লিখিত একটি ভান্ডারের সন্ধান পাওয়া যায়।

কিন্তু এর উপর প্রশ্ন হয় যে, হযরত আবূ হুরায়রা রা. -এর এই উক্তি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি লিখতাম না। তাহলে এই বিবরণের কি ব্যাখ্যা?

এর উত্তর হল, মনে হয়, হযরত আবূ হুরায়রা রা. রিসালত যুগে এবং খুলাফায়ে কিরামের প্রাথমিক যুগে হাদীস লিখতেন না; কিন্তু শেষ বয়সে মনে করলেন এই রেওয়ায়াতগুলো আবার ভুলে যাই কিনা। তাই, তিনি নিজের বর্ণিত হাদীসগুলো সংকলন করেছেন। অতএব কোন বৈপরীত্য রইল না। এ কারণে হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর প্রতি কয়েকটি সহীফা সম্বন্ধযুক্ত।

ক. মুসনাদে আবূ হুরায়রা রা.

ইমাম ইবন সা'দ র. 'তাবাকাতে' বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর ইবন আব্দুল আযীযের পিতা আব্দুল আযীয ইবন মারওয়ান মিসরের গভর্নর থাকা কালে কাসীর ইবন মুর্‌রাকে চিঠি লিখেছিলেন যে, আপনার নিকট সাহাবী বর্ণিত যতগুলো হাদীস রয়েছে সেগুলো সব আমার কাছে পাঠিয়ে দিন শুধুমাত্র আবূ হুরায়রা রা. -এর হাদীস ছাড়া। কারণ, এগুলো আমার কাছে আছে। এতে বোঝা যায়, হযরত আবূ হুরায়রা রা. -এর হাদীসগুলো তাঁর নিকট লিখিত আকারে মওজুদ ছিল।

খ. মুয়াল্লাফে বশীর ইবনে নাহীক র.

হযরত বশীর ইবন নাহীক র. হযরত আবূ হুরায়রা রা. -এর শিষ্য ছিলেন। হযরত ইমাম দারিমী র. বর্ণনা করেছেন- তিনি বলেন, আমি হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে যা শুনতাম তা লিখে ফেলতাম। পরবর্তীতে আমি এই সংকলনটি হযরত আবূ হুরায়রা রা. -এর খেদমতে পেশ করলাম। বললাম, এগুলো সেসব হাদীস যেগুলো আমি আপনার কাছ থেকে শুনেছি। হযরত আবূ হুরায়রা রা. বললেন, হ্যাঁ।

গ. সহীফায়ে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান র.

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ান পরীক্ষামূলক হযরত আবূ হুরায়রা রা. কে ডেকে তার কিছু হাদীস লিখেছিলেন।

ঘ. সহীফায়ে হাম্মাম ইবন মুনাব্বিহ র.

হযরত হাম্মাম ইবন মুনাব্বিহও হযরত আবূ হুরায়রা রা. -এর প্রসিদ্ধ শিষ্য। তিনি হযরত আবূ হুরায়রা রা. -এর হাদীসগুলোর একটি সংকলন বিন্যস্ত করেছিলেন। যার নাম হাজী খলীফা কাশফুজ্জুনূনে আস্ সহীফাতুস্ সহীহা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল র. স্বীয় মুসনাদে এই সহীফাটি পরিপূর্ণ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম র. ও স্বীয় সহীহে বহু হাদীস এই সহীফা সূত্রে এনেছেন। এই সহীফার কোন হাদীস উল্লেখ করলে তিনি বলেন-

عَنْ هَمَامِ بنِ منبهٍ قال هذا ما حدثنا به ابو هريرةؓ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرَ احاديثَ منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

'হাম্মাম ইবন মুনাব্বিহ বলেন, এ হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবূ হুরায়রা রা. কর্তৃক আমাদের নিকট বর্ণিত হাদীস। অতঃপর তিনি কতগুলো হাদীস উল্লেখ করলেন। বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন।'

সৌভাগ্যক্রমে কয়েক বছর পূর্বে এই সহীফার মূল পান্ডলিপিটি পাওয়া যায়। এর একটি কপি জার্মানীতে বার্লিনের লাইব্রেরীতে মওজুদ আছে। দ্বিতীয় কপিটি আছে দামেশকের কুতুবখানা মাজমায়ে ইলমীতে। সীরাত ও ইতিহাসের সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্ববিদ ডঃ মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ এ দুটি কপি মিলিয়ে এই সহীফাটি ছেপে দিয়েছেন। এতে ১৩৮টি হাদীস রয়েছে। আর যখন মুসনাদে আহমদের সাথে এটাকে মিলানো হয়, তখন কোথাও একটি হরফ বা একটি বিন্দুতেও পার্থক্য ছিল না।

উক্ত কতগুলো উদাহরণ এ বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য যথেষ্ট যে, রিসালত যুগে এবং সাহাবায়ে কিরামের জামানায় হাদীস লেখার নিয়ম খুব ভালরূপে প্রচলিত ছিল। এখানে আমরা শুধু বড় কয়েকটি সংকলনের কথা উল্লেখ করলাম। এগুলো ছাড়া রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব ব্যক্তিগত চিঠি লিখেছেন অথবা কাউকে কোন কথা লিখে দিয়েছেন, কিংবা ফরমান জারী করেছেন এগুলোতো আলাদা। বড় বড় কিতাবগুলোতে এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেখা যেতে পারে। -দরসে তিরমিযী।

হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, হাদীস সংকলনের এসব প্রচেষ্টা ছিল ব্যক্তিগত ধরনের এবং অবিন্যস্ত আকারে। ব্যাপক আকারে গ্রন্থরূপে হাদীস সংকলনের প্রতি গুরুত্বারোপ ছিল না। শাস্ত্রগতভাবে এগুলোকে গ্রন্থ বলতে পারেন না। এক পর্যায়ে সাহাবায়ে কিরাম জিহাদ, তা'লীম ও তাবলীগের জন্য এবং দেশ বিজয়ের কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্রে ও শহরে ছড়িয়ে পড়েন। কিছু সংখ্যক শহীদও হন। অতঃপর যখন তাবিঈনের যুগ

আসে, বিভিন্ন বাতিল ফিরকার সৃষ্টি হয়, খারিজী, রাফিযী, মু'তাযিলা, কাদরিয়া ইত্যাদির ভয়ংকর ফিৎনা মাথাচাড়া উঠতে শুরু করে, বিভিন্ন কুমতলবে এবং বাতিল ধর্মবিশ্বাসগুলোর প্রচলন দেয়ার জন্য বিভিন্ন হাদীস জাল করতে শুরু করে, তখন হাদীস সংকলণের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয র.-এর অন্তরে হাদীস সংকলনের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। একারণে তিনি গোটা সাম্রাজ্যে হাদীস সংকলনের নির্দেশ দেন।

উমর ইবনে আবদুল আযীয র.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

বংশ পরিক্রমা

উমর ইবনে আবদুল আযীয ইবনে মারওয়ান ইবনে হাকাম ইবনে আস ইবনে উমাইয়্যা ইবনে আবদে শামস। নাম উমর। উপনাম আবু হাফস। পিতার নাম আবদুল আযীয। মায়ের নাম উম্মে আসিম।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র.-এর সম্মানিতা মাতা ছিলেন হযরত আসিম ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর কন্যা।

আল্লামা ইবনে জাওযী র. লিখেন- এক দিন হযরত উমর ফারুক রা. মদীনা তায়্যিবায় ঘুরাফেরা করছিলেন। একপর্যায়ে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে একটি দেয়ালের কিনারায় বসে পড়েন। ঘরের ভিতর এক মহিলা আপন কন্যাকে বলছেন, উঠে যেয়ে দুধে পানি মিশাও। কিন্তু কন্যা বলল, আমীরুল মু'মিনীন সাধারণ ঘোষণা দিয়েছেন- দুধে যেন কেউ পানি না মিশায়। মা বললেন, এখন উমর রা. এবং উমরের ঘোষক কেউ দেখতে পারবেন না। তুমি দুধে পানি মিশাও। কন্যা উত্তর দিল, আল্লাহর শপথ! আমি প্রকাশ্যে আমীরুল মু'মিনীনের আনুগত্য করব, আর নির্জনে তাঁর অবাধ্যতার দাগ আঁচলে লাগাব, তা হতে পারে না।

কোন কোন গ্রন্থে অতিরিক্ত আরেকটি অংশ আছে, তিনি এ কথাও বলেছিলেন, আমীরুল মু'মিনীন তো দেখবেন না। কিন্তু আমার, আমীরুল মু'মিনীনের এবং সবার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা তো দেখছেন। হযরত উমর রা. এসব আলোচনা শুনে ফেলেন। আসলামকে বললেন, এ ঘর এবং দরজাটির কথা ভাল করে মনে রেখ। সকাল হলে হযরত উমর রা. অনুসন্ধানের জন্য লোক পাঠালেন। এসব মহিলা কারা? তাদের স্বামী আছে কি না? তত্ত্বানুসন্ধানের পর জানা গেল, মা বিধবা, কন্যা কুমারী।

মোটকথা, হযরত উমর রা. স্বীয় ছেলে আসিমের সাথে তার বিয়ে বন্ধন করিয়ে দেন। সে কন্যার ঘরেই জন্ম নেন উমর ইবনে আবদুল আযীয র. এর জননী হযরত উম্মে আসিম র.। এই হিসেবে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব উমর ইবনে আবদুল আযীয র.-এর পর নানা।

আল্লামা যাহাবী র. তাযকিরাতুল হুফ্ফাযে বলেন- হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র. মদীনা তায়্যিবায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রধান উক্তি অনুযায়ী ৬১ হিজরীতে তার জন্ম হয়। যখন তাঁর পিতা ৬৫ হিজরীতে মিসরের গভর্ণর হন, তখন স্বীয় স্ত্রী উম্মে আসিমকে লিখেন, সন্তান নিয়ে এখানে চলে এস। উম্মে আসিম স্বীয় চাচা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর সাথে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, তুমি চলে যাও। বাচ্চাকে আমাদের এখানে রেখে যাও। কারণ, সে তোমাদের সবার তুলনায় আমাদের সাথে অধিক সাদৃশ্য রাখে। ফলে তিনি উমর ইবনে আবদুল আযীয র.কে তাদের নিকট রেখে মিসরে চলে যান। যেন তাঁর প্রাথমিক প্রতিপালন হয় হযরত ইবনে উমর রা.-এর খেদমতে। এরপর তিনি পিতার কাছে আসেন। অল্প কিছুকাল সেখানে কাটান। এরপর শিক্ষার উদ্দেশ্যে মদীনা মুনাওয়ারায় তাকে পাঠিয়ে

দেয়া হয়। তিনি সালিহ ইবনে কায়সানের প্রতিপালনে থাকেন। শৈশবেই কুরআন মুজীদ হিফজ করেন। হাদীস রেওয়ায়াত যদিও বিভিন্ন উস্তাদ থেকে করেন, যাঁদের অন্তর্ভুক্ত তাবিঈ ছাড়া অনেক সাহাবীও। তা সত্ত্বেও এ পবিত্র শাস্ত্রে তার প্রতি সবচেয়ে বেশি অবদান ছিল উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উকবা ইবনে মাসউদ র.-এর। -তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ ঃ ১/১১২।

আল্লামা যাহাবী র. তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেন-

كان اماما فقيها مجتهدا عارفا بالسيى كبير الشان ثبتا حجة حافظا قانتا لله اواها منيبا وسيرته تحتمل مجلدا .

মুজাহিদ র. বলেন- আমরা উমর ইবনে আবদুল আযীযের কাছে এসেছিলাম, যেন তিনি আমাদের কাছ থেকে কিছু শিখতে পারেন। কিন্তু তাঁর কাছে এসে আমাদেরকেই অনেক কিছু শিখতে হল।

মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হোসাইনের নিকট কেউ তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তিনি বনু উমাইয়্যার অভিজাত সন্তান। কিয়ামতের দিন একটি উম্মতরূপে তাঁর উত্থান হবে।

যদিও উমর ইবনে আবদুল আযীয র.-এর গুণ ও মর্যাদার সবচেয়ে যুৎসই বিকাশকেন্দ্র মসনদে দরস হতে পারত, কিন্তু পারিবারিক ও বংশীয় সম্পর্কের কারণে মসনদে হুকুমত তাঁর জন্য অনুমোদন করা হয়। ৮৭ হিজরীতে তিনি মদীনা তায়্যিবার গভর্ণর হন। বিশাল বিশাল উল্লেখযোগ্য কীর্তি সম্পাদন করেন। ৯৩হিঃ পর্যন্ত তিনি মদীনা তায়্যিবার গভর্নর থাকেন। অতঃপর হাজ্জাজের ইংগিতে ওয়ালিদ তাঁকে অপসারণ করেন। অথবা তিনি ইস্তিফা দিয়ে দেন। অবশ্য উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানও হতে পারে। বিস্তারিত বিবরণের ক্ষেত্র এটি নয়।

১০ই সফর শুক্রবার দিন ৯৯হিজরীতে সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের ইন্তিকাল হয়। তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র.কে খলীফা নিযুক্ত করেন। তাঁর ওফাত হয় ২৫শে রজব, ১০১হিজরীতে। তাঁর সর্বমোট খিলাফতকাল দুই বৎসর পাঁচ মাস কয়েক দিন। কিন্তু ইসলামী ইতিহাসে তাঁর শাসনকাল এ হিসেবে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে, তিনি খিলাফতে রাশিদার শাসন নিয়ম-শৃঙখলা পুনরায় কায়েম করেছিলেন।

আল্লামা ইবনে খালদুন র. লিখেন-

وتوسط عمر بن عبد العزيز فنزع الى طريقة الخلفاء الاربعة والصحابة جهده ولم يمهل .

অর্থাৎ, উমর ইবনে আবদুল আযীয র. মারওয়ানী ধারার মধ্যম ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর সমস্ত মনোযোগ খুলাফায়ে রাশিদীন ও সাহাবায়ে কিরামের দিকে নিবিষ্ট করেছেন। তাতে সামান্যতম দুর্বলতাও প্রদর্শন করেননি।

সংশোধনের সূচনা নিজ ব্যক্তি, পরিবার ও খান্দান থেকে শুরু করেন। সর্বপ্রথম যখন তিনি জানতে পারলেন, আমাকে খলীফা নিযুক্ত করা হয়েছে, তখন এ মহা দায়িত্বের ফলে ইন্নালিল্লাহ পড়লেন। সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের দাফন-কাফনের পর শাহী সওয়ারীগুলো উপস্থিত করা হয়, যেগুলোতে তুর্কী ঘোড়া ইত্যাদিও ছিল। তিনি এগুলো ফেরত দেন। বলেন, আমার জন্য এই খচ্চরই যথেষ্ট। পুলিশ অফিসার নেযা নিয়ে চলতে আরম্ভ করলে তিনি তাকে হটিয়ে দেন। বলেন, আমিও মুসলমানদের ন্যায় একজন মুসলমান। ঘরে এলে তাঁর দাড়িগুলো ছিল অশ্রুসিক্ত। স্ত্রী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কুশল জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, ভাল কোথায়? আমার ঘাড়ে তো উম্মতে মুহাম্মদিয়ার দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া

হয়েছে। বিবস্ত্র, ক্ষুধার্ত, রুগ্ন, মজলুম, মুসাফির, কয়েদী, বৃদ্ধ, শিষ্য, অভাবী পরিবার পরিজন ইত্যাদির দায়দায়িত্ব আমার উপর এসে গেছে। এ ভয়েই কাঁদছি। কিয়ামত দিবসে যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়. আমি জবাব দিতে পারব কি না! অতঃপর তিনি আপন স্ত্রীকে বললেন, তোমার অলংকারাদি তোমাদের পিতা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের হক দ্বারা তৈরি করেছেন। আমি ফয়সালা করেছি, তোমাকে ফয়সালা করতে হবে, হয় অলংকারাদি, না হয় আমি। উভয়টি একত্রিত হতে পারে না। এতদ্বশ্রবণে তৎক্ষনাৎ স্ত্রী অলংকারাদি খুলে দেন। এগুলো রাষ্ট্রীয় কোষাগারে পৌঁছে দেয়া হয়। এরূপভাবে যেসব স্থাবর সম্পত্তি অথবা খান্দানের নিকট অবৈধ পন্থায় ছিল, সবগুলো যথার্থ ব্যয়খাতে খরচ করেন। সবার অধিকার প্রদান করেন। বনূ হাশিমের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন। তাদের সম্মান করেন। ফাদাক ইত্যাদির সম্পদ ফেরত দেন। রাজ পরিবারের প্রতি কোন (পক্ষপাতমূলক) ছাড় দেননি। তিনি স্বীয় প্রথম বক্তৃতায় সমস্ত বিষয়ের প্রতি ইংগিত দেন।

তাবাকাতে ইবনে সা'দে তাঁর বক্তব্যে এ অংশটুকুও আছে-

لو ان كل سنة يرفعها الله على يدى ولو ان كل بدعة يميتها الله على يدى ولو كان آخر ذلك على قطرة دمى لكان فى الله يسيرا

যার সারকথা হল, আমার আন্তরিক কামনা হল, একেকটি সুন্নত জিন্দা করা, একেকটি বিদ'আত মিটিয়ে দেয়া। সুন্নতের পুণরুজ্জীবন ও বিদ'আত মিটানোর জন্য আমার জান কুরবান করতে হলেও আল্লাহর পথে তা আমার জন্য সহজ। এ বক্তব্যে তিনি আরো বলেছিলেন-

لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق

মনে রেখো আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন মাখলূকের আনুগত্য জায়েয নেই। অতঃপর এর উপর বাস্তবে আমল করে দেখিয়েছেন।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র. যে ইনসাফ ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা কামনা করছিলেন, সেটি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হতে পারছিল না, যতক্ষণ পর্যন্ত সাবেক গভর্ণরদেরকে অপসারণ না করা হয়। সেহেতু ছিনিয়ে আনা সম্পদগুলো ফেরত দেয়ার পর তিনি একাজটিই করেন।

ইমাম আওযাঈ র. বলেন, একদিন তাঁর বাড়িতে অধিকাংশ অভিজাত ও নেতৃস্থানীয় লোক বসেছিলেন। তিনি তাঁদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের মনের আকাঙ্খা হল, আমি যেন তোমাদেরকে কোন সেনানায়ক এবং কোন অঞ্চলের মালিক ও শাসক বানিয়ে দিই। মনে রেখো, আমি কখনো এটা বৈধ মনে করি না যে, আমার বাড়ির ফরশ তোমাদের পা দ্বারা নাপাক হোক। তোমাদের অবস্থা বড়ই আফসোসজনক, আমি তোমাদেরকে স্বীয় দীন এবং মুসলমানদের স্বার্থের মালিক কখনো কোন ক্রমেই বানাতে পারি না। তারা আরয করলেন, আত্মীয়তার কারণে আমাদের কোন অধিকার এবং কোন মর্যাদা নেই? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে তোমাদের ও একজন নিম্ন পর্যায়ের মুসলমানের মাঝে আমার মতে এক অনুপরিমাণ পার্থক্য নেই। এ ধরনের ঘটনাবলীর কারণে বংশীয় লোকজনের মধ্যে চেচামেচি শুরু হয়। তিনি বিদ্যুৎগতিতে চমকে উঠে এক জ্বালাময়ী ভাষন দেন-

ان فى بنى مروان لذبحا وايم الله لو كان هذا الذبح على يدى

অর্থাৎ, মনে হচ্ছে, হকের পুনরুজ্জীবনের জন্য আমাকে নিজের বংশধরকে জবাই করতে হবে। আল্লাহর শপথ, যদি এর প্রয়োজন আসে, তবে আমি এতেও দ্বিধা করব না। বংশের লোকজন এটাও

মনে করল, যদি তাঁর খিলাফত কাল সুদীর্ঘ হয়, তবে শাসন ক্ষমতা আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং তিনি কোন যোগ্যতাসম্পন্ন দীনদার ব্যক্তিকেই তার স্থলাভিষিক্ত বানাবেন। এ জন্য তাঁকে বিষ প্রয়োগে (হত্যা) করা হয়।

قال الجزائرى فى توجيه النظر و كانت مبايعته بالخلافة فى صفر سنة تسع و تسعين ووفاتة لخمس بقين من رجب سنة احدى ومائة وعاش اربعين سنة و كان موته بالسم فان بنى امية ظهر لهم انه ان امتدت ايامه خرج الامر من ايديهم ولم يعهد الا لمن يصلح له فعاجلوه ، وفى تذكرة الحفاظ فسموه .

আল্লামা আইনী র. ১ম খণ্ডের ১১৩ পৃষ্ঠায় বলেন-

احد الخلفاء الراشدين ومدة خلافته سنتان وخمسة اشهر نحو خلافة الصديق فملأ الارض قسطا وعدلا .

ইমাম শাফিঈ র.ও তাঁকে খলীফায়ে রাশিদ বলেছেন। -তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ।

তাঁর কীর্তির গুরুত্ব এ কারণেও সমধিক যে, তিনি আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের ভাতিজা ও জামাতা ছিলেন। তাঁর বংশের সব লোক বড় বড় পদস্থ ছিলেন। তিনি এরূপ সময়ে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছেন, যখন ইনসাফ ও ন্যায়-নিষ্ঠা দুনিয়া থেকে রূপকথার শুকপাখির ন্যায় হয়ে গিয়েছিল।

আল্লামা নববী র. তাহযীবুল আসমায় লিখেন- তিনি ছিলেন প্রথম শতাব্দির মুজাদ্দিদ তথা সংস্কারক।

ইমাম আহমদ র. সহ অনেক আলিম থেকে এটাই বর্ণিত আছে। তিনি হাদীস সংকলনের নির্দেশনামা জারী করেন এবং সংকলিত হাদীসগুলোর সমষ্টি তৈরি করে বিভিন্ন দেশে বণ্টন করেন।
-জামিউ বয়ানিল ইলম ঃ ৩৮।

বিস্তারিত বিবরণ পিছনে এসেছে। -ইমদাদুল বারী ঃ ১ম খণ্ড।

মোটকথা, রীতিমত গ্রন্থাকারে সুশৃংখলভাবে হাদীস সংকলনের প্রয়োজন অনুভব করেন হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র.। তিনি ছিলেন উম্মতের সর্বপ্রথম মুজাদ্দিদ। তিনি মদীনা মুনাওয়ারার আমীর ও বিচারপতি আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযম আনসারী (ওফাত -১২০) র.কে লিখেন-

انظر ما كان من حديث رسول الله صلے الله عليه وسلم فاكتبه ، فانى خفت دروس العلم وذهاب العلماء الخ

মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদেও এই চিঠিটি বর্ণিত আছে। তাতে আছে, হাদীসে নববী বা সুনানে রাসূল অথবা হাদীসে উমর কিংবা (অনুরূপ অন্যান্য সুমহান সাহাবীর আছার) সব সংকলন করে লিখুন। কারণ, আমার মনে ইলম ধ্বংস হওয়া ও উলামায়ে কিরাম নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। -মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ ঃ ৩/৯১।

সহীহ বুখারী ও মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদে এই হুকুম শুধু মদীনার বিচারপতি আবু বকর ইবনে হাযম র.-এর নামে এসেছে। কিন্তু হাফিজ ইবনে হাজার র. ফাতহুল বারীতে (ছাপা পাকিস্তান, বাবু কিতাবাতিল ইলম ঃ ১/২০৮) বলেন-

واول من دون الحديث ابن شهاب الزهرى على رأس المائة بامر عمر بن عبد العزيزؒ .

অনুরূপভাবে আল্লামা সুয়ূতী র. আলফিয়া ও তাদরীবে ইমাম যুহরী র.কে সর্বপ্রথম সংকলক সাব্যস্ত করেছেন।

প্রথম সংকলক সম্পর্কে দুটি উক্তি রয়েছে- ১. ইমাম যুহরী র., ২. আবু বকর হাযমী। উভয়েই সমকালীন।

এতে বাহ্যতঃ বিরোধ মনে হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে কোন বিরোধ নেই। কারণ, হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র. উভয়কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ, উভয়েই সমকালীন ছিলেন।

আল্লামা ইবনে আবদুল বার র. তামহীদে লিখেছেন- উমর ইবনে আবদুল আযীয র. আবু বকর হাযমী র.কে লিখেছেন- হাদীসগুলো লিখে পাঠিয়ে দিন। فتوفى عمر وقد كتب ابن حزم كتبا قبل ان يبعث بها اليه অর্থাৎ, ইবনে হাযম র. কয়েকটি গ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় হল, যখন তাঁর এই কীর্তি পরিপূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছে, তখন হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র. ইহকাল ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমান। এ জন্য তাঁর খেদমতে এসব কিতাব পাঠাতে পারেননি।

আল্লামা ইবনে আবদুল বার র. জামিউ বয়ানিল ইলমে ইমাম যুহরী র.-এর বাণী বর্ণনা করেন যে, উমর ইবনে আবদুল আযীয র. সুনান সংকলনের নির্দেশ দিলে আমরা ভলিয়মের পর ভলিয়ম লিখে ফেলি। অতঃপর তিনি গোটা দেশের বিভিন্ন এলাকায় একেকটি ভলিয়ম পাঠিয়ে দেন।

সম্ভবতঃ একারণেই অধিকাংশ মুহাদ্দিস ইমাম যুহরী র.কে সর্বপ্রথম সংকলক বলেছেন। ইমাম মালিক র. থেকেও এটাই বর্ণিত আছে-

اول من دون الحديث ابن شهاب (زهرى) كما اخرج ابو نعيم فى حلية الاولياء عن مالك رح .

একটি বিভ্রান্তি ও এর নিরসন

এখানে একটি বিভ্রান্তির নিরসন জরুরী। ইমাম বুখারী র. باب كيف يقبض العلم এ তা'লীক রূপে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র.-এর উপরোক্ত ফরমান (انظر ما كان الخ) উল্লেখ করেছেন। এরপর নিম্নোক্ত বাক্যটি তিনি নিজের পক্ষ থেকে সংযুক্ত করেছেন-ولا تقبل الا حديث النبى صلى الله عليه وسلم অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ছাড়া অন্য কোন বিষয় গ্রহণ কর না।

এখানে কোন কোন ছাত্রের বিভ্রান্তি হয়ে যায় যে, এ বাক্যটিও হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র.-এরই। অথচ এ ধারণা যথার্থ নয়। যেমন স্বয়ং ইমাম বুখারী র.-এর দ্বিতীয় তা'লীক حدثنا العلاء بن ذهاب عبد الجبار الخ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র.-এর ফরমান শুধু العلماء পর্যন্ত। এ জন্য হাফিজ আসকালানী র. বলেন- فبقيته من كلام المصنف اورده تلو كلام عمر

আল্লামা কাসতাল্লানী র. এখানে নিম্নোক্ত ভাষায় এরই বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।

قال الحافظ ابن حجر محتمل لان يكون ما بعده ليس من كلام عمر الخ .

قسطلاني : ١/٣٤٥.

সারকথা, সংকলকগনের প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থানে রয়েছেন ইবনে শিহাব যুহরী র.। যিনি হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র.-এর জীবদ্দশাতেই হাদীস সংকলন করেছেন। তখন অনেক সাহাবী জীবিত ছিলেন। সর্বশেষ সাহাবী আবুত তুফাইল রা.-এর ওফাত হয়েছে মক্কা মুয়াজ্জমায় ১১০ হিজরীতে। আল্লামা যাহাবী র. এটাকেই বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন। -তাদরীব ঃ ৪১২।

এ জন্য স্পষ্ট বিষয় হল, হাদীস সংকলন সাহাবায়ে কিরামের যুগেই হয়েছিল। যদিও বাহ্যতঃ নিয়মতান্ত্রিক গ্রন্থাকারে বিন্যাস সে যুগে হয়নি।

দ্বিতীয় শ্রেণী

এরপর আসে রবী' ইবনে সাবীহ ও সাঈদ ইবনে আবূ আরূবা র. প্রমূখের যুগ। তাঁদেরকেও প্রথম সংকলক বলা হয়েছে। হাফিজ র. মুকাদ্দামায়ে ফাতহুল বারীতে তাঁদেরকে প্রথম সংকলক বলেছেন। তিনি আরো লিখেছেন- فكانوا يصنفون كل باب عليحدة তথা তাঁরা প্রতিটি অনুচ্ছেদের হাদীস স্বতন্ত্রভাবে লিখতেন। যেমন- নামায পর্ব আলাদা, যাকাত পর্ব আলাদা।

আল্লামা চলপী র. কাশফুজ্ জুনূনে রবী ইবনে সাবীহকে اول من صنف فى الاسلام তথা ইসলামের সর্বপ্রথম গ্রন্থকার লিখেছেন।

তৃতীয় শ্রেণী

এরপর আসে তৃতীয় শ্রেণী। তাঁরা বিভিন্ন অনুচ্ছেদকে এক স্থানে লিখতে আরম্ভ করেন। এই শ্রেণীটির সূচনা হয় প্রায় ১৫০ হিজরীর পর। এর সর্বশেষ্ঠ নজির হল মুয়াত্তা ইমাম মালিক। এই শ্রেণীতে রয়েছে একটি দল। দ্বিতীয় শতাব্দীর কয়েকটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ এই-

১. মুয়াত্তা ইমাম মালিক ইবনে আনাস র.-ওফাত-১৭৯ হিজরী।
২. মুসান্নাফে লাইছ ইবনে সা'দ র. -ওফাত-১৭৫ হিজরী।
৩. মুসান্নাফে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা র. -ওফাত-১৯৮ হিজরী।
৪. মুসনাদুল ইমামিশ শাফিঈ র. -ওফাত-২০৪ হিজরী।

তাদের যুগ প্রায় একই। এ জন্য তাদের প্রত্যেককেই প্রথম সংকলক বলা হয়েছে। কোন কোন মহা মনীষী এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, এই প্রথমত্ব অঞ্চলের দিকে লক্ষ্য করে। যেমন- মক্কা মুয়াজ্জমায় ইবনে জুরাইজ, শামে আওযাঈ, মদীনা মুনাওয়ারায় ইমাম মালিক, খুরাসানে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, ইয়ামানে মা'মার র.।

তাঁরা বিভিন্ন অনুচ্ছেদ সংকলন করেছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসগুলোর সাথে সাহাবা ও তাবিঈনের আছরগুলোও একত্রিত করেছেন। ইমামগণের ফিক্বহী উক্তিগুলোও এসে গেছে। এরপর প্রায় দুইশ হিজরীতে একটি দলের অন্তরে খেয়াল সৃষ্টি হল, শুধু হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একত্র করা দরকার। তখন আবদুল্লাহ ইবনে মূসা আবাসী মুসনাদ লিখেছেন। অতঃপর নুআঈম ইবনে হাম্মাদ খুযাঈ র. একটি মুসনাদ লিখেন। এরপর মুসনাদের ধারা শুরু হয়ে যায়। প্রচুর মুসনাদ লিপিবদ্ধ হয়। তন্মধ্যে মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল সমধিক প্রসিদ্ধ।

সারকথা, এই তৃতীয় শতাব্দীতে হাদীস সংকলনের কাজ স্বীয় যৌবনে উপনীত হয়। একবার ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ র.-এর মজলিসে এর আলোচনা হল। কেউ মত প্রকাশ করলেন যে, সহীহ হাদীস অশুদ্ধ হাদীস থেকে পার্থক্য করা সাধারণ লোকদের জন্য কঠিন হয়ে থাকে। এজন্য এরূপ কোন কিতাব হওয়া উচিত, যাতে শুধু সহীহ মারফূ' হাদীসগুলো থাকবে। ইমাম ইসহাক র. স্বীয় শিষ্যদেরকে সম্বোধন

করে বললেন- তোমাদের মধ্য থেকে যে এ কাজ করতে পারে তার জন্য অবশ্যই এ কাজটি করা উচিত। এ মজলিসে ইমাম বুখারী র. উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখনই মনে মনে ইচ্ছা করেন এবং শুধু সহীহ হাদীস সংকলনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। এরপর অনেক মুহাদ্দিস ইমাম বুখারী র.-এর অনুসরণ করেন। ফলে সহীহ মুসলিম, নাসাঈ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ সংকলিত হয়।

মোটকথা, প্রথম সংকলকের প্রয়োগ অনেক মনীষীর ক্ষেত্রে হয়েছে। কিন্তু তাত্বিক উক্তি হল, প্রথম সংকলক সাধারণতঃ ইমাম যুহরী র. অথবা আবূ বকর ইবনে হাযম র.। অতঃপর প্রতিটি অনুচ্ছেদকে স্বতন্ত্রভাবে লিপিবদ্ধকার [illegible] ইবনে সাবীহ ও সাঈদ ইবনে আবি আরূবা। এরপর বিভিন্ন অনুচ্ছেদ সংকলক হল একটি দল। এরপর শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসগুলো সংকলনকারী মুসনাদ গ্রন্থকারগণ। এরপর শুধু সহীহ হাদীসগুলোকে সংকলনকারী একটি দল ছিলেন। তাদের শীর্ষস্থানীয় হলেন ইমাম বুখারী র.।

আল্লামা সুয়ূতী র. আলফিয়ায় প্রথম সংকলকগণকে কয়েকটি কাব্যে একত্রিত করেছেন।

اول جامع الحديث والاثر ÷ ابن شهاب امر له عمر

واول الجامع للابواب ÷ جماعة فى العصر ذو اقتراب

كابن جريج وهشيم مالك ÷ ومعمر وولد المبارك

واول الجامع باقتصار ÷ على الصحيح فقط البخارى

এতে আল্লামা সুয়ূতী র. প্রথম সংকলকগণের তিনটি শ্রেণী সাব্যস্ত করেছেন। মোটকথা, প্রথম সংকলক সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে-

১. বর্তমান যুগের ন্যায় প[illegible]পত্রাদির মাধ্যম ছিল না। প্রতিটি ব্যক্তি নিজের জানা অনুযায়ী কাউকে প্রথম সংকলক বলেছেন।

২. অঞ্চল ভিত্তিক প্রথমত্ব।

৩. বিভিন্ন প্রকারের দিকে লক্ষ্য করে প্রথমত্ব।

নোটঃ আলফিয়া একটি হল হাফিজ ইবনে হাজার র.-এর উস্তাদ আল্লামা ইরাকীর। এটি খুব জটিল। এটি আলফিয়ায়ে ইরাকী রূপে প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় আলফিয়া আল্লামা সুয়ূতী র.-এর। এটি আলফিয়ায়ে সুয়ূতী নামে প্রসিদ্ধ। এ দুটি আলফিয়া হাদীসশাস্ত্র সংক্রান্ত। তৃতীয় আলফিয়া হল, ইলমে নাহব বা ব্যাকরণ সংক্রান্ত। এটি আলফিয়ায়ে ইবনে মালিক নামে প্রসিদ্ধ। এ তিনটিকে আলফিয়া বলার কারণ প্রত্যেকটিতে এক হাজার কাব্য রয়েছে।

ইমাম যুহরী র.

هو ابو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهره الفقيه نسب الى جد جده لشهرته- الزهرى نسب الى جده الاعلى زهرة بن كلاب وهو من رهط امنة ام النبى صلى الله عليه وسلم اتفقوا على اتقانه وامامته-

গ্রন্থরাজিতে অধিকাংশ ইবনে শিহাব অথবা যুহরী পাওয়া যায়। কোথাও মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমও আছে। উভয়ের দ্বারা উদ্দেশ্য একটি। তাঁর দাদা খুব প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। এদিকে সম্বোধন করে তাঁকে

ইবনে শিহাব বলা হয়। তাঁর উর্ধ্বতন প্রপিতা ছিলেন যুহরা ইবনে কিলাব। এ জন্য তাঁকে যুহরী বলা হয়েছে। নাম হল মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম।

ইমাম যুহরী র.-এর জন্ম -৫০ হিজরীতে, ওফাত-১২৫ হিজরীতে।

ইমাম বুখারী র.-এর জীবনী ঃ

জন্ম ঃ ১৯৪ হিজরী। বয়স ঃ ৬২ বছর। ওফাত ঃ ২৫৬ হিজরী।

ইমাম বুখারী র.-এর নাম মুহাম্মদ। উপনাম আবু আবদুল্লাহ। উপাধি ঃ আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস। তাছাড়া মুহাদ্দিসীনে কিরাম ও উলামায়ে ইসলাম থেকে নাসিরুল হাদীসিননববী ও নাশিরুল মাওয়ারীসিল মুহাম্মদিয়্যা উপাধিও বর্ণিত আছে। তবে প্রসিদ্ধ উপাধি হল আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস।

বংশ পরিক্রমা ঃ

আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুগীরা ইবনে বারদিযবাহ্ আল জু'ফী আল বুখারী র.। জু'ফী শব্দটিতে ইয়া নিসবতী অর্থাৎ, সম্বোধনযুক্ত। জু'ফ আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র।

ইমাম বুখারী র.এর প্রপিতা মুগীরা ইয়ামান জু'ফির হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যিনি ছিলেন তৎকালীন যুগের বুখারার শাসক। অতঃপর বুখারাতেই তিনি বসবাস করেন। যেহেতু আরবের নিয়ম ছিল কেউ কারো হাতে ইসলাম গ্রহণ করলে ওয়ালার সম্পর্ক তার সাথেই হয়ে যেত, সেহেতু তাকে জু'ফী বলা হয়। হানাফীগণও এর প্রবক্তা। এ প্রসঙ্গে হানাফীদের নিকট আবু দাউদ শরীফের একটি রেওয়ায়াত আছে-

عن تميم الدارى انه قال يا رسول الله! ما السنة فى الرجل يسلم على يدى الرجل من المسلمين قال هو اولى الناس بمحياه ومماته .

হযরত তামীমে দারী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! সে ব্যক্তি সম্পর্কে আদর্শ কি, যে মুসলমানদের মধ্য থেকে কারো হাতে ইসলাম গ্রহণ করে? তিনি বললেন- মুসলমান সমস্ত লোকদের মধ্য থেকে সবচেয়ে নিকটতম তার জীবন ও মৃত্যুতে। -আবু দাউদ ঃ ২য় খন্ড, কিতাবুল ফারায়িয।

কিন্তু তাঁর পিতা বারদিযবা ছিলেন ফার্সী বংশোদ্ভুত। তার ইনতিকালও হয়েছে কুফরী অবস্থায়।

বারদিযবা ফার্সী শব্দ। এর অর্থ হল কৃষক। এ বারদিযবাও ছিলেন কৃষক।

ইবরাহীমের পিতা অর্থাৎ ইমাম বুখারী র.-এর সম্মানিত দাদা ~~বারদিযবা~~ ইবরাহিম সম্পর্কে হাফিজ আসকালানী র. মুকাদ্দামায়ে ফাতহুল বারীতে লিখেন যে, তার অবস্থা জানা যায়নি। তবে ইমাম বুখারীর সম্মানিত পিতা হযরত ইসমাঈল র. শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিসীনের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। বহু মুহাদ্দিস তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন। তিনি সুমহান মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর উপনাম ছিল আবুল হাসান। তিনি ইমাম মালিক র.-এর ছাত্র ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক র.-এর সান্নিধ্য অর্জন করেছিলেন। আল্লামা যাহাবীর তারীখে ইসলাম এবং স্বয়ং তারীখে বুখারীতেও এর সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, তিনি ইবনে মুবারক র.-এর সংসর্গে ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রশংসনীয় গুণাবলীর অধিকারী বড় মুত্তাকী মনীষী। তাঁর এক শিষ্য আহমদ ইবনে হাফসের বিবরণ - 'আামি তাঁর ওফাতের সময় উপস্থিত ছিলাম। তখন ইসমাঈল বললেন- আমি আমার অর্জিত সম্পদে একটি দিরহামও সংশয়যুক্ত পাইনা।'

বলতে তো এটি সাধারণ। কিন্তু চিন্তা করলে বুঝা যায় এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, হারাম তো দূরের কথা, একটি দিরহাম সংশয়যুক্তও ছিল না।

ইমাম বুখারী র.-এর প্রতিপালন হয়েছিল এই সম্পদ দ্বারা। মাতা-পিতার তাকওয়া ও ইখলাসের আছর অবশ্যই সন্তানের উপর হয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ রয়েছে-

وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ.

ইমাম সাহেব র.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনীঃ

ইমাম বুখারী র. ১৩ই শাওয়াল ১৯৪ হিজরীতে জুমআর নামাযের পর বুখারা শহরে এ জগতে পদার্পন করেন। একদিকে শাওয়াল মাস, যেটি হারাম মাসের ১ম, অপর দিকে জুমআর দিন, যেটি অন্য দিনের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। এতে বুঝা যায়, ইমাম বুখারী র.-এর জন্ম তারিখও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

তিনি হালকা গড়নের এবং মধ্যাঙ্গী ছিলেন। পরিচ্ছন্নতাপ্রিয়। সাদাসিধে চালচলন ছিল তাঁর স্বাভাবিক অভ্যাস। দাড়িগুলো ছিল ঘন। আলোকোজ্জ্বল চেহারা। দেখা মাত্রই মানব দৃষ্টি ভক্তি ও ভালবাসায় ন্যুব্জ হয়ে আসত। বদান্যতা লাভ করেছিলেন খান্দানী মীরাছ রূপে।

ইমাম বুখারী র. কম বয়সেই পিতৃছায়া হারান। তাঁর তা'লীম- তরবিয়ত তথা শিক্ষাদীক্ষার সমস্ত দায়দায়িত্ব পড়ে সম্মাণিতা জননীর উপর। ইমাম সাহেবের জননী ছিলেন বড় ইবাদতগুজার আল্লাহ ওয়ালা রমনী। ইমাম বুখারী র. শৈশবে কোন কারণে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে তাঁর আম্মা অসাধারণ কষ্ট পান। স্বামী অর্থাৎ, হযরত ইসমাইল র.-এর ওফাতের ঘটনাই কম ছিল না। এদিকে চোখের জ্যোতি কলিজার টুকরা সন্তানের দৃষ্টিশক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। অনেক চিকিৎসা করানো হয়, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি থেকে তিনি বঞ্চিতই থেকে যান। ইমাম সাহেবের আম্মাজান খুব কান্নাকাটি করে দরবারে ইলাহীতে সন্তানের দৃষ্টিশক্তির জন্য দুআ করেন। এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, হযরত ইমাম ইবরাহীম খলীল আ. তাঁকে বলছেন, তোমার দুআ কবুল হয়ে গেছে। তোমার কলিজার টুকরাকে পুনরায় চোখের জ্যোতি দান করা হয়েছে। ফলে সকালে দেখলেন, ইমাম সাহেব র.-এর চোখের জ্যোতি বাস্তবিকই ফিরে এসেছে। দৃষ্টিশক্তি এত প্রখর হয়েছে যে, তারীখে কবীরের পান্ডুলিপি চাঁদনী রাতে লিখেছেন।

পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁকে মকতবে অর্পন করা হয়। দশ বৎসর বয়সে মকতবের শিক্ষা সমাপন করেন। ইমাম বুখারী র.-এর শিষ্য বুখারীর কপি লেখক ফিরাবরী র.-এর বিবরণ, আমি আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে হাতিম ওয়াররাক থেকে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, আমি নিজেই ইমাম বুখারী র.কে জিজ্ঞেস করেছি। كيف كان بدء امرك؟ অর্থাৎ, আপনি এ স্তরে কিভাবে পৌঁছেছেন। উত্তরে তিনি বললেন-

الهمت حفظ الحديث وانا فى الكتاب (المكتب) قلت وكم اتى عليك اذ ذاك؟

فقال عشر سنين او اقل

অর্থাৎ, আমি যখন মকতবে পড়ি, তখন আমার অন্তরে হাদীস মুখস্থের প্রতি গুরুত্বারোপের বিষয়টি প্রক্ষিপ্ত (ইলহাম)করে দেয়া হয়। অথচ তখন আমার বয়স ছিল দশ বছর বা তার চেয়েও কম। এজন্য মকতবে পড়াকালে বিক্ষিপ্তাকারে যেখানেই কোন হাদীস পেতাম, তৎক্ষণাৎ মুখস্থ করে ফেলতাম। কম বয়সেই হাদীসে নববীর প্রতি সীমাহীন আগ্রহ ছিল। মনে হয় ইমাম বুখারীর সৃষ্টিই হয়েছিল ইলমে হাদীসের জন্য। ফলে দশ বৎসর বয়সে মকতবের শিক্ষা সমাপন করে দরসে হাদীসের বিভিন্ন হালকায়

তথা চক্রে শামিল হতে শুরু করেন। ২০৫ হিজরীতে ১১ বছর বয়সে একদিন তিনি মুহাদ্দিস দাখিলী র.-এর দরসে উপস্থিত হন। তাঁর পাঠচক্র ছিল তৎকালীন যুগে সবচেয়ে বড়। মুহাদ্দিস দাখিলী র. কোন হাদীসের সনদ এভাবে বর্ণনা করলেন-

حدثنا سفيان عن ابى الزبير عن ابراهيم

ইমাম বুখারী র. এক কোণ থেকে আরজ করলেন, সনদ এরূপ নয়। কারণ, আবুয যুবাইরের সাক্ষাত ইবরাহীম থেকে প্রমাণিত নয়। মুহাদ্দিস দাখিলী র. ইমাম বুখারীকে একজন মকতবের শিশু মনে করে শাসালেন। কিন্তু ইমাম বুখারী র. নেহায়েত শিষ্টাচার সহকারে আরজ করলেন, যদি আপনার কাছে মূলকপি থাকে, তবে পুণরায় দেখতে পারেন। কথা যৌক্তিক ছিল। মুহাদ্দিস দাখিলী র. উঠলেন। মূলকপি দেখে বুঝতে পারলেন, ইমাম বুখারী র.এর কথা সঠিক। অতঃপর মুহাদ্দিস দাখিলী র. বললেন, বৎস! আসল সনদটি কি? ইমাম বুখারী র. বললেন, هو ابن عدى عن ابراهيم মুহাদ্দিস দাখিলী র.-এর সত্যায়ন করলেন। যেন উস্তাদ মুহাদ্দিস দাখিলী র.-এর নিকট আবুয যুবাইর ও যুবাইর ইবনে আদীতে গোলমাল লেগেছিল। ফলে ইমাম বুখারী র. তাঁর দৃষ্টিতে মকবুল হয়ে যান। কেউ ইমাম বুখারী র.কে জিজ্ঞেস করল, তখন আপনার বয়স কত ছিল? বললেন, ১১ বছর। এ হল ইমাম বুখারী র.-এর প্রসিদ্ধির প্রথম দিবস। সেদিন থেকে ইমাম বুখারী র.-এর চর্চা শুরু হয়। এক পর্যায়ে ইমাম বুখারী র. যখন বড় বড় মুহাদ্দিসীনের দরসে পৌঁছতেন, তখন তাঁরা সামলে যেতেন।

বিস্ময়কর স্মরণশক্তি

ইমাম বুখারী র.-এর স্মরণশক্তির অনেক ঘটনা সুপ্রসিদ্ধ। কয়েকটি ঘটনা নিম্নে বর্ণিত হল-

আল্লামা কাসতাল্লানী র. বর্ণনা করেন, শৈশবেই ইমাম বুখারী র.-এর সত্তর হাজার হাদীস মুখস্থ ছিল।

হাফিজ আসকালানী র. বর্ণনা করেন, হাশিদ ইবনে ইসমাঈল র.-এর বিবরণ, ইমাম বুখারী র. আমাদের সাথে বসরার মাশায়েখের নিকট যেতেন। আমরা লিখতাম, কিন্তু তিনি কিছুই লিখতেন না। আমরা তাঁকে ভর্ৎসনা স্বরূপ বলতাম, আপনি যেহেতু কিছুই লিখছেন না, তবে অনর্থক সময় নষ্ট করছেন কেন? একদিন ইমাম বুখারী র. আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, তোমরা অনেক কিছু বলেছ। আন দেখি, তোমরা কি লিখেছ? আমরা লিখিত পান্ডুলিপিগুলো দেখালাম। যেগুলোতে ১৫হাজারের চেয়েও কিছু বেশি হাদীস ছিল। বুখারী র. সমস্ত হাদীস স্মরণশক্তি থেকে একাধারে শোনাতে আরম্ভ করলেন। এমনকি আমরা পাণ্ডুলিপিগুলোর সংশোধন তাঁর মুখস্থ শুনানি থেকেই করে নেই। -হাদইয়্যুসসারী মুকাদ্দিমা ফাতহুল বারী।

বাগদাদ ছিল ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু ও সুতিকাগার। সেখানে হাদীসের প্রচুর শায়েখ ছিলেন। সেখানে ইমাম বুখারী র.-এর আগমনের পর পরীক্ষা নেয়া হয়। সেখানকার আলিমগণ একশত হাদীস বাছাই করেন। প্রথম থেকেই দশ জনকে দশ দশটি করে হাদীস মুখস্থ করানো হয়। হাদীসগুলোর সূত্র ও মূলপাঠ সবই পরিবর্তন করে দেয়া হয়। একটির সনদ অপরটির মতনে যুক্ত করা হয়। ইমাম সাহেব র. তাশরীফ আনলেন। মজলিস শুরু হল। সে দশ ব্যক্তি ভুল হাদীসগুলো পালা পালা করে পড়তে লাগলেন। প্রতিটি হাদীস সম্পর্কে ইমাম বুখারী র. বলতেন- لا اعرفه-'আমি জানি না।'

জনসাধারণের মধ্যে প্রশ্ন ও চেচামেচি শুরু হল। কিন্তু তত্বজ্ঞানী আলিমগণ টের পেলেন, তিনি কামিল ব্যক্তি। সবাই হাদীসগুলো শুনিয়ে শেষ করলেন। অতঃপর ইমাম বুখারী র. ধারাবাহিকভাবে

প্রত্যেককে ডেকে বললেন, আপনি প্রথম রেওয়ায়াতটি এভাবে করেছেন, এটি ভুল। বিশুদ্ধ এরূপ এরূপভাবে ধারাবাহিক দশ জনের হাদীসগুলো সংশোধন করলেন। সবার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল, তিনি হাদীস শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ।

হাফিজ ইবনে হাজার র. বলেন, এটা বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, তিনি ভুলগুলো শোধরিয়েছেন। তিনি তো হাফিজে হাদীস ছিলেন। তাঁর কাজই তো এমন। তাজ্জবের ব্যাপার হল, ভুল হাদীসগুলো একবার শুনেই ধারাবাহিকভাবে মুখস্থ করে ফেলেছেন।

শিক্ষা জীবন ইমাম বুখারী র. প্রথমতঃ প্রসিদ্ধ গ্রন্থরাজি এবং বুখারার মাশায়েখের কিতাবগুলো মুখস্থ করেছেন। অতঃপর ১৬ বছর বয়সে হিজায সফরের জন্য মনস্থ করেন। -হাফিজ ইবনে হাজার র.।

১৬ বছর বয়সে ২১০ হিজরীতে বাইতুল্লাহ শরীফে হজ্জ করার ইচ্ছা করেন। সম্মানিত জননী এবং ভাই আহমদ র.-এর সাথে ছিলেন। আম্মাজান ও ভাই আহমদ হজ্জ কর্ম সমাপনান্তে দেশে ফিরে আসেন। ইমাম র. মক্কা মুয়াজ্জমায় ইলম অন্বেষণে অবস্থান করেন। ২১২ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারা সফর করেন। ১৮ বছর বয়সে قضايا الصحابه والتابعين রচনা করেন। যার ফলে ইমাম র.-এর আজীমুশ শান সিদ্ধি লাভ হয়। সে সফরেই ইমাম বুখারী র. মদীনা তায়্যিবায় তারীখে কবীরের পাণ্ডুলিপি চাঁদনী রাতে তরি করেন। এটি ইমাম সাহেব র.-এর দ্বিতীয় গ্রন্থ। ইমাম বুখারী র.-এর উক্তি অনুযায়ী হিজাযে তাঁর অবস্থান ছিল ৬ বছর। কিন্তু পূর্ণ মেয়াদ এক সফরের হতে পারে না। হতে পারে মাঝে মাঝে অন্যত্র কোথাও সফরেরও সুযোগ হয়েছিল।

মোটকথা, ইমাম সাহেব র.-এর হিজাযে অবস্থানের মোট সময়কাল ছিল ৬ বছর। মদীনা তায়্যিবার পর বসরার দিকে রুখ ফেরান। ইমাম বুখারী র.-এর বিবরণ, আমি বসরায় ৪বার গিয়েছি। এরপর কূফার জন্য মনস্থ করি। ওয়াররাক বুখারী কূফা এবং বাগদাদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী র.-এর এই উক্তি বর্ণনা করেন-

لا احصى كم رحلت الى الكوفة وبغداد مع المحدثين

তথা আমি অগণিতবার মুহাদ্দিসীনের সাথে কূফা ও বাগদাদে সফর করেছি।

রিহলত মুহাদ্দিসীনের পরিভাষায় সে সফরকে বলে যেটি হাদীস অন্বেষণের উদ্দেশ্যে অথবা হাদীসের উচ্চ সনদ লাভের জন্য হয়ে থাকে। সাহাবায়ে কিরাম ও সুমহান তাবিঈনের এর প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল।

ইমাম বুখারী র.-এর এ প্রসঙ্গে সুদীর্ঘ সফরের প্রয়োজন এজন্য হয়েছিল যে, তাঁর শিক্ষাযুগটি ছিল বিজয়ের সময়। ইসলামী সাম্রাজ্যের সুবিস্তৃতির কারণে হাদীসের বাহকগণ দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলেন। হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থের আলোকে স্পষ্ট যে, সাহাবায়ে কিরাম একেকটি হাদীসের জন্য একেক মাস দূরত্বের সফরও করতেন। বুখারী শরীফের ১ম খণ্ডে ১৭ পৃষ্ঠায় আছে-

رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر الى عبد الله بن انيس فى حديث واحد

কুরআনে হাকীমও فلولا نفر من كل فرقة الخ আয়াত দ্বারা দীনের গভীর জ্ঞানার্জনের জন্য সফরের তাকীদ করেছে।

এরূপ সফরের জন্য প্রসিদ্ধ বযুর্গ হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম র.-এর উক্তি রয়েছে। মুহাদ্দিসীনে কিরাম যে সফর করেন, আল্লাহ তাআলা তাঁদের সফরের বরকতে এ উম্মতের বালা-মুসিবতগুলো তুলে নেন।

ইমাম বুখারী র.কে ইলম অন্বেষণকালে ক্ষুৎপিপাসার সম্মুখীন হতে হয়েছে। গাছের পাতা ও তৃণলতা গলধঃকরণ করতে হয়েছে। ক্ষুধার মুহূর্তে পোশাক বিক্রি করতে হয়েছে। কিন্তু অটলতার ক্ষেত্রে সামান্যতম দোদুল্যমানতাও আসেনি। তরকারী তো প্রায় জীবনের অধিকাংশ অংশেই ব্যবহার করেননি।

একবার ইমাম বুখারী র. অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাঁর একটি প্রস্রাবের বোতল ডাক্তারদেরকে দেখানো হয়। তখন ডাক্তাররা বললেন, এটি সে পাদ্রীদের মনে হচ্ছে, যারা কখনো তরকারী খান না। ইমাম বুখারী র. এর সত্যায়ন করেন। তিনি বলেন, আমি চল্লিশ বছর থেকে তরকারী ব্যবহার করি না। ডাক্তারগণ তরকারী নির্ধারণ করেন। কিন্তু ইমাম বুখারী আয়েশ-আরাম অন্বেষণ মঞ্জুর করেন নি। শুধু এতটুকু মঞ্জুর করলেন যে, মিষ্টি সহকারে রুটি খাবেন। বাস্তবতা হল- لا ينال العلم براحة الجسم আয়েশ-আরাম আর সুখ অন্বেষণে এই ইলম লাভ হয় না। ইলমের দৌলত তো নেহায়েত চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও কষ্ট-মেহনতে অর্জিত হয়। এ জন্যই ইমাম বুখারী র. আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস হয়েছেন। তাঁর প্রশংসা বড়-ছোট সবার মুখে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. বলেন-

ما اخرجت خراسان مثل محمد بن اسماعيل-

তথা খুরাসান ভূমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলের ন্যায় মনীষী জন্ম দিতে পারেনি।

ইমাম মুসলিম র. বলেন- اشهد انه ليس فى الدنيا مثلك -'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, পৃথিবীতে আপনার মত মনীষী নেই।'

হাকিম আবু আবদুল্লাহ র. তারীখে নিশাপুরে লিখেন- একবার ইমাম মুসলিম ইমাম বুখারী র.-এর নিকট এসে তাঁর দুই চোখের মাঝে ললাটে চুম্বন করে বললেন-

دعنى اقبل رجليك يا استاذ الاستاذين ويا سيد المحدثين ويا طبيب الحديث فى علله

অর্থাৎ, আমাকে অনুমতি দিন। আপনার পদদ্বয় চুম্বন করি। হে উস্তাদদের উস্তাদ! শীর্ষ মুহাদ্দিস ও হাদীসের রোগ নির্ণয়কারী চিকিৎসক!

হাদীসে ইঙ্গিত

যেহেতু ইমাম বুখারী র. পারস্যবাসী ছিলেন এবং হযরত সালমান ফারেসী রা.-এর দিকে ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لو كان الدين بالثريا لنا له رجال من ابناء فارس

মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেন, এ হাদীসের প্রথম বাস্তব রূপ ইমাম আজম আবু হানীফা র. অতঃপর ইমাম বুখারী র.। অনুরূপভাবে কুরআন মজীদে আছে- واخرين منهم لما يلحقوا بهم সাহাবায়ে কিরাম এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- رجال من ابناء فارس এর বাস্তবরূপও ইমামুল আইম্মা আবু হানীফা ও আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ইমাম বুখারী র.।

ওয়াররাক বুখারী র. বলেন, আমি স্বপ্নযোগে দেখি, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও তাশরীফ নিচ্ছেন। আর ইমাম বুখারী র. তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছেন। এর আলোকে ইমাম বুখারী র.-এর সুন্নতের অনুসারী হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট।

ফিরাবরী র. বলেন, আমি স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম, তিনি ইরশাদ করলেন, কোথায় যাচ্ছ? আরয করলাম, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারীর নিকট। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, তাঁর নিকট আমার সালাম বল।

বাস্তবতা হল, যিনি সুন্নতের অনুসরণ করেন এবং সুন্নত জিন্দা করেন, তাঁদের প্রতি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ খুশি হন। ইমাম বুখারীর সুন্নতের অনুসরণ করতেন, সুন্নত জিন্দা করতেন। সহীহ বুখারীর ন্যায় সুমহান গ্রন্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থ লিখে দীনের সেবা করেন। হাদীসের শিক্ষা দেন। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে সালামের সুসংবাদ লাভ করেন।

তাকওয়া ও সতর্কতা

ইমাম বুখারী র. যেরূপ ইলম, ফযল ও গুণাবলীতে উঁচু পর্যায়ের ছিলেন, এরূপভাবে সতর্কতা পরহেযগারীতেও ছিলেন উঁচু পর্যায়ের। তিনি বলেন- ما اغتبت احدا مذ علمت ان الغيبة حرام -আমি যখন থেকে জেনেছি, পরনিন্দা হারাম, তখন থেকে কারো গীবত করি না। তিনি আরো বলতেন, ইনশাআল্লাহ্ গীবত সম্পর্কে কিয়ামতের দিন কারো হাত আমার আচলের উপর পড়বে না। অথবা আমার আচল কারো হাতে পড়বে না। এ থেকে আমাদের ন্যায় তালিবে ইলমদেরও নসীহত ও উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। যে মহান জ্ঞান-গরিমার অধিকারী মনীষীর সুমহান গ্রন্থ আমরা অধ্যয়ন করছি, তিনি কারো গীবত একবারের জন্যও করেননি। অথচ আমরা রাত-দিন গীবতে নিমগ্ন। তাহলে আমাদের কি উপায় হবে? কারো গীবতের পূর্বে চিন্তা করা উচিত, আমরা যার গীবত করছি, তার তো কোন লোকসান হয় না। উল্টো আমাদেরই ক্ষতি, কিয়ামতের দিন আমাদের নেকীগুলোর উপর অন্যদের চাপিয়ে দেয়া হবে।

ইমামুল আইম্মা আবু হানীফা র.ও এ বিষয়ে ভীষণ সতর্ক ছিলেন। সুফিয়ান সাওরী র.-এর নিকট কেউ বলল, ইমাম আবু হানীফা র. কারো পরনিন্দা করেননি।

উত্তরে তিনি বললেন, তিনি খুবই বিচক্ষন জ্ঞানী। নিজের নেকীগুলোর উপর কাউকে চাপিয়ে দিতে চাননি।

কিন্তু আফসোস! এযুগে হিংসা-বিদ্বেষের আধিক্য রয়েছে। এজন্য গীবত শেকায়েতে লিপ্ততাও বেশি। উদাহরণ প্রসিদ্ধ আছে- العلماء اشد الناس تباغضا وتحاسدا। অথচ আলিমদের শান অনেক উর্ধ্বে। হিংসা করলেও অন্যদের কোন ক্ষতি হয় না। অবশ্য হিংসুকের নেকীগুলো বরবাদ হয়ে যায়। يأكل الحسنات كما تاكل النار الحطب শয়তান আত্মমর্যাদাপ্রিয়তা আর হিংসা-বিদ্বেষ ও অহংকারে ধরাশায়ী হয়। সে আলিমদেরকে এতে লিপ্ত করে ধ্বংস করতে চায়। আমাদের উচিত ইমাম বুখারী র.-এর জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষা নেয়া। আরো খেয়াল করা উচিত যে, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, গীবত, আত্মমর্যাদাপ্রিয়তা শুধু গুনাহ এবং হারামই নয়, বরং গুনাহের মূল। ইলমের জন্য স্মরণশক্তি প্রয়োজন। আর গুনাহ দ্বারা স্মরণশক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

شكوت الى وكيع سوء حفظى ÷ فاوصانى الى ترك المعاصى .

فان العلم فضل من الهى ÷ وفضل الله لا يعطى لعاصى.

ইলমী সম্ভ্রমের হেফাজত

হাফিজ ইবনে হাজার র. একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একবার ইমাম বুখারী র.কে নৌ পথে সফর করতে হয়। ইমাম র. এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে সামুদ্রিক জাহাজে আরোহন করেন। একব্যক্তি ভক্তি প্রকাশ করে এবং এতটা ভক্তি প্রকাশ করে যে, ইমাম সাহেব র.-এর তার প্রতি আস্থা হয়ে যায়।

নিজের সম্পূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। এটাও বলে দেন যে, আমার নিকট এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা আছে। একদিন সকালে সে প্রতারক উঠে কান্নাকাটি ও চিৎকার শুরু করে দিয়ে বলতে আরম্ভ করে, আমার একহাজার স্বর্ণমুদ্রার থলে গায়েব হয়ে গেছে। তার এ করুন অবস্থা দেখে নৌযান আরোহীদের দয়া হল। আরোহীদের তল্লাশী শুরু হলে ইমাম সাহেব র. সুযোগ খোঁজে চুপে চুপে নিজের থলেটি সমুদ্রে ফেলে দেন। ইমামেরও তল্লাশী করা হয়। কিন্তু যখন কারো কাছে সে থলে পাওয়া গেল না, তখন আরোহীরা তাকে ভর্ৎসনা করল। নৌযান থেকে নামার পর এসে সে লোকটি ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করল, হযরত! সে স্বর্ণমুদ্রাগুলোর কি হল? ইমাম সাহেব র. বললেন, সমুদ্রে ফেলে দিয়েছি। সে বলল, এত বিশাল অংকের অর্থ আপনি নষ্ট করে দিলেন! উত্তরে তিনি বললেন, যে নির্ভরযোগ্যতার দৌলত অর্জনে আমি সারা জীবন শেষ করেছি, সেটাই আমার মূল অর্জন। এই কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে আমি তা বরবাদ করতে চাইনা।

এ থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত, আমাদের বছরের পর বছরের ইলমী সম্ভ্রমকে টাকা-পয়সার বিনিময়ে বরবাদ না করা উচিত। এরূপ ঘটনা অনেক রয়েছে।

আরেকটি ঘটনা শুনুন। লামিউদ দিরারীর ভূমিকায় আছে, ইমাম বুখারী র.-এর সম্মানিত পিতা প্রচুর ধনসম্পদ রেখে যান। কিন্তু ইমাম সাহেব র. মনে করলেন, আমি ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত হলে আমার ইলমী ক্ষতি হবে। এ জন্য স্বীয় সম্পদ মুযারাবায় দিয়ে দেন। একবার এক মুযারাবা চুক্তিকারী ২৫হাজার টাকা নিয়ে অন্য দেশে অবস্থান করতে শুরু করে। লোকজন ইমাম সাহেবকে বললেন, স্থানীয় শাসকের চিঠি নিয়ে সে এলাকার শাসকের নিকট পৌঁছে দিন। সহজেই টাকা পেয়ে যাবেন। ইমাম বুখারী র. বলেন, যদি আমি নিজের টাকা-পয়সার জন্য শাসকদের নিকট থেকে সুপারিশ লেখাই, তবে এ সব শাসক আমার দীনে দখল দিবে। আমি আমার দীনকে দুনিয়ার বিনিময়ে নষ্ট করতে চাইনা।

২৫হাজার টাকার ব্যাপার এবং ইমাম সাহেবের এই সাহসিকতা আমাদের জন্য শিক্ষনীয়। -ইমদাদুল বারী ঃ ১ম খণ্ড।

খলকে কুরআনের মাসআলা ও নিশাপুরের ফিৎনা

কুরআন সৃষ্ট কি না? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে আকীদা সংক্রান্ত গ্রন্থগুলোতে আলোচনা রয়েছে। রূহুল মা'আনী গ্রন্থকার এটি তাঁর মুকাদ্দমায় লিখেছেন। ইমাম বুখারী র.ও كتاب خلق افعال العباد -এ এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মুহাদ্দিসসুলভ ভঙ্গিতে বাতিল আকাইদ খণ্ডন করেছেন। বুখারী শরীফে كتاب الرد على الجهمية তেও বিভিন্ন শিরোনামে এর দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করেছেন। এখানে বিস্তারিত আলোচনা উদ্দেশ্য নয়। তাছাড়া এখন এর কোন প্রয়োজনও নেই।

সারনির্যাস হল, কুরআন আল্লাহ তাআলার কালাম ও সিফত। আল্লাহ তাআলা অবিনশ্বর। স্পষ্ট বিষয় তার সিফতও অবিনশ্বর হবে। কাজেই কুরআন অবিনশ্বর ও অসৃষ্ট। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাযহাবও এটাই। মুতাযিলার মত হল, কুরআনও নশ্বর। এক যুগে এ ফিৎনা খুবই মারাত্মক ছিল। এমনকি তৎকালীন সরকারও মু'তাযিলার মিথ্যাজালে ফেঁসেছিল। তৎকালীন আলিমগণ প্রাণ হাতে নিয়ে এই ফিৎনার মুকাবিলা করেছেন। বিশেষতঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. এ বিষয়ে খুব চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালান এবং বহু মেহনত করেন। অবশেষে এই ফিৎনার ইতি ঘটে।

মূলনীতি হল, যখন কোন বিদআতে লিপ্ততা বেশী হয়, তখন হক্কানী উলামায়ে কিরামকে এ বিষয়ে অধিক কঠোরতা অবলম্বন করতে হয়। বদআকীদার প্রতিটি শিরা-উপশিরায় কাঁচি চালাতে হয়। যাতে

কেউ কোন ভুল বুঝাবুঝির অবকাশবিশিষ্ট শব্দ দ্বারা ভ্রান্তিতে পতিত না হয়। একারণে ইমাম আহমদ র. বলেন, যে ব্যক্তি لفظي بالقران مخلوق বলবে, সেও জাহমিয়ার অন্তর্ভূক্ত। এরূপভাবে যারা এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন, তাদের ব্যাপারেও প্রতিবাদ করেছেন। কারণ, তাদের নীরবতার সুযোগে লোকজনের ভ্রান্ত স্বার্থ উদ্ধারের আশংকা ছিল। কোন কোন বিদআতী لفظي بالقران مخلوق বলত। ফলে সতর্কতা স্বরূপ ইমাম আহমদ র. لفظي بالقران বলতেও নিষেধ করেছেন। অথচ এ দুটোতে অনেক পার্থক্য রয়েছে। অবশ্য এ পার্থক্য সবার নিকট স্পষ্ট হয় না।

মোটকথা, মু'তাযিলার ফিৎনার তো ইতি ঘটেছে। কিন্তু ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র.-এর কোন কোন ভক্ত এ বিষয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করেছেন। বলতে শুরু করেছেন- কুরআন পাঠকালে মানুষের যে আওয়াজ হয় সেটিও অবিনশ্বর। -মুকাদ্দামায়ে লামি'।

হাফিজ আসকালানী র. মুকাদ্দামায়ে ফাতহুল বারীতে (৪৯০) লিখেন- হাকিম আবু আবদুল্লাহ র. স্বীয় তারীখে লিখেছেন- ইমাম বুখারী র. নিশাপুরে তাশরীফ এনেছেন ২৫০ হিজরীতে। তাঁর আগমনের পূর্বে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া যুহলী (আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে খালিদ আয যুহলী আন নিশাপুরী।) স্বীয় মজলিসে ঘোষণা করেন, যে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলকে স্বাগতম জানাতে চায়, সে যেন তাঁকে স্বাগতম জানাতে যায়। আমিও স্বাগতম জানাতে যাব। যেহেতু ইমাম যুহুলী র. নিশাপুরের সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন, আম-খাস নির্বিশেষে সবার বড় আশ্রয়স্থল ছিলেন, এ জন্য তাঁর উদ্বুদ্ধকরণের ফলে বিশাল সমাবেশ হয়। ইমাম বুখারী র. এরূপ শান শওকতে নিশাপুর আগমন করেন যে, তখন পর্যন্ত এরূপ শান-শওকতের ইস্তিকবাল নিশাপুরের ইতিহাসে না কোন আলিমের হয়েছে, না কোন শাসকের। দুই মনজিল তিন মনজিল দূর থেকে লোকজন স্বাগতম জানাতে উপস্থিত হয়। তিনি নাজ্জারীদের মহল্লায় অবতরণ করেছেন। ইমাম যুহলী র. লোকজনকে সতর্ক করেন যে, ইমাম বুখারী র.-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে হাদীস শুন। কিন্তু ইলমে কালামের কোন মাসআলা জিজ্ঞেস কর না। আল্লাহ না করুন, যদি আমাদের বিরুদ্ধে তাঁর মুখ থেকে কোন কথা বের হয়ে যায়, তবে রাফিজী, নাসিবী, মুরজিয়া ও জাহমিয়া সম্প্রদায়ের লোক খুশি হবে।

মোটকথা, ইমামের খেদমতে লোকজন প্রচুর উপস্থিত হতে শুরু করে। ঘর-বাড়ি এমনকি ঘরের ছাদও ভরে যায়। এমনকি নিশাপুরের অধিবাসী ইমাম মুসলিম র. যিনি স্বয়ং এক পর্যায়ের ইমাম ছিলেন। ইমাম বুখারী র.-এর দরসে অংশগ্রহণ করে তিনিও শিষ্যত্ব লাভ করেন। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিন এক ব্যক্তি উঠে জিজ্ঞেস করল, কুরআনের শব্দ সম্পর্কে আপনার কি মত? এটি কি সৃষ্ট, না অসৃষ্ট? ইমাম বুখারী র. বলেন- افعالنا مخلوقة والفاظنا من افعالنا

এর ফলে শোরহাঙ্গামা হয়। কেউ কেউ বলল, لفظي بالقرآن مخلوق বলেছেন। আর কেউ কেউ বলল, এটা বলেননি। এমনকি কলার চেপে ধরার উপক্রম হল। এমতাবস্থায় বাড়িওয়ালারা সবাইকে বের করে দেয়। আবু আহমদ ইবনে আদী বর্ণনা করেন, মাশায়েখের একটি দল আমার নিকট বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী র.-এর ব্যাপক গ্রহনযোগ্যতার ফলে তৎকালীন কোন কোন শায়েখের হিংসা হয়। তারা লোকজনকে বললেন, ইমাম বুখারী র. বলেন, لفظي بالقرآن مخلوق দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিনে একব্যক্তি উঠে প্রশ্ন করলে ইমাম বুখারী র. তা এড়িয়ে যান। কোন উত্তর দেননি। লোকটি তিনবার প্রশ্ন করলে ইমাম সাহেব কোন উত্তর দিলেন না। লোকটি বারবার তাগাদা করলে ইমাম বুখারী র. বললেন-

القران كلام الله غير مخلوق و افعال العباد مخلوقة و الامتحان بدعة۔

সে শোরহাঙ্গামা ও চেচামেচি করল যে, তিনি তো لفظي بالقران مخلوق বলেন। কিন্তু ইমাম বুখারী র. বারবার বললেন-من زعم انى قلت لفظي بالقران مخلوق فهو كذاب তথা যে বলে, আমি لفظي بالقرآن مخلوق বলেছি, সে মিথ্যুক। আমি তো বলেছি- القرآن كلام الله غير مخلوق و افعال العباد مخلوقة এটা সম্পূর্ণ সহীহ। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন- والله خلقكم وما تعملون রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ রয়েছে- ان الله يصنع كل صانع و صنعته । -মুকাদ্দমায়ে ফাতহুল বারী ঃ ৪৯০।

স্পষ্ট বিষয়, মানুষ সৃষ্ট ও নশ্বর। অতএব, তার সমস্ত ক্রিয়াকর্ম সৃষ্ট ও নশ্বর হবে। মানুষের আওয়াজ, তার লেখা, তার কালি-কাগজ সবই নশ্বর হবে।

মাসআলা সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও পরিষ্কার ছিল। কিন্তু কোন কোন লোক বদনাম করেছে। মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া যুহলী র. ঘোষনা দিয়েছেন-

القرآن كلام الله غير مخلوق ومن زعم لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع

ফলে কথাবার্তা, সালাম-কালাম সবই যেন বন্ধ করে দেয়া হয়। এর পরে যে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলের নিকট যাবে, তাকে অভিযুক্ত মনে করবে। কারণ, তার মজলিসে সেই যাবে, যে তার মাযহাব মানবে। এই ঘোষনার পর ইমাম মুসলিম ও আহমদ ইবনে সালামা র. ছাড়া সবাই ইমাম বুখারী র.-এর মজলিসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। অতঃপর ইমাম যুহলী র. বলেন- من قال باللفظ فلا يحضر مجلسنا তখন ইমাম মুসলিম র. স্বীয় চাদর তুলে তৎক্ষণাৎ দাড়িয়ে যান। তাঁর সাথে চলে আসেন আহমদ ইবনে সালামা র.। ইমাম মুসলিম র. ইমাম যুহলী র. থেকে যতগুলো হাদীস শুনেছেন, সেগুলো সব প্রত্যাবর্তনকালে ফেরত দিয়ে আসেন।

হাকিম র. আরো বর্ণনা করেন, যখন ইমাম মুসলিম ও আহমদ ইবনে সালামা র. যুহলীর মজলিস থেকে উঠে চলে আসেন, তখন যুহলী এও বলেছেন, এ ব্যক্তি (বুখারী র.) এ শহরে থাকতে পারেন না। এরপর আহমদ ইবনে সালামা ইমাম বুখারী র.-এর খেদমতে পৌছেন। তাঁকে বলেন, এ ব্যক্তি (মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া যুহলী) গোটা খুরাসানে বিশেষতঃ এই নিশাপুর শহরে গ্রহণযোগ্য। আমাদের কারো সাহস নেই, এ বিষয়ে যুহলীর সাথে কথা বলার। আপনি কি চিন্তা করেছেন? এতদ্শ্রবণে ইমাম বুখারী র. স্বীয় দাড়ি মুষ্টিতে ধরে বললেন-

وافوض امرى الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم انك تعلم انى لم ارد المقام بنيسابور اشرا ولا بطرا ولا طلبا للرياسة .

এবং আহমদ ইবনে সালামাকে বললেন, আহমদ! আমি আগামীকাল সকালেই এখান থেকে রওয়ানা করে চলে যাব। ফলে তিনি নিশাপুর থেকে বিদায় নেন।

উপকারিতা -১. কেউ কেউ মনে করেন, ইমাম আহমদ ও বুখারী র.-এর মাঝে মতানৈক্য আছে। অথচ উভয়ের মাঝে বাস্তবে কোন মতবিরোধ নেই। ইমাম আহমদ র. বলেন- القرآن كلام الله غير مخلوق 'কুরআন আল্লাহর কালাম, এটি সৃষ্ট নয়।' ইমাম বুখারী র.ও তাই বললেন। ইমাম বুখারী র

বলেন, কারী সাহেবের আওয়াজ নশ্বর। কারণ, তিলাওয়াতকারীও নশ্বর। অতএব, তার আওয়াজ নশ্বর হবে। ইমাম আহমদ র. অথবা তাঁর কোন ইমাম শিষ্য থেকে কিংবা সলফে সালিহীন থেকে এর পরিপন্থী কোন বিবরণ নেই। তাদের কেউ এ কথা বলেননি যে, তিলাওয়াতকারীর আওয়াজ অবিনশ্বর। বরং ইমাম আহমদ র. বিভিন্ন স্থানে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ক্বারীর কিরাআত কালে যে আওয়াজ শ্রুত হয়, সেটি কারীরই আওয়াজ। এর সমর্থন হয় زينوا القرآن باصواتكم দ্বারাও। অর্থাৎ, তোমরা কুরআনকে তোমাদের আওয়াজের মাধ্যমে সুসজ্জিত কর। ইমাম আহমদ র. এতটুকু বলেছেন- من قال لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهمى 'যে বলবে, কুরআন সংক্রান্ত আমার শব্দ সৃষ্ট, সে জাহমিয়া সম্প্রদায়ের লোক লোকজন মনে করেছে, শব্দ এবং স্বর উভয়টি একই। এ জন্য বলেছেন, ইমাম আহমদ র. স্বরকে অবিনশ্বর বলেন, আর ইমাম বুখারী র. বলেন, নশ্বর। কাজেই উভয়ের মাঝে মতবিরোধ হয়ে গেল। অথচ ইমাম আহমদ র. স্বরকে অবিনশ্বর বলেননি। এ জন্য ইমাম বুখারী র. স্বীয় গ্রন্থ خلق افعال العباد তে লিখেছেন, লোকজন ইমাম আহমদ র.-এর কথা অনুধাবন করতে পারেননি।

মোটকথা, কুরআন মজীদের শব্দ ও অর্থ উভয়টি আল্লাহর কালাম, অবিনশ্বর, অসৃষ্ট। অবশ্য আমাদের কর্মের আওয়াজ ইত্যাদি নশ্বর। অতএব, উভয়ের মাঝে কোন মতবিরোধ নেই। -ইমদাদুল বারী।

উপকারিতা- ২. এটা তো সবাই জানেন যে, কুরআন সৃষ্ট বা অসৃষ্ট সংক্রান্ত মাসআলায় ইমাম আহমদ ও বুখারী র. উভয়কে অনেক কঠিন বিপদের মুকাবিলা করতে হয়েছে। কিন্তু যাঁরা মনে করেন, উভয়ের ব্যাপারটি একই ছিল, তাঁদের এ ধারণা ঠিক নয়। ইমাম আহমদ র. মু'তাযিলার মুকাবিলা করেছেন ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন। ইমাম বুখারী র. হাম্বলী চরমপন্থীদের মুকাবিলায় কষ্ট সহ্য করেছেন এবং আযীমত (দৃঢ়তা) অবলম্বন করেছেন। এ জন্য ইমাম বুখারী র. যেখানে তাশরীফ নিতেন, সেখানে পরীক্ষার সম্মুখীন হতেন। অবশেষে সব জায়গা থেকে নিরাশ হয়ে নিজের দেশ বুখারায় তাশরীফ আনয়ন করেন।

ইমাম বুখারী র. -এর পরীক্ষা এবং মর্মান্তিক ওফাত

ইমাম বুখারী র. যখন নিশাপুর থেকে দেশের দিকে রওয়ানা করেন, বুখারাবাসী এ সংবাদ জানতে পেরে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে পড়েন। কয়েক মাইল পর্যন্ত শামিয়ানা ও তাবু তৈরি করা হয়। গোটা শহরবাসী স্বাগতম জানাতে বেরিয়ে আসেন। বিরাট শানশওকত সহকারে ইমাম সাহেবকে নিয়ে শহরে আসেন।

ইমাম বুখারী র. বুখারায় হাদীসের দরস দান আরম্ভ করেন। ইলমে হাদীসের পিপাসুগণ দলে দলে তাঁর পাঠচক্রে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু হিংসুকরা এখানেও ইমাম বুখারী র.-এর পিছ ছাড়েনি। তাদের পরামর্শে গভর্নর খালিদ ইবনে আহমদ যুহলী ইমাম বুখারী র.-এর নিকট আবেদন প্রেরণ করেন যে, আপনি শাহী দরবারে তাশরীফ এনে আমাকে এবং সাহেবযাদাদেরকে বুখারী শরীফ ও তারীখের দরস দিন, কিন্তু ইমাম সাহেব র. সে বার্তাবাহককে মৌখিক বলে দেন-

لا اذل العلم ولا احمله الى ابواب السلاطين

'আমি রাজাবাদশাদের দ্বারে দ্বারে ইলম নিয়ে এটাকে অপমান করব না। যার পড়ার প্রয়োজন হয়, সে যেন আমার কাছে এসে পাঠ শিখে নেয়। বুখারার গভর্নর দ্বিতীয়বার বলে পাঠালেন, যদি তাশরীফ

আনতে না পারেন, তবে শাহজাদাদের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় দিন। যখন তাদের সাথে অন্য কেউ অংশগ্রহন না করে। ইমাম সাহেব র. তাও পছন্দ করেননি। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ গোটা উম্মতের জন্য সমান। তাঁর শ্রবণ থেকে আমি কাউকে বঞ্চিত করতে পারি না। যদি আমার এই জবাব অপছন্দ হয়, তবে নির্দেশ দিয়ে আমার দরস বন্ধ করে দিন। যাতে আমি আল্লাহর দরবারে ওযর পেশ করতে পারি। এই উত্তর শুনে বুখারার শাসক ভীষণ অসন্তুষ্ট হন। হিংসুকরা তৎকালীন শাসকের ইংগিতে ইমাম সাহেবকে দীন ও আকাইদ সম্পর্কে অভিযুক্ত করে। বিদআতী হওয়ার ইলযাম চাপিয়ে দেয়। অতঃপর শাসক তাঁকে বুখারা থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেন। ইমাম বুখারী র. নেহায়েত মনক্ষুন্ন হয়ে স্বীয় বিরোধীদের জন্য বদদুআ করেন-

اللهم ارهم ما قصدونى فى انفسهم واولادهم واهاليهم

'আয় আল্লাহ! যেরূপভাবে এ আমীর আমাকে অপমান করেছে, এরূপভাবে তাকে তার সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে বেইজ্জতি ও অপমানের মুখ দেখান।' -মুকাদ্দমা ফাতহুল বারী ঃ ৪৯৩।

ফলে একমাস যেতে না যেতেই খলীফাতুল মুসলিমীন এই আমীরের প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে অপসারণ করেন। তার স্থলে অন্য শাসক প্রেরণ করেন। নির্দেশ দেন, অপসারিত আমীরের মুখ কলংকিত করে গাধার উপর আরোহন করিয়ে যেন গোটা শহরে তাকে অপমান করা হয়, অতঃপর তাকে জেলে আবদ্ধ করা হয়। সেখানে সে নেহায়েত অপমান ও অপদস্থতার সাথে মৃত্যুলাভ করে। তাছাড়া বুখারার শাসকের সহকারী হুরাইছ ইবনে ওরাকা প্রমূখ বিভিন্ন বালা-মসিবতে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়- من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب

মোটকথা, ইমাম সাহেব র. সেখান থেকে বেরিয়ে বায়কান্দ পৌঁছেন। কিন্তু ইমাম সাহেব র. সম্পর্কে সেখানেও মতবিরোধ হয়। সেজন্য সেখানেও অবস্থান সমীচীন মনে করেননি। ইতিমধ্যেই সমরকন্দবাসী তাঁকে দাওয়াত দেন। তিনি তা কবূল করেন এবং সমরকন্দ যেতে মনস্থ করেন। পথিমধ্যে ছিল খরতং নামক স্থান। সেখানে কিছু আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব ছিলেন। মুবারক মাসের (রমযানের) কারণে সেখানেই তিনি অবস্থান করেন। এমতাবস্থায় সমরকন্দ থেকে সংবাদ আসে, এখানকার পরিবেশও অনুকূল নয়। এখানেও লোকজনের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে গেছে। এ জন্য ইমাম সাহেব র. শেষ দশকের তাহাজ্জুদ নামাযের পর দুআ করেন-

اللهم ضاقت على الارض بما رحبت فاقبضنى اليك

'আয় আল্লাহ! ভূমণ্ডল সুপ্রশস্থ হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে। অতএব, তুমি আমাকে তোমার কাছে তুলে নাও।'

সমরকন্দবাসী তদন্ত করে জানতে পারলেন, অভিযোগ ভিত্তিহীন। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে পূনরায় দাওয়াত দেন। ইমাম সাহেব র. সওয়ারী কামনা করলেন, দু জনের সাহায্যে কয়েক কদম হেটেই বললেন, দুর্বলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতঃপর কিছু দুআ করে শুয়ে পড়লেন। শরীর থেকে ঘাম বেরুতে আরম্ভ করে। অতঃপর সৃষ্টিকর্তার নিকট নিজের প্রাণ অর্পন করেন।

এরূপভাবে ১৩ দিন কম ৬২ বছরের জীবন সমাপ্ত করে ঈদুল ফিতরের রাত্রে (শাওয়ালের ১ তারিখ রাত্রে) ইলম ও ফযলের মহাসূর্য্য অস্তমিত হয়। যার জ্ঞান ও গুনের আলোতে বুখারা, সমরকন্দ, বাগদাদ ও নিশাপুরের অসীম আম-খাস আদম সন্তান নিজের দিল-দেমাগ আলোকিত করছিলেন। ঈদুল ফিতরের

দিন শনিবার জোহর নামাযের পর খরতং নামক স্থানে এই নূরানী দেহ, কারামতকেন্দ্রকে জমিনে অর্পন করা হয়। দাফনের পর তাঁর কবর মুবারক থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত মিশকের সুঘ্রাণ আসতে থাকে। লোকজন দূরদূরান্ত থেকে এসে মাটি তুলে নিয়ে যেত। যারফলে সেখানে গর্ত হয়ে যায়। এ জন্য কবরের হেফাজতের উদ্দেশ্যে প্রাচীর দেয়া হয়। কিন্তু তার পরেও এ ধারা অব্যাহত থাকে। লোকজন দেয়ালের বাইরে থেকে মাটি নিয়ে যেতে আরম্ভ করল। অবশেষে সংশ্লিষ্ট এক বুযুর্গের দুআয় এ সুঘ্রাণ বন্ধ হয়ে যায়। এ সুঘ্রাণ কি ছিল? কিরূপ ছিল? স্পষ্ট বিষয়, এ সুঘ্রাণ ছিল সায়্যিদুল কাওনাইন হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসসমূহের বরকত। যেন পবিত্র কবরের মাটি জবানে হালে বলছিল।-

گلے خوشبوئے درحمام روزے ÷ رسید از دست محبوبے بدستم
بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری ÷ کہ از بوئے دلاویز تو مستم
بگفتا من گلے ناچیز بودم ÷ ولیکن مدتے باگل نشستم
جمال ہمنشیں درمن اثر کرد ÷ وگرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم

দরবারে রিসালতে মকবূলিয়ত

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত ঈমানের প্রাণ। ইমাম বুখারী র.-এর অন্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে মহব্বত ছিল, তা এ থেকে স্পষ্ট যে, তিনি গোটা জীবন সুন্নতের অনুসরণ এবং হাদীসে নববীর অনুসন্ধান ও তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ ও প্রচার-প্রসারে ব্যয় করেছেন।

ওয়াররাকের বিবরণ

একবার আমি স্বপ্নে দেখেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও তাশরীফ নিচ্ছিলেন, তাঁর পিছনে পিছনে ইমাম বুখারী র. যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে যেখানে কদম রাখছিলেন, ইমাম বুখারী র.ও সেখানে কদম রাখছিলেন।

ইমাম বুখারী র.-এর প্রসিদ্ধ ছাত্র (কপি লেখক)-এর বিবরণ-

আমি স্বপ্নে দেখলাম, কোথাও যাচ্ছি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমি আরয করলাম, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলের নিকট। অতঃপর ইরশাদ করলেন- তাঁকে আমার সালাম বলবে।

আবদুল ওয়াহিদ ইবনে আদম তাওয়াদীসীর বিবরণ

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নযোগে দেখলাম, কয়েকজন সাহাবী সহ কারো অপেক্ষা করছেন। আমি সালামের পর আরয করলাম, হযরত! কার জন্য অপেক্ষমান? তিনি বললেন- মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈলের অপেক্ষায়। তাওয়াদীসী লিখেন, কয়েক দিন পর যখন ইমাম বুখারী র.-এর ওফাতের সংবাদ এল, তখন আমি চিন্তা করলাম। বুঝতে পারলাম, ইমাম সাহেব র.-এর ওফাত সে রাত্রেই হয়েছে, যে রাত্রে আমি স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করেছি। কোন কোন লেখক তাঁর জন্ম ও মৃত্যু এবং জীবনীকাল দুটি কাব্যে বর্ণনা করেছেন-

كان البخارى حافظا ومحدثا ÷ جمع الصحيح مكمل التحرير-

ميلاده صدق ومدة عمره ÷ فيها حميد وانقضى فى نور-

صدق ہے تاریخ ولادت نور ہے تاریخ وفات ÷ عمر مبارک حمید ہے ملکوتی صفات

فارسی: ولادت صدق وعمراو حمید است ÷ بگیر از نور شال جاں سپاری

در نثر: صدق حميد نور

অর্থাৎ, হামিদ সত্য বলেছেন যে, তিনি ছিলেন নূর বা জ্যোতি।

একটি প্রশ্নোত্তর

হাদীস শরীফে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এত বড় মুহাদ্দিস হযরত ইমাম বুখারী র. কিভাবে- فاقبضنى اليك (আয় আল্লাহ! আমাকে তোমার কাছে তুলে নাও।) -এ দোআ করেছেন?

এর উত্তর হল, পার্থিব বিপদাপদের কারণে মৃত্যু কামনা নিষেধ ও নাজায়েয। কিন্তু পরকালীন মুসিবতের কারণে অথবা দীনি ফিৎনা থেকে বাঁচার জন্য মৃত্যু কামনা করা জায়েয আছে। যেমন- শাহাদতের তামান্না।

জামি' সহীহ বুখারী সংক্রান্ত ইতিবৃত্ত

ইমাম বুখারী র.-এর এ গ্রন্থটি যদিও বুখারী শরীফ নামে প্রসিদ্ধ এবং এর কারণ হল, গ্রন্থকার বুখারার অধিবাসী, তা সত্ত্বেও স্বয়ং গ্রন্থকার এর নাম রেখেছিলেন-

الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه

-উমদাতুল কারী

নামকরনের কারণ

বুখারী শরীফ জামি' হওয়ার কারণ এতে হাদীসের ৮টি প্রকার বিদ্যমান আছে।

سير وآداب وتفسير وعقائد ÷ فتن واشراط احكام ومناقب

১. সিয়ার শব্দটি সীরাতুনের বহুবচন। অর্থাৎ, যে সব হাদীস রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবনের ঘটনাবলী বিশেষতঃ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্বলিত।

২. আদাব শব্দটি আদাবুনের বহুবচন। উদ্দেশ্য সামাজিক শিষ্টাচারসমূহ। যেমন- খানাপিনার আদব ইত্যাদি।

৩. তাফসীর অর্থাৎ, কুরআনের তাফসীর সংক্রান্ত হাদীসসমূহ।

৪. যে সব হাদীসের সম্পর্ক ঈমান-আকাইদের সাথে।

৫ ফিতান শব্দটি ফিৎনার বহুবচন। অর্থাৎ, সে সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যেগুলো সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

৬. আশরাত অর্থাৎ, কিয়ামতের আলামতসমূহ।

৭. আহকাম তথা শরঈ মাসায়েল।

৮. মানাকিব। মানকাবাতুনের বহুবচন। অর্থাৎ, নারী-পুরুষ সাহাবী, বিভিন্ন গোত্র ও শ্রেণীর ফাযায়েল।

মুসনাদ ঃ বলার কারণ হল, এর হাদীসগুলো মুত্তাসিল সনদে মরফু' আকারে বর্ণিত। যে সব আছর ইত্যাদি বর্ণিত আছে, সেগুলো অধীনস্থ এবং শিরোনামে আছে।

সহীহ ঃ এর কারণ হল, ইমাম বুখারী র. এতে বিশুদ্ধতাকে বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। তাঁর তত্ত্বানুসন্ধান অনুযায়ী এতে কোন রেওয়ায়াত দুর্বল নেই।

আলমুখতাসার ঃ এদিকে ইঙ্গিত যে, এ কিতাবটি সংক্ষিপ্ত। এতে সমস্ত সহীহ হাদীস সংকলন করা হয়নি। স্বয়ং গ্রন্থকার ইমাম বুখারী র. থেকে বর্ণিত হয়েছে, আমি ৬ লাখ হাদীস থেকে এ কিতাবটি চয়ন করেনি। আরো বর্ণিত আছে-

ما كتبت فى كتاب الجامع الا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول

'এতে বর্ণিত সবগুলো হাদীস সহীহ এবং অনেক সহীহ হাদীস পরিহার করেছি গ্রন্থকে দীর্ঘায়িত করা বাচার জন্য।

من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ ও বাণীসমূহের দিকে ইঙ্গিত।

وسننه দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্ম ও মৌন সম্মতির দিকে ইঙ্গিত।

وايامه এ দ্বারা যুদ্ধসমূহের দিকে এবং সে সব ঘটনার দিকে ইঙ্গিত, যেগুলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় যুগে ঘটেছিল।

ইমাম বুখারী র. এরূপ বহু রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন, যেগুলো না বাচনিক, না কর্মবাচক, না মৌন সম্মতিমূলক। সেখানে ব্যাখ্যাতাগণ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু যদি এ গ্রন্থটির পূর্ণ নাম অন্তরে হাজির থাকে, তবে কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হবে না।

মোটকথা, এ সংকলনটির নাম সুদীর্ঘ। এটি বিষয়গত দিক থেকে ব্যাপক। কিন্তু সংক্ষেপে মানুষের মুখে বুখারী শরীফ অথবা সহীহ বুখারী।

সংকলনের কারণ

সহীহ বুখারী সংকলনের তিনটি কারণ মুহাদ্দিসীনে কিরাম থেকে বর্ণিত আছে। কিন্তু এ সব কারণে কোন পারস্পরিক বিরোধ নেই। সামগ্রিক এ তিনটি কারণে ইমাম বুখারী র. বুখারী সংকলনের জন্য দৃঢ়প্রত্যয় করেন এবং বিশুদ্ধতম গ্রন্থটি সংকলন করেন।

১. ইমাম বুখারী র.-এর জীবনী থেকে জানা গেছে যে, শুধু দশ বছর বয়স থেকে তাঁর হাদীসে নববী মুখস্থ করার অসীম আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এর জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহস্রাধিক মাশায়েখে হাদীস ও বড় বড় ইমাম থেকে হাদীস গ্রহন করেন। ২৩ বছর বয়সে ইমাম সাহেব র.-এর নিকট ৬ লাখ হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার জমা হয়ে যায়। ৩ লাখ মুখস্থ, আর ৩ লাখ পাণ্ডুলিপিতে। তখন অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি হল, বিশুদ্ধ হাদীসগুলোকে একটি গ্রন্থাকারে বিন্যস্ত করা হবে। যাতে সর্বপ্রকার সহীহ হাদীস বিদ্যমান থাকবে।

২. এই আগ্রহ শুধু একটি খেয়াল ও পরিকল্পনা আকারে ছিল। ইতোমধ্যেই উস্তাদে মুহতারাম তৎকালীন শায়েখ ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ র. ক্লাস চলাকালে বললেন-

لو جمعتم كتابا مختصرا فى الصحيح لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم

তথা যদি তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুনান দিয়ে একটি বিশুদ্ধ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সংকলন করতে! উস্তাদের ফরমান অনুযায়ী এই খেয়ালে শক্তি সৃষ্টি হল। এই বিষয়টি মুলত সহীহ বুখারী সংকলনের জন্য আসল কারণ হয়ে দাড়ায়। ইমাম বুখারী র. সুদৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেন, এরূপ একটি সহীহ গ্রন্থ রচনা করব।

৩. ইমাম বুখারী র. থেকে বর্ণিত আছে- رايت النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام الخ অর্থাৎ, আমি স্বপ্নযোগে দেখলাম, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে দাড়িয়ে আছি। আমার হাতে একটি পাখা। এর মাধ্যমে পবিত্র দেহ থেকে মাছিগুলো তাড়াচ্ছি।

কোন স্বপ্ন ব্যাখ্যাবিশেষজ্ঞ মনীষী থেকে এর তা'বীর জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসগুলো থেকে মিথ্যা প্রতিহত করবেন। অর্থাৎ, হাদীস ভান্ডার থেকে জাল ও দুর্বল হাদীসগুলো ছেটে বের করে দিবেন। এ ব্যাখ্যার পর ইমাম বুখারী র. সহীহ বুখারী সংকলন করেন।

বুখারীর রেওয়ায়াত সংখ্যা

সহীহ বুখারীর সর্বমোট হাদীস কতগুলো?

শায়েখ ত্বকীউদ্দীন ইবনে সালাহ র.-এর তত্ত্বানুসন্ধান অনুযায়ী সহীহ বুখারীতে পুনরাবৃত্তি সহকারে সর্বমোট হাদীস সংখ্যা ৭২৭৫।

عدد احاديث صحيح البخارى سبعة الاف ومائتان وخمسة وسبعون بالاحاديث المكررة

مقدمة فتح الباري ص ٤٦٥.

আল্লামা নববী র. থেকে অনুরূপ সংখ্যাই বর্ণিত আছে। কিন্তু আল্লামা নববী র. ব্যাখ্যায় مسندة শব্দ যোগ করেছেন।

ولفظه جملة ما فى صحيح البخارى من الاحاديث المسندة فذكر العدة سواء

اى سبعة الاف ومائتان وخمسة وسبعون بالمكررة. مقدمة فتح الباري ص ٤٦٥.

হাফিজ আসকালানী র. বলেন, এই সংখ্যা বিশুদ্ধ নয়। অতঃপর হাফিজ র. প্রতিটি অনুচ্ছেদের হাদীসগুলো বিশুদ্ধ রূপে বর্ণনা করে লিখেছেন, সর্বমোট মুসনাদ হাদীসের সংখ্যা ৭৩৯৭। অর্থাৎ, তত্ত্বানুসন্ধানের পর ৭২৭৫ এর উপর ১২২টি হাদীস যোগ করেছেন।

অতএব, মোট সংখ্যা হয়েছে ৭৩৯৭। এরই মুকাদ্দামার শেষে ৪৬৯ পৃষ্ঠায় লিখেন-

فجملة ما فى الكتاب من التعاليق الف وثلثمائة واحد واربعون حديثا

অর্থাৎ, মোট তা'লীক সংখ্যা ১৩৪১। আর মোট মুতাবি' এবং রেওয়ায়াতের ইখতিলাফের ব্যাপারে সতর্কবানী ৩৪৪টি। এর দুই লাইন পরে লিখেন-

وجملة ما فيه من المتابعات و التنبيه على اختلاف الروايات ثلثمائة واحدواربعون حديثا

. مقدمة فتح الباري ص ٤٦٩.

সম্ভবতঃ اربعون واربعون -এর পরিবর্তে কলমের ভুলে احد واربعون হয়ে গেছে। এ ভুলের প্রমাণ সর্বমোট সংখ্যায় তিনি বলেন- تسعة الاف واثنان وثمانون حديث সর্বমোট এই সংখ্যা তখনই ঠিক হবে, যখন মুতাবি'র সংখ্যা হবে ৩৪৪টি।

মোটকথা,	মুসনাদ হাদীস হল	৭৩৯৭। -কাসতাল্লানী ঃ ১/৫০।
	তা'লীক সংখ্যা হল	১৩৪১।
	মুতাবি' সংখ্যা হল	৩৪৪। -কাসতাল্লানী।
		বুখারীর সর্বমোট হাদীস সংখ্যা ৯০৮২।

এতে পরিস্কার বুঝা মুতাবি'এর সংখ্যা লিখনীর ভুলের কারণে ৩৪৪এর পরিবর্তে ৩৪১ হয়ে গেছে। কিন্তু মোট হিসাব ৯০৮২ বিশুদ্ধ হয়েছে। যেমন মুকাদ্দামায়ে কাসতাল্লানীতে স্পষ্ট ভাষায় রয়েছে-

وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ثلثمائة واربعة واربعون حديثا فجملة ما فى الكتاب على هذا بالمكرر تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثا خارجا عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات على التابعين فمن بعدهم .

এটি মূলতঃ ফাতহুল বারীর মুকাদ্দমার সারসংক্ষেপ। -মুকাদ্দামা কাসতাল্লানী ঃ ১/ ৫০।

পুনরাবৃত্তি বাদ দিয়ে ২৫১৩।

وجميع ما فيه موصولا ومعلقا بغير تكرار الفا حديث و خمسمائة حديث وثلثة عشر حديثا. مقدمة لامع ص ٣٧ .)

সহীহ বুখারী সংকলন

সংকলন কবে শুরু হয়েছে এবং কবে শেষ হয়েছে? এ সম্পর্কে ব্যাখ্যাতা ও ঐতিহাসিকগণ নীরব। তবে এতটুকু ঐতিহাসিকগণও লিখেন এবং স্বয়ং গ্রন্থকারের বাণীও রয়েছে যে, এ গ্রন্থটি ১৬ বছরে পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। ইমাম বুখারী র. এও বর্ণনা করেছেন যে, এ গ্রন্থটিকে আমি স্বীয় উস্তাদ ইমাম আহমদ, আলী ইবনে মাদীনী ও ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন র.-এর খেদমতে পেশ করেছি।

وقال ابو جعفر العقيلى لما صنف البخارى كتاب الصحيح عرضه على ابن المدينى واحمد بن حنبل ويحيىٰ بن معين وغيرهم فاستحسنوه وشهدواله بالصحة الا اربعة احاديث ـ قال العقيلى القول فيه قول البخارى وهى صحيحة ايضا وقال فى موضع أخر روى الفربرى عن البخارى قال ما ادخلت فى الصحيح حديثا الا بعد ان استخرت الله وتيقنت صحته . مقدمة لامع : ص ٢٤، قسطلاني.

ইতিহাস দ্বারা জানা যায়, তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন র. -এর ওফাত হয় ২৩৩হিজরীতে। আলী ইবনে মাদীনী র.-এর ইন্তিকাল হয় ২৩৪ হিজরীতে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র.-এর ওফাত হয় ২৪১ হিজরীতে। এতে অনুমিত হয়, ইমাম বুখারী র. স্বীয় গ্রন্থ সহীহ বুখারী সংকলন থেকে ২৩৩ হিজরীর পূর্বেই অবসর হন। অর্থাৎ, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন র.-এর ওফাতের পূর্বে।

এটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে, এর পর অবসর হননি। অবশ্য হতে পারে, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন র.-এর ওফাতের কয়েক বছর পূর্বে সংকলন সমাপ্ত করেন। আবার হতে পারে, সংকলন সমাপ্তির পর আরো কিছু সংযুক্তও করেছেন। যখন ২৩৩ হিজরীতে অবসর গ্রহন মেনে নেয়া হয়, তখন অবশ্যই মানতে হবে যে, এর সূচনা হয়েছে ২১৭ হিজরীতে। যখন ইমাম সাহেবের বয়স হয়েছিল ২৩ বছর। যাতে ১৬ বছরের হিসাব সঠিক হয়ে যায়। কিন্তু এটা সুনিশ্চিত জানা নেই যে, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈনের খেদমতে তার ওফাতের বছর কিতাব পেশ করা হয়েছে। এ জন্য সূচনাকাল নির্ণয় করা কঠিন। অবশ্য এতটুকু বলা যেতে পারে যে, যেহেতু ২৩৩ হিজরীতে বা তার পূর্বে এটি সমাপ্ত হয়েছে, সে হিসেবে ২১৭ হিজরী বা তার পূর্বে এর সূচনা হয়েছে। -ইমদাদ।

বুখারীর ছুলাছিয়াত

এর জন্য অধমের রচিত নাসরুলবারী কিতাবুল মাগাযীর ২৭৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সহীহ বুখারীর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব

আবু যায়েদ মারওয়াযী র.-এর বিবরণ-

كنت نائما بين الركن والمقام فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام فقال لى يا ابا زيد الى متى تدرس كتاب الشافعى وما تدرس كتابى؟ فقلت يا رسول الله! وما كتابك؟ قال جامع محمدبن اسمعيل-

অর্থাৎ, আমি রুকনে ইয়ামানী ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝে শায়িত ছিলাম। স্বপ্নযোগে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাক্ষাত ঘটল। তিনি আমাকে বললেন, আবূ যায়েদ! তুমি কতকাল পর্যন্ত শাফিঈর কিতাব দরস দিতে থাকবে? আমার কিতাবের দরস দিবে না? আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কিতাব কোনটি? তিনি ইরশাদ করলেন, জামি' মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (সহীহ বুখারী)অ যেন এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বুখারী শরীফ নেহায়েত সহীহ জামি'। যেটিকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের গ্রন্থ বলেছেন।

বুখারী শরীফ খতমের বরকত

বড় বড় আলিমগণ বার বার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন এবং লিখেছেন, কোন বড় মুসিবতের সম্মুখীন হলে তার সমাধানের জন্য বুখারী শরীফ খতম করলে আল্লাহ তা'আলা সে মুশকিল আসান করে দেন। মহামারী হোক কিংবা দুর্ভিক্ষ এগুলোতে খতমে বুখারী পরীক্ষিত। আরেকটি পরীক্ষিত বিষয় হল, যে নৌযানে বুখারী শরীফ থাকবে, সেটি ডুবা থেকে হেফাজতে থাকবে। এরূপভাবে রোগ নিরাময়ের জন্য বুখারী শরীফের পাঠ খুবই উপকারী। গুরুত্বপূর্ণ মুকাদ্দামাগুলোতেও সহীহ বুখারী পরীক্ষিত। মোটকথা, দোআ কবূল, জটিলতার সমাধান ও প্রয়োজন পূর্ণ করার ক্ষেত্রে খতমে বুখারী উপকারী ও পরীক্ষিত। ইলমী ও দীনি কেন্দ্রগুলোতে যেমন মাজাহিরে উলূম সাহারানপুর ও দারুল উলূম দেওবন্দ ইত্যাদিতে আকাবির ও পূর্ববর্তীগণের সময় থেকেই এই মা'মূল রয়েছে।

বুখারীর শিরোনামগুলোর গুরুত্ব

মুহাদ্দিসীনে কিরাম সাধারণত স্বস্ব গ্রন্থাবলীতে আপন রুচি অনুযায়ী শিরোনাম কায়েম করেন। ইমাম মুসলিম র. তো কোন শিরোনামই লিখেননি। তিরমিযী ও আবূ দাউদের শিরোনামগুলো খুবই সহজ। এগুলোতে চিন্তা-ফিকির করার প্রয়োজন হয় না। ইল্লা মাশাআল্লাহ।

কিন্তু আবূ দাউদের শিরোনাম তিরমিযীর চেয়ে উঁচুমানের। আবূ দাউদ ও তিরমিযী অপেক্ষা নাসাঈ শরীফের শিরোনাম আরো উঁচু পর্যায়ের এবং কিছুটা জটিল। কোন কোন স্থানে ইমাম বুখারী র.-এর শিষ্যত্বের হক তিনি আদায় করেছেন। এ জন্য তাতে চিন্তা-ফিকিরের প্রয়োজন হয়। কোন কোন স্থানে উভয়ের শিরোনাম একই। হয়ত একটির পর একটি হয়েছে। কিন্তু হতে পারে শায়েখের অনুসরণই প্রধান মনে হয়েছে। শায়েখের শিরোনাম বেশী মনপূত হয়েছে। মোটকথা, ইমাম বুখারী র.-এর শিরোনাম সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা-ফিকির ও অনুধাবনের দিকে লক্ষ্য করলে প্রসিদ্ধ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

এটা তো হাদীস সংকলনের উপরোক্ত বক্তব্যের শেষে জানা গেল যে, ইমাম বুখারী র.-এর মূল উদ্দেশ্য ও প্রথম আগ্রহ হল, খালিস সহীহ মারফূ' হাদীসের সংকলন তৈরি করা ও মাসায়েল উৎসারণ করা। কিন্তু এ গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ন বৈশিষ্ট্য হল, এর শিরোনামগুলো। যদ্বারা ইমাম বুখারী র.-এর অনন্য শান ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। অন্যথায় যার নিকট মোট ৬লাখ হাদীসের ভাণ্ডার বিদ্যমান, তার জন্য দশ হাজার হাদীস নির্বাচনে ১৬ বছরের প্রয়োজন কেন হল? বাস্তবতা হল, তাঁর শিরোনামগুলো সবচেয়ে উঁচু পর্যায়ের ও অনন্য।

ইমাম বুখারী র.-এর অধিকাংশ শিরোনামের সাথে আয়াতে কারীমাও পেশ করেন। যদ্বারা এর দিকে ইংগিত উদ্দেশ্য হয়-

جميع العلم فى القرآن لكن ÷ تقاصر عنه افهام الرجال .

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

قال الله تعالى : وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

এতে যিকির দ্বারা কুরআন, তাবঈন দ্বারা হাদীস, আর তাফাক্কুর দ্বারা মাসায়েল উৎসারণ উদ্দেশ্য।

ইমাম শাফিঈ র. কিতাবুল উম্মে বলেন, ভবিষ্যতে আসন্ন এরূপ কোন ঘটনা নেই, যার হুকুম কুরআনে কারীম বর্ণনা করেনি।

হযরত ইমাম আজম র.-এর নিকট কেউ জিজ্ঞেস করল, আপনি নিজের রায় থেকে মাসআলা বর্ণনা করেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি যে কোন মাসআলা বর্ণনা করি, তার মূল উৎস হয় কুরআনে কারীম।

ইমাম বুখারী র. এরূপ শিরোনাম লিখেছেন, না তাঁর পূর্বে কেউ এরূপ শিরোনাম লিখেছেন, না তাঁর পর কেউ তাঁর পূর্ণ নকলের চেষ্টা করেছেন। যেন এই দরজার বিজেতা এবং সর্বশেষ ব্যক্তি তিনি। প্রসিদ্ধ আছে- فقه البخارى فى تراجمه এর এক অর্থ তো হল, ইমাম বুখারী র. ফিকহের কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখেননি। যদি তাঁর ফিকহী মাসায়েল জানতে হয়, তবে বুখারীর শিরোনামগুলো থেকে জানা যেতে পারে। কিন্তু এই বাক্যটির প্রকৃত অর্থ হল, ইমাম বুখারী র. অনেক বড় মেধাবী ও ইসলামী আইনবিদ ছিলেন। তাঁর ফিকহী জ্ঞান ও মেধার আন্দাজ করতে হলে শিরোনামগুলোর দিকে লক্ষ্য করুন। এ কারণেই আল্লামা ইবনে খালদুন র. বলেছেন, সহীহ বুখারীর শিরোনামগুলোর সাথে হাদীসসমূহের মিল উম্মতে মুসলিমার উপর ইমাম বুখারী র.-এর ঋণ। বাস্তব কথা হল, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী র. ও হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী র. স্বীয় মেধা ও দূরদর্শিতার আলোকে একটি সীমা পর্যন্ত এই ঋণ পরিশোধের পূর্ণ চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু তা স্বত্ত্বেও কোন কোন স্থানে

অস্ত্র সমর্পণ করেছেন। এর ফলে ইমাম বুখারী র.-এর সুক্ষ্মদৃষ্টি অনুমিত হয়। এ কারণে ইমাম নববী র. শরহে মুসলিমের মুকাদ্দমায় লিখেন-

وكثير منها يذكره فى غير بابه الذى يسبق اليه الفهم الخ. مقدمة النووي. ص ١٣.

মূলতঃ সাধারণত মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট শিরোনাম হয় দাবীর পর্যায়ভুক্ত। আর পেশকৃত হাদীসগুলো হয় প্রমাণের পর্যায়ভুক্ত। এ হিসেবে ফয়সালা করা হয় যে, শিরোনাম ও হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য কি? কিন্তু ইমাম বুখারী র. মুহাদ্দিসীনে কিরামের মূলনীতির পাবন্দ নন। তাঁর উদাহরণ তো এরূপ-

ہم پیروی قیس نہ فرہاد کریں گے ÷ ہم اک طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں گے

ইমাম বুখারী র. শিরোনামে অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞান জমা করেছেন। কোথাও হাদীসের ব্যাখ্যা উদ্দেশ্য হয়, কোথাও ইজমালের তাফসীল, কোথাও কোন প্রশ্নের নিরসন উহ্য থাকে, কোথাও কারো মত খন্ডন করেন, কোথাও আয়াত ও রেওয়ায়াতের মাঝে বাহ্যিক বিরোধ মনে হলে শিরোনাম দ্বারা তার নিরসন করতে চান। যে মাসআলা নিশ্চিত ও নির্ধারিত হয়, তা শিরোনামে প্রকাশ করেন। যদি কোন মাসআলায় ইমাম বুখারী র.-এর দোদুল্যমানতা থাকে অথবা উভয় পক্ষের অবকাশ থাকে, অথবা প্রমাণাদি পরস্পর বিরোধী হয়, তবে নিশ্চিত হুকুম আরোপ করেন না এবং বিভিন্ন রেওয়ায়াত উল্লেখ করে প্রত্যেকের প্রমাণের দিকে ইঙ্গিত করেন। অতঃপর কখনো শিরোনামের প্রতিটি রেওয়ায়াত তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, কখনো সমস্ত রেওয়ায়াতের সমষ্টি দ্বারা শিরোনাম প্রমাণ করা উদ্দেশ্য হয়।

বুখারীর শিরোনামগুলো সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীদের তাহকীক হল, প্রতিটি রেওয়ায়াত দ্বারা পূর্ণ শিরোনাম প্রমাণ করা জরুরী নয়। বরং প্রতিটি রেওয়ায়াত দ্বারা শিরোনামের কোন অংশ প্রমাণিত হওয়া যথেষ্ট। অবশ্য সমষ্টি থেকে সমষ্টি প্রমাণিত হওয়া চাই।

কখনো ইমাম সাহেব র. শিরোনামের সাথে মিলের কারণে হাদীস উল্লেখ করেন। অতঃপর অন্য একটি হাদীস এরূপ উল্লেখ করেন, যার সাথে শিরোনামের বাহ্যতঃ কোন সম্পর্ক ও মিল থাকে না। বরং এর সম্পর্ক হয়, পূর্বোক্ত হাদীসের সাথে। এর তাফসীল ও পূর্বোক্ত হাদীসের সনদ অথবা মতন সম্পর্কে কোন বিশেষ তাহকীকের দিকে ইশারা হয় ইত্যাদি।

ইমাম বুখারী র. কোন কোন স্থানে শিরোনামই উল্লেখ করেন না। হাদীস উল্লেখ করেন, যার বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করা হয়।

১. সংকলনকালে ইমাম বুখারী র.-এর মনে সংগত কোন শিরোনাম আসেনি। ভবিষ্যতের জন্য তা রেখে সামনে চলে গেছেন। কারণ, পরবর্তীতে উপরোক্ত হাদীস থেকে উৎসারণ করে শিরোনাম লিখে দেয়া হবে। কিন্তু সময় আর হয়নি।

কিন্তু এই উত্তর বিশুদ্ধ নয়। কারণ, এক স্থানে ইমাম বুখারী র. লিখেছেন, আমি এ কিতাবটি ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন র.-এর খেদমতে পেশ করেছি। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন র.-এর ওফাত হয়েছে ২৩৩ হিজরীতে। ইমাম বুখারী র.-এর ওফাত হয়েছে ২৫৬ হিজরীতে। এই হিসেবে কিতাব সংকলনের পর কমপক্ষে ২৩ বছর তিনি এই দুনিয়াতে থাকেন। তাছাড়া এটাও প্রমাণিত যে, নব্বই হাজার শিষ্য ইমাম র. থেকে এ গ্রন্থটি শুনেছেন। অতএব, সুযোগ না পাওয়ার ওযর কিভাবে যথার্থ হতে পারে?

২. কেউ কেউ বলেন, এটা লিপিকারদের ভুল। ইমাম বুখারী র. শিরোনাম লিখেছিলেন, কিন্তু কপিকারকদের ভুলে ছুটে গেছে। এই উত্তরটির দুর্বলতাও স্পষ্ট। কারণ, ইমাম সাহেব র. সংকলনের পর একাধারে ২৩ বছর দেখেছেন। হাজার হাজার লোককে শুনিয়েছেন। অতঃপর কপি লেখকদের ভুলের কি প্রমাণ? সে মূলকপি কোথায় যাতে ইমাম সাহেব র.-এর শিরোনাম বিদ্যমান রয়েছে? আর যদি কোন কপি এরূপ না হয়, তবে লিপিকারদের ভুল বলা প্রমাণহীন দাবী এবং বুঝের ত্রুটি।

৩. হাফিজ আসকালানী র. বলেন, এরূপ অনুচ্ছেদ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের পরিশিষ্ট। كالفصل من الباب السابق

পরবর্তী বিষয়টি না সম্পূর্ণ পূর্বের অনুচ্ছেদের সাথে একীভূত, না তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বরং এক হিসেবে পূর্বোক্তি অনুচ্ছেদের সাথে সম্পৃক্ত। এ জন্য শিরোনামের প্রয়োজন নেই। আবার এক হিসেবে তা থেকে ভিন্ন। এ জন্য বাব শব্দ লিখে দেয়া হয়েছে।

এ ব্যাখ্যাটি ভাল। অধিকাংশ ব্যাখ্যাতা এটি পছন্দ করেছেন। পূর্ণ তাফসীল ইনশাআল্লাহ সেখানে জানা যাবে, যেখানে শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ রয়েছে।

৪. ইমাম বুখারী র. শিরোনাম বাদ দিয়ে হাদীসের ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ এবং তাদের মেধার প্রশিক্ষণ দিতে চান। তারা যেন নিজ থেকে নিম্নোক্ত হাদীস থেকে কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ মাসআলা উৎসারণ করে শিরোনামে রেখে দেয়।

কোথাও এর উল্টো শিরোনাম লিখে দেন। কিন্তু এর অধীনে কোন রেওয়ায়াত পেশ করেননি। এরও সে কারণই বর্ণনা করা হয়।

অর্থাৎ, ইমাম বুখারী র. স্বীয় শর্ত অনুযায়ী সেখানে কোন হাদীস পাননি। অথবা রেওয়ায়াত তালাশ করে এখানে লেখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সময় পাননি। এখানে উত্তম উত্তর হল, হাদীসের ছাত্রদের মেধার প্রশিক্ষনের জন্য তিনি এরূপ করেন।

ইমাম বুখারী র.-এর শিরোনামের একটি বৈশিষ্ট্য হল, বিভিন্ন স্থানে কুরআনে হাকীমের আয়াতও পেশ করেন। সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈনের উক্তি দ্বারা স্বীয় দাবির সমর্থনে দলীল পেশ করেন। যদ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইমাম বুখারী র.-এর উদ্দেশ্য শুধু সহীহ হাদীস সংকলন করাই নয়। বরং সহীহ হাদীসগুলোর সাথে কুরআনে কারীমের খেদমতও উদ্দেশ্য। এর জন্য যদিও স্বতন্ত্র কিতাবুত তাফসীর রয়েছে, কিন্তু প্রতিটি বিষয়ের সাথে সংগত আয়াত সেস্থানেই মনে বেশী প্রভাব সৃষ্টি করে।

এরূপভাবে হাদীসসমূহ থেকে মাসায়েল উৎসারণ ও এর পদ্ধতি, তাছাড়া কুরআন-হাদীস ও ফিকহের যোগসূত্রও বলতে চান।

বুখারী শরীফের শিরোনামগুলোর প্রতি সর্বদাই গুরুত্বারোপ করা হয়। মুহাদ্দিসীনে কিরাম বুখারীর শিরোনামগুলোর উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। মুসনিদুল হিন্দ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী র. একটি পুস্তিকা 'শরহু তারাজিমে আবওয়াবে সহীহিল বুখারী' নামে রচনা করেছেন। এটি বুখারী শরীফের শুরুতে সংশ্লিষ্ট আছে।

২. হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান র. উর্দু ভাষায় 'আল আবওয়াবু ওয়াততারাজিম' নামে একটি পুস্তিকা লিখেছেন।

৩. এ সব মহামনীষীর পর আল্লামা শায়েখ মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া র. সাবেক শায়খুল হাদীস মাদরাসা মাজাহিরে উলূম সাহারানপুর বুখারীর শিরোনামগুলোর উপর নেহায়েত ব্যাপক ও

বিস্তারিত ছয় খন্ডে সমাপ্ত একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এর নাম হল, 'আল আবওয়াবু ওয়াততারাজিম লিসহীহিল বুখারী'।

ইমাম বুখারী র. থেকে শিরোনাম সংক্রান্ত কোন বিশেষ মূলনীতির ব্যাখ্যা বর্ণিত নেই। পরবর্তী বড় বড় উলামায়ে কিরাম স্বীয় তত্ত্বানুসন্ধান অনুযায়ী কিছু মূলনীতি গ্রহন করেছেন। যেগুলো হযরত শায়খুল হাদীস র. মুকাদ্দমায়ে লামি' তে একত্রিত করে দিয়েছেন। সেখানে সত্তরটি মূলনীতি রয়েছে। এগুলো দ্রষ্টব্য।

যদি আল্লামা ইবনে খালদুন র. থাকতেন, আর হযরত শায়খুল হাদীস র.-এর গ্রন্থ 'আল আবওয়াবু ওয়াততারাজিম' দেখতেন, তবে বোধহয় আপন মনে বলতেন শিরোনামের হক আদায় হয়ে গেছে। ইমাম বুখারী র.-এর ঋণ উম্মতে মুসলিমার উপর থেকে পরিশোধ করা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ নাসরুল বারীতে অধমও যথাস্থানে ব্যাখ্যা করবে।

সিহাহ সিত্তা

হাদীসের পাঁচটি গ্রন্থ- বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আবূ দাঊদ ও তিরমিযী তো সর্বসম্মতিক্রমে সিহাহের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম দিকে তো সিহাহে খামসা তথা পঞ্চ সিহাহের পরিভাষা প্রসিদ্ধ ছিল। ৬ষ্ঠ গ্রন্থটি সম্পর্কে মতবিরোধ ছিল। কেউ কেউ মুয়াত্তা ইমাম মালিককে এ পর্যায়ে রেখেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, মুয়াত্তা সহীহ হলেও তাতে হাদীস কম, আছর বেশী, তাই এটি সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত নয়। এর স্থলে কেউ কেউ ত্বাহাবীকে, আর কেউ কেউ সুনানে দারিমীকে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সর্বপ্রথম হাফিজ আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনে তাহির (ওফাত-৫০৭) র. স্বীয় গ্রন্থ 'আতরাফুল কুতুবিস সিত্তাহ' ও 'শুরুতুল আইম্মাতিস সিত্তা' তে ইবনে মাজাহকে সিহাহের তালিকাভুক্ত করেছেন।

অতঃপর হাফিজ আবদুল গনী মুকাদ্দাসী (ওফাত-৬০০ হিজরী) 'আসমাউর রিজাল' নামক গ্রন্থে সিহাহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তারপর লোকজন তাঁর অনুসরণ করেছেন।

অতঃপর অধিকাংশ আলিম ইবনে মাজাহকে এর সুন্দর ক্রমবিন্যাসের কারণে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বর্তমানে এই পরিভাষাই প্রসিদ্ধ। সিহাহ সিত্তা প্রসিদ্ধ। ইবনে মাজাহ এর ৬ষ্ঠ গ্রন্থ।

অতঃপর ইবনে মাজাহ এর স্তর অন্যান্য সিহাহের মত নয়। কারণ, এতে প্রায় ২০টি হাদীস রয়েছে মওযু' বা জাল। প্রায় এক হাজার দুর্বল। আবুল হাজ্জাজ আল মিযযী র. তো এ পর্যন্ত বলেছেন-

کل ما انفرد به ابن ماجة فهو ضعيف

কিন্তু প্রমাণবিহীন ব্যাপক আকারে এই হুকুম আরোপ করা ঠিক নয়। আবুল হাসান সিন্দী তার তা'লীকে, হাফিজ ইবনে হাজার র. তাহযীবে এ উক্তি করেছেন।

কেউ কেউ মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বলকে সিহাহ সিত্তায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু ইবনে মাজাহ র. মকবূলিয়তের উপর সাধারণ পর্দাও পড়েনি।

ایں سعادت بزور بازوی نیست ÷ تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

ইমামগণের শর্তাবলী

হাদীসের ইমামগণ স্বস্ব গ্রন্থে হাদীস অন্তর্ভুক্তির জন্য কি কি শর্তের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল প্রশ্ন। কারণ, স্বয়ং হাদীসের ইমামগণ ও লেখকগণ স্বস্ব গ্রন্থাবলীর কোন শর্ত উল্লেখ করেননি। অবশ্য পরবর্তী উলামায়ে কিরাম তাদের কিতাবগুলোতে তত্ত্বানুসন্ধানের পর

গভীর চিন্তা-ভাবনা করে তাদের শর্তগুলো তালাশ করে তাদের গ্রন্থ থেকে উৎসারণ করেছেন। এ সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থও লিপিবদ্ধ হয়েছে। তন্মধ্যে দুটি পুস্তিকা সুপ্রসিদ্ধ। ইমাম আবূ বকর হাযিমী র. -এর 'শুরুতিল আইম্মাতিল খামসা' এবং হাফিজ আবুল ফযল র.-এর 'শুরুতুল আইম্মাতিস সিত্তা'।

প্রতিটি রেওয়ায়াতে এই প্রসঙ্গে দুইটি জিনিস লক্ষনীয় হয়ে থাকে-১. বর্ণনাকারী নিজের মর্যাদা, তার ব্যক্তিগত গুণ অর্থাৎ, আদিল, নির্ভরযোগ্য ভালরূপে সংরক্ষণকারী হওয়া না হওয়া ইত্যাদি। ২. তার নিজের শায়েখের সাথে সম্পর্ক। উদাহরণ স্বরূপ শুধু সমসাময়িক? না কি সাক্ষাতও ঘটেছে? অতঃপর সাক্ষাতও কিরূপ এবং কতটুকু? ভাসাভাসা সাক্ষাত, না প্রশান্তিদায়ক? শায়েখের খেদমতে দীর্ঘ দিনের বেশী উপস্থিতি, না কম? শুধু মুকীম অবস্থায় সংসর্গ অবলম্বন করেছেন, না মুকীম ও সফর উভয় অবস্থাতে? কোন কোন মুহাদ্দিস এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করেন। কারণ, মানুষের আসল গুণ সফরে প্রকাশ পায়। হযরত উমর রা.-এর নিকট কেউ এক ব্যক্তির প্রশংসা করলে তিনি বললেন, তুমি কি কোন সফরে তার সাথে ছিলে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তাহলে প্রশংসা করছ কিভাবে?

হাযিমী র. বলেন, ইমামগণ থেকে শুধু সুস্পষ্ট ভাষায় শর্তগুলোর বিবরণ নেই। অবশ্য তাদের গ্রন্থাবলী দেখলে তাদের শর্তাবলীর আন্দায হয়।

বর্ণনাকারী পাঁচ প্রকার-

১. প্রচুর হাদীস সংরক্ষণকারী ২. উস্তাদের সাথে দীর্ঘ সংসর্গ অবলম্বনকারী। অর্থাৎ, এসব রাবী উঁচু পর্যায়ের স্মরণশক্তির অধিকারী এবং উস্তাদদের সাথে বেশী সময় সংসর্গ অবলম্বনকারী।

২. প্রচুর স্মরণশক্তির অধিকারী হাদীস সংরক্ষনকারী, কিন্তু শায়েখের সাথে কম সংসর্গ অবলম্বনকারী।

৩. হাদীস কম সংরক্ষনকারী ও কম স্মরণশক্তির অধিকারী, কিন্তু শায়েখের সাথে দীর্ঘ সংসর্গ অবলম্বনকারী।

৪. হাদীস কম সংরক্ষনকারী, কম স্মরণশক্তির অধিকারী আবার শায়েখের সাথে কম সংসর্গ অবলম্বনকারী।

৫. অজ্ঞাত ও দূর্বল।

ইমাম বুখারী র. প্রথম শ্রেণীর হাদীসগুলো পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেন। অবশ্য কখনো কখনো শাহিদ ও সমর্থক রূপে দ্বিতীয় শ্রেণীর হাদীসও আনেন।

ইমাম মুসলিম র. প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর হাদীসগুলো স্বতন্ত্রভাবে পরিপূর্ণ রূপে গ্রহণ করেন। আর কখনো কখনো তৃতীয় শ্রেণীর হাদীসও শাহিদ ও সমর্থক রূপে আনেন।

ইমাম নাসাঈ ও আবূ দাঊদ র. উক্ত তিন শ্রেণী ছাড়া চতুর্থ শ্রেণীর প্রসিদ্ধ রাবীদের রেওয়ায়াতও গ্রহণ করেন।

ইমাম তিরমিযী র. উপরোক্ত চার শ্রেণীর রেওয়ায়াত পরিপূর্ণরূপে নেন। কখনো কখনো পঞ্চম শ্রেণী থেকেও রেওয়ায়াত গ্রহণ করেন।

উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সিহাহ সিত্তার ক্রমঃবিন্যাস বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে নিম্নরূপ-

১. সহীহ বুখারী

২. সহীহ মুসলিম

৩. সুনানে নাসাঈ

৪. সুনানে আবূ দাঊদ

৫. সুনানে তিরমিযী

৬. সুনানে ইবনে মাজাহ

কারণ, এতে দূর্বল ও মুনকার রেওয়ায়াত বরং কিছু জাল হাদীসও আছে।

ত্বাহাবী শরীফ বিশুদ্ধতার দিকে লক্ষ্য করলে আবূ দাউদের সমপর্যায়ের।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের তুলনা এবং সিদ্ধান্তমূলক উক্তি

সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরামের মতে আল্লাহর কিতাবের পর বিশুদ্ধতম গ্রন্থ সহীহ বুখারী।

পশ্চিমা কোন কোন আলিমের মতে সহীহ মুসলিম সহীহ বুখারীর উপর প্রাধান্য লাভ করেছে। তাঁরা হাফিজ আবূ আলী নিশাপুরী র.-এর নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা এর উপর প্রমাণ পেশ করেন-

ماتحت اديم السماء كتاب اصح من مسلم

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম এর উত্তর এই দেন যে, এই বাক্য দ্বারা সহীহ বুখারীর উপর সহীহ মুসলিমের প্রাধান্য প্রমাণিত হয় না। কারণ, এ উক্তিতে সমতারও সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া এই ব্যাখ্যাও সম্ভব যে, উপরোক্ত বাক্য দ্বারা হাফিজ নিশাপুরী র.-এর উদ্দেশ্য হল, সহীহ মুসলিম সুন্দর ক্রমঃবিন্যাসের দিকে লক্ষ্য করলে প্রধান ও শ্রেষ্ঠ।

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের ফয়সালা হল, বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে সহীহ বুখারী শ্রেষ্ঠ। সুন্দর ক্রমঃবিন্যাসের দিকে লক্ষ্য করলে সহীহ মুসলিম উত্তম। যেমন-ইবনুল আরাবী র. বলেছেন-

تنازع قوم فى البخارى ومسلم ÷ لدى فقالوا اى ذين يقدم؟

فقلت لقد فاق البخارى صحة ÷ كما فاق فى حسن الصناعة مسلم.

মোটকথা, সহীহ বুখারী ও মুসলিম উম্মতে মুসলিমার জন্য সহীহ হাদীসের বিশাল সংকলন।

قال العلامة العينى رح اتفق علماء الشرق والغرب على انه ليس بعد كتاب الله تعالى اصح من صحيحى البخارى ومسلم الخ . عمدة القاري . ١/٥.

সহীহ বুখারী শরীফ এক অসীম সমুদ্র। এ থেকে কোন হাদীস তালাশ করতে গেলে বিরাট কষ্ট ও ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয়।

সহীহ মুসলিম সমস্ত মূলপাঠ ও সূত্রগুলো একত্রিত করে দেয়। যার হাদীস তালাশে কোন কষ্ট হয় না। ইমাম বুখারী র. حدثنا ও اخبرنا -এর মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। ইমাম মুসলিম র. এগুলোতে পার্থক্য করেছেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের উদাহরণ চক্ষুদ্বয় ও হস্তদ্বয়ের ন্যায়,বরং চন্দ্র-সূর্যের ন্যায়। কিন্তু এসব সৌন্দর্য সত্ত্বেও নিম্নোক্ত কারণে বিশেষভাবে বিশুদ্ধতার দিকে লক্ষ্য করলে সহীহ বুখারী সহীহ মুসলিমের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভের অধিকারী।

১. সহীহ বুখারীতে কালামকৃত রেওয়ায়াতের সংখ্যা ১১০, সহীহ মুসলিমে ১৩২। আল্লামা সুয়ূতী র. আদ্যাক্ষরের হিসেবে একটি কাব্যে বিষয়টি একত্র করেছেন।

فدعد لجعفى وقاف لمسلم ÷ بل لهما فاحفظ وقيت من الردى .

এ কাব্যে ফা অতিরিক্ত। عـــد সংখ্যা ৭৮। জু'ফী দ্বারা উদ্দেশ্য ইমাম বুখারী র.। কাফের সংখ্যা ১০০। দ্বিতীয় ছন্দে بـــل শব্দ উভয়ের জন্য। এর সংখ্যা হল ৩২। কাজেই এই কাব্যটি মুখস্থ করে নিলে কালামকৃত রেওয়ায়াতগুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হবে, ধ্বংস থেকে বেচে যেতে পারবে।

২. বিশুদ্ধতা নির্ভরশীল সনদ মুত্তাসিল হওয়ার উপর। ইমাম বুখারী র. এর সহীহ বুখারীর রেওয়ায়াতের জন্য বর্ণনাকারী এবং যার নিকট থেকে বর্ণনা করেন তথা ছাত্র-উস্তাদের মাঝে সাক্ষাত প্রমাণিত হওয়া জরুরী। কিন্তু ইমাম মুসলিম র.-এর মতে সাক্ষাতের সম্ভাবনাই যথেষ্ট।

৩. এ দুটি কারণ ছাড়া আরেকটি কারণ হল, ইমাম বুখারী র. ইমাম মুসলিম র.-এর তুলনায় শ্রেষ্ঠ। ইমাম মুসলিম র. ছাত্র। রীতিমত তিনি ইমাম বুখারী র. থেকে উপকৃত হতেন ও জ্ঞান আহরণ করতেন। পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী র. হাদীসের সুক্ষ্ম বিষয়াবলী ও ইল্লত সংক্রান্ত জ্ঞানে ইমাম মুসলিম র.-এর চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। ইত্যাদি। অতএব, স্পষ্ট বিষয়, শ্রেষ্ঠ মনীষীর গ্রন্থও শ্রেষ্ঠ হবে। এ জন্য শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী র. বলেন-

فاعلم ان الذى تقرر عند جمهور المحدثين ان صحيح البخارى مقدم على سائر الكتب بعد كتاب الله صحيح البخارى. مقدمة مشكوة.

কপির বিভিন্নতা ও ইখতিলাফের কারণ

সহীহ বুখারীর বিভিন্ন ও অনেক কপি রয়েছে। এই বিভিন্নতা ও ইখতিলাফের কারণও স্পষ্ট। কেননা পূর্বেকার যুগে বর্তমান যুগের ন্যায় ছাপাখানা ও প্রেসের বর্তমান সুযোগ-সুবিধা ছিল না। ছিল না বর্তমান যুগের ন্যায় প্রচার মাধ্যম যে, একটি গ্রন্থ ছেপে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মিসর ও শাম পাঠিয়ে দেয়া হল। সে যুগে পঠনপাঠনের পদ্ধতি শুধু এই ছিল যে, উস্তাদ স্বীয় স্মরণশক্তি থেকে অথবা স্বীয় পাণ্ডুলিপি থেকে বর্ণনা করতেন। শিষ্যগণ স্বীয় উস্তাদ থেকে শুনতেন এবং লিখে নিতেন। সর্বদা এই নিয়ম ছিল যে, প্রতি বছর ইলম পিপাসু, জ্ঞান আগ্রহী ছাত্ররা কোন শায়েখের নিকট যেতেন। শায়েখ শুনাতেন, তারা শুনতেন ও লিখে নিতেন।

জানাকথা, ইমাম বুখারী র. থেকে নব্বই হাজার ছাত্র সহীহ বুখারী শ্রবণ করেছেন। অভিজ্ঞতা সাক্ষী যে, উস্তাদ প্রতি বছর পড়ালে ও বক্তব্য রাখলে কিছু না কিছু পার্থক্য শাব্দিক এবং বিস্তারিত বিবরণ ও সংক্ষিপ্ত করনের ক্ষেত্রে অবশ্যই হয়ে থাকে। যেহেতু হাদীস সংক্ষেপ করণ অথবা অর্থগত বিবরণ দান জায়েয আছে। একারণে তৎকালীন যুগে উস্তাদগণও এই করতেন যে, কোন হাদীস এক বছর বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করতেন। অপর বছর বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করতেন না। এই হিসেবে শিষ্যদের লেখাতেও মতবিরোধ হত। এ কারণে হাফিজ আসকালানী, আল্লামা কাসতাল্লানী র. প্রমূখ নিজেদের যে সব সনদ লিখেছেন, এগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, চারটি কপি বুখারী শরীফের সুপ্রসিদ্ধ-

১. আল্লামা ইবরাহীম নাসাফীর
২. বযদবী ব.এর
৩. হান্নাদ ইবনে শাকিরের
৪. ফিরাবরীর

পঞ্চম আরেকটি কপি হল, মাহামিলীর। এটি বিতর্কিত যে, এর মর্যাদা স্বতন্ত্র কপির কি না? আল্লামা তাবারানী র.-এর রায় হল, এটি স্বতন্ত্র একটি কপি। তিনি স্বীয় সনদ মাহামিলী পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। কিন্তু

হাফিজ ইবনে হাজার র. তা স্বীকার করে লিখছেন- মাহামিলী ইমাম বুখারী র.-এর শিষ্য। কিন্তু তিনি স্বয়ং ইমাম বুখারী র. থেকে শ্রবণ করেননি। বরং তাঁর নকল ও পাণ্ডুলিপি তৈরী করেছেন। মোটকথা, আমাদের সামনে যে কপি আছে এবং চারটি কপিতে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য স্পষ্ট এবং গ্রহণযোগ্য, সেটি হল- ফিরাবরীর কপি। ইমাম বুখারী র. থেকে তিনি দুবার শুনে এগুলো প্রচার করেছেন। এ যুগে রেওয়ায়াতগুলো এর উপরই নির্ভরশীল।

আল্লামা ফিরাবরী র.

তাঁর নাম হল, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে মাতার ইবনে সালিহ ইবনে বিশর ফিরাবরী। فربر শব্দটির ফা-এর নিচে যের ও যবর উভয়টি হতে পারে। প্রথম রা-এর উপর যবর, বা-এর উপর জযম। এটি একটি গ্রামের নাম। বুখারা থেকে বিশ পঁচিশ মাইল দুরে এটি অবস্থিত। তিনি ২৩১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। ২০ই শাওয়াল ৩২০ হিজরীতে তাঁর ওফাত হয়। তাঁর সর্বমোট জীবনকাল ৯০ বছর। হযরত ইমাম বুখারী র.-এর ওফাতের সময় তাঁর বয়স ছিল ২৫ বছর। যেন এর পর তিনি ৬৪ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকেন এবং হাদীসের দরস-তাদরীস অব্যাহত রাখেন। প্রতি বছর ছাত্ররা হাদীস পড়তে থাকে ও লিখতে থাকে। এ জন্য এ কপিটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় কারণ এটাও যে, আল্লামা ফিরাবরী র. ইমাম বুখারী র. থেকে দুই বার সহীহ বুখারী পড়েছেন। প্রথমবার ২৪৮ হিজরীতে, দ্বিতীয়বার ২৫২ হিজরীতে। কোন কোন আলিম লিখেছেন, আল্লামা ফিরাবরী র. এটি তিনবার পড়েছেন। তৃতীয়বার পড়েছেন ২৫৬ হিজরীতে। যে বছর ইমাম বুখারী র.-এর ওফাত হয়।

স্বয়ং আল্লামা ফিরাবরী র.-এর বিবরণ, ইমাম বুখারী র. থেকে সহীহ বুখারী শরীফ ৯০ হাজার মনীষী শ্রবণ করেছেন, কিন্তু তাঁর থেকে বর্ণনাকারী এই মহূর্তে আমি ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট নেই।

কিন্তু এর উপর প্রশ্ন হল, শায়েখ বযদবী র. তাঁর পরেও জীবিত ছিলেন। অতএব, আল্লামা ফিরাবরী র.-এর এই ব্যাখ্যা হতে পারে, তিনি নিজের জানা মত উক্তি করেছেন।

ফিরাবরী থেকে বর্ণনাকারী ১২ জন শিষ্য রয়েছেন। তন্মধ্য থেকে হাফিজ ইবনে হাজার র. ৯ জনের কথা আলোচনা করেছেন। আল্লামা নববী ও কিরমানী র. তাঁদের ছাড়া আরো দু'জন শিষ্যের কথা আলোচনা করেছেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী র. আরেকজন ছাত্রের কথা আলোচনা করেছেন। লামি' এর মুকাদ্দমায় আমি একটি চিত্রে এর বিস্তারিত বিবরণ লিখেছি। -তাকরীরে শাইখুল হাদীস র.।

ফিরাবরীর কপিগুলো বিভিন্নতার কারণ

এখানে একটি প্রশ্ন হল, যদি ইমাম বুখারী র.-এর শিষ্যদের কপিগুলোতে ইখতিলাফ হয়, তবে তা যথার্থ। কিন্তু যখন গ্রন্থকার দ্বিতীয়বার দেখে দেন, তখন অবশ্যই কিছু কাটছাট করেন। কিন্তু ফিরাবরী থেকে যারা শিক্ষালাভ করেছেন, তাদের কপিগুলোতে বিভিন্নতা আসার কারণ কি?

এর উত্তর দুটি- একটি যৌক্তিক, অপরটি যৌক্তিক নয়। যুক্তির উর্ধ্বে যে উত্তরটি সেটি অধিক শক্তিশালী। সেটি হল, প্রথম যুগে উস্তাদ লিখাতেন, শিষ্যরা লিখতেন। যেহেতু সমস্ত শিষ্য একই পর্যায়ের সচেতন হতেন না, সেহেতু তাদের লেখার মধ্যে পার্থক্য হয়ে যেত। যেমন- পরীক্ষার খাতায় দেখেন, পরীক্ষক একেকটি অক্ষর বলেন, তা সত্ত্বেও লেখকদের মধ্যে বিভিন্নতা দেখা দেয়।

একটি যৌক্তিক কারণ হল, ফিরাবরী র. স্বীয় উস্তাদের সাথে চুড়ান্ত পর্যায়ের ভালবাসার কারণে উভয় কপির রেওয়ায়েতগুলো নিয়ে নিয়েছেন। যদিও তিনি জানতেন যে, সর্বশেষ কপি এটাই। অপরটি সর্বশেষ কপি নয়। যেমন- হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে একটি বিবরণ রয়েছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু দুটি সূরা মিলিয়ে একই রাক'আতে পড়তেন। এ রেওয়ায়াতটিতে পৌঁছে আমাদের হযরত শাইখুল হাদীস র. চুড়ান্ত পর্যায়ের ভালবাসার কারণে বলেন, আমাকেও একটি কাগজের উপর লিখে এই তরতীবটি দিয়ে দিবে। আজকে তাহাজ্জুদে এরূপভাবে পড়ব। অথচ এটি কুরআন এবং এর তরতীব মুসহাফে উসমানীর পরিপন্থী। কিন্তু চুড়ান্ত পর্যায়ের সুসম্পর্কের কারণে হযরত এভাবে পড়েছেন। -ইমদাদুল বারী।

একটি ভুল বুঝাবুঝির নিরসন

নিঃসন্দেহে আল্লাহর কিতাবের পর বিশুদ্ধতম গ্রন্থ হল, সহীহ বুখারী। কিন্তু এর অর্থ কখনো এই নয় যে, বুখারী শরীফের একেকটি শব্দ কুরআন মজীদের ন্যায় সহীহ এবং সঠিক, তার খুঁত বের করা এবং দুর্বল বলা জায়েয নেই। চাই সেটি হাদীস হোক অথবা সংকলকের উক্তি। এটি ভুল ধারণা নিঃসন্দেহে ইমাম বুখারী র. নিজের বিচক্ষনতা ও ফিকহী গভীর জ্ঞানের সাথে ১৬ বছর দিন-রাত গবেষণার পর নিজের সামর্থ অনুযায়ী চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, যাতে এই কিতাবে কোন দুর্বল ও অশুদ্ধ হাদীস না আসে, কোন ভুলত্রুটি না হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তো কেবল তাঁর নিজের ও তদ্বীয় রাসূলের হেফাজতই করেছেন। অতএব, পবিত্রতা কেবল মাত্র সে মহান আল্লাহ তা'আলার যিনি কোন কিছু ভুলেন না।

বরং বিশুদ্ধতম গ্রন্থ হওয়ার অর্থ শুধু এটাই যে, আজ পর্যন্ত হাদীসের যত গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে, তন্মধ্যে সর্বাধিক সহীহ হাদীস সহীহ বুখারীতেই আছে। অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের তুলনায় সহীহ বুখারীতে দুর্বল হাদীস কম। এ হিসেবে সহীহ বুখারী হল, বিশুদ্ধতম গ্রন্থ।

স্মর্তব্য, যেসব মহামনীষী সহীহ বুখারীকে বিশুদ্ধতম গ্রন্থ বলেছেন, তারা শুধু হাদীসগুলোর দিকে লক্ষ্য করেই বলেছেন। ইমাম বুখারী র.-এর শিরোনাম ও বাণীগুলোকে তাতে অন্তর্ভূক্ত করেননি। এই ইমাম বুখারী র. থেকেও এ বুখারী শরীফে কিছু কিছু পদস্খলন ঘটেছে।

ইমাম বুখারী র.-এর ত্রুটিসমূহ

ইমাম বুখারী র.ও নিজের সমস্ত জ্ঞানগত ও শাস্ত্রগত পূর্ণাঙ্গতা সত্ত্বেও একজন মানুষ ছিলেন। এ জন্য সহীহ বুখারী সংকলনে তাঁর থেকে ভুল-বিস্মৃতি পদস্খলন ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটা অসম্ভব নয়। যাঁরা মনে করেন, বুখারী শরীফের প্রতিটি হাদীসই সহীহ এবং সূত্র ও মূলপাঠের বিবরণে ইমাম বুখারী র. থেকে ভুল হয়নি, তাঁদের এ ধারণা যথার্থ নয়। যথার্থ হল, সহীহ বুখারীতেও ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে। সহীহ বুখারীতেও এরূপ অনেক বর্ণনাকারী আছেন, যারা কাদরিয়া, জাহমিয়া, শিয়া, নাসিবী ধর্মবিশ্বাসের অধিকারী। তাছাড়া বুখারী শরীফে এরূপ রাবীও আছেন, যারা মুনকারুল হাদীস এবং ওয়াহমী (ভুলের শিকার)। এসব বিস্তারিত বিবরণ হাফিজ আসকালানী র. হাদইয়ুস সারী মুকাদ্দামায়ে ফাতহুল বারীতে দিয়েছেন। (পৃঃ ৩৮৪-৪৫৬)

ইমাম বুখারী র.-এর উপর যেসব প্রশ্ন ও সমালোচনা হয়েছে, সেগুলো প্রতিহত করতে গিয়ে স্বীয় পূর্ণ ফিকহী ও ইলমী মেধা খরচ করে বলতে হল- لِكُلِّ جواد كبوة অর্থাৎ, প্রতিটি নিপূন তেজী ঘোড়াও হোচট খায়।

হাফিজ আসকালানী র. আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক র.-এর নিম্নোক্ত মূল্যবান বানীটির উদ্ধৃতি দেন-

وقال ابن معين لست اعجب ممّن يحدث فيخطئ انما اعجب ممن يحدث فيصيب.

'ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন র. বলেছেন, কেউ হাদীস বর্ণনায় ভুল-বিচ্যুতির শিকার হলে এতে আমার কোন তা'জ্জব হয় না। আমার তো বিস্ময় হয়, ভুল না করলে।' -লিসানুল মীযান ঃ ১/১৭।

কিন্তু বুখারীর সমালোচিত রাবীদের সম্পর্কে বলা হয় যে, এসব রাবীর ব্যাপারে অন্যরা সমালোচনা করেছেন। ইমাম বুখারী র.-এর নিকট সে সমালোচনা প্রমাণিত নয়। এ জন্য ইমাম বুখারী র. সেসব বর্ণনাকারীর হাদীস স্বীয় সহীহ বুখারীতে নিয়েছেন।

কিন্তু এর কি উত্তর যে, সহীহ বুখারীতে এরূপ বর্ণনাকারীর সংখ্যাও অনেক যাদের স্বয়ং ইমাম বুখারী র. স্বীয় গ্রন্থাবলীতে সমালোচনা করেছেন। যেমন- باب الاستنجاء بالماء এর অধীনে ইমাম বুখারী র. সূত্র সহকারে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন-

حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن ابى معاذ واسمه عطاء بن ابى ميمونة قال سمعت انس بن مالكؓ يقول كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته الحديث. بخاري. ١/٢٧.

এ হাদীসের সনদে একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন, আতা ইবনে আবু মাইমূনা। তার সম্পর্কে স্বয়ং ইমাম বুখারী র. কিতাবুয যু'আফাইস সগীরে (পৃঃ ২৭১) লিখেন-

عطاء بن ابى ميمونة ابومعاذ مولى انس وقال يزيد بن هارون مولى عمران بن حصين كان يرى القدر

'আবু মু'আয আতা ইবনে আবু মাইমূনা ছিলেন হযরত আনাস রা.-এর গোলাম। ইয়াযীদ ইবনে হারুন বলেছেন, তিনি ইমরান ইবনে হোসাইন রা.-এর গোলাম ছিলেন। তিনি কাদরিয়া ফিরকার আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন।

এ জন্য হাফিজ আসকালানী র. তার সম্পর্কে বলেন-

وقال البخارى وغير واحد كان يرى القدر

-হাদইয়ুস সারী ঃ ৪২৫, তাহযীবুয তাহযীব ঃ ৭/২১৬।

২. এমনিভাবে ইমাম বুখারী র. সহীহ বুখারীর কিতাবুল মাগাযীতে باب بعث ابى موسى ومعاذؓ الى اليمن الخ এর অধীনে একটি হাদীস সূত্র সহ উল্লেখ করেছেন-

حدثنى عباس بن الوليد قال حدثنا عبد الواحد عن عائذ قال حدثنا قيس بن مسلم قال سمعت بن طارق بن شهاب يقول حدثنى ابو موسى الاشعرى قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بخاري : ٢/٦٦٣.

এ হাদীসের সনদে একজন বর্ণনাকারী হলেন, আইউব ইবনে আইয। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী র. কিতাবুয যু'আফায় বলেন- (পৃঃ ২৫৩)

عطاء بن ابی میمونة ابو معاذ مولی انس وقال یزید بن هارون مولی عمران بن حسین کان یری القدر.

হাফিজ আসকালানী র. লিখেন- وقال البخاری وغیر واحد کان یری القدر -তাহযীবুত তাহযীব ঃ ১/৪০৭।

আল্লামা ইবনে মুবারক র. বলেন- کان صاحب عباده ولکنه کان مرجئا -তাহযীবুত তাহযীব ঃ ১/৪০৭।

হাফিজ যাহাবী র. এর উপর বিস্ময়ের সূরে লিখেন-

وکان من المرجئة قال له البخاری واورده فی الضعفاء لا رجائه والعجب من البخاری یغمزه وقد احتج به.

'আবু আইউব মুরজিয়া সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। ইমাম বুখারী র. মুরজিয়া হওয়ার কারণে তাকে দুর্বলদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। ইমাম বুখারী র.-এর উপর বিস্ময় হয় যে, তিনি তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনাও করেন এবং তদ্বারা প্রমাণও পেশ করেন অর্থাৎ, তার রেওয়ায়াতও গ্রহণ করেন।

৩. এমনিভাবে আরেক বর্ণনাকারী হলেন, ইসমাঈল ইবনে আবান আল ওয়াররাক আল কূফী। তার সম্পর্কে কিতাবুয যু'আফায় ইমাম বুখারী র. লিখেন-

اسماعیل بن ابان عن هشام بن عروة متروك الحدیث کنیته ابو اسحاق .

'ইসমাঈল ইবনে আবান যিনি হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে বর্ণনা করেন, তার হাদীস পরিত্যাজ্য তার উপনাম আবু ইসহাক।' (পৃঃ ২৫২)

ইমাম বুখারী র. তার হাদীস পরিত্যাজ্য বলে উল্লেখ করেন, অথচ এই পরিত্যাক্ত ব্যক্তি থেকে সহীহ বুখারীতে একটি নয় বরং অনেক হাদীস গ্রহন করেছেন। এই জন্য হাফিজ আসকালানী হাদইয়ুস সারীতে লিখেন-

اسماعیل بن الوراق الکوفی احد شیوخ البخاری ولم یکثر عنه

'ইসমাঈল ইবনে আবান আল ওয়াররাক আল কূফী ইমাম বুখারী র.-এর এক জন উস্তাদ। ইমাম বুখারী র. তার সূত্রে অনেক বেশি হাদীস গ্রহণ করেননি।' -হাদইয়ুস সারী ঃ ৩৯০।

উপরোক্ত রাবীগণ ছাড়া আপনি ইমাম বুখারীর কিতাবুয যু'আফা অধ্যয়ন করলে দেখতে পাবেন, নিম্নোক্ত বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে ইমাম বুখারী র. সমালোচনা করেছেন তথা স্বয়ং তিনি সেসব রাবীকে অভিযুক্ত এবং দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। অতঃপর সহীহ বুখারীতে তাদের রেওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন।

যুবাইর ইবনে মুহাম্মদ তাইমী, সাঈদ ইবনে আবু আরুবা, আবদুল্লাহ ইবনে লাবীদ, আবদুল মালিক ইবনে আমীন, আবদুল ওয়ারিস ইবনে সাঈদ, কাহমাস ইবনে মিনহাল, আতা ইবনে ইয়াযীদের সমালোচনা করেছেন। ইমরান ইবনে হিত্তানের ন্যায় খারিজী বরং শীর্ষ খারিজী নেতা থেকেও একটি রেওয়ায়াত কিতাবুল লিবাসে (পৃঃ ৮৬৭) এনেছেন, এই ইমরান সেই, যে সাইয়্যেদেনা হযরত আলী রা.-এর ঘাতক আবদুর রহমান ইবনে মুলজিমের ন্যায় বদবখতের শোকগাথা লিখেছে।

ایک تقی نے کیسی اچھی ضرب لگائی جس سے اس کی نیت خدا کی رضا حاصل کرنی تھی.

সে যে আলী রা. কে হত্যা করেছে এর প্রশংসা করেছে। এই ইমরান ছিল কবি। সে একটি কাব্য বলেছিল, যার অর্থ হল- একজন পরহেযগার ব্যক্তি কতই সুন্দর আঘাত এনেছে। যার ফলে তার নিয়্যত ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এরূপভাবে যে বদবখত ইমরান অন্য বদবখত (ইলমের শহর আমীরুল মুমিনীন সাইয়্যেদেনা আলী রা.-এর ঘাতক) কে মুত্তাকী সাব্যস্ত করেছে। রহমত ও সন্তুষ্টিরও যোগ্য সাব্যস্ত করেছে। তা'জ্জবের বিষয়, ইমাম বুখারী র. তার রেওয়ায়াত সহীহ বুখারীতে স্থান দিয়েছেন।

২. মারওয়ান ইবনে হাকামের ন্যায় প্রসিদ্ধ কবি থেকেও কিতাবুল মানাকিবে দুটি রেওয়ায়াত নিয়েছেন। দ্রষ্টব্য ঃ বুখারী - ৫২৭।

এই সে মারওয়ান যার ষড়যন্ত্র ও কুটচালের কারণে আমীরুল মুমিনীন সাইয়্যেদেনা উসমান রা. শাহাদত লাভ করেছেন। যে হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ এর ন্যায় আশারায়ে মুবাশশারার একজন সদস্যকে তীর নিক্ষেপে আহত করেছে। যার যখমের কারণে তিনি শহীদ হন।

৩. বুখারীর কিতাবুত তাফসীরের সূরা আনফালের অধীনে একটি সনদে ইবনে আবু নাজীহ নামক একজন রাবী এসেছে।

তিনি হলেন, আবদুল্লাহ। ইবনে আবু নাজীহ এর নাম হল, ইয়াসার সাকাফী। ইয়াহইয়া আল কাত্তান র. বলেছেন-

هو عبد الله واسم ابن ابى نجيح يسار الثقفى قال يحيى القطان كان قدريًا . نصر الباري، كتاب التفسير : ص ٢٣٧، عمدة القاري.

সনদের বিবরণে ভুল-ত্রুটি

দুর্বল রাবীদের থেকে বর্ণনা করা ছাড়াও কোন কোন স্থানে ইমাম বুখারী র. থেকে বর্ণনাকারীদের নামেও ভুল হয়েছে। যেমন- বুখারী (২/৭৩২) তে দ্বিতীয় লাইনে আছে- وقال عطاء عن ابن عباس الخ

তিনি হলেন, আতা খুরাসানী। যিনি দুর্বল। কিন্তু ইমাম বুখারী র. তাকে আতা ইবনে আবু রাবাহ মনে করে বর্ণনা করে ফেলেছেন। যেমন- আল্লামা কাসতাল্লানী র. বলেছেন-

لكن البخارى ماا خرجه الا انه رواية عطاء بن ابى رباح لان الخراسانى ليس على شرطه

-কাসতাল্লানী, তাফসীরে সূরা নূহ।

২. বুখারী ১ম খণ্ডের ৯১ পৃষ্ঠায় باب اذا اقيمت الصلوة فلا صلوة الا المكتوبة এর অধীনে হাদীসের সনদ নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে-

حدثنا عبد العزيز بن عبدقال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك ابن بحينة قال مرالنبى ﷺ

এ সনদে ইমাম বুখারী র. থেকে দুটি ভুল হয়েছে-

১. মালিক ইবনে বুহাইনা বলেছেন, যদ্বারা বুঝা যায় বুহাইনা মালিক র. -এর আম্মা। অথচ বুহাইনা মালিক র.-এর স্ত্রী। হযরত আবদুল্লাহ রা.-এর আম্মা।

২. সনদ পরিবর্তনের পর বলেছেন-

سمعت رجلا من الازد يقال له مالك ابن بحينة قال مر النبى صلى الله عليه وسلم راى رجلا .

১৫—

এ হাদীসের বর্ণনাকারী বলেছেন মালিককে। অথচ এর বর্ণনাকারী মালিকের ছেলে আবদুল্লাহ। মালিক তো বিশুদ্ধ উক্তি অনুযায়ী ইসলামও গ্রহণ করেননি।

হাফিজ আসকালানী র. বলেন-

حكم الحفاظ يحيى بن معين واحمد (وغيرهم) بالوهم فيه موضغين احدهما ان بحينة والدة عبد الله لا مالك ، وثانيهما ان الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك. فتح الباري : ٢/١٤٩ ، عمدة القاري : ٥/١٨٣ ، كتاب الآذان.

এ বিষয়ে পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে ইনশাআল্লাহ আসবে। ইবনে মাজায় প্রথম খন্ডের ৮২ পৃষ্ঠায় হুবহু শিরোনাম রয়েছে । তাছাড়া মুসলিম ও নাসাঈতেও এ সনদটির বিবরণ রয়েছে। কিন্তু তাদের সনদে এ ভুলগুলো নেই।

৩. باب غزوة ذات الرقاع وهى غزوة محارب خصفة من بنى ثعلبة من غطفان.

بخاري : ٢/٥٩٢.

আল্লামা কাসতাল্লানী র. বলেন-

قال ابن حجر وليس كذالك فان غطفان هو ابن سعد بن قيس بن غيلان فمحارب وغطفان ابناعم فكيف يكون الاعلى منسوبا الى الادنى والصواب ما فى الباب اللاحق وهو عند ابن اسحاق وغيره وبنى ثعلبة بواو العطف هكذا نبه على ذالك ابو على الغسانى فى اوهام الصحيحين .

-কাসতাল্লানী। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী কিতাবুল মাগাযী ঃ ১৭৮-১৭৯।

৪. সহীহ বুখারীর দ্বিতীয় খণ্ডে باب غزوة خيبر -এর অধীনে একটি হাদীস রয়েছে- ان ابا هريرةؓ قال شهدنا الخيبر এর একটি সনদে ইমাম বুখারী র. উল্লেখ করেছেন-

قال الزهرى واخبرنى عبد الله بن عبد الله وسعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم .

بخاري. ٢/٦٠٥.

এর উপর ইমাম আলী জুব্বাঈ প্রশ্নোথাপন করেছেন যে, বিশুদ্ধ হল আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ। কিন্তু ইমাম বুখারী র. আবদুর রহমানের স্থলে আবদুল্লাহ-ই লিখেছেন। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী র. বলেন-

وهم فى قوله قال الزهرى واخبرنى عبد الله بن عبد الله وشعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم ،، لان عبد الله بن عبد الله لايعرف والصواب انشاء الل عبد الرحمان بن عبد الله وهو ابن كعب قال وكنت اظن ان الوهم فيه ممن دون البخارى الى من رأيته فى التاريخ قد ساقه كما ساقه فى الصحيح سواء . مقدمة فتح الباري ص ٣٦٩.

হাদীসের মূলপাঠে ভ্রম

সহীহ বুখারীর কিতাবুয যাকাতে একটি হাদীস রয়েছে-

عن عائشة ان بعض ازواج النبی صلی الله علیه وسلم قلن للنبی صلی الله علیه وسلم اینا اسرع بك لعوقا قال اطولکن یدًا فاخذوا قصبة یذرعونها فطانت سودة اطولهن یدًا فعلمنا بعد انما کانت طول یدها الصدقة وکانت اسرعنا لحوقًا به صلی الله علیه وسلم وکانت تحب الصدقة .

'হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর কোন স্ত্রী আরয করলেন, আমাদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম কে আপনার সাথে মিলিত হবে? উত্তরে তিনি বললেন- তোমাদের যার হাত সবচেয়ে দীর্ঘ। একথা শুনে সবাই একটি কাঠ নিয়ে নিজ নিজ হাত মাপতে লাগলেন। বস্তুতঃ তাঁদের মধ্যে হযরত সাওদা রা.-এর হাত ছিল সবচেয়ে দীর্ঘ। অতঃপর আমরা জানতে পারলাম দীর্ঘ হাত দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল সদকা এবং হযরত সাওদা রা. সর্বপ্রথম ওফাত লাভ করেন। তিনি দান-সদকা করতে ভালবাসেন। -বুখারী ঃ ১/১৯১।

এ হাদীসে کانت اسرعنا لحوقا به বাক্যটিতে کانت এর যমীর বাহ্যত হযরত সাওদা রা.-এর দিকে ফিরেছে। যার অর্থ হল, পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম হযরত সাওদা রা.-এর ওফাত হয়েছে। অথচ সমস্ত সীরাতবিদ ও ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে একমত যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম ওফাত হয়েছে হযরত যয়নব বিনতে জাহশ রা.-এর। তাঁর ইনতিকাল হযরত উমর ফারুক রা.-এর খিলাফত যুগে ২০ হিজরীতে। আর হযরত সাওদা রা.-এর ওফাত হয় হযরত মু'আবিয়রা রা.-এর শাসনামলে ৫৪ হিজরীতে। -বুখারীর টীকা ও উমদাতুল কারী।

ইমাম নববী র. ও ইবনে বাত্তাল র.-এর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও তাই।

২. باب احداد المرأة علی غیر زوجها তথা 'স্ত্রী কর্তৃক স্বামী ছাড়া অন্য কারো ব্যাপারে শোক পালন' অনুচ্ছেদে একটি হাদীস রয়েছে-

عن زینب بنت ابي سلمة قالت لما جاء نعی ابي سفیان من الشام دعت ام حبیبة بصفرة في الیوم الثالث فمسحت عارضیها وذراعیها الخ.

হযরত যয়নব বিনতে আবু সালামা থেকে বর্ণিত, যখন শাম থেকে আবু সুফিয়ানের ইনতিকালের সংবাদ আসে, তখন উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবা রা. তৃতীয় দিন হলুদ রংঙের সুঘ্রাণ আনিয়ে নিজের গণ্ডদেশে এবং হাতে মাখিয়েছেন। (শোক খতম করে দিয়েছেন।) -বুখারী ঃ ১/১৭০।

ইমাম বুখারী র.-এর এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, আবু সুফিয়ান রা.-এর ইনতিকালের সংবাদ শাম থেকে এসেছিল। যার স্পষ্ট অর্থ হল, হযরত আবু সুফিয়ান রা.-এর ওফাত হয়েছিল শামে। অথচ এটা ভুল। সমস্ত ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত যে, আবু সুফিয়ান রা.-এর ওফাত হয়েছিল মদীনা মুনাওয়ারায়। এ জন্য হাফিজ আসকালানী র. লিখেন-

وفی قوله من الشام نظر لان ابا سفیان مات بالمدینة بلاخلاف بین اهل العلم بالاخبار والجمهور علی انه مات سنة اثنتین وثلاثین وقیل سنة ثلاث ولم ار فی شیئ من

طرق هـذا الـحـديـث تقييده بذلك الا فى رواية سفيان بن عيينة هذه واظنها وهما. فتح الباري : ٣/١٤٧.

'এই রেওয়ায়াতে من الشام (শাম থেকে) শব্দটির উপর প্রশ্ন হয়। কারণ, মুহাদ্দিসীন ও ঐতিহাসিকগণের ঐকমত্য রয়েছে যে, আবু সুফিয়ান রা. এর ওফাত হয় মদীনা মুনাওয়ারায় সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে ৩২ অথবা ৩৩ হিজরীতে তাঁর ইন্তিকাল হয়। এ ঘটনায় 'শামের' কথা সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার বিবরণ ছাড়া অন্য কোথাও আমি দেখিনি। আমার ধারণা, এটা বর্ণনাকারীর ভুল -ফাতহুল বারী ঃ ৩/১৪৭।

এ বিস্তারিত বিবরণ থেকে জানা গেল, ইমাম বুখারী র. এই রেওয়ায়াতটি বুখারীতে অন্তর্ভূক্ত করতে গিয়ে পূর্ণ তত্ত্বানুসন্ধান করতে পারেননি।

৩. ইমাম বুখারী র. باب فضل من شهد بدرا এর অধীনে ৫৬৮ পৃষ্ঠায় এবং باب غزوة الرجيع তে ৫৮৫ পৃষ্ঠায় একটি সুদীর্ঘ হাদীসে বলেছেন- وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر অর্থাৎ হযরত খুবাইব রা. হারিস ইবনে আমিরকে বদরের যুদ্ধে হত্যা করেছেন।

এ দীর্ঘ হাদীসটি ইমাম বুখারী র. কিতাবুল জিহাদে (৪২৭-৪২৮পৃষ্ঠা)ও অন্তর্ভূক্ত করেছেন। প্রতিটিস্থানে বাক্য এটি। যদ্বারা পরিস্কার বুঝা যায়, ইমাম বুখারী র.-এর এখানে মারাত্মক ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে। মূলতঃ খুবাইব নামের দু ব্যক্তি রয়েছেন- ১. খুবাইব ইবনে আদী খাযরাজী, ২. খুবাইব ইবনে ইসাফ আওসী। সমস্ত আহলে মাগাযী এ ব্যাপারে একমত যে, যে খুবাইব বদরযুদ্ধে হারিস ইবনে আমিরকে হত্যা করেছিলেন, তিনি হলেন আওস গোত্রের হযরত খুবাইব ইবনে ইসাফ রা.। আর ইমাম বুখারী র. এ হাদীসে যে খুবাইবের ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, তাকে পৌত্তলিক গ্রেফতার মক্কায় শুলিতে চড়িয়েছিল। তিনি হযরত খুবাইব ইবনে আদী রা.। তিনি না বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, না হারিস ইবনে আমিরকে হত্যা করেছেন। অতএব, তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী র.-এর এই বক্তব্য যথার্থ নয় যে, খুবাইব রা. হারিসকে হত্যা করেছিলেন। এ জন্য আল্লামা কাসতাল্লানী র. লিখেন-

قال الشرف الدمياطى لم يذكر احد من اهل المغازى ان خبيب بن عدى شهد بدرا ولاقتل الحارث بن عامر وانما ذكروا ان الذى قتل الحارث بن عامر ببدر خبيب بن يساف وهو غير خبيب بن عدى وهو خزرجى وخبيب بن عدى اوسى الخ . قسطلاني ، باب غزوة الرجيع، عمدة القاري، فتح الباري.

৪. ইমাম বুখারী র. باب غزوة الطائف এর অধীনে ৪র্থ হাদীসে লিখেছেন- وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة -বুখারী ঃ ৬২০ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় লাইন।

এর দ্বারা বুঝা যায়, জি'ইররানা মক্কা ও মদীনার মাঝে অবস্থিত। অথচ এটা বিশুদ্ধ নয়। আল্লামা কাসতাল্লানী র. বলেন- والصواب بين مكة والطائف ومنه جزم النووى وغيره অর্থাৎ, বিশুদ্ধ হল, মক্কা ও তায়েফের মাঝে অবস্থিত। ইমাম নববী র. প্রমূখ এ ব্যাপারে নিশ্চিত উক্তি করেছেন।

-কাসতাল্লানী বাবু গাওয়াতিত তায়েফ, বুখারীর টীকা ঃ ৬২০ পৃষ্ঠা।

৫. باب مناقب عثمان بن عفان অধীনে একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেছেন- ثم دعا عليا فامره ان يجلده فجلده ثمانين -বুখারী ঃ ১/৫২২।

এরপর হযরত উসমান রা. হযরত আলী রা.কে ডেকে বেত্রাঘাত লাগানোর নির্দেশ দেন। ফলে তিনি ৮০ বেত্রাঘাত ওয়ালীদকে লাগান।

ইমাম বুখারী র. এই রেওয়ায়াতে ৮০ কোড়া মারার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হাফিজ আসকালানী র. বলেন-

في رواية معمر فجلد الوليد اربعين جلدة وهذه الرواية اصح من رواية يونس والوهم فيه من الراوى.

'মা'মারের রেওয়ায়াতে আছে, ওয়ালীদকে ৪০টি বেত্রাঘাত লাগিয়েছেন। (মা'মারের এই রেওয়ায়াত বুখারীর ৫৪৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে। পক্ষান্তরে ইউনুসের রেওয়ায়াত বুখারীর ৫২২ পৃষ্ঠার রেওয়ায়াত থেকে বিশুদ্ধতম। এই ইউনুসের রেওয়ায়াতে বর্ণনাকারীর ভুল হয়ে গেছে।

-ফাতহুল বারী, উমদাতুল কারী, কাসতাল্লানী, বুখারীর টীকা।

৬. باب ما ذكر فى الاسواق এর অধীনে একটি হাদীস রয়েছে- 'হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার দিনের বেলায় বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। আমি এবং তিনি উভয়েই নীরব ছিলাম। এক পর্যায়ে বনূ কায়নুকার বাজারে এলেন এবং হযরত ফাতিমা রা.-এর ঘরের আঙ্গিনায় বসে পড়লেন।' -বুখারী ঃ ১/২৮৫ কিতাবুল বুয়ূ'।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, হযরত ফাতিমা রা.-এর ঘর ছিল বনূ কাইনুকার বাজারে। অথচ বাস্তবতা কিন্তু তা নয়। বরং হযরত সাইয়্যিদা ফাতিমা রা.-এর ঘর ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সহধর্মীনীগণের ঘরগুলোর মাঝে। বর্ণনাকারীর এই রেওয়ায়াতে ভুল হয়েছে। সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়াতে এই ভুল নেই। তাতে রয়েছে-

عن ابى هريرة الدوسى قال خرج النبى صلى الله عليه وسلم فى طائفة النهار لايكلمنى ولا اكلمه حتى اتى سوق بنى قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة .

অর্থাৎ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ কাইনুকার বাজারে তাশরীফ আনেন। এরপরে ফিরে এসে হযরত ফাতিমা রা.-এর আঙ্গিনায় প্রবেশ করেন। এ জন্য হাফিজ আসকালানী র. বলেন-

قال الدؤدى سقط بعض الحديث عن الناقل او ادخل حديثا فى حديث لان بيت فاطمة ليس فى سوق بنى قينقاع انتهى وما ذكره اولا هو الواقع .

'দাঊদী বলেন, বর্ণনাকারী থেকে হাদীসের কিছু শব্দ ছুটে গেছে। অথবা তিনি এক হাদীসকে অপর হাদীস প্রবিষ্ট করিয়েছেন। কারণ, হযরত ফাতিমা রা.-এর ঘর বনূ কাইনুকার বাজারে ছিল না। হাফিজ ইবনে হাজার র. বলেন, দাঊদী প্রথমে যে সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন, অর্থাৎ বর্ণনাকারী থেকে কিছু শব্দ ছুটে গেছে, মূলতঃ ঘটনা তাই। -ফাতহুল বারী, উমদাতুল কারী।

৭. ইমাম বুখারী র. باب فضل من شهد بدرا এর পর শিরোনামহীন একটি অনুচ্ছেদ কায়েম করে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন -

عن ابی اسیدؓ قال قال لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم بدرا اذا اکثبوکم یعنی کثروکم فارموهم واستبقوا نبلکم. بخاري : ٢/١٦٧ - ١٦٨.

হাফিজ আসকালানী র. বলেন- . هذا تفسير من بعض الرواة لايعرفه اهل اللغة

আল্লামা আইনী র. বলেন- هذا تفسير لايعرفه اهل اللغة

-উমদাতুল কারী, দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী কিতাবুল মাগাযী ঃ পৃষ্ঠা ৪০।

মাসায়েল উৎসারণে ভ্রম

আমরা ইতিপূর্বে 'বুখারীর শিরোনামগুলোর গুরুত্ব' শিরোনামে বর্ণনা করেছি যে, ইমাম বুখারী র. -এর উদ্দেশ্য সহীহ বুখারী রচনায় শুধু সহীহ হাদীসগুলো সংকলনই নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্দেশ্য হল, হাদীস থেকে মাসায়েল উৎসারণ করা। এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অধীনে তিনি শিরোনামগুলো কায়েম করেছেন। মানবিক দাবী অনুযায়ী মাসায়েল উৎসারণেও ইমাম বুখারী র. থেকে পদস্খলন ঘটেছে। এর সংখ্যা অনেক। যা নাসরুল বারীতে যথার্থ স্থানে বিস্তারিত প্রামাণ্য আলোচনা ইনশাআল্লাহ আসবে। আমরা এখানে নমুনাস্বরূপ কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি।

১. باب اذا شرب الكلب فی الاناء এর অধীনে দ্বিতীয় হাদীসটি সনদ সহকারে উল্লেখ করেছেন-

عن النبی صلی الله علیه وسلم ان رجلا رای کلبا یاکل الثری من العطش فاخذ الرجل خفة فجعل یغرف به حتی ارواه فشکر الله له فادخله الجنة.

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- এক ব্যক্তি দেখল, একটি কুকুর ভীষণ পিপাসায় ভিজা মাটি চাটছে। ফলে সে নিজের মোজা খুলে পানি পূর্ণ করে হাতের অঞ্জলী ভরে সেটিকে পান করাতে শুরু করে। এক পর্যায়ে কুকুরটির পূর্ণ তৃষ্ণা নিবারিত করে। আল্লাহ তা'আলা তার এ কাজের কদর করেছেন। তাকে জান্নাত দিয়েছেন। -বুখারী ঃ ১/২৯।

হাফিজ আসকালানী র. বলেন, استدل به المصنف علی طهارة سور الكلب الخ গ্রন্থকার এ হাদীস দ্বারা কুকুরের ঝুটা পবিত্র হওয়ার উপর প্রমাণ পেশ করেছেন। -ফাতহুল বারী ঃ ১/২৭৮, ২২৩।

এ অনুচ্ছেদে আরেকটি হাদীস রয়েছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর -

قال کانت الکلاب تقبل وتدبر فی المسجد فی زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم فلم یکونوا یرشون شیئًا من ذلك .

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, রিসালত যুগে কুকুরগুলো মসজিদে নববীতে যাতায়াত করত। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম-এর কারণে পানি ছিটাতেন না। এ হাদীস উল্লেখ করেও ইমাম বুখারী র.-এর উদ্দেশ্য বাহ্যত এটাই যে, কুকুরের লালা পবিত্র। অথচ এটা সম্পূর্ণ প্রথম দিককার কথা, যখন মসজিদে দরজা ছিল না। পরবর্তীতে মসজিদ পবিত্রকরণ ও এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ হয় এবং মসজিদে দরজা লাগানো হয়। তখন কুকুরের যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। এর উপর বিস্তারিত ও প্রামাণ্য আলোচনা নাসরুল বারীতে ইনশাআল্লাহ আসবে।

তা সত্ত্বেও এতটুকু স্মরণ রাখা উচিত যে, মসজিদ না ধোয়ার কারণে কুকুরের লালার পবিত্রতা কখনো প্রমাণিত হয় না। কারণ, জমিনে পেশাব পড়লে শুকিয়ে যাওয়ার পর তা পবিত্র হয়ে যায়। এই জমিনের নামায পড়া জায়েয হয়ে যায়। হানাফী ফকীহগণ তাই বলেন।

২. ইমাম বুখারী র. আরেকটি অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন- باب تقضى الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت অর্থাৎ, ঋতুবতী মহিলা মাসিক অবস্থায় হজ্জের সমস্ত রোকন আদায় করতে পারে। শুধু বাইতুল্লাহ্ তওয়াফের অনুমতি নেই। ইমাম বুখারী র. এই অনুচ্ছেদের অধীনে একটি রেওয়ায়াত তা'লীক রূপে উল্লেখ করেছেন- . كان النبى صلى الله عيه وسلم يذكر الله على كل احيانه

'নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা আল্লাহর যিকির করতেন।' -বুখারী ঃ ১/৪৪।

এ হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী র.-এর উদ্দেশ্য কি? আল্লামা আইনী র. বলেন-

اراد البخارى بايراد هذا وبما ذكره فى هذا الباب الاستدلال على جواز قراءة الجنب والحائض لان الذكر اعم من ان يكون بالقران او بغيره .

এ রেওয়ায়াত দ্বারা ইমাম বুখারী র.-এর উদ্দেশ্য হল, গোসল ফরয বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং মাসিকগ্রস্থ মহিলার জন্য কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা জায়েয আছে। কারণ, যিকির শব্দটি ব্যাপক। এতে কুরআন মজীদ এবং অন্যান্য যিকির সব অন্তর্ভূক্ত। কাজেই কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করাও জায়েয আছে। -উমদাতুল কারী ঃ ৩/২৭৪।

হাফিজ আসকালানী র. লিখেন-

ان مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والحنب الخ

'ইমাম বুখারী র.-এর উদ্দেশ্য ঋতুবতী মহিলা ও গোসল ফরয বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য কুরআন মজীদ তিলাওয়াতের বৈধতার উপর প্রমাণ পেশ করা। -ফাতহুল বারী মিসরী ঃ ১/৩২৩, পাকিস্তানী ঃ ১/৪০৭।

বিস্তারিত আলোচনা যথার্থস্থানে ইনশাআল্লাহ আসবে। এখানে শুধু এতটুকু স্মরণ রাখা চাই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফী, শাফিঈ ও হাম্বলীদের মতে তিলাওয়াতের নিয়তে পূর্ণাঙ্গ এক আয়াত পড়াও জায়েয নেই।

বাকী রইল, ইমাম বুখারী র.-এর সে সব প্রমাণ সহীহ হতে পারে, যখন যিকির দ্বারা আম বা ব্যাপক উদ্দেশ্য হয়। অথচ এখানে যিকির দ্বারা আন্তরিক যিকির দো'আ-তাসবীহও উদ্দেশ্য হতে পারে। واذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال

জরুরী সতর্কবানী

অধম বুখারীর ভ্রমসমূহের শিরোনাম কায়েম করে যা কিছু লিখেছে, সেগুলো শুধু মহামনীষী মুহাদ্দিসীনে কিরামের গবেষনার বিবরণ। অধমের নিকট না এতটুকু ইলম আছে, আর না এতটুকু গভীর চিন্তা। অধম তো শুধু বিবরণদাতা। এ বিবরণ দ্বারা আমার উদ্দেশ্য শুধু এ হাকীকত প্রকাশ করা যে, সাহাবায়ে কিরামের শেষ সময় থেকেই ফুকাহায়ে ইসলাম এবং হাদীস বিশারদগণ শরঈ মাসায়েলের যাচাই

বাচাই, তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সুক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে গবেষণা অব্যাহত রেখেছেন। তাঁরা ছিলেন ইখলাসের শীর্ষ নমুনা। ইসলাম প্রেমিক এবং উলূমে নববিয়ার সহায়ক এসব আলিম কোন মশহুর ও গ্রহণযোগ্য মনীষীরও দীনী ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপ করেননি। অবশ্য তাঁরা সমালোচনার ক্ষেত্রেও অবমাননামূলক কথাবার্তা ও আচরণ থেকে সম্পূর্ণ পরহেয করেছেন। স্বয়ং ইমাম বুখারী র. স্বীয় উস্তাদগণের উস্তাদ ইমামুল আইম্মা ইমাম আবু হানীফা র.-এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি। সহীহ

বুখারীতে বিভিন্ন স্থানে قال بعض الناس বাক্য ব্যবহার করেছেন। যদিও এর মূল কারণ ছিল ইমাম আজম র.-এর প্রকৃত মাযহাব সম্পর্কে অনবহিতি ও ভুলবুঝাবুঝি।

নিঃসন্দেহে সহীহ বুখারী আল্লাহর কিতাবের পর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কিন্তু এর দ্বারা এই ভুলবুঝাবুঝি যেন কখনো না হয় যে, এর সবগুলো হাদীস সহীহ, এর কোন বর্ণনাকারী সম্পর্কে কোন সমালোচনা নেই। বরং উদ্দেশ্য হল, অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের তুলনায় বুখারী শরীফে দুর্বল হাদীস নেহায়েত কম। তাছাড়া আরেকটি বিষয় মনে রাখা উচিৎ যে, ইমাম বুখারী র.-এর শিরোনামগুলো এবং এগুলোর উৎসারণ কেউ বিশুদ্ধতম বলেননি এবং না এর মকবূলিয়ত রয়েছে। অন্যথায় তিনিও অনুসরনীয় ইমামগনের অন্তর্ভূক্ত হতেন। এ সব মানবিক অপরিপক্কতা সত্ত্বেও ইমাম বুখারী র.কে আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস বলা সঠিক। ইমাম সাহেব সহীহ বুখারী সংকলন করে ইসলামের মহা সেবা করেছেন। মুসলমানদের উপর ইমাম বুখারী র.-এর বিরাট এহসান। আল্লাহ তা'আলার নিকট দো'আ করছি, আল্লাহ তাঁর দরজা বুলন্দ করুন। আমাদেরকে বুখারীর হাদীসগুলোর আনওয়ার ও বরকত দ্বারা উপকৃত করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ

সহীহ বুখারীর গ্রহণযোগ্যতা ও মকবূলিয়তের এটিও একটি স্পষ্ট প্রমাণ যে, হাদীসগ্রন্থাবলীতে সবচেয়ে বেশি ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ হয়েছে সহীহ বুখারীর। কাশফুজ জুনূনে হাজী খলীফা র. ১০১২ হিজরী পর্যন্ত ৫০টি শরাহ তথা ব্যাখ্যাগ্রন্থের আলোচনা করেছেন। এরপর প্রতি বছর এ ধারাবাহিকতা আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। আমার ধারণা আজ পর্যন্ত আরবী, ফার্সি, উর্দূ, (বাংলা) ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও অনুবাদের সংখ্যা নিশ্চয়ই এক শতাধিক হয়ে গেছে। সবগুলোর আলোচনা করা তো মুশকিল। শুধু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপ্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থের আলোচনা নিম্নে করা হল।

এতটুকু মনে রাখা উচিত যে, অতীত ও পরবর্তীকালের সমস্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা তিনটি ব্যাখ্যাগ্রন্থকে সর্বাধিক গ্রহনযোগ্যতা দান করেছেন। وذالك فضل الله يؤتيه من يشاء .

এ তিনটি ব্যাখ্যাগ্রন্থের আলোচনা ধারাবাহিকভাবে করা হল-

১. উমদাতুল কারী, প্রসিদ্ধ আইনী।

এটি হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী র.-এর সমকালীন (বরং উস্তাদ) শাইখুল ইসলাম আল্লামা বদরুদ্দীন আবু মুহাম্মদ মাহমূদ ইবনে আহমদ ইবনে মূসা -প্রসিদ্ধ আল বদরুল আইনী র.-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ। আল্লামা আইনী র. ১৭ই রমযান মুবারক ৭৬২ হিজরীতে আইন নামক স্থানে এ দুনিয়াতে জন্ম লাভ করেন। এ দিকে লক্ষ্য করেই তিনি আল্লামা আইনী রূপে প্রসিদ্ধ হন। আল্লামা আইনী র. উমদাতুল কারী নামক এই ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখতে আরম্ভ করেন ৮২১ হিজরী থেকে। জুমাদাল উলা ৮৪৭ হিজরীতে পচিশ খণ্ডে এটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। বর্তমানে ১২ খণ্ডে এটি পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলার লাখ লাখ শুকরিয়া, তাঁর অনুগ্রহে পাকিস্তানে নেহায়েত উত্তম কাগজে এটি ছাপা হয়েছে।

২. ফাতহুল বারী। এটি হাফিজ শিহাবুদ্দীন আবুল ফযল আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আসকালানী র. (ওফাত ৮৫২ হিজরী) -এর রচিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ। তিনি হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী শাফিঈ নামে সুপ্রসিদ্ধ। তিনি শাবান ৭৭৩ হিজরীতে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সহীহ বুখারীর বিশাল ব্যাখ্যাগ্রন্থ ৮১৭ হিজরীতে ফাতহুল বারী নামে লিখতে আরম্ভ করেন। ৮৪২ হিজরীতে তিনি এটি পরিপূর্ণ করেন। বর্তমানে ১৪ খণ্ডে এটি রয়েছে।

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী ও আল্লামা আইনী র.-এর মধ্যে সমসাময়িকতার দৃষ্টিভঙ্গি থাকত। আল্লামা আইনী র. জামি' মুআয়্যিদীর শাইখুল হাদীস ছিলেন এবং উক্ত গম্বুজে বসে হাদীসের দরস দিতেন। এই জামি' মুআয়্যিদীর একটি মিনারা পুরোনো ও জরাজীর্ণ হয়ে ঝুকে পড়েছিল। এর ইমারতের সংস্কারের জন্য এটিকে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়। তখন হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী র. নিম্নোক্ত কাব্যগুলো পাঠ করেন-

لجامع مولانا المؤيد رونق ÷ منارته بالحسن تزهو وبالزين

تقول وقد مالت عليهم تمهلوا ÷ فليس على حسنى اضر من العين

'জামি' মুআয়্যিদ বড়ই রওনকপূর্ণ। এর মিনারা নেহায়েত সুন্দর ও সুদর্শন। এটি ঝুকার সময় জবানে হালে বলছিল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমার সৌন্দর্যের জন্য আইন তথা বদনজর অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর কোন কিছু নেই।'

এতে হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী র. আইন তথা বদনজর দ্বারা আল্লামা আইনী র.-এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

আল্লামা আইনী র. এ সব কাব্য শুনে হাফিজ আসকালানী র.-এর নিকট নিম্নোক্ত উত্তর পাঠান-

منارة كعروس الحسن قد حليت ÷ وهدمها بقضاء الله والقدر

قالوا اصيبت بعين قلت ذا غلط ÷ ما آفة الهدم الا خسة الحجر

মিনারা নববধুর ন্যায় সুদর্শন ও সুন্দর ছিল। এটি পড়েছে তাকদীর তথা আল্লাহর ফয়সালার কারণে। লোকজন বলেছে, এতে নজর লেগেছে। আমি বলেছি, এটা ভুল। এটা হাজার (পাথর অথবা ইবনে হাজারের) ভাঙ্গনের কারণে পড়ে গেছে।

আল্লামা আইনী এবং হাফিজ আসকালানী র. উভয় মহামনীষীই একই যমানায় বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। পার্থক্য এতটুকু যে, হাফিজ আসকালানী তখন আরম্ভ করেছেন। অর্থাৎ, হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী ৮১৭ হিজরীতে আরম্ভ করে ২৫ বছরে ৮৪২ হিজরীতে এটি সমাপ্ত করে ফেলেন। আর আল্লামা আইনী র. ৮২১ হিজরীতে শুরু করে ৮৪৭ হিজরীতে ২৬ বছরে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেন। যেহেতু হাফিজ আসকালানী র. চার বছর পূর্বে লিখতে আরম্ভ করেন এবং হাফিজ আসকালানী র. প্রতি সপ্তায় স্বীয় ছাত্রদেরকে সমবেত করতেন এবং পূর্ণ সপ্তাহের লিপিবদ্ধ পাণ্ডুলিপি নিজের বিশেষ ছাত্র বুরহান ইবনে আখযারকে দিতেন। তিনি সবাইকে শুনাতেন এবং সবাই কপি করে নিতেন। সে বুরহান ইবনে আখযার থেকে হাফিজ আসকালানী র.-এর ব্যাখ্যা আল্লামা আইনী র. ধারস্বরূপ নিয়ে দেখে ফেলতেন। অতঃপর স্বীয় ব্যাখ্যাগ্রন্থে বিভিন্নস্থানে মত খণ্ডন করতেন। যখন আল্লামার শরাহ পূর্ণাঙ্গ হয়ে জনসাধারণের সামনে আসে, তখন সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। এরপর হাফিজ আসকালানী র. আল্লামা আইনী র.-এর প্রশ্নাবলীর উত্তরে 'ইনতিকাযুল ইতিরায' নামে একটি গ্রন্থ লিখতে আরম্ভ করেন। কিন্তু জীবন সাঙ্গ হয়ে যায়। কিতাব সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি ওফাত লাভ করেন।

মোটকথা, এদুটি হল, বুখারী শরীফের বিশাল ব্যাখ্যাগ্রন্থ। যদিও উপকারিতা, সুখ্যাতিসুক্ষ্ম বিষয় মা'আনী ও বয়ানের দিকে লক্ষ্য করলে উমদাতুল কারী প্রধান।

৩. ইরশাদুস সারী। এটি হল, আল্লামা আবুল আব্বাস শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ খতীব কাসতাল্লানীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এতে ফাতহুল বারী ও উমদাতুল কারী থেকে সহায়তা গ্রহন করা হয়েছে। যদিও মূল উৎস ফাতহুল বারী, তা সত্ত্বেও এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি ছাত্রদের জন্য খুবই উপকারী। প্রথমে এটি দশ

খণ্ডে বেরিয়েছিল। বর্তমানে বৈরুত থেকে নেহায়েত উত্তম কাগজে ১৫ খণ্ডে আসছে। এই কপিটি আমার সামনে আছে।

আল্লামা কাসতাল্লানী র.-এর জন্ম ৮৫১ হিজরীতে, ওফাত শুক্রবার ৭ই মুহাররমুল হারাম, ৯২৩ হিজরীতে।

৪. তাইসীরুল কারী। এটি ফার্সী ভাষায় রচিত চার খণ্ডে লিখিত। সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী র.-এর সাহেবযাদা হযরত শায়েখ নূরুল হক সাহেব র.-এর সুনিপুণ রচনা এবং খুবই উপকারী। জানতে পেলাম, পাকিস্তানে এটি ছাপা হয়েছে।

৫. লামিউদ দিরারী। এটি কুতবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী র.-এর বক্তৃতাসমগ্র।

হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া র. এটি বিন্যস্ত করেছেন। এটির আরো সংস্কার করে সুন্দর রূপ দান করেছেন হযরত মাওলানা যাকারিয়া মুহাজিরে মাদানী সাহেব র. -সাবেক শাইখুল হাদীস মাদরাসা মাজাহিরুল উলূম সাহারানপুর। এটি শুধু হাদীসের ছাত্রদের জন্যই নয়, বরং মুহাদ্দিসীনের জন্যও উপকারী।

গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা

কাযী আবুল আব্বাস ওয়ালীদ ইবনে ইবরাহীম যখন রাই-এর বিচারপতি পদ থেকে অপসারিত হন, তখন স্বয়ং তার বর্ণনা অনুযায়ী নিজের মধ্যে ইলমে হাদীসের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, তখন আমি ইমাম বুখারী র.-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিজের উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ করি। আমি আবেদন করি আমার প্রতি তাওয়াজ্জুহ দানের। তখন তিনি ইরশাদ করলেন- প্রিয় বৎস! কোন কাজ ততক্ষন পর্যন্ত আরম্ভ করো না, যতক্ষন তার সীমা ও পরিমাণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ না কর। আমি আরয করলাম, হযরত! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে জাযায়ে খায়ের দিন, আমি যে উদ্দেশ্য আপনার সামনে পেশ করলাম সেটির অর্থাৎ, ইলমে হাদীসের সীমা ও পরিমাণ আপনি বলে দিন। তখন ইরশাদ করলেন-

اعلم ان الرجل لايصير محدثا كاملا فى حديثه الا بعد ان يكتب اربعًا مع اربع كاربع مثل اربع فى اربع عند اربع على اربع عن اربع لاربع و ابتلى باربع فاذا صبر على ذلك اكرمه الله تعالى فى الدنيا باربع واثابه فى الاخرة باربع .

অর্থাৎ, মনে রেখো, এ চারটি জিনিস ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ মুহাদ্দিস হতে পারে না। আর যখন এ বারটি রুবাঈ (চারটি করে বিষয়) অর্থাৎ, ৪৮ টি বিষয় কোন ব্যক্তি পরিপূর্ণ করে ফেলে, এগুলো সে লাভ করে, তখন তার জন্য চারটি জিনিস সহজ হয়ে যায়, অর্থাৎ, তার দৃষ্টিতে ইলমের মুকাবিলায় সেসব জিনিস তুচ্ছ হয়ে যায় এবং চারটি জিনিস দ্বারা তার পরীক্ষা হয়ে। অতঃপর যে ১৪টি রুবাঈ তথা ৫৪টি বিষয়ের উপর ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়াতে চারটি নেয়ামত দ্বারা ভূষিত করবেন এবং আখিরাতে চারটি নেয়ামত দান করবেন।

বিচারপতি ওয়ালীদ র. বলেন, এতদশ্রবণে আমি আরয করলাম, আপনি এর ব্যাখ্যা দিয়ে দিন। তখন ইমাম বুখারী র. সে রুবাঈসমূহের ব্যাখ্যা দেন।

১. ان يكتب اربعا চারটি জিনিস লিখবে-

১. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস সমূহ

২. সাহাবায়ে কিরামের রেওয়ায়াত ও এগুলোর সংখ্যা

৩. তাবিঈনের রেওয়ায়াত ও তাদের জীবনী

৪. পরবর্তী উলামায়ে কিরামের রেওয়ায়াত ও ইতিহাস।

২. مع اربع চারটি জিনিস সহকারে লিখবে-

১. বর্ণনাকারীদের নাম ২. তাদের উপনাম ৩. তাদের ঠিকানা ৪. তাদের যমানা তথা জন্ম ও মৃত্যু তারিখ।

৩. كاربع চারটি জিনিসের ন্যায়-

১. যেমন খুৎবা অর্থাৎ, বক্তব্যের সাথে আল্লাহর হামদ

২. উসিলা সহকারে দো'আ ৩. সূরার সাথে বিসমিল্লাহ ৪. নামাযের সাথে তাকবীর।

৪. مثـــل اربـــع চারটি জিনিসের মত- ১. মুসনাদসমূহ ২. মুরসালসমূহ ৩. মাওকূফসমূহ ৪. মাকতূ'সমূহ।

৫. فى اربع চারটি অবস্থায়- ১. শৈশবে ২. যৌবনে ৩. পরিনত বয়সে ৪. বার্ধক্যে।

৬. عند اربع চারটি সময়ে- ১. অবসর সময়ে ২. ব্যস্ততার সময়ে ৩. অস্বাচ্ছন্দে ৪. সুখে-স্বাচ্ছন্দে।

৭. باربع চারটি স্থানে- ১. পাহাড়ে ২. সমুদ্রে ৩. শহরে ৪. ময়দানে-জঙ্গলে।

৮. عـلى اربـع চারটি জিনিসের উপর- ১. পাথরে ২. চারায় ২. চামড়ায় ৩. হাড্ডিতে, যখন কাগজ সহজলভ্য না হয়।

৯. عـن اربـع চার জনের কাছ থেকে- ১. বড়দের কাছ থেকে ২. সমবয়সীদের কাছ থেকে ৩. ছোটদের কাছ থেকে ৪. পিতার গ্রন্থ থেকে। তবে শর্ত হল, এটি স্বীয় পিতার লেখা এর দৃঢ়বিশ্বাস থাকতে হবে।

১০. لاربـــع চারটি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে- ১. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ২. আল্লাহর কিতাবের অনুকূল হলে তার উপর আমল করার উদ্দেশ্যে ৩. ছাত্র এবং ইলমপ্রিয় লোকজনের মাঝে প্রসারের উদ্দেশ্যে ৪. সংকলনের জন্য। যাতে পরবর্তীদের জন্য তা স্মারক হয়।

এ ১০টি রুবাঈ তথা চল্লিশটি বিষয় দুটি রুবাঈ তথা আটটি বিষয় ছাড়া পূর্ণ হবে না।

১১. الا بـــاربـــع চারটি বিষয় নিম্নোক্ত চারটি বিষয় ছাড়া পূর্ণ হবে না- ১. লিপি পদ্ধতি জানা ২. অভিধান বিষয়ক জ্ঞান ৩. নাহব সংক্রান্ত জ্ঞান ৪. সরফ সংক্রান্ত জ্ঞান।

১২. مع اربع আল্লাহ প্রদত্ত চারটি জিনিসের সাথে- ১. ক্ষমতা ২. বিশুদ্ধতা ৩. আগ্রহ ৪. স্মরণশক্তি।

যখন এ ১২টি রুবাঈ অর্থাৎ, ৪৮টি বিষয় অর্জিত হবে, তখন এ চারটি জিনিস তার দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে যায়। অর্থাৎ, ইলমের তুলনায় এ চারটি বিষয় তুচ্ছ মনে হয়।

১৩. هان عليه اربع চারটি জিনিষ তুচ্ছ হয়ে যায় - ১. স্ত্রী ২. সম্পদ ৩. সন্তান-সন্ততি ৪. বাড়ি-ঘর।

১৪. وابتـلـى بـاربـع চারটি বিষয়ে পরীক্ষা হয়- ১. শত্রুদের আনন্দ অর্থাৎ, শত্রুতা ২. বন্ধুদের তিরস্কার ৩. মূর্খদের ভর্ৎসনা ৪. আলিমদের হিংসা দ্বারা।

১৫. اكـرمـه الله عز و جل فى الدنيا باربع আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়াতে চারটি নেয়ামতে ভূষিত করবেন- ১. স্বল্পেতুষ্টির সম্মান ২. প্রভাব ৩. ইলমের স্বাদ ৪. চিরন্তন জীবন।

১৬. واثابه في الاخرة باربع আল্লাহ তা'আলা আখিরাতে চারটি নেয়ামত দান করবেন- ১. সংশ্লিষ্টদের যে কারো জন্য সুপারিশ করতে চাইবে, তার জন্য সুপারিশ করতে পারবে ২. যেদিন আরশের ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন আরশে ইলাহীর ছায়া পাবে ৩. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউযে কাউসার থেকে যাকে ইচ্ছা পান করাতে পারবেন ৪. জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে নবীগণের নৈকট্য নসীব হবে।

এরপর ইমাম বুখারী র. বলেন, আমি স্বীয় উস্তাদগণের কাছ থেকে যে কথাগুলো বিক্ষিপ্ত আকারে শুনেছি, সেগুলো তোমাকে বলে দিলাম। এবার তোমার মর্জি, ইলমে হাদীস অর্জন কর অথবা তার ইচ্ছা পরিহার করে কিছু মাসায়েল ও আহকাম শিখ।

বিচারপতি ওয়ালীদ বলেন, এ বক্তব্য আমাকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলে। আমি স্বসম্ভ্রনে গরদান নিচু করে চিন্তা করতে লাগলাম। যখন ইমাম বুখারী র. আমার এই চিন্তা ধরণ দেখলেন, তখন বললেন, যদি তোমার মধ্যে এ সব কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা না থাকে, তবে তুমি ফিকহ অর্জন কর। ইলমে ফিকহ ঘরে বসে অর্জন করা সম্ভব। এর জন্য দূরদুরান্তের সফর, বিভিন্ন শহরে ঘোরা, নদী ও সমুদ্র পাড়ি দেয়ার প্রয়োজন নেই। অথচ ফিকহও হাদীসেরই ফল এবং পরকালে একজন ফকীহের সওয়াব মুহাদ্দিস থেকে কম নয়। না ফকীহের সম্মান মুহাদ্দিস থেকে কম।

কাযী ওয়ালীদ বলেন, এতদশ্রবণে আমি হাদীস অন্বেষণের ইচ্ছা পরিহার করি, ফিকহ্ অর্জনে রত হই। এক পর্যায়ে আমি এ বিষয়ে অগ্রনী হয়ে যাই।

নিঃসন্দেহে ইমাম বুখারী র. একজন সুমহান মুহাদ্দিস ছিলেন, আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ছিলেন। কিন্তু ফিকহে তার মর্যাদা আইম্মায়ে মুজতাহিদীন বিশেষতঃ অনুসরনীয় ইমামগণের তুলনায় কম। এজন্য ফিকহের ব্যাপারে তাঁর উক্তি প্রমাণ নয়।

পরিস্কার ও সোজা কথা হল, ফিকহের বুনিয়াদ তিনটি মূলনীতির উপর- ১. আল্লাহর কিতাব ২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত তথা হাদীস ৩. ইজমায়ে উম্মত। এটা হল, মৌলিক বিষয়। এবার চিন্তার বিষয় হল, ফিকহের বুনিয়াদ যে সব জিনিসের উপর সেগুলোর একটি হল, হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বস্তুতঃ ইমাম বুখারী র.-এর উক্তি অনুযায়ী ইলমে হাদীসের জন্য এতগুলো রুবাঈর প্রয়োজন, তাহলে কিতাবুল্লাহর জন্য কতগুলোর প্রয়োজন! অতঃপর ইজমায়ে উম্মতের জন্য আরো কতগুলোর প্রয়োজন! যেহেতু মৌলিক বিষয় জানা হল যে, ফিকহের বুনিয়াদগুলোর একটি অংশ হল হাদীস, তবে পূর্ণটির কি হাল হবে!

ع قیاس کن زگلستان من بہار مرا .

বুঝা গেল, ইমাম বুখারী র. কর্তৃক ফিকহকে সহজ বলার কারণ শুধু এটা যে, তিনি ফিকহের পূর্ণ মিষ্টতা লাভ করতে পারেননি। কিন্তু কিছু চাশনীর স্বাদ উপভোগ করেছেন। যার ফলে এতটুকু বলতে বাধ্য হয়েছেন-

ليس ثواب الفقيه دون ثواب المحدث في الاخرة ولا عزة باقل من عز المحدث.

قسطلاني ٣٦/١ .

অবশেষে এ ইরশাদের কি অর্থ? যখন আল্লাহ তা'আলার মূলনীতি হল-

اجوركم على نصبكم ÷ العطايا بقدر البلايا

এজন্য ইমাম তিরমিযী র. বলেন-

وهم (اى الفقهاء) اعلم بمعانى الحديث

অর্থাৎ, হাদীসের আসল অর্থ যথার্থ মর্ম ইসলামী আইনবিদগণ সর্বাধিক জানেন। -তিরমিযী ঃ ১/১১৮।

দুধপান সংক্রান্ত মাসআলা

ইমাম বুখারী র.-এর উৎসারিত মাসআলাগুলোর মধ্য থেকে একটি হল, যদি ছেলে-মেয়ে দুধপানের বয়সে কোন বকরীর দুধ পান করে, তবে উভয়ের দুধসম্পর্ক প্রমাণিত হয়ে যাবে। যার ফলে বুখারার উলামায়ে কিরামের মধ্যে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। অথচ ইমাম আবু হাফস কবীর র. ইমাম বুখারী র.কে মাসআলা উৎসারণ ও ইজতিহাদ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আপনি মাসায়েল বাতলাবেন না, আপনার শাস্ত্র হল হাদীস। আপনি হাদীসের দরস দিন। কিন্তু ইমাম বুখারী র. ইমাম আবু হাফস র.-এর উপদেশ গ্রহণ করেননি। এরূপ ফতওয়া দিলেন, যার ফলে বুখারার উলামায়ে কিরাম ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। এ জন্য আল্লামা ইবনে হুমাম র. লিখেন-

ونقل ان الامام محمد بن اسماعيل البخارى صاحب الصحيح افتى فى بخارى بثبوت الحرمة بين صبيين ارتضعا شاة فاجتمع علماؤها عليه وكان سبب خروجه منها .

-ফাতহুল কাদীর ঃ৩/৩২০ -কিতাবুর রিযা।

কিফায়া গ্রন্থকার মাওলানা জালালুদ্দীন র. তাই লিখেন-

وكان محمد بن اسماعيل رحمه الله صاحب الحديث يقول تثبت به حرمة الرضاع فانه دخل بخارا فى زمن ابى حفص الكبيرؒ وجعل يفتى فقال له الشيخ لا تفعل فليس هنالك .

অর্থাৎ, আপনি ফতওয়া দানের কাজ করবেন না। কারণ, আপনি এর যোগ্য নন।

فابى ان يقبل نصيحته حتى استفتى عن هذه المسئلة اذا ارضع صبيان بلبن شاة فافتى بثبوت الحرمة فاجتمعوا واخرجوا من بخارا بسبب هذه الفتوى .

কারো ধারণা হতে পারে যে, এ ফতওয়ার সম্বন্ধ শুধু হানাফী ফুকাহায়ে কিরাম ইমাম বুখারী র.-এর দিকে করেছেন। অথচ এ ধারণা সুনিশ্চিত ভুল। কাযী হোসাইন ইবনে মুহাম্মদ মালিকী র.ও তা লিখেছেন।

-দ্রষ্টব্য ঃ তারীখুল খামীস ঃ ২/ ৩৮২।

তাছাড়া আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী শাফিঈ র.-এর আলখায়রাতুল হিসানে ৭০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

ولله در القائل " انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون"

মোটকথা, ইমাম বুখারী র. আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ছিলেন, কিন্তু ফিকহের ব্যাপারে তিনি অবশ্যই দুর্বল ছিলেন। বস্তুতঃ প্রতিটি শাস্ত্রের জন্যই আলাদা আলাদা মনীষী থাকেন।

ভাবনার বিষয় হল, ইমাম তিরমিযী র. ইমাম বুখারী র.-এর বিশিষ্ট ছাত্র বরং খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। কিন্তু ইমাম তিরমিযী তাঁকে আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের কাতারে অন্তর্ভূক্ত করেননি। অতএব, বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার।

সনদ ধারা

সনদ ধারা হল, উম্মতে মুহাম্মদিয়ার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ ধারা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে পাওয়া যায় না। চাই সেটি আসমানী ধর্ম হোক অথবা অন্য ধর্ম। তাদের কোন বিষয়েই মুত্তাসিল সনদে উল্লেখ করে না। গোটা বিশ্বের কোন ধর্মে এ বিষয়টি পাওয়া যায় না যে, তারা স্বীয় রাসূল অথবা অনুসরনীয় ব্যক্তির বাণী কর্ম ও জীবনীকে মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেন বা করতে পারেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তার সাথে যে মুসলমানদের ঈমানী ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সম্পর্ক অন্য উম্মতসমূহের মাঝে এর নজির পাওয়া যায় না। অতীত উম্মতদের এর নজির তালাশ করা মানে পাহাড় খোদাই করে খড়কুটা বের করা। আর এটা হওয়াই উচিত ছিল, যেটি নিঃশেষ হওয়ার জন্য এসেছিল, সেটি সময়ের সাথে সাথে শেষ হয়ে গেছে। না তার হেফাজত জরুরী ছিল , না সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে তার প্রতিশ্রুতি হয়েছিল। এই রিসালত সর্বশেষ রিসালত। এটি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। এটা আল্লাহর ফয়সালা। এজন্য এর হেফাজতের ওয়াদাও হয়েছে-

"اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ"

কুদরতের পক্ষ থেকে এরূপ মজবুত ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে, যাতে কোন সময় কারো আসল দীন অন্বেষণে ব্যর্থতার ওযর পেশ করার অবকাশ না হয়।

মোটকথা, সনদ ধারা শুধু এই উম্মতেরই বৈশিষ্ট্য। অমুসলিম ঐতিহাসিক তত্ত্বজ্ঞানীরাও এর স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। এ কারণে হাদীস গ্রন্থাবলীতে রেওয়ায়াতগুলো সনদ সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। এর তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য নেহায়েত আজীমুশ শান মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। অতঃপর মাশায়েখে হাদীসের এই নীতি অব্যাহত রয়েছে যে, তাঁরা কিতাবে স্বীয় সনদগুলো ততটুকু পর্যন্ত বর্ণনা করেন, যতটুকু পর্যন্ত প্রসিদ্ধ ও ছাপা নেই। সাধারণতঃ হাদীসের উস্তাদগণ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী র. পর্যন্ত স্বীয় সনদ বর্ণনা করেন। কারণ, তৎপরবর্তী সনদগুলো ছাপা আছে। স্বয়ং হযরত শাহ সাহেব র. "الارشاد الى امهات الاسناد" নামে স্বতন্ত্র একটি পুস্তিকায় স্বীয় সমস্ত সনদ বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে হযরত শাহ আবদুল গণী র.-এর 'اليانع الجنى فى اسانيد الغنى' নামক গ্রন্থ আরব ও অনারবে সুপ্রসিদ্ধ। -দ্রষ্টব্য ঃ জামিউদ দিরারী।

আমার সনদ

আমি প্রাথমিক শিক্ষা স্বদেশে দীনি মকতব চিলমিলে অর্জন করার পর আরবীর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করি মাদরাসা আশরাফুল উলূম বড়কাটরা চক বাজার ঢাকায়। সেখানে চার বছর পড়ার পর কয়েক বছর কোন অপারগতার কারণে শিক্ষা ধারাই বন্ধ থাকে। অতঃপর কয়েক বছর বিভিন্ন মাদরাসায় লেখা-পড়ার পর ১৯৪৭ ইংরেজিতে আজহারুল হিন্দ দারুল উলূম দেওবন্দে পৌঁছি। চার বছর সেখানে থেকে দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করি। বুখারী ১ম ও ২য় খণ্ড এবং তিরমিযী ১ম খণ্ড শাইখুল আরব ওয়াল আজম হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী র.-এর নিকট পড়ার সৌভাগ্য হয়। তিরমিযী ২য় খণ্ড, শামায়েলে তিরমিযী ও পূর্ণ আবু দাউদ শরীফ শায়খুল আদব ওয়াল ফিকহ হযরত মাওলানা ইযায আলী সাহেব র.-এর নিকট অধ্যয়ন করি। পূর্ণাঙ্গ মুসলিম শরীফ জামিউল মানকূল ওয়াল মা'কূল হযরত আল্লামা ইবরাহীম বলিয়াবী র.-এর নিকট পড়ি। নাসাঈ শরীফ অধ্যয়ন করি হযরত মাওলানা ফখরুল হাসান র.-এর নিকট।

এবার পূর্ণ সনদ মুসনিদে হাদীস হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী র. পর্যন্ত লক্ষ্য করুন।

قال العبد الضعيف محمد عثمان غنى بن مولوى عبد الله الديقى حدثنا شيخ الاسلام السيد حسين احمد المدنى قال حدثنا شيخ الهند محمود حسن الديوبندى عن شيخه الحجة العارف محمد قاسم النانوتوى وعن شيخه المحدث الفقيه الشيخ رشيد احمد الكنكوهى كلاهما عن المحدث الشيخ عبد الغنى المجددى الدهلوى وعن الشيخ احمد على السهارنفورى وعن الشيخ محمد مظهر النانوتوى وعن الشيخ القارى عبد الرحمن الفانيفتى وهؤلاء الاربع عن الشيخ المحدث محمد اسحاق الدهلوى عن جده لامه المحدث الحجة الشاه عبد العزيز الدهلوى عن والده الامام الشاه ولى الله الدهلوى واسانيده الى اصحاب السنن مذكورة فى رسالته 'الارشاد الى مهمات علم الاسناد.

سند المترجم غفر له : يقول العبد الضعيف نعمان أحمد بن نور الحق حدثنا الشيخ نصير أحمد خان رئيس المدرسين بجامعة أزهر الهند، دار العلوم بديوبند، المجلد الأول من صحيح البخاري والشيخ عبد الحق الموقر الأعظمي المجلد الثاني نا شيخ الاسلام حسين أحمد المدني نا شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي نا قاسم العلوم والخيرات الشيخ محمد قاسم النانوتوي نا الشاه عبد الغني المجددي نا الشاه محمد اسحاق الدهلوي نا الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي نا مسند الهند الشاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي نا الشيخ أبو طاهر محمد بن ابراهيم المدني نا أبي الشيخ ابراهيم الكردي نا الشيخ أحمد القاشاشي نا الشيخ أبو المواهب أحمد بن عبد القدوس الشناوي نا شمس الدين محمد بن أحمد الرملي نا شيخ الاسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري نا الشيخ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر كناني العسقلاني نا الشيخ ابراهيم بن أحمد التنوخي نا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار نا سراج الحسين بن المبارك الحنبلي الزبيدي اليمني نا أبو الوقت عبد الأول بن عيسي بن شعيب الجزري الهروي نا أبو الحسن عبد الرحمن بن مظفر بن محمد داود الداودي نا أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي نا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري نا ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله الباري نا المكي بن ابراهيم نا يزيد بن عبيد عن سلمة هو ابن الاكوع رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي مالم اقل فليتبوأ مقعده من النار.

اسانيد اخرى : حدثنا المحدث الشهير عبد العزيز رح صحيح البخاري مكملا بجامعة هاتهزاري، وحصل لي الاجازة للكتب الستة عن الشيخ أحمد شفيع مدير دار العلوم هاتهزاري مد ظله، وعن الشيخ يونس خليفة شيخ الحديث زكريا رح بسهارن بور وعن الشيخ انظر شاه الكشميري وأسانيدهم مشهورة، مكتوبة.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اكرم الاولين والاخرين وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته اجمعين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين!

امّا بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار وبالسند المتصل منّا الى الامام الحافظ الحجة امير المؤمنين فى الحديث ابى عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفى البخارى رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين انه قال :

بسم الله الرحمن الرحيم

ইমাম বুখারী র. আল্লাহর কিতাবের পর বিশুদ্ধতম গ্রন্থ সহীহ বুখারীর সূচনা করেছেন বিসমিল্লাহ দ্বারা। কারণ, মুসহাফে উসমানীতে সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের সর্বসম্মতিক্রমে সর্বপ্রথম بسم الله الرحمن الرحيم লেখা হয়েছে। তাছাড়া এতে রয়েছে, ইরশাদে নববীর অনুসরণ। কারণ, হাদীস শরীফে আছে-

كل امر ذى بال لم يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع

এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিসমিল্লাহ দ্বারা প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত চিঠিগুলোর সূচনাতেও বিসমিল্লাহ রয়েছে। প্রতি দুটি সূরার মাঝেও ব্যবধানকারী বিসমিল্লাহ রয়েছে। প্রতিটি দীনি গ্রন্থের সূচনাতেও এরই বহিঃপ্রকাশ। অতঃপর সহীহ বুখারীতে যতটা বিসমিল্লাহর প্রতি গুরুত্বারোপ রয়েছে, ততটা প্রবল ধারনা অনুযায়ী অন্য কোন গ্রন্থে নেই। আমি বুখারী শরীফে গননা করে ১৩২বার بسم الله الرحمن الرحيم পেয়েছি।

বর্বরতা যুগে লোকজনের রীতি ছিল, তারা প্রতিমার নামে নিজেদের কাজকর্ম শুরু করত। জাহিলিয়্যতের এই কুপ্রথা মিটানোর জন্য কুরআনে হাকীমের সর্বপ্রথম এই আয়াত জিবরাঈল আ. নিয়ে এসেছেন। তাতে আল্লাহর নামে কুরআন মজীদ শুরু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে- اقرأ باسم ربك

আল্লামা সুয়ূতী র. বলেছেন, কুরআন মজীদ ছাড়া অন্যান্য আসমানী কিতাবও بسم الله الرحمن الرحيم দ্বারা শুরু করা হয়েছে। কোন কোন আলিম বলেছেন- بسم الله الرحمن الرحيم কুরআন এবং উম্মতে মুহাম্মদিয়ার একটি বৈশিষ্ট্য। উভয় উক্তির মাঝে সামঞ্জস্য বিধান পদ্ধতি হল, আল্লাহর নামে আরম্ভ করা তো সব আসমানী কিতাবের মধ্যেই পাওয়া যায়। এটি একটি যৌথ বিষয়। কিন্তু بسم الله الرحمن الرحيم হল কুরআনে হাকীমের বৈশিষ্ট্য। যেমন- কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও শুরুতে প্রতিটি কাজ আল্লাহর নামে শুরু করার জন্য باسمك اللهمّ বলতেন ও

লিখতেন। যখন بسم الله الرحمن الرحيم আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন এটাকেই অবলম্বন করেন এবং চিরকালের জন্য এই আদর্শ চালু হয়।

মোটকথা, بسم الله মূলতঃ রাজকীয় সীল। নিয়ম হল, যখন সরকারের নিকট কোন জিনিস পছন্দ হয়, তখন রাজকীয় সীল লাগিয়ে সেটিকে ট্রেজারিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। অতঃপর তার সংরক্ষন এরূপভাবে করা হয়, যেরূপভাবে রাজকীয় ট্রেজারির তত্ত্বাবধান হয়। অতএব, মুমিনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন তার প্রতিটি কাজের সূচনা بسم الله দ্বারা করে। যাতে সেটি আল্লাহর নিকট মকবূল এবং বরকতময় হয়ে যায়।

লিপি পদ্ধতি

اسقطت الالف لكثرة استعمالها وطولت الباء عوضا قال البغوى قال عمر بن عبد العزيز طولوا الباء واظهروا السين ودوروا الميم تعظيما لكتاب الله .

অর্থাৎ, মূলনীতির দাবী ছিল- باسم الله আলিফ সহকারে লেখা। কিন্তু প্রচুর ব্যবহারের কারণে আলিফ ফেলে দেয়া হয়েছে। এর পরিবর্তে বা লম্বা করে লেখা হয়েছে। আল্লামা বগবী র. বলেন, হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র. বলেছেন- আল্লাহর কিতাবের সম্মানার্থে বা কে লম্বা করো, সীন এর দাতগুলো স্পষ্ট করো, মীমকে গোলাকারে লেখা। কারণ, এভাবে লেখা সুন্দর হয়। শব্দের প্রতি গুরুত্বারোপ হয়, আবার সম্মান প্রদর্শনও হয়। -তাফসীরে মাজহারী ঃ ১/২।

তারকীব

বা হরফে জর, ইসম- মুযাফ, লফজ আল্লাহ- মওসূফ, রহমান- প্রথম সিফত, রহীম- দ্বিতীয় সিফত। মওসূফ সিফত মিলে ইসম মুযাফের মুযাফইলাইহ। উভয়টি মিলে জারের মাজরূর। জার মাজরূরের জন্য এরূপ কোন মুতাআল্লাক বের করতে হয়, যেটি জুমলা (বাক্য) হতে পারে। যেহেতু জার মাজরূর জুমলাও নয় আবার মুতাআল্লাক ছাড়া জুমলাও হতে পারে না এবং বা হরফের কোন মুতাআল্লাক উল্লেখ নেই। এজন্য তার মুতাআল্লাক হয়ত ইসম হবে, নয়ত ফে'ল। উভয় ছূরতে আম হবে, না হয় খাস। অতঃপর এ চারটি ছূরত আগে হবে অথবা পরে। মোট আটটি ছূরত হল। বসরীগণ বলেন, মুতাআল্লাক ইসমে মুকাদ্দাম অর্থাৎ, ابتدائى كائن بسم الله الخ। কূফীগণের মতে ফে'লে মুকাদ্দাম উহ্য আছে। মোটকথা, চাই কূফী হোন অথবা বসরী নাহবীদের মতে মুতাআল্লাক ইসম হোক, অথবা ফে'ল, তা আগে হবে। কারণ, আমিল মামূলের আগেই হয়ে থাকে।

কিন্তু ইবনে জারীর, ইবনে কাসীর, যমখশরী, কাযী বায়যাবী র. প্রমূখ তত্ত্বজ্ঞানীগণ ফে'লে খাস মুতাআখখিরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ, اصنف يا اقرأ يا آكل وغيره

একটি প্রশ্ন

হাদীসে আছে- كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو اجذم

আরেক রেওয়ায়াতে আছে - كل امر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد الله اقطع

এবার প্রশ্ন হল, ইমাম বুখারী র. স্বীয় মহান গ্রন্থ সহীহ বুখারী আল্লাহর হামদ দ্বারা কেন শুরু করলেন না?

উত্তর ঃ প্রথমত এই প্রশ্নই স্বীকার্য নয়। ইমাম বুখারী র. স্বীয় সুক্ষ্মদৃষ্টির আলোকে বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করে হামদুল্লাহর হাদীসের উপরও আমল করেছেন। কারণ, بسم الله الرحمن الرحيم এর মধ্যে الرحمن এবং الرحيم আছে। এদুটো আল্লাহ তা'আলার গুন। হামদ দ্বারা উদ্দেশ্যও আল্লাহ তা'আলার সুউঁচ্চ ও গুণসম্পন্ন সিফত প্রকাশ করা। স্পষ্ট বিষয় যে, এ উদ্দেশ্য بسم الله الرحمن الرحيم দ্বারা ভালরূপেই পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়। অতএব, প্রশ্নের অবকাশ নেই। আর যদি এ প্রশ্ন মেনে নেয়া হয়, তবে এর বিভিন্ন উত্তর বর্ণিত হয়েছে।

২. তন্মধ্যে বিশুদ্ধতম উত্তর হল, এ রেওয়ায়াতটি বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। কোন রেওয়ায়াতে বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরুর কথা উল্লেখিত হয়েছে। কোনটিতে হামদুল্লাহ দ্বারা, আর কোনটিতে রয়েছে যিকরুল্লাহ দ্বারা শুরুর কথা। ইমাম নববী র. তিনটি শব্দ সামনে রেখে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, উদ্দেশ্য হল, যৌথ বিষয় তথা আল্লাহর যিকির, চাই হামদুল্লাহ দ্বারা হোক অথবা বিসমিল্লাহ দ্বারা। এ জন্য ইমাম বুখারী র. বিসমিল্লাহকে যথেষ্ট মনে করেছেন।

এর সারনির্যাস এই বের হল যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু একটি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। প্রবল ধারণা সেটি হল- اسم الله يا ذكر الله-এর ব্যাপক শব্দ। যাতে হামদ এবং শাহাদতও অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। কারণ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহর যিকির দ্বারা সূচনা। অতএব, কোন কোন বর্ণনাকারী এটাকে হামদ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন, আর কেউ কেউ শাহাদত দ্বারা।

মোটকথা, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সূচনা যিকরুল্লাহ দ্বারা হওয়া উচিত। চাই যে কোন প্রকারেই হোক না কেন। তবে মাসনূন পদ্ধতি হল- খুৎবা ও বক্তৃতার সূচনা হামদুল্লাহ দ্বারা করা, আর চিঠি-পত্রের সূচনা বিসমিল্লাহ দ্বারা। কারণ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ নিয়ম এটাই ছিল।

আল্লামা যুরকানী র. শরহে মুআত্তায় বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল যা আমাদের তালাশ অন্বেষণের পর জানা গেল, তা হল খুৎবার সূচনা তিনি আল্লাহর হামদ দ্বারা, আর চিঠি-পত্রের সূচনা তিনি বিসমিল্লাহ দ্বারা করতেন। এ জন্য হিরাকলিয়াস প্রমূখের নামে চিঠি এবং হুদাইবিয়ার সন্ধিনামার সূচনা বিসমিল্লাহ দ্বারা করেছেন।

৩. কুরআন মজীদের প্রথম আয়াত হল- اقرأ باسم ربك এতে আল্লাহর নাম দ্বারা পড়ার নির্দেশ রয়েছে। এতে হামদের হুকুম নেই। অতএব, যেহেতু সহীহ বুখারী একটি গ্রন্থ, সেহেতু এর জন্য সংগত ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি-পত্র ও কুরআন মজীদের অনুসরণ করা।

৪. তাছাড়া যে কোন একটি দ্বারা কর্মসম্পাদনের ছুরতে শুধু বিসমিল্লাহ দ্বারা কর্ম সম্পাদন পদ্ধতি অব্যাহত আছে।

পূর্ববর্তী নবীগণের চিঠি-পত্রগুলোতেও বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ হত। কুরআন মজীদে হযরত সুলায়মান আ.-এর সংক্ষিপ্ত ও অর্থপূর্ণ চিঠিটির বিবরণ রয়েছে। এরূপ ভাষাপান্ডিত্য ও মর্যাদাপূর্ণ এবং শানশওকতপূর্ণ চিঠি নবী ছাড়া অন্য কেউ লিখেননি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

'انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ان لا تعلوا على وأتونى مسلمين'

এর কাছাকাছি হারুন রশীদের সে শানদার চিঠি যেটি তিনি রোমসম্রাট ইয়াকফূরের নামে লিখেছিলেন। (কোন কোন ইতিহাসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে নাকফূর) যখন তিনি জিযিয়া-কর দিতে অস্বীকার

করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমার পূর্বে মালিকা নিসওয়ানী (সম্রাজ্ঞী) দুর্বলতা ও অজ্ঞতার কারণে জিযিয়া-কর পরিশোধ করতেন। আমার চিঠি পৌঁছার পর সম্রাজ্ঞীপ্রদত্ত্ব সমস্ত সম্পদ তৎক্ষনাৎ ফেরত দিন, অন্যথায় আমার পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষনা।

হারুন রশীদ এ চিঠির পৃষ্ঠে উত্তর লিখেছেন-

من هارون امير المؤمنين الى يقفور كلب الروم قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة والجواب ما تراه لا ما تسمعه.

সে দিনই এক দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে তিনি তার মূলোৎপাটনের জন্য রওয়ানা করেন।

-ইরশাদুল কারী। সূত্র ঃ তারীখুল খুলাফা-সুয়ূতী র.।

৫. কেউ কেউ হামদ দ্বারা গ্রন্থ শুরু না করার কারণ বর্ণনা করেছেন যে, এই হাদীসের সনদ দুর্বল। তবে এ শান বুখারীর জন্য সংগত নয়। কারণ, ইমাম বুখারী র. প্রতিটি হাদীসের পূর্বে গোসল, দু রাকআত নফল এবং ইসতিখারার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। অথচ এসব বিষয় সংক্রান্ত কোন দুর্বল রেওয়ায়াতও না থাকলে ফাযায়েলের ক্ষেত্রে হামদ দ্বারা সূচনা দুর্বল সনদের কারণে পরিহার করা যুক্তিসংগত নয়।

তাছাড়া হাদীসের চাজনর মহামনীষী অর্থাৎ, হাফিজ ইবনে সালাহ, আবু আওয়ানা, ইবনে হাব্বান ও তাজুদ্দীন সুবকী র. এই হাদীসটিকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

৬. কেউ কেউ উত্তর দিয়েছেন, হামদ লিপিবদ্ধ করা শর্ত নয়। শুধু মৌখিক উচ্চারণই যথেষ্ট। খতীব র. জামি'য়ে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আহমদ র. হাদীস লেখার সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুবারক পর্যন্ত পৌঁছলে মৌখিক দুরূদ শরীফ পড়তেন, লিখতেন না।

-ফাতহুল বারী ঃ ১/৭।

গ্রন্থকারের গুরুত্বপূর্ণ সূচনা

گلہائے رنگارنگ سے ہے زینت چمن ÷ اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے -

স্পষ্ট বিষয়, বাগানে একই প্রকার ফুল-পত্র থাকলেও বাগান বাগানই। কিন্তু যদি বিভিন্ন প্রকার রংবেরংএর ফুল,পাতা থাকে, তবে উদ্যানের রওনক দ্বিগুন হয়ে যায়।

বড় বড় মুহাদ্দিসীনে কিরাম স্ব-স্ব গ্রন্থাবলীর সূচনা নিজ নিজ চিন্তা-ফিকির অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয় দিয়ে করেছেন। ইমাম বুখারী র. সহীহ বুখারী শুরু করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয় উৎসারণ করেছেন। যেমন- ইমাম মুসলিম র. সর্বপ্রথম সনদের বিষয়টি পেশ করেছেন। কারণ, দীনের ভিত্তি সুন্নতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর। আর সুন্নতে সহীহ ও দুর্বলের মাঝে ব্যবধান শুধু সনদের মাধ্যমে হতে পারে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক র. বলেন-

الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ماشاء

যদি মুকাদ্দামাকে সহীহ মুসলিম থেকে আলাদা মনে করা হয়, তবে বলা হবে ইমাম মুসলিম র. কিতাবুল ঈমান দ্বারা শুরু করেছেন। কারণ, একজন মুকাল্লাফের উপর সর্বপ্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ ফরয় হল ঈমান আনয়ন করা। এরই উপর সমস্ত আমল নির্ভরশীল। এটি ইজমাঈ বিষয় যে, ঈমান ছাড়া কোন ইবাদত ধর্তব্য নয় এবং কোন আমল জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হবে না।

ইমাম নাসাঈ, আবু দাউদ ও তিরমিযী র. প্রমূখ মনে করেছেন, আমাদের কিতাব ঈমানদারদের খেদমতে পেশ করা হচ্ছে। একজন মুমিনের দায়িত্বে সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ ফরয হল, নামায। এটি দীনের স্তম্ভ। এ জন্য নামাযের বিবরণ সর্বাগ্রে হওয়া উচিত। কিন্তু যেহেতু নামাযের জন্য শর্ত হল, পবিত্রতা - مفتاح الصلوة الطهور বস্তুতঃ শর্ত সে জিনিসের পূর্বে হওয়া জরুরী, যার জন্য এটি শর্ত করা হয়েছে। এ জন্য তারা স্ব-স্ব গ্রন্থাবলী পবিত্রতা অনুচ্ছেদ দ্বারা আরম্ভ করেছেন। ইমাম তাহাবী র.ও পবিত্রতা দ্বারাই কিতাবের সূচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর মনোযোগ এদিকেই ছিল যে, ছোট পবিত্রতা হোক বা বড়, অযু হোক অথবা গোসল প্রতিটির জন্য পানি প্রয়োজন। এজন্য পানির পবিত্রতা অপবিত্রতার বিষয়টিকে আগে এনেছেন।

ইমাম ইবনে মাজাহ র. সুন্নতের অনুসরণ দ্বারা কিতাব সূচনা করেছেন। কারণ, দীন হল সুন্নতের নাম। যদি সুন্নত-বিদআতের পার্থক্যই উঠে যায়, সুন্নতের সাথে বিদআতের সংমিশ্রণ ঘটে যায়, তাহলে দীনের হাকীকতই খতম হয়ে যাবে। তাছাড়া কুরআন মজীদের সেটিই গ্রহণযোগ্য হবে, যেটি বর্ণনা করবে সুন্নতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এরপর মানাকিবে সাহাবা তথা সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদার আলোচনা করেছেন। কারণ, তাদের মাধ্যমেই আমরা কুরআন পেয়েছি। অতএব, তাদের উপর নির্ভর করা জরুরী, যতক্ষন পর্যন্ত তাদের উপর আস্থা হবে না, ততক্ষন না কুরআনের উপর পূর্ণাঙ্গ ঈমান হতে পারে, না সুন্নতের উপর। ইমাম মালিক র. স্বীয় মুয়াত্তার সূচনা করেছেন নামাযের ওয়াক্তের বিবরণ দিয়ে। কারণ, নামাযের জন্য ওয়াক্ত হল একটি কারণ। ওয়াক্ত আসার পূর্বে না নামায ফরয হয়, না সহীহ হয়। ইরশাদ ইলাহী রয়েছে-

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا

যেহেতু ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ফরয অর্থাৎ, নামায ওয়াক্ত নির্ধারনের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু ইমাম মালিক র. নামাযের ওয়াক্ত দিয়ে গ্রন্থের সূচনা করেছেন। এসব মুহাদ্দিসীন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বীয় উঁচু স্থানের সাথে সংগতিপূর্ণ নেহায়েত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয় ওহীর সূচনা দ্বারা ইমাম বুখারী র. গ্রন্থ আরম্ভ করেছেন।

گلستاں میں جا کر ہر اک گل کو دیکھ ÷ نہ تیری رنگت نہ تیری سی بو ہے

ইমাম বুখারী র. প্রথমে باب بدء الوحى দ্বারা শুরু করে ইঙ্গিত করেছেন যে, ঈমান ও ঈমানিয়াত সংক্রান্ত কোন বিষয় গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত এটি ওহীর আলোকে প্রমাণিত না হবে। বুঝা গেল, দীন নির্ভরশীল ওহীয়ে ইলাহীর উপর। সমস্ত শরঈ বিষয়ের উৎস হল ওহী। আল্লাহর মর্জি সংক্রান্ত জ্ঞান ওহী ছাড়া হতেই পারে না। কাজেই সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য বিষয় হল ওহী। চাই মাতলূ হোক অথবা গাইরে মাতলূ।

দার্শনিকগণ মানতিকের সংজ্ঞায় বলেন- "تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فى الفكر" অথচ স্বয়ং মানতিক বা যুক্তিশাস্ত্র ভুল থেকে নিরাপদ নয়। অতএব, অন্যান্য শাস্ত্রের জন্য কিভাবে এটি নিরাপত্তা দানকারী হতে পারে। দার্শনিকদের মধ্যে শত সহস্র বিষয়ে মতানৈক্য পাওয়া যায়। কেউ هيولى ও صورت দ্বারা দেহকে গঠিত মনে করে। আর কেউ কেউ পরমাণু দ্বারা। প্রথমে কোন যুগে পৃথিবী গতিশীল হওয়ার ধারণা ছিল। অতঃপর একটি দীর্ঘ কাল পর্যন্ত সমস্ত বিজ্ঞানীগণ আসমানকে গতিশীল মনে করতেন আর বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীগণ আবার জমিনকে গতিশীল বলতে আরম্ভ করেছেন।

نور دل از سینۂ سینا مجو ÷ روشنی از چشم نابینا مجو.
صدر او قاضی مبارک چغمنی ÷ عمر در تحصیل این ضائع کنی.
چند خوانی حکمت یونانیاں ÷ حکمت ایمانیاں راہم بخواں.
صحت ایں حس بجوئید از طبیب ÷ صحت آں حس بجوئید از حبیب .

ইলম অর্জনের তিনটি মাধ্যম বা কারণ রয়েছে। শরহে আকাইদে আছে-

اسباب العلم ثلاثة- الحواس السليمة والعقل والخبر الصادق

অতঃপর সত্য সংবাদ দুই প্রকার- ১. খবরে মুতাওয়াতির ২. ওহী।

এরূপভাবে ইলমের মাধ্যম চারটি হয়ে যায়। অবশ্যই ঐতিহ্যগতভাবে এবং যৌক্তিকভাবে এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হল ওহী।

বিবেকের ভুলের সম্ভাবনা উপরে প্রমাণিত হয়েছে যে, জ্ঞানীদের মধ্যে প্রচুর মতবিরোধ হয়, একজন অপর জনের মত খণ্ডন করেন। এরূপভাবে অনুভুতি শক্তিও ভুল করে। যেমন- চাঁদনী রাত্রে মেঘ ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু আমরা দেখি যেন চাঁদ পালিয়ে যাচ্ছে। রেল গাড়িতে আরোহন করে বসলে কাছে দিয়ে আরেকটি গাড়ি অতিক্রম করলে মনে হয় আমাদের গাড়ি চলছে। চলতি গাড়ি থেকে বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে মনে হয় বৃক্ষ ইত্যাদিও যেন চলছে। এ তো দৃষ্টিভ্রম। এরূপভাবে শ্রবণশক্তি, রসনশক্তি ইত্যাদি ইন্দ্রিয় থেকেও ভুল হয়। যখন জন্ডিসের প্রবলতা দেখা দেয়, তখন মধু তিতা মনে হয়। জন্ডিসরোগী প্রতিটি জিনিসকে হলুদ দেখে। ট্যাড়া চক্ষুবিশিষ্ট লোক একটিকে দুই দেখে। অতএব, ভুল থেকে পবিত্র শুধু সেটিই হতে পারে যেটি ওহীর মাধ্যমে প্রমাণিত। খবরে মুতাওয়াতির যদিও নির্ভরযোগ্য, কিন্তু এটি অনুভুত জিনিস পর্যন্তই সীমিত থাকে। অনানুভুত জিনিসে তা নির্ভরযোগ্য হওয়া জরুরী নয়।

ওলী আল্লাহদের কাশফ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। পৃথিবীতে (নবীগণের পর) সবচেয়ে বেশি পবিত্র দল হল, সাহাবায়ে কিরাম। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ও ইখতিলাফ হয়েছে।

শুধু আম্বিয়ায়ে কিরাম আ.-এর দলই এরূপ যে, তাঁদের মধ্যে কোন মৌলিক মতবিরোধ পাওয়া যায় না। বিচ্ছিন্ন ও শাখাগত বিষয়াবলীতে নবীগণের মধ্যে যে মতবিরোধ পাওয়া যায়, সেটিও মূলতঃ মতবিরোধ নয় বরং বিচ্ছিন্ন বিষয়াবলীতে বিভিন্নতা যুগের বিভিন্নতার কারণে। এর উদাহরণ এরূপ মনে করুন, যেমন- কোন রোগী কোন ডাক্তারের নিকট যায়, ডাক্তার নিজের মনে তার পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসার চিত্র তৈরি করেন যে, প্রথমে কয়েকদিন পর্যন্ত তাকে পেট শক্ত করার মত পথ্য দেয়া হবে। অতঃপর পেট পরিষ্কার করার মত ঔষধ দেয়া হবে। অতঃপর ঠান্ডা করার ঔষধ। অতঃপর শক্তিসৃষ্টিকারক ঔষধ দেয়া হবে। ডাক্তার তাকে প্রথমোক্ত ঔষধ দেয়ার পর সে অন্যত্র চলে যায়। এবার রোগী অন্য আরেক ডাক্তারের কাছে গেলে তাকে দ্বিতীয় প্রকারের ঔষধ দেন। এরপর তৃতীয় ডাক্তারের কাছে গেলে ঠান্ডা জাতীয় ঔষধের প্রেসক্রিপশন দেন। চতুর্থ ডাক্তারের কাছে গেলে শক্তিসৃষ্টিকারী ঔষধ সেবন করাবেন। বাহ্যতঃ রোগী মনে করবে, প্রতিটি নতুন চিকিৎসক প্রথম চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন পাল্টে দিয়েছেন। বলবেন, এসব ডাক্তারের চিকিৎসায় মতবিরোধ আছে। অথচ বাস্তবে কোন মতবিরোধ নেই। যদি প্রথম চিকিৎসকের চিকিৎসাই চালু থাকত, তবে তিনিও তার মনের চিত্র অনুযায়ী নির্ধারিত মেয়াদের পর প্রেসক্রিপশন পাল্টে দিতেন। মোটকথা, আম্বিয়া আ.-এর মধ্যে প্রকৃত অর্থে কোন মতবিরোধ নেই। হাদীস শরীফে আছে-

الانبياء اخوة لعلات امهاتهم شتى و دينهم واحد (متفق عليه)

উদ্দেশ্য হল, আম্বিয়া আ.-এর ফয়েজের উৎস একই, অথাৎ, ওহীয়ে ইলাহী। এজন্য মূলনীতিতে কোন মতবিরোধ নেই। অবশ্য উম্মতের স্বভাবের বিভিন্নতার কারণে বিচ্ছিন্ন ও শাখাগত বিষয়ে পার্থক্য হয়। এ কারণে একজন রাসূল কর্তৃক অপর রাসূলের শরীয়তকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা অসম্ভব। যেমন- অন্যান্য দল উপদলে মতবিরোধ হয়ে থাকে। একদল অপরদলকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে, তাদের ভুল ধরে।

মোটকথা, যতক্ষন পর্যন্ত ওহীর সনদ না হবে, ততক্ষন পর্যন্ত কোন বিষয়ের বিশুদ্ধতার উপর নির্ভর করা যায় না। নবীর মত শুধু মত হিসেবেও প্রমাণ নয়, যতক্ষন পর্যন্ত তা ওহীর মাধ্যমে না হবে। যেমন- হযরত বারীরা রা.-এর ঘটনা এবং খেজুর গাছে পরাগায়নের ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট। কাজেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার মর্জি অমর্জি জানার জন্য কোন নিশ্চিত, অকাট্য, ব্যাপক, আন্তর্জাতিক দিকনির্দেশনার প্রয়োজন। এটা ওহী ছাড়া অন্য কোন জিনিস হতে পারে না। শুধু ওহী সুনিশ্চিত ও অকাট্য। এ সব কারণে এটি সফলতা ও কামিয়াবীর যিম্মাদার। ইরশাদে ইলাহী রয়েছে-

وَإِنَّه لَكِتَابٌ عَزِيْزٌ لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِه تَنْزِيْلٌ مِنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ .

'এ কুরআন বড় মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ। যাতে অবাস্তব কোন বিষয় সামনের দিক থেকে এবং পিছনের দিক থেকে আসতে পারে না। এটি প্রজ্ঞাবান প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।'

-পারা ঃ ১৪ , শেষ রুকূ ।

এজন্য ইমাম বুখারী র. باب كيف كان بدء الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم দ্বারা কিতাবের সূচনা করেছেন।

আল্লামা কাশমীরী র. নেহায়েত সুক্ষ্ম একটি কারণ বর্ণনা করেছেন যে, ওহীর দ্বারা ইমাম বুখারী র.-এর কিতাব সূচনা করার উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার সাথে বান্দার সম্পর্ক ওহীর মাধ্যমেই কায়েম হয়। অতঃপর এই প্রমাণের প্রয়োজন যে, আমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ, ঈমানের প্রয়োজন। স্পষ্ট বিষয়, এই সম্পর্ক তথা ঈমান দাবি করে আমলের। আমলের জন্য প্রয়োজন ঈমানের। এই সম্পর্কের কারণে ইমাম বুখারী র. ওহীর পর ঈমান পর্ব, অতঃপর ইলম পর্ব, অতঃপর আমলের ধারা শুরু করেছেন।

মোটকথা, কিতাবের শুরু ওহী দ্বারা করেছেন। অতঃপর ওহীর আহকাম, মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থ শেষ করেছেন- كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان الخ হাদীস দ্বারা। যাতে ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ আহকামের ফলাফলের ব্যাপারে সতর্কীকরণ হয়ে যায়।

بَاب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ اِلى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلى نُوْحٍ وَّالنَّبِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِه .

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ওহীর সূচনা কিভাবে হয়েছিল? এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ-

"আমি আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি, যেমন প্রেরণ করেছিলাম নূহ আ. ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের নিকট।" (৪ ঃ ১৬৩)

ব্যাখ্যা ঃ باب শব্দটি মূলতঃ ছিল بَوَب ওয়াও এর উপর যবর। ওয়াও হরকত বিশিষ্ট হয়ে তার পূর্বে যবর থাকার কারণে আলিফ দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এর বহুবচন ابواب।

الباب اصله البوب قلبت الواو لتحركها وانفتاح ما قبلها ويجمع على ابواب المراد من الباب ههنا النوع . عمدة : ١/١٣.

পরিভাষা

মুহাদ্দিসীনে কিরাম ও ফুকাহায়ে কিরামের নিয়ম হল, তাদের সংকলনের যে অংশ বিভিন্ন প্রকার মাসায়েল বিশিষ্ট হয়, তা ব্যক্ত করেন কিতাব দ্বারা। আর যে অংশ একই প্রকার মাসায়েল বিশিষ্ট, তা ব্যক্ত করেন বাব দ্বারা। কোন একটি প্রকার অথবা শাখাগত বিষয় সংকলন বা রচনাকে বলে ফসল। অতএব, কিতাব হল, জিনসের পর্যায়ভূক্ত। যেমন- حيوان। আর বাব হল نوع-এর পর্যায়ভূক্ত। যেমন- انسان।

নামকরণের কারণ

بـــاب ঃ আভিধানিক অর্থ হল, দরজা। যেরূপভাবে দরজার মাধ্যমে বাড়ি এবং কামরায় প্রবেশ করে, এরূপভাবে بـاب তথা অনুচ্ছেদের মাধ্যমে যেন এক প্রকার মাসায়েলে প্রবেশ করে। এ জন্য ঘরের দরজার সাথে সাদৃশ্যের কারণে এটাকে বাব বলে।

প্রশ্ন ঃ ইমাম বুখারী র. 'বাব' শব্দ কেন লিখলেন? 'কিতাব' দ্বারা কেন ব্যক্ত করলেন না?

উত্তর ঃ মূলগ্রন্থ তো ঈমান থেকে আরম্ভ। এজন্য সেখানে কিতাবুল ঈমান বলেছেন। এটি হল, ভূমিকা। এজন্য বাব দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

২. এক প্রকার অর্থাৎ, ওহীর বিবরণ রয়েছে বলে নিয়ম অনুযায়ী বাব দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

৩. ওহী হল, মূল বিষয়। যার বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। ঈমান, ঈমানিয়্যাত, ইবাদাত, লেন-দেন ইত্যাদি সবই ওহীর প্রকার। অতএব, যদি এ স্থানেও কিতাব লিখতেন, তবে অস্পষ্টতা থেকে যেত যে, ওহী এবং ঈমান ইত্যাদি একটি অপরটির قسيم বা পরিপন্থি। অতএব, মূল বিষয় বা مقسم কিছুই থাকত না। এজন্য ব্যবধান সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে مـقـسـم কে বাব দ্বারা আর অবশিষ্ট প্রকারগুলোকে কিতাব দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। -উমদা।

কোন কোন কপিতে এখানে بـــاب শব্দ নেই। যেমন- ফাতহুল বারী দেখা যেতে পারে। আল্লামা কাসতাল্লানী র. বলেন-

كذا لابي ذر والاصيلي باسقاط لفظ باب الخ. قسطلاني ١/٨٢.

আবু যর ও উসাইলীর কপিতে অনুরূপ বাব শব্দ নেই। -কাসতাল্লানী ঃ ১/৮২।

বাব শব্দটি তিনভাবে পড়া যায়- ১. بابٌ এটি তানভীন সহ। মুবতাদা মাহযূফের খবর। অর্থাৎ, هذا بابٌ في الوحى

২. باب كيف كان بدء بالاضافة অর্থাৎ, তানভীন ছাড়া শুধু পেশ। এমতাবস্থায় বাব শব্দটি পরবর্তী শব্দের দিকে মুযাফ হবে। অর্থাৎ, هذا باب كيف كان بدء الوحى তখনও এটি মুবতাদা মাহযূফের খবর হবে। هذا মুবতাদা হবে।

৩. بـــــابْ ওয়াক্‌ফ সহকারে ই'রাব ছাড়া। আসমায়ে মা'দূদার ন্যায়। শেষ দুই ছূরতে (অর্থাৎ. তানভীন ছাড়া ইযাফত এবং ওয়াকফের ছূরতে) প্রশ্ন থেকে যায়, এ জন্য সর্বোত্তম ছূরত হল, প্রথমটি অর্থাৎ, তানভীন সহকারে।

যেমন- দ্বিতীয় ছূরতে (তানভীন ছাড়া ইযাফত সহকারে পড়লে) এই প্রশ্ন হবে যে, বাব শব্দটি মুযাফ. كيف শব্দটি মুযাফ ইলাইহ। অথচ كيف শব্দটির দাবি হল, বাক্যের শুরুতে থাকা। মুযাফইলাইহ হলে كيف শব্দটি শুরুতে থাকে না। কারণ, كيف শব্দটি باب এর অধীনস্থ হয়ে যায়।

আল্লামা কাসতাল্লানী র.বলেন-

ثم ان الجملة من كان ومعمولها في محل جر بالاضافة ولا تخرج كيف بذلك عن الصدرية لان المراد من كون الاستفهام له الصدر ان يكون فى صدر الجملة التي هو فيها. قسطلاني :١/٨٢.

হাফিজ আসকালানী র. বলেন, বুখারীর কোন কোন কপিতে এ স্থলে বাব শব্দটি নেই। এমতাবস্থায় বাক্যের শুরুতে না হওয়ার প্রশ্নই উত্থাপিত হবে না।

এমতাবস্থায় দ্বিতীয় প্রশ্ন হল

নাহবের গ্রন্থাদি দ্বারা জানা যায় যে, বাক্যের দিকে শুধু ৮টি শব্দের ইযাফত জায়েয আছে- ولا يضاف الى الجملة الا ثمانية অর্থাৎ, বাক্যের দিকে শুধু ৮টি শব্দের ইযাফত হতে পারে কিছু শর্তসাপেক্ষে। কোনটি জরুরী পর্যায়ের, আর কোনটি বৈধ পর্যায়ের।

১. اسم الزمان .২ حيث .৩ بمعنى علامت اية .৪ ذو .৫ لدن .৬ ريث .৭ قول .৮ قائل এবং বাব শব্দটি এতে নেই। অতএব, এখানে ইযাফত সঠিক হয় কিভাবে?

এর উত্তর হল, শায়েখ বদরুদ্দীন দাম্মামীনী র. মাসাবীহুল জামি'তে লিখেছেন যে, জুমলা দ্বারা উদ্দেশ্য শব্দ হলে তো এটি মুফরাদের পর্যায়ভূক্ত। পূর্ণ জুমলা মুযাফইলাইহ হতে পারে। আর এখানে লফজই উদ্দেশ্য। আসল উহ্য ইবারত হল, باب جواب كيف كان অর্থাৎ, যদি কেউ প্রশ্ন করে كيف كان بدء الوحى তবে আমরা এর উত্তর দিব, যা এ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হয়েছে তা। অতএব, কোন প্রশ্ন রইল না। -কাসতাল্লানী ঃ ১/৮২।

তৃতীয় তথা ওয়াকফের ছূরতে প্রশ্ন হল, মা'দুদ জিনিসে ওয়াকফ সেখানে হয়, যেখানে এগুলোর মাঝে ব্যবধান না হয়। অথচ এখানে বাবগুলোর ব্যবধান রয়েছে। এর দ্বারা বুঝা গেল, প্রথম ছূরতটি তথা তানভীন সহকারে বাব পড়লে কোন প্রশ্ন থাকে না।

মুহাদ্দিসীনে কিরামের পরিভাষা

একটি পরিভাষা তো হল, باب এর পর حدثنا পর্যন্ত যে ইবারত আসে, সেটাকে বলে ترجمة الباب। তাছাড়া এটাকে دعوى ، عنوان ، مترجم به ও বলা হয়। এরপর حدثنا থেকে যে হাদীস আসে, সেটাকে বলে مترجم له ।

তাছাড়া এটাকে معنون له এবং دليل ও বলে।

অতঃপর হাদীসে রাবীদের যেসব নাম থাকে, সেগুলোকে বলে হাদীসের সনদ। এরপর যেখান থেকে হাদীসের বিষয় আরম্ভ হয়, সেটাকে বলে হাদীস মতন বা মূলপাঠ। مترجم له এবং معنون له তে লামটি কারণ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু এই শিরোনাম এসব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, সেহেতু এসব হাদীসের কারণে এই শিরোনাম কায়েম করা হয়েছে। অতএব, উভয়ের মিল থাকা উচিত।

বুখারীর শিরোনামসমূহ ترجمة ابواب البخاری

এটি এরূপ প্রভাবশালী শব্দ যে, এতে বড় বড় ডুবুরীদের হাত, পাও অবশ হয়ে যায়। প্রসিদ্ধ আছে- فقه البخاری فی تراجمه। মুকাদ্দামায় এসেছে যে, এ বাক্যটির মূল অর্থ হল, তাফাক্কুহ। অর্থাৎ, বুখারী র.-এর শিরোনামগুলো দ্বারা ইমাম বুখারী র.-এর তাফাক্কুহ এবং তেজ মেধার শান বুঝা যায়। নেহায়েত সুক্ষ্মদৃষ্টিতে হাদীসগুলো নিয়ে আসেন। যেখানে মহামনীষীদের বিবেক পৌঁছতে পারে না। বিস্তারিত বিবরণ 'বুখারীর শিরোনামগুলোর গুরুত্বে' এসেছে।

قال ابن خلدون (بفتح الخاء وسكون اللام) ولقد سمعت كثيرا من شيوخنا رحمهم الله يقولون شرح كتاب البخاری دين على الامة يعنون ان احدا من علماء الامة لم يوف ما يجب له من الشرح بهذا الاعتبار -

আল্লামা ইবনে খালদুন র. স্বীয় মুকাদ্দামায় ইমাম বুখারী র.-এর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন যে, আমরা আমাদের অধিকাংশ উস্তাদ থেকে শুনেছি, তারা বলতেন, ইমাম বুখারী র.-এর কিতাব সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা উম্মতের উপর ঋণ। অর্থাৎ, উলামায়ে উম্মতের কেউ বুখারীর যথাযোগ্য শান অনুযায়ী ব্যাখ্যার হক আদায় করতে পারেননি। যদিও অনেক ব্যাখ্যাই লেখা হয়েছে। কিন্তু বুখারীর ঋণ এখন পর্যন্ত পরিশোধ হয়নি।

কিন্তু এর বাস্তবতা হল, আল্লামা আইনী ও হাফিজ আসকালানী র. উমদাতুল কারী ও ফাতহুল বারী লিখে উম্মতের পক্ষ থেকে হাদীস ব্যাখ্যার ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছেন। কিন্তু শিরোনামগুলোর ঋণ বাকী থেকে যায়। কেউ বুখারীর শিরোনামগুলোর সম্পর্কে কতইনা সুন্দর বলেছেন!

ای فحول العلم حل رموزما ÷ ابداه فی الابواب من اسرار
فازوا من الاوراق منه بما جنوا ÷ منها ولم يصلوا الى الاثمار

বুখারীর শিরোনামগুলোর উপর রচনাবলী

শিরোনামগুলো বুঝার জন্য স্বতন্ত্র রচনাও রয়েছে। সর্বদাই এ কাজের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নাসিরুদ্দীন ইবনুল মুনীর 'কিতাবুল মুতাওয়ারী আলা তারাজিমিল বুখারী' রচনা করেছেন। ইবনে রশীদ তারজুমানুত তারাজিম লিখেছেন। কাযী বদরুদ্দীন ইবনে জুমাআহ র. ইবনে মুনীরের পুস্তিকার সারসংক্ষেপ করেছেন, আবার কিছু যোগও করেছেন। মুসনিদুল হিন্দ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস

দেহলভী র. শিরোনামগুলোর ব্যাখ্যার জন্য একটি আরবী পুস্তিকা লিখেছেন। পরবর্তীতে হযরত শাইখুল হিন্দ র. উর্দূ ভাষায় আলআবওয়াবু ওয়াত তারাজিম নামে একটি পুস্তিকা লিখেছেন, কিন্তু তারা দু জন মহা মনীষী এগুলো পূর্ণাঙ্গ করতে পারেন নি। এর আগেই পরকালে পাড়ি জমিয়েছেন।

অবশেষে মাদরাসা মাজাহিরুল উলূম সাহারানপুরের শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া র. আকাবিরের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাথে অতিরিক্ত আরো নতুন তাহকীক দ্বারা সুসজ্জিত করে আল আবওয়াবু ওয়াত তারাজিম লিসহীহিল বুখারী নামে ৬খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ করেছেন। এটি কদরযোগ্য ও অধ্যয়নযোগ্য فجزاهم الله خير الجزاء।

শিরোনামের উদ্দেশ্য

باب كيف كان بدء الوحى الخ দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায়, ইমাম বুখারী র. ওহীর সূচনার ধরণ বর্ণনা করতে চান, কিন্তু হাদীসগুলোতে গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায়, অনুচ্ছেদের ৬টি হাদীস থেকে দুই একটি হাদীস ছাড়া কোন হাদীসের সাথে শিরোনামের সাথে কোন মিল বুঝা যায় না। অধিকাংশ রেওয়ায়াত ওহীর সূচনার আলোচনা থেকে শুন্য। যেমন- প্রথম হাদীস انما الاعمال بالنيات -এ বাহ্যত শিরোনামের সাথে কোন মিল নেই। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ হাদীসটিতে ওহীর ধরণের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু সূচনার কোন উল্লেখ লেই। অবশ্য তৃতীয় হাদীস তথা اول ما بدئ به শিরোনামের অনুকূল পরিদৃষ্ট হচ্ছে। পঞ্চম হাদীসে কোন কিছুর উল্লেখ নেই- না ওহীর উল্লেখ রয়েছে, না ওহীর সূচনার। এরূপভাবে নবুওতের শেষ যুগে সংঘটিত হিরাকলিয়াসের ঘটনা সংক্রান্ত ৬ষ্ঠ হাদীসটিতে ওহীর সূচনার সাথে বাহ্যত কোন সম্পর্ক বুঝা যায় না।

وقد اعترض محمد بن اسمعيل التيمىؒ على هذه الترجمة فقال لو قال كيف كان الوحى لكان احسن الخ

অথাৎ, ইসমাঈলী র. এই শিরোনামের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করতে গিয়ে বলেন, যদি এখানে كيف كان بدء الوحى এর পরিবর্তে كيف كان الوحى হত, তাহলে ভাল হত।

কিন্তু ইসমাঈলীর উক্তির উপর প্রশ্ন হতে পারত যে, প্রথম হাদীস انما الاعمال بالنيات তে তো ওহীরও উল্লেখ নেই। অতএব, তিনি স্বীয় মুসতাখরাজে انما الاعمال بالنيات হাদীসটি অনুচ্ছেদের পূর্বে উল্লেখ করেছেন। কারণ, এ হাদীসটি হল, খুৎবার পর্যায়ভূক্ত। অতএব, এটি পূর্বেই হওয়া উচিত। যেন দুটি হস্তক্ষেপের পর ইসমাঈলীর মতে এ হাদীসটির মিল শিরোনামের সাথে হতে পারে। মূলতঃ এটি ইমাম বুখারী র.-এর উপর প্রশ্ন উত্থাপন। তবে ইসমাঈলী র. -এর এই প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ, যদি শিরোনাম بدء الوحى তে ইযাফতে বয়ানিয়া মেনে নেয়া হয়, তবে بدء এবং وحى এক হয়ে যাবে। আর ইবারত হবে كيف كان بدء هو الوحى। এমতাবস্থায় শিরোনামের অর্থ হবে كيف كان الوحى الخ। যেটাকে হযরত ইসমাঈলী র. সর্বোত্তম বলেছেন। অতএব, প্রশ্ন সঠিক রইল না।

ব্যাখ্যাতাগণ শিরোনামের সাথে মিলের ব্যাপারে অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু বেশির ভাগই প্রশান্তিদায়ক নয়। এগুলো দ্বারা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তৃপ্তি আসতে পারে না। কয়েকটি উত্তম ব্যাখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হল-

১. ওহীকে আম ধরা হবে। চাই ওহীয়ে মাতলূ হোক অথবা গাইরে মাতলূ। بدء শব্দটিকেও ব্যাপক ধরা হবে। কারণ, শুরু কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। যেমন- কোন যমানায় ওহীর সূচনা হয়েছে? কোন স্থানে

হয়েছে? কিরূপ লোকদের দ্বারা হয়েছে? কোন পরিস্থিতিতে হয়েছে? فدخل فيه كل ما يدل على عظمة شان الموحى اليه

২. কোন কোন সময় بدء বলে সমস্ত অবস্থা উদ্দেশ্য হয়। যেমন- ইমাম বুখারী র.কে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল - كيف كان بدء امرك؟ তখন তিনি শুধু নিজের জন্মের বিষয়টি উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং বিস্তারিত জীবনী বর্ণনা করেছেন যে, অমুক মাদরাসায় ভর্তি হয়েছেন, অমুক অমুক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এরূপভাবে সহীহ বুখারীর ১৩ পারা শুরু করেছেন- كتاب بدء الخلق দ্বারা। ৪৫৩ পৃষ্ঠায় দেখুন, সেখানে শুধু সূচনার উল্লেখ নেই, বরং মাখলূক সংক্রান্ত সমস্ত আহকাম এসব অনুচ্ছেদে এসেছে।

৩. কোন কোন সময় শিরোনামের সাথে হাদীসের মুতাবিকী অর্থে মিল হয় না। বরং ইলতিযামী অর্থে মিল হয়।

৩. সহীহ বুখারীকে ترجمة الباب দ্বারা শুরু করার হিকমতের বিস্তারিত বিবরণ উপরে এসেছে। যার সারমর্ম হল, কোন জিনিস নির্ভরযোগ্য নয়, যতক্ষন না তার সম্বন্ধ ওহীর সাথে হয়। এর দ্বারা বুঝা গেল, ওহীর মাহাত্ম্য এবং মহা শান এই অনুচ্ছেদের ইলতিযামী বা আবশ্যকীয় অর্থে। শিরোনাম দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। যেন এই অনুচ্ছেদটি পূর্ণ গ্রন্থের একটি ভূমিকা বা কুবরা। মূল কিতাব কিতাবুল ঈমান থেকে আরম্ভ হয়েছে। সেটি সুগরার পর্যায়ভূক্ত। অতএব, কিতাবের প্রতিটি হাদীস সম্পর্কে বলা যাবে, এটি ওহীর অন্তর্ভূক্ত এবং باب الوحى এর সারনির্যাস হল, ما كان من الوحى فهو موجب للعمل। এর ফল বের হল, هذا موجب للعمل। এই বক্তব্যের পর শিরোনামের সাথে এই অনুচ্ছেদের হাদীসগুলোর মিল স্পষ্ট। কারণ, এগুলো ওহীর মাহাত্ম্য বুঝায়।

এই স্থানে একটি বিষয় ভেবে দেখার এই যে, ইমাম বুখারী র. অনুচ্ছেদ শুরু করেছেন كيف كان দ্বারা। বস্তুতঃ كيف দ্বারা যেরূপ কোন জিনিসের অবস্থা জানা উদ্দেশ্য হয়, এরূপভাবে কখনো এ শব্দটি মাহাত্ম্য প্রকাশ করার জন্যও আসে। যেমন- কুরআনে কারীমে আছে-

১. اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ

'হে সম্বোধিত ব্যক্তি! তুমি কি দেখনি? তোমার প্রভূ হস্তিওয়ালাদের সাথে কিরূপ আচরন করেছেন?'

২. كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا

'আল্লাহ তা'আলা কিভাবে স্তরে স্তরে সপ্ত আসমান সৃষ্টি করেছেন? '

৩. اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَالَهَا مِنْ فُرُوْجٍ

'তারা কি তাদেরউপর অবস্থিত আসমানের প্রতি লক্ষ্য করেনি যে, আমি কিভাবে এটিকে (উঁচু এবং বড়) বানিয়েছি? এবং (তারকারাজি দ্বারা) এটিকে সুসজ্জিত করেছি? (পরিপূর্ণ মজবূত হওয়ার কারণে এতে ছিদ্র পর্যন্ত নেই।)'

এ ধরণের বহু আয়াতে كيف শব্দ আছে। কিন্তু এগুলোতে ধরণ নিয়ে প্রশ্ন অথবা কোন প্রশ্ন উদ্দেশ্য নয়। বরং গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করা উদ্দেশ্য।

সারকথা, লোকজন كيف শব্দটিকে ধরণ সংক্রান্ত প্রশ্নের জন্য মেনে নিয়েছেন। ফলে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। যদি মাহাত্ম্যের অর্থের দিকে মনোযোগ হত, তবে কোন প্রশ্ন হত না।

ইনশাআল্লাহ প্রতিটি হাদীসের পর ব্যাখ্যায় শিরোনামের সাথে মিলের পূর্ণ ও বিশদ বিবরণ দেয়া হবে। যেমন- ইতোপূর্বে ২খণ্ডে (নাসরুল বারী কিতাবুল মাগাযী ও কিতাবুত তাফসীরে) বর্ণনা করা হয়েছে। والله المستعان وعليه التكلان - بدء বা -এর উপর যবর, দাল-এর উপর জযম, শেষে হামযা। এর অর্থ হল, সূচনা। আল্লামা আইনী র. বা -এর উপর পেশ, দাল-এর উপর পেশ এবং ওয়াও-এর উপর তাশদীদ সহকারে একটি কপির বিবরণ দিয়েছেন। যার অর্থ হল, প্রকাশ পাওয়া।

-ফাতহুল বারী, উমদাতুল কারী।

الوحى

হাফিজ র. বলেন, والوحى الاعلام فى خفاء অর্থাৎ, অভিধানে ওহীর অর্থ হল, গোপনে কাউকে কিছু বলা। ইমাম রাগিব র. মুফরাদাতুল কুরআনে লিখেছেন- واصل الوحى الاشارة السريعة তথা দীর্ঘ কথাকে সংক্ষিপ্ত আকারে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করার নাম ওহী। যেমন- তাকরীবে خ বুখারীর জন্য, م মুসলিম শরীফের জন্য, و আবু দাউদের জন্য, ت তিরমিযীর জন্য, س নাসাঈর জন্য, স্বয়ং বুখারীর টীকায় ك কিরমানীর ف ফাতহুল বারীর এবং ع উমদাতুল কারীর দিকে ইঙ্গিতের জন্য ব্যবহৃত হয়। অতঃপর এই ইঙ্গিত কখনো হাত দ্বারা হয়, আবার কখনো মাথার সাহায্যে, আবার কখনো জবানে। যেমন- نعم এবং لا।

রাজা-বাদশাদের ইঙ্গিত তাদের নৈকট্যপ্রাপ্তরাই বুঝে। এরূপভাবে ওহীয়ে ইলাহী বুঝা শুধু রাসূলগণের কাজ। যারা ইলাহী দরবারের নৈকট্যপ্রাপ্ত। নবীগণের মেধা ও ব্রেণ এতটা উঁচু পর্যায়ের হয় যে, তৎক্ষনাৎ একটি বিষয়ের গভীর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যেন ইমাম রাগিব র. اعلام এর পরিবর্তে اشـــــــــاره বলে বড় একটি জ্ঞানের কথা বলেছেন যে, ওহীতে ইঙ্গিত হয় অর্থাৎ, দীর্ঘ বিষয়কে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়।

একটি বাস্তব ঘটনা। একবার একটি বিশেষ সভায় শেরশাহ একটি জমিনের উপর কাঠি দিয়ে রেখা টানছিলেন। লোকজন মনে করল, একি শেরশাহ শিশুদের মত আচরণ করছেন! কিন্তু তাঁর মন্ত্রী বললেন, জাহাপনা! বাস্তবে অনুরূপই হবে এবং তিনি একটি মহাসড়ক তৈরি করে দেন। এরূপভাবে আম্বিয়া আ. (আল্লাহ তা'আলার) ইশারা-ইঙ্গিত অনুধাবন করে নিতেন।

আরেকটি শব্দ হল, الســريـعـه অর্থাৎ, ক্ষনিকের মধ্যে অবতীর্ণ হয়ে যেত। ইবনে আরাবী র. বলেন, নবী এক মুহূর্তে ওহী শ্রবণ করেন, অনুধাবন করেন এবং মুখস্থ করে ফেলেন।

ইমাম রাগিব র. যদিও خـــفيــــه শব্দ তথা গোপনের কথা উল্লেখ করেননি, কিন্তু ইশারা ইঙ্গিতে অপরিচিত ভিন লোক থেকে কোন বিষয়কে গোপনও করা হয়। অভিধানবিদগণ خـــفـــاء এর সীমাবদ্ধতা দেখেছেন। অতএব, ওহীর মধ্যে গোপন করার অর্থ আছে। কাজেই তৃতীয় জিনিস ওহীর মধ্যেই গোপন করাও আছে। এর উদাহরণ তারবার্তার ন্যায় মনে করুন। দু জন মানুষ পরস্পরে কথা বলে, কিন্তু পাশে উপবিষ্ট লোক কিছুই বুঝে না।

ওহী শব্দের প্রয়োগ

ওহী শব্দের আভিধানিক প্রয়োগ প্রাণী ও নিস্প্রাণ উভয়ের ক্ষেত্রে হয়। দ্বিতীয়টির উদাহরণ

بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا. جزء عم.

এতে জমিনের দিকে ওহীর সম্বন্ধ করা হয়েছে। অতঃপর প্রাণীর মধ্য থেকে জ্ঞান সম্পন্ন এবং বিবেকহীন উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ হয়। দ্বিতীয়টির উদাহরণ

وَاَوْحى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا الخ . سورة النحل جزء ١٤ .

এরপর আবার জ্ঞান সম্পন্ন জিনিসের মধ্যে মানব ও জিন উভয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়। দ্বিতীয়টির উদাহরণ-

يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرَفُ الْقَوْلِ غُرُوْرًا. سورة الانعام جزء ٨.

অতঃপর মানুষের মধ্যে নবী ও অনবী উভয়ের দিকে এটির সম্বোধন হয়। দ্বিতীয়টির উদাহরণ

وَاَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّ مُوْسى الخ . سورة القصص جزء ٢٠.

وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيِّيْنَ. سورة المائدة جزء ٧.

বস্তুতঃ নবীর ওহীর উদাহরণ আলোচ্য অনুচ্ছেদে রয়েছে। অর্থাৎ,

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْحٍ وَّالنَّبِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِهِ الخ. سورة النساء جزء ٦.

শরঈ ওহী

শুধু শেষোক্ত প্রকারকে শরঈ ওহী বলে। অর্থাৎ, নবীর প্রতি প্রত্যাদেশ। অনবীর প্রতি যে ওহী হয়, সেটিকে শরঈ ওহী বলে না। বরং সেটি হল, আভিধানিক ওহী। وفى اصطلاح الشريعة هو كلام الله المنزل على نبى من انبيائه অর্থাৎ, শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহ তা'আলার সে কালাম যেটি কোন নবীর উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়। আল্লামা কাসতাল্লানী র. বলেন-

وفى اصطلاح الشرع اعلام الله تعالى انبيائه الشئ اما بكتاب او برسالة ملك او منام او الهام

অর্থাৎ, শরীয়তের পরিভাষায় ওহী হল, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক স্বীয় নবীগণকে কোন কিছুর সংবাদ দান। চাই কিতাবের মাধ্যমে হোক, অথবা ফিরিশতা পাঠিয়ে, কিংবা স্বপ্ন বা ইলহামের মাধ্যমে। উদ্দেশ্য হল, ওহী আল্লাহ তা'আলার হুকুম ও বার্তা, যা পয়গাম্বরগণের নিকট প্রেরণ করা হয়।

ওহীর বিভিন্ন প্রকার

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াসসালামের ক্ষেত্রে ওহীয়ে ইলাহী কত প্রকার? এ সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। আল্লামা হালীমী র. ৪৬ প্রকার বর্ণনা করেছেন। এর সূত্র সহীহ বুখারীর সে রেওয়ায়াত যেটি হযরত আবু হুরায়রা রা. ও হযরত উবাদা ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

رؤيا المؤمن جزء من ستة واربعين جزء من النبوة

তথা মুমিনের স্বপ্ন নবুওয়তের ৪৬ ভাগের একটি অংশ।

কুরআন মজীদে আম্বিয়া আ. -এর তিন প্রকার ওহীর বিবরণ আছে-

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلاً - اِلَّا وَحْيًا اى فى المنام او بالالهام - اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ.

وحيـاً দ্বারা উদ্দেশ্য হল, প্রত্যক্ষ কথোপকথন, যেমন- হযরত মূসা আ.-এর সাথে তূর পাহাড়ে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মি'রাজ রজনীতে।

আল্লামা সুহাইলী র. ওহী অবতরণের মোট সাতটি ছূরত বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, ওহী সাতটি পদ্ধতিতে অবতীর্ণ হয়-

১. সত্য স্বপ্ন। আম্বিয়া আ.-এর স্বপ্নও ওহী হয়ে থাকে। যেমন- হযরত ইবরাহীম আ.কে স্বপ্নে ইসমাঈল আ.কে কুরবানীর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হযরত ইবরাহীম এই হুকুম পালন শুরু করেছিলেন। এ জন্য কোন আলিম বর্ণনা করেছেন যে, নবীগণ ঘুমিয়ে থাকলে তাদের জাগানো জায়েয নেই। হতে পারে স্বপ্নে ওহী আসছে।

২. অন্তরে প্রক্ষিপ্তকরণ। যেমন- হাদীসে আছে-

قال صلى عليه وسلم ان روح القدس نفث فى روعى

তথা রূহুল কুদুস অর্থাৎ, পবিত্রাত্মা আমার অন্তরে এ কথাটুকু প্রক্ষিপ্ত করেছেন যে, কোন ব্যক্তি ততক্ষন পর্যন্ত মৃত্যু লাভ করবে না, যতক্ষন পর্যন্ত তার রিযিক পূর্ণাঙ্গ করবে না। যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্য থেকে কোন ওলীর অন্তরে কোন কথা প্রক্ষিপ্ত করা হয়, তবে হাদীস শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় এটাকে ইলহাম ও কাশফ বলে আখ্যায়িত করা হয়। অতএব, উভয় প্রক্ষিপ্তকরণের মধ্যে পার্থক্য হল, নবীর উপর প্রক্ষিপ্তকরণকে ওহী বলা হয়। আর এটা সর্বদা সঠিক হয়ে থাকে। ভুলের কোন সম্ভাবনা নেই। পক্ষান্তরে ওলীর ইলহাম ভুলও হতে পারে, সঠিকও হতে পারে। মোল্লা জীবন র. বলেন-

يشترك فيه الاولياء ايضا وان كان الهامهم يحتمل الخطاء والصواب والهامه لا يحتمل الا الصواب

'ইলহামে ওলী আল্লাহগণও শরীক থাকেন। যদিও তাদের ইলহামে ভুল এবং শুদ্ধ উভয়টির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু নবীর ইলহামে সঠিক ছাড়া ভুলের কোন সম্ভাবনাই থাকে না।'

-নূরুল আনওয়ার মুজতাবাঈ ঃ ২১৪।

৩. আল্লাহ তা'আলার কালাম পর্দার আড়াল থেকে শ্রবণ করা যেমন- হযরত মূসা আ. তূর পাহাড়ে এবং হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ রজনীতে শুনেছিলেন।

৪. ঘুন্টির আওয়াজের ন্যায় শ্রুত হওয়া। এর বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ ২ নং হাদীসের অধীনে আসবে।

৫. ফিরিশতা কর্তৃক কোন মানুষ রূপে কালামে রব্বানী পেশ করা। যেমন- হযরত জিবরাঈল আ.-এর দিহইয়ায়ে কালবী রূপে আগমন অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

৬. ফিরিশতার আপন রূপে এসে পয়গামে রব্বানী পৌঁছানো। যেমন- হযরত ইবনে মাসঊদ রা.-এর রেওয়ায়াতে আছে- انه راى جبرئيل له ستمائة جناح

কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে- له ستمائة جناح ينتشر منها اللؤلو والياقوت

অর্থাৎ, হযরত জিবরাঈল আ.-এর ৬০০ ডানা রয়েছে। যেগুলো থেকে ইয়াকূত ও মোতি ঝরে। এরূপ দুবার হয়েছে। যেমন- সূরা নাজমে রয়েছে- وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى-

৭. ইসরাফীল আ.-এর ওহী-

كما فى مسند احمد باسناد صحيح عن الشعبى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه النبوة وهو ابن اربعين سنة فقرن بنبوته اسرافيل عليه السلام ثلاث سنين الخ

অর্থাৎ, মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বলে বিশুদ্ধ সূত্রে ইমাম শা'বী র. থেকে বর্ণিত আছে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ৪০ বছর হয়, তখন তাঁর উপর প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়। এরপর তিন বছর পর্যন্ত ওহীর ধারা বন্ধ থাকে। হযরত ইসরাফীল আ. কে আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এজন্য নিযুক্ত করেছিলেন, যাতে তিনি কখনো কখনো তাকে কোন কথা বলেন। তিন বছর পর হযরত জিবরাঈল আ.কে নিযুক্ত করা হয় এবং ওহীর ধারা চালু হয়।

-উমদাতুল কারী ঃ ১/৪০।

﴿الى رسول الله صلى الله عليه وسلم﴾

রাসূলুল্লাহ শব্দটি যদিও ব্যাপক, সব রাসূলকে রাসূলুল্লাহ বলা যায়, কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কারণ, প্রসিদ্ধ মূলনীতি রয়েছে, ব্যাপক জিনিসকে নিঃশর্ত রাখা হলে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হয় পূর্ণাঙ্গ অংশ।

২. এখানে ইযাফতে আহদী তথা সুনির্দিষ্ট রাসূল তথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্দেশ্য।

৩. অথবা যেহেতু অন্যান্য সব নবী-রাসূলের দীন রহিত হয়ে গেছে। কিয়ামত পর্যন্ত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই কেবল রাসূল, এমনকি কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন হযরত ঈসা আ.-এর আগমন ঘটবে, তখন আমাদের রাসূলেরই অনুসরণ করবেন। এজন্য বর্তমানকালীন রাসূল হওয়ার কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্দেশ্য।

৪. অথবা বলা হবে, এ গ্রন্থ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সংকলনের জন্যই লিপিবদ্ধ হয়েছে। অতএব, তিনিই একমাত্র উদ্দেশ্য হবেন। নবী ও রাসূল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বার্তাবাহক ও মাধ্যম হয়ে থাকেন।

নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য

কারো কারো ধারণা হল, রাসূল এবং নবী সমার্থক। কিন্তু প্রধান উক্তি হল, নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য আছে। আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ রয়েছে-

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ الاية .

এতে নবী শব্দটির আতফ হয়েছে রাসূলের উপর। আতফ হল ভিন্নতার প্রমাণ। অতঃপর সাধারণত নবী ও রাসূলের মধ্যে এই পার্থক্য বর্ণনা করা হয় যে, রাসূল, কিতাব ও শরীয়ত বিশিষ্ট হন, নবীর জন্য এটা জরুরী নয়। বরং নবী সব পয়গাম্বরকে বলে। কিন্তু এর উপর প্রশ্ন হয় যে, হযরত ইসমাঈল আ. -এর প্রতি কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়নি। তা সত্ত্বেও কুরআন মজীদে তাঁর সম্পর্কে وَكَانَ رَسُوْلًا نَبِيًّا বর্ণিত হয়েছে। -সূরা মারইয়াম।

হাফিজ ইবনে তাইমিয়া র. কিতাবুন্নবুওয়তে সর্বোৎকৃষ্ট পার্থক্য বণনা করেছেন। তাঁর বক্তব্যটি সবচেয়ে উত্তম। তিনি বলেন, নবী তিনি যাকে মানুষের সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। আর

রাসূল তিনি, যাকে শত্রুদের সাথে মুকাবিলারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। চাই কিতাব বিশিষ্ট হোন বা না হোন। মোটকথা, নবী ও রাসূলের মাধ্যে উমূম খুসূস মিন ওয়াজহিনের সম্পর্ক। কিন্তু সাধারণত নবীকে আম আর রাসূলকে খাস বলা হয়। কারণ, মানব নবী ও রাসূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অতএব, এমতাবস্থায় উমূম খুসূস মুতলাকের সম্পর্কে হবে।

সর্বপ্রথম দীনের শত্রুদের সাথে মুকাবিলার সুযোগ আসে হযরত নূহ আ.-এর। এজন্য তাঁর থেকে রিসালতের যুগ আরম্ভ হয়। كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّيْنَ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শুরুর দিকে কোন ইখতিলাফ ছিল না। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, হযরত আদম আ. ও নূহ আ.-এর মাঝে ১০ যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। যাতে কোন প্রকার ইখতিলাফ ছিল না। এর দ্বারাও বুঝা যায়, সর্বপ্রথম ইখতিলাফ হয়েছে হযরত নূহ আ.-এর যমানায়। এতে প্রমাণিত হল, সর্বপ্রথম রাসূল হযরত নূহ আ.। সহীহ বুখারীর কিতাবুর রিকাকের হাদীসে শাফা'আতে আছে- ائتوا نوحا اول رسول بعثه الله

-বুখারী ঃ ২/৯৭১, মুসলিম ঃ ১/১০৮।

উপকারিতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা আ. নবী ও রাসূল। হযরত জিবরাঈল আ. প্রমূখ রাসূল, নবী নয়। কিন্তু এ বিষয়টিও স্মরণ থাকা উচিত যে, ফিরিশতাদের রিসালত হল খাস। জিবরাঈল আ. নবীগণের নিকট ওহী নিয়ে আসেন। অথবা কখনো শাস্তির জন্য অথবা কোন বিশেষ নেয়ামত অথবা বিশেষ হুকুম সহকারে প্রেরিত হন। তাদেরকে সরাসরি কোন কওম অথবা রাষ্ট্রের হেদায়াত ও পথপ্রদর্শনের জন্য পাঠানো হয়নি। এজন্য যখন রাসূল শব্দটি শর্তহীনভাবে বলা হয়, তখন তার দ্বারা মানব রাসূল উদ্দেশ্য হয়। ফিরিশতা উদ্দেশ্য হয় না।

﴿صلى الله عليه وسلم﴾

আল্লামা আইনী র. বলেন-

جملة خبرية لكنها لما كانت دعاء صارت انشاءً لان المعنى اللهم صل و كذا الكلام فى سلم. عمدة القاري.

মাসআলা ঃ হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী র. লিখেন, গোটা জীবনে একবার দুরূদ শরীফ পড়া ফরয। কারণ, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হিজরী দ্বিতীয় বর্ষে শা'বান মাসে صَلُّوا এর হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে।

যদি এক মজলিসে কয়েকবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম উল্লেখ করা হয়, যেমন- হাদীসের ক্লাসে প্রচুর এর সুযোগ হয়, তখন তাহাবী র.-এর মতে প্রতিবার নাম উল্লেখ ও শ্রবণকারীর উপর দরূদ পড়া ওয়াজিব। কিন্তু ফতওয়া হল এই উক্তির উপর যে, একবার দরূদ শরীফ পড়া ওয়াজিব। অতঃপর মুস্তাহাব। এটাই ইমাম কারখী র.-এর তাহকীক।

﴿قول الله عز وجل﴾

যদি قول শব্দটিতে পেশ পড়া হয়, তবে এর আতফ হবে باب এর উপর। যের -এর ছূরতে বাবের অধীনস্থ হবে এবং كيف এর উপর আতফ হবে।

﴿اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْ حَيْنَا اِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ﴾

'আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি। যেমন - নূহ আ. ও তৎপরবর্তী নবীগণের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি।'

আয়াত নির্বাচনে ইমাম বুখারী র.-এর পারদর্শিতা

ওহী সংক্রান্ত অনেক আয়াত বিজ্ঞানময় কুরআনে আছে। কিন্তু ইমাম বুখারী র. শিরোনামে এরূপ একটি আয়াত নির্বাচন করেছেন, যাতে ওহীর বিবরণ অত্যন্ত বিশদভাবে দেয়া হয়েছে। এই নির্বাচন ইমাম বুখারী র.-এর আল্লাহ প্রদত্ত মেধা, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, জ্ঞানের গভীরতা ও বিচক্ষনতার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

স্মর্তব্য ঃ আয়াতের শুধু উপরোক্ত অংশই এখানে উদ্দেশ্য নয়। বরং পূর্ববর্তী রুকূও উদ্দেশ্য। কারণ, এটি প্রশ্নকর্তার প্রশ্ন এবং এর বাধ্যতামূলক উত্তর। বস্তুতঃ اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ দ্বারা তাত্ত্বিক উত্তর দেয়া হয়েছে। অতঃপর শুধু كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ পর্যন্তই উদ্দেশ্য নয়। বরং উমদাতুল কারী ও ইরশাদুস সারীতে আছে- زاد ابو ذر الاية এর দ্বারা বুঝা যায়, এর পরবর্তী অংশও উদ্দেশ্য। তাছাড়া বিষয়ের প্রতিও চিন্তা করুন, তাহলে পরিস্কার বুঝা যাবে। পরবর্তী আয়াতটি وَالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ এর বিস্তারিত বিবরণ। যাতে অনেক নবীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে। এগার জন নবীর তো নামই উল্লেখ রয়েছে। হযরত দাঊদ আ.-এর একটি বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দেয়া হয়েছে- وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا হযরত মূসা আ. সম্পর্কে বলা হয়েছে- وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا

সারসংক্ষেপ হল, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াতগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে পরিস্কার হয়ে যায়, ওহীর এত বিস্তারিত ও বিশদ বিবরণ অন্য কোন আয়াতে নেই। তাফসীরে খাযীনে আছে- একবার ইয়াহুদী কা'ব ইবনে আশরাফ এবং ফাখ্খায ইবনে আযূরা সাইয়্যিদুল আওয়ালীন ওয়াল আখিরীন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, যদি আপনি নবী হন, তবে আমাদের নিকট আসমান থেকে একবারেই পূর্ণ কিতাব এনে দিন। যেরূপভাবে হযরত মূসা আ. এনে দিয়েছিলেন।

আহলে কিতাবদের এই প্রশ্ন আন্তরিক প্রশান্তি হেদায়েত অন্বেষণ ও অনুসরণের জন্য ছিল না। এটি ছিল, সত্যলংঘন ও অবাধ্যতার ভিত্তিতে। এর উপর يَسْأَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ الخ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। পূর্ণ রুকূতে তাদের ও তাদের পিতা-প্রপিতাদের দুষ্টামির বিবরণ রয়েছে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক প্রকার সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। এখনো তো তারা আপনাকে মানেই নি। কিন্তু মূসা আ.কে তো নবী মেনে নিয়েছিল। তারপরও কি কি ধরণের প্রশ্ন করত এবং কিরূপ হুকুমের পরিপন্থী কাজ করত! তাওয়াত ও হযরত মূসা আ.-এর সুস্পষ্ট মু'জিযাগুলো দেখা সত্ত্বেও তাদের প্রশ্নধারা খতম হয়নি। আমি তাওরাত একবারে নাযিল করা সত্ত্বেও বদস্বভাবী লোকদের হাজার টালবাহানার কারণে আনুগত্যের পরিবর্তে তারা প্রকাশ্যে আল্লাহ তা'আলার দর্শনের জন্য আবেদন করেছে। যদি কুরআনে কারীম একবারেই অবতীর্ণ করা হয়, তবে অন্য কোন শয়তানী আরম্ভ করবে।

انّا اوحينا দ্বারা তাত্ত্বিক উত্তর দেয়া হয়েছে। এর সারনির্যাস হল, হযরত মূসা আ. ছাড়া অনেক নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছে। তন্মধ্যে ১১ জনের নাম এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের কারো প্রতি একবারে কিতাব অবতীর্ণ হয়নি। অথচ আহলে কিতাব তাদেরকে নবী মানে।

এতে বুঝা গেল, ইয়াহুদীদের নিকটও নবুওয়তের জন্য একবারে পূর্ণাঙ্গ কিতাব অবতীর্ণ হওয়া জরুরী ছিল না। এর দ্বারা প্রমাণিত হল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই প্রশ্ন ছিল, বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার ভিত্তিতে। রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য মাখলূকের হেদায়াত এবং তাদেরকে তাওহীদ ও মা'রিফাতের শিক্ষাদান, আত্মশুদ্ধি ও প্রশিক্ষণ। বিক্ষিপ্তাকারে কিতাব অবতীর্ণ হলে এ উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ রূপে অর্জিত হয়। কারণ, অল্প অল্প জিনিস সহজে মুখস্থ হয়ে যায়, স্মরণ থাকে। এদিকে কেউ প্রশ্ন করল, তৎক্ষনাৎ উত্তর এসে গেল। কোন জটিলতা দেখা দিল, তৎক্ষনাৎ এর সমাধানও আন্তরিক প্রশান্তির কারণ হয়ে গেল। এ ছূরত মনে অধিক সুদৃঢ় হয়। অন্তর অধিক উন্মুক্ত হয়। তাছাড়া এজাতিও ছিল উম্মী। তাদের জন্য এটাই সহজ ছিল। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও সংশোধনের দাবিও ছিল ক্রমশঃ বিধিবিধান অবতীর্ণ হওয়া। অতএব, এসব হিকমত অনুধাবন না করা এবং বিভিন্ন প্রকার নিরর্থক প্রশ্ন করা চুড়ান্ত আহমকী বৈ কি? অতঃপর اٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا আয়াতে ইঙ্গিত করেছেন, নিঃসন্দেহে আমি হযরত দাঊদ আ.কে যাবুর দান করেছি। তাকেও একবারেই পূর্ণ কিতাব প্রদান করিনি। রবং অল্প অল্প করে কিস্তিতে কিস্তিতে অবতীর্ণ করেছি।

যেমন- রূহুল মা'আনী (১/১৭) তে আছে- وَكَانَ انزاله عليه السلام منجما । অতএব, যদি নবুওয়তের সত্যায়নের জন্য একবারে কিতাব নাযিল হওয়া জরুরী হয়, তাহলে তোমরা হযরত দাঊদ আ.কে কেন নবী মান? এর দ্বারাও তোমাদের হটকরিতা এবং সত্যলংঘন প্রবনতা স্পষ্ট।

তাছাড়া كَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا আয়াত দ্বারা ইয়াহুদীদের নেহায়েত দাতভাঙ্গা উত্তর দেয়া হয়েছে যে, মূসা আ.-এর সাথে আল্লাহ তা'আলা তূর পাহাড়ে কথোপকথন করেছেন, তখন থেকে তাঁর নবূওয়ত প্রমাণিত হয়েছে। ফিরআউন এবং তার জাতির নিকট দাওয়াত ও তাবলীগ ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আ.কে নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, মৌলিকভাবে তিনি রিসালত লাভ করেছেন। হে আহলে কিতাব! তূর পাহাড়ের কথোপকথন দ্বারাই তোমরা হযরত মূসা আ.কে রাসূল মান্য কর। অথচ তখন পর্যন্ত তার উপর কোন কিতাব অবতীর্ণ হয়নি। বরং তাওরাত গ্রন্থ তিনি লাভ করেছেন ফিরআউন ও তার সম্প্রদায় ডুবে মরার পর। অতএব, যেহেতু তোমরা কোন কিতাব অবতীর্ণ হওয়া ব্যতীত হযরত মূসা আ.-এর নবূওয়ত স্বীকার করে নাও। সেহেতু আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবূওয়তের সত্যায়ণের জন্য কিতাবের শর্ত, উপরন্ত একসাথে অবতীর্ণ হওয়ার শর্ত কিরূপে করছ! এটা জেদ, সত্য অস্বীকার করা এবং দুষ্টামী নয় তো কি? -ইমদাদুল বারী।

শিরোনামের সাথে আয়াতের মিল

শিরোনাম হল- كيف كان بدء الوحى অর্থাৎ, ওহীর সূচনা কিভাবে হল? আয়াতে কারীমায় দুটি উত্তর উল্লেখিত হয়েছে- ১. ওহীর মূল উৎসের বিবরণ রয়েছে। সেটি হল انّا اوحينا আয়াতে মূল উৎস হলেন আল্লাহ তা'আলা।

২. ওহীর ধরণের কালগত সূচনার বিবরণ রয়েছে। সেটি হল كما اوحينا الخ আয়াতে রয়েছে যে, এ ধরণের ওহীর সূচনা হয় হযরত নূহ আ. থেকে।

২. দ্বিতীয় উত্তর হল, আয়াত মুবারকা দ্বারা এদিকে সতর্ক করা উদ্দেশ্য যে, ওহীর জন্য তিনটি জিনিস আবশ্যক- ১. ওহী প্রেরণকর্তা তথা ওহীর মূল উৎস। এটা হল আল্লাহ তা'আলার সত্তা। ২. যার

কাছে ওহী ও বার্তা প্রেরণ করা হয়, তারা হলেন আম্বিয়া আ.। ৩. মাধ্যম। আয়াতে উদ্দেশ্য হল, সমস্ত আবশ্যকীয় বিষয়ের বিবরণ দান।

প্রশ্নোত্তর

এখানে একটি প্রশ্ন হল, আয়াতে হযরত নূহ আ.-এর উল্লেখ বিশেষভাবে কেন করা হল? অথচ নূহ আ.-এর পূর্বেও নবীগনের আগমন ঘটেছে। যেমন- হযরত আদম, শীস ও ইদরীস আ. অতিক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের প্রতিও ওহী অবতীর্ণ হয়েছে।

☆ এর বিভিন্ন উত্তর বর্ণিত আছে। যেমন- হযরত নূহ আ.কে বিশেষভাবে উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত দেয়া উদ্দেশ্য যে, যেরূপভাবে হযরত নূহ আ.কে তাঁর জাতি কষ্ট দিয়েছে এবং তিনি ধৈর্য্যধারণ করেছেন। এরূপভাবে আপনারও অনেক কষ্ট হবে। কিন্তু অনেক ধৈর্য্যধারণ করতে হবে।

২. হযরত নূহ আ.-এর পূর্বে যদিও আম্বিয়া আ. ছিলেন, কিন্তু রাসূল ছিলেন না। হযরত নূহ আ. সর্বপ্রথম রাসূল। তাঁর পর অনেক রাসূল এসেছেন। আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত হল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও রাসূল। কুফরের ব্যাপক প্রচার-প্রসারের সময় হযরত নূহ আ. প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর পূর্বে কুফরের এরূপ ব্যাপকতা ও প্রচার-প্রসার ছিল না। এর দ্বারা ইঙ্গিত করলেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কুফরের ব্যাপক প্রসারতাকালে প্রেরিত হয়েছেন ইত্যাদি।

হযরত শাইখুল হিন্দ র. হযরত নূহ ও তৎপরবর্তী নবীগণকে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে একটি সুক্ষ্ম বিষয়ের অবতারনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত নূহ আ.-এর পূর্বে সামাজিক বিষয়াবলীতে ওহী প্রেরিত হত। অর্থাৎ, জীবিকা অর্জনের উপায়, শিল্প ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হত। (যেমন- হযরত আদম আ.কে গৃহ নির্মাণ, হযরত শীস আ.কে কৃষি কাজ, হযরত ইদরীস আ.কে সেলাই কর্মের পদ্ধতি বাতলে দেয়া হয়েছে) হযরত নূহ আ. থেকে শরঈ ওহীর সূচনা হয়। তা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। যেমন- শিশুদেরকে শুরুতে সামাজিক শিক্ষা দেয়া হয়, যখন সামান্য হুশ-জ্ঞান আসে, তখন কালিমায়ে তায়্যিবা ও মা'মূলি ধরণের দীনি শিক্ষা দেয়া হয়। অতঃপর মাদরাসার সাথে সম্পর্কে কায়েম করা হয়। যখন কিছু করতে আরম্ভ করে, বিবেক বুদ্ধি বাড়ে, তখন কঠোরতা আরোপ করা হয় এবং নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষার সূচনা হয়। পরীক্ষার কষ্ট ভোগতে হয়। পাস-ফেল, সফল ও ব্যর্থ দুটি দল হয়ে যায়।

এরূপভাবে পৃথিবী হল একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এর প্রথম শিক্ষক ছিলেন হযরত আদম আ.। যেহেতু সেটি ছিল শৈশবকাল, সেহেতু প্রথমে বেশিরভাগ সামাজিক বিধিবিধান শিখানো হয়েছে। সামান্য দীনি আহকামও শিক্ষা দেয়া হয়েছে। চলতে চলতে হযরত নূহ আ.-এর যুগ আসে। সেখান থেকে নিয়ম তান্ত্রিক দীনি শিক্ষার দারুল উলূমের সূচনা হয়। তাতে যারা ফেল করেছে, তাদের দুনিয়া থেকে নাস্তানাবুদ করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর নূহ আ.-এর তিন সন্তান থেকে আবার নববিশ্বের সূচনা হয়। যেন নূহ আ. হলেন দ্বিতীয় আদম আ.। এরপর দুনিয়ার উন্নয়ন ঘটে। সে অনুপাতে নবীর আগমন ঘটতে থাকে। অবশেষে এই ইলম ও আমলের দারুল উলূমের নিসাব পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর। এজন্য ইরশাদ রয়েছে-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

মোটকথা, হযরত নূহ আ.-এর পূর্বে ওহী ছিল ভিন্ন ধরণের। অর্থাৎ, সামাজিক বিষয়াবলীতে ওহী আসত। হযরত নূহ আ. থেকে নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পরকালীন বিষয় ওহী এসেছে। এ জন্য তাঁর ওহীকে নূহ আ. ও তৎপরবর্তী [illegible] ওহীর সাথে উপমা দেয়া হয়েছে।

١. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ (عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ) قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

১. ইমাম বুখারী র. বলেন, আমার নিকট হুমাইদী র. বর্ণনা করেছেন, হুমাইদী র. বলেন, আমার নিকট সুফিয়ান র. বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী র. আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার নিকট মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম তাইমী র. সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস লাইছী র. কে বলতে শুনেছেন, আমি উমর ইবনে খাত্তাব রা. কে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ইরশাদ করতে শুনেছি ঃ প্রতিটি কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। মানুষ তার নিয়্যত অনুযায়ীই ফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে দুনিয়া অর্জনের অথবা কোন রমনীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে-সেই উদ্দেশ্যই হবে তার হিজরতের প্রাপ্য।

নোট ঃ শুধু শুরুতে এ হাদীসের সনদের তরজমা লেখা হল। যাতে প্রিয় ছাত্রদের পদ্ধতি জানা হয়ে যায়। পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ শুধু হাদীসের অনুবাদ লেখা হবে।

সহীহ বুখারীতে হাদীসের পুনরাবৃত্তি

এ রেওয়ায়াতটি বুখারী শরীফের সাত জায়গায় এসেছে- ১. এখানে দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়। এতে نيات শব্দটি বহুবচন এসেছে। অবশিষ্ট ছয় জায়গায় একবচনের শব্দ نية এসেছে। দ্রষ্টব্য ঃ পৃষ্ঠা ঃ ১৩, ৩৪২, ৫৫১, ৭৫৯, ৭৯০, ১০২৮।

শিরোনামের সাথে মিল

এ বিষয়ে হাদীস ব্যাখ্যাতাগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে- ১. কেউ কেউ বলেছেন, শিরোনামের সাথে এ হাদীসটির কোন মিল নেই। কারণ, হাদীসে না সূচনার বিবরণ আছে, না ওহীর। বরং শুধু তাবাররুকের জন্য সূচনাতে এটি এনেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, কিতাবের এ হাদীসটি নেয়া দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু যে, আমি এ গ্রন্থটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লিখেছি এবং এটা হল, আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের বিবরণ। প্রাসঙ্গিকভাবে শিক্ষক-ছাত্র সবাইকে সতর্ক করতে চান যে, তোমরাও নিজ নিজ নিয়্যত আল্লাহর জন্য খালিস করে নাও।

তবে এটা বিশুদ্ধ নয়। কারণ, যদি ইমাম বুখারী র.-এর উদ্দেশ্য এটা হত, তবে মিশকাত গ্রন্থকারের ন্যায় শিরোনামের পূর্বে হাদীসটি নিতেন। যাতে গ্রন্থ শুরুর পূর্বে নিয়্যত পরিস্কার এবং ইখলাসের দাওয়াতের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

৩. বিশুদ্ধতম উত্তর দিয়েছেন আল্লামা ইবনে বাত্তাল র.। তিনি বলেন, হাদীসের সম্পর্ক শিরোনামে উল্লেখিত আয়াত اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ الخ এর সাথে। কারণ, শিরোনামের উদ্দেশ্য ছিল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহীর সূচনা কিভাবে হয়েছে? আয়াতে কারীমায় বলা হয়েছে,

যেরূপভাবে পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি হয়েছে। হাদীসে নিয়্যত সুন্দরকরণ ও ইখলাসের তাকিদ রয়েছে এবং এই ওহীই সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি এসেছে।

وَمَا أُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ

বুঝা গেল, আয়াতে كما اوحينا তে যে উপমা ছিল। এর উদাহরণ রূপে انما الاعمال بالنيات হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব, মিল স্পষ্ট।

৪. ইবনে মুনাইয়্যির র. বলেন, এই রেওয়ায়াতে হিজরতের উল্লেখ রয়েছে। আর ওহীর সূচনা হয়েছে হিজরতেরই অবস্থায়। এরূপভাবে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরত দুটি- ১. ঘর থেকে বেরিয়ে হেরা গুহার দিকে হিজরত। ২. মদীনার দিকে হিজরত। প্রথম হিজরত থেকে ওহীর প্রকৃত সূচনা হয়েছে, দ্বিতীয় হিজরত থেকে ওহীর প্রকাশ ও প্রসার ঘটেছে। অতএব, শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট হয়ে গেছে। -উমদাহ।

৫. একটি সূক্ষ্ম মিল এটিও বর্ণনা করা হয় যে, এ হাদীসের প্রথম বর্ণনাকারী হুমাইদী মক্কী। অতএব, ইমাম বুখারী র. মক্কী দ্বারা সূচনা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, ওহীর সূচনা হয়েছে মক্কা থেকে।

৬. একটি উত্তম জবাব হল, শিরোনামের আবশ্যকীয় অর্থের সাথে এ হাদীসের মিল রয়েছে। অর্থাৎ, ওহীর মাহাত্ম্য। এ হিসেবে যে, যার মধ্যে সুন্দর নিয়্যত থাকবে, তার প্রতিই ওহী অবতীর্ণ হতে পারে। যেমন- রাজা-বাদশাদের নিকট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব শুধু তার নিকটই অর্পন করা হয়, যার আন্তরিকতার প্রতি সম্রাটের পরিপূর্ণ আস্থা হয়। বিদ্রোহের কল্পনা পর্যন্ত হয় না। শুধু বিদ্রোহের ধারণা হলেও অপসারণ করে দেয়া হয়। কিন্তু দুনিয়ার রাজা-বাদশাদের জ্ঞান ত্রুটিপূর্ণ। এ জন্য যার উপর আস্থা রেখেছিল, সেও বিদ্রোহ করতে পারে। বিদ্রোহ না করলেও অন্ততঃ এর সম্ভাবনা তো অবশ্যই থাকে। এর পরিপন্থী আল্লাহর জ্ঞানে ভুলত্রুটির কোন সম্ভাবনাই নেই। অতএব, তিনি যাকে মনোনীত করেন, তার মধ্যে বিদ্রোহের সম্ভাবনাও থাকে না। ইরশাদ রয়েছে-

مَاكَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلُ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللهِ .

৭. হাফিজ আসকালানী র. বলেন-

ومن المناسبات البديعة الوجيزة ان الكتاب لما كان موضوعا لجمع وحي السنة صدره ببدء الوحي لبيان الاعمال الشرعية صدره بحديث الاعمال .

অর্থাৎ, সর্বোত্তম ও সংক্ষিপ্ত মিল হল, যেহেতু গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ওহীয়ে সুন্নত সংকলনের উদ্দেশ্যে, সেহেতু ওহীর সূচনার কথা প্রথমে বর্ণনা করেছেন। যাতে জানা হয়ে যায় যে, এ গ্রন্থে যা কিছু রয়েছে তার সূচনা কিভাবে হয়েছে? এবং ওহী দ্বারা উদ্দেশ্য শরঈ আমলের বিবরণ দান। এ জন্য সর্বপ্রথম انما الاعمال بالنيات হাদীস এনেছেন, যাতে আমল ঠিক করার পদ্ধতি বাতলে দেয়া হয়েছে।

ওহীর জন্য সুন্দর নিয়্যতের শর্ত রয়েছে। এর দ্বারা এ কল্পনাও যেন না হয় যে, ওহী একটি অর্জিত জিনিস। যেমন- মু'তাযিলা ও কাদিয়ানীরা বলে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল, ওহীয়ে নবুওয়ত শুধু আল্লাহ প্রদত্ত দান। কোন ব্যক্তি যতই রিয়াযত-মুজাহাদা আর সাধনাই করুন না কেন, তার মধ্যে যতই যোগ্যতার জওহর থাকুক না কেন, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত তার প্রতি ওহী আসতে পারে না।

মোটকথা, নবুওয়ত ও রিসালত কোন ডিগ্রী নয়। বরং এটি একটি দায়িত্ব। আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পন ছাড়া তা কেউ পেতে পারে না। দুনিয়াতে এরূপ শত শত লোক রয়েছে, যারা উঁচু ডিগ্রী অর্জন করেছে, কিন্তু কোন দায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। এরূপভাবে ভূপৃষ্ঠে এরূপ অনেক লোক রয়েছেন, যাদের অন্তরে নবুওয়তের বিশাল দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা আছে, কিন্তু নবী নন। কারণ, এটা দায়িত্ব, আল্লাহ তা'আলার দান। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা এ থেকে বঞ্চিত রাখেন। ইরশাদ রয়েছে-

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

'আল্লাহ জানেন, তিনি কাকে রাসূল বানাবেন।'

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلاً وَّمِنَ النَّاسِ

'আল্লাহ তা'আলা মানব ও ফেরেশতা থেকে রাসূল মনোনীত করেন।'

যেহেতু প্রমাণিত হল, নবুওয়ত কোন ডিগ্রী নয়; বরং দায়িত্ব, সেহেতু মালিক যখন চান, তখন দায়িত্ব অবশিষ্ট রাখেন। আর যখন ইচ্ছা করেন, তখন তা বাতিল করে দেন। অতএব, রিসালতের দায়িত্ব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর খতম করে দিয়েছেন। এবার হাজার যোগ্যতাসম্পন্ন লোক হতে পারেন, কিন্তু নবী হতে পারেন না। যদি নবুওয়তের ব্যাপারে সামান্যও অবকাশ থাকত, তবে হযরত উমর ফারুক রা. অবশ্যই নবী হতেন। যেমন- প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لو كان بعدي نبيّ لكان عمر رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ .

حدثنا : হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কিরামের পারিভাষিক শব্দগুলোর মধ্য থেকে একটি হল- حدثنا অনুরূপ আরো শব্দ রয়েছে, যেমন- اخبرنا ও انبانا ইত্যাদি।

মুতাকাদ্দিমীন ও অনুসরণীয় ইমামগণ ও ইমাম বুখারী র.-এর মতে تحديث, اخبار এবং انباء তে কোন পার্থক্য নেই। রাবীর ইখতিয়ার আছে, যে কোন শব্দেই বিবরণ দিতে পারেন। অবশ্য মুতাআখখিরীন ও ইমাম মুসলিম র.-এর মতে পার্থক্য আছে। যখন উস্তাদ পড়েন ও শিষ্য শুনেন, তখন রেওয়ায়াতকালে শিষ্যের উচিত حدثنا فلان অথবা سمعت فلانا পড়া। আর যদি উস্তাদের সামনে শিষ্য পড়ে, তবে রেওয়ায়াতের সময় শিষ্য বলবে اخبرنا । এটাই ইমাম শাফিঈ র. ও নাসাঈ র. -এর মাযহাব। রেওয়ায়াত গ্রহনের সমস্ত পদ্ধতি ইমাম বুখারী র. কিতাবুল ইলমে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এ জন্য বিস্তারিত বিবরণ তো স্বস্থানে আসবে। কিন্তু যেহেতু এ শব্দটি শুরুতেই এসেছে, সেহেতু কয়েকটি বিষয় আরয করা হচ্ছে- ১. বুখারী ও মুসলিমে প্রচুর পরিমাণ حدثنا , নাসাঈ শরীফে প্রচুর পরিমাণ اخبرنا , মুসান্নাফে আবদুর রয্যাক ও মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে প্রচুর পরিমাণ انبانا শব্দ পাওয়া যাবে।

২. মুহাদ্দিসীনে কিরামের রীতি হল, সনদের শুরুতে حدثنا অথবা اخبرنا মোটা অক্ষরে লিখেন। এরপর এই সনদে পুনরায় এই শব্দটি এলে কিতাবের সাধারণ ইবারতের ন্যায় লিখেন। যাতে শুরু ও মধ্যখানে পার্থক্য হয়ে যায়। মোটা অক্ষর দেখে প্রথম দৃষ্টিতে বুঝা যায়, সনদের শুরু এখান থেকে।

৩. আরেকটি রীতি হল, সনদের মাঝখানে اخبرنا ও حدثنا লিখলে এসব শব্দের পূর্বে قال শব্দও লিখেন। কিন্তু কোন কোন সময় এই قال শব্দটিকে লিপিতে বাদ দেন। কিন্তু পড়াতে অবশিষ্ট থাকে। অতএব, حدثنا قال اخبرنا পড়া উচিত।

৪. সংক্ষেপেরও একটি রীতি প্রাচীন যুগ থেকে চলে আসছে। সেটা হল, حدثنا -এর পরিবর্তে শুধু ثنا অথবা শুধু نا লিখেন। আর اخبرنا এর পরিবর্তে أنا লিখেন। পড়ার সময় حدثنا ও اخبرنا পড়া চাই।

হুমাইদী

শব্দটির হা-এর উপর পেশ, মীম-এর উপর যবর। এই নামের দুজন মুহাদ্দিস অতিক্রান্ত হয়েছেন। তিনি ইমাম বুখারী র.-এর উস্তাদ, ইমাম শাফিঈ র.-এর সমকালীন। তাঁর নাম আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর। উপনাম আবু বকর। তাঁর পূর্বপুরুষ হুমাইদ ইবনে উসামার দিকে সম্বন্ধ করে হুমাইদী বলা হয়। তাঁর ওফাত হয়েছে ২১৯ হিজরীতে মক্কা মুকাররমায়। -উমদাহ।

গুরুত্বপূর্ণ একটি ফায়দা

বুখারী র.-এর উস্তাদ হুমাইদী র. উঁচু পর্যায়ের মুহাদ্দিসও আবার গ্রন্থকারও। মুসনাদে হুমাইদী তাঁর উঁচু পর্যায়ের একটি গ্রন্থ। এটি সুমহান মুহাদ্দিস আবুল মাআছির মাওলানা হাবীবুর রহমান আজমী র.-এর গুরুত্বপূর্ণ তা'লীক সহকারে হায়দারাবাদে ছাপা হয়েছে। পাঠকের খেদমতে মুসনাদে হুমাইদীর একটি উৎকৃষ্ট তোহফা আমরা (অর্থাৎ, মাওলানা আবদুল জব্বার আজমী র.) পেশ করতে চাই।

দ্রষ্টব্য ঃ মুসনাদে হুমাইদী ঃ ২/হাদীস নং ৬১৪।

حدثنا الحميدى قال ثنا الزهرى قال اخبرني سالم بن عبد الله عن ابيه قال رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا افتتح الصلوة رفع يديه حذو منكبيه واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع راسه من الركوع فلا يرفع ولا بين السجدتين فاغتنم وتشكر .

পরবর্তীতে আরেক হুমাইদী অতিক্রান্ত হয়েছেন, যিনি 'আল জম'উ বাইনাস সহীহাইন' নামক গ্রন্থের লেখক। তার নাম মুহাম্মদ আবু নসর। উপনাম আবু আবদুল্লাহ। তাঁর ওফাত হয়েছে ৪৮৮ হিজরীতে।

قال حدثنا سفيان তিনি হলেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা। তিনি ইমাম আজম র.-এর একজন ছাত্র। ইমাম শাফিঈ র.-এর উস্তাদ। ৯১ বছর বয়সে ১৯৮ হিজরীতে তিনি ওফাত লাভ করেন।

ولد سنة سبع ومائة وتوفي في غرة رجب سنة ثمان وتسعين ومائة -উমদাহ।

তিনি তাবে তাবিঈনের অন্তর্ভূক্ত।

قال حدثنا يحى بن سعيد الانصاري প্রসিদ্ধ তাবিঈ মুহাদ্দিস ও ফকীহ। ১৪৩ হিজরীতে ওফাত লাভ করেছেন। ইমাম আজম আবু হানীফা ও ইমাম মালিকের ন্যায় আইম্মায়ে কিরাম তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ابن শব্দের হামযা সংক্রান্ত মূলনীতি

ابن শব্দটি যদি বংশীয় দুটি নামের মাঝখানে হয় এবং ابن শব্দটি পূর্বের নামের সিফত হয় এবং সে ابن শব্দটি মুযাফ হয় অন্য আরেকটি নামের দিকে এবং মুফরাদ হয়, তবে ابن এর হামযা উহ্য করে দেয়া হবে। কিন্তু যদি একটি শর্তও ফওত হয়ে যায়, তবে হামযা লেখা হবে। যেমন يحى بن سعيد -এর মধ্যে ابن শব্দটি দুইটি বংশীয় নামের মাঝখানে হয়েছে এবং ابن শব্দটি ইয়াহইয়ার সিফত। সাঈদ ইয়াহইয়ার পিতা। ابن শব্দটিও মুফরাদ এবং দ্বিতীয় নাম সাঈদের দিকে মুযাফ। অতএব, يحى بن سعيد এর মধ্যে ابن এর আলিফ উহ্য করে দেয়া হবে। তাছাড়া যদি ابن -এর পূর্বে কোন নাম না থাকে, তবে ابن এর হামযা লেখাও হবে, পড়াও হবে। যেমন- ابن عمر ، ابن عباس ، ابن مسعود ইত্যাদি।

মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম তাইমী

তিনি প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য তাবিঈ। হযরত ইবনে উমর রা. থেকে হাদীস শুনেছেন। তাঁর ওফাত হয়েছে মদীনা মুনাওয়ারায় ১২০ হিজরীতে।

انه سمع علقمة بن وقاص الليثى তাঁর উপনাম আবু ওয়াকিদ। নাম আলকামা। ওয়াক্কাস শব্দটির কাফ-এর উপর তাশদীদ। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে তিনি তাবিঈনের অন্তর্ভূক্ত। ইবনে মান্দা তাকে সাহাবায়ে কিরামের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। অন্যরা তাবিঈনের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে ওফাত লাভ করেছেন। -কাসতাল্লানী ঃ ১/৮৮।

সতর্কবানী

আমাদের বুখারী শরীফের ভারতীয় কপির টীকা কাসতাল্লানীর বরাতে ذكره ابن المنذر من الصحابة ইবারতে লিপিকারের ভুল হয়েছে। লিপিকার ইবনে মান্দার পরিবর্তে ইবনুল মুনযির লিখে দিয়েছেন।

-কাসতাল্লানী ঃ ১/৮৮।

আল্লামা আইনী র. ও হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী র. সবাই এটাই লিখেছেন।

উমর ইবনুল খাত্তাব

তাঁর নাম হল, উমর। (মীম-এর উপর যবর) উপনাম আবু হাফস। উপাধি ফারুক। হস্তিবাহিনীর ঘটনার ১৩ বছর পর তাঁর জন্ম হয়। ২৭ বছর বয়সে নববী ৬ষ্ঠ সনে তিনি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সাইয়্যিদেনা আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর ওফাতের পর ১৩ হিজরীতে মসনদে খেলাফতে সমাসীন হন। ১০ বছর, ৬মাস, ৫দিন খেলাফতের সিংহাসনকে সুশোভিত করে রাখেন। ফজরের নামাযে আবু লূলূ অগ্নি উপাসকের হাতে ২৭শে জিলহজ্জ, ২৩ হিজরীতে বুধবার দিন আহত হন। ৫ম দিন, ১লা মুহররম, রবিবার দিন, ৬৩ বছর বয়সে শাহাদত লাভ করেন। পবিত্র রওযায় হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. এর পাশে সমাহিত হন।

হাদীসের ব্যাখ্যা

এটি সহীহ বুখারীর সর্বপ্রথম হাদীস। এর সনদের শুরুতে ইমাম বুখারী র.-এর উস্তাদ শাইখ হুমাইদী র. এবং সহীহ বুখারীর সর্বশেষ হাদীসের সনদের শুরুতে ইমাম বুখারী র.-এর এক উস্তাদ আহমদ ইবনে আশকাব। উভয়ের মূলধাতু حمد । এটি ইমাম বুখারী র.-এর সূক্ষ্মদৃষ্টির চুড়ান্ত প্রমাণ যে, হামদ দ্বারা শুরু করে হামদের উপর শেষ করেন। এটা الحمد لاوله و آخره এর দিকে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত।

انما الاعمال بالنيات

সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিধানবিদের মতে انما শব্দটি সীমাবদ্ধতা বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আল্লামা আইনী র. বলেন- انما للحصر وهو اثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه -উমদাহ ঃ ১/২৫।

اعمال এটি আমলের বহুবচন। কামূস গ্রন্থকার عمل এবং فعل শব্দটিকে সমার্থক সাব্যস্ত করেন। কিন্তু বাস্তবতা হল, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। যদিও কোন কোন সময় উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। فعل ব্যাপক। নিঃশর্ত কাজকে বলে। ঐচ্ছিক হোক, বা অনৈচ্ছিক। আর عمل শুধু মুকাল্লাফের ঐচ্ছিক কর্মকে বলে। প্রবল ধারণা একারণেই হাদীস শরীফে انما الاعمال বলা হয়েছে, افعال বলা হয়নি। কারণ, افعال এর প্রয়োগ মানব ও জীব-জন্তু উভয়ের কাজের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর আমলের প্রয়োগ মানুষের কর্মের সাথে বিশেষিত। অতএব, فعل البهائم বলা হবে, عمل البهائم বলা হবে না।

نية - نيّات এর বহুবচন। نية শব্দটির ইয়া-এর উপর তাশদীদ। অবশ্য কোন কোন সময় তাশদীদ ছাড়াও ব্যবহৃত হয়। নিয়্যতের আভিধানিক অর্থ হল, অন্তরের পরিপক্ক ইচ্ছা। সুদৃঢ় ইরাদা। চাই যে কোন জিনিসেরই হোক না কেন। শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইবাদতের সংকল্পকে নিয়্যত বলে।

عزم ، قصد ، نيت

এগুলো সুদৃঢ় ইচ্ছার ক্ষেত্রে মুশতারাক বা যৌথ। তবে কিছু পার্থক্য আছে। আয্‌ম হল, সে দৃঢ় ইচ্ছা যা কাজের পূর্বে হয়ে থাকে। কস্‌দ হল, সে ইচ্ছা যেটি কর্মের সাথে মিলিত হয়ে থাকে। নিয়্যত হল, সেই ইচ্ছা যেটি আমলের সাথে মিলিত হয় এবং মনে মনে থাকে। অর্থাৎ, আমলের চুড়ান্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রতি খেয়াল থাকে।

উল্লেখ্য, **نيت ، قصد ، عزم** তিনটি নশ্বর ইচ্ছার নাম। একারণে আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে এগুলোর প্রয়োগ হয় না। যেহেতু ইরাদায় নশ্বরতার বৈশিষ্ট্য নেই, সেহেতু এটি আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়। যেমন- يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ । কারণ, আল্লাহ তা'আলার কাজগুলো স্বার্থপ্রনোদিত নয়।

আলোচনা ও প্রশ্ন

انما الاعمال بالنيات এখানে সর্বপ্রথম জানা প্রয়োজন যে, বা হরফে জারের উহ্য মুতাআল্লাক কোনটি? যাতে হাদীসের অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায়। শাফিঈ প্রমূখের মতে تصح উহ্য আছে। অর্থাৎ, انما الاعمال تصح بالنيات অথবা انما صحة الاعمال بالنيات তথা কোন আমল নিয়্যত ছাড়া সহীহ হয় না। অতএব, এই ব্যাপকতায় অযুও অন্তর্ভূক্ত। কাজেই যদি কেউ নিয়্যত ছাড়া অযু করে, তবে তার অযু সহীহ নয়। এ অযু দ্বারা নামায হবে না।

হানাফীগণ বলেন, تثاب শব্দ উহ্য আছে। অর্থাৎ, انما الاعمال تثاب بالنيات. বা ثواب الاعمال بالنيات। মোটকথা, সবাই নিজ নিজ মাযহাবের দিকে লক্ষ্য রেখে উহ্য শব্দ মেনে নেন।

এ বিষয়ে উভয় পক্ষের ঐকমত্য রয়েছে যে, আমল দ্বারা উদ্দেশ্য ইবাদত। কারণ, الاعمال শব্দটিতে আলিফ লাম ইসতিগরাকী নয়। কারণ, ছাদের উপর থেকে যে পড়ে যায়, তার পড়ার নিয়্যত থাকে না। হোচট খানেওয়ালার হোচট খাওয়ার নিয়্যত থাকে না। তাছাড়া কেউ কাপড় এবং শরীর পরিস্কার করার জন্য এবং চুরি ও জিনায় দণ্ডবিধি বাস্তবায়নের জন্য নিয়্যতের শর্ত আরোপ করেন না। এরূপভাবে ভুলক্রমে হত্যাকে خطا ই বলা হয়। কারণ, এতে হত্যার নিয়্যত থাকে না। তা সত্ত্বেও সবাই এতে রক্তপণের নির্দেশ দেন। এতে বুঝা গেল, الاعمال শব্দে আলিফ লাম আহদী বা সুনির্দিষ্ট বস্তু বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আমল দ্বারা উদ্দেশ্য ইবাদত। ইবাদতে মাকসূদা যেমন - নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতে সর্বসম্মতিক্রমে নিয়্যত শর্ত। নিয়্যত ছাড়া কোন আমল ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত হবে না। না এর ফলে ইবাদতের সওয়াব পাওয়া যাবে। অতএব, নিয়্যতবিহীন অযু সত্তাগতভাবে সহীহ হয়ে যাবে। কিন্তু সওয়াব পাওয়া যাবে না।

হাদীসের বিবরণের প্রেক্ষাপট

যেরূপভাবে আয়াতের শানে নুযূল হয়ে থাকে, এরূপভাবে কোন কোন সময় হাদীস শরীফেরও বর্ণনার কারণ হয়ে থাকে। অর্থাৎ, যে ঘটনায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস বর্ণনা করেছেন। এজন্য আল্লামা আইনী র. লিখেন-

عن ابن مسعود رض كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها امّ قيس فابت الخ. عمدة ١/٢٨.

অর্থাৎ, এক ব্যক্তি উম্মে কায়েস নাম্নী এক মহিলার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। উম্মে কায়েস শর্তারোপ করে, তুমি হিজরত করলে তোমার সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হব। ফলে লোকটি বিয়ের খাতিরে হিজরত করে। এ জন্য লোকজন তাকে মুহাজিরে উম্মে কায়েস বলতেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ঘটনা জানতে পেরে একটি খুৎবা দেন। তাতে তিনি انما الاعمال بالنيات الخ হাদীস বর্ণনা করেন। এটিও একটি স্বীকৃত বিষয় যে, তৎকালীন যুগে হিজরত ফরয ছিল। অতএব, যদি শাফিঈদের উক্তি অনুযায়ী প্রতিটি আমলের বিশুদ্ধতার জন্য নিয়্যত শর্ত হয়, তবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু এই সতর্কবানীর উপর কেন ক্ষান্ত করলেন? তাকে তিনি একথা কেন বললেন না যে, তোমার হিজরত সহীহ হয়নি, তুমি পুনরায় মক্কায় যাও, অতঃপর হিজরত করে আস? যেমনিভাবে বলেছিলেন-

قم فصل فانك لم تصل

তাজ্জবের বিষয় হল, যে হাদীসটি হানাফীদের প্রমাণ, শাফিঈদের পরিপন্থী তারা সেটাকে নিজের প্রমাণ ও হানাফীদের বিরোধী বলেন। শুনুন, হিজরতও ইবাদতে গাইরে মাকসূদা। যেরূপভাবে অযু। কারণ, মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তো ইকামাতে দীন। যখন শরঈ বিধিবিধান আদায় করা জটিল হয়ে পড়ে, তখন শরায়েত অনুযায়ী হিজরতের নির্দেশ হয়, অন্যথায় নয়। একারণেই মক্কা বিজয়ের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- لا هجرة بعد الفتح অতএব, যেরূপভাবে অযু ইবাদতে গাইরে মাকসূদা, অনুরূপভাবে হিজরতও গাইরে মাকসূদা। বস্তুতঃ মুহাজিরে উম্মে কায়েসের হিজরত শরঈ নিয়্যতে হয়নি। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হিজরতকে বাতিল সাব্যস্ত করেননি। বরং যা কিছু বলেছেন, তার সারমর্ম এই যে, তার হিজরত মকবূল হয়নি। এর ফলে সওয়াব পাবে না। এতে প্রমাণিত হল, এ রেওয়ায়াতটি হানাফীদের প্রমাণ। শাফিঈদের এর উত্তর দিতে হবে।

আইম্মায়ে কিরামের মূল ইখতিলাফ

হানাফীগণও উযূ ইবাদত হওয়ার জন্য নিয়্যত শর্ত সাব্যস্ত করেন এবং স্বীকার করেন যে, নিয়্যত ছাড়া উযূ ইবাদতের পর্যায়ে আসবে না। কিন্তু এটি নামাযের চাবিও হতে পারবে না-তা নয়। কারণ, যে সব আমল উসিলা এবং নামাযের শর্ত, যেমন সতর ঢাকা, কাপড় ও শরীরের পবিত্রতা এগুলোতে সওয়াব অর্জনের জন্য নিয়্যত জরুরী। কিন্তু বিশুদ্ধতা ও উসিলা হওয়ার জন্য নিয়্যত জরুরী নয়। কারণ, এমতাবস্থায় সরাসরি উযূ ইবাদত নয়। বরং ইবাদতের উসিলা। এ ওযু দ্বারা নামায সহীহ হয়ে যাবে।

প্রশ্নোত্তর

◆ হানাফীদের উপর প্রশ্ন হয়, যেরূপভাবে উযূ উদ্দিষ্ট ইবাদত নয়, এরূপভাবে তায়াম্মুমও উদ্দিষ্ট ইবাদত নয়। তাহলে হানাফীদের মতে উযূতে নিয়্যত ফরয না হওয়া এবং তায়াম্মুমে ফরয হওয়ার কারণ কি?

উত্তর ঃ ১. কুরআনে হাকীম ওযূ সম্পর্কে বলেছে- فاغسلوا الخ আর তায়াম্মুম সম্পর্কে বলেছে- فتيمموا صعيدًا طيّبًا। গোসল শব্দটি নিয়্যত বুঝায় না। আর তায়াম্মুম শব্দটি নিয়্যত বুঝায়। অতএব, হানাফীরা কুরআনের শব্দের প্রতি লক্ষ্য করেছেন। অতএব, হানাফীদের এ পদ্ধতি প্রশংসার্হ, প্রশ্নযোগ্য নয়।

২. ওযূ নিয়্যত ফরয সাব্যস্ত করা হয়, তবে অস্পষ্ট ও বিভিন্ন সম্ভাবনা বিশিষ্ট খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কিতাবুল্লাহর উপর বর্ধিত করণ আবশ্যক হবে। এটাতো জায়েয নেই। পক্ষান্তরে তায়াম্মুমে নিয়্যতকে জরুরী সাব্যস্ত করলে কিতাবুল্লাহ উপর বর্ধিতকরণ আবশ্যক হয় না। বরং আল্লাহ তা'আলার হুকুম তা'মিল হয়।

৩. পানি স্বভাবতই পবিত্রকারী। আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ রয়েছে-

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طهورًا . سورة الفرقان.

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. سورة الأنفال.

এতে বুঝা গেল, পানি স্বভাবত পবিত্রকারী এবং উযূ দ্বারা উদ্দেশ্য পবিত্রতাই। কিন্তু মাটি স্বভাবত পবিত্রকারী নয়। বরং মাটিতো আরো ময়লা করে। অতএব, এর দ্বারা পবিত্রতা নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া তায়াম্মুমের অর্থ ইচ্ছা করা।

৪. তাছাড়া মূল তো মূলই। আর স্থলাভিষিক্ত স্থলাভিষিক্তই। অতএব, মূল ও স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দাবিও তায়াম্মুমে নিয়্যত কে জরুরী সাব্যস্ত করা।

وانما لكل امرئ ما نوى এ রেওয়ায়াতে তিনটি অংশ তথা তিনটি বাক্য রয়েছে। প্রথম বাক্য হল, انما الاعمال بالنيات এর সারমর্ম হল, আল্লাহ তা'আলার নিকট আমলের অস্তিত্ব হয় নিয়্যত দ্বারা। অর্থাৎ, সে আমলই ধর্তব্য হবে, যাতে নিয়্যত রয়েছে।

দ্বিতীয় বাক্য হল- انما لامرئ ما نوى এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যেরূপ নিয়্যত হবে এবং যত নিয়্যত হবে, আমলের অস্তিত্ব সেরূপ এবং সে পরিমাণ হবে। অর্থাৎ, নিয়্যতে যে পরিমাণ ইখলাস বেশি হবে, সে পরিমাণ সওয়াব বেশি হবে। তাছাড়া একটি আমলে যে পরিমাণ নিয়্যত হবে (অর্থাৎ, এক আমলে যদি বিভিন্ন নিয়্যত থাকে) তবে সবগুলোর সওয়াব পাবে, সে পরিমাণ আমলের প্রতিদানই লাভ হবে। যেমন- এক ব্যক্তি মসজিদে শুধু নামায পড়তে আসে, আরেক জন সাথে সাথে ই'তিকাফেরও নিয়্যত করে, তাহলে প্রথম ব্যক্তির একটি আমলের সওয়াব হবে, আর দ্বিতীয় ব্যক্তির সওয়াব হবে দুটি আমলের।

প্রশ্নোত্তর

এখানে একটি প্রশ্ন হয়, এর দ্বারা তো বাহ্যত বুঝা যায়, যে যেরূপ নিয়্যত করবে, তাই বাস্তব ফল দাড়াবে। ইসলামী আইনবিদগণ বলেন, যদি কেউ রমযানের নফল রোযার নিয়্যত করে, তবেও ফরযই আদায় হবে। অতএব, এখানে নিয়্যত অনুযায়ী ফল বাস্তবায়িত হয়নি।

উত্তর ঃ রমযান যেহেতু নফলের স্থান নয়, সেহেতু নফলের নিয়্যত নিরর্থক হয়ে যাবে। তাছাড়া এই উত্তরও দেয়া যেতে পারে যে, ফরযের মধ্যে নফল অন্তর্ভূক্ত। যেন ফরয নফল ইবাদত অতিরিক্ত বিষয় সহ। এমতাবস্থায় নিয়্যত অনুযায়ী ফল হল, তবে অতিরিক্ত জিনিস সহ।

তৃতীয় বাক্য হল, فمن كانت هجرته الخ এটি দ্বিতীয় বাক্যটির বিস্তারিত বিবরণ। এর উদাহরণ এরূপ মনে করুন, যেমন- বীজ, বৃক্ষ ও ফল। নিয়্যত হল, বীজের পর্যায়ভূক্ত। এই বীজ থেকে বৃক্ষের সৃষ্টি হল, আমল। এর উপর মালিকের সম্পূর্ণ মনোযোগ ও কম ব্যস্ততার কারণে কমবেশ সাত শ পর্যন্ত শস্যদানা গাছে ধরে। যদি বীজ বপণের পর তাতে পানি সিঞ্চন না করা হয়, তত্ত্বাবধান না করা হয়, তবে একটি শস্যদানাও হত না। পরবর্তীতে এ ফলের মিষ্টতা অথবা তিক্ততা ইত্যাদি দানার জাতের উপর নির্ভরশীল। এরূপভাবে নিয়্যত খারাপ হলে ফলও খারাপ হবে। নিয়্যত যদি ভাল হয়, সওয়াবও ভাল হবে।

হাদীস সংক্ষিপ্তকরণ

এই মাসআলায় মতবিরোধ আছে যে, হাদীস সংক্ষিপ্তকরণ জায়েয কি না। (উমদাহ, ফাতহ) প্রধানতম উক্তি এবং বিশুদ্ধতম মাযহাব হল, শাস্ত্রবিশেষজ্ঞের জন্য জায়েয আছে। অন্যদের জন্য জায়েয নেই।

এর কারণ স্পষ্ট যে, অবিশেষজ্ঞের সংক্ষিপ্তকরনে আশংকা হয় যে, অবশিষ্ট হাদীসের বিষয় গোলমাল হয়ে যেতে পারে। এর পরিপন্থী বিশেষজ্ঞের ব্যাপার। তিনি মাঝখান থেকে সংক্ষেপ করুন অথবা শেষ থেকে, তাতে অবশ্যই এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখবেন যে, রেওয়ায়াতের অবশিষ্ট বিষয়ে কোন ব্যাঘাত হয় কি না। সহীহ বুখারীর এটি হল প্রথম হাদীস। হযরত ইমাম বুখারী র. একটি বাক্য

فمن كانت هجرته الي الله ورسوله فهجرته الي الله ورسوله

উহ্য করে সংক্ষেপের বৈধতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তাছাড়া ইমাম বুখারী র.-এর সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় যে, একটি সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে সতর্ক করেছেন যে, ইলমে দীন অর্জনে ছাত্র-শিক্ষকের জন্য জরুরী হল, কমপক্ষে খারাপ নিয়্যত যেন না হয়। কারণ, উপকার লাভের তুলনায় ক্ষতি প্রতিরোধের বিষয়টি অগ্রগণ্য। অতএব, ইমাম বুখারী র.

فمن كانت هجرته الي الله ورسوله فهجرته الي الله ورسوله

বাক্য ছেড়ে দিয়েছেন একথা বুঝানোর জন্য যে, নিয়্যত যেন খারাপ না হয়। হ্যাঁ, যদি নিয়্যত ভাল হয়, তবে নূরুন আলা নূর- সোনায় সোহাগা।

প্রশ্নোত্তর

প্রথম বাক্য فمن كانت هجرته الي الله ورسوله فهجرته الي الله ورسوله শর্ত এবং জাযায় পার্থক্য জরুরী। অথচ এখানে রয়েছে ঐক।

উত্তর ঃ ভিন্নতা কখনো শাব্দিক হয়, আর কখনো অর্থগত, যেমন – شعرى شعرى، انا انا ، انا ابو النجم ইত্যাদিতে শাব্দিক মিল রয়েছে। কিন্তু অর্থগতভাবে ভিন্নতা রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল, ' شعرى شعرى الكامل انا انا الكامل ، انا مشهور بابي النجم আমার বর্তমান কালের কাব্য পূর্ণাঙ্গই আছে। আর আমি হলাম সে কামিল পুরুষ এবং আমি প্রসিদ্ধ আবুন নজম উপনামে।

এরূপভাবে এখানেও এটাই উদ্দেশ্য।

من كانت هجرته الي الله ورسوله نيةً وقصدا فهجرته الي الله ورسوله اجرا وثوابًا –

او الى امرأة ينكحها الخ

এখানে একটি প্রশ্ন হয়, যেহেতু মহিলা দুনিয়ার অন্তর্ভূক্ত, অতএব, তাকে আলাদা কেন উল্লেখ করলেন?

এর বিভিন্ন উত্তর দেয়া হয়েছে- ১. এটা হল, আমের পর খাস করার অন্তর্ভূক্ত। দুনিয়ার সমস্ত ফিৎনার মধ্যে মহিলার ফিৎনা সবচেয়ে মারাত্মক। যেমন- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنِ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ الخ -সূরা আলে ইমরান।

এই আয়াতে কারীমায় পার্থিব ভোগসম্ভার থেকে নারী জাতির সর্বাগ্রে উল্লেখ এদের মহা ফিৎনা হওয়ার প্রমাণ।

আরেক আয়াতে রয়েছে- اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি হল, ফিৎনার কারণ। অতএব, নারী জাতি যারা ভোগসম্ভারগুলোর মধ্য থেকে সর্বাগ্রে উল্লেখিত, তারা কত বিপদজনক ফিৎনা হবে! ইরশাদে নববী রয়েছে-

ما تركت بعدي فتنة اضر علي الرجال من النساء

٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقاً .

২. 'আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ র. .... উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. থেকে বর্ণিত, হারিস ইবন হিশাম রা. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নিকট ওহী কিভাবে আসে?' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কোন কোন সময় তা ঘন্টাধ্বনির ন্যায় আমার নিকট আসে। আর ওহীর এ ধরণটি-ই আমার উপর সবচাইতে কষ্টদায়ক হয়। অতঃপর এ ধরণ সমাপ্ত হতেই ফিরিশতা যা বলেন, আমি তা মুখস্থ করে নিই। আবার কখনো ফিরিশতা মানুষরূপে আমার সাথে কথা বলেন। তিনি যা বলেন, আমি তা মুখস্থ করে ফেলি। 'হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি প্রচণ্ড শীতের দিনে ওহী নাযিলরত অবস্থায় তাঁকে দেখেছি। ওহী শেষ হলেই তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়ত।

হাদীসের পুনারাবৃত্তি

এই হাদীসটি ইমাম বুখারী র. দুই স্থানে এনেছেন- ১. বাদউল ওয়াহীতে ২. বাদউল খালকে। পৃষ্ঠা ৪৫৭। তাছাড়া এই হাদীসটি মুসলিম ঃ ১/২৫৭, তিরমিযী কিতাবুল মানাকিব ঃ ২/ ২০৪, নাসাঈ কিতাবুল ইফতিতাহ ঃ ১/ ১৪৩ - ১৪৮- এ আছে।

হাদীস বর্ণনাকারীদের পরিচিতি

বর্ণনাকারী মোট ৬জন- ১. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ। তিনি ইমাম বুখারী, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন ও ইমাম যুহলী র.-এর ন্যায় মুহাদ্দিসীনে কিরামের উস্তাদ। ইমাম মালিক ও লাইছ ইবনে সা'দ র.-এর ন্যায় সুমহান আইম্মায়ে কিরামের শিষ্য। সিহাহ সিত্তায় তিনি ছাড়া অন্য কোন আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ নেই। তাঁর ওফাত হয়েছে মিসরে ২১৮ হিজরীতে। মূলতঃ তিনি দামেশকের অধিবাসী। পরবর্তীতে তিনি তিন্নীসে এসে অবস্থান করেন।

২. তিন্নীস (তা-এর নিচে যের। তাশদীদযুক্ত নূনের নিচেও যের এবং সীন-এর উপর জযম। সর্বশেষে সীন।)

একটি শহর ছিল, যেটি তিন্নীস ইবনে হাম ইবনে নূহ আ.-এর নামে মিসরের সীমান্তে সমূদ্র তীরে আবাদ ছিল। কিন্তু বর্তমানে (আল্লামা আইনী র.-এর যুগে) উজাড় হয়ে যায়। এর দিকে সম্বন্ধ করে তাঁকে তিন্নীসী মিসরী বলা হয়।

৩. ইউসুফ। এটি ইবরানী (হিবরু)শব্দ। এর অর্থ হল, সুদর্শন চেহারার অধিকারী। অতএব, উজমা ও আলামিয়াতের কারণে গাইরে মুনসারিফ। -উমদাতুল কারী ঃ ১/৩৬।

৪. মালিক। তিনি অনুসরনীয় আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের মধ্য থেকে অন্যতম সুমহান এক মনীষী। ইমাম শাফিঈ ও ইমাম মুহাম্মদ র.-এর ন্যায় মহান ইমামগণ তাঁর শিষ্য। জন্ম -৯৪হিজরী। ওফাত-১৭৯ হিজরী। কবর মুবারক মদীনা মুনাওয়ারার জান্নাতুল বাকীতে।

৫. হিশাম ইবনে উরওয়া। উঁচু শ্রেণীর তাবিঈ। মাদানী। হাফিজে হাদীস। জন্ম-৬১ হিজরী। ওফাত হয়েছে বাগদাদে-১৪৫হিজরীতে।

৬. عن ابيه অর্থাৎ, উরওয়া ইবনে যুবাইর। উপরোক্ত হিশামের জনক। তার উপনাম আবদুল্লাহ। নাম উরওয়া। ওফাত-৯৪হিজরী। সুমহান তাবিঈ। মদীনা তাইয়্যিবার সপ্ত ফকীহের অন্যতম একজন। সিহাহ সিত্তায় তিনি ছাড়া অন্য কোন উরওয়া ইবনে যুবাইর নেই। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও উরওয়া ইবনে যুবাইর নামে কেউ নেই। -উমদাহ।

৭. হযরত আয়েশা রা.। বরকতময় নাম আয়েশা। উপাধি সিদ্দীকা। উপনাম উম্মে আবদুল্লাহ। তাঁর সহোদরা বোন আসমা বিনতে আবু বকর রা.-এর সাহেবযাদা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর রা.-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপনাম রাখেন উম্মে আবদুল্লাহ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত পবিত্র সহধর্মিনী উম্মুল মুমিনীন-মুমিনদের (রূহানী) জননী। যেমন-ইরশাদে ইলাহী রয়েছে- وَاَزْوَاجُه اُمَّهَاتُهُمْ 'নবীর স্ত্রীগণ উম্মতের মা।' -সূরা আহযাব ঃ পারা ২১, রুকূ ১৭।

তাঁর পিতা প্রথম খলীফা সাইয়্যিদেনা আবু বকর সিদ্দীক রা.। এটিও কুদরতের বিশাল অবদান যে, পিতা হলেন রফীকে গার (গারে ছওরের সঙ্গী) আর কন্যা হলেন, রফীকায়ে হায়াত তথা জীবন সঙ্গিনী। তাঁর আম্মা উম্মে রুমান যয়নব বিনতে আমির রা.। হযরত সিদ্দীকা রা. নববী ৪র্থ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। ছয় বছর বয়সে হিজরতের পূর্বে নববী ১০ম সনে হযরত খাদীজাতুল কুবরা রা.-এর ওফাতের পর উম্মুল মুমিনীন উপাধিতে ভূষিত হন। ৩ বছর পর ৯ বছর বয়সে তাঁকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে তুলে আনা হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১৮ বছর।

عن عائشة رض انّ النبي صلي الله عليه وسلم تزوجها وهى بنت ست سنين وبني بها وهى تسع سنين الخ. بخاري ٢:٧٧١.

৬৬ বছর বয়সে ১৭ রমযান মুবারক, ৫৭ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁর ওফাত হয়। হযরত আবু হোরায়রা রা. তাঁর জানাযার নামায পড়ান।

প্রশ্ন ঃ পবিত্র সহধর্মিনীগণ উম্মুল মুমিনীন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন –

وَلَا تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَه مِنْ بَعْدِه اَبَدًا . سورة الاحزاب.

এর দ্বারা বুঝা যায়, সমস্ত সহধর্মিনী উম্মতের উপর চিরস্থায়ীভাবে হারাম। সমস্ত উম্মতের উপর মায়ের ন্যায় তাদের জন্য হারাম। তাহলে তাদের থেকে পর্দা কেন করতে হল?

উত্তর ঃ যে সব মহিলা চিরস্থায়ীভাবে হারাম বংশীয় আত্মীয়তার কারণে অথবা শশুরালয়ের সম্পর্কের কারণে কিংবা দুধ সম্পর্কের কারণে তাদের থেকে পর্দা হয় না। পবিত্র সহধর্মিনীগণ হারাম হয়েছেন উপরোক্ত তিন কারণ ভিন্ন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কারণে শুধুমাত্র আদর-ইহতিরাম ও তা'জীমার্থে, সমস্ত বিধি-বিধানে নয়। এ কারণে তাদের সন্তান-সন্ততির সাথে অন্য মুসলমানদের বিয়ে জায়েয।

২. পবিত্র সহধর্মীনীগণ যে হারাম এটা হল, হায়াতুন্নবীর ফল। যেমন- নবীগণের জীবদ্দশায় তাঁদের উপর অন্যান্য অনেক হুকুম জারী হয়, যেমন- নবীদের দেহ মাটি ভক্ষন করে না। তাঁদের উত্তরাধিকার বন্টিত

হয় না। এরূপভাবে পবিত্র সহধর্মিনীগণ হারাম হওয়ার কারণ হল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এ দুনিয়া ত্যাগ করে যাওয়ার পরেও পার্থিব জীবনের কিছু বিধি-বিধান ও আলামত নিদর্শন পাওয়া যায়। এ কারণে পবিত্র সহধর্মিনীগণ স্বামী বিশিষ্ট হওয়ার কারণে অন্যদের জন্য হারাম। বিবাহিতা স্ত্রীরূপে হারাম হওয়া পর্দার পরিপন্থী নয়।

হারিস ইবনে হিশাম

তিনি হলেন আল্লাহর তরবারী হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-এর চাচাত ভাই। মক্কার ফিরআউন আবু জেহেলের আপন ভাই। বদর ও উহুদ যুদ্ধেও তিনি কুফফারে কুরাইশের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুকাবিলায় আসেন। মক্কা বিজয়ের দিন ঈমান আনয়ন করেন। ইয়ারমূকের যুদ্ধে ১৫ হিজরীতে শহীদ হন। তিনি উঁচুস্তরের সাহাবীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

كيف ياتيك الوحى

হযরত হারিস ইবনে হিশাম রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নিকট কিরূপে ওহী আসে?

এর দ্বারা বুঝা গেল, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা জায়েয আছে। কারণ, ওহী একটি বিস্ময়কর, বিরল ব্যাপার ছিল। এ কারণে ভীষণ আগ্রহের ভিত্তিতে ওহীর ধরণ সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞেস করেছেন। এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই দোদুল্যমানতা ও সন্দেহের ভিত্তিতে ছিল না। ধরণ সম্পর্কে প্রশ্ন ইয়াকীনের প্রমাণ। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জিনিসের অস্তিত্বের ইয়াকীন হয় না, ততক্ষণ এর ধরণ সম্পর্কে প্রশ্নই সৃষ্টি হয় না। যেমন - হযরত ইবরাহীম আ. আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন-

رَبِّ اَرِنِیْ کَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتٰی

'হে আমার প্রভূ! আপনি আমাকে দেখান, কিভাবে মৃতদের জীবিত করেন?'

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন প্রকার প্রতিবাদ না করে উত্তর দেন এবং তাতে ওহীর দুটি প্রকারের বিবরণ দেন।

১. احيانا ياتيني مثل صلصلة الجرس

কখনো কখনো আমার নিকট ওহী আসে ঘন্টির আওয়াজের ন্যায়। احيانا শব্দটি জরফ হিসেবে মানসূব। তাতে আমিল হল পরবর্তী ياتيني শব্দ। -উমদাহ ঃ ১/৪২।

احيان শব্দটি حين এর বহুবচন। সাধারণ সময়। কমবেশি সবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। মোটকথা, শব্দটি কালের একটি মুহূর্ত এবং তার চেয়ে বেশির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

والحاصل ان الحين يطلق على الخطبة من الزمان فما فوق . عمدة.

صلصلة الجرس

صلصلة আভিধানিকভাবে সে আওয়াজকে বলে যা লোহা অথবা পাথরের উপর লোহার শৃংখল টানার ফলে সৃষ্টি হয়। جرس সে ঘুঙুর ঘন্টিকে বলে যা জীব-জন্তুর গলায় ঝুলানো হয়। যাতে চলার সময় নড়াচড়ার কারণে আওয়াজ সৃষ্টি হয়।

আলোচনা ও গবেষণা

এতে আলোচনা হল, ঘন্টির আওয়াজের ন্যায় এ স্বর কিসের ছিল?

এতে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে- ১. আল্লাহ তা'আলার অবিনশ্বর কালামে নফসীর আওয়াজ হত। অর্থাৎ ওহীর আওয়াজ, আল্লাহ তা'আলার আওয়াজ।

২. হযরত জিবরাঈল আমীন আ.-এর আসল আওয়াজ হত।

৩. হযরত জিবরাঈল আ.-এর ডানার আওয়াজ হত। এতে হিকমত ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন ওহীর দিকে মনোযোগী হন। যেমন- প্রথমে মনোযোগী করার জন্য ঘন্টি বাজে। এরপর কথা শুরু হয়। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিসীনে কিরামের মতে এটা ছিল ওহীরই আওয়াজ। ইমাম বুখারী-এর ঝোকও এদিকে। হাফিজ আসকালানী র.প্রমূখের তাহকীকও এটাই। অতএব, আমরা যেমন বলি – له يد له صوت ليس كصوتنا وله ساق ليس كساقنا ليس كيدنا তেমনিভাবে সৃষ্টিকর্তার আওয়াজ সম্পর্কেও বলব- এজন্য হযরত মূসা আ.-এর সাথে যখন কথোপকথন হয়েছে, তখন আওয়াজ কোন এক দিক থেকে শ্রুত হওয়ার পরিবর্তে সর্বদিক থেকে শ্রুত হত।

এমনিভাবে বুখারী শরীফে ইরশাদে নববী রয়েছে-

اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملاءكة باجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسلة على صفوان الخ

'যখন আল্লাহ তা'আলা আসমানে কোন হুকুম দেন (অর্থাৎ, কোন কথা বলেন। -তাবারানী) তখন ফিরিশতারা অক্ষমতার কারণে স্বীয় ডানা মারতে শুরু করে। (অর্থাৎ, আল্লাহর কালাম শুনে বেহুশ হয়ে যায়)। যার ফলে এরূপ আওয়াজ হয় যেমন- স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন পাথরের উপর শৃংখল টানার ফলে হয়ে থাকে।' -বুখারী ঃ ২/১১১৪।

এরপর যখন ফিরিশতারা হুশে আসে, তখন উর্ধ্ব জগতের ফিরিশতাদের অর্থাৎ, নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতাদের নিকট জিজ্ঞেস করে। বলুন, রাব্বুল আলামীন কি ইরশাদ করেছেন? তখন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতারা বলেন, যথার্থ ইরশাদ করেছেন। তিনি সুমহান।

তাছাড়া এ অনুচ্ছেদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস রা. থেকে একটি রেওয়ায়াত আছে-

قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعهم من بعد كما يسمعه من قرب الخ

'তিনি বলেন, আমি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করছিলেন- আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতে বান্দাদের সমবেত করবেন। অতঃপর তাদের এরূপ আওয়াজে আহবান করবেন যে, দুরবর্তী ও নিকটবর্তী সবাই তা সমভাবে শুনবে।' -বুখারী ঃ ২/১১১৪।

এ ধরণের রেওয়ায়াত একত্র করলে বুঝা যায়, ইমাম বুখারী র. আল্লাহ তা'আলার আওয়াজের প্রবক্তা। ঘন্টির আওয়াজের ন্যায় স্বর হল, ওহীর আওয়াজ। বাকী রইল, ওহীর আওয়াজের যথার্থ হাকীকত অনুধাবন। এটা মানুষের বিবেক-বুদ্ধির উর্ধ্বে।

উপমাপ্রদত্ত বিষয়টি প্রশংসিত, যার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে সেটি নিন্দনীয়।

এ আওয়াজ যারই হোক, এটি খুবই প্রশংসিত স্বর ছিল। কারণ, এর সম্পর্ক দরবারে ইলাহীর সাথে। হাদীস শরীফে এটাকে ঘন্টির আওয়াজের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। অথচ ঘন্টির আওয়াজ খুবই নিন্দনীয়। যা করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। ইরশাদে নববী রয়েছে- لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس অর্থাৎ, যে কাফেলায় ঘন্টি থাকে, তার সাথে রহমতের ফিরিশতা থাকে না। -সহীহ মুসলিম।

কিন্তু যেহেতু উপমার কারণ স্পষ্ট, এটি হল ধারাবাহিক ও অবিরত হতে থাকা, এজন্য কোন অসুবিধা নেই। এধরণের বহু উপমা হাদীসে রয়েছে। যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তি সিংহের ন্যায়, তখন সর্ববিষয়ে উপমা দান উদ্দেশ্য হয় না। বরং উপমা দানের একটি বিশেষ গুণ থাকে। অর্থাৎ, বীরত্ব। এরূপভাবে এখানে উপমার কারণ ধর্তব্য। উপমা দ্বারা উদ্দেশ্য উপমাপ্রদত্ত জিনিসটিকে স্পষ্ট করা। এ জন্য তা অবলম্বন করেছেন। এরূপ উচ্চাঙ্গের উপমা দান নবীরই শান। এর চেয়ে উত্তম কোন উপমা হতেই পারে না।

সহীহ মুসলিমে আছে- ان الايمان ليارز الي المدينة كما تارز الحية في جحرها

'ইসলাম মদীনার দিকে ফিরে আসবে, যেমন সাপ তার গর্তের দিকে ফিরে আসে।'

যদি আমাদের কোন মহামনীষী এরূপ উপমা দিতেন, তবে কাফির ফতওয়াদাতারা তৎক্ষণাৎ কাফির বলতে শুরু করতেন। আমাদের মহামনীষীগণ মাসায়েল বুঝানোর জন্য উপমা দেন। তাদের উদ্দেশ্য অপদস্থ ও হেয় করা নয়। বরং উদ্দেশ্য হল, যে সব মূর্খতা চালু করে রেখেছে, সেগুলো উপমাপ্রদত্ত এরূপ নিকৃষ্ট জিনিসের মতই। এধরণের কাফির সাব্যস্ত করা ও কাফির বলা সুস্পষ্ট জুলুম। এখানে ঈমানের ন্যায় মুবারক বিষয়কে সাপের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে, যেটিকে হেরেম শরীফেও মারা জায়েয আছে। উদ্দেশ্য স্পষ্ট। কারণ, সাপ যেখানেই ঘুরাফেরা করুক, অবশেষে তার গর্তেই ফিরে আসে। এরূপভাবে ইসলাম ফিৎনা-ফাসাদের সময় স্বীয় স্থানে আশ্রয় নিবে।

সীরাত গ্রন্থাবলীতে আছে- যখন হুদায়বিয়ায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনী বসে পড়েছিল, তখন তিনি বললেন- حبسها حابس الفيل

'হস্তিবাহিনীকে বারণকারীই এটিকে বারণ করেছে।'

এখানে উটনী বারণকে হস্তিবারণের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। অথচ তারা এসেছিল ধ্বংস ও মুলোৎপাটনের জন্য। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিয়েছিলেন কল্যাণের নিয়তে। কিন্তু উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহর ইচ্ছার বিবরণ দান।

মোটকথা, সর্বদা উপমার উদ্দেশ্য দেখা হয়। এখানে হাদীস শরীফে উদ্দেশ্য আওয়াজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকা। এজন্য এরূপ বলা হয়েছে।

وهو اشده على

ঘন্টির ধারাবাহিক আওয়াজের এই সূরত আমার উপর সবচেয়ে কঠিন হত। কঠিন হওয়ার কারণ ছিল উপকৃত করা ও উপকৃত হওয়ার জন্য শ্রোতা ও বক্তার একই ধরনের গুণের অধিকারী হওয়া জরুরী। অর্থাৎ, উভয়ের মাঝে মিল থাকা আবশ্যক। কাজেই কখনো বক্তা তথা ফিরিশতা শ্রোতা তথা নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণ ও রূপ অবলম্বন করেন। আর কখনো শ্রোতা তথা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর বক্তার সিফতকে প্রবল করে দেয়া হয়। এই দ্বিতীয় পন্থাটি বেশি কষ্টকর হত। কারণ, নবীর অবস্থায় পরিবর্তন এসে যেত এবং মানবিক আবশ্যকীয় গুণাবলী থেকে এক ধরণের শূন্য হয়ে ফিরিশতা গুণে গুণান্বিত হত। ফলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কষ্ট হত।

২. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় প্রকার সম্পর্কে বলেন– يتمثل لى الملك رجلا আর কখনো ফিরিশতা মানব আকৃতিতে আমার কাছে আসত।

يتمثل لي الملك الخ اي يتصور لي الملك تصور رجل ইবারত হবে رجلا منصوب بنزع الخافض

–উমদাহ ঃ ১/৪২।

فيفصم এতে তিনটি রেওয়ায়াত রয়েছে। সবচেয়ে উত্তম ও বিশুদ্ধতম ফসীহ হল ইয়া এর উপর যবর।
–উমদাহ ঃ ১/৪১।

অর্থাৎ, يفصم এ তিনটি রেওয়ায়াত রয়েছে–

১. ইয়া এর উপর যবর, ফা এর উপর জযম, সোয়াদ এর নিচে যের। অর্থাৎ, مضارع معروف از باب ضرب يضرب এটিই প্রসিদ্ধতম ও সবচেয়ে বেশি ফসীহ বা বিশুদ্ধতম।

২. مضارع مجهول

৩. প্রথম অক্ষরে পেশ, তৃতীয় অক্ষরে যের। অর্থাৎ, مضارع معروف از باب افعال

এই লোগাতটির ব্যবহার কম। فصم এর আভিধানিক অর্থ হল– কর্তন করা।

প্রশ্ন ঃ পূর্বে ভূমিকায় ওহীর যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, তদ্বারা বুঝা গেছে যে ওহী অবতরনের সাতটি পদ্ধতি রয়েছে। তাহলে এই হাদীসে শুধুমাত্র দু'টি পদ্ধতির কথা কেন বলা হল?

উত্তর ঃ এই দু'টি পদ্ধতি বাস্তবে বেশি হয়েছে। এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং অধিক বাস্তবায়নের কারণে শুধুমাত্র এই দুটি ছূরতের বিবরণ দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ছূরতগুলো বাস্তবে কম হয়েছে। ফলে সেগুলোর উল্লেখ এখানে করা হয়নি।

قالت عائشة رضـــ এখান থেকে হযরত আয়েশা রা. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ মুবারক وهو اشده على এর বিশদ বিবরণ দিচ্ছেন।

ولقد رايته এখানে কসমের ওয়াও, লামে তাকীদ এবং قد শব্দটি তাহকীক তথা নিশ্চিত বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি নিজের প্রত্যক্ষ দর্শনের বিবরণ দিয়েছেন, আল্লাহর শপথ, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, প্রচণ্ড শীতকালেও যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হত, তখন তাঁর ললাট মুবারক থেকে ঘাম টপকে টপকে পড়তে আরম্ভ করত।

وان جبينه ليتفصد عرقا হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ এর এই কারণ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও জ্যোতি এবং হযরত জিবরাঈল আ.ও জ্যোতি। দুই জ্যোতি একত্রিত হওয়ার কারণে তেজ ও উষ্ণতা সৃষ্টি হত। এই জন্য ঘর্মাক্ত হয়ে যেতেন। অতঃপর তৃতীয় জ্যোতি ওহীয়ে ইলাহীর।

اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً

অতঃপর যখন তিন জ্যোতি একত্রিত হয়, তখন উষ্ণতা সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। এটা স্বাভাবিক বিষয়, যখন ভিতরে উষ্ণতা বেশি হয়, তখন স্বভাব তা বাইরে নিক্ষেপ করে। আর যখন ঘাম আকারে ভিতরের উষ্ণতা বেরিয়ে যায় ও লোমকুপগুলো খুলে যায়, তখন যে আবহাওয়া শরীরে লাগবে এবং লোমকুপগুলোর মাধ্যমে ভিতরে প্রবেশ করবে, তার ফলে অবশ্যই ঠাণ্ডা অনুভূত হবে। এ কারণে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– زملونى زملونى অর্থাৎ, আমার উপর কম্বল দাও। আমার উপর কম্বল দাও।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল

আল্লামা সিন্ধী র.-এর তাহকীক অনুযায়ী কোন প্রশ্ন নেই। কারণ, আল্লামা সিন্ধী র.-এর উক্তি অনুসারে بدو এর ইযাফত وحىএর দিকে বয়ানিয়া। এমতাবস্থায় ترجمة الباب كيف كان بدء الوحى শিরোনামের অর্থ হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ওহী কিভাবে এসেছে?

হাদীসে এর উত্তর হল– ফিরিশতা ওহী নিয়ে আসেন। কখনো ঘন্টির ধারাবাহিক আওয়াজ রূপে, আর কখনো মানব রূপে।

২. শিরোনামের দুইটি দিক ছিল– ১. বাহ্যিক ও ২. প্রকৃত।

১. বাহ্যিক দিক রূপে এ হাদীসের সম্পর্ক হল, হাদীসে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সাধারণ রূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, কখনো ঘন্টির ধারাবাহিক আওয়াজ, আর কখনো ফিরিশতার মাধ্যমে ওহী অবতীর্ণ হয়। ফিরিশতা হয়ত মানব রূপে আসেন অথবা ফিরিশতা রূপে। মোটকথা, যেহেতু ব্যাপক পন্থা জানা হয়ে গেল, সেহেতু ওহীর সূচনা সম্পর্কেও একপ্রকার আলোকপাত হয়ে গেল। অর্থাৎ, সেটিও হয়ত এভাবে অবতীর্ণ হয়ে থাকবে।

২. এই শিরোনামের প্রকৃত দিক হল, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ওহীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা। এই হিসেবে এ হাদীসটি নিশ্চয় স্পষ্ট। হযরত আয়েশা রা. বলেন, وكرب وتربّد وجهه। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী অবতরণকালে অস্থির হয়ে যেতেন। চেহারা মুবারক বিবর্ণ হয়ে যেত। তাছাড়া এ ধরণ এক দু'বার হয়নি। যখনই ওহী আসত, তখনই এ অবস্থার সম্মুখীন হতেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দেহ ওহী অবতরনের সময় চুরচুর হয়ে যেত। এতে বুঝা যায়, ওহী একটি মাহাত্ম্যপূর্ণ বিষয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের বেশিরভাগ সময় এই ধরণ সহ্য করে অতিক্রম করেছেন। যদি কৃত্রিমতা হত, তবে একেক দিনে কয়েকবার তা বরদাশত করতে পারতেন না। হযরত আদম আ.-এর প্রতি সারা জীবনে শুধু দশবার ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত নূহ আ.-এর প্রতি তাঁর নবুওয়ত যুগে ৫০বার ওহী এসেছে, হযরত ইবরাহীম আ.-এর প্রতি ৪৮বার। হযরত ঈসা আ.-এর প্রতি শুধু দশবার ওহী নাযিল হয়েছে। অথচ সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে চব্বিশ হাজার বার। প্রতিবারই তিনি এ কষ্ট সহ্য করেছেন। এর ফলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতার সাথে সাথে ওহীর মাহাত্ম্যও ভাল করে বুঝা যায়।

٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ قَالَ مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ.

فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ

خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ.

فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ وَكَانَ امْرَأً قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنْ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ.

فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرُعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ إِلَى قَوْلِهِ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو صَالِحٍ وَتَابَعَهُ هِلَالُ بْنُ رَدَّادٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ بَوَادِرُهُ.

৩. ইয়াহইয়া ইবনে বুকায়র র. .... 'উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সর্বপ্রথম যে ওহী আসে, তা ছিল ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে ভোরের আলোর ন্যায় প্রকাশ পেত। তারপর তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় করে দেয়া হয় এবং তিনি 'হেরা'র গুহায় নির্জনে থাকতেন আপন পরিবারের প্রতি আগ্রহ আসার পূর্বে। এভাবে সেখানে তিনি একাধারে বেশ কয়েক রাত ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। এর জন্য তিনি পানাহারের দ্রব্যাদি সাথেনিয়ে যেতেন। এর পর হযরত খাদীজা রা.-এর কাছে ফিরে এসে আবার অনুরূপ সময়ের জন্য কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতেন। এমনিভাবে 'হেরা' গুহায় অবস্থানকালে একদিন তাঁর কাছে হক তথা ওহী এল। তাঁর কাছে ফিরিশতা এসে বললেন, اقرء -'পড়ুন'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি বললাম, 'আমি পড়তে পারিনা।'

তিনি বলেন- তারপর তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার চুড়ান্ত পর্যায়ের কষ্ট হল। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, اقرء -'পড়ুন'। আমি বললাম- আমি তো পড়তে পারি না।' তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার চুড়ান্ত পর্যায়ের কষ্ট হল।

এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, اقرء -'পড়ুন'। আমি জবাব দিলাম, 'আমি তো পড়তে পারি না।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারপর তৃতীয়বার তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনিভাবে চাপ দিলেন। এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন-

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ.

'পড়ুন আপনার (বরকতময়) রবের নামে, যিনি (সবকিছু) সৃষ্টি করেছেন। (বিশেষতঃ) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' বা জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন, আর আপনার রব মহামহিমান্বিত।' (৯৬ ঃ ১-৩)

তারপর এসব আয়াত নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এলেন। তাঁর অন্তর তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদের কাছে এসে বললেন, 'আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও', 'আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও।' তাঁরা তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভয় খতম হল। (প্রশান্ত হয়ে) তিনি হযরত খাদীজা রা.-এর কাছে সকল ঘটনা জানিয়ে বললেন, আমি আমার নিজের উপর আশংকা বোধ করছিলাম। খাদীজা রা. বললেন, আল্লাহর কসম, কখনো এরূপ হবেনা। আল্লাহ্ আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বদের খোজ-খবর নেন (অর্থাৎ, আপনি তাদের এরূপ জিনিষ দেন যেমন ধন-সম্পদ, আখলাক ও ইলম যা তাদের কাছে নেই), মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং (হকের পক্ষে) দুর্দশাগ্রস্তকে সর্বদা সাহায্য করেন।

এপর তাঁকে নিয়ে হযরত খাদীজা রা. তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবন নাওফিল ইবন 'আবদুল উযযার কাছে গেলেন, যিনি জাহিলী যুগে 'খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী (হিব্রু) ভাষায় লিখতে জানতেন এবং আল্লাহর তাওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইনজীল থেকে অনুবাদ করতেন। তিনি (ওয়ারাকা) ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ এবং অন্ধও হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত খাদীজা রা. তাঁকে বললেন, 'হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন।' ওয়ারাকা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাতিজা! তুমি কী দেখ?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রত্যক্ষ দেখা সব ঘটনা খুলে বললেন। তখন ওয়ারাকা তাঁকে বললেন, 'ইনি সে রাজ বিশেষজ্ঞ দুত যাঁকে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আ-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। হায় আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম! হায় আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বের করে দেবে!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তারা কি আমাকে বের করে দেবে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, অতীতে যিনিই তোমার মতো এরূপ দাওয়াত নিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গেই শত্রুতা করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি জীবিত থাকি, তবে তোমাকে পূর্ণশক্তি দিয়ে সাহায্য করব।' এর অল্প কিছুদিন পরই ওয়ারাকা রা. ইন্তিকাল করেন, আর ওহীও স্থগিত হয়ে যায়।

ইবনে শিহাব র. .... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী রা. বলেন, ওহী স্থগিত হওয়ার কাল প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একবার আমি হেঁটে চলেছি, হঠাৎ আকাশ থেকে একটি আওয়ায শুনতে পেয়ে চোখ তুলে তাকালাম। দেখলাম, সে ফিরিশতা, যিনি হেরায় আমার কাছে এসেছিলেন, আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটি কুরসীতে বসে আছেন। এ দৃশ্য দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তৎক্ষণাৎ আমি ফিরে এসে পরিবারের লোকজনকে বললাম, 'আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর।' তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন-

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

'হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠুন। সতর্কবাণী প্রচার করুন এবং আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন। অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন।' (৭৪ ঃ ১-৪)। এরপর ব্যাপকভাবে পর পর ওহী নাযিল হতে লাগল।

আবদুল্লাহ্ ইবনে ইউসুফ র. ও আবূ সালিহ্ র. অনুরূপ বর্ণনা করেছেন (এটা মুতাবা'আতে তাম)। হেলাল ইবনে রাদদাদ র. যুহরী র. থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন (এটা অসম্পূর্ণ মুতাবা'আত)। ইউনুস ও মা'মার فؤاده -এর স্থলে بوادره শব্দ উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি

ইমাম বুখারী র. সহীহ বুখারীতে এ হাদীসটি তার জায়গায় বর্ণনা করেছেন।

১. بدء الوحى পৃষ্ঠা দুই

২. কিতাবুল আম্বিয়া ঃ ১/৪৮০।

৩. কিতাবুত তাফসীর ঃ ২/৭৩৯।

৪. কিতাবুত তা'বীর ঃ ২/১০৩৩।

সহীহ মুসলিম –কিতাবুল ঈমান ঃ ১/৮৮ ইত্যাদি।

রাবীদের বিবরণ

এ হাদীসে ছয়জন রাবী রয়েছেন–

১. ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর

নাম ইয়াহইয়া। উপনাম আবু যাকারিয়া। পিতার নাম আবদুল্লাহ। বুকাইর (বা এর উপর পেশ, কাফ এর উপর যবর) দাদা। জন্ম –১৫৪ হিজরী, মতান্তরে-১৫৫ হিজরী। ওফাত –২৩১ হিজরী। ইমাম বুখারী র. দাদার দিকে সম্বোধন করে ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর বলেছেন। কারণ, এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি মিসরের শীর্ষস্থানীয় হাফিজদের একজন। –উমদাহ।

২. লাইছ

নাম লাইছ। পিতার নাম সা'দ। দাদার নাম আবদুর রহমান। উপনাম আবুল হারিছ। তিনি তাবে তাবেঈ। কায়রো থেকে প্রায় চার ফরসখ দূরে কালকাশান্দা নামক স্থানে ৯৩ অথবা ৯৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। ওফাত লাভ করেছেন-১৭৫ হিজরীতে, শা'বান মাসে। তাঁর কবর মিসরের কুরাফায় অবস্থিত। এটি যিয়ারতগাহ হয়ে আছে। তিনি ছিলেন একজন শীর্ষ ইমাম। তাঁর মাহাত্ম্য নির্ভরযোগ্যতা এবং বদান্যতার ব্যাপারে সবাই একমত। তিনি ছিলেন ইমাম আবু হানীফা র. এর মাযহাবের অনুসারী। –কাযী খাল্লিকান, উমদাহ ঃ ১/৪৭।

সিহাহ সিত্তায় তিনি ছাড়া আর কোন লাইছ ইবনে সা'দ নেই। অতএব, সিহাহ সিত্তায় যেখানেই লাইছ ইবনে সা'দ থাকবে, সেখানে উদ্দেশ্য তিনিই।

৩. উকাইল

আইন এর উপর পেশ, কাফ এর উপর যবর-তাসগীর সহ। তিনি হলেন উকাইল ইবনে খালিদ। তাঁর উপনাম আবু খালিদ। দাদা খালিদের পিতার নাম আকীল (আইন এর উপর যবর, কাফ এর নিচে যের)। ইমাম যুহরী র. থেকে রেওয়ায়াতকারী সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মনীষী। ৪১ হিজরীতে মিসরে তাঁর ওফাত হয়। সিহাহ সিত্তায় এই উকাইল নামে তিনি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি নেই। –উমদাহ।

৪. ইবনে শিহাব

তিনি হলেন ইমাম যুহরী র.। তাঁর জীবনী সম্পর্কে ভূমিকায় ইমাম বুখারী র.-এর জীবনীর পূর্বে আলোচনা এসেছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

৫. উরওয়া ইবনে যুবাইর

৬. হযরত আয়েশা রা.

তাঁদের দু'জনের জীবনী সম্পর্কে দ্বিতীয় হাদীসের অধীনে আলোচনা এসেছে।

عن عائشة ام المؤمنين رض انها قالت الخ

বাহ্যতঃ এ হাদীসটি মুরসাল। কারণ, যখন এ ঘটনা ঘটেছিল, তখন হযরত আয়েশা রা. জন্ম গ্রহণও করেননি। কিন্তু সত্যের নিকটবর্তী কথা হল- পরবর্তীতে তিনি হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ ঘটনাটি প্রত্যক্ষভাবে শুনে থাকবেন। এমতাবস্থায় এ হাদীসটি নিঃসন্দেহে মুত্তাসিল হয়ে যাবে। কিন্তু যদি মেনে নেয়া হয়, তিনি এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেননি, তাহলে কোন সাহাবী থেকে শুনে বর্ণনা করে থাকবেন। তাতেও কোন প্রশ্ন নেই। কারণ, সাহাবীর মুরসাল রেওয়ায়াত আমাদের মতে প্রামাণ্য।

اول ما بدئ به الخ

সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে জিনিস দ্বারা ওহীর সূচনা হয়, সেটি হল সত্য স্বপ্ন বা উত্তম স্বপ্ন।

من الوحى দ্বারা বুঝা গেল, স্বপ্নও ওহীর একটি প্রকার। হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর ইরশাদ রয়েছে– (عمده ج ١ ص ٥٣) رؤيا الانبياء عليهم السلام وحي তথা নবীগণের স্বপ্নও ওহী। –উমদাহ ঃ ১/৫৩।

নবীগণের স্বপ্ন ওহী ঃ

একটি প্রশ্ন

নবীর স্বপ্ন ওহী। তাহলে হযরত ইবরাহীম আ. فانظر ماذا ترى শব্দে হযরত ইসমাঈল আ.কে কেন জিজ্ঞেস করলেন? যদি এটাকে ওহী মনে করতেন, তবে তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করা ব্যতীত হুকুম তা'মিলের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন?

উত্তর ঃ হযরত ইবরাহীম আ.-এর এই জিজ্ঞেস দোদুল্যমানতার কারণে ছিল না। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল হযরত ইসমাঈল আ.কে পরীক্ষা করা যে, তিনি আল্লাহর হুকুমের সামনে আত্মসমর্পণ করেন কি না? আল্লাহ না করুন, যদি হযরত ইসমাঈল আ. অস্বীকার করতেন, তবুও হযরত ইবরাহীম আ. আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নে কখনো দ্বিধা করতেন না।

দ্বিতীয় হিকমত ছিল, জিজ্ঞেস করার ফলে জবাইয়ের পদ্ধতি নির্ণিত হয়ে যাবে। কারণ, স্বতঃস্ফূর্তভাবে জবাই হওয়ার আর জোরপূর্বক জবাইয়ের পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা।

একটি প্রশ্ন

হযরত ইবরাহীম আ.-এর স্বপ্ন ছিল ওহী। যেমন– তাঁর হুকুম তা'মিল এবং হযরত ইসমাঈল আ.-এর উত্তরে افعل ما تؤمر উক্তি দ্বারা স্পষ্ট। বরং হযরত ইসমাঈল আ. কর্তৃক افعل ما ترى এর পরিবর্তে افعل ما تؤمر বলা স্বতন্ত্র একটি প্রমাণ। তাহলে তা বাস্তবায়িত কেন হল না? অর্থাৎ, হুকুম ছিল সন্তান জবাই করা কিন্তু বাস্তবে জবাই হয়নি।

এর বিভিন্ন উত্তর দেয়া হয়েছে–

১. শায়খে আকবর র. উত্তর দিয়েছেন, স্বপ্নের সত্যতার দু'টি পদ্ধতি হয়ে থাকে–

১. স্বপ্নে যা দেখেছে, বাস্তবে তাই হয়েছে।

২. স্বপ্নের ব্যাখ্যা অন্য কোন রূপে বাস্তবায়িত হয়েছে। যেমন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখলেন, তিনি তলোয়ার নাড়াচাড়া দিয়েছেন। তখন তার কিছু অংশ ভেঙ্গে যায়। অতঃপর নাড়াচাড়া দিলে তা পূনরায় ঠিক হয়ে যায়। তিনি আরো দেখলেন, একটি জবাইকৃত গাভী। এর ব্যাখ্যা তিনি এই দিয়েছেন যে, তলোয়ার ভাঙ্গা মানে উহুদে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয়। অতঃপর তলোয়ার ঠিক হয়ে যাওয়া মানে অবশেষে মুসলমানদের বিজয়। আর জবাইকৃত গাভীর ব্যাখ্যা হল শহীদগণ।

হযরত ইউসুফ আ. বলেন-

اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِيْ سَاجِدِيْنَ.

এর ব্যাখ্যা ১১ ভাই ও মাতা-পিতা রূপে প্রকাশ পেয়েছে। এমনিভাবে

اِنِّيْ اَرَانِيْ اَعْصِرُ خَمْرًا – اِنِّيْ اَرَانِيْ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ – اِنِّيْ اَرٰى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يَابِسٰتٍ.

এর ব্যাখ্যা কুরআনে হাকীমে উল্লেখিত হয়েছে।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধের ব্যাখ্যা ইলম এবং জামার ব্যাখ্যা করেছেন দীন দ্বারা।

মোটকথা, কোন কোন সময় স্বপ্নের ব্যাখ্যা এর বাহ্যিক অর্থ ছাড়া অন্য কিছু হয়ে থাকে। এরূপভাবে এখানে সন্তান জবাইয়ের ব্যাখ্যা ছিল মেন্ডা জবাই। কিন্তু আল্লাহর হুকুম পালনে অধিক স্বতঃস্ফূর্ততার ফলে হযরত ইবরাহীম আ.-এর ধ্যান এদিকে যায়নি এবং সন্তান জবাইয়ের জন্যই প্রস্তুত হয়ে যান।

শায়খে আকবর র. এর এই উত্তর প্রশান্তিদায়ক নয়। এতে কয়েকটি অসুবিধা রয়েছে–

১. নবী থেকে যদিও ইজতিহাদী ভুল হতে পারে, যার ফলে সতর্ক করা হয়, কিন্তু অকারণে নবীর ভুল ধরা যথার্থ নয়। হ্যাঁ, যদি অন্য কোন কারণ হতে না পারত, তাহলে বাধ্য হয়ে ইজতিহাদী ভুলের ক্ষেত্রে প্রয়োগের অবকাশ ছিল।

২. যদি মেন্ডা জবাই উদ্দেশ্য হত, তাহলে قد صدقت الرؤيا কেন বললেন?

৩. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ

এর প্রমাণ যে, মূল হুকুম সন্তান জবাইরই ছিল। মেন্ডা জবাই ছিল বদলরূপে। ফিদিয়া বলে বদলকে।

৪. যদি সন্তান জবাইয়ের হুকুম না হয়ে থাকে, তবে এটাকে بلاء مبين তথা সুস্পষ্ট পরীক্ষা কেন বললেন? মেন্ডা জবাই তো বিরাট ব্যাপার নয়।

২. হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী র. বলেন, যতটুকু ঘটনা স্বপ্নে দেখেছেন, বাস্তবেও ততটুকু সংঘটিত হয়েছে। স্বপ্নে শুধু জবাই করতে দেখেছেন انى اذبحك । জবাই হয়েছেন – এটা দেখেননি। অতএব, স্বপ্নের সত্যতায় কোন প্রশ্ন থাকল না।

◆ এর উপর কেউ প্রশ্ন করেছেন, যদি হযরত ইবরাহীম আ. জানতেন যে, আমার জবাই করার পর ফল বের হবে না, তাহলে এটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা হল না। আর যদি এটা তিনি না জেনে থাকেন, তবে তো সে নবীর ভুল ধরাই আবশ্যক হবে।

◆ কিন্তু এই প্রশ্ন যথার্থ নয়। কারণ, কোন নবীর অশরঈ কোন বিষয় সম্পর্কে জানা না থাকা ত্রুটির কারণ নয়। না এরূপ বিষয়ে জ্ঞান না থাকাকে নবীর ভূল ধরা বলা যথার্থ।

সর্বোত্তম ব্যাখ্যা

হাফিজ ইবনে কাইয়্যিম র. যাদুল মা'আদে বলেন, হুকুম ছিল সন্তান জবাই করার। হযরত ইবরাহীম আ. তা অনুধাবনও করেছিলেন। বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতও হয়েছিলেন। বরং কাজ শুরুও করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবায়নের পূর্বে এ হুকুম রহিত হয়ে গিয়েছে। কারণ, উদ্দেশ্য শুধু পরীক্ষা গ্রহণ।

এ বক্তব্যের আলোকে সর্বোচ্চ কাজ বাস্তবায়নের পূর্বে হুকুম রহিত হওয়া আবশ্য হয়। এতে কোন অসুবিধা নেই। বরং এরূপ ঘটনা বাস্তবে হয়েছে। মে'রাজ রজনীতে ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়েছিল। কিন্তু আমলের পূর্বে এ হুকুম রহিত হয়ে পাঁচ ওয়াক্ত থেকে যায়। -ইরশাদুল কারী। (সংক্ষেপিত)

فكان لايرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু স্বপ্নে দেখতেন, তা সকালের আলোর ন্যায় প্রতিভাত হয়ে যেত। অর্থাৎ, নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন স্বপ্ন দেখতেন, তার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হত। যেমন- সুবহে সাদিকের আলো সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে থাকে, সকাল উদয়ে কোন সন্দেহ হয় না। এই উত্তম স্বপ্ন ছিল নবুওতের ভূমিকা।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্ন তিনটি গুণে গুনান্বিত ছিল- صالحه ، صادقه، واضحه।

صالحه যার বাহ্যিক দিকও বরকতময় এবং এর ব্যাখ্যাও আনন্দদায়ক। তাতে ক্ষতির কোন দিক নেই।

صادقه যেটি সত্য এবং এর ব্যাখ্যা বাস্তব অনুযায়ী হয়, চাই এটি আনন্দদায়ক হোক অথবা তাতে ক্ষতির কোন দিক থাকুক, সবই হতে পারে। যেমন- উহুদ যুদ্ধে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখলেন, তিনি তলোয়ার নাড়া দিয়েছেন, তখন সেটি ভেঙ্গে যায়। এরপর দ্বিতীয়বার নাড়া দিলে সেটি ঠিক হয়ে যায়। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও দেখলেন একটি জবাইকৃত গাভী। তিনি এর ব্যাখ্যা দিলেন যে, তলোয়ার ভেঙ্গে যাওয়া মানে উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয়, জবাইকৃত গাভী মানে শহীদগণ। এতে বাহ্যত মুসলমানদের ক্ষতি ছিল। কিন্তু এটি ছিল বাস্তবানুযায়ী। অতএব, এটি সত্য, তবে সালিহা নয়। তবে এ বিষয়টি মনে থাকা আবশ্যক যে, আম্বিয়া আ. এর ক্ষেত্রে প্রতিটি সত্য স্বপ্ন সালিহা তথা ভাল ও উপকারীও বটে। যদিও পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে বাহ্যতঃ সালিহা তথা ভাল না হোক না কেন। অতএব, এখানেও আল্লাহর পথে শাহাদত নিঃসন্দেহে চিরন্তন জীবন, পার্থিব জীবন থেকে উত্তম।

واضحه যার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ স্পষ্ট। যেমন- ওহী অবতরণের পূর্বে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অদৃশ্য আওয়াজ শুনতেন। পাথর ও বৃক্ষ তাঁর সাথে কথাবার্তা বলত, তাঁকে সালাম করত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- আমি সে পাথরটি চিনি, যেটি আমাকে সালাম করত। এ সব বিষয় ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহীর সাথে সুসম্পৃক্ত করার জন্য এবং ওহীর মাহাত্ম্য ও উঁচু মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য। যেমন- রেলগাড়ী আসার পূর্বে ষ্টেশনে সিগন্যাল, ঘন্টি এবং পতাকা ইত্যাদি ব্যবস্থা আরম্ভ হয়ে যায়। বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও দ্রুতগামী মেইল হলে যেমন- রাজধানী এক্স প্রেস আসলে অনেক পূর্ব থেকে প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়।

مثل فلق الصبح আল্লামা আইনী র. বলেন, এখানে مثل শব্দটিতে যবর। এটি উহ্য মাসদারের সিফত। মূল ইবারত হল- الا جاءت مجيئا مثل فلق الصبح اي شبيهة لضياء الصبح -উমদাহ ঃ ১/৫৬।

فلق ফা ও লাম এর উপর যবর। এর অর্থ হল ফেড়ে ফেলা, ছিড়ে ফেলা। যেমন– কুরআনে কারীমে এসেছে– ان الله فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوى

সুবহে সাদিককে فلق الصبح বলা হয়। কারণ, এটি রাতের অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসে।

আল্লামা ইবনে আবু জামরা বলেন, এই উপমায় একটি বিশেষ সুক্ষ্ম হিকমত হল– পূর্ববর্তী আম্বিয়া আ. চন্দ্র ও তারকারাজির ন্যায়। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সূর্য। যার উদয়ের অনেক পূর্বে সুবহে সাদিক তার আগাম সংবাদ দেয় যে, শীঘ্রই পৃথিবী উজ্জ্বলকারী সূর্য উদয় হবার পথে। এরূপভাবে এই উত্তম স্বপ্ন নবুওয়ত সূর্যের সূর্যের ভূমিকা ছিল। নবুওয়তের পূর্বে ছয় মাস পর্যন্ত এর ধারা অব্যাহত ছিল। রবিউল আউয়ালে উত্তম স্বপ্নের সূচনা হয়। আর রমযানুল মুবারকে হয় ওহীর সূচনা।

ثم حبب اليه الخلاء আল্লামা আইনী র. বলেন, الخلاء। শব্দটি মদ্ সহকারে। এর অর্থ হল নির্জনতা। এর উদ্দেশ্য হল خلاء দ্বারা নির্জন স্থান উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হল মাসদার (ক্রিয়ামূল) । অর্থাৎ, নির্জনতা অবলম্বন। মানে অতঃপর তাঁর নিকট নির্জনতা প্রিয় করে দেয়া হয়।

حبّب بصيغه مجهول যদ্বারা বুঝা গেল, এ নির্জনতা স্বভাবজাত ছিল না। বরং ছিল কুদরতের পক্ষ থেকে। সূফিয়ায়ে কিরাম বলেন, যখন যিকিরের নিদর্শনাবলী শুরু হয়ে যায়, তখন মানুষের নিকট নির্জনতা প্রিয় হয়ে যায়।

وكان يخلو بغار حراء প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহায় নির্জনতা অবলম্বন করতেন। حراء শব্দটিতে হা এর নিচে যের, রা তাশদীদ শূন্য। সহীহ উক্তি হল এটি পুংলিঙ্গ ও মুনসারিফ। -কাসতাল্লানী।

হেরা মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। মিনায় যাওয়ার সময় বাম দিকে পড়ে। বর্তমানে এটিকে বলে জাবালুন নূর।

হেরা মনোনয়নের কারণসমূহ

নির্জনতা অবলম্বনের জন্য নবীজী সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহাকে কেন মনোনয়ন করেছিলেন?

আল্লামা কাসতাল্লানী র. লিখেন– কুরাইশে সর্বপ্রথম নবী কারীম সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদা আবদুল মুত্তালিব এতে নির্জনতা অবলম্বন করেছিলেন। (কাসতাল্লানী ঃ ১৪/৪৭৬) দাদার সাথে নবীজী সাল-লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেখানে তাশরীফ নিতেন। তখন থেকেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সেই স্থানটির সখ্যতা ও সুসম্পর্ক গড়ে উঠে।

তবে এ ব্যাখ্যাটি প্রশান্তিদায়ক নয়। কারণ, এতে প্রশ্ন হয়, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদা এ গুহাটিকে কেন বাছাই করে নিয়েছিলেন?

২. হাফিজ র. কিতাবুত তা'বীরে বলেন-

قال ابن ابي جمرة الحكمة في تخصيصه بالتخلي فيه ان المقيم فيه كان يمكنه روية الكعبة فيجتمع لمن يخلو فيه ثلث عبادات الخلوة والتعبد وروية البيت

এর সারনির্যাস হল এখানে নির্জনতা অবলম্বন করলে তিনটি ইবাদতের সমন্বয় ঘটে–

১. কাফির, মুশরিকদের থেকে বিচ্ছিন্নতা।

২. সে যিকির আযকার যেগুলোতে তিনি রত থাকতেন।

৩. বাইতুল্লাহ দর্শন।

রেওয়ায়াতে আছে, বাইতুল্লাহর দিকে প্রতিবার দৃষ্টিপাত করলে আল্লাহ তা'আলার বিশটি রহমত নাযিল হয়।

৩. হেরা গুহা অবলোকন করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উপরোক্ত ব্যাখ্যাগুলোর কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, এর অবস্থানই কিছুটা এ ধরণের যে, নির্জনতা ও ইবাদতের জন্য সমীচীন। শহরের বেশি নিকটেও নয়, যার ফলে নির্জনতার উদ্দেশ্যই অর্জিত না হয়। আবার এতটা দূরবর্তীও নয়, যাতে পৌঁছা কঠিন। এরূপভাবে হেরা গুহার উঁচুতাও এত কম নয় যে, প্রতিটি ব্যক্তি সহজে সেখানে পৌঁছতে পারে, আবার এত বেশিও নয় যে, সেখানে যাওয়া কঠিন। গুহার ধরণও এরকম যেন কুদরত ইবাদতের জন্যই এটিকে ছোট একটি কক্ষের ন্যায় বানিয়েছেন। এতটুকু উঁচু যে, একজন মানুষ সহজে তাতে দাঁড়াতে পারে। প্রশস্ততা এতটুকু যে, সহজে সেজদা দেয়া যায়। মোটকথা, এর সৃজন এবং অবস্থানস্থল দেখার পর অন্য কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকে না।

فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي কয়েক রাত ও দিন লাগাতার তাতে ইবাদত করতেন।

وهو التعبد এর যমীর تحنث -এর দিকে ফিরেছে। এই ব্যাখ্যা হল ইমাম যুহরী র.-এর। حنث শব্দটি গুনাহের অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু যেহেতু باب تفعل -এর একটি বৈশিষ্ট্য হল سلب ماخذ , সেহেতু تحنث এর অর্থ হল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা একটি ইবাদত। অতএব, এটি تحنث এর প্রকৃত অর্থ নয়; বরং ইলতিযামী তথা আবশ্যকীয় অর্থ।

হেরা গুহায় ইবাদতের ধরণ

এতে আলোচনা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহায় কোন দীন অনুযায়ী ইবাদত করতেন? নূহ আ.-এর দীন, ইবরাহীম আ.-এর দীন, মূসা আ.-এর দীন, ঈসা আ.-এর দীন অনুযায়ী ইবাদত করতেন। সবগুলো উক্তিই রয়েছে। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী র. থেকে বর্ণিত আছে–

كان عبادته صلي الله عليه وسلم قبل البعثة علي ملة ابيه ابراهيم عليهم الصلوة والسلام (تيسير القاري ج ١ ص٨)

অর্থাৎ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় প্রপিতা হযরত ইবরাহীম খলীল আ.-এর অনুসরণ করতেন। এই উক্তিটিই প্রসিদ্ধতম। তাছাড়া সীরাতে ইবনে হিশামের রেওয়ায়াতে يتحنث এর পরিবর্তে يتحنّف এসেছে। অর্থাৎ, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনে হানীফ অনুযায়ী ইবাদত করতেন। হতে পারে রাবীগণ ফা কে ছা দ্বারা পরিবর্তন করেছেন, মূলতঃ রেওয়ায়াত ছিল ফা সহকারে।

হাফিজ র. বলেন, ফা কে ছা দ্বারা পরিবর্তন করা আরবদের সাধারণ নিয়ম।

তবে প্রশ্ন হল পূর্ববর্তী ধর্মগুলোতে বিকৃতি ঘটেছিল। তাহলে হযরত ইবরাহীম আ.-এর ধর্মের অবিকৃত অবশিষ্ট অংশের জ্ঞান কিভাবে হল? এর নিভরযোগ্য মাধ্যম কি ছিল? এ জন্য দুররে মুখতার গ্রন্থকারের উক্তিটিই প্রধান। তিনি বলেছেন–

والمختار عندنا انه كان يعمل بما ظهر له من الكشف الصادق من شريعة ابراهيم وغيره – درمختار جلد اول

অর্থাৎ, আমাদের হানাফীদের মতে পছন্দনীয় কথা হল সত্য কাশফ এবং যথার্থ ইলহাম দ্বারা যে জিনিস স্পষ্ট হয়ে যেত, তদানুযায়ী আমল করতেন। কোন বিশেষ নবীর অনুসরণ করতেন না। অবশ্য হতে পারে

সত্য কাশফ ও কুদরতী ইলহাম হত ইবরাহীমী ধর্ম অনুযায়ী। যেমন– পরবর্তীতে মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

قبل ان ينزع الي اهله অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবার পরিজনের প্রতি আগ্রহ না হত, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করতেন। কখনো কখনো এক মাস পর্যন্ত অবস্থানেরও অবকাশ হত। যেমন– মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে– جاورت بحراء شهرا অর্থাৎ, আমি হেরায় একমাস পর্যন্ত থেকেছি।

ويتزود لذالك প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানাপিনার আসবাব-উপকরণ সাথে নিয়ে যেতেন। এতে বুঝা যায় তাওয়াক্কুলের আসবাব-উপকরণ পরিহার না করা চাই। বস্তুতঃ আসবাব-উপকরণ বর্জন তাওয়াক্কুল নয়, বরং তা'আত্তুল বা নিষ্ক্রিয়তা। অবশ্য এটা যেন খেয়াল থাকে যে, এসব আসবাব হল উপকরণ, রব বা খোদা নয়। এ সব আসবাব সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে কাজ হবে, অন্যথায় নয়।

حتي جاءه الحق وهو في غار حراء অবশেষে হক এসে যায়, যখন তিনি হেরা গুহায় অবস্থান করছেন। অর্থাৎ, হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর নিকট হক এসে যায়। এ জন্য বুখারীর কিতাবুত তাফসীরে ৭৩৯ পৃষ্ঠায় এসেছে– حتي فجأه الحق । হক দ্বারা উদ্দেশ্য ওহী।

فجاءه الملك فقال اقرأ অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিশতা (জিবরাঈল আ.) এসে পৌছেন। يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من رمضان وهو ابن اربعين سنة তথা সোমবার দিন, রমযানের ১৭ তারিখে যখন তাঁর বয়স ৪০ বছর। –উমদাহ ঃ ১/৬১, কাসতাল্লানী।

তিনি এসে বললেন– اقرأ।

فجاءه এতে ফা تعقيبيه নয়। কারণ, ফিরিশতার আগমন ওহীর পরে হয়নি। বরং ফিরিশতা অর্থাৎ, জিবরাঈল আ. ওহী নিয়ে আসেন। অতএব, এ ফা টি হল تفصيليه

فقال اقرأ এখানে একটি প্রশ্ন হয়। ফিরিশতা জানতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মী ছিলেন। এরূপ অপড়ুয়া ব্যক্তিকে পড়ার নির্দেশ দান মানে সাধ্যাতীত বিষয়ের দায়িত্ব অর্পন। তাহলে ফিরিশতার পক্ষ থেকে পড়ার নির্দেশ কেন দেয়া হল?

উত্তর ঃ এ নির্দেশ তাকলীফী তথা দায়িত্ব চাপানোর জন্য নয়। বরং এটি হল তালকীনী বা শিক্ষামূলক। এর উদ্দেশ্য হল, আমি পড়ছি, আপনিও আমার সাথে সাথে পড়ুন। অতএব, হযরত জিবরাঈল আ. এখানে পাঠ নির্দেশ দেননি। বরং পাঠ শেখার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহ্যিক শব্দের প্রতি লক্ষ্য করেছেন যে, এখানে পাঠের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। তাই উত্তরে বললেন– ما انا بقارئ ।

যেহেতু বুঝতে পারলেন اقرأ এটি তালকীনী নির্দেশ, তাই এর এই অনুবাদ করা ঠিক নয় যে, আমি তো পড়ুয়া নই। কারণ, মৌখিক শিক্ষাদানের জন্য প্রশিক্ষণের শব্দগুলো পড়া উম্মী হওয়ার পরিপন্থী নয়। যেমন– মকতব, মাদরাসাগুলোতে রাত-দিন প্রত্যক্ষ দর্শন হচ্ছে।

ماانا بقارئ এর যথার্থ তরজমা হল, ওহীর কাঠিন্য ও ভারিত্বের কারণে আমার জবান চলে না। অর্থাৎ, আমি পড়তে পারি না।

ওহীর ভার

ওহীর ভারের বিবরণ দ্বিতীয় হাদীসে এসেছে। স্বয়ং কুরআনে হাকীমে রয়েছে-

إِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَه خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ

বুখারী শরীফে বিভিন্ন স্থানে এ রেওয়ায়াতটি আছে যে, হযরত যায়েদ রা. বলেন– শুধু غيرُ اولى الضرر শব্দটি যখন অবতীর্ণ হয়েছিল, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাটু মুবারক আমার হাটুর উপর ছিল। তখন আমার কাছে অনুভূত হচ্ছিল যেন আমার হাটু টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। অতএব, ধারণা করুন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কতটা ভারী ও ওজনী হয়ে থাকবে!

তাছাড়া এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে বদর যুদ্ধ সম্পর্কে। আর মক্কা মুয়াজ্জমায় ১৩ বছর পর্যন্ত ওহী অবতীর্ণ হতে থাকে। এরপর মদীনা মুনাওয়ারায় বদর পর্যন্ত ওহী নাযিল হয়।

যখন এ সময়ের ওজনের এ অবস্থা, তখন প্রথমবারে কতটা ভারী মনে হবে? সম্পূর্ণ স্পষ্ট বিষয় যে, কোন উম্মত সে বিষয়টি ধারণাও করতে পারে না। বাস্তবতা হল, কালামের আজমত আল্লাহ তা'আলা হিকমতের ভিত্তিতে গোপন রেখেছেন। অন্যথায় কুরআনে আজীম তিলাওয়াত করা কঠিন হয়ে পড়ত। আল্লাহর কালামের আধ্যাত্মিক ওজনের আন্দাজ কোন উম্মতের কি হতে পারে? কিন্তু রাসূলের কালামের ওজনের একটি ঝলকের আন্দাজ একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা দ্বারা হতে পারে।

হযরত মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী র. সমকালিন শীর্ষস্থানীয় একজন অলী আল্লাহ ছিলেন। তিনি ছিলেন যুগের গাউস ও কুতুব। ভাল আলিম ছিলেন। হযরত থানভী র.ও তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং একটি পুস্তিকায় তাঁর কামালাত ইত্যাদির বিবরণও দিয়েছেন।

মোটকথা, একজন আলিম, ফাযিল, বুখারী শরীফ পড়ানে ওয়ালা উস্তাদ হযরতের খেদমতে ইজাযতের জন্য উপস্থিত হয়েছেন। সাথে শিষ্যদেরও নিয়ে এসেছেন। হযরত মাওলানা রীতি অনুযায়ী বুখারী শরীফ খুলে তাঁর সামনে বললেন, পড়ুন। তিনি পড়তে আরম্ভ করলেন। শিরোনাম পড়ে সনদ শেষ করে হাদীস পর্যন্ত পৌছে নীরব হয়ে যান। হযরত বললেন, পড়ুন। কিন্তু তাঁর জবান খুলছে না। এমনকি কিতাবের অক্ষরও দেখতে পারছিলেন না। দীর্ঘক্ষন পর হযরত বললেন, ঠিক আছে, যান। মুহাদ্দিস সাহেব চলে গেলেন। ছাত্ররা ভীষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হল। ব্যাপার কি? হযরত উস্তাদ ইবারতও পড়তে পারলেন না! এ জন্য উস্তাদের নিকট এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, আমি যখন হাদীস পর্যন্ত পৌছি, তখন জবান অপারগ হয়ে যায়। চোখের নিচে তখন অন্ধকার ছেয়ে যায়। হযরত মাওলানাগঞ্জে মুরাদাবাদী র.কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালামের ওজনের একটি ঝলক দেখানো হয়েছে। যার প্রভাব এই হল যে, জবান ও চক্ষু অপারগ হয়ে যায়। এ থেকে অনুমান হতে পারে যে, আল্লাহর রাসূলের কালামের ওজনের একটি ঝলকের যেহেতু এই অবস্থা, তাহলে আল্লাহর কালামের ওজনের কি অবস্থা হবে? বাস্তবতা এটাই যে, তার কোন সীমা বর্ণনা করা যায় না, এর সংজ্ঞা দেয়া যায় না, কল্পনাও করা যায় না। -ইমদাদুল বারী।

حتى بلغ منى الجهد - جهد শব্দে চারটি সম্ভাবনা আছে–

১. জীম এর মধ্যে পেশ ও যবর, দাল এর মধ্যে পেশ ও যবর। جهد শব্দটির জীমে পেশ এবং জীমের উপর যবর। উভয়টির তিনটি অর্থ আসে–

১. শক্তি ২. কষ্ট ৩. চূড়ান্ত পর্যায়।

رفع অবস্থায় কষ্টের অর্থ হবে। بلغ এর ফায়েল হবে الجهد, মাফঊল হবে উহ্য। ইবারত হবে حتى بلغ منى الجهد مبلغه সংক্ষেপের জন্য مبلغه মাফঊল উহ্য করে দেয়া হয়েছে। তরজমা হবে, ফিরিশতা আমাকে ধরেন এবং চাপ দেন। এক পর্যায়ে আমার কষ্ট-তাকলীফ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে যায়। অর্থাৎ, এর চেয়ে বেশি কষ্ট

আমার সহ্যের বাইরে ছিল। অথবা আমার শক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়, অর্থাৎ, এর চেয়ে বেশি সহ্যের ক্ষমতা আমার ছিল না।

২. الجهد نصب-এর অবস্থায় بلغ-এর মাফঊল হবে। ফায়েলের যমীর ملك এর দিকে ফিরবে। এখানে ফিরিশতার মানবাকৃতি উদ্দেশ্য। অন্যথায় ফিরিশতা স্ব-রূপে পূর্ণ শক্তিতে চাপ দিলে তা সহ্য করা কোন মানুষের জন্য কঠিন। এমতাবস্থায় (نصب অবস্থায়) তরজমা হবে, এক পর্যায়ে ফিরিশতা স্বীয় শক্তি অথবা কষ্টের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যান। অর্থাৎ, এত জোরে চাপ দিয়েছেন যে, নিজেই ঘর্মাক্ত হয়ে যান।

একটি প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন হল, হযরত জিবরাঈল আ.-এর শক্তি হল ফিরিশতাগত। যার সম্পর্কে কুরআনে হাকীমে বলা হয়েছে- ذى قوة اى قوة عظيمة কওমে লূতের জনপদকে স্বীয় পাখার উপর তুলে উল্টে দিয়েছেন। অতএব, হযরত জিবরাঈল আ.-এর চাপ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে বরদাশত করতে পারেন?

উত্তর ঃ যে সব জিনিস (ফিরিশতা হোক অথবা জ্বিন) বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকে, সেগুলো যেরূপে থাকে, সে শক্তিতেও চলে আসে। অতএব, যখন জিবরাঈল মানবরূপে উপস্থিত হয়েছেন, সেহেতু শুধু একজন মানবের শক্তিতে এসেছেন। জানা কথা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চার হাজার মানুষের শক্তি দেয়া হয়েছে। এরই অন্তর্ভূক্ত হযরত মূসা আ. কর্তৃক হযরত জিবরাঈল আ.কে থাপ্পর মেরে চোখ খুলে ফেলা। নবীর শক্তি ও যোগ্যতার আন্দাজ এর দ্বারা লাগান যে, তাজাল্লীয়ে ইলাহী দ্বারা তূর পাহাড় টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, কিন্তু হযরত মূসা আ. মাত্র সামান্য সময়ের জন্য বেহুশ হয়েছিলেন।

চাপ দেয়ার হিকমতসমূহ

(জামি'উদ দিরারী-শরহে বুখারী থেকে)

১. ব্যাখ্যা সহ আল্লামা উসমানী র.-এর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

বাস্তবতা হল, হযরত জিবরাঈল আমীন আ. আল্লাহর নির্দেশে বক্ষ বিদারণের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক বিদ্যুতের সুমহান পাওয়ার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর মুবারককে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। অতঃপর ভারী কালাম মহান বানী পাঠ করার নির্দেশ দেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এটা ছিল ভীষণ ভারী। হযরত জিবরাঈল আ.এর চাপ ছিল ভার সহজ করার জন্য।

আল্লামা উসমানী র. বলেন, কোন কোন আধুনিকতাবাদী (প্রবল ধারনা অনুযায়ী আল্লামা শিবলী নু'মানী র. উদ্দেশ্য) বলেছেন, বিষয়টি বুঝে আসে না যে, হযরত জিবরাঈল আ. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চাপ দিবেন, তিনি এটা অনুভব করবেন এবং বিষয়টি সহজ হয়ে যাবে, আর তিনি পড়তে শুরু করবেন!

আমরা বলি, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোন বিষয়টি অনুধাবনযোগ্য! ওহীর হাকীকতই কোন উম্মত জানতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে সব কথা আমাদের বিবেকের উর্ধ্বে। তাহলে কি সব কথা অস্বীকার করে ফেলবেন?

আল্লামা উসমানী র. বলেন, ধরণের কোন বিবরণই দেয়া যায় না। কিন্তু আমার উপর দিয়েই একটি ঘটনা ঘটেছে। আমি হায়দারাবাদের হাসপাতালে গিয়েছিলাম। সেখানে ডাক্তার বৈদ্যুতিক চিকিৎসার অনেক কারিশমা আমাকে দেখিয়েছেন। অতঃপর বলেন, বলুন। আপনার দেহে বিদ্যুত প্রবিষ্ট করব? প্রথমে ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু একটি চেয়ারে বসে পড়লাম। পিতলের একটি দস্তায় ধরে রাখলাম। তিনি মেশিন চালালেন। সামান্য কিছুক্ষন পর বললেন, আমি এ পরিমাণ বিদ্যুত আপনাদের দেহে প্রবিষ্ট করেছি। আমার তাজ্জব হল। তিনি বললেন, আপনি বিস্ময়াভিভূত হবেন না। এক্ষুনি আপনি জানতে পারবেন। তখন মৌলভী

ইয়াহইয়া সাহেবকে বললেন, আপনি তাঁর গায়ে হাতে সামান্য স্পর্শ করুন। তিনি হাত কাছে এনে একটি আঙ্গুল বাড়িয়ে দেন। আমি দেখলাম, আঙ্গুল থেকে একটি স্ফুলিঙ্গ বের হল। তিনি মনে করেছেন, আঙ্গুল জ্বলে গেছে এবং আমি কষ্ট অনুভব করেছি। এবার বুঝতে পারলাম, কোন ভিন্ন জিনিস দেহে রয়েছে। অতঃপর তিনি মৌলভী ইয়াহইয়া সাহেবকে বললেন, একদম জোরে চাপ দিয়ে ধরুন। এবার কোন প্রভাব পড়ল না। তিনি ধরে থাকলেন। তৃতীয় ব্যক্তিকে বললেন, তুমি তাদের গায়ে স্পর্শ কর। লোকটি হাত কাছে আনা মাত্রই পূর্বের সে ধরণ সৃষ্টি হল। এর পর জোরে ধরার পর আর কোন প্রভাব সৃষ্টি হল না। আমি বললাম, আজকে একটি বড় বিষয়ের সমাধান হল। বুঝলাম, জোরে ধরলেও কোন কোন সময় সহজ হয়ে যায়। হযরত জিবরাঈল আ.-এর মিলন যখন হয়েছিল, নূরের সাথে নূরের মুলাকাত হল, তখন প্রথমতঃ খুব কষ্ট হয়েছে। অতঃপর জোরে চাপ দিলে সে কঠিন বিষয়টিই সহজ হয়ে যায়। –ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/৩১০।

২. হযরত শাইখুল হিন্দ র.-এর ব্যাখ্যা

এর সারনির্যাস হল, প্রকৃত শিক্ষক তো মুলতঃ আল্লাহ জাল্লা জালালুহু। হযরত জিবরাঈল আ. শিক্ষার মাধ্যম। যেমন- কলম অথবা দর্পণ বাহক। আল্লাহ তা'আলা প্রথমে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে পূর্ণাঙ্গতাকে সংশ্লিষ্ট করেছেন। তিনি যে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের শীর্ষ ব্যক্তি, নবী-রাসূলগণের নেতা এর সিদ্ধান্ত অনাদিকালেই হয়েছে। কিন্তু তাঁর দাসত্ব ছিল কামিল। গারে হেরার নির্জনতা এটাকে চূড়ান্ত ও শীর্ষ পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এবার তিনি মাকামে আবদিয়তের মুরাকাবায় মগ্ন ছিলেন। এ জন্য যখন জিবরাঈল আমীন আ. اقرأ বলে পরিপূর্ণতা তথা কামালের আহবান জানিয়েছিলেন, তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে মাকামে আবদিয়তে নিমগ্ন থাকার কারণে বলেছেন ما انا بقارئ আর এটা বলাও ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কারণ, এ পর্যন্ত তাঁর কামালাত, আবদিয়তের পর্যায়ে লুকায়িত ছিল, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে হযরত জিবরাঈল বার বার চাপ দিয়ে তাঁকে এই নিমগ্নতার স্থান থেকে উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করেন। নিজের দর্পনে নিজের সুপ্ত কামালাত দেখাতে শুরু করেন। একপর্যায়ে যখন তৃতীয়বার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুপ্ত কামালাত মনে সুদৃঢ় হয়ে গেল, তখন হযরত জিবরাঈল আমীন আ. বললেন- اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الخ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তে শুরু করলেন। আর এ কাজটুকু ধীরে ধীরে ক্রমশঃ তিনবারে করা হয়েছে। কারণ, একবারে করা হলে হয়ত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শক্তি তা বহন করতে পারত না। মোটকথা, হযরত জিবরাঈল আমীন আ. কোন নতুন কিছু সৃষ্টি করেননি। বরং যে জিনিসটি এ পর্যন্ত বিভিন্ন হিকমত ও উপকারিতার ভিত্তিতে সুপ্ত রাখা হয়েছিল, সেটি আল্লাহর হুকুমে দেখিয়ে দিয়েছেন। কারণ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ভবিষ্যতে আজীমুশশান পদের দায়িত্ব অর্পন করা হবে।

হযরত শাইখুল হিন্দ র. একটি উদাহরণও পেশ করেছেন। যেমন- কোন সুদর্শন ব্যক্তি কখনো আয়না দেখেনি, নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে তার কোন অনুভূতিই নেই। কিন্তু হঠাৎ করে তার সামনে আয়না রেখে দিলে নিজের রূপ দেখে আপন সৌন্দর্যের প্রতি আসক্ত হয়ে যাবে। অথচ আয়না তার মধ্যে কোন নতুন কিছু সৃষ্টি করেনি। এখানেও ঠিক তদ্রুপ অবস্থা। আমাদের আমীর শাহখানের কাব্য কতই না যথার্থ!

ترسم که خوری زخمی از تیر نگاه خود ÷ آئینه مبیں هر گز ای محو غاشائی

অর্থাৎ, তুমি আয়না দেখনা। অন্যথায় আমার আশংকা রয়েছে, তোমার ছবি তোমাকে আহত করে দেয় কি না?

৩. হযরত শাহ আবদুল আযীয র. এর অভিনব তাহকীক

সেটা হল, এই চাপ ছিল ঐক্যের সম্পর্ক সৃষ্টি এবং তাঁর মুবারক আত্মায় উঁচু পর্যায়ের ক্রিয়া সৃষ্টি করার জন্য। যেটাকে সূফিয়ায়ে কিরামের পরিভাষায় তাওয়াজ্জুহ বলে। বাস্তবতা হল, প্রকৃত শিক্ষক তো আল্লাহ তা'আলা। জিবরাঈল শিক্ষার মাধ্যম ও দূত। নিয়ম হল যখন একজন কামালবিশিষ্ট ব্যক্তি অন্য আরেক জনের নিকট নিজের কামাল দ্বারা ফায়দা পৌঁছাতে চান, তখন নিজেকে তার দিকে মনোযোগী করেন। অতঃ এই তাওয়াজ্জুহ চার প্রকার- ১. انعکاسی ২ القائی ৩. اصلاحی ৪. اتحادی.

১. انعکاسی এর সারকথা হল, শায়েখ নিজের যিকির শোগল এবং আনফাসে কুদসিয়ার বরকতে হাজিরীনে মজলিসের অন্তরে আল্লাহর স্মরণের জ্যোতির্ময় আত্মা সৃষ্টি করেন। যতক্ষন পর্যন্ত শায়েখ মজলিসে উপস্থিত আছেন, ততক্ষন পর্যন্ত তার আছর উপস্থিতগণের মধ্যে যোগ্যতা অনুসারে পড়ে। দিল-দেমাগ থেকে দুনিয়া উবে যায়, দুনিয়ার কথা ভুলে যায়। কিন্তু যখন শায়েখ মজলিস ত্যাগ করেন, তখন এ অবস্থা খতম হয়ে যায়। এর উদাহরণ হল, কোন ব্যক্তি প্রচুর আতর মাখিয়ে মজলিসে উপস্থিত হল। তার আতরের সুঘ্রাণ হাজিরীনকে বিমোহিত করবে, আতরের ঘ্রাণে সুবাসিত হবে। কিন্তু এটা হল দুর্বল ধরণের তাওয়াজ্জুহ কারণ, এর আছর শুধু মজলিস পর্যন্ত সীমিত। যতক্ষন পর্যন্ত সংসর্গ অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষন পর্যন্তই ফায়দা। এর পরে কিছু নেই। তবে এটি উপকারিতা শূন্য নয়।

২. القائی দ্বিতীয় প্রকার হল, প্রথম প্রকার অপেক্ষা উঁচু পর্যায়ের। এটাকে বলে তাওয়াজ্জুহে ইলকাঈ এখানে শায়েখ নিজের অন্তরের নূরানিয়াত দ্বারা মুরীদের মধ্যে একটি নূরাণী ধরণ প্রক্ষিপ্ত করেন। নিজের বাতিনী নূরের চেরাগ দ্বারা মুরীদের অন্তরের চেরাগকে আলোকোজ্জ্বল করেন। এর উদাহরণ মনে করুন, যেমন- কারো নিকট চেরাগও আছে এবং তেল সলতেও আছে। এবার অন্য কোন ব্যক্তি এরূপ লোকের কাছে যায় যে, নিজস্ব চেরাগ প্রথম থেকেই জ্বালিয়ে রেখেছে। সে এসে বলে আমার চেরাগ আলোকোজ্জ্বল করে দিন। তিনি নিজস্ব আলোকোজ্জ্বল চেরাগ দ্বারা তার চেরাগকে আলোকোজ্জ্বল করে দেন। এতে প্রথমটি থেকে কিছু শক্তি অতিরিক্ত আছে। মজলিসের পরেও এর আছর অবশিষ্ট থাকে। এবার মুরীদের কাজ হল, যিকর ও শোগলের তেল ঢালতে থাকা। তাছাড়া গুনাহের হাওয়া থেকে তার হেফাজত করা। অন্যথায় চেরাগ নিভে যাবে।

৩. ইসলাহী। এটা হল, তাওয়াজ্জুহের তৃতীয় প্রকার। এটা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের তুলনায় শক্তিশালী। এতে মুরীদ স্বীয় অন্তরকে রিয়াযত, মুজাহাদা তথা সাধনার মাধ্যমে সম্পূর্ণ পরিস্কার করে ফেলে। অতঃপর শায়েখ তাওয়াজ্জুহ দিয়ে নিজে নূরের একটি বড় অংশ মুরীদকে দান করেন। মুরীদ অন্তরের পরিচ্ছন্নতার কারণে তার নূরানিয়াত গ্রহণ করে। এর উদাহরণ এক ব্যক্তি পূর্ণ মেহনত পরিশ্রম করে হাউয খনন করে ভালরূপে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে কোন নদীর সাথে তার মুখ সংযোগ সৃষ্টি করে। যাতে এ হাউযে পানি আসে। এবার যদি হাউযের মুখে সামান্য খড়কুটা, মাটি ইত্যাদি আসে, তবে পানির চাপে তা নিজেই নিজেই প্রবাহিত হয়ে চলে যাবে। কিন্তু যদি মুখে বড় পাথর পড়ে যায়, তবে পানির আগমন বন্ধ হয়ে যাবে। ৪. ইত্তিহাদী। চতুর্থ পর্যায়ের তাওয়াজ্জুহ হল, ইত্তিহাদী। এতে শায়েখ স্বীয় কামালপূর্ণ আত্মাকে উপকার প্রার্থী মুরীদের আত্মার সাথে মিলিয়ে দেন। নিজের কামালাত ও জ্যোতিসমূহ তার মধ্যে প্রবাহিত করেন। যাতে শায়খের স্বভাবের সাথে তার স্বভাব মিলে যায়, একাকার হয়ে যায়। যার ফলে শায়েখের অন্তরে যা আসবে, মুরীদের অন্তরেও তা আসবে।

এর উদাহরণে হযরত শাহ সাহেব র. হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী র.-এর শায়েখ মুরশিদ হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ র.-এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একবার খাজা শাহেবের দরবারে কয়েকজন মেহমানের

আগমন ঘটে। তখন তাদের মেহমানদারীর জন্য তার কাছে কিছু ছিল না। তিনি খুব পেরেশান হলেন। এই পেরেশানীতে কখনো হুজরার ভিতরে যান। ভীষণ অস্থিরতায় কখনো আবার বাইরে বেরিয়ে আসেন। সামনে ছিল এক রুটিওয়ালার দোকান। তিনি বিষয়টি জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ একটি চিনামাটির পাত্রে খানা নিয়ে হযরত খাজা সাহেবের খেদমতে হাজির করেন। মেহমানরা খানা খেলেন। খাজা সাহেব খুব খুশী হলেন। বাস্তবতা হল, এ সব মাশায়েখের রীতি অনুযায়ী নিজের ব্যক্তিগত হাদিয়া তোহফার জন্য এতটা খুশী হন না, যতটা খুশী হন বিশেষ মেহমানদের হাদিয়া-তোহফার জন্য। তখন যদি কেউ মেহমানদের জন্য উপযুক্ত হাদিয়া আনেন, তবে অন্তর খুশীতে আটখানা হয়ে যায়। অন্তরের দ্বার খুলে যায়। এখানেও তাই হয়েছে। রুটিওয়ালা যখন তার পাত্র নেয়ার জন্য এল, তখন হযরত বললেন, কি চাওয়ার চাও? সে আরয করল, হযরত! আপনার মত বানিয়ে দিন। খাজা সাহেব বললেন, তুমি তা বরদাশত করতে পারবে না। অন্য কিছু চাও। কিন্তু সে তার দাবিতে অটল রইল।

খাজা সাহেব তাকে হুজরায় নিয়ে গেলেন। নিজের বুকের সাথে মিলিয়ে ইত্তিহাদী তাওয়াজ্জুহ দান করলেন। কিছুক্ষন পর উভয়ে বেরিয়ে এলেন। এবার উভয়ের ছূরত পর্যন্ত এক রকম হয়ে যায়। শুধু পার্থক্য এতটুকু ছিল যে, হযরত খাজা সাহেব র.-এর হুশ ও ইন্দ্রিয়শক্তি সব ঠিক ছিল। রুটিওয়ালা বেহুশ ছিল। এর ফল এই দাড়াল যে, এই রুটিওয়ালা তিন দিন পর মৃত্যুমুখে পতিত হল। আল্লাহ তা'আলার তাঁর প্রতি রহম করুন।

মোটকথা, এখানে হযরত জিবরাঈল আ. আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অনেক কামালাত নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি সেসব কামালাত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তর মুবারকে ঢালতে চেয়েছেন। কিন্তু যদি ক্রমশঃ ও ধারাবাহিক কানুন থেকে নজর ফিরিয়ে নেয়, তবে শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। এ জন্য এ রূপ অবলম্বন করা হয়েছে যে, একবার চাপ দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। বিরতি দিয়ে পুনরায় চাপ দিয়েছেন। এরপর তৃতীয়বার চাপ দিয়েছেন। এমনিভাবে ক্রমশঃ তিনবারের আমল দ্বারা ইত্তিহাদী তাওয়াজ্জুহ ঢুকিয়ে যোগ্যতা সৃষ্টি করার পর আয়াতে মুবারাকা তিলাওয়াত করেছেন।

এখান থেকে এ বিষয়টিও জানা গেল যে, যদি তাওয়াজ্জুহে ইত্তিহাদী গ্রহণকারী যোগ্যতাসম্পন্ন হয়, তবে তার শুধু ক্ষতি হয়না যে তাই নয়; বরং সে ন্যূনতম সময়ে অন্যের কামালাত নিজের মধ্যে টেনে আনে। যেমন হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী র. সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, এই হযরত খাজা বাকি বিল্লাহ র.-এর খেদমতে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী র. এসে পৌঁছেন, বাইআত হন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই কুতুব ফরদ ইত্যাদি উঁচু ধাপগুলো পর্যন্ত উন্নতি লাভ করেন। যদিও খাজা সাহেব র. তাঁকে নৈকট্য এবং আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার উঁচু মরতবাগুলো অর্জন ও পূর্ণাঙ্গতা লাভের সুসংবাদ শুনান এবং বলেন যে, শায়েখ আহমদ সারহিন্দী র. আমাদের এখানে এসেছেন। তিনি প্রচুর ইলমের অধিকারী এবং আমলের দিক দিয়ে শক্তিশালী। কয়েক দিনেই আমরা তাঁর অনেক বিস্ময়কর, বিরল ঘটনা প্রকাশ করেছি। এরূপ মনে হয় যে, তিনি একটি সূর্য হবেন। যদ্বারা সারা জাহান আলোকোজ্জ্বল হবে। একদিন এটাও বলেছেন যে, শায়েখ আহমদ সারহিন্দী র. এরূপ ভাস্কর যার ছায়ায় আমাদের ন্যায় হাজার হাজার তারকাও হারিয়ে যায়। এর ফলে এটাও বুঝা গেল যে, তাওয়াজ্জুহ গ্রহণকারী কখনো তাওয়াজ্জুহ দাতাদের চেয়েও অগ্রগামী হয়ে যায়। যেমন- এখানে হযরত খাজা সাহেব নিজেই বলেছেন যে, হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবের উদাহরণ ঠিক সূর্যের ন্যায়। আমাদের মত সহস্র তারকা তাঁর ছায়ায় হারিয়ে যায়। -আনওয়ারুল বারী ঃ ১/৫।

৪. আল্লামা কাসতাল্লানী র. বলেন, প্রথমবার চাপ প্রয়োগ ছিল সর্বদিক থেকে মনোযোগ হটানোর জন্য। দ্বিতীয়বার ওহীয়ে ইলাহী থেকে নফসকে মনোযোগী করার জন্য। আর তৃতীয়বার হল, সুসম্পর্ক গড়ার জন্য। -কাসতাল্লানী ঃ ১/১০৮।

বাহজাতুন নুফূস গ্রন্থকার লিখেছেন- রাসূলু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নিজের সীনার সাথে মিলিয়ে চাপ দেয়া দ্বারা হযরত জিবরাঈল আ.-এর উদ্দেশ্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে নূরানী একটি জবরদস্ত শক্তি সৃষ্টি হওয়া। যার ফলে তিনি ওহীয়ে ইলাহী বহনে সক্ষম হন।

-আনওয়ারুল বারী ঃ ১/৪৯।

فقال اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ

এটা হল, ما انا بقارئ এর উত্তর যদিও আপনি পড়তে অক্ষম স্বীয় প্রভূর নামের সাহায্যে পড়তে শুরু করুন। অতঃপর রব শব্দটি এবং যমীরে মুখাতাবের দিকে তার ইযাফত এদিকে ইঙ্গিত যে, যে সত্তা আপনার প্রতিপালন শৈশব থেকে করেছেন এবং পূর্ণাঙ্গ মানবে রূপান্তরিত করেছেন, এখন কি তিনি এরূপই ছেড়ে দিবেন? কারণ, তরবিয়তের অর্থই হল-

تبليغ الشئ الي كماله شيئا فشيئا اى تدريجا

অর্থাৎ, কোন জিনিসকে ক্রমশঃ পূর্ণাঙ্গতা পর্যন্ত পৌছানো। অর্থাৎ, চল্লিশ বছর পর্যন্ত আপনার প্রতিপালন করেছেন, পূর্ণাঙ্গতা পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। শুরু থেকেই আপনার নবুয়তের আজীমুশশান নিদর্শনাদি প্রকাশ করেছেন। যেমন- হযরত মূসা আ.-এর এরূপ সময় জন্মলাভ এবং জীবিত থাকা, যখন বনী ইসরাঈলের সমস্ত ছেলেদের হত্যা করার নির্দেশ (ফিরআউন) দিয়ে রেখেছিল। বরং শত সহস্রকে শুধু এজন্য তলোয়ার দ্বারা যবাই করেছে যে, মূসা আ. যেন দুনিয়াতে বেঁচে না যান। কিন্তু কুদরতের কারিশমা হল, সে ফিরআউনের তত্ত্বাবধানে মূসা আ.কে লালনপালন করেছেন। যেই ফিরআউনের ভয়ে মূসা আ.-এর জননী তাঁকে নদীতে নিক্ষেপ করেছেন এবং অতঃপর ফিরআউনের ঘরেই প্রতিপালিত হয়েছেন। এসব ছিল নবুওয়তের নিদর্শন।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তো জন্মের পূর্বেও এরূপ নিদর্শনাদি প্রকাশ পেয়েছে, যা কোন আজীমুশশান বিষয়ের অস্তিত্বের সংবাদ দেয়। যেমন- প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জননী কর্তৃক জ্যোতি দর্শন, তাঁর দাদার স্বপ্ন ইরান সম্রাটের রাজপ্রাসাদের টুকরো ভেঙ্গে পড়া, ইরানের অগ্নিকুণ্ডলী ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি।

اَلَّذِىْ خَلَقَ এতেও পড়ার যোগ্যতার প্রমান রয়েছে। কারণ, যে সত্তা গোটা বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তিনি আপনার মধ্যে পড়ার গুণ সৃষ্টি করতে সক্ষম। ব্যাপকতা বুঝানোর জন্য خلق এর মাফউল উহ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ, সব কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ এটাও পড়ার যোগ্যতার প্রমাণ। কারণ, যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা যার করায়ত্বে, যিনি একটি নাপাক ও অনুভূতিহীন জড় বস্তুতে বরং নিস্প্রাণ রক্তপিণ্ডকে মানব রূপ দান করেছেন, শ্রবণ, দর্শন, অনুধাবন ও বিভিন্ন প্রকার গুন দ্বারা ভূষিত করেছেন, তার জন্য একজন পূর্ণাঙ্গ মানবকে পূর্ণাঙ্গতর রূপ দান এবং ননপড়ুয়াকে পড়ুয়ায় রূপান্তরিত করা কি জটিল কাজ?

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উপকৃত হওয়া এবং উপকার পৌছানোর ক্ষেত্রে দুটি জিনিস প্রতিবন্ধক হয়- ১. উপকারপ্রার্থীর মধ্যে যোগ্যতা নেই। ২. উপকারী ব্যক্তি কৃপণ। এজন্য অপরজনকে উপকৃত করতে কার্পণ্য করে। পূর্বোক্ত আয়াতে বিবরণ রয়েছে যে, উপকারপ্রার্থী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে পড়ার পূর্ণ যোগ্যতা আছে এবং رَبُّكَ الْاَكْرَمُ আয়াতে বিবরণ

রয়েছে যে, উপকারদাতা অর্থাৎ, আপনার প্রভূ সবচেয়ে বেশি বদান্যতাকারী, করমের অধিকারী। অতএব, তার থেকে উপকৃত হতে কোন বাধা নেই।

الذى علم بالقلم। যিনি কলমের সাহায্যে শিখিয়েছেন, এতেও পড়ার যোগ্যতার বিবরণ রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার সত্তা একটি জড় পদার্থ অর্থাৎ, কলম দ্বারা বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শাস্ত্রের প্রচার-প্রসারের কত বিরাট কাজ নিয়েছেন। অতএব, আপনার মাধ্যমে কুরআনের নূর পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছাতে কোন অযৌক্তিকতা রয়েছে?

এতে এদিকেও ইঙ্গিত যে, হযরত জিবরাঈল ফিরিশতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রেষ্ঠ নন। কারণ, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষক নন। বরং শিক্ষার মাধ্যম। পক্ষান্তরে শিক্ষার মাধ্যম ছাত্র থেকে উত্তম হয় না। যেমন- কলম হল শিক্ষার মাধ্যম। এটি ছাত্র অপেক্ষা উত্তম নয়।

علمه شديد القوى তে শিক্ষার সম্বন্ধ রূপকার্থে ফিরিশতার দিকে করা হয়েছে। প্রকৃত শিক্ষক আল্লাহ তা'আলা যেমন- মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন-

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ، وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ

তাছাড়া علم بالقلم আয়াতেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কলম লিপিকারদের ইচ্ছা অতিক্রম করতে পারে না। এরূপভাবে শিক্ষার মাধ্যম ফিরিশতারা আল্লাহ তা'আলার হুকুমের অবাধ্যতা করতে পারে না। وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

علم الانسان مالم يعلم এর দ্বারাও পড়ার যোগ্যতা সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য। কারণ, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, যে মানব জন্মকালে শুধু অজ্ঞই ছিল, তাতে বুঝ-বিবেকের লেশমাত্রও ছিল না, অতএব, সে সত্তার জন্য একজন পূর্ণাঙ্গ মানবকে পড়ুয়া বানানো কোন মুশকিল কাজ নয়।

আল্লামা আইনী র. বলেন- اشارة الى علم اللدنى তখন পর্যন্ত সূরা ইকরা এর এতটুকু পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়েছিল। অবশিষ্ট অংশ নাযিল হয়েছে পরবর্তীতে। -উমদাহ।

একটি প্রশ্নোত্তর

◆ সহীহ বুখারীতে এই তৃতীয় হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, সর্বপ্রথম নাযিলকৃত কুরআন শরীফের আয়াত হল সূরা ইকরা। কিন্তু এই বুখারী শরীফের কিতাবুত তাফসীরে (পৃষ্ঠা ৭৪০) এবং মুসলিম শরীফে (১/৯০) হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত আছে- সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াত হল- يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ আরেকটি হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে সূরা ফাতিহা। অতএব, সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা কি?

উত্তর ঃ এ সব হাদীসে কোন বিরোধ নেই। কারণ, প্রকৃত অর্থে প্রথম হল সূরা ইকরা এর পাঁচ আয়াত। ইমাম নববী র. বলেন-

هذا هو الصواب الذى عليه الجماهير من السلف والخلف

তথা এটাই সঠিক। পূর্ববর্তী পরবর্তী সংখ্যাগরিষ্ঠের মত এটাই।

সর্বপ্রথম নাযিলকৃত পূর্ণ সূরা হল, সূরা ফাতিহা। আর তিন বছর মেয়াদকাল পর্যন্ত ওহী বন্ধ থাকার পর সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে সূরা মুদ্দাসসিরের فاهجر আয়াত পর্যন্ত। মোটকথা, বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করলে তিনটি জিনিসের মধ্যে তিনটি দিক রয়েছে। এজন্য সর্বপ্রথম বলে যে সব উক্তি রয়েছে, সেগুলো বিভিন্ন দিকে লক্ষ্য করলে সবই সহীহ।

فرجع بها অর্থাৎ, আয়াতগুলো নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন। -কাসতাল্লানী।

فدخل على خديجة। الخ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদীজা রা.-এর নিকট তাশরীফ এনেছেন। এর কারণ স্পষ্ট। কারণ, তিনি ছিলেন তাঁর পরিবার। হযরত খাদীজা রা. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অর্ধাঙ্গিনী ছিলেন।

উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা রা.

উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ রা. সর্বসম্মতিক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথমা স্ত্রী এবং সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম মুসলমান। কোন নারী বা পুরুষ তার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেননি। তাঁর সম্মানিত পিতা খুয়াইলিদ ইবনে আসাদ আরবের সুপ্রসিদ্ধ বণিক এবং কুরাইশের নামযাদা মনীষী ছিলেন। তাঁর মাতা ফাতিমা বিনতে যাইদা। হযরত খাদীজা রা. ছিলেন বর্বরতার যুগের রসম রেওয়াজ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। এ কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের পূর্বে তিনি তাহেরা বা পবিত্র রমণী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিল আবু হালা ইবনে যুরারা তাইমীর সাথে। তাঁর ঘরে হিন্দ এবং হালা নামক দুটি সন্তান জন্ম নেয়। হিন্দ এবং হালা উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, উভয়েই সাহাবী ছিলেন। হিন্দ ইবনে আবু হালা নেহায়েত উচ্চাঙ্গের ভাষাবিদ ছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈহিক গঠন সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ তাদের থেকেই বর্ণিত। হযরত হাসান হুসাইন রা. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দৈহিক গঠন সংক্রান্ত বিবরণ স্বীয় এই মামাদের থেকেই প্রদান করেন।

আবু হালার ওফাতের পর তিনি আতিক ইবনে আইয মাখযূমীর সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার ঔরসে হিন্দ নাম্নী এক কন্যার জন্ম হয়। হিন্দও ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবিয়তের মর্যাদা অর্জন করেন। কিছুকাল পরে আতিকেরও ওফাত হয়ে যায়। হযরত খাদীজা রা. তখন একা বিধবা থেকে যান। -যুরকানী।

হযরত খাদীজা রা. ছিলেন একজন সুদর্শনা ও বিত্তবৈভবের অধিকারীনী মহিলা। এজন্য অনেক কুরাইশ নেতা তাঁকে বিয়ে করার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তিনি সবগুলোই প্রত্যাখ্যান করেন এবং নাফীসা বিনতে উমাইয়্যা অর্থাৎ, ইয়ালা ইবনে উমাইয়্যার সহোদরার মাধ্যমে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। হযরত খাদীজা রা.-এর চাচা আমর ইবনে আসাদ তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়ে করিয়ে দেন। তখন হযরত খাদীজা রা.-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল পঁচিশ বছর। পঁচিশ বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দাম্পত্য জীবন কাটান। হিজরতের তিন বছর পূর্বে রমযানুল মুবারকে ১০ম নববী বর্ষে ৬৫ বছর বয়সে তিনি ওফাত লাভ করেন। হুজুন নামক স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাঁকে কবরে নামান। জানাযা তখন পর্যন্ত বিধিবদ্ধ হয়নি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তানদের মধ্য থেকে হযরত ইবরাহীম তাঁর উম্মে ওয়ালাদ মারিয়া কিবতিয়ার ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। যিনি শৈশবেই ইনতিকাল করেন। হযরত ইবরাহীম ছাড়া অবশিষ্ট সব সন্তান হযরত খাদীজা রা.-এর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। দুই সাহেবযাদার একজন কাসিম। যার কারণে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপনাম হয় আবুল কাসিম। তিনি দুই বছর বয়সে পরকালে পাড়ি জমান। দ্বিতীয় কলিজার টুকরা আবদুল্লাহ নবুওয়তের পর জন্মগ্রহণ করেন। তার উপাধি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে তায়্যিব এবং হযরত খাদীজা রা.-এর পক্ষ থেকে তাহির ছিল। তিনিও শৈশবে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুত্র সন্তান না থাকার ফলে ভর্ৎসনা করা হয়েছে এবং এর ফলে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়েছে। সাহেবযাদী ছিলেন চার জন- ১. হযরত যয়নব ২. রুকাইয়্যা ৩. উম্মে কুলসূম ৪. ফাতিমা রা.। বিশুদ্ধ উক্তি অনুযায়ী এই ক্রমবিন্যাস অনুযায়ীই তাঁদের জন্ম হয়।

فقال زملوني زملوني الخ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে এসেই বললেন- আমার গায়ে কম্বল দাও, আমার গায়ে কম্বল দাও। লোকজন কম্বল দিলেন। অবশেষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শংকা দূর হল।

একটি প্রশ্ন

একটি প্রশ্ন হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত খাদীজা রা.-এর নিকট তাশরীফ আনলেন, তখন পুংলিঙ্গের শব্দ زملوني দ্বারা কেন সম্বোধন করলেন? অথচ সম্বোধিত ছিলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা রা.?

উত্তর ঃ ১. এরূপ স্থানে তথা খেদমতের স্থলে বাগধারায় পুরুষ ও স্ত্রীলিঙ্গের পার্থক্য করা হয় না। এই জন্য ঘরে যেয়ে সাধারণত স্ত্রীকে বলে খানা আন।

২. ঘরে হযরত খাদীজা রা.-এর গোলাম-বাদীও ছিল। তৎকালীন সময়ে যেহেতু পর্দার নিয়ম ছিল না, সেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে সম্বোধন করেছেন।

لقد خشيت علي نفسي আমার তো নিজের জানের আশংকা হয়ে গিয়েছিল।

বাক্যটির ব্যাখ্যায় আল্লামা আইনী, হাফিজ আসকালানী র. প্রমূখ বারটি উক্তি বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে কোন কোনটি সম্পূর্ণ ভুল ও বাতিলযোগ্য। আর কোন কোনটি দুর্বল। এসব উক্তি বর্ণনা করার পর হাফিজ আসকালানী র. বলেন-

واولى هذه الاقوال بالصواب واسلمها من الارتياب الثالث واللذان بعده وما عداها فهو معترض ا

অর্থাৎ, এসব উক্তি থেকে নিকটতম সঠিক এবং সমস্ত সন্দেহ-সংশয় থেকে নিরাপদ তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমটি। অর্থাৎ, ১. ভীষণ ভয়ে মৃত্যু ২. রোগ ৩. স্থায়ী অসুখ।

কিন্তু এসব উক্তি নির্ভরশীল বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎকালের উপর। অর্থাৎ, আমার আশংকা হয় আমি মরে যাব। অথচ হাদীস শরীফে خشيتُ অতীত কাল বুঝাবার শব্দ রয়েছে। মুযারি'-এর শব্দ নয়। অর্থাৎ, অতীত ঘটনার বিবরণ রয়েছে। যে ঘটনা হেরা গুহায় সংঘটিত হয়েছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে আগমন ও প্রশান্তি লাভের পর হযরত খাদীজা রা.কে বললেন, খাদীজা! হেরা গুহার ব্যাপারটি এত কঠিন ছিল যে, আমার জানের আশংকা হয়ে গিয়েছিল। কোন ক্রমেই এই অর্থ নয় যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আশংকা করছিলেন যে, আমি কি করব?

আল্লামা আবু হাসান মুহাম্মদ ইবনে আবদুল হাদী সিন্ধী র. বলেন, আমার মতে সংগত ব্যাখ্যা হল- لقد خشيتকে অতীতের সাথে সংশ্লিষ্ট মেনে নেয়া। হতে পারে যখন প্রথম প্রথম তিনি ফিরিশতা দেখেছেন, তখন চেনা ও ওহী প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে তিনি ভয় পেয়েছিলেন। বস্তুতঃ ফিরিশতাকে চেনা এবং ওহীর প্রচারের পূর্বে ভয় ক্ষতিকর নয়। যেমন- হযরত ইবরাহীম আ. সম্পর্কে ইরশাদ রয়েছে-

فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً — فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الرَّوْعُ —

যদি ভয়কে বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎকালের জন্য মেনে নেয়া হয়, তাহলে অর্থ হবে খাদীজা! আমার উপর এমন কঠিন অবস্থা গেছে যে, ভবিষ্যতে এধরনের কঠিন পরিস্থিতিতে দু তিনবার ওহী নাযিল হলে আমার আশংকা হয় আমার জান বেরিয়ে যাবে।

মোটকথা, আল্লামা সিন্ধী র.-এর মতে ভয় বর্তমান কাল কিংবা ভবিষ্যৎকালের জন্য নয়। এটি অতীত বুঝানোর শব্দ। অতীতের অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

হযরত খাদীজা রা.-এর নিকট এ ঘটনার উল্লেখের হিকমত আল্লামা সিন্ধী র. এই বর্ণনা করেছেন যে, হযরত খাদীজা রা.-এর পরীক্ষা উদ্দেশ্য ছিল। যেরূপভাবে হযরত ইবরাহীম আ. কর্তৃক فانظر ماذا ترى দ্বারা জিজ্ঞাসার মাধ্যমে উদ্দেশ্য ছিল হযরত ইসমাঈল আ.-এর পরীক্ষা। এরূপভাবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে চাচ্ছিলেন, এই সংবাদ শুনে হযরত খাদীজা রা. ঈমান আনয়ন করেন কি না? এবং এই পরীক্ষার জন্য তিনি এরূপ পন্থা অবলম্বন করেছেন। যার ফলে হযরত খাদীজা রা. সহমর্মিতা আরম্ভ করেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসিত গুণাবলী উল্লেখ করে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

كلا والله مايخزيك الله ابدا হযরত খাদীজা রা. উত্তর দিলেন, কখনো এরূপ হবে না। আল্লাহর শপথ, তিনি কখনো আপনাকে অপমান করবেন না। এর দ্বারা হযরত খাদীজা রা.-এর পূর্ণ মেধা ও পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ, পার্থিব অভিজ্ঞতার আলোকে এ বিষয়টি প্রসিদ্ধ ছিল, যার মধ্যে এরূপ আখলাক-চরিত্র ও গুণাবলী থাকে, এগুলোর ফাযায়েলের কারণে সে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে থাকে। কুদরতের পক্ষ থেকে তাঁর সাহায্য হয়। তাছাড়া হাদীসেও এসেছে- সদ্ব্যবহার অপমান-অপদস্থতা থেকে রক্ষা করে। এখানে পাঁচটি নৈতিক চরিত্রের বিবরণ দেয়া হয়েছে-

১. انك لتصل الرحم আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন। অর্থাৎ, আত্মীয়দের হক আদায় করেন। হযরত খাদীজা রা. সমস্ত গুণ থেকে সর্বপ্রথম আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ, পরের সাথে সদ্ব্যবহার এত বেশি মুশকিল নয়, নিকটাত্মীয়ের সাথে যতটা মুশকিল।

২. وتحمل الكل কাফ-এর উপর যবর। লাম তাশদীদযুক্ত। অর্থাৎ, আপনি বোঝা বহন করেন। এতে সমস্ত দুর্বল, ইয়াতীম অপারগ ও মা'যূর অন্তর্ভূক্ত। কারণ, كل এরূপ প্রতিটি ব্যক্তিকে বলা হয়, যারা নিজেদের বোঝা বহন করতে পারে না। উদ্দেশ্য হল, অক্ষম লোকদের বোঝা আপনি বহন করেন, তাদের সাহায্য করেন।

৩. وتكسب المعدوم তা-এর উপর যবর।

আল্লামা আইনী র. বলেন- هو المشهور الصحيح فى الرواية المعروف فى اللغة অর্থাৎ, রেওয়ায়াতে প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ, অভিধানেও প্রসিদ্ধ।-উমদাহ ঃ ১/ ৫১।

কাযী ইয়ায র. বলেন- وهذه الرواية اصح এ রেওয়ায়াতটিই বিশুদ্ধতম। -ফাতহুল বারী ঃ ১/২০।

অতঃপর كسب শব্দটি কখনো এক মাফঊলে মুতাআদ্দী হয়, আবার কখনো দুই মাফঊলে। মোটকথা, মুজাররাদে এই শব্দটি দু ভাবে ব্যবহৃত হয়।

মাফঊলে মুতাআদ্দী হলে অর্থ হবে, আপনি নিঃস্ব ফকীরদের উপার্জন করেন। এর উদ্দেশ্য হল আপনি নিঃস্ব ও মুখাপেক্ষীদের প্রতি এত অনুগ্রহ করেন যেন তারা আপনার উপার্জিত মালিকানাধীন গোলাম হয়ে যায়। নিঃস্ব ও মুখাপেক্ষীকে معدوم এই জন্য বলা হয়েছে যে, তারা যেন মৃতের পর্যায়ভূক্ত। নিজের জীবিকা নির্বাহ ও প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থা করতে পারে না। দ্বিতীয় অর্থ হল, আপনি দুঃষ্প্রাপ্য সম্পদ উপার্জন

করেন। অর্থাৎ, সাধারণ লোক যে দুঃষ্প্রাপ্য সম্পদ উপার্জন করতে পারে না, আপনি তা উপার্জন করেন। প্রসিদ্ধ ছিল যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড়ই ভাগ্যবান। - كان محظوظًا في التجارة

অতঃপর এরূপ অর্জন করে নিজে পুঞ্জিভূত রাখেন না। বরং تحمل الكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق অর্থাৎ, অন্যদের পিছনে ব্যয় করেন।

যদি تكسب দুই মাফঊলে মুতাআদ্দী হয়, তবে এক মাফঊল উহ্য হবে। অর্থাৎ, تكسب غيرك المعدوم মানে দুঃষ্প্রাপ্য জিনিস আপনি অন্যদেরকে দান করেন।

দ্বিতীয় ছূরত এটাও হতে পারে যে, تكسب المعدوم المال তে معدوم শব্দটি প্রথম মাফঊল। অর্থাৎ, নিঃস্ব। আর দ্বিতীয় মাফঊল উহ্য। অর্থাৎ, تكسب المعدوم المال মানে আপনি নিঃস্ব ও মুখাপেক্ষী লোকদেরকে সম্পদ দান করেন। এই জন্য কোন কোন কপিতে معدوم -এর স্থলে معدم ইসমে ফায়েল রূপে এসেছে। এর অর্থ হল, মুখাপেক্ষী-নিঃস্ব। কোন কোন কপিতে তা-এর উপর পেশ সহকারে বাবে ইফআল থেকে মানে দান করা। এমতাবস্থায় দুই মাফঊলে মুজাররাদ মুতাআদ্দী হওয়া কালে যে অনুবাদ হবে, এখানেও তাই হবে।

৪. تقرى الضيف তা-এর উপর যবর। মানে আপনি মেহমানদারী করেন।

৫. وتعين على نوائب الحق সত্য পথে বিপদগ্রস্ত লোকদের আপনি সাহায্য করেন। نوائب- **শব্দটি** نائبة এর বহুবচন। এর অর্থ দুর্ঘটনা। হক শব্দের বন্ধনারোপ করে বাতিলকে বাদ দেয়া উদ্দেশ্য। কারণ, বিপদাপদ-দুর্ঘটনা উভয় প্রকার হয়ে থাকে। মানে যদি হকের কারণে কোন মসিবতে কেউ পতিত হয়, তবে তিনি সাহায্য করেন। কিন্তু যদি কেউ না হক কাজে যায়, যেমন-চুরি করতে যাচ্ছে অথবা কারো হক মেরে দেয়ার চেষ্টা করছে, তখন তিনি তাতে সাহায্য করতেন না।

কোন কোন আলিমের মত হল, نوائب حق দ্বারা উদ্দেশ্য আসমানী বালা-মসিবত। যেমন- প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে ঘর-বাড়ি ধ্বসে যাওয়া অথবা ভীষন গরম হাওয়ার কারণে অথবা লু হাওয়া, ঠাণ্ডা ইত্যাদির কারণে বাগান ও ফসলাদি বিনষ্ট হওয়া ইত্যাদি। মোটকথা, আসমানী বালা-মসিবত হোক অথবা জমিনী, সর্বাবস্থায় হকের পক্ষে ন্যায়ের অনুকূলে তিনি সাহায্য করেন।

فانطلقت به خديجة حتى اتت به ورقة بن نوفل الخ

হযরত খাদীজা রা. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়ারাকা ইবনে নওফিলের নিকট নিয়ে যান। যিনি ছিলেন হযরত খাদীজা রা.-এর চাচাতো ভাই।

বর্বরতার যুগে দু ব্যক্তি মক্কা থেকে শাম অভিমুখে হক অন্বেষণে বের হয়েছিলেন- ১. যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (যিনি আশারায়ে মুবাশারার একজন হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রা.-এর পিতা) ২. এই ওয়ারাকা ইবনে নওফিল। অবশেষে যায়েদ দীনে ইবরাহীমীর উপর অটল থাকেন। বাইতুল্লাহ ধরে তিনি বলতেন, হে বাইতুল্লাহর মালিক! আমি দীনে ইবরাহীমীর উপর আছি এবং তিনি নিজেকে মিল্লতে ইবরাহীমীর উপর প্রতিষ্ঠিত বলে বলতে থাকেন। তার ইনতিকাল হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের পূর্বে।

হযরত ওয়ারাকা হকের অন্বেষণে লেগে থাকেন। অবশেষে তিনি এক জন খ্রীষ্টান আলিম পেলেন, যিনি খ্রীষ্ট ধর্মের উপর অটল ছিলেন এবং ওয়ারাকা খ্রীষ্ট ধর্ম অবলম্বন করেছেন।

وكان يكتب الكتاب العبراني ওয়ারাকা হিবরু ভাষার লিপিকার ছিলেন। অর্থাৎ, ইঞ্জিলের অনুবাদ লিখতেন হিবরু ভাষায়। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে-

يكتب كتاب العربي ويكتب من الانجيل بالعربية. بخاري ٢/٨٤٠.

উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ, হযরত ওয়ারাকা আরবী ও হিবরু উভয় ভাষা জানতেন উভয় ভাষায় অনুবাদ করতেন। ইঞ্জিলের মূল ভাষা সুরিয়ানী। এটি সূরিয়ার দিকে সম্বন্ধযুক্ত। সূরিয়া শাম দেশকে বলে। তাওরাতের মূল ভাষা ছিল ইবরানী বা হিবরু। ইবরানী শব্দটি عبر এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। عبر يعبر عبرًا عبورًا از باب نصر পার হওয়া। عبر এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে عبری এবং কোন কোন সময় কিয়াস পরিপন্থী ভাবে আলিফ নূন অতিরিক্ত করে ইবরানী বলা হয়।

হযরত ইবরাহীম আ. যখন নমরূদ থেকে রক্ষা পেয়ে ইরাক থেকে ফোরাত নদী পেরিয়ে শামের দিকে চলে যান, তখন সেখানে এই ভাষা সৃষ্টি হয়। এই জন্য এটাকে ইবরানী বলা হয়েছে।

সারকথা, হযরত ওয়ারাকা আরবী ইবরানী উভয় ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। এই জন্য ইঞ্জিলকে সুরিয়ানী ভাষায়, কোন কোন অংশ ইবরানী ভাষায়, আর কোন কোন অংশ আরবী ভাষায় অনুবাদ করতেন। -শরহে নববী, -মুসলিম ঃ ১/৮৯।

কেউ কেউ বলেছেন, মূলতঃ প্রতিটি আসমানী কিতাব আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। অতঃপর স্বীয় জাতীয় ভাষায় অনুবাদ করতেন। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

وكان شيخا كبيرا قدعمى প্রশ্ন হয়, তিনি যেহেতু অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, সেহেতু লিখতেন কিভাবে?

উত্তর ঃ ১. হয়ত অন্ধ হওয়ার পূর্বে লিখতেন। ২. হতে পারে চোখের জ্যোতির দুর্বলতাকে অন্ধত্ব দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। চোখে কম দেখলেও তিনি লিখতেন। ৩. হতে পারে কারো দ্বারা লিখাতেন।

فقالت له خديجة يا ابن عمّ হযরত খাদীজা রা. তাকে বললেন, চাচাতো ভাই! মুসলিমের (পৃষ্ঠা ঃ ৮৮) রেওয়ায়াতে আছে -عم- (চাচা!)। আল্লামা নববী র. এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, ابن عمّ তো বাস্তব অনুযায়ী ছিল। কারণ, বাস্তবে ওয়ারাকা ছিলেন চাচাতো ভাই। আর عم (চাচা) বলেছেন বয়স্ক হওয়ার কারণে সম্মানার্থে। এটা আরবের পরিভাষা।

اسمع من ابن اخيك الخ আপনার ভাতিজার কথা শুনন, ওয়ারাকা ইবনে নাওফিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা ছিলেন না। কিন্তু যেহেতু আরবরা সব বড়কে সম্মানার্থে চাচা এবং সব ছোটকে স্নেহ-মমতা স্বরূপ ভাতিজা বলতেন, সেহেতু হযরত খাদীজা রা. ابن اخ বলেছেন।

هذا الناموس الذى نزل الله على موسى তিনি সেই রাজবিশেষজ্ঞ, যাকে আল্লাহ তা'আলা মূসা আ.-এর নিকট ওহী দিয়ে পাঠিয়েছিলেন।

নামূসের অর্থ হল, রাজসংক্রান্ত জ্ঞানের অধিকারী। ইমাম বুখারী র. এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন-

الناموس صاحب السر الذى يطلعه بما يستره عن غيره

অর্থাৎ, সে গোপনতথ্যজ্ঞানী যিনি এরূপ কথা বলেন যেগুলো অন্যদের কাছ থেকে গোপন রাখেন। এই ওজনে আরেকটি শব্দ হল, জাসূস বা গোয়েন্দা। কিন্তু এ শব্দটির অর্থ যে ক্ষতিকর গোপন জিনিস সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। অভিধানবিদগণ উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য করেন না। হাফিজ আসকালানী র. তাই বলেন। কিন্ত আল্লামা আইনী র. বলেন, নামূস ও জাসূসের মধ্যে পার্থক্য আছে। -উমদাহ ঃ ১/৫২।

এখানে নামূস দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত জিবরাঈল আ. سمى جبرئيل الناموس لان الله خصه بالغيب والوحى 'জিবরাঈল আ.কে নামূস নামকরনের কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাকে অদৃশ্য ও ওহী সংক্রান্ত বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন।'

একটি প্রশ্ন

ওয়ারাকা খ্রীষ্ট ধর্মের উপর ছিলেন। অতএব, তাকে نزّل الله على عيسى বলা উচিত ছিল?

উত্তর ঃ ১. হযরত মূসা আ.-এর শরীয়ত ছিল স্বতন্ত্র। হযরত ঈসা আ. যদিও তাওরাতের কোন কোন বিধান রহিত করেছেন। কিন্তু বেশির ভাগ তাওরাতের আহকামের উপরই চলতেন। অতএব, ঈসা আ.-এর শরীয়ত ছিল পরিশিষ্ট রূপে, স্বতন্ত্র শরীয়ত ছিল না। এ জন্য রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তকে মূসা আ.-এর শরীয়তের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। কারণ, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত সবচেয়ে ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ। যেমন- সমস্ত পূর্ববর্তী গ্রন্থে তাওরাত সবচেয়ে ব্যাপক। তাওরাতে প্রচুর আহকাম ছিল, কিন্তু এর পরিপন্থী ইঞ্জিলে আহকাম ছিল কম । বেশির ভাগই হল, নসীহত-উপদেশ। অতএব, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওহীকে হযরত মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওহীর সাথে উপমা দান অধিক সংগত ছিল। কুরআন মজীদেও হযরত মূসা আ.-এর সাথে উপমা দেয়া হয়েছে।

اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلى فِرْعَوْنَ رَسُوْلاً

এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যেমন- মূসা আ.-এর নবুওয়ত যুগে ফিরআউনকে ডুবিয়ে মারা হয়েছে, এরূপভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের ফিরআউন, আবু জেহেলও ধ্বংস হবে।

২. কোন কোন রেওয়ায়াতে نزّل على عيسى এর উপর কোন প্রশ্ন নেই। অবশ্য উভয় রেওয়ায়াতে বিরোধের প্রশ্ন উত্থাপিত হবে। কাজেই বিরোধকালে বুখারী, মুসলিমের রেওয়ায়াতের প্রাধান্য হবে।

হাফিজ র. সামঞ্জস্য বিধানের এই পন্থা বর্ণনা করেছেন যে, প্রথমে হযরত খাদীজা রা. ওয়ারাকার নিকট একা গিয়েছিলেন এবং পরিস্থিতির বিবরণ দিয়েছিলেন। তখন ওয়ারাকা বলেছিলেন-

نزّل الله على عيسى -দালাইলুন নবুওয়্যাহ - আবু নুআইম।

কারণ, মূসা শব্দ অবলম্বনে যে সব ইঙ্গিত ছিল, হযরত খাদীজা রা. সে সব অনুধাবনে অক্ষম ছিলেন। পরবর্তীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাথে নিয়ে দ্বিতীয়বার গেলে তিনি বললেন- نزّل الله على موسى অতএব, শব্দের পরিবর্তন শ্রোতার অনুধাবনের উপর নির্ভরশীল ছিল।

৩. আরেকটি উত্তর হল, হযরত মূসা আ.-এর নবুওয়তে ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান সবাই একমত ছিল। কিন্তু এর পরিপন্থী হযরত ঈসা আ.-এর ব্যাপার। তাকে মানত শুধু খ্রীষ্টানরা।

ياليتنى فيها جذعا ياليتنى اكون حيا اذيخرجك قومك হায়! আমি যদি আপনার দাওয়াত যুগে শক্তিশালী যুবক থাকতাম! হায়! আমি যদি তখন পর্যন্ত জীবিত থাকতাম, যখন আপনার সম্প্রদায় আপনাকে বহিষ্কার করে দিবে!

جذعًا যবর বিশিষ্ট যাল সহকারে। অর্থাৎ, শক্তিশালী যুবক।

اومخرجيّ هم রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা (আমার সম্প্রদায়) কি আমাকে বহিষ্কার করে দিবে? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চরম বিস্ময়ের সূরে বললেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চল্লিশ বছরের জীবন নেহায়েত প্রিয়ভাজন রূপেই অতিক্রান্ত হয়েছে। গোটা জাতিতে তিনি সত্যবাদী, আল আমীন রূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কওমে তাঁর সৌন্দর্য ও মর্যাদার এ অবস্থা ছিল যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁকে সিদ্ধান্তদাতা মেনে নিত। অতঃপর যার নৈতিক চরিত্র এরূপ হয় যা হযরত খাদীজা রা.-এর বিবরণে পাওয়া গেল, এরূপ মনীষীকে তারা কি বহিষ্কার করে দিবে?

এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চরম বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা ও বিস্ময়ের উপর ওয়ারাকা উত্তর দিলেন- لم يات رجل قط الخ

'হ্যাঁ, যে কোন মনীষী এরূপ জিনিস (নবুওয়ত) নিয়ে আসেন লোকজন তাদের সাথে শত্রুতামূলক আচরণ করেছে। অতএব, আপনার সাথেও দুশমনির আচরণ করবে। হযরত ইবরাহীম আ.কে ইরাক ছেড়ে শামে চলে যেতে হয়েছে। হযরত মূসা আ. কে মিসর থেকে বেরিয়ে যেতে হয়েছে। অতএব, আপনার সাথেও এরূপ আচরণ হবে।

একটি প্রশ্নোত্তর

◆ او مخرجى তে একটি প্রশ্ন হয় যে, হামযায়ে ইসতিফহামের পর ওয়াও হরফে আত্ফ আছে। হামযায়ে ইসতিফহামের দাবি হল- বাক্যের শুরুতে আসা। আর ওয়াও -এর দাবি হল- তার পূর্বে মা'তূফ আলাইহ থাকা। স্পষ্ট বিষয়, বাক্যের আত্ফ হরফের উপর হতে পারে না। অতএব, এই প্রশ্নের উত্তর কি?

উত্তর ঃ ১. এখানে হামযা ও ওয়ায়ের মাঝে একটি বাক্য উহ্য আছে- অর্থাৎ, امعادى هم ومخرجى 'তারা কি আমার সাথে দুশমনি করবে এবং আমাকে বহিষ্কার করে দিবে?

২. কেউ কেউ উত্তর দিয়েছেন- আসলে ওয়াও ছিল আগে, আর হামযা পরে। বস্তুতঃ এই বাক্যটির আত্ফ এর পূর্ববর্তী বাক্যের উপর। কিন্তু যেহেতু হামযার দাবি হল, বাক্যের শুরুতে আসা, সেহেতু হামযাকে আগে নেয়া হয়েছে।

ان يدركنى দ্বারা জযম সহকারে। يومك পেশ সহকারে يدركنى এর ফায়েল। انصرك জযম সহকারে। এটি শর্তের জওয়াব। -কাসতাল্লানী ঃ ১/১১৩।

হযরত ওয়ারাকা পূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, যদি আমি আপনার সে যমানা পাই, তথা আপনার রিসালত পর্যন্ত জীবিত থাকি, তবে অবশ্যই আপনার জোরদার সাহায্য করব। **ثم لم ينشب ورقة ان توفى** অর্থাৎ, এর পর আর বেশি কাল অতিক্রান্ত হয়নি, ওয়ারাকার ইনতিকাল হয়ে যায়।

হযরত ওয়ারাকা ইবনে নওফিল

হযরত ওয়ারাকা সর্বসম্মতিক্রমে মুক্তিপ্রাপ্ত এবং মুমিন। কারণ, তিনি যখন খ্রীষ্টান ছিলেন, তখন মূল খ্রীষ্ট ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, বিকৃত ধর্মের উপর ছিলেন না। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. এর এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কার স্পষ্ট যে, হযরত ওয়ারাকা নবুওয়তের প্রথম কাল পেয়েছিলেন। তিনি পূর্ণ ইয়াকীনের সাথে নবুওয়তের স্বীকারোক্তি করেছেন এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আপনার নবুওয়ত প্রসারিত হওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকলে আমি আপনার জোরদার সাহায্য করব। এ সব কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ওয়ারাকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছিলেন, নিঃসন্দেহে তিনি মুসলমান ছিলেন। কিন্তু لم ينشب ورقة দ্বারা বুঝা যায় হযরত ওয়ারাকা দাওয়াতের যুগ পাননি। দাওয়াতের জমানা ওহী বন্ধ হওয়ার পর يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَانْذِرْ .... وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ দ্বারা শুরু হয়।

হযরত ওয়ারাকা নবুওয়তের পর রিসালতের পূর্বে ঈমান এনেছেন। হযরত ওয়ারাকার ঈমান ছিল ওহী বন্ধ হওয়ার সময়ে। তখন দাওয়াত ছিল না। এজন্য হযরত ওয়ারাকা মুসলমান তো অবশ্যই, কিন্তু তাকে সাহাবী বলা মুশকিল। যদিও কোন কোন আলিম তাঁকে সাহাবী বলেছেন।

ইমাম আজম আবু হানীফা র.কে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, সর্বপ্রথম কে ইসলাম গ্রহণ করেছেন? তখন তিনি বললেন, স্বাধীন পুরুষদের মধ্য থেকে হযরত আবু বকর রা. সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন, নারীদের মধ্যে হযরত খাজীদা রা., গোলামদের মধ্যে হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা, বালকদের মধ্যে হযরত আলী রা. (প্রথমে) ইসলাম গ্রহণ করেছেন। -জামি'উদ দিরারী- আলবিদায়া ওয়াননিহায়া।

وفتر الوحى তখন ওহীও বন্ধ হয়ে যায়। فترا এর আভিধানিক অর্থ হল, দ্রুত গতির পর বন্ধ হয়ে যাওয়া, দুর্বল হয়ে পড়া এবং কোন কাজ স্থগিত হওয়া। এখানে মওকূফ হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত। কুরআন মজীদ সূরা মায়িদা ঃ আয়াত নং-১৯ এও আছে- على فترة الرسل শব্দ। হযরত ঈসা আ.-এর পর হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানা পর্যন্ত প্রায় ৫৭৯ বছর কাল নবী শূন্য থাকে। আম্বিয়ায়ে কিরামের আগমনের ধারা বন্ধ থাকে। উপরোক্ত আয়াতে নবীগণের ধারা বন্ধ হয়ে যাওয়াই উদ্দেশ্য। সাধারণভাবে زمانه فترة বলা হলে এর দ্বারা সেকালই উদ্দেশ্য হয় (অর্থাৎ, মধ্যবর্তী বিরতিকাল)। এ হাদীসে ওহীর ধারা বন্ধ হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য।

এই ওহী বন্ধ হওয়ার মেয়াদ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ ছয় মাস, কেউ আড়াই বছর বলেছেন। ইমাম আহমদ র. তিন বছরের উক্তি করেছেন। এটাই বিশুদ্ধতম।

قال ابن شهاب এটা তা'লীক নয় যেমন- আল্লামা কিরমানী র. এর ভুল হয়ে গেছে। মূলতঃ এটি তাহ্‌বীল। এর দুটি ছূরত হয়ে থাকে- ১. প্রথমাংশে অর্থাৎ, নিচের সনদগুলো বিভিন্ন রকম হবে। আর উপরের সনদগুলো এক রকম হবে। সাধারণতঃ তাহবীলের এ ছূরতই হয়। ২. সনদের শুরু এক রকম হবে, কিন্তু শেষ দিক বিভিন্ন রকম হবে। এখানে এ ছূরতই হয়েছে। ইমাম বুখারী র. থেকে নিয়ে ইবনে শিহাব পর্যন্ত সনদ একই। ইবনে শিহাবের পর সনদ বিভিন্ন রকম। পূর্বোক্ত বিষয়ের সনদে ইবনে শিহাবের উস্তাদ হলেন উরওয়া। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন। অতএব, সে হাদীসটি মুসনাদে আয়েশার অন্তর্ভূক্ত হল। এখানে ইবনে শিহাবের উস্তাদ আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান। তিনি হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণনা করেন। অতএব, এ হাদীসটি মুসনাদে জাবির রা.-এর অন্তর্ভূক্ত। যেমন- ইমাম বুখারী র. কিতাবুত তাফসীরে (২/৭৩৯) উল্লেখ করেছেন।

আবু সালামা ঃ সীন এবং লাম-এর উপর যবর। আর নাম হল আবদুল্লাহ। ওফাত হয়েছে মদীনা মুনাওয়ারায় ৯৪ হিজরীতে। -কাসতাল্লানী।

মোটকথা, হযরত আবু সালামা আশারায়ে মুবাশশারার একজন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.-এর ছেলে। তিনি ছিলেন সুমহান তাবিঈ মুহাদ্দিস। বাহাত্তর বছর বয়সে ৯৪ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় ওফাত লাভ করেন।

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. ঃ নাম জাবির। উপনাম আবু আবদুল্লাহ অথবা আবু আবদুর রহমান। তিনিও সাহাবী। তাঁর পিতা হযরত আবদুল্লাহ আনসারী খাযরাজীও সাহাবী। তিনি তৃতীয় হিজরীতে উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন।

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. ছয় জন অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবায়ে কিরামের একজন। হযরত জাবির রা. থেকে ১৫৪০ টি হাদীস বর্ণিত আছে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে তাঁর থেকে ২১০টি হাদীস বর্ণিত আছে। ৫৮ টি হাদীস বর্ণনায় ইমাম বুখারী ও মুসলিম একমত। বুখারীতে তাঁর এরূপ ২৬টি রেওয়ায়াত রয়েছে যেগুলো মুসলিম শরীফে নেই। মুসলিম শরীফে তাঁর এরূপ ১২৬টি রেওয়ায়াত আছে যেগুলো বুখারী শরীফে নেই। তিনি চোখের দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তাঁর ওফাত হয়- ৭৮ বা ৭৩ বা ৭৪ বা ৭৯ হিজরীতে। তখন তাঁর বয়স ছিল ৯৪ বছর। মদীনা তায়্যিবায় সর্বশেষ সাহাবী তিনি ওফাত লাভ করেছেন।

وهو يحدث প্রধান উক্তি এটাই যে, هو যমীর ফিরেছে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে।

ইমাম বুখারী র.-এর নিয়ম হল বিভিন্ন স্থানে মুতাবাআত পেশ করেন। বিশেষতঃ যেখানে কোন দোদুল্যমানতা ও সন্দেহ সৃষ্টি হয়। যেমন- এই রেওয়ায়াতে لقد خشيت على نفسى শব্দ রয়েছে। যার অর্থ না বুঝার কারণে কোন কোন লোক হাদীসটিকেই অস্বীকার করেছে। ইমাম বুখারী র. মুতাবাআত পেশ করে হাদীসটির সমর্থন করেছেন।

মুতাবাআত দুই প্রকার-

১. পূর্ণাঙ্গ মুতাবাআত ২. অসম্পূর্ণ মুতাবাআত।

পূর্ণাঙ্গ মুতাবাআত হল যা সনদের শুরু থেকেই হয়। অর্থাৎ, প্রথম রাবী যেই উস্তাদ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, দ্বিতীয় রাবীও সেই শায়েখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন- এখানে تابعه -এর এক মাফঊলের যমীর ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইরের দিকে ফিরেছে। যিনি ইমাম বুখারী র.-এর উস্তাদ। পক্ষান্তরে تابع এর ফায়েল হল আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ ও আবু সালিহ। যেহেতু উভয়ে ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইরের পূর্ণ সনদে মুতাবাআত করেছেন, সেহেতু এটিকে বলা হবে মুতাবাআতে তাম্মাহ বা পূর্ণাঙ্গ মুতাবাআত।

تابعه هلال بن ردّاد عن الزهرى এখানে عن الزهرى যুহরী উল্লেখ করার ফলে জানা গেল যে, এখানে মুতাবাআত হচ্ছে যুহরীর শিষ্য উকাইলের। অতএব, تابعه তে যমীর ফিরেছে উকাইলের দিকে। কাজেই অর্থ হবে, যেরূপভাবে উকাইল যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, এরূপভাবে হিলাল ইবনে রাদ্দাদও যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। যেহেতু এই মুতাবাআত সনদের শুরু থেকে নয়। বরং উপর শ্রেণীতে তথা সনদের কোন অংশে সেহেতু এই মুতাবাআত হল অসম্পূর্ণ।

قال يونس ومعمر بوادره তারা দু জনও হিলাল ইবনে রাদ্দাদের ন্যায় উকাইলের মুতাবি'। যুহরী থেকে তাঁরা বর্ণনা করেন। অবশ্য শব্দগত কিছু পার্থক্য হওয়ার কারণে এ দুটিকে আলাদা উল্লেখ করেছেন। আলাদা উল্লেখ করা দ্বারা উদ্দেশ্য একথা বলা যে, মুতাবাআতে সেসব শব্দ এক হওয়া জরুরী নয়। বরং বিষয় এক হওয়াই যথেষ্ঠ। যেমন- এখানে ইমাম যুহরী -এর এক শিষ্য উকাইল يرجف فواده বলেছেন। ইউনুস এবং মা'মার বলেছেন- بوادره

بوادر - بادرة এর বহুবচন। স্কন্ধ ও গর্দানের মধ্যবর্তী অংশকে বলে। ভয়ের সময় যেরূপভাবে অন্তর কাঁপে, এরূপভাবে এ অংশও কাঁপতে শুরু করে।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল

শিরোনামের দুটি রুখ ছিল- একটি জাহিরী আরেকটি প্রকৃত। জাহিরী রুখ ছিল ওহীর সূচনা কিভাবে হয়েছে? এ রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা গেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুরুর দিকে ভাল স্বপ্ন দেখানো হত। অতঃপর তার নিকট নির্জনতা প্রিয় করে দেয়া হয়েছে। তিনি হেরা গুহায় নির্জনতা অবলম্বন করতে শুরু করেন। এসব পর্যায় ছিল ওহীর শুরু। হযরত আয়েশা রা.-এর এ হাদীসে বিস্তারিতভাবে ওহীর সূচনার হাল অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল প্রকৃত। অর্থাৎ, ওহীর মাহাত্ম্য ও ইসমত প্রমাণ করা। হযরত আয়েশা রা.-এর এ হাদীস দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ওহী এতটা সুমহান বিষয়, যা ধারণ করা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কষ্টকর হয়েছিল। তাছাড়া যদি ওহী সুমহান বিষয় না হত, তাহলে তা মওকূফ হলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এতটা অস্থিরতা হত না। কালামে বারীর আজমত ও মজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য পূর্ণ আগ্রহের কারণ ছিল। একটি নেয়ামত যখন অর্জিত হয়, তখন তার স্থায়িত্বের দাবিও একটি স্বভাবজাত বিষয় হয়।

٤. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رض فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِجُ مِنْ التَّنْزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رض فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُهُمَا وَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ قَالَ جَمْعُهُ لَكَ فِي صَدْرِكَ وَتَقْرَأَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَرَأَهُ.

৪. মূসা ইবনে ইসমাঈল র. ....হযরত ইবনে ‘আব্বাস র. থেকে বর্ণিত, মহান আল্লাহর বাণী-

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ.

তথা ‘দ্রুত ওহী আয়ত্ত করার জন্য আপনার জবান তার সাথে নাড়বেন না’ (৭৫ ঃ ১৬)-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী অবতরণের সময় তা আয়ত্ত করতে বেশ কষ্ট স্বীকার করতেন এবং প্রায়ই তিনি তাঁর উভয় ঠোঁট নাড়তেন।’ ইবনে ‘আব্বাস রা. বলেন, ‘আমি তোমাকে দেখানোর জন্য ঠোঁট দুটি নাড়ছি যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নাড়তেন।’ সা‘ঈদ র. (তাঁর শাগরিদদের) বলেন, ‘আমি ইবনে ‘আব্বাস রা.-কে যেভাবে তাঁর ঠোঁট দুটি নাড়তে দেখেছি, সেভাবেই আমার ঠোঁট দুটি নাড়াচ্ছি।’ এই বলে তিনি তাঁর ঠোঁট দুটি নাড়লেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করলেন ঃ

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ.

‘তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার নিমিত্তে আপনি আপনার জবান তার সাথে নাড়বেন না। এর সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই।’ (৭৫ ঃ ১৬-১৮) ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ‘এর অর্থ হল ঃ আপনার অন্তরে তা সংরক্ষণ করা এবং আপনার দ্বারা তা পাঠ করানো।

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ.

‘সুতরাং যখন আমি তা তিলাওয়াত করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন (৭৫ ঃ ১৯)।’ ইবনে আব্বাস রা. বলেন- অর্থাৎ, মনোযোগ সহকারে শুনুন এবং চুপ থাকুন।

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ.

‘এরপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই (৭৫ঃ ১৯)।’ অর্থাৎ, আপনি তা পাঠ করবেন, এটাও আমার দায়িত্ব। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিবরাঈল আ. আসতেন,

তখন তিনি মনোযোগ সহকারে কেবল শুনতেন। জিবরাঈল আ. চলে গেলে তিনি যেমন পড়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও ঠিক তেমনি পড়তেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি

এ হাদীসটি কয়েক জায়গায় এসেছে- ১. কিতাবুল ওহী ঃ ১/৩, ২. তাফসীর ঃ ২/৭৩৪, ৩. ফাযায়েলুল কুরআন ঃ ২/৭৫৪, ৪. তাওহীদ।

রাবী পরিচিতি

এ হাদীসের পাঁচজন রাবী রয়েছেন-

১. মূসা ইবনে ইসমাঈল

قال الحافظ هو ابوسلمة التبوذكى وكان من حفاظ المصريين- وقال العلامة العينى.

তিনি হলেন আবু সালামা মূসা ইবনে ইসমাঈল। তিনি মহা সম্মানিত জবরদস্ত মুহাদ্দিস। ইমাম বুখারী, আবু দাঊদ র. প্রমূখের উস্তাদ। রজব ২২৩হিজরীতে বসরায় তাঁর ইনতিকাল হয়।

২. আবু আওয়ানা

আইন ও নূন-এর উপর যবর। তাঁর নাম হল ওয়ায্‌যাহ ইবনে আব্দুল্লাহ আলইয়াশকুরী (কাফ-এর উপর পেশ)। -উমদাহ ঃ ১/৭০।

মোটকথা, আবু আওয়ানা হল উপনাম। তিনি উপনামেই প্রসিদ্ধ । ওয়ায্‌যাহ ইবনে আবদুল্লাহ নাম। জুরজানের যুদ্ধে গ্রেফতার হয়ে আসেন। দীর্ঘ কাল পর্যন্ত ইয়াযীদ ইবনে আতা ওয়াসিতীর গোলাম ছিলেন। তিনি তাকে দিয়ে ব্যবসা করাতেন। অবশেষে আযাদ করে দেন। তাঁর একটি বড় সৌন্দর্য হল, গোলামীর অবস্থাতেও ইলমে দীনের এত পূর্ণাঙ্গ আগ্রহ ছিল যে, বহু জটিলতা সত্ত্বেও তিনি ইলমী চেষ্টা-প্রচেষ্টায় রত থাকেন। হযরত হাসান বসরী র. ইবনে সীরীন র. -এর দর্শন লাভ করেছেন। ১৭৬ হিজরীতে মতান্তরে ১৭৫ হিজরীতে তিনি ওফাত লাভ করেন। -উমদাহ ঃ ১/৭০।

৩. মূসা ইবনে আবু আয়েশা। নাম মূসা। উপনাম আবু হাসান। আবু আয়েশার নাম জানা যায়নি।

৪. সাঈদ ইবনে জুবাইর

(بضم الجيم وفتح الباء) امام مجمع عليه بالجلالة والعلو فى العلم والعظم فى العبادة قتله الحجاج صبرا فى شعبان سنة خمس وتسعين و لم يعش الحجاج بعده الا ايامًا و لم يقتل احدا بعده الخ . عمدة ١/٧٠.

সারকথা, হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর প্রসিদ্ধ তাবিঈ। শীর্ষস্থানীয় একজন আলিম। তাঁর উপনাম আবু মুহাম্মদ। উপাধি جهبذ العلماء। যার অর্থ পরখকারী-জ্ঞানী। তিনি শীর্ষ মুফাসসির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর মহান শিষ্য তিনি মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকীহ, আবিদ, যাহিদ, তাহাজ্জুদগুজার ছিলেন। ৪৯ বছর বয়সে, শা'বান ৯৫হিজরীতে হাজ্জাজের নির্দেশে তাঁকে শহীদ করে দেয়া হয়। ইবনে জুবাইর র.-এর শাহাদতের পর হাজ্জাজের পেটে ফোড়া হয় এবং ভীষণ কষ্ট ভোগে কয়েক মাসেই মারা যায়।

৫. ইবনে আব্বাস রা.

তাঁর জীবনী সম্পর্কে দ্রষ্টব্যঃ নাসরুল বারী শরহে বুখারী কিতাবুত তাফসীর ঃ ২/১১৪। এই রেওয়ায়াতে عن ابن عباس আছে। যদিও হযরত আব্বাস রা.-এর একাধিক সাহেবযাদা ছিলেন, কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.। কারণ, মূলনীতি হল, المطلق اذا يطلق يراد به الفرد الكامل কোন শব্দ নিঃশর্ত বলা হলে এবং কোন বিশেষ অর্থের কোন নিদর্শন না থাকলে পূর্ণাঙ্গ শাখাটি উদ্দেশ্য হয়। হযরত

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. তাঁর ভাইদের মধ্যে ছিলেন সবচেয়ে উঁচু পর্যায়ের ও প্রসিদ্ধতম। এ জন্য যখনই হাদীসে ইবনে আব্বাস আসবে, সেখানে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর হলে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও ইবনে যুবাইর হলে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, ইবনে মাসঊদ হলে আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. উদ্দেশ্য হন। কারণ, এসব আবদুল্লাহ তাদের ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ, উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যা ঃ শুরুতে যখন হযরত জিবরাঈল আ. ওহীয়ে ইলাহী তথা কুরআন মজীদ নিয়ে আসতেন, তখন হযরত জিবরাঈল পড়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখস্থের প্রতি লক্ষ্য করে দ্রুত পুনরাবৃত্তির চেষ্টা করতেন। যাতে ভুলে না যান। কিন্তু এ পদ্ধতিতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভীষণ কষ্ট হত। একতো স্বয়ং ওহীয়ে ইলাহী কষ্টকর। দ্বিতীয়তঃ ইয়াদ করা ও জবান মুবারক নাড়াচাড়ার কষ্ট। তৃতীয়তঃ অর্থের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করার কষ্ট। এসব কষ্ট হত। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন-

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ الخ

অর্থাৎ, আপনি এ সময় পাঠ ও জবান নাড়াচাড়া করার চেষ্টা করবেন না। বরং আপনি গভীর মনোযোগ সহকারে শুনুন, এ কুরআন আমার কালাম। আমি যে উদ্দেশ্যে এ কুরআন অবতীর্ণ করছি, তা সম্পূর্ণ করা আমার দায়িত্ব। এ জন্য অবতীর্ণ ওহীকে প্রশান্তভাবে শুনুন। তা মুখস্থ করার জন্য আপনি চিন্তা করবেন না।

يعالج من التنزيل شدة . شدة শব্দটি يعالج এর মাফঊল। যার অর্থ হল কোন জিনিস অর্জনের জন্য কষ্ট সহ্য করা। এমতাবস্থায় شدة শব্দটি তাকীদের জন্য হবে। অর্থাৎ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী অবতরণের ভীষণ কষ্ট সহ্য করতেন। وكان مما يحرك شفتيهما অর্থাৎ, ربما মানে তিনি বেশির ভাগ ঠোট মুবারক নাড়াচাড়া করতেন।

একটি প্রশ্ন

এখানে একটি প্রশ্ন হয়, সমস্ত হরফ তো ঠোটে উচ্চারিত হয় না। বরং বেশির ভাগ হরফ উচ্চারণের সময় ওষ্ঠদয় নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া অভিজ্ঞতা হল, পাঠকালে জবান এবং ঠোঁটদ্বয় গতিশীল হয়, তাহলে রেওয়ায়াতে শুধু ওষ্ঠদয় নাড়াচাড়া দানের উল্লেখ কেন করা হল? এবং আয়াতে কারীমায় শুধু জবানের কথা কেন উল্লেখ করা হল?

উত্তর ঃ ১. ওষ্ঠদয়ের কথা على سبيل الاكتفاء হয়েছে। এতে একাধিক বিষয়ের মধ্য থেকে কোন একটি উল্লেখ করে অপরটি উহ্য করে দেয়া হয়। যেমন-

سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ. سورة النمل.

এর অর্থ এই নয় যে, এসব পায়জামা-পোশাক শুধু গরম থেকে রক্ষা করে, ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করে না। বরং উদ্দেশ্যে ঠাণ্ডাও অন্তর্ভূক্ত। এরূপভাবে ইরশাদ রয়েছে- رَبُّ الْمَشَارِق অথচ আল্লাহ তা'আলা পূর্বের ন্যায় পশ্চিমেরও রব। ঠিক তদ্রূপ এখানেও ওষ্ঠদয় উল্লেখ করে ক্ষান্ত করা হয়েছে। জিহ্বার কথা উহ্য করে দেয়া হয়েছে। -উমদাহ।

২. এখানে বাদউল ওহীতে সংক্ষেপ করা হয়েছে। এ রেওয়ায়াতটি বুখারী কিতাবুত তাফসীরে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং বাদউল ওহীতেও আছে এবং এর শব্দরাজিতেও বিভিন্নতা রয়েছে। এসব রেওয়ায়াত ইবনে আবু আয়েশা -সাঈদ ইবনে জুবাইর- ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু নিচের রাবী বিভিন্ন ধরণের। আবু আওয়ানা (যেমন বাদউল ওহীতে, হাদীস নং ৪) এবং ইসরাঈল (যেমন

তাফসীরে, হাদীস নং ৪৫১) শুধু ওষ্ঠদয় উল্লেখ করে ক্ষান্ত করা হয়েছে। সুফিয়ানের রেওয়ায়াতে (যেমন তাফসীরে, হাদীস নং ৪৫০) শুধু জিহবার উল্লেখ রয়েছে। জারীরের রেওয়ায়াতে (তাফসীরে, হাদীস নং ৪৫২) وكان مما يحرّك به لسانه وشفتيه উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, জবান এবং ওষ্ঠদয় উভয়ের উল্লেখ রয়েছে।

স্পষ্ট বিষয়, যেহেতু এসব রেওয়ায়াত হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকেই বর্ণিত এবং সমস্ত রেওয়ায়াতে সাহাবীর শিষ্য এবং শিষ্যের শিষ্যও একই, সেহেতু প্রমাণিত হয় যে, মূল রেওয়ায়াতে জিহ্বা ও ওষ্ঠদয় দুটোরই উল্লেখ রয়েছে। যে রেওয়ায়াতে একটির উল্লেখ রয়েছে, সেটি সংক্ষিপ্ত। মূল উত্তর এটিই এবং এই উত্তরটি যথেষ্ট প্রশান্তিদায়ক। অতএব, এবার রেওয়ায়াতে কোন প্রশ্ন নেই। এটি মূলতঃ এক নং উত্তরই। পার্থক্য হল শুধু দ্বিতীয় উত্তরটি বিস্তারিত ও প্রমাণ নির্ভর।

او المراد يحرك فمه المشتمل على الشفتين واللسان -ফাতহুল বারী ঃ ৮/৫২৩।

অর্থাৎ, সমস্ত রেওয়ায়াতের সমষ্টি দ্বারা উদ্দেশ্য হল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মুখ মুবারক নাড়াচাড়া করতেন। এ মুখেই রয়েছে জিহ্বা ও ওষ্ঠদয়।

প্রশ্ন ঃ এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, ওষ্ঠদয় নাড়াচাড়া দেয়ার ঘটনা সম্পূর্ণ ওহীর প্রাথমিক দিকের এবং ইবনে আব্বাস রা. হিজরতের শুধু তিন বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছেন। কাজেই তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লামের ওষ্ঠদয় নাড়াচাড়া কিভাবে দেখলেন?

উত্তর ঃ ১. হয়ত অন্য কোন সাহাবী থেকে দেখেছেন। সে সাহাবীর সূত্র তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। তাহলে এ রেওয়ায়াতটি হবে মুরসাল। বস্তুতঃ সাহাবায়ে কিরামের মুরসাল সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণ। কারণ, সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম দীনের অনুসারী আদিল।

২. আল্লামা কাসতাল্লানী র. বলেন, মুসনাদে আবু দাঊদ তায়ালিসীতে হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর রেওয়ায়াতও স্পষ্ট। এর শব্দগুলো নিম্নরূপ-

قال ابن عباس فانا احرك لك شفتيّ كما رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم يحركهما. قسطلانى ١/١١٧.

এ রেওয়ায়াতটির দিকে হাফিজ আসকালানী র.ও ইঙ্গিত করেছেন। -ফাতহুল বারী ঃ ১/২৫।

এই রেওয়ায়াত দ্বারা স্পষ্টাকারে জানা গেল যে, হযরত ইবনে আব্বাস রা. কোন সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সূরা কিয়ামার এসব আয়াতের তাফসীর শুনেছেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওষ্ঠদয় নাড়াচাড়া করে বাতলিয়েছেন। ইবনে আব্বাস রা. সাঈদ ইবনে জুবাইর র.-এর নিকট এ হাদীস বর্ণনা করার সময় নিজের ওষ্ঠদয় নাড়াচাড়া দিয়েছেন। অনুরূপভাবে সাঈদ ইবনে জুবাইর যখন এ রেওয়ায়াতটি মূসা ইবনে আবু আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন, তখন হযরত সাঈদ নিজের ওষ্ঠদয় নাড়াচাড়া দিয়েছেন। একারণে এ হাদীসটির নাম مسلسل بتحريك الشفتين পড়ে যায়।

এর দ্বারা এটাও জানা যায় যে, শিক্ষকের জন্য উচিত হল, প্রয়োজনের মুহূর্তে বচনের সাথে সাথে ছাত্রের সামনে বিষয়ের ধরন নিজের মত করে বর্ণনা করে দেয়া, যাতে অন্তরে গেথে যায়। -নববী।

অতএব, এমতাবস্থায় হাদীস মারফূ' প্রমাণিত হল। এবার এই রেওয়ায়াতটি আর মুরসাল হবে না।

فانزل الله تعالى لَاتُحَرِّكْ بَه لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ به

এই আয়াতের সম্পর্ক مم يحرّك شفتيه এর সাথে। বস্তুতঃ فقال ابن عباس থেকে فحرك شفتيه পর্যন্ত جمله معترضه । এই আয়াতে به এর যমীর কুরআনের দিকে ফিরেছে। যদিও এর পূর্বে কুরআন শব্দের উল্লেখ

নেই। কিন্তু আয়াতের পূর্বাংশ এটি বুঝায়। এ জন্য اضمار قبل الذكر এর প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না। যেমন- اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ আয়াতে আছে।

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَه وَقُرْاٰنَه এটি মাসদার। মাফঊলের দিকে মুযাফ। ফায়েল উহ্য। আসলে ছিল- وقرائتك اياه
-কাসতাল্লানী।

অতএব, এই আয়াতে কুরআন মাসদার। (অর্থাৎ, কিতাবুল্লাহর নাম নয়) আর যদি মাফঊলের দিকে মুযাফ হয় এবং ফায়েল উহ্য হয়, তাহলে মূল ইবারত হবে قراءتك اياه।

قال جمعه لك صدرك এটা হল, হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর তাফসীর। এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। অধিকাংশ রেওয়ায়াতে মীম এবং আইন-এর মধ্যে যবর। অর্থাৎ, এটি بصيغه ماضى। আর صدرك শব্দে রা এ ফায়েল হওয়ার কারণে পেশ। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, আপনার সিনা কর্তৃক আপনার জন্য কুরআন জমা করা।

মূলতঃ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক সীনায় কুরআন জমাকারী হলেন আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু বক্ষের দিকে জমা বা একত্রিত করার সম্পর্ক রূপক। যেমন- কোন মুসলমান কর্তৃক انبت الربيع البقل বলা হয় রূপকার্থে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, বসন্তকালে আল্লাহ তা'আলা তরকারী উৎপন্ন করেছেন। লাম অব্যয়টি কারণ বুঝানোর জন্য অথবা বিশদ বিবরণ দানের জন্য ব্যবহৃত।

দ্বিতীয় কপি হল, جمعه لك صدرك মীম সাকিন, আইনের উপর পেশ। এ শব্দটি মাসদার। صدرك এর রা আগের মতই ফায়েলরূপে পেশযুক্ত।

তৃতীয় কপি হল, জীম-এর উপর যবর, মীম সাকিন, لفظ في অতিরিক্ত। অর্থাৎ, في صدرك। আল্লামা কাসতাল্লানী র. বলেন- وهو يوضح الاول -ইরশাদুস সারী ঃ ১/১১৮।

وتقرءه হযরত ইবনে আব্বাস রা. قرانه এর তাফসীর تقرءه দ্বারা করেছেন। অর্থাৎ, আপনাকে পড়িয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব।

فَاِذَا قَرَأْنَاهُ অর্থাৎ, যখন আমি পড়তে আরম্ভ করি। এই বাক্যে আল্লাহ তা'আলা পড়ার সম্বন্ধ নিজের দিকে করেছেন। কারণ, মূল ওহী প্রেরক তো আল্লাহ তা'আলাই। হযরত জিবরাঈল আ. আল্লাহর তা'আলার পক্ষ থেকে মুবাল্লিগ।

فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَه কুরআন মানে কিরাআত। অর্থাৎ, আপনি এই কিরাআতের অনুসরণ করুন।

অনুসরণ দুই প্রকার- ১. অনুসৃত ব্যক্তি যা করেন, অনুসারীও তাই করবে। অনুসরনের দ্বিতীয় পদ্ধতি হল, নীরবে শুনা। এখানে প্রথমার্থ উদ্দেশ্য হতে পারে না। অর্থাৎ, যখন আমি পড়ব, তখন আপনিও পড়ুন- এটা উদ্দেশ্য হতে পারে না। কারণ, এটাকে তো বলে প্রতিউত্তর। অতএব, অনুসরণের দ্বিতীয় পন্থা সুনির্দিষ্ট হয়ে যাবে। এজন্য হযরত ইবনে আব্বাস রা. তার তাফসীরে বলেন- فاستمع له وانصت অর্থাৎ, নীরবে শুনতে থাকুন। এটি ইমামের পিছনে ফাতিহা পাঠ করা নাজায়েয হওয়ার অকাট্য প্রমাণ।

এক হাদীসে আছে- انّما جعل الامام ليؤتم به হাফিজ র. এর তাফসীরে বলেন- ليتبع আর কুরআনের অনুসরণের অর্থ নীরবে শ্রবণ করা। فاتبع قرآنه এবং ইবনে আব্বাস রা.-এর তাফসীর فاستمع له وانصت দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে। অতএব, যদি এই হাদীস انما جعل الامام ليؤتم به এর শেষে واذا قر فانصتوا অতিরিক্ত মেনে না নেয়া হয়, তবু এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমামের পিছনে ফাতিহা পড়া জায়েয নেই।

১৩

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَه হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর তাফসীরে বলেন- ثم ان علينا ان تقرءه অথচ হুবহু এই তাফসীরই উপরে قرانه এর এসেছে।

একটি প্রশ্ন ঃ

এখানে একটি প্রশ্ন হয় قرآنه এবং بيانه -এর তাফসীর একই, তাহলে ثمّ শব্দটি আনা হল কেন? পূনরাবৃত্তি দ্বারা কি ফায়দা?

উত্তর ঃ ১. কেউ কেউ বলেছেন, কোন বর্ণনাকারী থেকে ভুল হয়ে গেছে। তিনি قرانه এর তাফসীর بيانه এর তাফসীরের স্থলে রেখে দিয়েছেন। কারণ, ان تقرء ه শব্দ قرانه এর তাফসীর بيانه এর নয়। এর প্রমাণ হল, এই রেওয়ায়াতটি বুখারী শরীফে কিতাবুত তাফসীরে (৭৩৪ পৃষ্ঠা) সনদ ও মূলপাঠ সহ উল্লেখিত হয়েছে। তাতে بيانه এর তাফসীর ان تبينه ।

২. প্রথমে تقرء ه অর্থাৎ قرانه এর অধীনে উল্লেখিত ان تقرء هশব্দে নিজের পাঠ উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়টি দ্বারা অর্থাৎ, بيانه এর অধীনে ان تقرء ه দ্বারা উদ্দেশ্য লোকজনের সামনে পাঠ করা।

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা তিনটি বিষয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন-

১. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্ষে তা জমা করা ২. মৌখিক পড়ানো ৩. লোকজনের সামনে এর বিবরণ দান।

لا تحرّك به لسانك এর সাথে পূর্বাপরের যোগসূত্র

এটি সূরা কিয়ামার আয়াত। এই সূরাটিকে এই নামে নামকরণের কারণ হল, এর সূচনাই করা হয়েছে, لا اقسم بيوم القيامة দ্বারা। এই আয়াতের পূর্বাপরে কিয়ামত সংক্রান্ত আলোচনা আছে। কিন্তু বাহ্যত পূর্বাপরের সাথে এই আয়াতের যোগসূত্র বুঝা যায় না। যোগসূত্রের দিক দিয়ে এটি সবচেয়ে জটিলতম স্থানে গণ্য হয়। কারণ, হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত সহীহ রেওয়ায়াত দ্বারা যে শানে নুযূল বুঝা যায়, সে হিসেবে পূর্বাপরের সাথে বাহ্যত কোন যোগসূত্র অনুধাবন করা যায় না। একারণেই শিয়ারা এটাকে কুরআন বিকৃতির প্রমাণ রূপে পেশ করে।

বাস্তবতা হল, যদি আল্লাহর কালামের আয়াতগুলোর যোগসূত্র মানুষের বুঝে না আসে, তাহলেও এটা কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। কারণ, যেরূপভাবে কুরআনে হাকীম আল্লাহ তা'আলার বাচনিক সহীফা, অনুরূপভাবে গোটা বিশ্ব হল কর্মতঃ সহীফা। যেমন- শায়েখ ফরীদুদ্দীন আত্তার র. বলেছেন-

آن خداوندي كرسهتي ذات اوست ÷ هر دو عالم مصحف آيات اوست.

কার্যতঃ সহীফার ক্রমবিন্যাস মানুষের অনুধাবনের উর্ধ্বে। যেমন- রাফ'আত আজমতের আগে কেন সৃষ্টি হল? শরফুদ্দীন আবু মুহাম্মদের পূর্বে কেন মরল? ইত্যাদি। অতএব, বাচনিক সহীফার বিন্যাস ও যোগসূত্র যদি বুঝে না আসে, তবে সেটা অযৌক্তিক কেন? তাছাড়া এ স্থানে মুফাসসিরীনে কিরাম যোগসূত্রে অনেক কারণ বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল-

১. ইমাম রাযী র. বলেন- এখানে যোগসূত্রের কোন প্রয়োজনই নেই। এটা ঠিক এমন, যেমন কোন উস্তাদ কোন ছাত্রকে বুঝানোর সময় কোন ছাত্রকে কোন কাজে রত দেখলে অথবা কোন বক্তা বক্তৃতার মাঝখানে কারো কোন অসংগত কাজ দেখলে নিজের আলোচ্য বিষয় মাঝখানে বন্ধ করে তাকে সতর্ক করেন। এরপর নিজের বিষয় আরম্ভ করেন। এ সতর্কবাণীর যোগসূত্র মূল বক্তৃতার পূর্বাপরের সাথে থাকা জরুরী নয়। এই দৃশ্য শিক্ষক ও ছাত্রদের সামনে সর্বদাই এসে থাকে। সম্পূর্ণ এরূপ এখানে। ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওষ্ঠদ্বয় নাড়তে দেখা গেছে, তাঁর কষ্ট হচ্ছে। মুখস্থ করার

কষ্টের সাথে সাথে বিষয় বুঝার চিন্তাও রয়েছে। এজন্য জুমলায়ে মু'তারিযা রূপে স্নেহ-মমতার সাথে ইরশাদে রব্বানী হচ্ছে- হে প্রিয়ভাজন! আপনি এরূপ করবেন না। মুখস্থ করানো এবং বিষয় বুঝা ও বুঝানোর যিম্মাদারী আমার উপর। আপনার কাজ হচ্ছে শুধু নীরবে শুনা। অতএব, ওষ্ঠদ্বয় নাড়াচাড়া করতে নিষেধ করা হয়েছে, চাই মুখস্থ করার উদ্দেশ্যে হোক, অথবা কালামের স্বাদ আস্বাদনের জন্য। এর পর পূর্বোক্ত বিষয়ই আরম্ভ করা হয়েছে।

২. হাফিজ ইবনে কাসীর র. বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট বান্দাদের জন্য দুটি কিতাব নির্ধারিত রয়েছে- একটি হল, বিধিবিধান সম্বলিত কিতাব, যাতে বান্দার উপর দায়িত্ব অর্পিত আইন-কানুন ও বিধিবিধান বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ, কুরআন মজীদ। দ্বিতীয়টি হল, আমল সংক্রান্ত কিতাব, যাতে মানুষের কৃত ভাল-মন্দ সব আমল লিপিবদ্ধ করা হয়, যার উপর হিসাব নির্ভরশীল, অর্থাৎ, আমলনামা। এদুটি গ্রন্থের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। কারণ, আমলনামা বিধিবদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থের কারণেই। যদি আহকাম সংক্রান্ত কিতাব না হত, তাহলে হিসাব-কিতাব কিছুই হত না। অতএব, যেহেতু আমলনামা কিতাবুল আহকামেরই ফল, সেহেতু আল্লাহর রীতি এটিই অব্যাহত আছে যে, যেখানে একটি কিতাবের আলোচনা করেন, সেখানে দ্বিতীয়টিরও আলোচনা টেনে আনেন। এ জন্য সূরা কাহ্ফের-৪৯ নং আয়াতে আছে-

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَايُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَاكَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصٰهَا وَوَجَدُوْا مَاعَمِلُوْا حَاضِرًا-

'এবং আমলনামা সামনে রেখে দেয়া হবে, তখন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে, তাতে যা কিছু লিপিবদ্ধ হবে, সে বিষয় দেখে ভয়ে বলবে, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য! এটি কিরূপ কিতাব যে, লিপিবদ্ধ ছাড়া কোন ছোট-বড় গোনাহই ছেড়ে দেয়নি! তারা যা কিছু করেছিল, সবকিছুই সেখানে মওজূদ পাবে।'

এই আয়াতে কিতাবুল আ'মাল তথা আমলনামার উল্লেখ রয়েছে। এরপর যোগসূত্রের কারণে হযরত আদম আ.-এর ঘটনা বর্ণনা করে তার পর বলেছেন-

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَّكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلًا.

'আমি এ কুরআনে মানুষের হেদায়াতের জন্য সর্বপ্রকার উত্তম বিষয়াবলী বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছি। কিন্তু মানুষ বড়ই ঝগড়াটে।' -সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত-৫৪।

এই আয়াতে কিতাবুল আহকাম অর্থাৎ, কুরআনে হাকীমের আলোচনা রয়েছে। তাহলে এখানে উভয় গ্রন্থের আলোচনা করেছেন। কারণ, উভয়ের মাঝে মিল রয়েছে। কেননা, কিতাবুল আহকাম তথা কুরআনের উপর ভিত্তি করে কিতাবুল আমাল তথা আমলনামা বিন্যস্ত হয়। এরূপভাবে সূরা ত্বহাতে আছে-

يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا.

'সে দিন যখন সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং আমি অপরাধীদের এমতাবস্থায় সমবেত করব যে, তাদের চোখ (ভয়ের চোটে) হলুদ বর্ণ ধারণ করবে।'

এবার এখানে আমল সংক্রান্ত অপরাধীদের আলোচনার পর ঈমানদার ও তাদের আমলের আলোচনা রয়েছে।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَّلَاهَضْمًا. سورة طه ١١٢.

'যে ঈমান নিয়ে নেক কাজ করে, সে বেইনসাফী এবং লোকসানের আশংকা করবে না।'

অর্থাৎ, না তার কোন নেকী নষ্ট হবে, না অকৃত অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হবে, না তার সওয়াব হ্রাস করা হবে।

এতক্ষণ পর্যন্ত কিতাবুল আ'মালের বিবরণ ছিল। এরপর কিতাবুল আহকামের বিবরণ এসেছে-

وَكَذَالِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَاتَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُه وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا.

'আমি এরূপভাবে এটাকে আরবী কুরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি এবং তাতে আমি বিভিন্ন প্রকার সতর্কবাণীর বিবরণ দিয়েছি। যাতে তারা ভয় পায়, অথবা এই কুরআন তাদের মধ্যে কিছুটা অনুধাবন সৃষ্টি করে। অতএব, প্রকৃত সম্রাট আল্লাহ তা'আলা বড়ই আলীশান। কুরআনে আপনার প্রতি ওহী পরিপূর্ণরূপে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আপনি তাড়াহুড়া করবেন না। আর আপনি দো'আ করুন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।'

মোটকথা, যেরূপভাবে এসমস্ত আয়াত ও এধরনের অন্যান্য আয়াতে কিতাবুল আ'মালের সাথে সাথে কিতাবুল আহকামেরও উল্লেখ রয়েছে, অনুরূপভাবে এখানে সূরায়ে কিয়ামাতেও ينبّؤ الانسان يومئذ بما قدّم واخّر (অর্থাৎ, মানুষের আগে-পরের সমস্ত ভাল-মন্দ কাজ সম্পর্কে অবহিত করা হবে) আয়াতে কিতাবুল আ'মালের উল্লেখ ছিল। ينبّؤ এর পন্থা এই হবে যে, আমলনামা সামনে রেখে দেয়া হবে। এ জন্য ইরশাদে রব্বানী হয়েছে-

وَنُخْرِجُ لَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُوْرًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا.

'কিয়ামতের দিন তার আমলনামা তার জন্য সামনে বের করে রেখে দেয়া হবে। যেটাকে তারা উন্মুক্ত দেখবে। (বলা হবে, নিজ আমলনামা পড়। আজকে নিজের হিসাব-নিকাশের জন্য নিজেই যথেষ্ট হবে।' - সূরা বনী ইসরাঈল।

এই পদ্ধতির অধীনে সূরা কিয়ামাতেও ينبّؤ الانسان يومئذ بما قدّم واخّر আয়াতে কিতাবুল আ'মালের বিবরণ ছিল। এই জন্য لاتحرّك به لسانك لتعجل به الخ আয়াতে কিতাবুল আহকামের বিবরণও এসেছে।

৩. হযরত শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী র. বলেন- প্রথম থেকে আলোচনা চলে আসছে- ينبّؤ الانسان يومئذ بما قدم واخّر (সে দিন মানুষকে তার পূর্বাপরের সব কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করা হবে। ماقدّم সে সব আমল, যেগুলো পরবর্তীতে করার ছিল, কিন্তু সেগুলো আগে করে ফেলেছে। যেমন- ওয়াক্ত আসার পূর্বে নামায পড়া, ইশার পূর্বে বিতর পড়া, ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে বিয়ে করা। আর ما اخّر দ্বারা উদ্দেশ্য সেসব জিনিস যেগুলো আগে করনীয় ছিল, কিন্তু করেছে পরবর্তীতে। যেমন- ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর নামায পড়া, সেজদার পর রুকূ করা।

মোটকথা, যে জিনিস পরে করা জরুরী ছিল, সেটি আগে করা নিষিদ্ধ এবং অভিযুক্ত হওয়ার যোগ্য। এরূপভাবে যে জিনিস আগে করা জরুরী, তা পরে করা অভিযোগের যোগ্য। যদিও আগ-পিছ ভাল কাজেই হোক না কেন। কিন্তু শরীয়তের নির্ধারিত ক্রমবিন্যাসের খেলাফ হওয়ার কারণে অভিযুক্ত হবে। যেমন- দাড়ানোর পরিবর্তে রুকূ এবং সেজদায় কুরআন পড়া, রুকূর পূর্বে সেজদা করা। এরূপভাবে কুরআন মজীদ শুনাও ইবাদত, পড়া ও মুখস্থ করাও ইবাদত। কিন্তু শরীয়ত এসব বিষয়েও তরতীব রেখেছে। যেমন-

জিবরাঈল আ.-এর পাঠের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করাও পরবর্তী কাজ আগে করার নামান্তর। কারণ কুরআন পাঠের অনুসরণ হল শ্রবণ ও নীরবতায়। কাজেই জিবরাঈল আ.-এর সাথে পড়ার বিষয়টিও এরূপ, যেখানে পরবর্তীতে করা ওয়াজিব ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা আগে করতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- لاتحرك به لسانك الخ অর্থাৎ, প্রতিটি জিনিসে আগ-পিছের বিষয় খেয়াল রাখা জরুরী। অতএব, لاتحرك به আয়াতে পূর্বাপরের সাথে যোগসূত্র স্পষ্ট।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ

ওহীর সূচনার সাথে এ হাদীসের যোগসূত্র হল, এর দ্বারা বুঝা গেছে, لاتحرك به الخ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রীতি ছিল, তিনি ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় হযরত জিবরাঈল আমীনের সাথে তিলাওয়াত করতেন। এর দ্বারা স্পষ্ট যে, ওহীর সূচনাকালেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আমল হয়ে থাকবে। যেন গারে হেরা সংক্রান্ত রেওয়ায়াতে স্থানের সূচনার আলোচনা ছিল। আর এই রেওয়ায়াতে সূচনা হল, যার প্রতি ওহী নাযিল হয় সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলীর।

শিরোনামের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, ওহীর আজমত ও পবিত্রতা প্রমাণ করা। যাতে এ কথা অন্তরে বদ্ধমূল হয় যে, দীনি ব্যাপারে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বিষয় হল ওহী। কারণ, যদি ওহীয়ে ইলাহীর যিম্মাদার কোন মানুষকে বানানো হত, তবে ভুলবিস্মৃতির সম্ভাবনা ছিল। ওহী মুখস্থ করা, পাঠ করা জটিল বিষয়গুলোর ব্যাখ্যাদান, অর্থ ও উদ্দেশ্যের দায়দায়িত্ব রাব্বুল আলামীন নিয়ে নিয়েছেন। এই যিম্মাদারী থেকে ওহীর মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা প্রমাণিত হয়। রাব্বুল আলামীনের দায়দায়িত্ব দ্বারা ওহীর মাহাত্ম্য ও আজমতে শান স্পষ্ট। অতঃপর এটাও স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, যার রক্ষক স্বয়ং রাব্বুল আলামীন, সেটি সর্বপ্রকার পরিবর্তন-রদবদল ও হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে নিরাপদ থাকবে। কাজেই ওহীর আজমতও প্রমাণিত হল।

٥. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح و حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

৫. আবদান র. ...... ও বিশর ইবনে মুহাম্মদ র. ..... হযরত ইবনে 'আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। রমযানে তিনি আরো বেশী দানশীল হতেন, যখন হযরত জিবরাঈল আ. তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর রমযানের প্রতি রাতেই জিবরাঈল আ. তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁরা পরস্পর কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবাহিত বাতাস থেকেও অধিক দানশীল ছিলেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি

ইমাম বুখারী র. এই হাদীসটি পাঁচটি স্থানে এনেছেন- ১. তৃতীয় পৃষ্ঠায় ২. ২৫৫পৃষ্ঠায় ৩. ৪৫৭ পৃষ্ঠায় ৪. ৫০২ পৃষ্ঠায় ৫. ৭৪৮পৃষ্ঠায়। এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম র. ও বর্ণনা করেছেন।

রাবী পরিচিতি

এটিতে আটজন রাবী রয়েছেন- ১. আবদান (আইন-এর উপরে যবর, বা-এর উপর জযম)। এটি উপাধি। তাঁর নাম হল, আবদুল্লাহ ইবনে উসমান। উপনাম আবু আবদুর রহমান। কাজেই নাম ও উপনামে দুটি আব্দ একত্রিত হওয়ার কারণে তাকে আবদান বলা হয়েছে।

মোটকথা, প্রথমে এটি দ্বিবচন ছিল। পরে নাম হয়ে গেছে এবং এই নামেই তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে গেছেন। ইমাম মালিক র. ও হাম্মাদ ইবনে যায়েদ র. এর নিকট শিষ্যত্ব লাভে ধন্য হয়েছেন। ইমাম বুখারী র. ও ইমাম যুহরী র.-এর ন্যায় ইমামে হাদীস তাঁর ছাত্র। বুখারী শরীফে তাঁর সূত্রে ১১০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ৭৬ বছর বয়সে ২২১হিজরীতে তিনি ওফাত লাভ করেন।

২. আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ঃ

اخبرنا عبد الله هو ابن المبارك بن واضح الحنظلى التيمى الخ

হযরত আদুল্লাহ ইবনে মুবারক র.-এর মাহাত্ম্য ও শীর্ষত্বের ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। আল্লামা আইনী র. বলেন- الامام المتفق عليه على جلالته وامامته وورعه وسخائه وعبادته' الثقة الحجة الثبت -উমদাহ।

তিনি ছিলেন তাবে তাবিঈ। বড় বড় মুহাদ্দিসীন তাঁকে আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস উপাধিতে ডাকেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক র. অধিকাংশ সময় নির্জনতায় কাটাতেন। কেউ জিজ্ঞেস করল, আপনার এটা খারাপ লাগেনা? তিনি বললেন, নির্জনতা আর দূরত্ব কোথায়? কারণ, আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকি, তাতে (তাঁর হাদীসে) রত থাকি।

এজন্যই উলামায়ে কিরাম লিখেছেন- তিনি ছিলেন উত্তম চরিত্রের সমষ্টি। ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশ বলেন- তাঁর যুগে ভুপৃষ্ঠে ইবনে মুবারকের ন্যায় কোন মনীষী ছিল না। আমার জানামতে যত নেক বৈশিষ্ট্য ছিল কুদরত সেগুলো তাঁর মধ্যে একত্রিত করে দিয়েছে।

-জামিউদ দিরারী ঃ সূত্র তাহযীবুল কামাল ঃ ৫/৩৮৬।

আবদুর রহমান ইবনে মাহদী র. বলেন- আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক র.ছিলেন হাদীস বিশেষজ্ঞ। -মুওয়াফফাকাত ঃ ২/৪৫।

ইমাম বুখারী র.ও রাফয়ে ইয়াদাইন নামক পুস্তিকায় বলেছেন যে, ইবনে মুবারক র. তৎকালীন যুগের বড় আলিম ছিলেন। জন্ম -১১৮ হিজরী। যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে হীত নামক স্থানে তাঁর ৬৩ বছর বয়সে ওফাত হয় । হীত ইরাকের ফোরাতের তীরবর্তী একটি শহরের নাম ছিল।

৩. ইউনুস

তিনি হলেন ইউনুস ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মিশকান ইবনে আবুন নাজাদ। -উমদাহ ঃ ১/৬৮।

ইউনুস ইবনে ইয়াযীদ ছিলেন তাবিঈ। ১৫৯ হিজরীতে মিসরে ওফাত লাভ করেন। ইউনুস শব্দটিতে ছয়টি ছুরত রয়েছে- ১. নূন-এর উপর পেশ ও যবর, হামযা সহকারে ও হামযা ছাড়া। তবে হামযা ছাড়া পেশ, ভাষা সাহিত্যের দিক দিয়ে উচ্চাঙ্গের।

৪. যুহরী

ইমাম যুহরী র.-এর জীবনী ভূমিকায় এসেছে।

৫. বিশ্‌র

ح وحدثنا بشر بن محمد

এই রেওয়ায়াতের সনদে ح এসেছে। এজন্য এরপর واو تحويل আনা হয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ পরে আসছে।

بشر বা-এর নিচে যের, শীন সাকিন। ইবনে মুহাম্মদ, আবু মুহাম্মদ, মারওয়াযী, সাখতিয়ানী, ইমাম বুখারী র. স্বতন্ত্রভাবে তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ সিহাহ সিত্তার অন্যান্য গ্রন্থ তা থেকে ব্যতিক্রম। তাওহীদ, সালাত ইত্যাদিতে তাঁর হাদীস আছে। ইবনে হাব্বান র. তাঁকে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তিনি মুরজিয়া ছিলেন। ২২৪ হিজরীতে তাঁর ওফাত হয়। -উমদাহ।

সারকথা, বুখারী শরীফ ছাড়া সিহাহ সিত্তার কোন কিতাবে বিশ্‌র ইবনে মুহাম্মদের কোন রেওয়ায়াত নেই। ইমাম বুখারী র. এই স্থানে ও কিতাবুস সালাত ইত্যাদিতে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

قال حدثنا عبد الله তিনি হলেন, আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক র.। তাঁর জীবনী সম্পর্কে কেবল মাত্র আলোচনা হল।

৬. اخبرنا يونس ومعمر نحوه অর্থাৎ, ইউনুসের ন্যায়। তাঁর জীবনী আলোচিত হয়েছে।

৭. মা'মার

উভয় মীম-এর উপর যবর, আইন-এর উপর জযম। তিনি হলেন, মা'মার ইবনে রাশিদ। সহীহ বুখারী, মুসলিমে মা'মার ইবনে রাশিদ শুধু তিনিই। এছাড়া আর কোন মা'মার ইবনে রাশিদ রাবী নেই। বরং সহীহ বুখারী মুসলিমে তিনি ছাড়া মা'মার নামক কোন রাবী নেই। অবশ্য বুখারীতে মা'মার ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে সাম দাব্বী নামক একজন রাবী আছেন। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন, এই معمر এর মীম তাশদীদযুক্ত। ইমাম বুখারী র. তাঁর থেকে কিতাবুল গোসলে একটি রেওয়ায়াত নিয়েছেন।

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ১৩জন মা'মার রয়েছেন। সহীহ বুখারী, মুসলিম ছাড়া গ্রন্থ চতুষ্ঠয়ে মা'মার নামক ছয় ব্যক্তি রয়েছেন। -উমদাতুল কারী ঃ ১/৬৯।

তাঁর ওফাত হয়েছে-৫৮ বছর বয়সে, ১৫৪ হিজরীতে। -তাকরীব।

حاء تحويل ও এর উদ্দেশ্য ঃ

এ প্রসঙ্গে আমি নাসরুল বারী শরহে বুখারী কিতাবুল মাগাযীতে (২২পৃষ্ঠায়) আলোচনা করেছি। কিন্তু যেহেতু এটি নাসরুল বারী প্রথম খণ্ড এবং এটাই সর্বপ্রথম স্থান, যেখানে ইমাম বুখারী র. তাহভীল করেছেন, সেহেতু জামিউদ দিরারী শরহে বুখারী থেকে পূর্ণ বিস্তারিত বিবরণ দান সংগত মনে করি। উল্লেখ্য, জামিউদ দিরারী হল কুতবুল আকতাব শাইখুল হযরত মাওলানা যাকারিয়া র.-এর খলীফা সাবেক শাইখুল হাদীস কাসেমিয়া শাহী মুরাদাবাদ হযরত মাওলানা আবদুল জাব্বার আ'জমী র. কর্তৃক রচিত গ্রন্থ। এটি মূলতঃ ইমদাদুল বারী শরহে বুখারীর সারসংক্ষেপ।

উপকারিতা ঃ

এই রেওয়ায়াতে আছে- وحدثنا بشر এই ওয়াওকে ওয়াওয়ে তাহভীল বলা হয়। অর্থাৎ, এক সনদ থেকে অন্য সনদের দিকে স্থানান্তরিত হওয়ার নির্দেশন। সাধারণতঃ এটিকে ح লেখা হয়। আর কোন কোন কপিতে এখানেও অনুরূপ আছে। আল্লামা নববী র. বলেন- এ ধরনের ح সহীহ মুসলিমে অনেক, তবে বুখারীতে কম। এটিই সর্বপ্রথম স্থান, যেখানে ইমাম বুখারী র. তাহভীল রূপ অবলম্বন করেছেন। মূলনীতি হল, যখন কোন হাদীসের দুই অথবা দুইয়ের অধিক সনদ থাকে, তখন প্রত্যেকটির সনদ পূর্ণাঙ্গ আকারে নিলে ইবারত

দীর্ঘ হয়ে যায়, এটা স্পষ্ট। সেহেতু মুহাদ্দিসীনে কিরাম দীর্ঘায়ন থেকে বাচার জন্য এ পন্থা অবলম্বন করেন যে, প্রথমত একটি সনদ সূত্রের মূলকেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ, যৌথ শায়েখ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে ফিরে আসেন। এরপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সনদ সে শায়েখ পর্যন্ত পৌঁছান এবং উভয় সনদের মাঝে ব্যবধানের জন্য হা নিয়ে আসেন, যাতে দমশকের বিভিন্ন সনদের ক্ষেত্রে একই সনদের ধারণা বা সন্দেহ না হয়। যেমন- উপরোক্ত রেওয়ায়াতে যুহরী সনদের কেন্দ্রবিন্দু এবং তিনি উভয় সনদে যৌথ। এজন্য প্রথমে বলেছেন-

حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهرى ح

এরপর দ্বিতীয় সনদের সূচনা হয়।-

وحدثنا بشر بن محمّد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهرى

যুহরী উভয় সনদে যৌথ। এরপর اخبرنى عبيد الله থেকে শেষ পর্যন্ত উভয় রেওয়ায়াতেই আছে।

তাহভীল দুই প্রকার- ১. উভয় সনদ শুরুতে আলাদা আলাদা, শেষের দিকে এক। যেমন- বর্তমান রেওয়ায়াতে আছে। অধিকাংশ তাহভীলের পন্থা এটাই হয়।

কোন কোন সময় উভয় সনদ শুরুতে এক হয়, শেষের দিকে হয় ভিন্নরকম। যেমন- এ অনুচ্ছেদের তৃতীয় হাদীস ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইরের রেওয়ায়াতে সনদের শুরু এক, শেষে গিয়ে আলাদা আলাদা। যেমন-قال ابن شهاب এর ব্যাখ্যায় এসেছে। তবে এ ধরণের তাহভীল খুব কম হয়। -ফয়যুল বারী ঃ১/৩৬।

উপকারিতা ঃ

হাফিজ ইবনে হাজার র. বলেন, تحويل এর ছূরতে শব্দ ও মূলপাঠ সর্বশেষ সনদের হয়ে থাকে। আল্লামা নববী র. এর উস্তাদ শায়খ আবু আমর ইবনে সালাহর বলেন, মতন হয়ত শেষ সনদের হয়, অথবা উঁচু সনদের। এ দু'টি উক্তির মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে যে, ইমাম বুখারী র.এর সাধারণ রীতি হল, মতন শেষ সনদের হয়ে থাকে। কখনো এর পরিপন্থীও হয়ে যায়। আর সাধারণ মুহাদ্দিসীনের রীতি তাই, যা আল্লামা ইবনে সালাহ র. উল্লেখ করেছেন। –ফয়যুল বারী ঃ ১/৩৬।

উপকারিতা ঃ

ح সংক্রান্ত ছয়টি উক্তি রয়েছে, যেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ-

প্রথমত এই ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, এটি কি খা না হা? যারা খা সাব্যস্ত করেন তাদের মধ্যে দুইটি উক্তি রয়েছে- ১. এটি حدث এর সংক্ষেপ। অর্থাৎ, الى آخره । যখন কোন দীর্ঘ আয়াত বা হাদীসের দিকে ইঙ্গিত উদ্দেশ্য হয়, তখন এর প্রথমাংশ লিখে الآية বা الحديث -الخ। লিখে দেন। উদ্দেশ্য হয়, আয়াত, হাদীস বা বাক্যের শেষ পর্যন্ত। যেন الخ শব্দটি الى آخره।এর সংক্ষেপ। খা হল الخ এর সংক্ষেপ।

দ্বিতীয় উক্তি হল, এটি اسناد آخر এর সংক্ষেপ। কিন্তু আল্লামা কাসতাল্লানী র. এটাকে ভুল সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেন- وزعم بعضهم انها معجمة فوهم -ইরশাদুস সারী ঃ ১/৫৯।

মোটকথা, কারো কারো ধারণা হল, এটি خاء معجمه তাদের মধ্যেও দুটি উক্তি রয়েছে। কিন্তু অনেক দলের তাহকীক হল, এটি حاء مهمله। অতঃপর তাদের মধ্যে চারটি দল হয়েছে-

১. পশ্চিমারা বলেন- এটি الحديث এর সংক্ষেপ। অতএব, এখানে পৌঁছে الحديث পড়া উচিত।

২. আবু মুসলিম লাইছী ও আবু সাঈদ খলীলী বলেন- এটি صح এর সংক্ষেপ। মূলনীতি হল, যখন কোন লেখায় কোন স্থানে দোদুল্যমানতা ও সন্দেহের আশংকা হয়, তখন সে স্থানে ছোট করে صح লিখে

দেন। যেটা বিশুদ্ধতার নিদর্শন হয়। এতে ইঙ্গিত হয় যে, এই ইবারতটি সম্পূর্ণ সহীহ। এতে কোন প্রকার সন্দেহ ও দোদুল্যমানতা রেখনা। কিন্তু এর দ্বারা শুধু সতর্ক করা উদ্দেশ্য। এজন্য এটা পড়া হয় না। যেহেতু এই স্থানেও সন্দেহ হতে পারত যে, হয়ত প্রথম সনদের মূলপাঠ পড়ে গেছে, এজন্য হা লেখা হয়েছে। যাতে ইঙ্গিত হয় صح -এর দিকে। কোন কোন হাফিজ এখানে صح লিখেন যাতে বুঝা যায়, صح -এর সংক্ষেপ রূপ। আল্লামা সুয়ূতী র. বলেন-

وحسن اثبات صح لئلا يتوهم ان حديث هذا الاسناد سقط ولئلايركب الاسناد الثانى على الاسناد الاول فيجعلا اسنادا واحدا

৩. এ حاء টি দুই সনদের মাঝে আড়াল হয়। আসল রেওয়ায়াতে নেই। শুধু আড়াল হওয়ার নিদর্শন। এ জন্য এটি পড়া যাবে না। (তাদরীব)

ইরশাদুস সারীতে আছে– আবদুল কাদির রুহাবী ও দিমইয়াতী র. বলেন, এটি হল حاء حائل কিন্তু আবদুল কাদির র. এর মতে এখানে কিছু পড়া হবে না। আর দিমইয়াতী র. এর মতে হা পড়া হবে।

৪. সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে এটি حاء تحويل । অর্থাৎ, تحويل থেকে গৃহীত। এখানে পৌঁছে হা পড়া হবে।

وقال النووى فى مقدمة شرح مسلم اذا كان للحديث اسنادان او اكثر كتبوا عند الانتقال من اسناد الى اسناد ح وهى حاء مفردة والمختار انه ماخوذ من التحويل لتحوله من اسناد الى اسناد وانه يقول القارى اذا انتهى اليه حاء ويستمر فى قراءة ما بعدها الخ –

ومعمر نحوه ইমাম বুখারী র. এ হাদীস স্বীয় দুই উস্তাদ থেকে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, আব্‌দান ও বিশ্‌র থেকে। আব্‌দান ও বিশ্‌র উভয়ে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক থেকে। কিন্তু আব্‌দান আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের এক উস্তাদ তথা ইউনূসের কথা উল্লেখ করেছেন। আর বিশ্‌র আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের দুই শায়খ তথা ইউনুস ও মা'মারের কথা উল্লেখ করেছেন। যেহেতু ইমাম বুখারী র. এর সাধারণ নিয়ম হল- হাদীসের মূলপাঠ সর্বশেষ সনদে উল্লেখ করেন, সেহেতু রেওয়ায়াতের মতন হল বিশ্‌রের। বিশ্‌রের রেওয়ায়াতে তাঁর উস্তাদের উস্তাদ দু'জন– ইউনুস ও মা'মার। কিন্তু এখানে শব্দাবলী ইউনুসের। মা'মারের রেওয়ায়াত ইউনুসের রেওয়ায়াতের অর্থবোধক, শাব্দিক পার্থক্য আছে। এদিকেই ومعمر نحوه দ্বারা ইঙ্গিত রয়েছে।

مثله এবং نحوه তে পার্থক্য

দ্রষ্টব্য ঃ নাসরুলবারী শরহে বুখারী, কিতাবুল মাগাযী ঃ পৃষ্ঠা ২৭।

উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ

উবায়দুল্লাহ তাসগীর সহ, ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উকবা (আইন এর উপর পেশ, তা সাকিন, বা এর উপর যবর) সুমহান এক ইমাম। সপ্ত ফকীহের একজন। তাবিঈ। ৯৯ অথবা ৯৮ অথবা ৯৫ বা ৯৪ হিজরীতে চোখের জ্যোতি নষ্ট হওয়ার পর ওফাত লাভ করেছেন। –ইরশাদুস সারী ঃ ১/১২১।

মোটকথা, হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ সুপ্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা.-এর ভাই উকবা ইবনে মাসঊদের নাতি। ৯৪ হিজরীতে তাঁর ওফাত হয়। (তাকরীব ঃ ২৫২) হযরত উবায়দুল্লাহ সুমহান তাবিঈ ছিলেন। তিনি মদীনার সপ্ত ফকীহের একজন। তিনি ছিলেন খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র.-এর উস্তাদ।

ইবনে আব্বাস রা.

৪ নং হাদীসের অধীনে তাঁর জীবনী এসেছে।

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس

اجود শব্দের মধ্যে যবর। কারণ, এটি كان এর খবর। –ফাতহুল বারী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার চেয়ে অধিক বদান্যতার অধিকারী ও দানবীর ছিলেন।

جود ও سخا এর মধ্যে পার্থক্য

اجود ইস্‌মে তাফযীলের সীগা باب نصر থেকে। দান ও বখশিশে প্রবল হওয়া। ইমাম রাগিব র. جود এর অর্থ বর্ণনা করেছেন – اعطاء ماينبغى لمن ينبغى তথা যে জিনিস যাকে দেয়া সমীচীন, তাকে তা প্রদান করা। سخاوت এর অর্থ হল, অর্থ বণ্টন করা। এ হিসেবে جود শব্দে অনেক ব্যাপকতা রয়েছে। অর্থাৎ, এটি সম্পদের উপর মওকূফ নয়। বরং প্রতিটি ব্যক্তিকে তার জন্য সমীচীন বস্তু দান করাই جود। ক্ষুধার্তকে পোশাক দান, বিবস্ত্রকে খানা খাওয়ানো جود নয়। কারণ, এটি যাকে যা দেয়া উচিত, তা দেয়া হল না। বরং গরীব-ফকীর কপর্দকহীনদের সম্পদ বণ্টন করে দেয়া, জ্ঞান পিপাসার্তদের ইলম দান করা, পথহারাদের পথ দেখানো অর্থাৎ, প্রতিটি কাজ মওকামত করার নাম جود। এই হিসেবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার চেয়ে বড় দানবীর হওয়ার বিষয়টি সূর্য অপেক্ষা স্পষ্টতর।

جود মূলতঃ একটি যোগ্যতার নাম। سخاوت হল এর ফল ও ক্রিয়া। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য করলে সমস্ত গুনীজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখতেন। ইরশাদে নববী রয়েছে-

انا اجود ولد آدم واجودهم بعدى رجل علم علما لنشر علمه الخ (فتح)

অর্থাৎ, সমস্ত মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দানবীর আমি। অতঃপর সবচেয়ে বেশি দানবীর সে যে ইলম অর্জন করে তার প্রসার ঘটাবে।

বিভ্রান্তির নিরসন

সাধারণতঃ একটি ভুল বুঝাবুঝি এই হয় যে, جود ও سخا এর অর্থ মনে করা হয় প্রচুর সম্পদ ব্যয় করা। দ্বিতীয় ভুল বুঝাবুঝি হল سخا ও جود কে সম্পদের সাথে বিশেষিত মনে করা হয়। এ দু'টি ভুল বুঝাবুঝির উপর ভিত্তি করে একটি সন্দেহ হতে পারে যে, পৃথিবীতে কয়েক জন ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও বড় দানবীর। যেমন– হাতেম তাঈ প্রমূখের ঘটনাবলী প্রসিদ্ধ।

অতএব, বাস্তবতা হল, প্রচুর সম্পদ ব্যয় করা سخا বা جود নয়। বরং সম্পূর্ণ মাল থেকে ব্যয়িত মালের তূলনার বিষয়টি ধর্তব্য। যেমন– এক ব্যক্তি লাখপতি। সে এক হাজার টাকা দান খয়রাত করে। আরেকজনের শুধু এক টাকা আছে। সে পূর্ণ টাকাটাই আল্লাহর পথে ব্যয় করে দেয়। বাহ্যতঃ প্রথম ব্যক্তিকে দানবীর মনে করা হয়। কারণ, সে এক হাজার টাকা ব্যয় করেছে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ব্যয় করেছে শুধু এক টাকা। কিন্তু বাস্তবে দ্বিতীয় ব্যক্তি বড় দানবীর। কারণ, সে নিজের পূর্ণ সম্পদ দান করেছে। অথচ প্রথম ব্যক্তি নিজের পূর্ণ সম্পদের এক শতাংশ দান করেছে। এ বিষয়টি যৌক্তিক হওয়ার সাথে সাথে ঐতিহ্যগতও।

একবার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য সম্পদ জমা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। তখন হযরত উমর ফারুক রা.-এর নিকট প্রচুর সম্পদ ছিল। তিনি নিজের অর্ধ সম্পদ নিয়ে গেলেন। আর মনে মনে খুশি যে, আজকে সিদ্দীকে আকবর রা.-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করব।

এদিকে হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. স্বীয় ঘরের সমস্ত মাল-আসবাব নিয়ে আসেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর রা. কে জিজ্ঞেস করলেন– তুমি কতটুকু সম্পদ এনেছ? তিনি আরয করলেন, অর্ধেক। অতঃপর হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি আরয করলেন, সম্পূর্ণ মাল আপনার খেদমতে হাজির। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঘরে বাচ্চাদের জন্য কি রেখে এসেছ? আরয করলেন, تركت الله ورسوله তথা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলকে রেখে এসেছি। হযরত উমর রা. বলেন, সেদিন থেকে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছে যে, কোন ময়দানেই আমি সিদ্দীকের মুকাবিলা করতে পারি না।

অতএব, এই স্থলে শ্রেষ্ঠত্বের এই কারণ দেখা হয়নি যে, বেশি মাল কে এনেছে? বরং লক্ষ্যনীয় বিষয় ছিল পূর্ণ সম্পদের কতটুকু অংশ এনেছে?

মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বলে হযরত আলী রা. সূত্রে বর্ণিত আছে–

جاء ثلثة نفر الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال احدهم كانت لى مائة دينار فتصدقت بعشرة فقال الاخر كانت لى عشرة فتصدقت بواحد وقال الاخر كان لى دينار فتصدقت بعشرة ' فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم فى الاجر سواء وكلكم تصدق بعشر ماله -

এরূপভাবে جود وسخا কে সম্পদের সাথে বিশেষিত মনে করা ভুল। কারণ, এটা ফুয়ূয, আনওয়ার, উলূম ও আসরারকেও (নিগুঢ় রহস্যাবলীকেও) অন্তর্ভূক্ত করে। যেমন– ইমাম রাগিব র. جود এর অর্থ বর্ণনা করেন هو اعطاء ماينبغى لمن ينبغى অতএব, جود وسخا এর হাকীকত জানার পর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সবচেয়ে বড় দানবীর হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

একটি প্রশ্ন ও এর উত্তর

বিভিন্ন রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে রান্না করার কোন জিনিস না থাকার ফলে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত চুলায় আগুন জলত না। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. বলেন, দু দু মাস পর্যন্ত অতিক্রান্ত হয়ে যেত, আমাদের চুলায় আগুন জলত না। শুধু খেজুর আর পানির উপর দিন গুজরান হত।

কয়েক দিন পর্যন্ত উপোস থাকতে হত। অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই অবস্থা হওয়ার পরও তিনি সবচেয়ে বড় দানবীর কিভাবে হলেন?

উত্তর ঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই ক্ষুৎ- পিপাসা, ক্ষুধা-দারিদ্র অনৈচ্ছিক ছিল না। বরং তা ছিল ঐচ্ছিক। এই দানশীলতার কারণেই ছিল। কারণ, যা কিছু আসত, তা তৎক্ষনাৎ বণ্টন করে দিতেন। সম্পূর্ণ বণ্টনের পূর্বে ঘরে ফিরতেন না।

হযরত আনাস ইবনে মালিক রা.-এর রেওয়ায়াত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাহরাইন থেকে কিছু সম্পদ এল। (বুখারী ঃ১/৬০) ইবনে আবু শায়বার মুরসাল রেওয়ায়াতে আছে– সে মাল ছিল এক লক্ষ দিরহাম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে সে অর্থ মসজিদের এক কোণে রাখা হয়। নামায থেকে অবসর হয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বণ্টন করতে আরম্ভ করেন। এভাবে পূর্ণ সম্পদ বণ্টিত হয়ে যায়।

فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمه منها درهم

অর্থাৎ, যতক্ষন পর্যন্ত একটি দিরহামও ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সেখান থেকে উঠেননি। –বুখারী ঃ ১/৬০।

একবার আসর নামাযের পর দ্রুত লোকজনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে ঘরে যান। সেখান থেকে স্বর্ণের একটি টুকরো নিয়ে এসে বলেন, বণ্টনযোগ্য একটি জিনিস ঘরে রয়েছিল। এরূপ জিনিস পয়গাম্বরের ঘরে থাকা সমীচীন নয়।

এক মহিলা খুব আগ্রহের সাথে একটি লুঙ্গি নিয়ে খেদমতে উপস্থিত হন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেহায়েত আগ্রহের সাথে তা গ্রহণ করেন। প্রিয়নবী যখন তা ব্যবহার করলেন, তখন এক সাহাবী তা দেখে স্পর্শ করে বললেন, খুব ভাল। তার শব্দরাজি থেকে বুঝা যাচ্ছিল, তিনি এটি কামনা করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ ঘরে যেয়ে নিজের পুরোনো লুঙ্গি পরে এর লুঙ্গিটি ভাজ করে সে সাহাবীকে দিয়ে দেন। লোকজন তাকে ভৎর্সনাও করল যে, তুমি এ কাজটি ঠিক করনি। তুমি লক্ষ্য করনি, একজন মহিলা নেহায়েত আগ্রহের সাথে এটি এনেছেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাদরে গ্রহণ তা করেছেন। কিন্তু তুমি তৎক্ষণাৎ তা চেয়ে নিলে। তিনি উত্তর দিলেন, এ জন্য চেয়েছি যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মুবারকের সাথে এ লুঙ্গি লেগেছে। আমি আমার কাফনে এরূপ কাপড় দেখতে চাই, যেটির সম্পর্ক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মুবারকের সাথে হয়েছে।

মোটকথা, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তো এ অবস্থা হয়েছিল যে, কোন জরুরতমন্দ ব্যক্তি যদি তাঁর নিকট নাও চাইত, কিন্তু অন্য কোন পন্থায় তার প্রয়োজন স্পষ্ট হয়ে যেত, তবে তা নিজেই পূর্ণ করে দিতেন। আর যদি নিজে পূর্ণ করতে না পারতেন, তবে সে জরুরতমন্দ ব্যক্তির জন্য ধার নিতেন। আর যদি ধারও না পেতেন, তবে সাহাবায়ে কিরামকে তাঁর জরুরতের প্রতি মনোযোগী করতেন। আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত উক্তিকারীকে প্রতিদান দিন–

ما قال لاقط الا في تشهده ÷ لولا التشهد كان لاءه نعم.

অতএব, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সবচেয়ে বড় দানবীর, বরং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ দানবীর এ বিষয়টি স্বীকৃত।

وكان اجود مايكون في رمضان الخ রমযানুল মুবারকে যখন হযরত জিবরাঈল আ. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করতেন, তখন (অন্যান্য সময়ের তুলনায়) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানশীলতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যেত। এর কারণ স্পষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মাসটিকে মহান ও বরকতময় মাস বলেছেন। এতে নফলের সওয়াব ফরযের সমান হয়। একটি ফরযের সওয়াব ৭০টি ফরযের সমান হয়। এক হাদীসে বলা হয়েছে– রমযান শরীফের প্রতিটি রাতে দশ লাখ ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা হয়।

স্থান ও কালের শ্রেষ্ঠত্ব

◆ অধিকাংশ কালাম শাস্ত্রবিদের মাযহাব হল, সত্তাগতভাবে সব স্থান ও কাল সমান। সৃষ্টিকর্তা সবগুলোকে এক রকম বানিয়েছেন। কোন স্থান বা কালের অন্যটির উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অবশ্য কোন বিশেষ মহা কারণে কোন স্থান কালের উপর অপরটির শ্রেষ্ঠত্ব এসে যায়।

◆ শায়খে আকবর ও ইবনে কাইয়্যিম র. প্রমুখ তত্ত্বজ্ঞানী বলেন, কুদরতের পক্ষ থেকে কোন কাল ও স্থানে কিছু বৈশিষ্ট্য গচ্ছিত রাখা হয়েছে। যেগুলোর ফলে সে সব মহা কাজ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তাতে হয়ে

থাকে। আল্লাহর হিকমতের দাবি হচ্ছে, উৎকৃষ্ট স্থান ও কালকে শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলোর জন্য মনোনীত করা হয়। সেসব জিনিস ও ঘটনার কারণে এগুলোর শ্রেষ্ঠত্বও বেড়ে যায়। যেমন- আশুরার দিন সম্পর্কে কালাম শাস্ত্রবিদদের মত হল অন্যান্য দিনের উপর সত্তাগতভাবে এই দিনটির কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কিন্তু যেহেতু দিবসটিতে বড় বড় কাজ সংঘটিত হয়েছে, যেমন- হযরত মূসা আ. এর ন্যায় সুমহান রাসূলের মুক্তি এবং ফিরআউন ও অবাধ্য লোকদের ধ্বংস ও ডুবে মরা ইত্যাদি। এজন্য এতে বিশেষ ঘটনার কারণে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব এসে গেছে।

◆ তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেন, এ দিবসটিতে কুদরতিভাবে বিশেষ যোগ্যতা রাখা হয়েছে। এ দিনটিকে একতচ্ছত্র প্রজ্ঞাবান আল্লাহ তা'আলা সেসব মহা বিষয়ের জন্য নির্ধারিত করেছেন। ফলে এই দিনটির শ্রেষ্ঠত্ব দিগুন হয়ে গেছে। এরূপভাবে কালামশাস্ত্রবিদদের মতে লাইলাতুল কদরের কোন বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব অন্য রজনীগুলোর উপর ছিল না। কিন্তু কুরআন অবতরণ ও অন্যান্য আসমানী কিতাব নাযিল হওয়ার কারণে এতে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব এসে গেছে।

◆ তত্ত্বজ্ঞানীগণের বাণী হল, শবে কদরে সৃষ্টিগতভাবে বিশেষ মাহাত্ম্য, যোগ্যতা ও ফযীলত ছিল। এজন্য এতে আসমানী কিতাবসমূহ ও কুরআনে আজীম অবতীর্ণ হয়েছে। এরূপভাবে কাবাগৃহের স্থান সম্পর্কে কালামশাস্ত্রবিদগণ বলেন, এতে বিশেষ ফযীলত ছিল না। যেহেতু সেখানে হজ্জ শুরু হয়েছে, পবিত্র লোকজন সেখানে হজ্জ করতে যায়, সেহেতু এর এক বিশেষ ফযীলত এসে গেছে।

◆ তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেন, যদি সমস্ত স্থান সমান হত, তাহলে হজ্জের জন্য এই স্থানটিকে কেন নির্বাচন করলেন? وربك يخلق ما يشاء ويختار তথা তোমার প্রভু যা চান, তাই সৃজন করেন। যাকে ইচ্ছা মনোনয়ন করেন। আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞাবান। হিকমতের অর্থ যথার্থস্থানে কোন জিনিস রাখা। এ জন্য স্পষ্ট বিষয় হল, আল্লাহ তা'আলা কোন মহা বস্তুর জন্য কোন স্থান অথবা কালকে বেছে নিলে অবশ্যই তাতে কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের শান থাকবে। আরকে গোলাপের ঘ্রাণ নিলে এবং শিশিতে রেখে দিলে কোন ফযীলত অর্জন হয় না, বরং এতে সৌন্দর্য ছিল এ জন্য এটাকে উৎকৃষ্ট স্থানে রেখেছেন।

◆ আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম র. এই বিষয়টি একটি দীর্ঘ ভূমিকার পর কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে দীর্ঘ থেকে সংক্ষেপ করেছেন এবং যাদুল মা'আদের ৩৫ পৃষ্ঠা থেকে ৬০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

এক স্থানে তিনি বলেন, এই হিকমত, এ স্বল্পজ্ঞানীর বুঝের উর্ধ্বে, যে সত্তা, কর্ম, স্থান ও কালগুলোকে সমান মনে করে, তাদের ধারণা অনুসারে এগুলোর একটির উপর অপরটির শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কিন্তু এই ভ্রান্ত ধারণার পরিপন্থী ৪০ টির অধিক প্রমাণ আমার নিকট বিদ্যমান রয়েছে। যেগুলো আমি অন্যত্র বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। এই স্থলে এই ভ্রান্ত মতবাদ বাতিল করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, যদি তা মেনে নেয়া হয়, তবে নবী-রাসূল এবং তাঁদের শত্রু (কাফির, মুশরিক, ফিরআউন, হামান) সবার মর্যাদা এক হয়ে যাবে। এর চেয়ে নিরর্থক ও বাতিল ব্যাপার আর কি হতে পারে যে, বাইতুল হারামের স্থান অন্য সব স্থানের সমান। হাজরে আসওয়াদের টুকরা ভূপৃষ্ঠের অন্য পাথরের ন্যায় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান সত্তা অন্যান্য মানুষের সমান হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ রয়েছে। الله اعلم حيث يجعل رسالته -আল্লাহ তা'আলা জানেন, তিনি কাকে রিসালত দান করবেন। অর্থাৎ, প্রতিটি ব্যক্তি রিসালত বহনের যোগ্যতা রাখে না বরং যদিও নবুওয়ত আল্লাহর দানকৃত বিষয়, অর্জিত বিষয় নয়, তা সত্ত্বেও এর যোগ্যতার জন্য কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন। যেগুলোতে নবুওয়ত ও রিসালত আসতে পারে এবং এগুলো ছাড়া এ বিষয়টি সত্য হতে পারে না। বস্তুতঃ এসব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। তিনিই জানেন, এসব বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় কার মধ্যে ঘটেছে। এজন্যই ইরশাদ করেছেন–

اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلاً وَّمِنَ النَّاسِ

আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম র. কোন স্থান, কালের শ্রেষ্ঠত্ব সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন এবং তত্ত্বজ্ঞানীদের মত বিস্তারিতভাবে প্রমাণাদির আলোকে সাব্যস্ত করেছেন। অবশেষে কালামশাস্ত্রবিদদের মত খন্ডন করতে গিয়ে বলেন– هو اعظم جناية جناها المتكلمون على الشريعة। –যাদুল মা'আদ ঃ ১/৪৭।

এ সব উক্তি কালামশাস্ত্রবিদগণ করেছেন। এগুলো তাদের অপরাধ। এ সব অপরাধমূলক কথাবার্তা উদ্ভাবন তারা করেছেন শরীয়তের উপর এবং এর দিকে তারা এটিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। অথচ শরীয়ত সম্পূর্ণরূপে এসব নিরর্থক ও বাজে কথাবার্তা থেকে মুক্ত। এ সব কালামশাস্ত্রবিদের নিকট কোন কোন সাধারণ বিষয়ে সাম্য ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ নেই। এই সাধারণ সমতা থেকে প্রকৃত সমতা কোন অবস্থাতেই প্রমাণিত হতে পারে না। ....। বরং রাত-দিনের প্রত্যক্ষ দর্শন এর পরিপন্থী। যেমন– যায়েদ, উমর, বকর আকার-আকৃতিতে, মানবতায়, খানাপিনায়, উঠা-বসায় একরকম। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা সবাই না এক, না একরকম। অনেক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। এটি নিশ্চিতরূপে স্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলাই তাওফীকদাতা। –জামি'উদ দিরারী –যাদুল মা'আদ, বড় প্যারা ঃ পৃষ্ঠা ৬-১৪।

আল্লামা ইবনে কাসীর র. বলেন–

انزل اشرف الكتب باشرف اللغات على اشرف الرسل بسفارة اشرف الملائكة وكان ذالك فى اشرف بقاع الارض وابتداء انزاله فى اشرف شهور السنة وهو رمضان فكمل من كل الوجوه.

فيدارسه القران হযরত জিবরাঈল আ. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কুরআন দাওর করতেন। يدارس শব্দটি فعل مضارع এর সীগা। مدارسة باب مفاعلة থেকে উদ্ভূত। যেটি উভয় পক্ষ থেকে কোন কাজ হওয়া বুঝায়। এখানে উদ্দেশ্য দাওর করা। এই مدارسة থেকে বুঝা যায়, কালামে ইলাহীর সাথে এই বরকতময় মাসের বিশেষ সম্পর্ক আছে। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলার সমস্ত কিতাব এই বরকতময় মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। পূর্ণ কুরআন মজীদ লাওহে মাহফূজ থেকে পৃথিবীর আকাশে এ মাসে শবে কদরে অবতীর্ণ হয়েছে এবং বাইতুল ইয্‌যতে সংরক্ষন করা হয়েছে। বস্তুতঃ বাইতুল ইয্‌যত হল দুনিয়ার আকাশের একটি স্থানের নাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ওহীয়ে কুরআনের সূচনা হয় ১৭ই রমযান, সোমবার দিন। অতঃপর প্রয়োজন মাফিক অল্প অল্প করে ২৩ বছরের জীবনে অবতীর্ণ হয়। তাছাড়া হযরত ইবরাহীম আ.-এর সহীফাগুলো অবতীর্ণ হয় পহেলা রমযানে। হযরত মূসা আ.কে তাওরাত দান করা হয় রমযানের ৬তারিখে। হযরত ঈস আ. কে ইঞ্জিল প্রদান করা ১৩ই রমযানে। হযরত দাউদ আ. যাবূর লাভ করেন ১৮ই রমযানে।

فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে কল্যাণ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে প্রবাহিত হাওয়া অপেক্ষাও অধিক দানবীর ছিলেন।

এর কারণ ছিল, এক তো রমযানুল মুবারক সমস্ত মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আগন্তুক জিবরাঈল আ. ফিরিশতাদের নেতা। যে জিনিস নিয়ে আসতেন, সেটি সমস্ত আসমানী কিতাবের মধ্যে শেষ্ঠ। যার কাছে

নিয়ে এসেছেন, তিনি সাইয়্যেদুল মুরসালীন ও সৃষ্টির সেরা। যেহেতু এসব শরাফত ও মর্যাদা সব একত্রিত হয়েছে, সেহেতু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানশীলতার সিফতের সমুদ্রে ঢেউ আসা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উলূম ও মা'রিফাতের অকূল সমূদ্র উথলে উঠা স্পষ্ট।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল

হেরা গুহা সংক্রান্ত হাদীসে (অর্থাৎ অনুচ্ছেদের তৃতীয় রেওয়ায়াতে) স্থানগত সূচনার উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ, ওহীর সূচনাস্থলের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ হাদীসে কালগত সূচনার বিবরণ রয়েছে। অর্থাৎ, সর্বপ্রথম ওহী অবতরনের সূচনা রমাযানুল মুবারকে হয়েছে। যেমন– ইরশাদে বারী রয়েছে-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنَ.

٦. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّأْمِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا ، فَقَالَ أَدْنُوهُ مِنِّي وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ.

ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ، قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ قُلْتُ لَا، قَالَ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ ، فَقُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ ، قَالَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ بَلْ يَزِيدُونَ ، قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ لَا، قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ لَا ، قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ ، قُلْتُ لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا،

قَالَ وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ ، قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قُلْتُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ ، يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ ، قَالَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ ، فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ

فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا،

قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا ، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ ، فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ.

وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ ، فَذَكَرْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ ، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ ، لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ ، فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقْلَ فَقَرَأَهُ،

فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ وَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ وَارْتَفَعَتْ الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ وَكَانَ ابْنُ النَّاظُورِ صَاحِبُ إِيلِيَاءَ وَهِرَقْلَ سُقُفًّا عَلَى نَصَارَى الشَّأْمِ يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِيَاءَ أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيثَ النَّفْسِ فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ قَدْ اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ.

قَالَ ابْنُ النَّاطُورِ وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ قَالُوا لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا الْيَهُودُ فَلَا يُهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ وَاكْتُبْ إِلَى مَدَايِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنْ الْيَهُودِ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُوَ أَمْ لَا فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ وَسَأَلَهُ عَنْ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَخْتَتِنُونَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَى صَاحِبٍ لَهُ بِرُومِيَةَ وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَى حِمْصَ فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأْيَ هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ نَبِيٌّ فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَغُلِّقَتْ ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الرُّومِ! هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ فَلَمَّا رَأَى هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ وَأَيِسَ مِنْ الْإِيمَانِ قَالَ رُدُّوهُمْ عَلَيَّ وَقَالَ إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفًا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَيُونُسُ وَمَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ.

৬. আবুল ইয়ামান হাকাম ইবনে নাফি' র. .... হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ সুফিয়ান ইবনে হরব রা. তাকে বলেছেন, সম্রাট হিরাক্লিয়াস একবার তাঁর কাছে লোক পাঠালেন। তিনি কুরাইশদের কাফেলায় তখন ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়ায় ছিলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ান ও কুরাইশদের সাথে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধিবদ্ধ ছিলেন। আবূ সুফিয়ান তার সঙ্গীদের সহ হিরাক্লিয়াসের কাছে এলেন এবং তখন হিরাকল জেরুজালেমে অবস্থান করছিলেন। হিরাক্লিয়াস তাদেরকে তাঁর দরবারে ডাকলেন। তাঁর পাশে তখন রোমের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। এরপর তাদের কাছে ডেকে নিলেন এবং দোভাষীকে ডাকলেন। তারপর দোভাষীর মাধ্যমে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আরবগণ! এই যে ব্যক্তি নিজকে নবী বলে দাবী করেন– তোমাদের মধ্যে বংশের দিক দিয়ে তাঁর সবচেয়ে নিকটাত্মীয় কে'?

আবূ সুফিয়ান বললেন, 'আমি বললাম, বংশের দিক দিয়ে আমিই তাঁর নিকটাত্মীয়।' হিরাক্লিয়াস বললেন, 'তাঁকে আমার খুব কাছে নিয়ে এস এবং তাঁর সঙ্গীদেরও কাছে এসে পেছনে বসিয়ে দাও।' এরপর তাঁর দোভাষীকে বললেন, 'তাদের বলে দাও, আমি আবু সুফিয়ানের কাছে সে ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করব, সে যদি আমার কাছে মিথ্যা বলে, তবে সাথে সাথে তোমরা তাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রকাশ করবে।'

আবূ সুফিয়ান বলেন, 'আল্লাহর কসম! তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করবে-এ লজ্জা যদি আমার না থাকত, তবে অবশ্যই আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম।' এরপর তিনি

তাঁর সম্পর্কে আমাকে প্রথম যে প্রশ্ন করেন তা হচ্ছে, 'তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশমর্যাদা কেমন?' আবু সুফিয়ান বললেন, 'তিনি আমাদের মধ্যে অতি অভিজাত বংশের।'

তিনি বললেন, তাঁর পিতা-প্রপিতাদের মধ্যে কি কেউ বাদশাহ ছিলেন?' আমি বললাম, 'না।' তিনি বললেন, 'সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর অনুসরণ করে, না সাধারণ লোকেরা?' আমি বললাম, 'কমজোর সাধারণ লোকেরা।' তিনি বললেন, 'তারা কি সংখ্যায় বাড়ছে, না কমছে?' আমি বললাম, 'তারা বেড়েই চলেছে।' তিনি বললেন, 'তাঁর দীন গ্রহণ করার পর কেউ কি অসন্তুষ্ট হয়ে তা পরিত্যাগ করে?' আমি বললাম, 'না।' তিনি বললেন, 'নবূয়তের দাবীর আগে তোমরা কি কখনো তাঁকে মিথ্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছ?' আমি বললাম, 'না।'

তিনি বললেন, 'তিনি কি চুক্তি ভঙ্গ করেন?' আমি বললাম, 'না। অবশ্য আমরা তাঁর সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সময়ের চুক্তিতে আবদ্ধ আছি। জানি না, এতে তিনি কি করবেন অর্থাৎ, চুক্তির উপর অটল থাকেন কি না।' আবূ সুফিয়ান বলেন, 'এ কথাটুকু ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে আর কোন গলদমিশ্রিত কথা সংযোজনের সুযোগই আমি পাইনি।' তিনি বললেন, 'তোমরা কি তাঁর সাথে কখনো যুদ্ধ করেছ?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

তিনি বললেন, 'তাঁর সাথে তোমাদের যুদ্ধ কেমন হয়েছে?' আমি বললাম, 'তাঁর ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল কুপের বালতির ন্যায়।' কখনো তাঁর পক্ষে যায়, আবার কখনো আমাদের পক্ষে আসে।' অর্থাৎ, কখনো তিনি বিজয়ী হন, কখনো আমরা। তিনি বললেন, 'তিনি তোমাদের কিসের আদেশ দেন?' আমি বললাম, 'তিনি বলেন ঃ তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুর অংশীদার করো না এবং তোমাদের পিতা-প্রপিতার (শিরকের) ভ্রান্ত মতবাদ ত্যাগ কর। আর তিনি আমাদের সালাত আদায় করার, সত্য কথা বলার, নিষ্কলুষ থাকার এবং আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করার-সুসম্পর্ক রাখার আদেশ দেন।'

তারপর তিনি দোভাষীকে বললেন, 'তুমি তাকে তথা আবু সুফিয়ানকে বল, আমি তোমার নিকট তাঁর বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তুমি তার উত্তরে উল্লেখ করেছ, তিনি তোমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশের। প্রকৃতপক্ষে রাসূলগণকে তাঁদের কওমের উচ্চ বংশেই প্রেরণ করা হয়ে থাকে। তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, এ কথা তোমাদের মধ্যে ইতোপূর্বে আর কেউ বলেছে কিনা? তুমি বলেছ, 'না।' তাই আমি (মনে মনে) বলছি, আগে যদি কেউ এ কথা বলে থাকত, তবে অবশ্যই আমি মনে করতে পারতাম, এ এমন এক ব্যক্তি, যে তাঁর পূর্বসূরীর কথারই অনুসরণ করছে মাত্র।

আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে কোন সম্রাট ছিলেন কি না? তুমি তার উত্তরে বলেছ, 'না।' তাই আমি বলছি যে, তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে যদি কোন সম্রাট থাকতেন, তবে আমি (মনে মনে) বলতাম, ইনি এমন এক ব্যক্তি যে, নবুওয়াতের বাহানায় তাঁর পিতা-প্রপিতার রাজত্ব ফিরে পেতে চান। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি- এর আগে কখনো তোমরা তাঁকে মিথ্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছ কি না? তুমি বলেছ, 'না।' এতে আমি বুঝলাম, এমনটি হতে পারে না যে, কেউ মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা ত্যাগ করবে অথচ আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলবে যে, আল্লাহর রাসূল। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, সম্ভ্রান্ত লোক তাঁর অনুসরণ করে, না সাধারণ লোক? তুমি বলেছ, সাধারণ মানুষই তাঁর অনুসরণ করে। আর বাস্তবেও এরাই হয় রাসূলগণের অনুসারী। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তারা সংখ্যায় বাড়ছে না কমছে? তুমি বলেছ, বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে ঈমানে পূর্ণতা লাভ করা পর্যন্ত এ রকমই হয়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তাঁর দীনে প্রবেশের পর তাঁকে খারাপ মনে করে অসন্তুষ্ট হয়ে কেউ কি তা ত্যাগ করে? তুমি বলেছ, 'না।' ঈমানের স্নিগ্ধতা অন্তরের সাথে মিশে গেলে ঈমান এরূপই হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি চুক্তি ভঙ্গ করেন কিনা? তুমি বলেছ, 'না'। প্রকৃতপক্ষে রাসূলগণ এরূপই, চুক্তি ভঙ্গ ও প্রতারণা করেন না।

আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি তোমাদের কিসের নির্দেশ দেন। তুমি বলেছ. তিনি বলেছেন, আল্লাহর ইবাদত করতে, তিনি তোমাদের নিষেধ করেন প্রতিমাপূজা করতে, আর তোমাদের আদেশ করেন সালাত আদায় করতে, সত্য কথা বলতে ও কলুষমুক্ত থাকতে। অতএব, তুমি যা বলেছ তা যদি সত্য হয়, তবে শীঘ্রই তিনি আমার এ দু'পায়ের নীচের জায়গার মালিক হবেন। অর্থাৎ, মুলকে শামেরও তিনি শাসক হবেন। আমি নিশ্চিত জানতাম, তাঁর আবির্ভাব হবে; কিন্তু তিনি যে তোমাদের মধ্য থেকে হবেন, এ কথা ভাবিনি। যদি নিশ্চিত জানতাম, আমি তাঁর কাছে পৌঁছতে পারব, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য আমি যে কোন কষ্ট স্বীকার করতাম। আর আমি যদি তাঁর কাছে থাকতাম তবে অবশ্যই তাঁর পা দু'খানা ধুয়ে দিতাম। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেই পত্রখানি আনতে বললেন, যা তিনি দিহয়াতুল কালবীর মাধ্যমে ছয় হিজরীতে বুসরার শাসক হারিস ইবনে শিমর গাস্সানীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। বুসরার শাসক সে চিঠি হিরাক্লিয়াসকে দেন। হিরাক্লিয়াস তা পাঠ করলেন। তাতে লেখা ছিল-

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে)। আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাকল-এর প্রতি। –শান্তি (বর্ষিত হোক) তার প্রতি, যে হেদায়াতের অনুসরণ করে। তারপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। (لا إله إلا الله-এর দিকে আহবান করছি।) ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদে থাকবেন (দুনিয়াতে ও আখিরাতে)। আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরুস্কার দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে সব প্রজার পাপই আপনার উপর বর্তাবে। হে আহলে কিতাব! এসো সে কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর সাথে শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ্ ব্যতীত রব রূপে গ্রহণ না করি। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তথা ঈমান ও তাওহীদের দাওয়াত না মানে, তবে হে মুসলমানরা তোমরা বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম' (৩ ঃ ৬৪)।

আবূ সুফিয়ান বলেন, 'হিরাক্লিয়াস যখন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন এবং পত্র পাঠও শেষ করলেন, তখন সেখানে শোর-হাঙ্গামা পড়ে গেল, চীৎকার ও হৈ-হল্লা তুঙ্গে উঠল এবং আমাদের বের করে দেয়া হল। আমাদের বের করে দিলে আমি আমার সঙ্গীদের বললাম, আবূ কাবশার ছেলের বিষয় তো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, বনূ আসফার (রোম-শাম)-এর সম্রাটও তাকে ভয় পাচ্ছেন! তখন থেকে আমি (আবু সুফিয়ান) বিশ্বাস করতে লাগলাম, তিনি শীঘ্রই জয়ী হবেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দান করলেন।

(ইমাম যুহরী র. বলেন) ইবনে নাতূর ছিলেন জেরুজালেমের শাসনকর্তা এবং হিরাক্লিয়াসের বন্ধু ও সিরিয়ার খৃষ্টানদের লাট পাদ্রী। তিনি বলেন, 'হিরাকল যখন জেরুজালেম (বাইতুল মুকাদ্দাস) আসেন, তখন একদিন তাঁকে অত্যন্ত বিমর্ষ-উদাস দেখাচ্ছিল। তাঁর একজন বিশিষ্ট সহচর বলল, 'আমরা আপনার চেহারা আজ বিবর্ণ দেখতে পাচ্ছি'। ইবনে নাতূর বলেন, হিরাকল ছিলেন জ্যোতিষী, জ্যোতির্বিদায় তাঁর দক্ষতা ছিল। তারা জিজ্ঞেস করলে তিনি তাদের বললেন, 'আজ রাতে আমি তারকারাজির দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, খতনাকারীদের সম্রাট আবির্ভূত হয়েছেন। আচ্ছা বলতো, বর্তমান যুগে কোন্ জাতি খতনা করে'? তারা বলল, 'ইয়াহূদী ছাড়া কেউ খতনা করে না। কিন্তু তাদের ব্যাপার যেন আপনাকে মোটেই চিন্তিত না করে। অর্থাৎ, এসব ইয়াহুদীর কারণে আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার রাজ্যের শহরগুলোতে লিখে পাঠান, তারা যেন সেখানকার সকল ইয়াহূদীকে হত্যা করে ফেলে।' তারা যখন এ ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত ছিল, তখন হিরাকলের কাছে এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হল, যাকে গাস্সানের শাসনকর্তা পাঠিয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্পর্কে খবর দিচ্ছিলেন।

হিরাক্লিয়াস তার কাছ থেকে খবর জেনে নিয়ে (খাদেমদেরকে) বললেন, 'তোমরা একে নিয়ে গিয়ে দেখ, তার খতনা হয়েছে কি-না।' তারা তাকে নিয়ে দেখে এসে সংবাদ দিল, তার খতনা হয়েছে। হিরাকল তাকে আরবদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে উত্তর দিল, 'তারা খতনা করে।' তারপর হিরাক্লিয়াস তাদের বললেন, 'ইনিই [রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এ উম্মতের সম্রাট। তিনি আবির্ভূত হয়েছেন।' এরপর হিরাক্লিয়াস রোমে তাঁর বন্ধু (যাগাতির)-এর কাছে লিখলেন। তিনি জ্ঞানে তাঁর সমকক্ষ ছিলেন। পরে হিরাক্লিয়াস হিমস চলে গেলেন। হিমসে থাকতেই তাঁর কাছে তাঁর বন্ধুর চিঠি এল, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাব এবং তিনিই যে প্রকৃত নবী, এ ব্যাপারে হিরাক্লিয়াসের মতের সমর্থন করছিল। তারপর হিরাক্লিয়াস তাঁর হিমসের প্রাসাদে রোমের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের ডাকলেন এবং প্রাসাদের সব দরজা বন্ধ করে দেয়ার হুকুম দিলেন। দরজা বন্ধ করা হল। তারপর তিনি সামনে এসে বললেন, 'হে রোমবাসী! তোমরা কি কল্যাণ, হেদায়াত এবং তোমাদের রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব চাও? তাহলে এই নবীর বায়'আত গ্রহণ করো।' এ কথা শুনে তারা জংলী গাধার মত উর্ধ্বশ্বাসে দরজার দিকে ছুটল, কিন্তু তারা তা বন্ধ অবস্থায় পেল।

হিরাক্লিয়াস যখন তাদের অনীহা লক্ষ্য করলেন এবং তাদের ঈমান থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন বললেন, 'ওদের আমার কাছে ফিরিয়ে আন।' তিনি বললেন, 'আমি একটু আগে যে কথা বলেছি, তা দিয়ে তোমরা তোমাদের দীনের উপর কতটুকু অটল, কেবল তার পরীক্ষা করেছিলাম। এখন আমি তা দেখে নিলাম।' একথা শুনে তারা তাঁকে সিজদা করল এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হল। এই ছিল হিরাক্লিয়াস-এর শেষ অবস্থা।

আবূ 'আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী র.] বলেন, সালিহ ইবনে কায়সান র. ইউনুস র. ও মা'মার র. এ হাদীসটি যুহরী র. থেকে রেওয়ায়াত করেছেন।

হাদীসটির পূনরাবৃত্তি

এটিকে বলে হাদীসে হিরাক্‌ল। ইমাম বুখারী র. সহীহ বুখারীতে এ হাদীসটি ১৪ জায়গায় উল্লেখ করেছেন। তিনটি স্থানে সবিস্তারে আর ১১টি স্থানে সংক্ষেপে, খণ্ডিত আকারে। সবিস্তারে ১. এই কিতাবুল ওহীর শেষ হাদীস ৪র্থ পৃষ্ঠা থেকে ৫ম পৃষ্ঠা পর্যন্ত। ২. কিতাবুল জিহাদ পৃষ্ঠা ৪১২-৪১৩। ৩. কিতাবুত তাফসীর পৃষ্ঠা ৬৫৩-৬৫৪।

সংক্ষেপে- ৪. কিতাবুল ঈমান, পৃষ্ঠা ১৩। ৫. পৃষ্ঠা ৩৬৮। ৬. পৃষ্ঠা ৩৯৩। ৭. পৃষ্ঠা ৪১১। ৮. পৃষ্ঠা ৪১৮। ৯. পৃষ্ঠা ৪৫০। ১০. পৃষ্ঠা ৮৮৪। ১১. পৃষ্ঠা ৯২৬। ১২. পৃষ্ঠা ১০৬৮। ১৩. পৃষ্ঠা ১০৭৮। ১৪. পৃষ্ঠা ১১২৫।

আল্লামা আইনী র. বলেন-

قال الكرماني قد ذكر البخاري حديث هرقل في كتابه في عشرة مواضع قلت ذكره في أربعة عشر موضعاً الخ . عمدة ١/٨٤.

ইমাম মুসলিম র. মাগাযীতে পাঁচজন উস্তাদ থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদ র. আদবে, তিরমিযী ইস্তিযানে, নাসাঈ তাফসীরে উল্লেখ করেছেন। ইবনে মাজাহ র. এ হাদীসটি বর্ণনা করেননি। -উমদাহ ঃ ১/৮৪।

রাবীদের বিবরণ

এই হাদীসে রাবী ছয়জন।

১. আবুল ইয়ামান

ইয়া এর উপর যবর। মীম তাশদীদশূন্য। নাম হাকাম। হা এর উপর যবর, কাফ এর উপরও যবর। -উমদাহ। আবুল ইয়ামান উপনাম। নাম হাকাম ইবনে নাফি'। তবে প্রসিদ্ধ হলেন উপনামে। সিহাহ সিত্তায় তিনি ছাড়া হাকাম ইবনে নাফি' নামে অন্য কোন রাবী নেই। তাঁর জন্ম ১৩৮হিজরীতে। ওফাত হয়েছে ৮৩ বছর বয়সে ২২১ বা ২২২ হিজরীতে হিমস নামক স্থানে।

২. শুআইব

তিনি হলেন শুআইব ইবনে আবু হামযা। তাঁর পিতার নাম দীনার। ৭০ বছরেরও বেশি বয়সে ১৬৬ বা ১৬৩ হিজরীতে তিনি ওফাত লাভ করেন। সিহাহ সিত্তায় তিনি ছাড়া শুআইব ইবনে দীনার নামক অন্য কোন রাবী নেই। -উমদাহ।

৩. যুহরী

এই অনুচ্ছেদের তৃতীয় হাদীস দ্রষ্টব্য।

৪. উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ

সুমহান তাবিঈ। তাঁর জীবনীর জন্য পূর্ববর্তী ৫ম হাদীস দ্রষ্টব্য।

৫. আবু সুফিয়ান ইবনে হারব

তাঁর নাম সাখ্র ইবনে হার্ব। উপনাম আবু সুফিয়ান ও আবু হানজালা। আবু সুফিয়ান উপনামে প্রসিদ্ধ। বুখারী শরীফে عن أبي سفيان সনদে এছাড়া অন্য কোন রেওয়ায়াত নেই। তাছাড়া সহীহ বুখারী, মুসলিম, সুনানে আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈতে এ ছাড়া আবু সুফিয়ান রা.-এর অন্য কোন রেওয়ায়াত নেই। আর এই রেওয়ায়াতটি আবূ সুফিয়ান রা. থেকে হযরত ইবনে আব্বাস রা. ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেননি।

ব্যাখ্যা ঃ হিরাক্লিয়াস সংক্রান্ত হাদীসের ব্যাখ্যার পূর্বে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা আবশ্যক মনে হয়। যদ্বারা ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত হিরাক্লিয়াসের পরিচিতি লাভ হয়। তার, আবু সুফিয়ান ও হযরত দিহইয়ায়ে কালবী রা.-এর একত্রে বাইতুল মুকাদ্দাসে সমবেত হওয়ার রাজ ফাঁস হয়ে যায়। তাছাড়া এই সুদীর্ঘ হাদীসে যে ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, তা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হবে, যাতে হাদীস বুঝতে সহজ হয়।

অধম নাসরুল বারী শরহে বুখারী, কিতাবুত তাফসীরে ১১৫ পৃষ্ঠায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, بدء الوحی তে হিরাক্লিয়াসের হাদীসের পূর্ণাঙ্গ বিস্তারিত বিবরণ আসবে। এ জন্য এখানে সবিস্তারে আলোচনা করতে চাই। وعلى الله التوكل وهو المستعان।

যে সময় সারওয়ারে কায়েনাত, খাতামুল আম্বিয়া ওয়ালমুরসালীন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ধুলির ধরায় আগমন করেন (অর্থাৎ, সোমবার ৮ই রবিউল আউয়াল ৫৭০ খৃষ্টাব্দে), তখন পৃথিবীতে বড় বড় দু'টি হুকুমত ছিল। একটি রোমের। যার সম্রাটকে বলা হত কায়সার। তার নাম হিরাক্ল (প্রসিদ্ধ হিরাক্লিয়াস)। অপরটি হল, পারস্য। যেটাকে ইরান বলে। পারস্য সম্রাটকে বলা হত কিসরা। তৎকালীন যুগে এ দু'টি সাম্রাজ্যই অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। রোমবাসী ছিল খৃষ্টান আহলে কিতাব। পারস্যবাসী ছিল অগ্নি উপাসক (মজুসী)। এ দু'টি রাজত্বে দীর্ঘ দিন থেকে পারস্পরিক সংঘর্ষ চলে আসছিল। মক্কাবাসীদের নিকট রোম, পারস্যের যুদ্ধ সম্পর্কে খবরাখবর অব্যহতভাবে পৌঁছত। এরই মধ্যে যখন ৬১০ খৃষ্টাব্দে সারওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী রূপে প্রেরিত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের দাবী ও ইসলামী আন্দোলন মক্কাবাসীদের জন্য রোম, পারস্যের যুদ্ধ সংবাদগুলো এক বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করল। পারস্যের অগ্নি উপাসক মজুসীদেরকে মক্কার মুশরিকরা

ধর্মীয়ভাবে নিজেদের নিকটবর্তী মনে করত। রোমের খৃষ্টানরা ছিল আহলে কিতাব। এ কারণে তাদেরকে মুসলমানদের নিকটবর্তী সাব্যস্ত করা হত। এ জন্য পারস্যের বিজয় সংবাদ যখন এল, তখন মক্কার পৌত্তলিকরা আনন্দিত হল। এতে মুসলমানদের মুকাবিলায় নিজেদের বিজয়ের শুভলক্ষন মনে করত। বিভিন্ন প্রকার আনন্দদায়ক আশা বুকে বাধত। মুসলমানদেরও স্বভাবতঃ এর ফলে মনকষ্ট হত যে, খৃষ্টান আহলে কিতাবরা অগ্নি উপাসক মজুসীদের হাতে পরাজিত হবে! তখন তাদেরকে মক্কার কাফিরদের আনন্দেরও লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে হত। অবশেষে ৬১৪হিজরীর পর যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের ৪৫ বছর হয় চান্দ্র হিসেবে এবং নবুওয়তের পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়, তখন পারস্যবাসী খসরু পারভেজের যুগে রোমকে নেহায়েত জবরদস্ত সিদ্ধান্তমূলক পরাজয় দান করে, তখন শাম, মিসর এবং ক্ষুদ্র এশিয়া ইত্যাদি সবরাষ্ট্র রোমীদের হাত থেকে বেরিয়ে যায়।

ইরানী সৈন্যরা রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে কুসতুনতুনিয়ায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। রোমীদের রাজধানীও আশংকাজনক অবস্থায় নিপতিত হয়। বড় বড় পাদ্রীকে হত্যা বা গ্রেফতার করা হয়। বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে খৃষ্টানদের সবচেয়ে পবিত্র ক্রশও ইরানী বিজেতারা লুট করে নিয়ে যায়। রোম সম্রাটের ক্ষমতা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। বাহ্যিক আসবাব-উপকরণের দিকে লক্ষ্য করলে রোমের পুনরায় উত্থান এবং পারস্যের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসার কোন পন্থা অবশিষ্ট থাকেনি।

এসব পরিস্থিতি দেখে মক্কার পৌত্তলিকরা খুব আনন্দ উৎযাপন করল। মুসলমানদের গালিগালাজ ও কষ্ট দিতে আরম্ভ করল। খুব সাহস ও আশা বাড়তে লাগল। এমনকি কোন কোন পৌত্তলিক হযরত সিদ্দীকে আকবর রা.কে বলল, আজকে আমাদের ভাই ইরানীরা তোমাদের ভাই রোমীদেরকে মিটিয়ে দিয়েছে। কালকে আমরাও অনুরূপ (তোমাদেরকে) মিটিয়ে দেব। তখন কুরআন মজীদ বাহ্যিক আসবাব-উপকরণের ধারা পরিপন্থী সাধারণ ঘোষণা করে দেয়–

الم . غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِيْ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ (سورة روم)

'রোমীরা পরাস্ত হয়েছে নিকটতম ভূমিতে (আযরা'আত ও বুসরার মধ্যবর্তী অঞ্চল, যেটি শাম সীমান্তে হিজাজের সাথে মিলিত) এবং এ পরাজয়ের পর শীঘ্রই তারা বিজয় লাভ করবে, কয়েক বছরে (নয় বছরে)।

কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী, সিদ্দীকে আকবর রা.এর ঈমানী দুঃসাহস

এই ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তিতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. কোন কোন পৌত্তলিকের সাথে শর্ত আরোপ করলেন (বাজি ধরলেন। তখন বাজি ধরা ও এরূপ শর্তারোপ করা হারাম ছিল না) যে, এত বছরের মধ্যে যদি রোমীরা বিজয়ী না হয়, তাহলে তোমাদেরকে আমি এক শত উট দেব। অন্যথায়, সমপরিমাণ উট তোমাদের কাছ থেকে নেব। এদিকে এই চুক্তি হচ্ছিল, অপর দিকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস এসব নৈরাশ্যকর পরিস্থিতি থেকে সম্পূর্ণ নির্ভয় হয়ে এবং আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা করে পূর্ণ সাহসিকতার সাথে হৃত ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও কৌশল অবলম্বনে তৎপর হয়। হিরাক্লিয়াস মান্নত মানল, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে পারস্যের উপর বিজয় দেন, তবে আমি হিম্‌স (শামের প্রসিদ্ধ ও বড় শহর) থেকে পায়ে হেটে ঈলিয়া তথা বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছব। (কারণ, বাইতুল মুকাদ্দাস তাদের কিবলা ছিল, যেরূপ বাইতুল্লাহ আমাদের কিবলা।)

রোমের বিজয় ও পারস্যের পরাজয়

কুরআনে হাকীমের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঠিক নয় বছরের মধ্যে হিজরতের এক বছর পর দ্বিতীয় হিজরীতে হুবহু বদরযুদ্ধের দিন যখন মুসলমানরা আল্লাহর মেহেরবাণীতে পৌত্তলিকদের উপর সুস্পষ্ট বিজয়

উদযাপন করছিলেন, তখন রোমীদের বিজয় সংবাদ শুনে আরো বেশি আনন্দিত ও প্রফুল্ল হন। কারণ, রোম সম্রাট আহলে কিতাবকে আল্লাহ তা'আলা ইরানী অগ্নি উপাসকদের উপর বিজয় দান করেছেন। এ সংবাদে (বদর যুদ্ধে) মুশরিকদের নিজেদের পরাজয়ের সাথে সাথে ইরানের পরাজয়েরও যিল্লতি নসীব হল।

বাহ্যিক আসবাব-উপকরণের সম্পূর্ণ পরিপন্থী কুরআন মজীদের এই বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী প্রত্যক্ষ করে অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. একশত উট মক্কার পৌত্তলিকদের কাছ থেকে উসূল করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ অনুযায়ী এগুলো সদকা করে দেয়া হয়।

দিহ্ইয়া, আবু সুফিয়ান ও হিরাক্লিয়াসের সমাবেশ

দ্বিতীয় হিজরীতে বদরযুদ্ধে যদিও মুসলমানদের শানদার বিজয় ও সুস্পষ্ট কামিয়াবী অর্জিত হয়, তা সত্ত্বেও যুদ্ধ ধারা অব্যাহত থাকে। দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধ, তৃতীয় হিজরীতে উহুদ যুদ্ধ, ৪র্থ হিজরীতে বদর সুগরা, ৫ম হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধ (যাকে গাযওয়ায়ে আহ্যাবও বলে) এবং গাযওয়ায়ে বনূ মুস্তালিক (যেটাকে গাযওয়ায়ে মুরাইসী'ও বলে।) এ জন্য একদিকে মুসলমানদের সফরে জটিলতা ছিল এবং ইসলামী দাওয়াতের চিঠি-পত্র তৎকালীন রাজা-বাদশাহদের নিকট প্রেরণও প্রায় অসম্ভব ছিল। অপর দিকে মক্কার কুরাইশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল শাম। যেখানে মদীনা তাইয়্যিবার নিকট দিয়ে যেতে হত। এজন্য কুরাইশেরও শাম অভিমুখে বাণিজ্যিক সফর বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ছয় হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধি হয়।

সতর্কবাণী ঃ

হুদায়বিয়ার সন্ধির বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য অধমের নাসরুল বারী শরহে বুখারী, কিতাবুল মাগাযী পৃষ্ঠা ২২০ থেকে ২৩০ পর্যন্ত দেখা যেতে পারে।

সারকথা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি স্বপ্ন দেখে ছয় হিজরীতে জ্বিলকদ মাসে প্রায় দেড় হাজার সাহাবীকে সাথে নিয়ে উমরার উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমা অভিমুখে রওয়ানা হন। মক্কা মুয়াজ্জমার সন্নিকটস্থ হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনী বসে পড়ে। কোনক্রমেই এটি আর উঠে না। সেখানে অনেক ঘটনা ঘটার পর মক্কার কিছু নেতা সন্ধির উদ্দেশ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয় এবং সন্ধিনামা লেখার সিদ্ধান্ত হয়। এ প্রসঙ্গে কোন কোন বিষয়ে বাদানুবাদ ও বহছ-বিতর্ক হয়। এর শর্তগুলো বাহ্যতঃ মুসলমানদের প্রতিকূল ছিল। মুসলমানদের ক্রোধ এল। উত্তেজনা সৃষ্টি হল যে, যুদ্ধ করেই বিয়ষটির মিমাংসা করে দেয়া হবে। কিন্তু অবশেষে রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীদের হটকারিতা অনুযায়ী সবকথাই মঞ্জুর করে নিলেন। সন্ধিনামা তৈরী হয়ে যায়। তাতে অনেক শর্ত পাস হয়ে যায়। এতে একটি শর্ত ছিল, উভয় পক্ষে ১০ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ হবে না।

এবার যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ হওয়ার কারণে উভয় পক্ষের সুযোগ এসে যায়। তারা নিজ নিজ কায়কারবার শুরু করে দেয়। আবু সুফিয়ান যুদ্ধের কারণে বন্ধ বাণিজ্যের দিকে মনোযোগী হয়। ৩০জনের একটি কাফেলা নিয়ে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সে শাম পৌঁছেন। এদিকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফুরসতকে গনীমত মনে করে বিভিন্ন রাজা-বাদশার নামে ইসলামী চিঠি-পত্র প্রেরণ করেন। রোম, পারস্য, হাবশা (আবিসিনিয়া), শাম এবং ইয়ামামার রাজা-বাদশাদের নিকট চিঠি-পত্র লেখা হয়।

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর ৬ষ্ঠ হিজরীর জ্বিলহজ্জ মাসের শেষ দিকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোম সম্রাটের নিকট হযরত দিহ্ইয়া কালবী রা. মারফত একটি চিঠি লিখেন। এই চিঠি নিয়ে হযরত দিহইয়া রা. মহর্‌রমের শুরুর দিকে ৭ম হিজরীতে পৌঁছেন। এই হাদীসে হিরাকলে সম্মানিত এ চিঠির উল্লেখ রয়েছে। হযরত দিহ্ইয়া রা. যখন সম্মানিত চিঠিটি নিয়ে যান, তখন হিরাক্লিয়াস তার মান্নত পূর্ণ করার জন্য বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছেন। কারণ, তিনি আগেই মান্নত মেনেছিলেন, পারস্য সম্রাটকে পরাস্ত করতে পারলে বাইতুল মুকাদ্দাস পায়ে হেটে যাবেন। হযরত দিহ্ইয়া রা. বুসরার আমীরের মাধ্যমে চিঠি মুবারক হিরাক্লিয়াসকে দেন। হিরাক্লিয়াস নির্দেশ দেন, এই নবীর নিকটাত্মীয়ের মধ্য থেকে যদি কেউ এখানে থাকে, তবে তাকে এখানে ডাকাও। আবু সুফিয়ান এবং তার সাথীসঙ্গীদেরকে হিরাক্লিয়াসের নিকট ডেকে পাঠানো হয়।

কুদরতে ইলাহীর কারিশমা, এভাবে হযরত দিহইয়া, আবু সুফিয়ান ও হিরাক্লিয়াস সবাই এক স্থানে সমবেত হয়ে যান। অতঃপর আবু সুফিয়ান ও হিরাক্লিয়াসের মাঝে যে (সংলাপের) ঘটনা ঘটে, তার বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে।

হাদীসে হিরাক্লের ব্যাখ্যা ঃ

ان ابا سفيان بن حرب এই রেওয়ায়াতটি আবু সুফিয়ান মুসলমান অবস্থায় বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনাটি তিনি শ্রবন ও গ্রহণ করেছেন কুফরী অবস্থায়।

ان هرقل অর্থাৎ, بان هرقل হা এর নিচে যের, রা এর উপর যবর। শব্দটি উজমা ও আলমিয়তের কারণে গাইরে মুনসারিফ।

অবশ্য এতে রা সাকিন ও কাফে যের তথা هِرْقِل ও বর্ণিত হয়েছে। তবে প্রথমটি প্রসিদ্ধতম। তার উপাধি ছিল কায়সার। –কাসতাল্লানী।

কায়সার উপাধির কারণ

قيصر শব্দটি قصر থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ তাদের ভাষায় কর্তন করা। রোমীদের উর্ধ্বতন প্রপিতাদের মধ্যে কারো অথবা স্বয়ং হিরাক্লিয়াসের জন্ম এভাবে হয়েছিল যে, তার মায়ের পেটে থাকা অবস্থাতেই তার মায়ের ইনতিকাল হয়ে যায়। শিশু জীবিত ছিল, একারণে মায়ের পেট চিরে তাকে বের করা হয়। সে শিশু জীবিত থাকে এবং পরবর্তীতে সম্রাট হয়। সে এর উপর গর্ব করত যে, যেরূপভাবে সাধারণ শিশুদের জন্ম স্বাভাবিক নিয়মে হয়ে থাকে এবং লজ্জাস্থান দিয়ে দুনিয়াতে আসে, এরূপভাবে আমার জন্ম হয়নি। এজন্য সে তার উপাধি রাখে কায়সার। এর পর থেকে রোমীদের সম্রাটের উপাধিই হয় কায়সার। (আইনী ইত্যাদি)

وهو اول من ضرب الدنانير الخ –কাসতাল্লানী। অর্থাৎ, হিরাক্লিয়াসই সর্বপ্রথম সম্রাট যিনি দীনার মুদ্রা আবিষ্কার করে চালু করেছেন। তিনি ৩১বছর রাজত্ব চালিয়েছেন। তার যুগেই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরকালের স্থায়ী নিবাসে ইনতিকাল করেন।

فى ركب শব্দটি راكب এর বহুবচন। যেমন– صاحب এর বহুবচন صحب এবং تاجر - تجر এর বহুবচন। আবু সুফিয়ানের সঙ্গী এ কাফেলার লোক সংখ্যা ছিল ৩০জন।

من قريش নযর ইবনে কিনানা ইবনে খুযাইমার সন্তানদেরকে কুরাইশ বলে।

مادّ فيها দাল এর উপর তাশদীদ باب مفاعلة থেকে। মূলতঃ ছিল مادد। اجتماع مثلين এর কারণে দালকে দালে ইদগাম করা হয়। আর এই ইদগাম হল আবশ্যকীয়। শব্দটি مدّت থেকে প্রতিপন্ন। এই শব্দটির প্রয়োগ

কালের প্রতিটি অংশের উপর হয়। কমের উপরও হয়, বেশির উপরও হয়। নিদর্শন দেখে তা ঠিক করতে হয়। অতঃপর باب مفاعلة- مشاركة এর জন্য হয়। এ জন্য ইবারতের সারমর্ম হবে اتفقوا على الصلح مدة من الزمان। অর্থাৎ, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু সুফিয়ান ও কুফ্ফারে কুরাইশ একটি সময়ের সন্ধির ব্যাপারে একমত হন। এতে হুদাইবিয়ার সন্ধির দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। যে সন্ধি হয়েছিল ৬হিজরীতে, জ্বিলকদ মাসে।

فاتوه وهم بايلياء যমীরে মনসূব হিরাকলের দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ,আবু সুফিয়ান তার সঙ্গীরা কায়সারের নিকট আসেন। তাদেরকে শামের একটি প্রসিদ্ধ শহর গাজা থেকে ডেকে পাঠানো হয়। বর্তমান কপিতে وهم যমীর দ্বারা উদ্দেশ্য হিরাক্লিয়াস এবং তার সাংসদবর্গ ও সাথী-সঙ্গী। কোন কোন কপিতে وهم এর পরিবর্তে وهو আছে। অর্থাৎ, হিরাকল।

بايليا এতে তিনটি লোগাত রয়েছে। প্রসিদ্ধতম হল হামযাতে যের, লামে যের, ইয়া সাকিন ও মদ সহকারে। -উমদাহ। অর্থাৎ, এতে প্রসিদ্ধতম লোগাত হল প্রথমত হামযায়ে মাকসূরা, এরপর ইয়া সাকিন, এরপর লামে মাকসূর, অতঃপর ইয়া, অতঃপর আলিফে মামদূদা। কিবরিয়া এর ওজনে। ঈলিয়া ইবরানী তথা হিবরু ভাষায় ايل তথা আল্লাহ এবং ياء তথা ঘর দ্বারা গঠিত। অর্থাৎ, বাইতুল মুকাদ্দাস।

فدعاهم فى مجلسه وحوله عظماء الروم - عظماء - عظيمة এর বহুবচন। রোমের মহান ব্যক্তিবর্গ দ্বারা উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় বড় বড় কর্মকর্তা, সামরিক কমান্ডার এবং জ্ঞানী লোকজন ও পাদ্রীগণ।

ثم دعاهم এতে বাহ্যতঃ পূণরাবৃত্তি মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এটা পূনরাবৃত্তি নয়। কারণ, সম্রাটদের রীতি প্রথমে দরবারে ডাকেন। অতঃপর আলোচনার জন্য কাছে ডাকেন। এজন্য ثم دعاهم বলেছেন। কারণ, ثم শব্দটি বিলম্ব বুঝায়।

ودعا ترجمانه তা এর উপর যবর, জীম এর উপর পেশ। –ফাত্‌হ।

আল্লামা নববী র. শরহে মুসলিমে এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। বস্তুতঃ তা এর উপর পেশ দেয়াও জায়েয আছে। তারজুমান সে ব্যক্তি হয়, যে একভাষার অনুবাদ অন্য ভাষায় করে (দোভাষী)। শব্দটি আরবীকৃত। যেহেতু আবু সুফিয়ান আরব ছিলেন এবং তার ভাষা ছিল আরবী, আর রোম সম্রাট প্রমূখ আরবী ভাষা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন না, সেহেতু দোভাষী ডাকিয়েছেন।

قوله انا اقربهم نسبا আবু সুফিয়ানের বংশ ৪র্থ সিড়িতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের সাথে মিলে যায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ হল– মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ। আবু সুফিয়ানের বংশ হল– আবু সুফিয়ান সাখ্‌র ইবনে হারব ইবনে উমাইয়্যা ইবনে আবদে শামস ইবনে আবদে মানাফ।

আবদে মানাফে গিয়ে উভয় ধারা মিলে যায়। আবদে মানাফের ছেলে ছিলেন চার জন– হাশিম, আবদুল মুত্তালিব, আবদে শামস, নাওফাল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাশিমের সন্তানদের অন্তর্ভূক্ত। আবু সুফিয়ান আবদে শামসের সন্তান। এরূপভাবে তিনি হলেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই। যেমন– বুখারী কিতাবুল জিহাদে ৪১২ পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে– হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন-

ماقرابتك منه؟ قلت هو ابن عمّى

আবু সুফিয়ান আরও বর্ণনা করেন যে, এই কাফেলায় আমি ছাড়া আবদে মানাফের আর কোন লোক ছিল না।

فاجعلوهم عند ظهره অর্থাৎ, আবু সুফিয়ানের পিছনে। আবু সুফিয়ানকে বংশীয় আত্মীয়তার কারণে আগে ডাকা হয়েছে। সাধারণ নিয়মও এটাই যে, আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবগতি লাভ হয়। কারণ, সর্বদা তার সাথে অবস্থান করতে হয়, লেনদেন ইত্যাদি অব্যহত থাকে। অন্যান্য সাথীদেরকে আবু সুফিয়ানের পিছনে বসানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে, যদি এ আবু সুফিয়ান কোন প্রশ্নের উত্তর ভুল বর্ণনা করেন, তবে তোমরা তৎক্ষনাৎ তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। এই মিথ্যা প্রতিপন্নতার নির্দেশের প্রয়োজন এই জন্য অনুভূত হল যে, শাহী দরবারে অনুমতি ছাড়া কথা বলা অপরাধ। এই জন্য সাধারণ অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, দেখ, আবু সুফিয়ান সামান্যতম অবাস্তব কথা বললে তৎক্ষণাৎ তোমরা সতর্ক করে দিবে। আবু সুফিয়ানের সাথীদেরকে পিছনে বসানোর এই হিকমত কার্যকর ছিল যে, যদি তারা সামনে থাকত, তাহলে চোখে চোখ মিললে মিথ্যা বললেও তা এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

فوالله لولا الحياء من ان ياثروا على الخ

আবু সুফিয়ান বলেন, আল্লাহর শপথ! যদি আমার এই লজ্জা ও আত্মমর্যাদাবোধ না হত যে, তারা এই মজলিস থেকে উঠার পর এই মিথ্যা লোকদের সামনে বর্ণনা করবে, তবে আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অবশ্যই মিথ্যা বিবরণ দিতাম। অর্থাৎ, আমার সাথীদের ব্যাপারে এতটুকু তো ভরসা আছে যে, এখানে কেউ আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে না। কিন্তু এই মিথ্যা এই মজলিস পর্যন্ত শেষ হয়ে যাবে না। বরং জাতির নিকট তা ফলাও করে প্রচার করা হবে। এটা আমার নেতৃত্বের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হবে।

দ্বিতীয় আশংকা এই ছিল যে, যদিও তখন কথা হিরাক্লিয়াসের নিকট পৌঁছবে না, কিন্তু আমাদের বাণিজ্যিক কেন্দ্র হল শাম। হতে পারে আরবে এর চর্চা হওয়ার পর হিরাক্লিয়াসও এ সম্পর্কে অবহিত হয়ে যাবেন। তখন প্রবেশ নিষেধ করবেন অথবা গ্রেফতার করে শাস্তি দিবেন।

قوله ثم كان اوّل ما سالنى عنه ان قال الخ

এ বাক্যটিতে ان قال শব্দটি كان এর ইস্‌ম এবং ماسالنى হল খবর। অতএব, প্রথমটি হবে মানসূখ।

হিরাক্লিয়াস ১০টি বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। এসব বিষয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রশ্ন হল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খান্দান কিরূপ?

قلت هو فينا ذونسب এখানে তানবীন তা'জীমার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি আমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক।

قط قبله তোয়া এর উপর তাশদীদযুক্ত পেশ, কাফ এর উপর যবর।

◆ এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, قط শব্দটি ماضى منفى কে তা'কিদের জন্য ব্যবহৃত হয়। অথচ এখানে বাক্যটি হল ইতিবাচক।

◆ এর একটি উত্তর হল– এই মূলনীতি অধিকাংশ সময়ের।

◆ দ্বিতীয় উত্তর হল– এখানে ইসতিফহাম রয়েছে। আর এটা নেতিবাচকের পর্যায়ভূক্ত হয়ে থাকে। আসল ইবারত হল-

هل قال هذا القول احد! و لم يقله احد قط (قس)

◆ হিরাক্লিয়াসের দ্বিতীয় প্রশ্ন হল– নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে এ খান্দানে কেউ নবুওয়তের দাবি করেছে কি না? আবু সুফিয়ান নেতিবাচক উত্তর দিলেন। অতঃপর হিরাক্লিয়াস প্রশ্ন করলেন,

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী অভিজাত লোকজন, না দুর্বল লোকজন? অর্থাৎ, প্রভাবশালী বড় লোকেরা তাঁর অনুসরণ করছেন, না দুর্বল লোকেরা? এর উত্তর আবু সুফিয়ান সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে দিয়েছেন। কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ণাঙ্গের পর্যায়ভূক্ত।

◆ **سخطة لدينه** এটা হল হিরাক্লিয়াসের ৬ষ্ঠ প্রশ্ন যে, তাদের কেউ ঈমান এনে এ দীন সম্পর্কে অসন্তুষ্ট হয়ে মুরতাদ হয়ে যায় কি না? আবু সুফিয়ান নেতিবাচক উত্তর দিলেন। এতে سخطه এর কয়েদ (বন্ধন) হিরাক্লিয়াসের জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং অভিজ্ঞতার প্রমাণ। কারণ, মুরতাদ হওয়ার বিভিন্ন কারণ হতে পারে– কোন কোন সময় ধনসম্পদের লোভে অথবা কোন ভয়ে কিংবা মহিলার প্রেমে পড়ে হতে পারে। যেমন– আবু সুফিয়ানের জামাতা উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহ্শ মুসলমান হয়েছিলেন। স্বীয় স্ত্রী হযতর উম্মে হাবীবা রা.এর সাথে হাবশা অভিমূখে হিজরতও করেন। কিন্তু এক খৃষ্টান রমনীর প্রেমে পরে মুরতাদ হয়ে যান। তা সত্বেও আবু সুফিয়ান বলেছেন– لا । কারণ, আবু সুফিয়ান জানতেন, এর কারণ দীন ইসলাম সম্পর্কে অসন্তোষ নয়, বরং রমনীর প্রেম ইত্যাদি।

فهل يغدر এ হল হিরাক্লিয়াসের ৮ম প্রশ্ন যে, তিনি কি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন? আমি বললাম, না। কিন্তু আবু সুফিয়ান বলেন- نحن منه في مدة لاندرى الخ। অর্থাৎ, আমাদের এবং তাদের মাঝে মেয়াদী একটি চুক্তি হয়েছে। জানি না, এতে তার কি কর্মপন্থা হয়?

কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে– আবু সুফিয়ান অতিরিক্ত এতটুকু কথা বলেছিলেন যে, এই সন্ধিচুক্তির পর আমরা তার মিত্রের বিরুদ্ধে নিজের মিত্রের সাহায্য করেছি। অর্থাৎ, তাঁর মিত্রের উপর জুলুম করেছি। এজন্য তাদের পক্ষ থেকে আমাদের আশংকা আছে। তখন হিরাক্লিয়াস বললেন– ان كنتم بدءتم فانتم اغدر অর্থাৎ, যেহেতু তোমাদের পক্ষ থেকেই চুক্তি ভঙ্গের সূচনা হয়েছে, সেহেতু তোমরাই তো গাদ্দার।

قال هل قاتلتموه হিরাক্লিয়াসের নবম প্রশ্ন হল– তোমরা কি কখনো তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ? এ ধরণের প্রশ্নও হিরাক্লিয়াসের বিজ্ঞতা এবং জ্ঞান প্রমাণ করে। কারণ, হিরাক্লিয়াস একথা বলেননি– هل قاتلكم । কারণ, আম্বিয়া আ. দাওয়াত ও তাবলীগ এবং সংশোধনের জন্য প্রেরিত হন। কখনো হত্যা ও লড়াইয়ের সূচনা নিজের পক্ষ থেকে করেন না। ১৩ বছরের মক্কী জীবন এর ন্যায়ানুগ সাক্ষী। মুলতঃ লড়াই তো অপারগতার পর্যায়ভূক্ত। সর্বশেষ কৌশল হল তলোয়ার।

উপমাস্বরূপ মনে করুন, যখন কারো দেহে ফোঁড়া উঠে, তখন সর্বপ্রথম চেষ্টা করা হয় জখম কোন রকমে যেন ভাল হয়ে যায়। অতঃপর চেষ্টা করে কোন রকমে এটি ফেটে রক্ত পূঁজ বেরিয়ে যায় কিনা। এটাও যদি না হয়, বরং আশংকা হয় যে, অপারেশন না করলে অন্য অঙ্গে এর প্রভাব পড়তে পারে তথা সংক্রমনের আশংকা রয়েছে, তখন তাতে ছুরি চালানো ও অপারেশন করা জরুরী হয়ে যায়। অপারেশন সফল হলে ডাক্তারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। এমনিভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনে সংশোধনের চেষ্টা করা হয়। অতঃপর বলা হয়, শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে থাকার গ্যারান্টি দাও। যদি কেউ নিরাপত্তার পয়গামও গ্রহণ না করে, তবে দুষিত জিনিস কেটে ফেলে দেয়া জরুরী হয়ে যায়। এটাই হিকমত ও যুক্তির দাবি।

الحرب بيننا وبينهم سجال الخ

অর্থাৎ, আমাদের ও তাদের লড়াই বালতির ন্যায়, কখনো তারা আমাদের থেকে ময়দান নিয়ে নেয়। আর কখনো আমরা তাদের কাছ থেকে ময়দান দখল করি। অর্থাৎ, না তারা সবসময় বিজয়ী থাকে, না

আমরা। পাশা পরিবর্তিত হতে থাকে। আবু সুফিয়ানের ইঙ্গিত উহুদ যুদ্ধের দিকে। কারণ, বদরযুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হয়েছেন, আর উহুদের যুদ্ধে মক্কার পৌত্তলিকরা। খন্দকের যুদ্ধে ছিল উভয়ে সমান।

একটি প্রশ্ন

◆ এই ইবারতের উপর বাহ্যত একটি প্রশ্ন হয়। কারণ, سجال শব্দটি বহুবচন। আর الحرب শব্দটি একবচন। আরবী ব্যাকরণের মূলনীতি অনুসারে একবচনের খবর বহুবচন হওয়া বিশুদ্ধ নয়।

◆ হাফিজ ইবনে হাজার র. এর উত্তর দিয়েছেন। الحرب শব্দটি ইস্‌মে জিন্‌স। এটি কমবেশি সবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। سجال শব্দটি বহুবচন নয়। বরং ইসমে জিনস। অতএব, سجال শব্দটি খবর হওয়া সঠিক। -ফাতহ্।

◆ কিন্তু আল্লামা আইনী র. বলেন, سجال শব্দটি سجل এর বহুবচন, ইসমে জিনস নয়। কিন্তু যেহেতু الحرب শব্দটি ইসমে জিনস, সেহেতু কোন প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে না। অতঃপর আল্লামা আইনী র. বলেন- হতে পারে سجال শব্দটি قتال এর ওজনে باب مفاعلة থেকে মাসদার তথা ক্রিয়ামূল। অতএব, কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না। -উমদাহ।

قال ماذا يامركم হিরাক্লিয়াসের এটি হল সর্বশেষ ও ১০ নং প্রশ্ন যে, তিনি তোমাদের কিসের নির্দেশ দেন? অর্থাৎ, তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থা ও গুনাবলী তো জানা হল, এবার তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে বল। আবু সুফিয়ান তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে বললেন, তিনি বলেন- اعبدوا الله وحده ولاتشركوا به شيئا الخ। অর্থাৎ, শুধু এক আল্লাহর ইবাদত কর, তার সাথে কাউকে শরীক কর না এবং পিতা-প্রপিতাদের বিষয়গুলো বর্জন কর।

নবীজী সা.-এর সম্মানিত চিঠির শব্দরাজির ব্যাখ্যা ঃ

من محمد عبد الله ورسوله চিঠির বিন্যাসের স্বাভাবিক দাবি হল- লেখকের নাম আগে থাকা। যাতে প্রথম দিকেই তার প্রতি দৃষ্টিপাত হয়। কারণ, প্রাপকের মনে প্রথমেই জানার উদ্রেক হয়, প্রেরক কে? কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, হিরাক্লিয়াসের কোন কোন সহকর্মী প্রশ্ন করল, লেখক নিজের নাম প্রথমে লিখে কত বড় বেআদবি করেছেন! হিরাক্লিয়াস উত্তর দিলেন, যদি তিনি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে তিনি এর যোগ্য।

عبد الله এর দ্বারা খৃষ্টানদের মত খন্ডন উদ্দেশ্য। কারণ, আমি সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর বান্দা। অতএব, ঈসা আ. আল্লাহর সন্তান কিভাবে হতে পারেন?

عظيم الروم এর দ্বারা বুঝা গেল, কাফিরের অধিক প্রশংসা করা জায়েয নেই। অবশ্য তার পদমর্যাদা অনুযায়ী তাকে কোন উপাধি প্রদানে কোন অসুবিধা নেই। যাতে তারা এটাকে অসভ্যতা মনে না করে।

بدعاية الاسلام দাল এর নিচে যের। অর্থাৎ, ইসলামের দাওয়াত। কোন কোন রেওয়ায়াতে بداعية الاسلام শব্দ এসেছে। তখন এর موصوف উহ্য হবে। অর্থাৎ, بالكلمات الداعية الى الاسلام ।

اسلم تسلم অর্থাৎ, আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে। এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, তোমাদের রাজত্বও বহাল থাকবে। প্রবল ধারণা, এই ইঙ্গিত অনুধাবন করে হিরাক্লিয়াস স্বজাতিকে বলেছিলেন- هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم

يؤتك الله اجرك مرتين এর দু'টি কারণ হতে পারে– ১. সম্রাটের ঈমান প্রজাদের ঈমানের কারণ হবে। অতএব, এক সওয়াব স্বীয় ঈমানের, আরেকটি প্রজাদের ঈমানের কারণ হওয়ার। ২. হাদীসে আছে– যে আহলে কিতাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়ন করে, সে দ্বিগুন সওয়াব পায়। এর কারণ ও পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা শীঘ্রই ইনশাআল্লাহ কিতাবুল ঈমানে আসবে।

فان توليت فان عليك اثم اليريسيين

একটি প্রশ্ন ঃ

বাহ্যত এটি কুরআনের আয়াত وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰی এর পরিপন্থী।

উত্তর ঃ কুরআন মজীদে প্রত্যক্ষ কর্মের বিষয়টি না করা হয়েছে। আর এতে কারণ হওয়ার উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ, অন্য আরেকজনের গোমরাহীর কারণ হলে তার গুনাহ হবে। কারণ হওয়ার ফলে গুনাহ হওয়ার বিষয়টি কুরআন দ্বারাও প্রমাণিত-

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَاهُمْ بِحَامِلِيْنَ مِنْ خَطَايَا هُمْ مِنْ شَيْئٍ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ . وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ . سورة العنكبوت.

প্রথম ভারী হওয়ার কারণ প্রত্যক্ষ বদকর্ম। আর দ্বিতীয়টি কারণ হওয়ার ফলে।

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لَّانَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ الخ

একটি প্রশ্ন ঃ

খৃষ্টানরা ত্রিত্ববাদের প্রবক্তা। হযরত ঈসা আ.কে তারা আল্লাহর পুত্র বলে। ইয়াহুদীরা হযরত সুলায়মান আ. কে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করে। অতএব, কালিমায়ে তাওহীদকে আমাদের মাঝে তোমাদের মাঝে সমান বলা কিভাবে যথার্থ হবে?

উত্তর ঃ ১. কুরআন, তাওরাত, ইঞ্জিল ও অন্যান্য আসমানী কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত- এ হিসেবে সমতা রয়েছে।

২. সমস্ত পৌত্তলিকও একটি সীমা পর্যন্ত তাওহীদের প্রবক্তা। প্রতিটি ধর্ম ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের মৌখিক স্বীকারোক্তি করে। অতএব, যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, আল্লাহ কি এক? তখন সুনিশ্চিত এই উত্তরই দিবে যে, এক। কিন্তু তা সত্ত্বেও বদবখতির কারণে এতে কিছু বাড়াবাড়ি করে। যেমন– খৃষ্টানরা ত্রিবিভূতির (আকানীমে ছালাছার) প্রবক্তা। তারা বলে, একই তিন। আবার তিনই এক। অথচ এখানে পরস্পর বিরোধী বিষয়াবলী আবশ্যক হচ্ছে, তা সত্ত্বেও তারা তাওহীদ ছাড়ে না।

উদ্দেশ্য হল, যদিও অসম্ভব বিষয় আবশ্যক হোক। তা সত্ত্বেও তাওহীদ যেন হাত ছাড়া না হয়।

এক পাদ্রী মীযানুল হক লিখেছেন। ত্রিত্ববাদের উপর বহু পাতা কালো করেছেন। অতঃপর লিখেছেন, এটি ধর্মীয় একটি রাজ (গোপন রহস্য)। মধ্যপন্থী বিবেকের অনুধাবনের উর্ধ্বে। যেন এটি মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভূক্ত।

◆ কিন্তু এটা সরাসরি ভুল। কারণ, মুতাশাবিহ বলে যেটি বিবেকে আসতে পারে না এবং তার ধরণ জানা যেতে পারে না। বস্তুত ত্রিত্ববাদ হল যৌক্তিক অসম্ভব বিষয়াবলীর অন্তর্ভূক্ত।

মোটকথা, একটি বিষয় হল, যেটি পর্যন্ত বিবেক পৌঁছতে পারে না। আরেকটি বিষয় হল বিবেক সেটাকে অসম্ভব মনে করে। এ দু'টোর মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য আছে।

◆ এরূপভাবে অগ্নিপূজককে জিজ্ঞেস করলে উত্তর পাওয়া যায়, আল্লাহ এক। আহরামান খোদারই অন্ত ভূক্ত। যেমন– মুসলমান শয়তানকে মনে করে। কিন্তু এটা ভুল। কারণ আমরা শয়তানকে মাখলূক মনে করি অথচ তারা তাকে স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করে।

এমনিভাবে আর্যরাও তাওহীদের প্রবক্তা। এমনকি আমাদেরকে মুশরিক বলে। কারণ, আমরা কা'বার পূঁজা করি। অথচ তারা আত্মা ও মূলবস্তুকে অবিনশ্বর মনে করে। এরূপভাবে অন্যান্য ধর্মেও কোন না কোন সীমা পর্যন্ত তাওহীদের উক্তি রয়েছে। কিন্তু কেউ একত্ববাদী হওয়ার হাজার দাবি করলেও যতক্ষন পর্যন্ত ইসলমের আঁচলে আশ্রয় গ্রহণ না করবে, ততক্ষন সে কখনো একত্ববাদী হতে পারবে না। কারণ, ইসলাম ছাড়া সমস্ত ধর্মে শিরকের অস্তিত্ব বিদ্যমান। শুধু ইসলামই তা থেকে মুক্ত।

সারকথা, সর্বদিক দিয়ে সাম্য উদ্দেশ্য নয়। বরং সে তাওহীদ উদ্দেশ্য যা থেকে মানুষ মুক্তি পেতে পারে না। আর যার দাবি মানবিক স্বভাব করে ও তা স্বীকার করতে বাধ্য। অতএব, তাওহীদ ইজমালীভাবে ও পূর্ণতঃ একটি সর্বজন স্বীকৃত আকীদা। মৌলিক বিষয় স্মরণ করানোর পর শাখাগত বিতর্কিত বিষয়গুলোকে প্রমাণ করতে যাওয়া মোটামুটি সহজ হয়ে যায়।

◆ আহলে কিতাব সৃষ্টিকর্তার সাথে বিশেষিত গুণাবলী থেকে উলূহিয়্যত তথা খোদায়িত্বকে হযরত ঈসা ও ওযায়ের আ. এর জন্য এবং একচ্ছত্র অনুসরণীয় হওয়ার বিষয়টি তাদের আলিম ও পাদ্রীদের জন্য প্রমাণ করত। কুরআনে কারীমে যাদেরকে اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ বলা হয়েছে, তারা তাদের হালাল-হারামকৃত বিষয়াবলীর উপর আমল করা ওয়াজিব মনে করত, যদিও এগুলো অকাট্য মুহকাম এবং ইজমাঈভাবে আমলযোগ্য বিষয়াবলীরও পরিপন্থী হোক না কেন। এর পরিপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের তাকলীদ। কারণ, এর স্থান হল দ্ব্যার্থবোধক ধারণা নির্ভর মাসায়িল। আহলে কিতাব এই আকীদাকে শিরক এবং তাওহীদ পরিপন্থী মনে করত না। কারণ, তারা সত্তাগত এবং যৌগিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করত। অথচ এই পার্থক্য অবিশেষিত গুনাবলীতে যথার্থ। বিশেষিত গুণাবলীতে যথার্থ নয়, বরং শিরক।

শিরকের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ঃ

শিরক দুই প্রকার– ১. شرك فى الذات ২. شرك فى الصفات তথা সত্তাগত অংশীদারিত্ব এবং গুণগত অংশীদারিত্ব ।

প্রথম প্রকারের প্রবক্তা পৃথিবীতে কেউ নেই । মক্কার পৌত্তলিকরাও আল্লাহ তা'আলাকে এক, সৃষ্টিকর্তা ও মালিক মনে করত।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ الخ

দ্বিতীয় প্রকার গুনাবলীতে অংশীদারিত্ব। এর প্রবক্তা বহু লোক রয়েছে। তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য জিনিসেরও ইবাদত করে। হযরত মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী র. বলেন, আমরা যখন জমিয়তুল উলামার পক্ষ থেকে মক্কা মুয়াজ্জমায় গেলাম, তখন সুলতান ইবনে সাউদের সাথে কথোপকথন হয়। আমি বললাম, আপনি তায়েফবাসীদের হত্যা করা বৈধ মনে করেন কেন?

তিনি উত্তরে বললেন, তারা কবরে এরূপ সিজদা করে, যেরূপ প্রতিমাকে সিজদা করা হয়। অতএব, তারা কাফির। তাদের হত্যা করা বৈধ।

নায়লুল আওতার গ্রন্থকার কাযী শাওকানী الدر النضيد فى اخلاص كلمة التوحيد নামে স্বতন্ত্র একটি পুস্তিকা লিখেছেন। তাতে প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা ব্যাপক আকারে কুফরী। কিন্তু আমাদের ইসলামী আইনবিদগণ বলেন, সিজদায়ে তা'জীমী যদিও হারাম এবং কবীরা গুনাহ, কিন্তু এর দ্বারা কুফরী হয় না।

আমি বললাম, যেহেতু আপনার মতে প্রতিটি সিজদা ইবাদত, সেহেতু প্রতিটি সিজদাকারী আবিদ বা উপাসক। আর যত জিনিসকে সিজদা করা হয়, সেগুলো হবে মা'বুদ। অতএব, কোন যুগে কি এক মিনিটের জন্যও গাইরুল্লাহর ইবাদত বৈধ রাখা হয়েছিল? তিনি নেতিবাচক উত্তর দিলেন।

আমি বললাম, কুরআন মজীদে আছে-

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ

হযরত ইউসুফ আ.-এর মাতা-পিতা ও ভাইদের সম্পর্কে বলেন- وَخَرُّوْا لَه سُجَّدًا এতে বুঝা গেল, এটা সিজদায়ে তা'জীমী ছিল। বিশেষতঃ যখন এর পূর্বে হযরত ইউসুফ আ. জেলখানায় নিজের সাথীদের নিকট তাওহীদের প্রচার করেছিলেন। অতঃপর পরবর্তীতে সিজদাও হয়েছে। এতে বুঝা গেল, এই সিজদা ইবাদত রূপে ছিল না। এতদশ্রবণে সুলতান নীরব হয়ে যান। তবে তিনি বলেন, আমি আলিম নই, না আমি আপনার সত্যায়ন করছি, না মিথ্যা প্রতিপন্ন। এ সম্পর্কে আমাদের উলামায়ে কিরামের সাথে আলোচনা করুন। আলিমদের যে ফয়সালা হবে, ইবনে সাউদের গরদান তারই অনুগত হবে।

সিজদায়ে তাআব্বুদী ও তা'জীমীর মধ্যে পার্থক্য

◆ এবার প্রশ্ন হয়, সিজদায়ে তাআব্বুদী ও তা'জীমীতে পার্থক্য কি?

এ বিষয়টি বুঝার জন্য ইবাদতের অর্থ বুঝা আবশ্যক। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী র. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাতে বলেন, যেরূপ সম্রাট তার অধীনস্থ মন্ত্রী-মিনিষ্টার এবং অন্যান্য শাসককে কিছু ইখতিয়ার দিয়ে দেন, তখন তারা সে ইখতিয়ারকে কাজে লাগানোর সময় বার বার সম্রাট থেকে অনুমতি নেন না। বরং সেসব ইখতিয়ার ব্যবহারে স্বত্তাগতভাবে স্বতন্ত্র হয়ে যান। যখন ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন। সম্পূর্ণ অনুরূপ আরবের পৌত্তলিকদের ধর্মবিশ্বাস ছিল যে, প্রতিমাগুলোরও ইখতিয়ার রয়েছে। যদিও এগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এসব ইখতিয়ার এরূপভাবে অর্পন করে দিয়েছেন যে, তারা সেসব ব্যবহরে স্বাধীন-স্বতন্ত্র। নিজের মর্জি মাফিক যখন ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারবে। এ জন্য কাফিররা বলত-

لا شريك لك الا شريكًا هو لك تملك وما ملك

অতএব, এরই নাম শিরক। কাজেই যদি সিজদাকারীর আকীদা এই হয় যে, যাকে সিজদা করা হয়েছে, সে বিভিন্ন জিনিসে তাসাররুপের (হস্তক্ষেপের) অধিকারী, তবে এই সিজদা হল তাআব্বুদী। আর এই সিজদাকারী সবই মুশরিক, এরূপ ব্যক্তি কাফির হবে। আর যদি যাকে সিজদা করেছে, সেটিকে তাসাররুপকারী মনে না করে, তবে এই সিজদা হবে তা'জীমী। এটি হারাম হলেও কুফরী নয়।

অবশ্য প্রতিমাকে সিজদা করা চাই যে কোন নিয়তেই হোক না কেন, তা কুফরী। কারণ, এটি পৌত্তলিকদের প্রতীক।

◆ قوله تعالى: فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ

এতে মতবিরোধ রয়েছে যে, ইসলাম মিল্লাতে মুহাম্মদীয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিশিষ্ট, না পূর্ববর্তী দীনগুলোর ব্যাপারেও ব্যবহৃত হয়?

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী র. এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা লিখেছেন যে, মুসলিম শুধু এ উম্মতের উপাধি। পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের উপর কখনো এটি প্রযোজ্য হয় না। শুধুমাত্র আম্বিয়া আ. ও তাঁদের কিছু বিশেষ অনুসারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। যেমন- হযরত ইবরাহীম আ. বলেছেন- اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ

এবং হযরত ইউসুফ আ. বলেছেন- تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ

হযরত ইয়াকুব আ. এর ছেলেরা বলেছেন- وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُوْنَ

ইসলামের আভিধানিক অর্থ হল সোপর্দ করা, অর্পন করা। যেমন– হযরত ইবরাহীম আ. বলেছেন-

اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ

হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ. সম্পর্কে এসেছে– فَلَمَّا اَسْلَمَا অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার হুকুমের সামনে তারা দু'জন যখন আত্মসমর্পন করলেন। এরূপভাবে হযরত সুলায়মান আ. এর চিঠিতে রয়েছে-

اَلاَّ تَعْلُوْا عَلَىَّ وَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ

ইসলামের মূল হল سلم । এতেও ঝুঁকার অর্থ পাওয়া যায়। যেমন-

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا – يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِىْ السِّلْمِ كَافَّةً

এই আভিধানিক অর্থ হিসেবে সব নবী এবং প্রতিটি উম্মতের ক্ষেত্রে মুসলিম শব্দ প্রয়োগ করতে পারেন। কারণ, প্রতিটি নবীর দাবি ছিল আল্লাহর বান্দারা নিজের সৃষ্টিকর্তার সামনে আত্মসমর্পন করবে।

অতএব, মুসলিমের অর্থ হল, যে হুকুম যখন যে মাধ্যমেই পৌঁছে তার সামনে তৎক্ষনাৎ আত্মসমর্পন করে নেয়া। যদি কোন একটি হুকুম থেকেও ফিরে যায়, তবে ইসলাম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। অবশেষে এই নবুওয়তের ধারাবাহিকতা কামালাতের একটি উৎসের উপর এসে খতম হয়ে যায়। যেটি পূর্ণাঙ্গ ও আন্তর্জাতিক আইন নিয়ে এসেছে। যাতে সমস্ত আসমানী কিতাবের আহকাম বিদ্যমান। فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ যেন এটি সেসব গ্রন্থের সারনির্যাস। এই মিল্লাতে এরূপ তিনটি জিনিস রয়েছে, যেগুলো অন্য কোন ধর্মে নেই।

১. সমস্ত ধর্মের সমন্বয়কারী

২. সমস্ত উক্তি এবং গোত্রকে ব্যাপক আকারে অন্তর্ভূক্ত করা। কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকা। অতএব, দীন, ইসলামকে মেনে নেয়া মানে সমস্ত দীনকে মেনে নেয়া। বস্তুতঃ যিনি দীন মানবেন, তিনি পূর্ণাঙ্গ।

–ইরশাদুল কারী।

لقد امر امر ابن ابى كبشة

ইবনে আবু কাবশার ব্যাপারটি তো অনেক বেড়ে গেছে। কারণ, এর ফলে রোম সম্রাটও ভীত সন্ত্রস্ত। امر از سمع অর্থ বড় হয়েছে। আর দ্বিতীয় امر بسكون الميم مصدر এর অর্থ হল কাজ। উদ্দেশ্য এই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রচার অথবা তাঁর মাহাত্ম্য ও শান অনেক উঁচু হয়ে গেছে।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবু কাবশার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করার বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

১. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধ মা হযরত হালিমা সা'দিয়া রা.-এর স্বামী হারিছ ইবনে আবদুল উয্যার উপনাম ছিল আবু কাবশা। এজন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুধ সম্পর্কের কারণে ইবনে আবু কাবশা বলেছেন।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খান্দানের কারো উপনাম হয়ত আবু কাবশা থাকবে।

৩. তাহকীক হল আবু কাবশা বনূ খুযাআর এক ব্যক্তি। তার নাম ওয়াজয (ওয়াও এর উপর যবর, জীম সাকিন। তিনি পিতা-প্রপ্রিতার ধর্ম প্রতিমা পূঁজা ছেড়ে তারকা পূঁজা শুরু করেছিলেন। পিতা-প্রপিতাদের

দীনের বিরোধিতা এবং তা থেকে বিচ্ছেদে উপমাদানের উদ্দেশ্যে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবু কাবশার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে।

وكان ابن الناطور الخ এটি ইমাম যুহরী র.এর উক্তি। হযরত আবু সুফিয়ান রা.এর রেওয়ায়াত حتى ادخل الله على الاسلام পর্যন্ত সমাপ্ত হয়ে গেছে। এরপর ইমাম বুখারী র. ঘটনা পূর্ণাঙ্গ করার জন্য وكان ابن الناطور দ্বারা বিবরণ দিচ্ছেন। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাথমিক সনদ উভয় ঘটনার একই।

حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهرى

এতটুকু পর্যন্ত সনদ একটি। এরপর পূর্বের ঘটনা ইমাম যুহরী র. উবায়দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। যেটি حتى ادخل الله على الاسلام পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। এখান থেকে ইমাম যুহরী র. প্রত্যক্ষভাবে ইবনে নাতূর থেকে বর্ণনা করছেন। অর্থাৎ, এতে উবায়দুল্লাহ অথবা ইবনে আব্বাস রা. প্রমূখের সূত্র নেই। আবু মুঈন দালাইলুন নবুওয়তে যুহরী র. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ইমাম যুহরী র.) আবদুল মালিকের যুগে শাম তথা দামেশকে ইবনে নাতূরের সাথে সাক্ষাত করেছেন এবং তার কাছ থেকে এই ঘটনা শুনেছেন।

নাতূর মূলতঃ বাগানের মালীকে বলে। কিন্তু খৃষ্টানদের নিকট একটি পদও রয়েছে। যেমন– বিতরিক, আসকাফ ইত্যাদি। তিনি ফারুকী খেলাফত আমলে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। মুসলমান হওয়ার পর এই ঘটনা বর্ণনা করেন যে, হিরাক্লিয়াস যখন ঈলিয়া পৌছেন, তখন একদিন সকালে খুব পেরেশান ও বিব্রতকর অবস্থায় উঠেন।

صاحب ايلياء وهرقل

হিরাকলের আতফ ঈলিয়া এর উপর। অনুবাদ হবে যিনি ঈলিয়ার শাসক এবং হিরাক্লিয়াসের সাথী ও গোপন তথ্য বিশেষজ্ঞের ন্যায় ছিলেন। صاحب শব্দটি পেশ অবস্থায় ইবনে নাতূরের সিফত অথবা উহ্য মুবতাদা هو এর খবর।

একটি প্রশ্ন ঃ

এই ইবারতে তো হাকীকত ও মাজায তথা প্রকৃত অর্থ ও রূপকার্থের একত্রিকরণ আবশ্যক হয়। এটি তো সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরামের মতে অবৈধ। শুধু শাফিঈগণ এটাকে বৈধ মনে করেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া র. লিখেন– ইমাম শাফিঈ র. থেকে এ মাসআলায় কোন সুস্পষ্ট বিবরণ নেই। বরং শাফিঈগণ তাঁর কোন কোন মাসআলা থেকে উৎসারণ করেছেন। –ফয়যুল বারী।

উত্তর ঃ

১. আল্লামা আইনী র. বলেন, এখানে প্রকৃত অর্থ ও রূপকার্থ একত্রিত হয়নি। কারণ, আসল ইবারত হল– كان ابن الناطور صاحب ايلياء وصاحب هرقل । শ্রোতার অনুধাবনের উপর নির্ভর করে সংক্ষেপ করতে গিয়ে দ্বিতীয় صاحب টিকে উহ্য করে দেয়া হয়েছে। অতএব, একই শব্দ থেকে প্রকৃত ও রূপকার্থ উদ্দেশ্য । صاحب هرقل তে প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য। صاحب শব্দটি দুই স্থানে আছে। একটি দ্বারা রূপকার্থ, দ্বিতীয়টি দ্বারা প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য। অতঃপর আল্লামা আইনী র. বলেন, প্রকৃত অর্থ ও রূপকার্থ একত্রিত করণের ন্যায় অসম্ভব বিষয় অবলম্বনের চেয়ে ইবারত উহ্য করা উত্তম। -উমদাহ।

২. এখানে صاحب এর অর্থ একই, শুধু সম্পর্কে পার্থক্য। صاحب এর অর্থ হল ولا, তথা বিশিষ্ট বা অধিকারী। যদি صاحب শব্দটির সম্পর্ক কোন রাষ্ট্র অথবা শহরের দিকে করা হয়, তখন এর অর্থ হবে

শাসক। আর যদি কোন মানুষের দিকে করা হয়, তবে এর অর্থ হবে সাথী-বন্ধু। উর্দূতে এর অনুবাদ করা হবে ایلیاء اور ہرقل والا। অতএব, কোন প্রশ্ন রইল না।

سقف علی نصاری الشام এবং শামের খৃষ্টান ছিল পাদ্রী। سقف শব্দটি বিভিন্নভাবে পড়া হয়েছে–

১. মারফূ'। এমতাবস্থায় এটি ইস্‌ম এবং উহ্য মুবতাদার খবর।

২. ইসম এবং كان ابن الناطور এর খবর।

৩. তৃতীয় ছূরত হল ফে'ল মাজহুল। তখন অনুবাদ হবে, শামের খৃষ্টানকে মুকতাদা পাদ্রী বানানো হয়েছে।

অতঃপর এতে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে যে, এটি افعال থেকে না باب تفعیل থেকে। হামযা সহকারে, না হামযা ছাড়া? ইত্যাদি।

আল্লামা নববী র. বলেন, হামযা এবং ফা এ তাশদীদ প্রসিদ্ধতম। হাফিজ ইবনে হাজার র. বলেন, এটি كان এর খবর হিসেবে মানসূব। অর্থাৎ, اسقفا।

حین قدم ایلیاء হিরাক্লিয়াস যখন পারস্য সম্রাটের মুকাবিলায় সফলতা অর্জন করলেন, তখন মান্নত পূরণার্থে বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছেন।

فقال بعض بطارقه- بطارقه ও بطارق বা এর উপর যবর সহকারে بِطریق এর বহুবচন। সেনাবাহিনীর জেনারেল। এই জেনারেলও খৃষ্টানদের নিকট এটি বড় পদে কর্মরত ছিলেন। যেমন– পোপ, আসকাফ এবং ভবিষ্যদ্বক্তা।

وكان هرقل حزاء ينظر فى النجوم হিরাক্লিয়াস ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন। তারকা বিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন।

حزاء হা এর উপর যবর, যা এর উপর তাশদীদ। এটি মূলতঃ সে ব্যক্তিকে বলে, যে গুণে এবং নিদর্শনাদি দ্বারা কিছু জ্ঞান লাভ করে, তাকে কাহিনও বলে। কাহানত (ভবিষ্যত বক্তাগিরি) কখনো স্বভাবজাত হয়ে থাকে। যার ফলে নিদর্শনাদিতে আন্দাজ অনুমান করে কিছু জ্ঞান লাভ করে। আর কখনো তারকার মাধ্যমে, আবার কখনো শয়তানগুলোর মাধ্যমে। কারণ, শয়তানগুলো তাদের অনুগত হয় এবং এদিক সেদিকের খবর বলতে থাকে। বর্বরতার যুগে এরূপ লোকদেরকে সাধারণত কাহিন বলত। এবার যদি ينظر فى النجوم শব্দটিকে حزاء শব্দের সিফত সাব্যস্ত করেন, তাহলে অর্থ হবে হিরাক্লিয়াসের ভবিষ্যত বক্তাগিরি ছিল তারকা বিদ্যার মাধ্যমে, শয়তানগুলোর সাথে সম্পৃক্ত ছিল না। আর যদি ينظر فى النجوم কে حزاء এর সিফত না সাব্যস্ত করে দ্বিতীয় খবর বলেন, তবে এর অর্থ হবে, হিরাক্লিয়াস স্বভাবতঃ ভবিষ্যত বক্তা ছিলেন এবং তারকা (জ্যোতি) বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।

اتی هرقل برجل হতে পারে এই দূত আদি ইবনে হাতিম। তিনি তখন খৃষ্টান ছিলেন। তিনি হিরাক্লিয়াসের কাছে পৌঁছেন। এরপর দিহইয়া রা.ও পৌঁছেন। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, দিহইয়া ও আদি এক সাথে পৌঁছেছিলেন। ارسل به ملك غسان الخ এর দ্বারা উদ্দেশ্য সে আজীমে বুসরা তথা হারিস ইবনে আবু শিম্‌র গাসসানী।

ملك الختان قد ظهر

ملك মীমের উপর যবর, লামের নীচে সহকারেও পড়া হয়েছে এবং ملك মীমের উপর পেশ এবং লাম সাকিন সহকারেও পড়া হয়েছে। -কাসতাল্লানী।

মূল তরজমা হল– খিতান রাজার বিজয় হবার মত। কিন্তু বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে হিরাক্লিয়াস ماضی এর সীগা ব্যবহার করেছেন। অথবা বলতে হবে, মালিকুল খিতানের বিজয়ের সূচনা হয়েছে। ইঙ্গিত হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি।

ثم كتب هرقل الى صاحب له

সে বন্ধুর নাম রাখা হয় যাগাতির আল আসকাফ। -কাসতাল্লানী। অতঃপর হিরাক্লিয়াস রোমিয়ার অধিবাসী নিজের এক বন্ধু যাগাতিরকে লেখলেন, যিনি বিদ্যায় হিরাক্লিয়াসের সমপর্যায়ের ছিলেন। হিরাক্লিয়াসের চিঠি যাগাতিরের নিকট পৌঁছার পর তিনি তা পড়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু জাতি তাকে সেখানেই শহীদ করে দেয়।

فلم يرم ইয়া এর উপর রা এর নিচে যের। حمص হা এর নিচে যের। হিরাক্লিয়াস হিম্‌স থেকে অন্য কোথাও যাবার পূর্বেই বন্ধু যাগাতিরের উত্তর এসে যায়।

ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা

এই হাদীসে হিরাকলে কয়েকটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। ঘটনাগুলোর ধারাবাহিকতা নিম্নরূপ–

প্রথমেই জানতে পেরেছি, হিরাক্লিয়াস পারস্য সম্রাটের মুকাবিলায় যখন বিজয় ও সফলতা লাভ করেছেন, তখন নিজের মান্নত পূর্ণ করার জন্য বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছেন। সেখানে নিজের মান্নত পূর্ণ করেন। এমতাবস্থায় হিরাক্লিয়াসের নেহায়েত আনন্দিত ও প্রফুল্ল থাকার কথা। কিন্তু একদিন সকালে তার সাংসদবর্গ হিরাক্লিয়াসকে পেরেশান এবং উদাস চেহারায় দেখতে পেয়ে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। হিরাক্লিয়াস উত্তরে বললেন, আজ রাতে আমি যখন তারকারাজির দিকে নজর করি, তখন আমি খিতান রাজার বিজয় দেখতে পাই। অতঃপর হিরাক্লিয়াস সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলেন, বর্তমানে খতনা করে কারা? সঙ্গীগণ নিজের জানা মুতাবিক বললেন, শুধু ইয়াহুদীরা খতনা করে। তাদের নিয়ে চিন্তা করার কোন কারণ নেই, তারা কি করতে পারবে? তারা তো হীন ও তুচ্ছ। আপনি গোটা সাম্রাজ্যে নির্দেশ পাঠিয়ে দিন, যত ইয়াহুদী পাওয়া যাবে, তাদের সবাইকে যেন হত্যা করে দেয়া হয়। তখন এ বিষয়ে পরামর্শ চলছিল। এ দিনগুলোতেই গাসসান সম্রাটের দূত হিরাক্লিয়াসের নিকট পৌঁছেন। যিনি আরবে নবী প্রেরিত হওয়ার সংবাদ দেন এবং লোকজনের বিরোধিতা ও আনুকূল্যের বিবরণ দেন। হিরাক্লিয়াস সাথীদের বললেন, এ দূতকে দেখ, সে খতনাকৃত কি না? লোকজন প্রত্যক্ষ দর্শনের পর বলল, তিনি খতনাকৃত। অতঃপর সে দূতকে জিজ্ঞেস করলেন, আরবরাও কি খতনা করায়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এতদশ্রবণে হিরাক্লিয়াস বলেন, আমি যার বিজয় দেখেছি, তিনি এই নবীই।

ইতোমধ্যে হযরত দিহইয়া রা. সম্মানিত চিঠি নিয়ে পৌঁছেন। যদিও ইবনুস সাকানের রেওয়ায়াত অনুযায়ী সে দূত এবং হযরত দিহইয়া রা. এক সাথেই পৌঁছেছেন, কিন্তু যেহেতু দূত নিজস্ব বিশেষ বিশ্বস্ত লোকের ছিলেন, সেহেতু প্রথমত হিরাক্লিয়াস তাকে দরবারে ডেকে পাঠান। এরপর হযরত দিহইয়া রা. সম্মানিত চিঠি তার নিকট অর্পন করেন। এরপর হিরাক্লিয়াস প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিগত অবস্থা সম্পর্কে তদন্তের জন্য আরব কাফেলা তালাশ করার নিদের্শ দেন। তখন বাইতুল মুকাদ্দাসের নিকটস্থ একটি স্থান গাযাতে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মক্কার বণিক ত্রিশজন উষ্ট্রী আরোহী কাফেলা বিদ্যমান ছিল। তাদেরকে ডেকে হিরাক্লিয়াস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ১০টি প্রশ্ন করেন। এগুলোর উত্তর দেন আবু সুফিয়ান। তার পর হিরাক্লিয়াস নিজের মত প্রকাশ করেন। যার ফলে তার জাতি অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। চিৎকার হৈ হুল্লোর শুরু হয়ে যায়। হিরাক্লিয়াস বিষয়টির স্পর্শকাতরতা অনুভব করে তখন বিষয়টি মুলতবী রাখেন এবং হিরাক্লিয়াস রোমিয়ার আলিম যাগাতিরের নিকট সম্মানিত চিঠি এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে লিখেন, তার রায় জানার জন্য এবং সহজে ফয়সালা করার জন্য। এসব ঘটনা ঘটে বাইতুল মুকাদ্দাসে।

যাগাতিরের নিকট চিঠি লেখার পর হিরাক্লিয়াস হিম্‌স অভিমুখে রওয়ানা করেন। হিম্‌সে পৌঁছার পর যাগাতিরের উত্তর আসে। তাতে হিরাক্লিয়াসের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ছিল এবং ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যায়ন।

যাগাতিরের আনুকূল্য ও সমর্থনে হিরাক্লিয়াসের সাহস হয়। তিনি আশান্বিত হলেন, হয়ত এবার লোকজন কথা মানবে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালত স্বীকার করবে। কারণ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলছেন এবং ধর্মীয় সবচেয়ে বড় আলিম যাগাতিরও বলছেন। কাজেই এ আশায় হিরাক্লিয়াস রাষ্ট্রের বড় বড় মনীষীদের নিজ মহলে ডেকে পরিস্কার ভাষায় দাওয়াত দেন। অবশ্য বাইতুল মুকাদ্দাসে হিরাক্লিয়াসের নিজের মতের বিরুদ্ধে উত্তেজনা ও ঘৃণার অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেহেতু হিম্‌সে তিনি একটি বিশাল শাহী মহলে রোমের বড় বড় মনীষীদের সমবেত করেছেন। চতুর্দিক থেকে বাইরে বের হবার দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়েছেন। নিজে প্রাসাদের উপর যেয়ে এর দরজাও বন্ধ করিয়ে দেন। যাতে কেউ তার উপর হস্তক্ষেপ করতে না পারে এবং না বাইরে বেরিয়ে জনসাধারণের মধ্যে কোন ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে। তাদের ক্রোধ এখানে কার্যত হিকমত ও কৌশলে খতম করে দেয়া হয়ে। এসব ব্যবস্থাপনার পর তিনি রাজপ্রাসাদের উপর থেকে মাথা তুলে দাওয়াত দেন এবং বক্তব্য রাখেন– يا معشر الرّوم هل لكم في الفلاح الخ কিন্তু সবাই বিরোধিতা করে এবং বলতে শুরু করে, দেখ, তিনি আমাদের সবাইকে আরবদের গোলাম বানাতে চান। অতঃপর রাষ্ট্র ও হুকুমতের লোভে হিরাক্লিয়াসের ধাঁচও পাল্টে যায় এবং ইসলাম ও ঈমান থেকে বঞ্চিত থাকেন। وَاللهُ يَهْدِىْ مَنْ يَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল

১. আল্লামা কাসতাল্লানী র. বলেন–

২. ووجه مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب الخ

সারকথা হল, শিরোনাম ওহীর সূচনার ধরণ সংক্রান্ত। ইমাম বুখারী র. بدء الوحى এর শেষ হাদীসে যার নিকট ওহী প্রেরিত হয়েছে তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৎগুণ ও উঁচু শিক্ষার বিষয় পরিশিষ্ট রূপে বর্ণনা করেছেন।

২. কারো কারো মতে হিরাক্লের হাদীসে সম্পর্ক ওহীর সূচনাকালের সাথে যে, ওহীর সূচনাকালে তথা নবুওয়তের শুরুর দিকে কি কি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল? কোন কোন স্তর অতিক্রম করতে হয়েছিল? অবশেষে মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করা হল। এসব মুসিবত সত্ত্বেও তিনি হকের উপর অটল থাকেন। হিরাকলের হাদীসে এসব পরিস্থিতির চিত্রাংকন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল بدء الوحى দ্বারা ক্ষণিকের সূচনা উদ্দেশ্য নয়, বরং দীর্ঘকালীন সূচনা উদ্দেশ্য।

৩. হযরত শাইখুল হিন্দ র. এর মতে যেহেতু অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য ওহীর মাহাত্ম্য ও পবিত্রতার বিবরণ দান, যার বিস্তারিত বিবরণ শিরোনামের ব্যাখ্যায় এসেছে এবং হাদীসে হিরাকলে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসিত চরিত্র এবং উন্নত গুণাবলীর বিবরণ দেয়া হয়েছে। ইসলামের একজন কট্টর দুশমনও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরূপ ব্যাপক প্রশংসা করেছে, যা বানী ও কর্মে সর্বদিক দিয়ে তথা সর্বপ্রকার ফযীলতপূর্ণ ছিল। তাছাড়া আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, মাখলূকের সাথে সম্পর্ক, আত্মশুদ্ধি, উন্নত শিক্ষা ইত্যাদিকেও অন্তর্ভূক্ত করেছে।

অতঃপর আহলে কিতাবের সর্বজন স্বীকৃত আলিম কর্তৃক হিরাক্লিয়াসের সমর্থনও এই রেওয়ায়াত দ্বারাই হয়। এসব বিবরণ দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাহাত্ম্য ভালরূপেই জানা যায়। যার নিকট ওহী প্রেরিত হয়, তার মাহাত্ম্য দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওহীর আজমতও প্রমাণিত হয়।

৩. হযরত শায়খুল হাদীস র. বলেন, ইমাম বুখারী র. শিরোনাম দিয়েছেন-

كيف كان بدء الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده

আর হিরাকলের হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত চিঠির আয়াত হল-

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ.

অতএব, মিল স্পষ্ট। কারণ, সম্মানিত চিঠি দ্বারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম الكلمة السواء এর দাওয়াত দিয়েছেন। আর এই الكلمة السواء তথা কালিমায়ে তাওহীদ হল সমস্ত নবী-রাসূলের মৌলিক আহ্বান। -তাকরীরে বুখারী-হযরত শায়খ র.।

ইঙ্গিতপূর্ণ সুন্দর সমাপ্তি

হাফিজ আসকালানী র. বলেন-

ويوخذ للمصنف من آخر لفظ فى القصة براعة الاختتام وهو واضح مما قررنا.

সারকথা হল, ইমাম বুখারী র. এর প্রণীত একটি মূলনীতি এটিও যে, প্রতিটি পর্বের শেষে এরূপ রেওয়ায়াত অবশ্যই আনেন, যদ্বারা এ পর্বের সমাপ্তির দিকে ইঙ্গিত হয়। এজন্য হাফিজ র. প্রতিটি পর্বের শেষে এরূপ শব্দ বাতলে দিয়েছেন, যদ্বারা পর্বের সমাপ্তির দিকে ইঙ্গিত হয়। এখানেও ইমাম বুখারী র. فكان ذالك آخر شان هرقل দ্বারা باب بدء الوحى এর শেষের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া র. বলেন, বুখারী শরীফে যেরূপ অনেক সুক্ষ্ম বিষয় রয়েছে, এরূপভাবে প্রতিটি পর্বের শেষে এরূপ কোন রেওয়ায়াত অথবা বাক্য আনেন, যদ্বারা মানুষের সমাপ্তি ও মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত উদ্দেশ্য হয়।

ايك دن مرنا هي آخر موت هي ÷ كر لي جو كرنا هي آخر موت هي.

মোটকথা, দুটি উক্তিই যথাস্থানে সঠিক ও মূল্যবান। উভয়ের মাঝে কোন বৈপরিত্য নেই। হতে পারে উভয়টিই উদ্দেশ্য। والله اعلم

كتاب الْإِيمَان

ঈমান পর্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

ইমাম বুখারী র. বিসমিল্লাহর প্রতি যতটা গুরুত্ব দিয়েছেন, অন্য কোন মুহাদ্দিস ততটা গুরুত্ব দেননি। প্রতিটি পর্বের সূচনায় অবশ্যই তিনি বিসমিল্লাহ লিখেন। অতঃপর পূর্ণ বুখারীতে কিতাবের পূর্বে অথবা পরে বিসমিল্লাহ লেখা সম্পর্কে রেওয়ায়াত বিভিন্ন রকম। কোথাও কিতাব তথা পর্বের পূর্বে বিসমিল্লাহ, যেমন– শুরুতেই আছে। অন্যান্য পর্ব ও অধ্যায়েও আছে। আবার কোন কোন স্থানে পর্বটির পূর্বে, বিসমিল্লাহ তার পরে রয়েছে। উভয়ের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা হতে পারে।

যদি পর্বের পূর্বে বিসমিল্লাহ হয়, যেমন– সহীহ বুখারীর অধিকাংশ পর্বে রয়েছে– (ইরশাদুস সারী ঃ১ম খণ্ড) তবে এর কারণ স্পষ্ট। কারণ, প্রতিটি পর্ব যেন এককেটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা। বস্তুতঃ বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু প্রতি খুব তাগিদ দেয়া হয়েছে। অতএব, সুন্নতকে আকড়ে ধরার প্রতি গুরুত্বারোপ এবং বরকত অর্জনের উদ্দেশ্য বিসমিল্লাহ আগে উল্লেখ করেন।

যে সব স্থানে পর্ব আগে, বিসমিল্লাহ পরে, সেগুলোর ব্যাখ্যা হল আল্লাহর কিতাবে যেরূপভাবে কখনো সূরাগুলোর নাম হয়ে থাকে, অতঃপর বিসমিল্লাহ, এরপর সে সূরার আয়াত। এরূপভাবে পর্ব ও শিরোনামগুলো সূরার নামের পর্যায়ভূক্ত। এরপর বিসমিল্লাহ। কোন কোন স্থানে একই জায়গায় আগেও আছে, পরেও আছে। যেমন- কিতাবুল ঈমানের শুরুতেই অধিকাংশ কপিতে পর্ব আগে, বিসমিল্লাহ পরে। (যেমন- আমাদের ভারতীয় কপিগুলোতেও আছে।) কোন কোন কপিতে (যেমন উমদাতুল কারী, ইরশাদুস সারী ইত্যাদিতে) এর বিপরীত। এর কারণ, কপির বিভিন্নতা। কোন কপিতে পূর্বে, আর কোনটিতে পরে। প্রতিটিরই যথার্থ ব্যাখ্যা রয়েছে। যেমন– ইতিপূর্বে আলোচনা হল।

বিসমিল্লাহ পরে রাখার আরেকটি ব্যাখ্যা হতে পারে, কিতাবুল ঈমানের শিরোনাম লিখে রেখেছিলেন যে, পরে এখানে আরো কিছু লিখবেন। কোন কারণে দেরি হয়ে গেছে, অতঃপর,লেখা আরম্ভ করেছেন, তাই বিসমিল্লাহ লিখেছেন। কেউ কেউ এ কারণ উল্লেখ করেছেন।

কোন কোন স্থানে পর্বের মাঝখানেও বিসমিল্লাহ আছে। মাশায়েখে কিরাম থেকে এর কারণ এই বর্ণিত হয়েছে যে, কিতাব লিখতে লিখতে কোন রোগ অথবা অন্য কোন ওযরের কারণে লেখা বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর যখন লেখা শুরু করেন, তখন বিসমিল্লাহ লিখে দেন। والله اعلم -ইমদাদুল বারী ঃ ৪/২৫১।

قوله كتاب الايمان اى هذا كتاب الايمان فيكون ارتفاع الكتاب علي انه خبر مبتدأ محذوف ويجوز العكس ' ويجوز نصبه علي هاك كتاب الايمان او خذه (عمده ج١ ص١٠١)

কিতাব এবং বাবের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ بدء الوحى তে এসেছে।

যোগসূত্র ঃ

ولما فرغ المؤلف رح من باب الوحى الذى هو كالمقدمة لهذا الكتاب الجامع شرع بذكر المقاصد الدينية وبدء منها بالايمان الخ (ارشاد السارى)

আল্লামা কাসতাল্লানী র. বলেন, গ্রন্থকার জামি' গ্রন্থের ভূমিকার পর্যায়ভূক্ত باب الوحى থেকে অবসর গ্রহণ করার পর এবার দীনি লক্ষ্য উদ্দেশ্যের বিবরণ দিতে আরম্ভ করেছেন। জামি' গ্রন্থকার তথা যে সব মুহাদ্দিস স্বীয় গ্রন্থে হাদীসের ৮টি প্রকার উল্লেখ করেন, তাদের পদ্ধতি হল, স্বীয় গ্রন্থ কিতাবুল ঈমান দ্বারা আরম্ভ করেন। কারণ, একজন মুকাল্লাফ (শরঈ দায়িত্বপ্রাপ্ত) ব্যক্তির উপর সর্বপ্রথম ফরয হল ঈমান। সমস্ত আমল ও ইবাদত ঈমানের উপরই নির্ভরশীল। চিরন্তন জীবন ও পরকালিন মুক্তি ঈমানের উপরই মওকূফ। ঈমান-আকীদা হল বুনিয়াদ, আমলগুলো হল এর শাখাপ্রশাখা। ঈমান হল রূহের পর্যায়ভূক্ত। আমল হল এর কায় বা দেহ। ঈমান হল হাকীকত, ইসলাম এর বাহ্যিক রূপ। এ জন্য ভূমিকা শেষ করে কিতাবুল ঈমান দ্বারা গ্রন্থ শুরু করেছেন।

ইসলামী ফিরকাগুলোর প্রকারভেদ ঃ

দুনিয়াতে যত ফিরকা রয়েছে তন্মধ্যে ইসলামী ফিরকা বলা হয় সেগুলোকে, যারা মুসলমান হওয়ার দাবিদার এবং নিজেদেরকে মুমিন ও মুসলমান মনে করে। চাই তারা ইসলামের সহীহ পথের উপর থাকুক অথবা ভ্রান্ত হোক। যেমন– রাফিযী, খারিজী, মু'তাযিলা, মুরজিয়া, কাররামিয়া, জাহমিয়া প্রমূখ। তারা সবাই নিজেদেরকে ইসলামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে। কিন্তু এগুলো সবই বাস্তবে কমবেশ ভ্রান্ত ফিরকা।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাআত নামকরণের কারণ ঃ

সহীহ ইসলামী দল হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত। অর্থাৎ, যারা সুন্নতে নববী এবং সাহাবা জামাআতের অনুসারী। এ উপাধিটি গৃহীত বরং হুবহু হাদীসের তরজমা। হাদীসে মুক্তিপ্রাপ্ত দল সম্পর্কে ইরশাদে নববী রয়েছে– ما انا عليه واصحابى (তিরমিযী) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ইরশাদের অর্থ, যে পথের উপর আমি ও আমার সাহাবায়ে কিরাম আছে, সেটি মুক্তিপ্রাপ্তদের পথ।

২. হযরত আবু হোরায়রা রা. হতে বর্ণিত-

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر ماءة شهيد.

'প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– আমার উম্মতের বিপর্যয়কালে যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে প্রমাণ বানিয়েছে, সে একশ শহীদের সওয়াব পাবে।'

স্পষ্ট বিষয়, যারা সুন্নতকে প্রমাণ মানে, তারাই আহলে সুন্নাত। উপরোক্ত দু'টি রেওয়ায়াত মিলালে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের উপাধি সাব্যস্ত হয়ে যায়। বরং শুধু প্রথম রেওয়ায়াতটিই এর জন্য যথেষ্ট।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিভিন্ন শ্রেণী ঃ

অতঃপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মধ্যে চারটি দল রয়েছে। এরা সবাই সহীহ ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ও মুক্তিপ্রাপ্ত। সবার মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং দাবি একই। শুধু প্রমাণ পদ্ধতিতে কোন দলে কোন পদ্ধতি প্রবল- এই হিসেবে চারটি দল হয়েছে।

১. মুহাদ্দিসীন।

যারা আকাইদে ইমাম আহমদ র. এর অনুসারী। অর্থাৎ, ইমাম আহমদ র. থেকে আকাইদ সংক্রান্ত যে সব উক্তি বর্ণিত আছে, এগুলোর প্রচার-প্রসার ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন।

২. মুতাকাল্লিমীন।

তাঁদের মধ্যে আবার দু'টি দল রয়েছে। ১. আশআরী। তারা সাধারণতঃ এবং বেশির ভাগ ইমাম মালিক ও শাফিঈ র. থেকে বর্ণিত আকাইদের সমর্থন ও ব্যাখ্যা করেন। ২. মাতুরীদী।

আশআরী ও মাতুরীদীদের মধ্যে ইখতিলাফ সামান্য। আশআরীদের ইমাম আবুল হাসান আশআরী র.। মাতুরীদীদের ইমাম আবুল মানসূর মাতুরীদী র.। তাঁরা দু'জন একই জমানার ইমাম এবং ইমাম তাহাভী র. এর সমকালিন।

ইমাম আবুল হাসান র. প্রথমে মু'তাযিলী ছিলেন। বছরের পর বছর ধরে শীর্ষস্থানীয় মু'তাযিলী আবু আলী জুব্বাঈর সান্নিধ্যে ছিলেন। ইমাম আবুল হাসান র. মু'তাযিলার পক্ষ থেকে অনেক বড় মুনাজির (তার্কিক) ছিলেন। যেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিরুদ্ধে মু'তাযিলার পক্ষ থেকে তিনি ছিলেন একটি তলোয়ার। কিন্তু পরবর্তীতে কুদরতে ইলাহী এ তলোয়ার ঘুরিয়ে মু'তাযিলার গরদানের উপর রেখে দিয়েছেন। তাঁর ঘটনা বর্ণিত আছে– একবার তিনি পূর্ণ রমযানের ই'তিকাফের নিয়তে তাতে বসেন। প্রথম দশদিনের এক রাতে স্বপ্নযোগে দেখেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে তাশরীফ এনে বলেন– 'আবুল হাসান! দীনের সাহাযার্থে প্রস্তুত হয়ে যাও।' সকালে তিনি উঠলেন, কিন্তু এ স্বপ্নের ব্যাপারে তেমন বেশি গুরুত্বারোপ করলেন না। তাঁর মতে যেহেতু মু'তাযিলা ধর্মমতই সহীহ দীন ছিল, সেহেতু তিনি মনে করলেন, আমি তো তাদের পক্ষ থেকে প্রচুর মুনাজারা ও সহযোগিতা করে যাচ্ছি। এর পর দ্বিতীয় দশকেও অনুরূপ স্বপ্ন দেখলেন। এবার মনে মনে তিনি বিব্রত হলেন, চিন্তা পেরেশানী অবশ্যই হল, কিন্তু স্বপ্নের সঠিক অর্থ বুঝতে পারছিলেন না। কারণ, তাঁর মতে তো মু'তাযিলা ধর্মমতই আসল দীন ছিল।

তৃতীয় বার শেষ দশকে স্বপ্নে দেখলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন– আমি তোমাকে বলেছি, দীনের সাহায্যার্থে দাড়িয়ে যাও। কিন্তু তুমি এখনো প্রস্তুত হওনি। তখন স্বপ্নেই আবুল হাসান র. দরখাস্ত করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো জানিনা। আপনি বলুন, আমার আকাইদে কি কি ভুল ভ্রান্তি রয়েছে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে ইরশাদ করলেন– যদি আমি না জানতাম, আল্লাহ তা'আলা তোমার হেদায়াতের যিম্মাদারী স্বয়ং নিয়েছেন, তবে আমি এখান থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত সরতাম না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার ভুলভ্রান্তিগুলোর একেকটি করে বিশদ বিবরণ না করতাম। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং দায়িত্ব নিয়েছেন, তাই এর প্রয়োজন নেই। ফলে সকালে উঠলেন যখন তাঁর অন্তর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সমস্ত আকাইদের ব্যাপারে উন্মুক্ত তথা প্রশান্ত ছিল এবং মু'তাযিলী আকীদাসমূহের ক্রটিবিচ্ছুতিগুলোও তার অন্তরে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

দিনটি ছিল শুক্রবার। জামি' মসজিদে দাড়িয়ে সমাবেশে মু'তাযিলার সমস্ত ফাসিদ ধারণাগুলো স্পষ্টাকারে বলে তা থেকে তওবা করেন। অতঃপর তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমামে পরিণত হন। যা সূর্য অপেক্ষাও স্পষ্টতর।

৩. সুফিয়ায়ে কিরাম।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের চতুর্থ দল হল সুফিয়ায়ে কিরাম। মুহাদ্দিসীনে কিরামের মতে শ্রুত ঐতিহ্যগত প্রমাণ প্রবল। তাঁরা মাসায়েল প্রথমত শ্রুত প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত করেন। মুতাকাল্লিমীন আশআরী হোন বা মাতুরীদী- তারা শ্রুত-ঐতিহ্যগত এবং যৌক্তিক প্রমাণাদি উভয়ের উপর মাসায়েল নির্ভর রাখেন। উভয়টি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যুক্তি দ্বারা কোন নতুন বিষয় প্রমাণ করেন। বরং কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আকীদাগুলোকে যৌক্তিক প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত করেন। যৌক্তিক

সংশয়গুলোর উত্তরদান তাদের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। যুক্তি ও শ্রুত প্রমাণে সমন্বয় সাধন এবং আনুকূল্য সৃষ্টি করে উভয় থেকে মাসআলা প্রমাণ করেন। (ফযলুল বারী-আল্লামা উসমানী র.)

ঈমানের হাকীকত কি? এতে ইসলামী দলগুলো বরং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতেও বাহ্যত মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এ জন্য কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক।

ঈমানের আভিধানিক অর্থ ঃ

ايمان শব্দটি امن থেকে গৃহীত। এটি ভয়ের বিপরীত। امن এর অর্থ প্রশান্তি। خوف এর মধ্যে অস্থিরতা ও পেরেশানী হয়ে থাকে। আর امن এর অর্থ হল ভয় দুরীভূত হওয়া এবং মনে প্রশান্তি আসা। কুরআন মজীদে আছে-

وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا

আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাদের ভয়কে নির্ভয়ে পরিণত করে দিবেন। -সূরা নূর।

এতে বুঝা যায়, امن হল خوف এর বিপরীত। কাজেই امن হল ভয় দুরীভূত হয়ে প্রশান্তি এসে যাওয়া। ইরশাদে নববী রয়েছে- المؤمن من امنه الناس على دماءهم واموالهم -তিরমিযী শরীফ।

امن শব্দটি ثلاثی مجرد থেকে لازم। যেহেতু এটিকে باب افعال এ এনে ايمان বানানো হয়েছে, সেহেতু همزه افعال এটিকে متعدی করে ফেলেছে। এর অর্থ হল সম্পূর্ণ শংকা ও চিন্তামুক্ত করে দেয়া। অতএব, ঈমান আনয়নের অর্থও এটাই হয়ে থাকে যে, মুমিন তথা ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তি যে সব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে, সেগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্নতা থেকে শংকামুক্ত ও প্রশান্ত করে দেয়। অতএব, অবশ্যই তার সত্যায়ন ও মেনে নেয়া আবশ্যক হয়। এর দ্বারা এ বিষয়টিও স্পষ্ট হল যে, ঈমানের দু'টি অর্থই প্রকৃত। অর্থাৎ, শব্দ প্রণয়নকারী ايمان শব্দটিকে প্রথমে কোন জিনিস থেকে নিরাপত্তাদানের অর্থে প্রণয়ন করেছেন। কারণ, স্পষ্ট বিষয়, যখন কেউ কারো সত্যায়ন করে, তখন তাকে মিথ্যা প্রতিপন্নতা ও বিরোধিতা থেকে নিরাপত্তা দেয়।

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী র. এর তাহকীকও এটাই। তিনি বলেন-

كالمعنيين اللغويين معنيان حقيقيان للفظ الايمان وضع اولا لجعل الشيئ آمنا من امر ثم وضع ثانيا لمعنى يناسبه وهو التصديق فانك اذا صدقت المخبر فقد امنته من تكذيبك اياه (فيض البارى ج اول ص ٤٥)

সারকথা হল, ঈমানের আভিধানিক অর্থ হল সত্যায়ন করা এবং মেনে নেয়া। যেমন কুরআনে হাকীমে আছে-

وَمَاانْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صدقِيْنَ

অর্থাৎ, আপনি আমাদের কথার প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস আনবেন না। যদিও আমরা সত্যবাদী হই না কেন। (সূরা ইউসুফ) -ফায়যুল বারী ঃ ১/৪৫।

সারমর্ম এই, মনে রাখা উচিত যে, ঈমান ইলম ও মা'রিফাত তথা চেনা জানার নাম নয়। অতএব السماء فوقنا এবং الأرض تحتنا এর সত্যায়নকে ঈমান বলা যাবে না।

শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান হল

تصديق الرسول عليه السلام فى كل ماعلم مجيئه به بالضرورة تصديقا جازما الخ.

এর নাম। অর্থাৎ, ঈমান হল সে সব বিষয়ের প্রতি সত্যায়ন ও মেনে নেয়ার নাম, যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন।

আল্লামা উসমানী র. বলেন-

واما فى الشرع فهو التصديق بما علم مجئ النبي صلي الله عليه وسلم به ضرورة تفصيلاً فيما علم تفصيلا واجمالا فيما علم اجمالا وهذا مذهب جمهور المحققين.

-ফাতহুল মুলহিম ঃ ১/১৫২।

অর্থাৎ, যে সব বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনয়ন স্পষ্টভাবে জানা যায়, সেগুলোর প্রতি বিস্তারিত হলে বিস্তারিতভাবে, আর ইজমালী হলে সংক্ষেপে সত্যায়নের নাম ঈমান। অতএব, শুধু সত্য জানার নাম ঈমান নয়, বরং সত্য মানার নাম ঈমান।

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন কোন জিনিস বিস্তারিত আকারে বর্ণিত আছে। যেমন– নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি সংক্রান্ত এরূপ আহকাম যেগুলোর প্রমাণ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুতাওয়াতিরের সীমায় পৌঁছে গেছে। কারণ, এগুলোর কোন একটিকেও অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে।

কোন কোন জিনিস ইজমালীভাবে বর্ণিত আছে। যেমন– কিয়ামত আসন্ন। কিন্তু এর সুনির্দিষ্ট সময় জানানো হয়নি। যেমন– হাদীসে জিবরাঈলসহ আরো অনেক হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়। এরূপভাবে কবরের আযাব মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু ইজমালীভাবে এতটুকু প্রমাণিত যে, কবরের আযাব হবে। কিন্তু এর ধরণ কি হবে? এর বিস্তারিত বিবরণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। অতএব, এবার শুধু ইজমালীভাবে এতটুকু বিষয়ের উপর ঈমান আনা আবশ্যক যে, শাস্তিরযোগ্য লোকজনের উপর কবরের আযাব হবে। এর ধরণের বিস্তারিত বিবরণের উপর ঈমান আনয়ন জরুরী নয় যে, রূহের উপর আযাব হবে, না দেহের উপর, না দেহ আত্মা উভয়ের উপর?

কোন কোন বিষয় এরূপ রয়েছে, যেখানে কিছুটা ইজমালও রয়েছে, আবার তাফসীলও। সেখানে তাফসীলী বিষয়ের উপর বিস্তারিত আকারে, আর ইজমালী বিষয়ের উপর ইজমালীভাবে ঈমান আনয়ন জরুরী। যেমন– সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের নবুওয়ত ও হক্কানিয়তের প্রতি ঈমান আনয়ন করা ফরয। কোন কোন নবীর নাম সবিস্তারে এসেছে। আবার কোন কোন নবীর আলোচনা সবিস্তারে আসেনি। শুধু এতটুকু বাতলে দেয়া হয়েছে যে, আরো নবী প্রেরিত হয়েছেন। ইরশাদে রব্বানী রয়েছে-

مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ.

'কিছু কিছু নবী রয়েছেন এরূপ, যাদের জীবনী আমরা আপনার নিকট বর্ণনা করেছি। আবার কিছু সংখ্যক রয়েছেন, যাদের বিস্তারিত বিবরণ আমি দেইনি।' –সূরা মুমিন।

অতএব, যাঁদের নাম সবিস্তারে এসেছে, তাঁদের প্রতি সুনির্দিষ্টভাবে ঈমান আনতে হবে। যেমন– হযরত আদম, নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা আ. প্রমূখ। আর যাঁদের বিস্তারিত বিবরণ আসেনি, তাঁদের প্রতি ঈমান আনতে হবে ইজমালীভাবে। তথা যত নবী, রাসূল প্রেরিত হয়েছেন, সবার প্রতি ইজমালীভাবে ঈমান আনছি। অনুরূপভাবে আসমানী সমস্ত কিতাব সম্পর্কে বিস্তারিত জানা নেই, কিন্তু কুরআন মজীদ, তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাবুর যে আসমানী এ সম্পর্কে কুরআনে কারীম দ্বারা জানতে পারি।

অতএব, এসব গ্রন্থের প্রতিটির উপর এবং অন্যান্য আসমানী কিতাবের উপর ইজমালীভাবে ঈমান আনা জরুরী। آمنت بالله وملئكته - وكتبه ورسله

ইমামুল হারামাইন ও আল্লামা ইবনে হুমাম র.

ইমামুল হারামাইন র. বলেন, তাসদীক বা সত্যায়ন উলূম ও মা'আরিফের অন্তর্ভূক্ত নয়। বরং এটা হল কালামে নফসী। অর্থাৎ, কোন জিনিস অনুধাবন করার পর তার প্রতি ঝুকে পড়া এবং গ্রহণ করে নেয়া।

আল্লামা ইবনে হুমাম র. সর্বোত্তম ভাষায় বলেছেন, ঈমান হল তাসদীক ও মা'রিফাতের সাথে আন্ত রিকভাবে মেনে নেয়া ও তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। অর্থাৎ, অন্যের হাতে নিজের লাগাম দিয়ে দেয়া, ঘোড়া ইত্যাদির ন্যায় যেদিকে টানে, সেদিকে চলে যাওয়া।

অর্থাৎ, মুমিন সেই, যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জানার পর বাহ্যিক ও আন্ত রিকভাবে তার সামনে অনুগত হয়ে যায়, আনুগত্যের রশি তার গলায় পরে নেয় এবং নিজের উপর আনুগত্যকে আবশ্যক করে নেয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিকে যাবেন, আমিও সেদিকে যাব। এটাই হল আভ্যন্তরীন মান্যতা। যেটাকে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া র. 'আনুগত্যকে আবশ্যক করা,' আর অন্য মনীষীরা 'শরীয়তকে আবশ্যক করে নেয়া' দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

ঈমানের হাকীকত সংক্রান্ত মাযহাবসমূহের সারনির্যাস ঃ

ঈমানের হাকীকত সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে– আমলসমূহ ঈমানের হাকীকতে অন্তর্ভূক্ত কি না?

আল্লামা আইনী র. উমদাতুল কারী শরহে বুখারীর প্রথম খণ্ডে ১২০ পৃষ্ঠায় সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এর সারনির্যাস হল, ঈমান যুক্ত বিষয়, না একক? যারা একক মানেন, তাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। এরূপভাবে যারা যুক্ত মনে করেন, তাদের মধ্যেও ইখতিলাফ আছে যে, এই অংশগুলো اجزاء مقومه না কি اجزاء فرعيه?

اجزاء مقومه বলে সে সব অংশকে, যেগুলোর অস্তিত্বের উপর পূর্ণ বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভরশীল। এগুলো ছুটে গেলে পূর্ণ বস্তুই অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে اجزاء فرعيه تزئينيه مكمله ছুটে গেলে পূর্ণতা ও সৌন্দর্য খতম হয়ে যায়। পূর্ণ জিনিস অস্তিত্বহীন হয় না। অতঃপর যারা اجزاء مقومه মানেন, তাদের মধ্যেও মতবিরোধ রয়েছে– আমল ছুটে গেলে মানুষ কাফির হয়ে যায় কি না? মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকে কি না? এসব হল বিভিন্ন উক্তির ইজমালী সারনির্যাস। আমরা এখানে শুধু প্রসিদ্ধ উক্তি ও মাযহাবগুলোর বিবরণ দেব।

আহলে কিবলার প্রসিদ্ধ উক্তিসমূহ ঃ

আহলে কিবলার প্রসিদ্ধ উক্তি পাঁচটি–

১. ইমাম আবু হানীফা র. ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুকাহা ও মুতাকাল্লিমীনের। তাদের মতে ঈমান বসীত বা একক। এর হাকীকত হল আন্তরিক সত্যায়ন, আহকাম জারী করার জন্য মৌখিক স্বীকারোক্তি শর্ত। ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্য আমলগুলো জরুরী। এ উক্তিটি তত্ত্বজ্ঞানীদের নিকট প্রধান।

প্রমাণাদি ঃ

কুরআনে হাকীমে হানাফীদের পাঁচটি প্রমাণ পাওয়া যায়–

১. সে সব আয়াত, যেগুলোতে আমলকে ঈমানের উপর আত্ফ করা হয়েছে। যদ্বারা বুঝা যায়, আমল ঈমান থেকে ভিন্ন জিনিস। কারণ, আত্ফের আসল দাবি হল মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহের ভিন্নতা। এর পরিপন্থী হল আসলের খেলাফ। যার জন্য বাহ্যিক প্রমাণাদি ও নিদর্শণাদি প্রয়োজন। তাছাড়া যদি আমল ঈমানের অন্তর্ভূক্ত থাকে, তবে পূণরায় তা উল্লেখ করা মানে পুনরাবৃত্তি। যেমন- কুরআনে হাকীমে আছে-

إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ

'যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং নেক আমল করেছে।' –সূরা বাইয়্যিনাহ।

এরূপ শত শত আয়াত রয়েছে।

৩. দ্বিতীয় প্রকার হল যে সব আয়াতে আমলের জন্য ঈমানকে শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে, যেমন– কুরআনে হাকীমে আছে-

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

'যে ঈমানদার অবস্থায় নেক কাজ করে, (সে মূমিন)।'

পক্ষান্তরে শর্ত এবং মাশরূতে ভিন্নতা থাকে। মূলনীতি হল, কোন কিছুর শর্ত সে জিনিস থেকে বহির্ভূত হয়ে থাকে।

৩. সে সব আয়াত, যেগুলোতে। آمنوا দ্বারা সম্বোধন করে তওবার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন– কুরআন মজীদে আছে-

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَي اللهِ توبةً نَصُوْحًا. سورة التحريم.

কারণ, তওবা হয়, গুনাহ থেকে। যদি আমল ঈমানের অংশ হয়, তবে ঈমান হল নাফরমানীর পরিপন্থী এবং সম্বোধন দ্বারা ঈমান ও নাফরমানী উভয়টি একত্রিত হতে পারা যথার্থ মনে হয়। অথচ একটি জিনিস তার পরিপন্থী জিনিসের সাথে একত্রিত হতে পারে না।

৪. সে সব আয়াত যেগুলোতে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির উপর মুমিন শব্দ প্রয়োগ করেছেন। যেমন– কুরআনে কারীমে আছে–

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوْاالَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِئَ اِلٰى اَمْرِ اللهِ

'যদি মুসলমানদের দু'টি দল পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তবে তাদের মাঝে সন্ধি করিয়ে দাও। অতঃপর যদি তাদের একটি দল অপর দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তবে যে দলটি বাড়াবাড়ি করে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর হুকুমের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।' –সূরা হুজুরাত।

এতে বুঝা গেল, এতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর হুকুমের বাইরে ছিল, তা সত্ত্বেও তাকে মুমিন বলা হয়েছে।

৫. সে সব আয়াত যেগুলোতে ঈমানের স্থান কলব বলা হয়েছে এবং ঈমানকে অন্তরের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। যেমন– কুরআনে কারীমে আছে-

اُولٰئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ

'তাদের অন্তরে ঈমান লিখে দেয়া হয়েছে।' – সূরা মুজাদালা।

অন্যত্র ঈমানের সম্বন্ধ কলবের দিকে করা হয়েছে।

مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ.

'কেউ কেউ আছে, মৌখিক বলে যে, আমরা মুসলমান, অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনয়ন করেনি।' –সূরা মায়িদা।

এরপর হাদীস থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ সে সব হাদীস যেগুলোতে এ ধরণের বিষয় রয়েছে। যেমন-

يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال حبة من خردلٍ من ايمان.

যেগুলো দ্বারা ঈমানের স্থান অন্তর বুঝা যায়।

একটি সন্দেহের অপনোদন ঃ

হাদীস এবং কুরআনী প্রমাণাদির পঞ্চম প্রকার দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায়, ঈমান শুধু তাসদীক বা সত্যায়নের নাম। মৌখিত স্বীকারোক্তি ঈমানের অংশ নয়।

উত্তর ঃ ইমাম আজম আবু হানীফা র. এর একটি উক্তি তো এটি যে, (মৌখিক) স্বীকারোক্তি ঈমানের অংশ নয়। আর যদি ঈমানের অংশ সাব্যস্ত করা হয়, তবে বলা হবে, যেহেতু ঈমানের মূল গোড়াই তাসদীক বা সত্যায়ন। আর স্বীকারোক্তি হল তার ঘোষণা ও বহিঃপ্রকাশ। আন্তরিক বিশ্বাস ছাড়া স্বীকারোক্তি কোন কিছুই নয়। তাসদীক মূল রোকন। যা কোন অবস্থাতেই বাতিল হয় না। স্বীকারোক্তি হল অতিরিক্ত রোকন। ওযরের কারণে এটি বাদ পড়ে যায়। এজন্য মূল অংশের দিকে লক্ষ্য করে ঈমানের সম্বন্ধ কলবের দিকে করা হয়েছে। মৌখিক স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা করা হবে, যখন স্বীকারোক্তি ঈমানের অংশ বলে প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত হবে। এবার যে সব নস বাহ্যতঃ এর পরিপন্থী, সেগুলোতে অবশ্যই ব্যাখ্যা দেয়া হবে। কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা দেয়া যাবে না। কারণ, এই পর্যন্ত আমল ঈমানের অংশ বলে প্রমাণিত হয়নি। যাতে নসগুলোকে বাহ্যিক অর্থ থেকে ফিরিয়ে নেয়া যায়। অবশ্য এ বিষয়টি প্রশ্ন সাপেক্ষ। والله اعلم

২. দ্বিতীয় উক্তি হল, ইমামত্রয়, ইমাম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিসীনের। তাঁদের মতে ঈমান যুক্ত বিষয়। এর অংশ হল, অন্তরে সত্যায়ন, মৌখিক স্বীকারোক্তি ও রোকনগুলোর উপর আমল। কিন্তু সবগুলোর অংশত্ব এক রকম নয়। আন্তরিক স্বীকারোক্তি সমস্ত মূলের মূল। আর মৌখিক স্বীকারোক্তি ও আমলগুলো পূর্ণাঙ্গ রূপ দানকারী অংশ। اجزاء مقومه নয়।

এই বিস্তারিত আলোচনা থেকে পরিস্কার বুঝা গেল, হানাফী এবং ইমামত্রয়ের মধ্যে কোন ইখতিলাফ নেই। বিস্তারিত বিবরণ পরে আসছে।

৩. তৃতীয় উক্তি মুরজিয়া, কাররামিয়া ও জাহমিয়ার। সেটি হল ঈমান একক বস্তু। এ মাযহাবপন্থীরা আবার তিনদলে বিভক্ত–

ক. মুরজিয়া বলে, ঈমানের হাকীকত শুধু আন্তরিক বিশ্বাস। মৌখিক স্বীকারোক্তি ও আমল না ঈমানের রোকন, না শর্ত, না اجزاء مقومه, না اجزاء مكمله। বরং আমল ঈমানের সাথে সম্পর্কহীন। বদআমলী দ্বারা না ঈমানের রওনকে কোন পার্থক্য আসে, না পরকালিন নাজাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। অর্থাৎ, বিনা শাস্তিতে জান্নাতে যাবে।

খ দ্বিতীয় দল জাহমিয়া। তারা বলে, ঈমানের হাকীকত শুধু আন্তরিক মা'রিফাত। তাসদীক ও ইয়াকীনও জরুরী নয়।

গ তৃতীয় দল কাররামিয়া। তাদের মতে ঈমানের হাকীকত শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তি। এই শর্তে যে, অন্তরে যেন অস্বীকৃতি না থাকে।

মোটকথা, এই তিনটি দলের মধ্যে ঈমান শুধু বসীত বা একক বিষয়। এবার যার মধ্যে ঈমানের বসীত হাকীকত বিদ্যমান, তার জন্য বদ আমল ক্ষতিকর নয়।

প্রমাণে তারা হাদীসে নববী পেশ করেন– وان زنى وان سرق الخ (মুসলিম ঃ ১/১৬৬)

من قال لااله الا الله دخل الجنة। তবে এসব অজ্ঞ লোক

مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُه جَهَنَّمُ، مَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه.

لايدخل الجنة قتات، لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن الخ.

ইত্যাদি আয়াত ও হাদীসগুলোর দিকে লক্ষ্যই করে না। এ জন্যই বলে দিয়েছে, ঈমানের উপস্থিতিতে গুনাহ্ ক্ষতিকর নয়।

৪. চতুর্থ উক্তি হল খারিজীদের। তারা বলে, ঈমান যুক্ত বিষয়। এর অংশ হল অন্তরে সত্যায়ন, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং আরকানের উপর আমল। অর্থাৎ, আমল ঈমানের ارکان واجزاء مقومة এর অন্তর্ভূক্ত। কাজেই আমল তরককারী ব্যক্তি ইসলামের গন্ডি বহির্ভূত এবং কাফির হবে।

প্রমাণে তারা নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেন-

لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن الحديث. مسلم : ١/٥٥.

৫. পঞ্চম উক্তি হল মু'তাযিলার। তাদের মতে ঈমান মুরাক্কাব বা যুক্ত। এর অংশ হল, অন্তরে বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং আরকানের উপর আমল। অর্থাৎ, মৌখিক স্বীকারোক্তি ও আমল ঈমানের اجزاء مقومه। অতএব, আমল তরককারী ইসলামের গন্ডি বহির্ভূত। কিন্তু কাফির হবে না। কারণ, ঈমানের একটি অংশ আন্তরিক সত্যায়ন বিদ্যমান রয়েছে।

খারিজী ও মু'তাযিলার মধ্যে পার্থক্য হল, খারিজীরা ঈমান ও কুফরের মাঝে মধ্যম কোন স্তরের প্রবক্তা নয়। মু'তাযিলা মধ্যম স্তরের প্রবক্তা। ফলে মু'তাযিলার মতে কবীরা গুনাহকারী অথবা আমল তরককারী না মুমিন, না কাফির। যদি তওবা ছাড়া মরে যায়, তাহলে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

প্রমাণাদি ঃ

শেষোক্ত তিনটি উক্তি (তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম) বাতিল ফিরকাগুলোর। এসব উক্তি কিতাব ও সুন্নাতের আলোকে ভ্রান্ত ও প্রত্যাখ্যাত। তৃতীয় উক্তি ঈমান শুধু বসীত- এটি হল, মুরজিয়া, কাররামিয়া ও জাহমিয়ার মাযহাব। তাদের মতে ঈমানের সাথে আমলের কোন সম্পর্ক নেই। ঈমানের পর নামায, রোযা তরক করলে কোন ক্ষতি হবে না। গুনাহের কাজ এবং নাফরমানীর কারণে এক মুহুর্তের জন্যও জাহান্নামে যেতে হবে না। যেরূপভাবে একজন কাফির সারা জীবন সমস্ত নেক কাজ করলেও মুহুর্তের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। সর্বসম্মতিক্রমে জান্নাত তার উপর হারাম, এরূপভাবে গুনাহে নিমজ্জিত মুমিন ব্যক্তির উপরও জাহান্নাম সম্পূর্ণ হারাম। যেমনিভাবে কুফরের সাথে কোন ইবাদত উপকারী নয়, এমনিভাবে ঈমানের সাথে কোন গুনাহও ক্ষতিকর নয়। এটি কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত উক্তি।

কুরআনে কারীমে হযরত মূসা আ.এর ঘটনার বিবরণ রয়েছে। যখন হযরত মূসা আ. ফিরআউনের নিকট গেলেন এবং তার নিকট ইসলামের দাওয়াত প্রচার করলেন, তখন ফিরআউন বলতে লাগল, হে মূসা! আমার ধারণা মতে তোমার উপর যাদু করা হয়েছে। হযরত মূসা আ. উত্তরে বললেন-

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا اَنْزَلَ هٰؤُلَاءِ اِلاَّ رَبُّ السَّموٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَائِرَ. سورة بني اسرائيل.

এই আয়াত দ্বারা পরিস্কার বুঝা যায় যে, শুধু কলবী ইলম তথা অন্তরে জানার নামই ঈমান নয়।

অন্যত্র ইরশাদে ইলাহী রয়েছে-

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا . سورة النحل.

তারা সরাসরি জুলুম ও অহংকারবশতঃ এসব নিদর্শনাবলী তথা মু'জিযাগুলো অস্বীকার করেছে। অথচ তাদের অন্তরসমূহ সেগুলোর ইয়াকীন করে নিয়েছে। এতে আরো অধিক স্পষ্ট হয়ে গেল যে, শুধু অন্তরের বিশ্বাস জ্ঞানের পর্যায়ে ঈমান নয়। বরং জ্ঞানের পর্যায়ের পর অন্তরে গ্রহণ করে নেয়ার ধরণ সৃষ্টি হওয়া জরুরী। যেটি ইদরাক বা জ্ঞানের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত। যাকে উর্দূ ভাষায় ماننا এবং ফার্সী ভাষায় گرويدن দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। এই ইয়াকীন ছাড়া মুমিন নয়, কাফির।

এরূপভাবে কাররামিয়ার উক্তিও প্রত্যাখ্যাত এবং বাতিল। কারণ, আয়াতে রাব্বানী ও ইরশাদাতে নববী দ্বারা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হয় যে, ঈমানের স্থান অন্তর। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- اولئك كتب فى قلوبهم الايمان। -মুজাদালা।

২. مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ. سورة المائدة.

তাছাড়া ঈমানের হাকীকত শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তি হলে তো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই প্রমূখ মুনাফিকও অবশ্যই মুমিন হয়ে যাবে।

সতর্কবাণীঃ

কাররামিয়া সম্পর্কে সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ এটাই যে, ঈমানের হাকীকত শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তি। এটাই মুক্তির জন্য যথেষ্ঠ। হাফিজ আসকালানী র.ও বর্ণনা করেছেন-

والكرامية القائلون بان الايمان قول باللسان فقط وان اعتقد الكفر بقلبه. فتح الباري : ١٣/٢٩٢.

হতে পারে কোন কোন কাররামিয়ার এই উক্তি। কিন্তু তাহকীক হল কাররামিয়া এ কথার প্রবক্তা যে, পার্থিব আহকামে ঈমানের হাকীকত শুধু স্বীকারোক্তি। অর্থাৎ, যার মধ্যে স্বীকারোক্তি পাওয়া যাবে, তার ব্যাপারে আমরা মুমিনের আহকাম জারী করব। এবার যদি তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী অন্তরেও বিশ্বাস থাকে, তবে তার ঈমান পরকালেও নির্ভরযোগ্য এবং উপকারী হবে। আর যদি অন্তরে বিশ্বাস না থাকে, শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তি থাকে, তবে পার্থিব জগতে ঈমানের আহকামই জারী হবে। আখিরাতে জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে থাকবে।

আল্লামা আইনী র. তাদের মাযহাব সহীহ লিখেছেন-

ان الايمان مجرد الاقرار باللسان وهو قول الكرامية وزعموا ان المنافق مؤمن الظاهر

كافر السريرة فيثبت له حكم المؤمنين فى الدنيا وحكم الكافرين فى الاخرة.

এই ব্যাখ্যার পর আহলে হকের সাথে কাররামিয়ার বেশি মতবিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। ফল তাই, যা আহলে হক বলে।

এরূপভাবে জাহমিয়ার এই উক্তিও ভুল এবং প্রতাখ্যাত যে, ঈমানের হাকীকত শুধু অন্তরের মা'রিফাত। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَه كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَ هُمْ.

এরূপভাবে ঈমানের অর্থ হল সত্যায়ন। আর জাহমিয়ার উক্তি অনুযায়ী কোন নিদর্শন ব্যতীত অন্য দিকে ফিরে যাওয়া আবশ্যক হয়, যা বাতিল। ইমাম বুখারী র. তাদের মত খন্ডনের পরিপূর্ণ হক আদায় করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন।

চতুর্থ এবং পঞ্চম উক্তি হল ঈমান প্রকৃত অর্থেই মুরাক্কাব বা যুক্ত। অর্থাৎ, ঈমানের অংশগুলো হল অন্তরে বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল। যদি একটি ফরযও তরককারী হয়, তবে মুমিন থাকবে না। একারণেই তারা কবীরা গুনাহকারীকে ইসলামের গন্ডি বহির্ভূত এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا الخ. سورة الحجرات .

উক্ত আয়াতে মুবারকায় কবীরা গুনাহকারীকে মুমিন সাব্যস্ত করা হয়েছে। যদি নেক আমল ঈমানের অংশ হত, তাহলে এর বিপরীত জিনিসের সাথে মিলিত হওয়া যথার্থ হত না এবং দু'টি বিপরীতধর্মী বিষয় একত্রিত হওয়া আবশ্যক হত।

২. ইরশাদে ইলাহী- يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا. سورة التحريم.

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা গুনাহগারদেরকে মুমিন সাব্যস্ত করে সম্বোধন করেছেন এবং তওবার নির্দেশ দিয়েছেন।

৩. ইরশাদে রব্বানী- قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ -সূরা যুমার।

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমল তরককারী এবং কবীরা গুনাহকারী ব্যক্তিকে নিজের রহমত ও মাগফিরাতের আশা দিয়েছেন। অতঃপর এই বদনসীব খারিজী ও মু'তাযিলা চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলে নৈরাশ্যের হুকুম কিভাবে আরোপ করে?

৪. ইরশাদে বারী - وَاَطِيْعُوْا اللهَ وَرَسُوْلَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. سورة الانفال.

এই আয়াতে আনুগত্য ও আমলের নির্দেশ রয়েছে ঈমানের শর্তে। স্পষ্ট বিষয়, কোন জিনিসের শর্ত সে জিনিস থেকে বহির্ভূত হয়।

তাছাড়া প্রচুর হাদীসে আমল তরককারী এবং গুনাহকারীকে মুমিন সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন- وان زنى وان سرق হাদীস ইত্যাদি।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ঃ

প্রথম উক্তি এবং দ্বিতীয় উক্তি হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের। এই দু'টি উক্তিই হক। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ঐকমত্যে আমল ঈমানের হাকীকতের অন্তর্ভূক্ত নয়। বাকি রইল এই প্রশ্ন যে, এ দু'টি উক্তি পারস্পরিক বিরোধী।

◆ এর উত্তর হল এটি শুধু অভিব্যক্তির বিভিন্নতা। শাব্দিক বিতর্ক। কারণ, হানাফী ইসলামী আইনবিদগণ এবং উলামায়ে মুতাকাল্লিমীন একথা বলেন না যে, আমলের প্রয়োজন নেই। বরং তাঁরা বলেন, আমল ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্য জরুরী। আমল পরিহারকারী এবং গুনাহকারী অসম্পূর্ণ মুমিন।

এরূপভাবে ইমামত্রয় ও মুহাদ্দিসীনে কিরাম আমল তরককারীকে কাফির বলেন না। বরং অসম্পূর্ণ মুমিন বলেন। অতএব, উভয় উক্তির পরিণতি একই। কারণ, আমল পরিহারকারী মুমিন, তবে

অসম্পূর্ণ। অন্য ভাষায় বলা যায়, ইমামত্রয় আমলগুলোকে ঈমানের অংশ মানেন, তবে মূল ঈমানের অংশ নয়। বরং কামিল ঈমানের অংশ। যেমন– হাত, পা, নাক, কান, আঙ্গুল, মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। যেরূপভাবে এসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাকি থাকলে মানুষ জীবিত ও অবশিষ্ট থাকে, এরূপভাবে তখনও একজন মানুষ জীবিত থাকবে, যখন হাত বা কান কেটে দেয়া হয়। শুধু পার্থক্য হবে, প্রথম ছূরতে সে পূর্ণাঙ্গ মানব হবে, আর দ্বিতীয় ছূরতে হবে ত্রুটিপূর্ণ অসম্পূর্ণ। ঠিক অনুরূপ আসল ঈমান তো অন্তরের বিশ্বাস। কিন্তু ঈমানের পরিপূর্ণতা ও শোভা-সৌন্দর্যের জন্য আমল জরুরী অংশ। মুহাক্কিকীনে ইসলামের মতে এটাই হক ও প্রধান। এটা হানাফী ইসলামী আইনবিদ ও কালামশাস্ত্রবিদ ইমামগণের সিদ্ধান্ত। শুধু পরিভাষাগতভাবে ইমামত্রয় ও মুহাদ্দিসীনে কিরাম যখন ঈমান শব্দ বলেন, তখন ঈমান দ্বারা কামিল ঈমান উদ্দেশ্য নেন। বস্তুতঃ পরিভাষায় কোন বিতর্ক নেই।

ইমাম রাযী ও মুহাদ্দিসীনে কিরাম ঃ

ইমাম রাযী র.ও যেহেতু মুতাকাল্লিমীনের অন্তর্ভূক্ত। তিনি স্বীয় গ্রন্থ মানাকিবে শাফিঈতে এ মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং মুহাদ্দিসীনে কিরামের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করতে গিয়ে লিখেন যে, আমাদের বুঝে আসে না যে, আমলকে অংশ বলে অতঃপর এটা কিভাবে বলেন যে, আমল ফওত হলে ঈমান ফওত হয় না, অথচ এটি তো স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, অংশ ছুটে গেলে অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ জিনিস ফওত হয়ে যায়!

হাফিজ ইবনে হাজার র. এ প্রশ্নটি স্বীকার করে বলেন, যারা আমলকে অংশ বলেন, তারা মূল ঈমানের অংশ বলেন না, বরং পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অংশ বলেন। অতএব, এখন আমল ছুটে যাওয়ার পর মূল ঈমান অবশিষ্ট থাকবে। যার ভিত্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ঈমানে কামিল ফওত হয়ে যাবে। যার ফলে প্রাথমিকভাবে জান্নাতে প্রবেশের অধিকার থাকবে না। কিন্তু হানাফীগণ এই বিষয়টি অস্বীকার করেন না। একারণে হাফিজ ইবনে হাজার র. এটাকে শাব্দিক বিতর্কের ক্ষেত্রে প্রযেজ্য ধরেছেন।

পূর্ণ আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল, আহলে হক তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের এ দু'টি উক্তিতে কোন সংঘর্ষ ও প্রকৃত বিরোধ নেই।

◆ অতঃপর একটি প্রশ্ন হয় যে, আহলে হকের মধ্যে শাব্দিক মতবিরোধ কেন হল? অভিব্যক্তির এই পার্থক্য এবং ইখতিলাফের কারণ কি?

◆এর উত্তর হল ইমাম আজম র. এর যুগে মু'তাযিলার প্রভাব ছিল। এমনকি সরকারও ছিল মু'তাযিলা মতাবলম্বী। এ জন্য ইমাম আজম আবু হানীফা র. যুগের চাহিদা অনুসারে মু'তাযিলার পূর্ণ বিরোধিতা করেছেন। ইমাম শাফিঈ র. প্রমূখের যুগে মুকাবিলা হল জাহমিয়া ও কাররামিয়ার সাথে। এজন্য ইমাম শাফিঈ র. প্রমূখকে আমলের প্রতি জোর দেয়ার প্রয়োজন হয়। কারণ, এসব বাতিল ফিরকা আমলকে ঈমানের সাথে সম্পর্কহীন বলে।

মোটকথা, সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এক। শুধু অভিব্যক্তির পার্থক্য। এই ইখতিলাফ যুগের বিভিন্নতার পরিনতি।

ঈমান ও ইসলামের পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ

ইমাম গাযালী র. বলেন, উলামায়ে কিরামের এই বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে যে, ঈমান ও ইসলামের মাঝে সম্পর্ক কিরূপ? উভয়টি মুতারাদিফ, না মুতাসাভী? না উভয়ের মাঝে সম্পর্ক উমুম খুসূসের?

তাহকীক হল, নিসবত বর্ণনার জন্য উভয়ের অর্থ নির্ধারণ করা জরুরী। যদি ঈমান দ্বারা ঈমানে কামিল উদ্দেশ্য হয় এবং ইসলাম দ্বারাও ইসলামে কামিল উদ্দেশ্য হয়, তবে উভয়ের মাঝে তারাদুফ তথা তাসাভীর সম্পর্ক হবে। যেমন- ইমামত্রয়, মুহাদ্দিসীনে কিরাম এবং ইমাম বুখারী র.-এর মাযহাব।

তাঁদের প্রমাণ ইরশাদে রব্বানী –

فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

এই জনপদে সর্বসম্মতিক্রমে একটি পরিবারই ছিল মুসলমানদের। অর্থাৎ, হযরত লূত আ.-এর পরিবার। তাঁদেরকে মুমিন বলেছেন। আবার তাঁদেরকেই মুসলিমও বলেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল, ঈমান ও ইসলামের মাঝে তারাদুফের সম্পর্ক (উভয়টি সমার্থক)।

আর যদি ঈমানের সংজ্ঞা দেয়া হয় هو الانقياد الباطنى بشرط الانقياد الظاهرى এবং ইসলামের সংজ্ঞা দেয়া হয় هو الانقياد الظاهرى بشرط الانقياد الباطنى তবে এমতাবস্থায় সম্পর্ক তালাযুম ও তাসাভীর (উভয়ের অর্থ এক না হলেও বাস্তবে এক)।

আর যদি ঈমান দারা উদ্দেশ্য হয় শুধু তাসদীকে কলবী, অর্থাৎ, বাতিনী আনুগত্য, আর ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য হয় সাধারণ আনুগত্য, চাই অন্তর থেকে হোক বা মৌখিক অথবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা, তবে সম্পর্ক হবে উমুম খুসূস মুতলাকের। ইসলাম আম হবে, আর ঈমান হবে খাস।

আর যদি ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য হয় শুধু বাতিনী আনুগত্য, আর ইসলাম দ্বারা শুধু জাহিরী আনুগত্য, তাহলে সম্পর্ক হবে তাবায়ুন তথা বৈপরীত্যের। যেমন– ইরশাদে ইলাহী রয়েছে-

قَالَتِ الْاَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ

আল্লামা আইনী র. বলেন, আমার মতে প্রধান হল উভয়ের মাঝে عموم خصوص من وجه এর সম্পর্ক। কোন কোন ব্যক্তি মুমিন হবে, মুসলমান নয়। যেমন– অন্তরে বিশ্বাস করেছে, কিন্তু তা প্রকাশের সুযোগ পায়নি, এভাবেই ইনতিকাল হয়ে গেছে, এরূপ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট মুমিন, প্রকৃত মুসলমান নয়। আরেক ব্যক্তি মৌখিক স্বীকার করে, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করে না। সে মুসলমান, মুমিন নয়। যেমন– মুনাফিক।

আরেক ব্যক্তি মুমিনও মুসলমানও। যেমন– সাহাবায়ে কিরাম ও প্রতিটি মুখলিস মুমিন।

অতএব, ঈমান ও ইসলামে عموم خصوص من وجه এর সম্পর্ক হবে। এমতাবস্থায় একটি ছূরত বের হবে একত্রিত হওয়ার। আর দু'টি বের হবে বিচ্ছিন্নতার। যেমন– উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট। অনেক মুহাক্কিক এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লামা আইনী র. বলেন, والحق أن بينهما عموما وخصوصا من وجه

হাফিজ ইবনে রজব হাম্বলী র. ঈমান ও ইসলামের শরঈ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। যেটি নেহায়েত মূল্যবান এবং সোনালী অক্ষরে লেখার যোগ্য। তিনি বলেন,

الاسلام والايمان كاسمى الفقير والمسكين اذا اجتمعا تفرقا واذا تفرقا اجتمعا

পূর্ণ বক্তব্যের সারনির্যাস হল, ঈমান ও ইসলাম উভয়টির মাঝে নিঃসন্দেহে পার্থক্য আছে। আভিধানিক অর্থেও শরঈ অর্থেও।

আভিধানিক হাকীকতের আলোকে বিষয়টি কুরআনে কারীমের আয়াত-

قَالَتِ الْاَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا

দ্বারা স্পষ্ট। আর শরঈ হাকীকতের ক্ষেত্রে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে দো'আটি লক্ষনীয়, যেটি জানাযা নামায প্রসঙ্গে হাদীসগ্রন্থাবলীতে বিদ্যমান রয়েছে। সেটি হল-

اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَه مِنَّا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان

এতে জীবিতদের জন্য ইসলাম (যা জাহিরী আনুগত্য এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল বুঝায়) এর তাওফীকের জন্য দো'আ এবং মৃত ব্যক্তির জন্য ঈমান সহকারে মৃত্যুলাভের দো'আ উভয় শব্দের পারস্পরিক পার্থক্য ও নিসবত সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করছে। যদিও একটির ক্ষেত্রে অপরটির প্রয়োগ ও ব্যবহার প্রমাণিত আছে। والله اعلم وعلمه اتم.

٢. بَاب قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بُنِىَ الْاسْلَامُ عَلى خَمْسٍ وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ

وَيَزِيْدُ وَيَنْقُصُ قَالَ اللهُ تَعَالي لِيَزْدَادُوْا اِيْمَانًا مَعَ اِيْمَانِهِمْ- وَزِدْنَاهُمْ هُدًى- وَيَزِيْدُ اللهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًي — وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًي- وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَ هُمْ هُدًي واتـــهُمْ تَقْوهُمْ — وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ امَنُوْا اِيْمَانًا- وَقَوْلُه عَزَّ وَجَلَّ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هذه اِيْمَانًا فَاَمَّا الَّذِيْنَ امَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا- وَقَوْلُهُ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا- وَقَوْلُهُ وَمَازَادَهُمْ اِلَّا اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا — وَالْحُبُّ فِيْ اللهِ وَالْبُغْضُ فِيْ اللهِ مِنَ الْاِيْمَانْ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْد الْعَزِيْزِ اِلي عَدِي بْنِ عَدِيٍّ اَنَّ لِلْاِيْمَان فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُوْدًا وَسُنَنًا فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلْ الْاِيْمَانَ فَاِنْ اَعِشْ فَسَاُبَيِّنُهَا لَكُمْ حَتَّي تَعْمَلُوْا بِهَا- وَاِنْ اَمُتْ فَمَا اَنَا عَلي صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيْصٍ- وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْه السَّلَامُ وَلكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ- وَقَالَ مُعَاذٌ رضــ اِجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنْ سَاعَةً- وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْد رضــ اَلْيَقِيْنُ الْاِيْمَانُ كُلُّهُ- وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضــ لَايَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيْقَةَ التَّقْوي حَتي يَدَعَ مَا حَاكَ فِيْ الصَّدْرِ- وَقَالَ مُجَاهِدٌ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّي بِه نُوْحًا اَوْصَيْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ وَاِيَّاهُ دِيْنًا وَاحِدًا- وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضــ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا سَبِيْلاً وَّسُنَّةً - وَدُعَاءُكُمْ اِيْمَانُكُمْ.

২. অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। আর সে ঈমান মৌখিক স্বীকৃতি (ইয়াকীনসহ) এবং কর্ম উভয়ের সমষ্টি এবং তা বাড়ে ও কমে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- لِيَزْدَادُوْا اِيْمَانًا مَعَ اِيْمَانِهِمْ

'যাতে তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান দৃঢ় করে নেয়।' (সূরা ফাতহ ঃ ৪৮ ঃ ৪)।

وَزِدْنَا هُمْ هُدًى

'আমরা তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।' (সূরা কাহ্ফ ঃ ১৮ ঃ ১৩)।

وَيَزِيْدُ اللهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًي

'এবং যারা সৎপথে চলে আল্লাহ্ তাদের অধিক হেদায়াত দান করেন।' (সূরা মারইয়াম ঃ ১৯ ঃ৭৬)।

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًي

'এবং যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাদের হেদায়াত বাড়িয়ে দেন।' এবং

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَ هُمْ هُدًي واتـــهُمْ تَقْوهُمْ

'যারা সৎপথ অবলম্বন করে তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দেন। এবং তাদের তাকওয়া দান করেন।' (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৪৭ ঃ ৩১)

وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ امَنُوْا اِيْمَانًا

'ঈমানদারদের ঈমান আরো বাড়ে।' (সূরা মুদ্দাসসির)

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন-

اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هذه اِيْمَانًا فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا

'এ সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বাড়িয়ে দিল? যারা মু'মিন এ তো তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেয়।' (সূরা তাওবা ঃ ৯ ঃ ১২৪) এবং তাঁর বাণী-

فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا

"সুতরাং তোমরা তাদের ভয় কর; আর এটা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছিল" (আলে ইমরান ঃ ২৭৩)।

وَمَازَادَهُمْ اِلَّا اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا

"আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বাড়ল।" (সূরা আহযাব ঃ ২২)।

الحب في الله والبغض في الله من الإيمان (হাদীসের আলোকে) 'আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা ঈমানের অংশ।'

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي أن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعلموا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص.

'খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীয র. আদী ইবনে আদী র.-এর কাছে এক পত্রে লিখেছিলেন, 'ঈমানের কতকগুলো ফরয, কতকগুলো হুকুম-আহকাম, বিধি-নিষেধ এবং সুন্নাত-মুস্তাহাব রয়েছে। যে এগুলো পূর্ণভাবে আদায় করে তার ঈমান পূর্ণ হয়। আর যে এগুলো পূর্ণভাবে আদায় করে না, তার ঈমান পূর্ণ হয় না। আমি যদি ভবিষ্যতে বেঁচে থাকি তবে অচিরেই এগুলো তোমাদের কাছে বর্ণনা করব, যাতে তোমরা তার উপর 'আমল করতে পার। আর যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে জেনে রাখ, তোমাদের সাহচর্যে থাকার জন্য আমি লালায়িত নই।'

হযরত ইবরাহীম আ. বলেন,

وَلَكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ 'তবে এ তো কেবল চিত্তপ্রশান্তির জন্য' (বাকারা ঃ ২৬০)।

وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة মু'আয রা. (আসওয়াদ ইবনে হিলাল রা.কে) বলেন, 'এস, আমাদের সঙ্গে বস, কিছুক্ষণ ঈমানের আলোচনা করি।' وقال ابن مسعود اليقين الايمان كله হযরত ইবনে মাসঊদ রা. বলেন, 'ইয়াকীন হল পূর্ণ ঈমান।'

وقال ابن عمر لايبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر

ইবনে 'উমর রা. বলেন, 'বান্দা প্রকৃত তাকওয়ায় পৌছতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে, মনে যে বিষয়ে খটকা জাগে, তা ত্যাগ না করে।'

وقال مجاهد شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا

মুজাহিদ র. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

اوصيناك يا محمد! واياه دينا واحدا

অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ! আমি আপনাকে এবং নূহকে একই দীনের নির্দেশ দিয়েছি।

وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة ودعاءكم ايمانكم

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, شرعة ومنهاجا অর্থাৎ, পথ ও পন্থা (অধারাবাহিক) এবং তোমাদের দো'আ অর্থাৎ, তোমাদের ঈমান। (সূরা ফুরকান)

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ

ইমাম বুখারী র.-এর লক্ষ্য দু'টি মাসআলা–

১. ঈমান যুক্ত, না একক?

২. ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধি পায় কি না?

পূর্বোক্ত বক্তব্যের আলোকে বুঝা গেল, ইমাম বুখারী র. সে সব মুহাদ্দিসীনের অন্তর্ভূক্ত, যাঁরা ঈমানকে যুক্ত বলেন। এ লক্ষ্য উদ্দেশ্য প্রমাণ করার জন্য ইমাম বুখারী র. শিরোনামে তিনটি বাক্য বর্ণনা করেছেন–

১. بني الاسلام على خمس এ বাক্যটি হাদীসের একটি অংশ। সে হাদীসটি হল কিতাবুল ঈমানের সর্বপ্রথম রেওয়ায়াত। এ অনুচ্ছেদেই আসছে।

ইমাম বুখারী র. ইসলামকে ঈমানের মুরাদিফ (সমার্থক) সাব্যস্ত করে প্রমাণ পেশ করেছেন। হাদীসে এখানে ঈমানের ব্যাখ্যা নেই। আর যে সব হাদীসে ঈমানের ব্যাখ্যা আছে, যেমন– হাদীসে জিবরাঈলে, সেখানে ঈমান ও ইসলামের ব্যাখ্যা আলাদা আলাদা।

২. দ্বিতীয় বাক্যটি হল–.وهو قول وفعل

৩. তৃতীয় বাক্য হল– يزيد وينقص

এই তিনটি বাক্যের প্রতিটি প্রথম বাক্য দ্বিতীয়টির জন্য কারণের পর্যায়ভূক্ত এবং প্রতিটি দ্বিতীয় বাক্য পূর্বোক্তটির পরিণতি বা ফল। এভাবে যে, প্রথম বাক্য হল بني الاسلام على خمس। স্পষ্ট বিষয় যে, ইসলামের বুনিয়াদ যেহেতু পাঁচটি জিনিসের উপর, সেহেতু ইসলাম যুক্ত এবং অংশবিশিষ্ট। এর অংশগুলো হল উক্তি ও কর্ম। এবার যেখানে এ সব অংশ পরিপূর্ণ হবে, সেখানে ঈমানও কামিল হবে।

আর যেখানে অংশ পরিপূর্ণ হবে না, সেখানে ঈমানও ত্রুটিপূর্ণ হবে। অতএব, দ্বিতীয় মাসআলাটিও প্রমাণিত হল যে, ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি পায়।

هو যমীরের مرجع ইসলামও হতে পারে, আবার ঈমানও। ইসলাম হওয়ার কারণ এটি নিকটবর্তী। বস্তুতঃ مرجع নিকটবর্তী হওয়া উচিত। ইমাম বুখারী র.-এর মতে ঈমান ও ইসলাম একই। আর ঈমান একারণে مرجع হতে পারে যে, এখানে আসল হল কিতাবুল ঈমানই। অতঃপর বর্তমান কপিগুলোতে আছে- قول وفعل। কিন্তু অন্যান্য কপিতে আছে- قول وعمل। এ কপিটি প্রধান। কারণ, সলফ তথা পূর্ববর্তীদের উক্তিতে আমল শব্দই আছে। কিন্তু যেহেতু একটি অপরটির ক্ষেত্রে প্রচুর প্রয়োগ হয়, সেহেতু ইমাম বুখারী র. আমলের স্থলে فعل বলে দিয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ প্রশ্ন হল, তাসদীকে কলবী (আন্তরিক বিশ্বাস) মূল অংশ এবং সর্বসম্মতিক্রমে জরুরী। ইমাম বুখারী র. সেটি কেন উল্লেখ করলেন না।

উত্তর ঃ ১. قول কে ব্যাপক রাখা হবে। قول لسانى তথা মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং قول قلبى তথা অন্তরের সত্যায়ন উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত রাখা হবে।

২. অথবা فعل দ্বারা আম উদ্দেশ্য। অন্তরের কর্ম অর্থাৎ, সত্যায়ন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কর্ম অর্থাৎ, আমল উভয়টি উদ্দেশ্য।

৩. তাসদীকে কলবী যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে জরুরী এবং স্বীকৃত ছিল। এতে কোন দলের কোন মতবিরোধ নেই। অতএব, এ বিষয়টি সিদ্ধান্ত হয়ে আছে। এ সম্পর্কে আর মাথা ব্যথা নেই। এ সম্পর্কে আর আলোচনার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। বাকি যে দুই অংশে اقرار باللسان وعمل بالاركان (মৌখিক স্বীকারোক্তি ও আরকানের উপর আমলে) মতবিরোধ ছিল শুধু সেগুলো উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ এখানে একটি প্রশ্ন করা হয় যে, ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি জিনিসের উপর। তাহলে পাঁচটি জিনিসের উপর ইসলামের ভিত্তি রাখা হয়েছে। এ পাঁচটি জিনিস হল- مبنى عليه। আর ইসলাম হল-مبنى। মূলনীতি আছে- مبنى – مبنى عليه থেকে ভিন্ন জিনিস হয়ে থাকে।

উত্তর ঃ নাহবের (আরবী ব্যকরণের) মূলনীতি হল, হরফে জরগুলো একটি অপরটির স্থলে ব্যবহৃত হয়। এখানে على -من এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, بنى الاسلام من خمس। কাজেই কোন প্রশ্ন থাকল না।

ويزيد وينقص অর্থাৎ, ইবাদতের ফলে ঈমান বৃদ্ধি পায়, গুনাহের ফলে হ্রাস পায়। এখানে ইমাম বুখারী র. সলফের উক্তি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন। মূল উক্তি এটাই ছিল যে, ঈমান ইবাদত দ্বারা বৃদ্ধি পায় এবং গুনাহ দ্বারা হ্রাস পায়।

এ থেকে সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে, আমল ঈমানের অংশ নয়, বরং আমল ঈমান থেকে আলাদা একটি জিনিস। যদ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পায়। কারণ, কোন জিনিস নিজের সত্তা দ্বারা বৃদ্ধি পায় না। অর্থাৎ, কোন জিনিসে এর সত্তা দ্বারা বৃদ্ধি সৃষ্টি হয় না। যেমন- এটা বলা যথার্থ নয় যে, মানুষের মধ্যে তার মাথার কারণে বৃদ্ধি হয়। হ্যাঁ, এটা বলা যথার্থ যে, মানুষের মধ্যে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং স্থূলতা ইত্যাদির কারণে বৃদ্ধি হয়। যেরূপভাবে এটা বলা ঠিক নয় যে, রুকূর কারণে নামাযে বৃদ্ধি হয়। কারণ, রুকূ , সিজদা ছাড়া নামাযই হয় না। অতএব, রূকূ , সিজদা দ্বারা অস্তিত্ব হয়, বৃদ্ধি হয় না। বরং আদব ও সুন্নাতগুলোর প্রতি লক্ষ্য করার ফলে নামাযে বৃদ্ধি পায়।

অতএব, সত্তাগতভাবে ঈমানের একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। এই অস্তিত্বের পর তার বিভিন্ন অবস্থা হয়। বৃদ্ধিও পায় আমল ও ইবাদতের ফলে, আবার হ্রাসও পায় গুনাহের কারণে। এটাই বলেন ইমাম আজম র. যে, আমলসমূহ মূল ঈমান থেকে অতিরিক্ত, তার সত্তায় অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লামা নববী র. বলেন,

قال المحققون من اصحابنا المتكلمين نفس التصديق لايزيد ولاينقص والايمان الشرعى يزيد بزيادة ثمراته وهى الاعمال ونقصانها

◆ বর্তমান যুগের গাইরে মুকাল্লিদগণ বলেন যে, ইমাম বুখারী র. এ বাক্যটি দ্বারা হানাফীদের মত খন্ডন করেছেন। কারণ, হানাফীদের মতে ঈমান বসীত বা একক। ইমাম বুখারী র. ঈমানকে যুক্ত এবং হ্রাস-বৃদ্ধির যোগ্য সাব্যস্ত করছেন। কিন্তু এ বক্তব্য অজ্ঞতা প্রসুত ও ভ্রান্ত, অথবা মারাত্মক পক্ষপাতিত্ব ও বিদ্বেষ নির্ভর। কারণ, হানাফীগণ বলেন, ঈমানের জন্য অন্তরে বিশ্বাস থাকা জরুরী। এ ছাড়া মুমিনই হতে পারে না। যদি কারো আন্তরিক বিশ্বাস না থাকে, বরং সন্দেহ থাকে, তবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কারো মতে সে মুমিন নয়। হ্যাঁ, ইয়াকীনের স্তরগুলো বিভিন্ন রকম। যেমন- দিল্লি একটি শহর। এ বিষয়টির ইয়াকীন সে ব্যক্তিরও আছে, যে দিল্লি শহর দেখেছে এবং সে ব্যক্তিরও আছে, যে দেখেনি, শুধু শুনেছে। কিন্তু উভয়ের ইয়াকীনে ধরণগত পার্থক্য আছে। এরূপভাবে ঈমানও। কারণ, এটি তো শুধু তাসদীক বা সত্যায়নের নাম। কিন্তু এতে পরিপূর্ণতা দানকারী তথা আমলের মাধ্যমে বৃদ্ধি হতে থাকে। কিন্তু মুরজিয়া এর পরিপন্থী। তারা কোন প্রকার বৃদ্ধির প্রবক্তা নয়। কিন্তু ইমাম বুখারী র.এর উদ্দেশ্য মুরজিয়ার মত খন্ডন। হানাফীদের মত খন্ডন তো কোন ক্রমেই হতে পারে না। কারণ, হানাফীগণ ঈমানের জন্য পরিপূর্ণতা দানকারী অংশের প্রবক্তা। যেমন- বিস্তারিত বিবরণ আগে এসেছে। ইমাম বুখারী র.-এর পেশকৃত প্রমাণাদি দ্বারাও এটাই বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারী র. বাতিল ফিরকাগুলোর মত খন্ডন করছেন।

ইমাম বুখারী র.এর প্রমাণাদি ঃ

ইমাম বুখারী র. ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি প্রমাণের জন্য যে সব আয়াত পেশ করেছেন, সেগুলোর ইজমালী উত্তর হল, এসব আয়াত দ্বারা যে হ্রাস-বৃদ্ধি প্রমাণিত হয়, ইমাম আজম র. তা অস্বীকার করেন না। ইমাম র. যে হ্রাস-বৃদ্ধি অস্বীকার করেন, তা আয়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় না। অবশ্য মুরজিয়া সম্প্রদায় প্রভৃতির পূর্ণ রদ রয়েছে, যারা ব্যাপক আকারে হ্রাস-বৃদ্ধি অস্বীকার করে। লক্ষ্য করুন।

لِيَزْدَادُوْا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ

শাহ আবদুল কাদির র. মূযিহুল কুরআনে এর সুন্দর বক্তব্য দিয়েছেন যে, হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামকে মক্কার মুশরিকরা উমরা আদায়ে বারণ করল, তখন সাহাবায়ে কিরামের অন্তরে জিহাদী আবেগ উত্তেজিত হয়ে উঠল। অতঃপর যখন হযরত উসমান রা.কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীর নিকট দূত বানিয়ে প্রেরণ করেন এবং এই ভূয়া সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, মক্কাবাসী হযরত উসমান রা.কে শহীদ করে দিয়েছে, তখন এই সংবাদ আগুনে পেট্রোল নিক্ষেপের কাজ করল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর উপর বাইআত নিতে আরম্ভ করলেন। প্রায় ১৫শত সাহাবী ছিলেন, তারা এক এক করে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হস্ত মুবারকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে বাইআত হন। লড়াই করে জান দিতে প্রস্তুত হন। যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

এই বাইআতকে বলে বাইআতে রিযওয়ান। মোটকথা, তখন সাহাবায়ে কিরাম পরিপূর্ণ জান উৎসর্গ করার পরিস্থিতি প্রদর্শন করছিলেন। চিত্র ছিল–

عـــ سر میدان کفن بر دوش دارم.

মাথা কাটার খেলা। আর এর প্রবল আগ্রহের ফলে রক্ত টগবগ করছিল। জান নেয়া দেয়ার সুযোগের অপেক্ষা ছিল অস্থিরচিত্তে। হুকুম ফেলে তলোয়ার দ্বারা সমস্ত ঝগড়ার ফয়সালা করা হবে। শক্তিও কোন কম ছিল না। ইতিহাস সাক্ষী, সাহাবায়ে কিরামের ন্যায় প্রাণ উৎসর্গকারী সৈনিকদের এই বিশাল বাহিনীর সামনে কুরাইশ এবং তাদের পক্ষপাতিদের দল আর কিই ছিল।

চিন্তা করুন, এই তুচ্ছ দুনিয়া এবং খাহেশাতে নফসানীর জন্য যখন কেউ মরা ও মারার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন এর কি ধরণ হয়? এর দ্বারা অনুমান করুন, তখন প্রকৃত প্রেমাস্পদের খাতিরে জানবাজিতে অংশগ্রহণকারীদের প্রবল আবেগ আগ্রহের কি অবস্থা হয়ে থাকবে?

جرعه خاك آميز جوي مجنون كند ÷ صاف كرباشد نه دانم جويِ كند.

এমতাবস্থায় নির্দেশ আসে, সন্ধি করে নাও। যাতে সব শর্ত ছিল সরাসরি মুসলমানদের প্রতিকূল। বাহ্যতঃ এটা ছিল সরাসরি যিল্লতি। সাহাবায়ে কিরামের সমস্ত জযবা ও আগ্রহ একদম ফানা হয়ে যায়। প্রকৃত প্রেমাস্পদের ইঙ্গিতে যিল্লতি গ্রহণকে হুবহু ইয্যত মনে করে দুনিয়া টিকে থাকা পর্যন্ত গোলামীর উদাহরণ সৃষ্টি করে দেয়। সূর্য এসব সময়ে আল্লাহর গোলামদের এই গোলামীর শানের নজির দেখেনি যে, এখনো প্রকৃত প্রেমাস্পদের খাতিরে রণক্ষেত্রে রক্তে রঙ্গিন হওয়ার জন্য গো ধরে বসে আছে, আর এদিকে মুহূর্তের মধ্যে প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টির জন্য অবমাননা গ্রহণ করে নিচ্ছে!

زنده كنِي عطائي تو در بكشي فدائي تو ÷ دل شده مبتلائي تو هرجه كنِي رضائي تو.

অল্প কিছুক্ষন পর সাহাবায়ে কিরাম মাথা মুন্ডানো এবং ইহরাম খোলার ব্যাপারে এই বিলম্ব করেছেন যে, হয়ত সন্ধির এই নির্দেশ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইজতিহাদ, শীঘ্রই এর বিপরীত ওহীর মাধ্যমে জিহাদের নির্দেশ আসতে পারে। হযরত উম্মে সালামা রা. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্যোতির্ময় চেহারায় সাহাবায়ে কিরামের মাথা মুন্ডনে বিলম্বের কারণে কিছুটা পরিবর্তন অনুভব করলেন। ফলে তিনি আরয করলেন, আপনি তাবু থেকে বেরিয়ে নিজের মাথা মুন্ডে ফেলুন। তাহলে সাহাবায়ে কিরাম আপনার অনুসরণ করবেন। হযরত উম্মে সালামা রা. ছিলেন বড় বুদ্ধিমতি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাথা মুডাতে আরম্ভ করেন, তখন সাহাবায়ে কিরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে দ্রুত নেমে পড়েন। কারণ, এবার ওহী অবতরণ থেকে নিরাশ হয়ে গেছেন। এই পরিস্থিতির বিবরণ কুরআন মজীদ এভাবে দিয়েছে-

هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ . سورة الفتح.

সারকথা হল, এ আয়াতে আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতা'আলা স্বীয় প্রেমিকদের আনুগত্য ও ঈমানের দু'টি অবস্থার বিবরণ দিচ্ছেন। অতএব, এতে ঈমান বৃদ্ধির বিবরণ নেই। বরং ঈমানের দু'টি রং এর বিবরণ দেয়া হয়েছে। অতএব, এর দ্বারা ঈমানের জ্যোতি ও স্তর বৃদ্ধি প্রমাণিত হয়, যা হানাফীগণ অস্বীকার করেন না।

২. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى

ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য, এ আয়াত দ্বারা হেদায়াতে বৃদ্ধি প্রমাণিত হয়। বস্তুতঃ হেদায়াত ও ঈমান একই জিনিস। অতএব, প্রমাণিত হল ঈমানে বৃদ্ধি হয়। এখানেও প্রথমে এ আয়াতটির অর্থ বুঝতে হবে। আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কে।

রোমে দিকইয়ানুস নামক এক জালিম সম্রাট অতিক্রান্ত হয়েছে। সে ছিল চরমপন্থী প্রতিমাপূঁজক। সে জোরপূর্বক প্রতিমা পূঁজার প্রচার করত। যখন সাধারণ লোকজন কঠোরতা এবং কষ্টের ভয়ে কিছু দিন পার্থিব স্বার্থের স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করে প্রতিমা পূঁজা অবলম্বন করতে আরম্ভ করে, তখন সে দেশেই কয়েকজন যুবকের অন্তরে খেয়াল হল, একটি মাখলূকের খাতিরে সৃষ্টিকর্তাকে অসন্তুষ্ট করা ঠিক নয়। তাদের অন্তর আল্লাহ ভীতি এবং হেদায়াতের নূরে ছিল টইটুম্বুর। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধৈর্য্য, অটলতা, তাওয়াক্কুল এবং দুনিয়া বিমূখিতার দৌলতে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন। সম্রাটের সামনে গিয়েও তারা ঈমানী সাহসিকতা এবং অটলতা প্রদর্শন করেছেন। কুরআনে কারীম তাদের সত্য ঘোষণার আলোচনা করেছে–

رَبُّنَا رَبُّ السَّموتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَ مِنْ دُوْنِه اِلٰهاً لَّقَدْ قُلْنَا اِذاً شَطَطًا

'আমাদের প্রভু তিনি, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রতিপালক। আমরা কখনো তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্যকে ডাকব না। কারণ, তাহলে আমরা নিশ্চয় অনর্থক কথা বলে ফেলব।' –সূরা কাহাফ। অর্থাৎ, যেহেতু রব তিনিই, সেহেতু উপাস্যও তিনিই হবেন। রবুবিয়ত ও উপাসনা উভয়টি তার জন্য বিশেষিত।

তাঁরা এই তাওহীদের ঘোষণার প্রমাণ দিয়েছেন আল্লাহর রবুবিয়ত উল্লেখ করে। এর উপরও ক্ষান্ত হননি। বরং সে সব প্রতিমাপূঁজককে আহমক ও মূর্খ সাব্যস্ত করেছেন। কেন সবাই বিনা প্রমাণে রব ছেড়ে অন্য কিছুকে উপাস্য ঠাওরিয়েছে। এটা তো সরাসরি আহমকী। তাদের উদ্বুদ্ধ করে তাদের কাছ থেকে প্রমাণ তলব করেছেন এবং তাদের বড় জালিম ও বেইনসাফ বলেছেন।

لَوْلَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا.

'তারা তাদের উপাস্যদের পক্ষে কেন সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করে না? অতএব, তাদের চেয়ে বড় জালিম আর কে হবে? যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে।' –সূরা কাহাফ।

এ সব বিষয় দ্বারা স্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঈমানী অন্তরদৃষ্টি এবং বুঝ জ্ঞান কি পরিমাণ দান করেছিলেন? যার বদৌলতে তারা এরূপ দেশে এবং এরূপ আশংকাজনক স্থানেও পাহাড়ের ন্যায় ঈমানের উপর মুজবূত সুদৃঢ় এবং একত্ববাদী বিশ্বাসে অটল থাকেন এবং নিজের বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় দেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَزِدْنَاهُمْ هُدًى তথা আমি তাদের হেদায়াত আরো বাড়িয়ে দেই। অর্থাৎ, আমি তাদেরকে আরো বেশি বুঝ-জ্ঞান দান করি।

এবার নিজেই নিজ ফয়সালা দ্বারা প্রধান্য দিন যে, এখানে উদ্দেশ্য মূল ঈমানে বৃদ্ধি কি না? যেমন– ইমাম বুখারী র.-এর মাযহাব বর্ণনা করা হয়, না কি ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় তথা ঈমানী অন্তরদৃষ্টি, অটলতা, দৃঢ়তা এবং এর বুঝ-জ্ঞানে বৃদ্ধি উদ্দেশ্য? যেমন– হানাফীদের প্রসিদ্ধ মাযহাব।

৩. وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى

এটি সূরা মারইয়ামের আয়াত। এর পূর্বে কাফিরদের সম্পর্কে বলেছেন-

قُلْ مَنْ كَانَ فِيْ الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا.

'আপনি বলুন, যারা পথভ্রষ্টতায় আছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অবকাশ দিয়ে যাচ্ছেন।' অর্থাৎ, কাফিরদের গোমরাহীতে অব্যাহত কাল অতিক্রম হয়। এর দ্বারা বুঝা গেল, এর বিপরীত-

وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى

দ্বারাও উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে ঈমানের উপর স্থায়িত্ব ও অটলতা দান করেন। অতএব বৃদ্ধি দ্বারা উদ্দেশ্য অটলতা, দৃঢ়তা।

৪. وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰـهُمْ تَقْوٰيهُمْ

এটি হল সূরা মুহাম্মদের আয়াত। এই সূরাকে সূরায়ে কিতালও বলা হয়। এর পূবে

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْا اَهْوَاءَ هُمْ

আয়াতে কাফিরদের দু'টি দুর্ভাগ্যের বিবরণ দিয়েছেন। এর বিপরীতে মুমিনদেরও দু'টি প্রশংসিত গুনের বিবরণ দিয়েছেন। طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ এর মুকাবিলায় زَادَهُمْ هُدًى আর وَاتَّبَعُوْا اَهْوَاءَ هُمْ এর মুকাবিলায় وَاٰتَاهُمْ تَقْوٰيهُمْ বলেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল, زَادَهُمْ هُدًى দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি উদ্দেশ্য নয়। বরং অন্তরে ঈমানের নূর বৃদ্ধি উদ্দেশ্য। তেমনিভাবে طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ আয়াতে কুফরের অন্ধকার উদ্দেশ্য।

৫. وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمَانًا এ হল সূরা মুদ্দাসসিরের ৩১ নং আয়াতের একটি অংশ। এর পূর্বে কয়েকটি আয়াতে জাহান্নামের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (এর উপর নিযুক্ত ১৯জন ফিরিশতা। অর্থাৎ, জাহান্নামের ব্যবস্থাপনায় ফিরিশতা বাহিনী থাকবে। তাদের অফিসার হবে ১৯জন ফিরিশতা। তন্মধ্যে সবচেয়ে শীর্ষ দায়িত্বশীলের নাম মালিক।

◆ বাকি রইল এই প্রশ্ন যে, বিশেষ এই সংখ্যার কারণ কি?

◆ এর মূল উত্তর হল, সৃষ্টিজগত সম্পর্কে প্রশ্ন করা এবং কারণ অন্বেষণ করাই ঠিক নয়। পৃথিবীর ন্যূনতম সৃষ্টির কারণ কেউ বর্ণনা করতে পারে না।

◆ দ্বিতীয়তঃ শাহ আবদুল আযীয র. ১৯ সংখ্যার কোন কোন হিকমত বর্ণনা করেছেন। এগুলো দেখার মত। সারকথা, জাহান্নামে অপরাধীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য ১৯প্রকার দায়িত্ব রয়েছে। তন্মধ্য হতে প্রতিটি সম্পাদনের জন্য একেক জন ফিরিশতাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কোন সন্দেহ নেই, ফিরিশতার শক্তি বিপুল। একজন ফিরিশতা এরূপ কাজ করতে পারে, যা লক্ষ মানুষ মিলেও করতে পারে না।

কিন্তু স্মর্তব্য হল, প্রতিটি ফিরিশতার এই শক্তি সে গন্ডিতেই সীমাবদ্ধ, যাতে কাজ করার জন্য সে আদিষ্ট হয়। যেমন– আযরাঈল আ. লক্ষ মানুষের জান এক মূহুর্তে বের করতে পারেন। কিন্তু মহিলার পেটে একটি শিশুর প্রাণ দিতে পারেন না। হযরত জিবরাঈল আ. চোখের পলকে ওহী আনতে পারেন, কিন্তু বৃষ্টি বর্ষণ তার কাজ নয়। যেরূপভাবে কান দেখতে পারে না, চোখ শুনতে পারে না। যদিও নিজ প্রকারের কাজ যতই কঠিন হোক তা সম্পাদন করতে পারেন। যেমন– কান ক্লান্ত অবসন্ন হওয়া ব্যতীত হাজার আওয়াজ শুনতে পারে। চোখ অক্ষমতা ছাড়াই হাজার রং দেখতে পারে। এরূপভাবে যদি আযাবের জন্য এক জন ফিরিশতা জাহান্নামীদের উপর নিযুক্ত হন, তবে তার দ্বারা একই প্রকার শাস্তি জাহান্নামীদের হতে পারে। অন্য প্রকার আযাব হতে পারে না। যেগুলো তার ক্ষমতার গন্ডিবহির্ভূত। এজন্য ১৯প্রকারের আযাবের জন্য (যেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ তাফসীরে আযীযীতে রয়েছে) ১৯জন ফিরিশতা নিযুক্ত হয়েছেন।

উলামায়ে কিরাম এই সংখ্যার হিকমত সম্পর্কে অনেক আলোচনা করেছেন। কিন্তু আমার মতে (আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী র. এর মতে) শাহ সাহেব র.এর উক্তি খুবই গভীর ও সুক্ষ্ম। এই ব্যাখ্যা সম্পর্কে মক্কার আহমক পৌত্তলিকরা ঠাট্টা মশকারী করতে শুরু করে। তাদের এক পালোয়ান বলে উঠে

'১৭জনের জন্য তো আমি একাই যথেষ্ট। বাকি দুইজনকে সমস্ত মক্কাবাসী মিলে কোথায় ছেড়ে দিবে?' এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَاجَعَلْنَا اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰئِكَةً وَّمَاجَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّافِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا

'আমি জাহান্নামের দায়িত্বশীল শুধু ফিরিশতা বানিয়েছি। আর তাদের সংখ্যা বানিয়েছি কাফিরদের জন্য পরীক্ষার বস্তু।' –সূরা মুদ্দাসসির।

এ সংখ্যার বিবরণের হিকমতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এক তো এ সংখ্যার বিবরণে অস্বীকারকারীদের পরীক্ষা রয়েছে। দেখছি কে তা শুনে ভয় পায়? আর কে হাসি মজাক করে? উদ্দেশ্য, এই বেওকুফরা জানেনা, সেই জাহান্নামের দারোগারা তাদের মত মানব নয়। বরং ফিরিশতা। যাদের শক্তির অবস্থা হল, একজন ফিরিশতা কওমে লূত আ.এর পূর্ণ জনপদকে এক বাহুতে তুলে উল্টে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় হিকমত হল– لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ 'যাতে কিতাব প্রদত্ত লোকেরা ইয়াকীন করে নেয়।'

অর্থাৎ, আহলে কিতাব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত এবং কুরআনের সত্যতার ইয়াকীন করে নেয় এবং তাদের ক্ষেত্রে প্রমাণ পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়। কারণ, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহেও জাহান্নামের দারোগাদের এ বিবরণই এসেছে। বাহ্যতঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মী ছিলেন। আসমানী কিতাবসমূহের জ্ঞান অর্জিত ছিল না। তা সত্ত্বেও ওহী ছাড়া আন্দায অনুমান ইত্যাদি দ্বারা বলা যায় না, এরূপ একটি বিষয়ের সংবাদ দান প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরআনে কারীমের সত্যতার একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ। প্রমাণটিও এরূপ যে, দুশমন আহলে কিতাবও তা অস্বীকার করতে পারে না। তাদেরও স্বীকার করতে হয়। বস্তুতঃ শত্রুর মুখ থেকে স্বীকৃত প্রমাণ হওয়ার কারণে ঈমানদারদেরও অধিক প্রশান্তি, বক্ষউন্মুক্তি, ঈমানী আনন্দ ও প্রফুল্লতা অবশ্যই অর্জিত হবে। এ হল তৃতীয় হিকমত। প্রথম দু'টি হিকমতের বিবরণ দেয়ার পর এগুলোর সাথে সাথে এই তৃতীয় উক্তিটিও হিকমতের বিবরণ দিয়েছে–

وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمَانًا

'এবং যাতে ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।' –সূরা মুদ্দাসসির।

এই বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট যে, এখানে বৃদ্ধি দ্বারা মূল ঈমানে বৃদ্ধি উদ্দেশ্য নয়। বরং ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় তথা ঈমানী আনন্দ উন্মুক্তি এবং প্রশান্তি বৃদ্ধি উদ্দেশ্য। যেমন– হযরত ইবরাহীম আ.এর ঘটনায় রয়েছে– তিনি স্বচক্ষে মৃতদের জীবনদানের ধরণ প্রত্যক্ষ করার আকাঙ্খা প্রকাশ করলে উত্তরে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

اَوَلَمْ تُؤْمِنْ؟ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ . سورة البقرة.

অর্থাৎ, ঈমান তো পরিপক্ক। এবার প্রত্যক্ষ দর্শনের আবেদনের কারণ হল অধিক উন্মুক্তি ও প্রশান্তি অর্জন, যা ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত।

তাছাড়া এখানে ইমাম আজম র.-এর উত্তর آمنوا بالجملة ثم بالتفصيلও চলতে পারে। কারণ, ঈমানদাররা প্রথমে এই মূলনীতির উপর ঈমান আনয়ন করেছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব সংবাদ দিবেন, আমরা সেগুলো বিশ্বাস করব। এটি ছিল ইজমালী এরূপ একটি বিষয়, যার প্রতি ঈমান আনয়ন করা হয়। (কারণ, এর লাখ লাখ খুটিনাটি ও শাখাগত বিষয় হতে পারে।) এই ইজমালী مومن به এর একটি তাফসীল (অর্থাৎ, একটি শাখাগত বিষয়) এটি হল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ

দিলেন যে, জাহান্নামের দারোগা ১৯জন। মুমিনরা শুনা মাত্রই নির্দ্বিধায় বিনাপ্রশ্নবানে এর উপর ঈমান আনয়ন করেছে। অতএব, آمنوا بالجملة ثم بالتفصيل প্রমাণিত হল। এটাকেই বলা হয়েছে-

وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ امَنُوْا اِيْمَانًا

৬. اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هذه اِيْمَانًا فَاَمَّا الَّذِيْنَ امَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا

এটি সূরা তওবার শেষ রুকূর আয়াত। ইমাম বুখারী র. এ আয়াত দ্বারাও ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধির উপর প্রমাণ পেশ করেছেন। এই আয়াতটিরও পূর্বাপরের সাথে মিলিয়ে অর্থ বুঝতে হবে।

কিন্তু প্রথমতঃ ভূমিকা স্বরূপ একটি উদাহরণ মনে রাখতে হবে। সেটি হল সমস্ত গবেষণা এবং প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা প্রমাণিত যে, সর্বোৎকৃষ্ট খাবার যদি কোন হজমশক্তি বিনষ্ট রোগীকে খাওয়ানো হয়, তখন তার রোগ আরো বাড়বে। পেটে ময়লা, অপবিত্রতা আরো বৃদ্ধি করবে। আগে যদি পাঁচ বার দস্ত হয়, এবার হবে ১৫বার। এবিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত। আরেকটি সর্বজন স্বীকৃত বিষয় হল, ফাসাদ বা বিপর্যয় এ খাবারে নয়, বরং তার পেটে ও হজমশক্তিতে। অন্যথায় সুস্থ ব্যক্তির মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয় না কেন? অতএব, তার পেটের সংস্কার হওয়া উচিত।

এই ভূমিকা মনে রাখার পর এবার পূর্ণ আয়াতের দিকে লক্ষ্য করুন–

وَاِذَا مَا اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هذه اِيْمَانًا

'আর যখন কুরআনের কোন সূরা নাযিল হয়, তখন মুনাফিকরা পরস্পরে অথবা কোন সাধারণ মুসলমানের সাথে ঠাট্টা-মশকারী করে বলে– এই সূরা তোমাদের কার কার ঈমান বৃদ্ধি করেছে?'

উদ্দেশ্য ছিল নাউযুবিল্লাহ, এই সূরাতে আছেই বা কি? কি হাকিকত ও মা'রিফাত বা জ্ঞাতব্য বিষয় এখানে আছে, যেগুলো ঈমান-ইয়াকীন বৃদ্ধির কারণ হতে পারে?

আল্লাহ তা'আলা উত্তর দিয়েছেন-

فَاَمَّا الَّذِيْنَ امَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا الخ.

তথা নিঃসন্দেহে আল্লাহর কালাম শুনে মুমিনদের ঈমান তরতাজা হয় এবং তা বৃদ্ধি পায়। অন্তরে আনন্দ সৃষ্টি হয়। মনে প্রফুল্লতা আসে। হ্যাঁ, যাদের অন্তরে কুফর, মুনাফিকীর রোগ ও ময়লা আছে, তাদের, রোগ ও ময়লা বেড়েই চলে। এমনকি এই রোগ তাদের প্রাণ নাশ করে দেয়।

باران که در لطافت طبعش خلاف نیست ÷ در باغ لاله روید ودر شوره بوم خس.

উদাহরণ স্বরূপ কোরমা খুবই উত্তম এবং শক্তিশালী খাদ্য। কিন্তু যার পেট খারাপ, তার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

ঈমান বৃদ্ধির পন্থা ঃ

প্রথমতঃ পন্থা হল, প্রতিটি সূরায় কিছু নতুন জ্ঞাতব্য বিষয় বা নতুন বিধিবিধান অবতীর্ণ হয়, যেগুলো ইজমালী مومن به এর তাফসীল হয়ে থাকে। তা নাযিল হলে ঈমানদারগণ যখন এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন, তখন آمنوا بالجملة ثم بالتفصيل বাস্তবায়িত হয়। এটিকেই زادتهم বলেছেন। অর্থাৎ, مومن به এর ভিত্তিতে ঈমান বৃদ্ধি বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ যখন নতুন সূরা নাযিল হয়, তখন কিছু নতুন প্রমাণ জানা যায়, এই নতুন প্রমাণাদি দ্বারা ঈমান, ইয়াকীনে মিষ্টতা, প্রফুল্লতা ও শক্তি অর্জিত হয়।

৭. فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا

এটি সূরা আলে ইমরানের আয়াত। পূর্ণ আয়াত শানে নুযূলসহ লক্ষ্য করুন।

এর শানে নুযূল হল, উহুদ যুদ্ধ শেষ হবার পর যখন কুরাইশের কাফিররা উহুদ রণাঙ্গন থেকে প্রত্যাবর্তন করে, তখন পথিমধ্যে মনে হল, আমরা বিরাট ভুল করেছি। পরাস্ত ও আহত মুসলমানদেরকে এমনিই ছেড়ে চলে এসেছি। পরামর্শ শুরু হল যে, পূনরায় মদীনায় যেয়ে তাদের বিষয়টি চুকিয়ে আসা দরকার। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সংবাদ পেয়ে ঘোষণা দিলেন, যারা গতকাল আমাদের সাথে যুদ্ধে উপস্থিত ছিল, আজকে যেন তারা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবণে প্রস্তুত হয়। মুসলমান মুজাহিদগণ তাজা যখম সহ আল্লাহ ও রাসূলের আহবানে বেরিয়ে পড়েন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে মুজাহিদ বাহিনী সহ হামরাউল আসাদ নামক স্থান পর্যন্ত (মদীনা তাইয়্যিবা থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান) পৌঁছেন। মুসলমানরা কাফিরদের পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হয়েছেন– সংবাদ শুনে আবু সুফিয়ান মারাত্মক ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। পুনরায় আক্রমণের ইচ্ছা বাতিল করে মক্কা অভিমূখে পালাল।

আবদুল কায়েসের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা মদীনায় আসছিল, আবু সুফিয়ান কিছু (মালপানি) দিয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করল, যেন মদীনায় গিয়ে তারা এরূপ সংবাদ প্রচার করে, যা শুনে মুসলমানরা তাদের ব্যাপারে প্রভাবিত ও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা মদীনায় পৌঁছে বলতে আরম্ভ করে যে, মক্কাবাসী ভারী অস্ত্রসস্ত্র, রসদ উপকরণ এবং বিশাল বাহিনী মুসলমানদের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে তৈরি করেছে। এতদশ্রবণে মুসলমানদের অন্তরে ভয়ের স্থলে ঈমানী জোশ-উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পায়। কাফির বাহিনীর হাল অবস্থা শুনে বলতে শুরু করেন– حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ -গোটা দুনিয়ার মুকাবিলায় শুধু আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য যথেষ্ট। এর উপর আয়াত অবতীর্ণ হয় –

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

'তারা এরূপ (মুখলিস) লোক যে, লোকজন তাদেরকে বলল, তারা তোমাদের (মুকাবিলার) জন্য রসদ উপকরণ সঞ্চয় করেছে। অতএব, তোমাদের তাদের ভয় করা উচিত। তখন এ সংবাদ তাদের ঈমান আরো বাড়িয়ে দেয়।'

অর্থাৎ, ঈমানী জোশ, তাওয়াক্কুল এবং নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। কুরআনে কারীমের আয়াত حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ এর সুস্পষ্ট প্রমাণ।

অতএব, এখানে ঈমান বৃদ্ধি দ্বারা ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় বা ঈমানের স্থান বৃদ্ধি উদ্দেশ্য। ঈমানের হাকীকত বৃদ্ধি উদ্দেশ্য নয়।

কেউ কেউ এর শানে নুযূল বলেছেন বদরে সুগরা। কারণ, উহুদ যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আবু সুফিয়ান যাবার প্রাককালে বলেছিল– وموعدنا البدر। অর্থাৎ, আগামী বছর বদর ময়দানে পুনরায় শক্তি পরীক্ষা (লড়াই) হবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা গ্রহণ করে নেন। পরবর্তী বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে নির্দেশ দিলেন, জিহাদের জন্য চল। কেউ না গেলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একা যাবেন।

এদিকে আবু সুফিয়ান বাহিনী নিয়ে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়ে। সামান্য দূর অতিক্রমের পর সাহস ভেঙ্গে পড়ে। প্রভাব ও ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ভিক্ষের ওযর পেশ করে মক্কায় ফিরে যেতে চায়। আর যেন এমন ছুরত হয় যে, দোষটি পড়ে মুসলমানদের গায়ে। একব্যক্তি মদীনায় যাচ্ছিল, তাকে কিছু মালপানি দিয়ে বলল, যাতে সেখানে গিয়ে তাদের পক্ষ থেকে এরূপ সংবাদ প্রচার করে, যেগুলো শুনে মুসলমানরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়, আর যুদ্ধের জন্য বের না হয়।

সে মদীনায় পৌঁছে বলতে শুরু করে, মক্কাবাসীরা বিশাল বাহিনী সমবেত করেছে। যুদ্ধ তোমাদের জন্য উত্তম নয়। মুসলমানদেরকে আল্লাহ তা'আলা অটলতা দান করলেন। তারা বলল, আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট।

অবশেষে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বদরে পৌঁছেন। সেখানে বিরাট বাজার বসত। তিনদিন সেখানে ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর মুনাফা অর্জন করে মদীনায় ফিরে আসেন। এই যুদ্ধকে বলে বদরে সুগরা। তখন যে সব লোক সঙ্গ দিয়েছিলেন এবং রণ প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, তাদের জন্য এই সুসংবাদ। কারণ, উহুদে আহত হয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পুনরায় এরূপ সাহসিকতা দেখিয়েছেন। মুসলমানদের এই সাহসিকতা ও প্রস্তুতির সংবাদ শুনে পৌত্তলিকরা পথিমধ্য থেকে ফিরে যায়। এ জন্য মক্কাবাসী এই অভিযানের নাম দেয়- حيش السويق অর্থাৎ, সে সৈন্যবাহিনী যেটি শুধু ছাতু খাওয়ার জন্য গিয়েছে আর তা খেয়ে ফিরে চলে এসেছে।

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ

অর্থাৎ, আল্লাহর অনুগ্রহ দেখো। না কোন লড়াই করতে হয়েছে, না কাটাবিদ্ধ হয়েছে, ফ্রি সওয়াব অর্জন করেছে, ব্যবসা মুনাফা করে শত্রুদের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে আল্লাহর সন্তুষ্টি নিয়ে সহীহ সালামতে ঘরে ফিরে এসেছে।

প্রধান উক্তি হল, এসব আয়াতের সম্পর্ক বদরে সুগরার সাথে নয়। বরং গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদের সাথে। গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদের বিস্তারিত বিবরণের জন্য নাসরুল বারী কিতাবুল মাগাযী দ্রষ্টব্য।

৮. وَمَازَادَهُمْ اِلَّا اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا

এটি হল সূরা আহযাবের ২২নং আয়াতের অংশ। এ আয়াতের সম্পর্ক খন্দক যুদ্ধের সাথে। যখন মুশরিকরা সিদ্ধান্ত করেছিল, সব গোত্র মিলে মদীনা মুনাওয়ারায় চড়াও হয়ে আক্রমণ করে মুসলমানদের সম্পূর্ণ মুলোৎপাটন করে দিবে। এর চিত্র কুরআন মজীদ এঁকেছে এভাবে-

اِذْ جَاءُوْكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللهِ الظُّنُوْنَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا. سورة الأحزاب ١٠، ١١.

এর দাবি ছিল সাহাবায়ে কিরামের ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়া। অথচ এর পরিবর্তে তাদের তাওয়াক্কুল শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। এর চিত্র কুরআনে কারীমে এভাবে অঙ্কিত হয়েছে–

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُوْلُه وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُوْلُه وَمَازَادَهُمْ اِلَّا اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا

শানে নুযূল দ্বারা প্রমাণিত হল ঈমান বৃদ্ধি দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হল তাওয়াক্কুল বৃদ্ধি।

নোটঃ গাযওয়ায়ে আহযাব তথা খন্দক যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণের জন্য নাসরুল বারী কিতাবুল মাগাযী দ্রষ্টব্য।

এর পর ইমাম বুখারী র. স্বীয় দাবি প্রমাণার্থে কয়েকজন সাহাবী ও তাবিঈর আছর পেশ করছেন।

প্রশ্ন ঃ ইমাম বুখারী র. প্রথম আয়াতটি قال الله تعالى দ্বারা শুরু করেছেন। এর অধীনে পাঁচটি আয়াত উল্লেখিত হয়েছে। মাঝখানে قوله تعالى এর পুনরাবৃত্তি নেই। অতঃপর ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম আয়াত قوله দ্বারা শুরু করেছেন। এতে হিকমত কি?

উত্তর ঃ যদিও এই ৮টি আয়াত কুরআন মজীদের, কিন্তু পার্থক্য হল প্রথম পাঁচটি আয়াতের বিষয় আল্লাহ তা'আলারই পক্ষ থেকে, কারো উক্তির বিবরণ নয়। আর শেষ তিনটি আয়াতে অন্যের উক্তির বিবরণ। ৬ষ্ঠ আয়াতে কাফিরদের ঠাট্টা-মশকারীর উত্তর। ৭ম আয়াতে কাফিরদের সাবধানবানীর উপর মুসলমানদের দৃঢ়তা ও অটলতার বিবরণ। ৮ম আয়াতেও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মুসলমানদের হিম্মত, সাহসিকতা ও অটলতার বিষয়টির বিবরণ রয়েছে। والله اعلم ।

والحبّ فى الله والبغض فى الله من الايمان আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং তারই উদ্দেশ্যে বিদ্বেষ পোষণ করাও ঈমানের অন্তর্ভূক্ত। ইমাম বুখারী র. এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করতে চান যে, ভালবাসা ও বিদ্বেষ ঈমানের অংশ। ভালবাসা ও শত্রুতার স্তরও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। অতএব, ঈমানেও হ্রাস-বৃদ্ধি প্রমাণিত হল।

উত্তর ঃ ১. যদি এটি ইমাম বুখারী র. এর নিজস্ব উক্তি হয়, তবে প্রমাণ নয়। আর যদি হাদীস হয়, তবে এ বিষয়টি হাদীস গ্রন্থাবলীর কোথাও পাওয়া যায় না। সুনানে আবু দাউদে হাদীসটি এরূপ-

من احبّ لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان

'যে আল্লাহর জন্য মহব্বত করে ও আল্লাহর জন্য বিদ্বেষ পোষণ করে এবং আল্লাহর জন্যই দান খয়রাত করে এবং আল্লাহর জন্যই দান থেকে বিরত থাকে, তবে সে ঈমান পূর্ণাঙ্গ করে ফেলেছে।

২. যদি মেনে নিই, এটা হাদীস এ হিসেবে যে, ইমাম বুখারী র. হাদীস সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানের অধিকারী, তবে হতে পারে তিনি এ হাদীস পেয়েছেন। কিন্তু আমরা তা পাইনি। অতএব, এর উত্তর হল, من الايمان শব্দে من تبعيضيه নেই। বরং ابتدائيه। উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টিতে মহব্বত এবং শত্রুতার সূচনা ঈমানের শুরু থেকে হয়। অর্থাৎ, তার উদ্দেশ্য হল ঈমান।

৩. যদি من কে تبعيضيه ও মেনে নেয়া হয়, তবে এটি মুক্তিদায়ক ঈমানের অংশ নয়। বরং معلى এর অংশ।

বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে এসেছে।

وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدى بن عدى

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র. আদী ইবনে আদীকে লিখেছেন। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র. খলীফায়ে রাশিদ দ্বিতীয় উমর নামে প্রসিদ্ধ। যার আদ্ল ও ইনসাফের ব্যাপারে ইতিহাস সাক্ষী। তিনি বড় ও সমুহান তাবিঈ ছিলেন। প্রথম শতাব্দির শেষে দ্বিতীয় শতাব্দির শুরুতে সর্বসম্মতিক্রমে সর্ব প্রথম মুজাদ্দিদ।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র.এর বিস্তারিত জীবনী হাদীস সংকলনে উল্লেখিত হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে- সাহাবায়ে কিরামের পর গোটা পৃথিবীর ইনসাফ যদি এক দিকে হয়, আর উমর ইবনে আবদুল আযীযের ইনসাফ অপর দিকে, তাহলে উমর ইবনে আবদুল আযীযের ইনসাফ সবার উপর ভারী

হয়ে যাবে। যেমন– সারাবিশ্বের জুলুম যদি এক পাল্লায় রাখা হয়, আর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের জুলুম অপর পাল্লায়, তবে হাজ্জাজের জুলুম সবচেয়ে বেশি ভারী হবে।

হযরত আবদুল্লাই ইবনুল মুবারক র. এর নিকট কেউ জিজ্ঞেস করল যে, উমর ইবনে আবদুল আযীয র. উত্তম, না কি আমীরে মুআবিয়া রা.। তখন তাঁর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হল। তিনি বললেন, হযরত মুআবিয়া রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদের জন্য যে ঘোড়ার উপর আরোহী ছিলেন, সে ঘোড়ার নাকের বালুও উমর ইবনে আবদুল আযীয অপেক্ষা উত্তম। এ ফযীলত ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুহবতের কারণে। এর ফলে সুহবতের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বুঝা গেল।

আজকাল লাগাতার ফিতনার ফলে একটি মহা ফিতনা মহামারী আকারে এটিও ছড়িয়ে পড়ছে যে, উলামায়ে কিরামও আল্লাহ ওয়ালাদের সুহবতের প্রয়োজন অস্বীকার করতে শুরু করেছেন।

সুহবতের প্রয়োজনীয়তার উপর কয়েকটি প্রমাণ

১. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَه وَلَاتَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا -সূরা কাহাফ।

শীর্ষ পৌত্তলিকরা আবেদন করেছিল, আমাদের আসার সময় আপনি ফকীর-মিসকীনদেরকে (মজলিস থেকে) তুলে দিবেন। এ প্রসঙ্গে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আপনি রীতিমত স্বীয় দীর্ঘ সুহবত দ্বারা স্বীয় সাহাবীগণকে সম্মানিত করতে থাকুন। কোন নেতার ঈমান আনয়নের আশায় এসব তালিবে হককে নিজের দীর্ঘ বৈঠকের কোন অংশ থেকে মাহরুম করবেন না।

২. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ -সূরা তাওবা।

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাকওয়ার নির্দেশ দিয়ে তা অর্জনের পন্থা বলে দিয়েছেন যে. সত্যবাদীদের সাথে থাকুন। অর্থাৎ, সত্যবাদীদের সুহবত যেন বেশির চেয়ে বেশি হয়।

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক র. এর উপরোক্ত উক্তি দ্বারা বুঝা গেল, বড় কোন অলী আল্লাহ সাধারণ অপেক্ষা সাধারণ সাহাবীর স্তরে পৌঁছতে পারেন না। এ বিষয়টি হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত-.

عن ابى سعيد رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتسبوا اصحابى فان احدكم لو انفق مثل حد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولانصيفه

وعن جابر رض قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لاتمس النار مسلما رانى او راى من رانى (رواه الترمذى)

মোটকথা, এ বিষয়টি শ্রুত প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত হওয়ার সাথে সাথে সর্বজন স্বীকৃত যে, কোন অসাহাবী সাহাবীর স্তর লাভ করতে পারেন না। চিন্তার বিষয় হল, সাহাবীর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি? সুহবতের ফযীলত ছাড়া আর কোন কারণ নেই। এর দ্বারা প্রমাণিত হল, আল্লাহ ওয়ালাদের সুহবতে বিরাট প্রভাব সৃষ্টি হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– اذا رؤا ذكر الله। অর্থাৎ, তাদের দেখলে আল্লাহ তা'আলার কথা স্মরণ হয়।

৪. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمونى اصلى এটা এর প্রমাণ যে, দীন প্রশ্নোত্তর দ্বারা অর্জিত হয় না। বরং কোন সাহেবে হাল ব্যক্তির গোলামী ও বন্দেগী দেখে তার আচার-আচরণ, কিয়াম, রুকূ সিজদায় তার প্রতিটি অঙ্গ থেকে যে আল্লাহ তা'আলার আজমতের প্রতি লক্ষ্য করে এক বিশেষ বিনয় বুঝা যায়, তা প্রত্যক্ষ করে অন্তরে যে প্রভাব পরে এবং বন্দেগীর যে স্প্রিট লাভ হয়, তা গ্রন্থাদি এবং প্রশ্নোত্তর দ্বারা কোথায় লাভ হবে?

কবি আকবর ইলাহাবাদী কতই না সুন্দর বলেছেন–

نه كتابون سي نه وعظون سي نه زر سي بيدا ÷ دين هوتاهي بزركوه كي نظر سي بيدا.

৫. এ বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত, যৌক্তিক ও প্রত্যক্ষ দেখা যে, পৃথিবীর কোন শাস্ত্র ও কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সংসর্গ ছাড়া অর্জিত হতে পারে না। যেমন– চিকিৎসা শাস্ত্রে উৎকৃষ্ট, বিস্তারিত ও ব্যাপক প্রচুর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রতিটি ভাষায় বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি শুধু এসব গ্রন্থ অধ্যয়ন করে ডাক্তার হতে পারেনি। চিকিৎসক হতে হলে নির্ভরযোগ্য সময় পর্যন্ত কোন অভিজ্ঞ শাস্ত্রবিশেষজ্ঞ মনীষীর কাছে থাকা আবশ্যক মনে করা হয়। ঠিক অনুরূপ কোন কামিল ব্যক্তির জুতা সোজা করা ছাড়া আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় না।

جو آك كي خاصيت وه عشق كي خاصيت ÷ اك خانه بخانه هي ايك سينه بسينه هي.

قال را بكذار ومرد حال شو ÷ بيش مرد كامل بامال شو.

যদি সুহবতের প্রয়োজন না থাকে, তবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরং সমস্ত নবীগণের প্রেরণই অর্থহীন হয়ে যায়। তাহলে তো শুধু লিখিত কিতাবই নাযিল করা হত। লোকজন নিজে নিজে তা অধ্যয়ন করে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যেত, রাসূলের কি প্রয়োজন ছিল? অলী আল্লাহদের সুহবত থেকে বঞ্চিত থাকার ফল এই হয় যে, আলিম তো হয়ে যায়, কিন্তু ইনসানিয়তের আদব থেকে মাহরুম থেকে যায়।

شيخ شدي دزاهد شدي ودانشند ÷ اين جمله شدي دلي انسان نه شدي.

অতঃপর কিছুসংখ্যক লোকের আস্থাভাজন হয়ে যাওয়ার পর মনে মনে এই ভাবনা আসে যে, আমার মত আর কেউ নেই। এ জন্য অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা রোগ নির্ণয় করানো জরুরী।

بنما بصاحب نظري كوهر خودرا ÷ عيسي نتوان كشت بتصديق خري جند.

الى عدى بن عدى

এই আদী হলেন ইবনে আদী ইবনে আমীরাহ। -উমদাহ।

এই আদী ইবনে আদী তাবিঈ। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র.-এর পক্ষ থেকে জাযীরার গভর্ণর ছিলেন। ১২০হিজরীতে তিনি ওফাত লাভ করেন।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র. গভর্ণর আদী ইবনে আদীকে যে হেদায়াতনামা পাঠিয়েছিলেন, তার শব্দরাজি হল–

ان للايمان فرائض - ان এর হামযাতে যের। فرائض শব্দটিতে যবর। কারণ, এটি انّ এর ইসম। ঈমানের ফারায়েয, বিধিবিধান, নিষিদ্ধ বিষয়াবলী এবং সুন্নাত, মুস্তাহাব রয়েছে।

৩৩ –

শব্দরাজির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ঃ

فرائض ফরয আমলসমূহ যেমন– নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইদ্যাদি। شرائع দীনি আকাইদ যেগুলো সমস্ত আম্বিয়া আ. এর মাঝে সর্বসম্মত ছিল। وحدودا নিষিদ্ধ বস্তু। অর্থাৎ, শরীয়তের পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ ও হারামকৃত। وسننا মুস্তাহাব বিষয়াবলী। -উমদাহ ইত্যাদি।

فمن استكملها استكمل الايمان الخ যে এসব জিনিস পূর্ণ করবে, সে ঈমান পরিপূর্ণ করবে। আর যে এসব জিনিস পূর্ণ করবে না, সে ঈমান পূর্ণ করবে না।

যেন এসব জিনিস اجزاء مقومه নয়। বরং পরিপূর্ণতাদানকারী অংশ। কারণ, এটা বলেননি যে, এগুলো না হলে ঈমান চলে যাবে। বরং বলেছেন, ঈমানের পরিপূর্ণতা এগুলোর অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। হাফিজ আসকালানী র.ও বলেন–

فالمراد انها من المكملات لان الشارع اطلق على مكملات الايمان ايمانا (فتح ج١ ص ١٤)

অতএব, প্রমাণিত হল, এসব বিষয় ঈমানের হাকীকতে অন্তর্ভূক্ত নয়। তাছাড়া ইমাম রাগিব ইস্পাহানী র. تمام ও كمال শব্দে পার্থক্য করতে গিয়ে বলেন, تمام সত্তার জন্য এবং كمال গুণাবলীর জন্য ব্যবহৃত হয়। অতএব, যেহেতু হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র.-এর বাণীতে اتمام শব্দ নেই, বরং استكمال শব্দ আছে, সেহেতু বুঝা গেল, এসব জিনিস ঈমানের সত্ত্বায় অন্তর্ভূক্ত নয়।

অতএব, ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য এর দ্বারা শুধু মুরজিয়ার মত খন্ডন যে, তোমরা আমলের কোন গুরুত্বই অনুধাবন কর না এবং ঈমানকে পরিপূর্ণতাদানের জন্যও আমলকে জরুরী মনে কর না। অথচ কুরআনের আয়াত, হাদীসে নববী এবং মহামনীষীদের উক্তিসমূহে আমলের প্রতি বিরাট তাগিদ রয়েছে। এবং সুস্পষ্টভাষায় প্রমাণিত হয় যে, আমল ছাড়া ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয় না।

قوله فان اعش فسابينهما الخ

যদি আমি জীবিত থাকি তাহলে সমস্ত বিস্তারিত বিবরণ বিশদ আকারে প্রদান করব। যাতে তোমরা আমল করতে পার।

হতে পারে এতে হাদীস সংকলনের ইচ্ছার প্রতি ইঙ্গিত। এ জন্য তিনি ৯৯ হিজরীতে ব্যাপক আকারে হাদীস সংকলনের কাজ শুরু করেন। যার বিস্তারিত বিবরণ হাদীস সংকলনের অধীনে এসেছে।

وان امت فما انا على صحبتكم بحريص

আর যদি আমি মরে যাই, তবে আমি তোমাদের সংসর্গের প্রতি লালায়িত নই। গাইরুল্লাহ থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ধরণ কতইনা বিস্ময়করভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন! আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকেও এই মহা দৌলত দ্বারা সম্মানিত করুন। আমীন।

وقال ابراهيم عليه السلام وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ.

এর দ্বারাও ইমাম বুখারী র. ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধির যোগ্য হওয়ার উপর প্রমাণ পেশ করেন। কারণ, মৃতদের জীবনদানের ব্যাপারে হযরত ইবরাহীম আ. এর ঈমান তো প্রথম থেকেই ছিল। অতএব, وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ দ্বারা অতিরিক্ত ঈমান কাম্য।

উত্তর ঃ ইতমিনানের অর্থ হল প্রশান্তি। অতএব, হযরত ইবরাহীম আ.-এর এই বাক্য এর প্রমাণ যে, মৃতদের জীবন দানের পূর্ণাঙ্গ ইয়াকীন এবং এর প্রতি পূর্ণাঙ্গতম পর্যায়ের ঈমান আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। কারণ, কোন জিনিসের ইয়াকীন থাকলেই তো তার দর্শনের আগ্রহ সৃষ্টি হবে। ইয়াকীন যত বেশি হবে, আগ্রহ তত বাড়বে। চরম আগ্রহের ফলে অন্তরে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। যা দেখার পর প্রশান্তি আসে।

এর দ্বারা প্রমাণিত হল, অন্তরের ইতমিনান দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি উদ্দেশ্য নয়। ঈমানে কামিল তো আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। যদি নাউযুবিল্লাহ প্রথম থেকে ইয়াকীন না থাকে, তাহলে দেখার আগ্রহ কিভাবে সৃষ্টি হবে? যেমন- বাইতুল্লাহ দর্শনের আগ্রহ এবং অস্থিরতা তার মধ্যেই হতে পারে, যে এর অস্তিত্ব এবং সুমহান শানের প্রতি পূর্ণাঙ্গ ইয়াকীন রাখে। -ইরশাদুস সারী।

وقال معاذ اجلس بنا نومن ساعة

معاذ শব্দটিতে মীমের উপর পেশ। তিনি হলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত মুআয ইবনে জাবাল আনসারী, খাযরাজী রা.। তাঁর উপনাম আবু আবদুল্লাহ। ১৮বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। প্রসিদ্ধ মহামারী তাউনে আমওয়াস কালে ১৮ হিজরীতে তিনি ওফাত লাভ করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৩ বছর। -উমদাহ।

এ রেওয়ায়াতটি মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল ও মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতে সহীহ সনদে বিদ্যমান আছে। আসওয়াদ ইবনে হিলাল বলেন, আমাকে হযরত মুআয রা. বলেন, আমাদের নিকট বস। আমরা সামান্য সময় ঈমান আনব।

স্পষ্ট বিষয়, হযরত মুআয রা. পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী মুমিন ছিলেন। এ জন্য হযরত মুআয রা.-এর উদ্দেশ্য সামান্য সময়ের জন্য ঈমান আনা নয়, বরং উদ্দেশ্য হল দুনিয়াবী ধাঁধায় পড়ে কিছুটা যেন গাফিলতি এসে গেছে। এস, আল্লাহর যিকির করে এ গাফিলতি দূর করে ঈমানের নবায়ন করি, এটিকে তরতাজা করি। এ রেওয়ায়াত দ্বারা ইমাম বুখারী র.-এর উদ্দেশ্য এটাই যে, হযরত মুআয রা. ঈমান বৃদ্ধির প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু এই বৃদ্ধি মূল ঈমানে নয়, বরং ঈমানের ধরণে। যদ্দারা মুরজিয়ার মত খন্ডন ভালরূপেই হয়ে যায়।

وقال ابن مسعودٍ اليقين الايمان كله

হযরত ইবনে মাসঊদ রা. বলেন, ইয়াকীন পুরোটাই ঈমান। তাবারানী সহীহ সনদে এই আছরটি বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারীতে এই রেওয়ায়াতটি সংক্ষিপ্ত। হাফিজ র. তাবারানী থেকে পূর্ণ আছর বর্ণনা করেছেন। الصبر نصف الايمان واليقين الايمان كله প্রথম বাক্যটি ইমাম বুখারী র.এর দাবির জন্য সম্পূর্ণ স্পষ্ট। কিন্তু ইমাম বুখারী র.-এর রীতি হল, তিনি কখনো কখনো পরিস্কার ও স্পষ্ট বিষয়টি উহ্য করে দেন। এর দ্বারা ছাত্রদের প্রশিক্ষন ও অনুশীলন হয়।

এই বাক্যটি থেকে ইমাম বুখারী র.এর প্রমাণ এভাবে হবে যে, এতে كل শব্দ দ্বারা তাকিদ নেয়া হয়েছে। মূলনীতি হল, كل শব্দ দ্বারা তাকিদ হয় অংশবিশিষ্ট জিনিসের। অতএব, বুঝা গেল, ঈমান অংশবিশিষ্ট যুক্ত জিনিস। যেহেতু ঈমান অংশবিশিষ্ট-যুক্ত, সেহেতু তাতে হ্রাস-বৃদ্ধিও হবে।

এরূপও বলা হয়েছে যে, যেহেতু ঈমানের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ হবে, সেহেতু তার অংশও হবে। কারণ, كل সমষ্টিগত অংশগুলোকে বলা হয়। তাছাড়া এ বাক্যে ইয়াকীনকে ঈমান বলা হয়েছে। বস্তুতঃ ইয়াকীনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। ইলমুল ইয়াকীন, আইনুল ইয়াকীন, হক্কুল ইয়াকীন। অতএব, এর দ্বারা ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি

প্রমাণিত হল। হানাফীরাও বলেন যে, ঈমানে কামিল বিভিন্ন অংশবিশিষ্ট। তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। অবশ্য এখানে মুরজিয়ার মত খন্ডন ভালরূপে হয়ে যায়।

وقال ابن عمررض لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك فى الصدر

হযরত ইবনে উমর রা. বলেন, বান্দা তাকওয়ার হাকিকত তথা পূর্ণাঙ্গ তাকওয়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, যতক্ষণ না মনে খটকাজনিত বিষয় পরিহার না করে।

ইমাম বুখারী র.এর উদ্দেশ্য হল, হযরত ইবনে উমর রা. এর এ উক্তি দ্বারা তাকওয়ার বিভিন্ন স্তর সাব্যস্ত হয়েছে। বস্তুতঃ তাকওয়া তো ঈমানই। অতএব, বুঝা গেল, ঈমানের বিভিন্ন স্তর রয়েছে।

মূল ঈমান এক জিনিস আর তাকওয়া আরেকটি বিষয়। এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ হল ক্ষতি থেকে বাঁচা। শরীয়তের পরিভাষায় তাকওয়া হল পরকালীন জীবনে ক্ষতিকর এমন জিনিস থেকে বাঁচার নাম। তাকওয়ার ৭টি স্তর রয়েছে–

১. শিরক-কুফর থেকে বাঁচা,
২. বিদআত থেকে বাঁচা,
৩. কবীরা গুনাহ থেকে বাঁচা,
৪. কবীরা ও সগীরা উভয় থেকে বাঁচা,
৫. যে সব মুবাহ হারামের দিকে পৌঁছে দেয়, সেগুলো থেকে বাঁচা,
৬. সন্দেহজনক জিনিস থেকে বাঁচা,
৭. গাইরুল্লাহ থেকে পরহেয করা।

সর্বশেষ এই স্তরটি নৈকট্যপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ লাভ করেন।

হযরত ইবনে উমর রা.এর উক্তি حتى يدع ماحاك فى الصدر দ্বারা তাকওয়ার ৬ষ্ঠ স্তর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, সন্দেহজনক জিনিস থেকে পরহেয করা। আর এই উক্তিটি গৃহীত হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী دع مايريبك الى ما لايريبك থেকে।

মোটকথা, তাকওয়ার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সর্বনিম্নস্তর হল শিরক কুফর থেকে বাঁচা। আর সর্বোচ্চস্তর হল সমস্ত গাইরুল্লাহ থেকে পরহেয করা। তথা প্রতিটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হওয়া। এটা হল সবচেয়ে খাস স্তর। এটা হল নৈকট্যপ্রাপ্তদের তাকওয়া।

এর দ্বারাও মুরজিয়ারই মত খন্ডন হয়। কারণ, তারা আমলকে ঈমানের ক্ষেত্রে মোটেই প্রভাবশালী-ক্রিয়াশীল মনে করে না। অথচ ছোট ছোট আমলকেও তাকওয়া দ্বারা ব্যক্ত করা হচ্ছে।

وقال مجاهد شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَاوَصّٰى به نُوْحًا اوصيناك يامحمد واياه دينا واحدا

মুজাহিদ র. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ আয়াতে কারীমার তাফসীরে বলেন, হে মুহাম্মদ! আমি আপনাকে এবং হযরত নূহ আ.কে একই দীনের ওসিয়ত করেছি (নির্দেশ দিয়েছি)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.এর বিশিষ্ট শিষ্য ইমাম মুজাহিদ র. এর উক্তি দ্বারা ইমাম বুখারী এভাবে প্রমাণ পেশ করেন যে, সমস্ত নবীর দীন অর্থাৎ, ঈমান এক। তা সত্ত্বেও এসব দীন শাখাগত বিষয়াবলীতে বিভিন্ন রকম। এর দ্বারা বুঝা গেল, ঈমানের স্তর বিভিন্ন রকম হয়।

উত্তর ঃ এই আয়াত ও হযরত মুজাহিদের এই তাফসীর হানাফীদের সমর্থন করে। কারণ, এর দ্বারা দীনের মৌলিক বিষয়াবলীতে ঐক্য এবং শাখাগত বিষয়গুলোতে বিভিন্নতা প্রমাণিত হয়। অতএব,

হানাফীগণও মনে করেন, মূল ঈমান যুক্ত বা অংশবিশিষ্ট নয় এবং এতে হ্রাস-বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নেই। হ্যাঁ, শাখাগত বিষয়াবলীতে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। অবশ্য এর দ্বারা মুরজিয়ার মত খন্ডন ভালরূপেই হয়েছে।

وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন-

لِكُلٍّ جَعَلْنَامِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا

আয়াতে شرعة দ্বারা উদ্দেশ্য সুন্নাত। আর منهاج দ্বারা উদ্দেশ্য হল পথ। এ তাফসীর ধারাবাহিকতার পরিপন্থী বর্ণিত হয়েছে।

হাফিজ র. বলেন, এখানে লফ্‌ফে নশর গাইরে মুরাত্তাব (অধারাবাহিক) হয়েছে। -ফাতহ, উমদাহ।

অর্থাৎ, منهاج বলে বড় পথকে। আর বড় পথ থেকে যে ছোট পথ বের হয়, সেটিকে বলে شرعة কখনো কখনো ছোট স্বতন্ত্র রাস্তাকেও منهاج বলে।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর তাফসীর দ্বারা বুঝা যায়, দীন তো একই। কিন্তু কোনটিকে মিনহাজ বলে, আর কোনটিকে বলে শিরআ। অতএব, হ্রাস-বৃদ্ধি প্রমাণিত হল।

হযরত ইবনে আব্বাস রা.এর বাণী স্বতন্ত্র প্রমাণও হতে পারে এবং হযরত মুজাহিদের উক্তির সাথে মিলিয়েও প্রমাণ হতে পারে।

◆ কোন কোন আলিমের তাহকীক হল, ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য উভয় আয়াতে সামঞ্জস্য বিধান করা। কারণ, প্রথম আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, সমস্ত আম্বিয়ার দীন এক। আর দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, প্রত্যেকের পথ আলাদা। অতএব, গ্রন্থকার ইমাম বুখারী র. উত্তর দিলেন যে, ঐক্য হল মূল দীনে। আর বিভিন্নতা হল শাখাগত ও খুটিনাটি বিষয়ে।

◆ কোন কোন আলিম

لِكُلٍّ جَعَلْنَامِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا

কে সর্বশ্রেষ্ঠ এই উম্মতের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োগ করেছেন। কারণ, নারী-পুরুষ, মুকীম-মুসাফির, রুগ্ন ও সুস্থ ব্যক্তিদের বিধিবিধান আলাদা আলাদা।

قوله دعاؤكم ايمانكم ইমাম বুখারী র.-এর উদ্দেশ্য হল, হযরত ইবনে আব্বাস রা. দো'আকে ঈমান সাব্যস্ত করছেন। বস্তুতঃ দো'আ হল একটি আমল। অতএব, বুঝা গেল, আমল ঈমানে কামিলের অন্তর্ভূক্ত। আবার দো'আয় হ্রাস-বৃদ্ধিও হয়। অতএব, ইমাম বুখারী র.এর উভয় দাবি প্রমাণিত হল।

সূরা ফুরকানের এই সর্বশেষ পূর্ণ আয়াতটি হল এই-

قُلْ مَايَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّىْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ.

'আপনি বলুন, আমার প্রভু সামান্যতমও পরোয়া করেন না, যদি তোমরা তাকে না ডাক। কিছুসংখ্যক লোকের ডাক আল্লাহর আযাবকে বারণ করেছে।'

সহীহ মুসলিমের হাদীসে আছে-

لاتقوم الساعة حتى لايقال فى الارض الله الله

আরেকটি দুর্বল হাদীসে আছে-

لولاشبان خشع وبهائم رتع وشيوخ ركع واطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا.

এতে বুঝা গেল, দুর্বলতা, বিনয় ও অক্ষমতা আল্লাহ তা'আলার রহমতকে আকৃষ্ট করে।

شبان خشع শব্দটিকে পূর্বে উল্লেখ করার মধ্যে প্রবল ধারণা অনুযায়ী এর গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত। আল্লাহ তা'আলার নিকট যৌবনকালে আল্লাহ ভীতি ও বিনয়ের অনেক বড় কদর রয়েছে।

در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است ÷ وقت پیری گرگ ظالم میشود پرهیز گار.

হযরত মাওলানা নানুতবী র. মা'রিফাতের বিস্ময়কর কথা বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে একটি জিনিস নেই। আর যার দরবারে যে জিনিস থাকে না, তার বিরাট কদর হয়ে থাকে। সেটি হল বান্দার কান্নাকাটি এবং লজ্জা ও যিল্লতি।

রুমী র. বলেন,

که برابر مي کند شاه مجيد ÷ اشك را در وزن باخون شهيد.

ناله مؤمن همي درايم دوست ÷ کو تضرع کن که این اعزاز اوست.

ইরশাদুল কারী

এক নজরে ইমাম বুখারী র.এর প্রমাণাদি

ইমাম বুখারী র. এর শিরোনাম ও প্রমাণাদির রুখ হল মুরজিয়া ও মু'তাযিলার দিকে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত মধ্যখানে আছে। তাদের কেউ মুরজিয়ার নিকটবর্তী আর কেউ মু'তাযিলার। হযরত শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান র. এই পর্যালোচনাই করতেন। কিন্তু যদি কেউ এই হাকীকত থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এটাই বলেন যে, ইমাম বুখারী র. এখানে ইমাম আজম আবু হানীফা র. এর দিকে রুখ করেছেন. তবে আমরা ইমাম বুখারী র.কে জিজ্ঞেস করব, বিষয়টি ঈমান সংক্রান্ত। আর আপনি এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা র.এর সাথে জড়িয়েছেন। আপনি যে শিরোনাম কায়েম করেছেন, সেটি হল–بنى الاسلام على خمس দাবি হল, ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধির। আর যেসব প্রমাণ তা সাব্যস্ত করার জন্য পেশ করেন, সেগুলো দ্বারা ঈমানের নয়, বরং ইসলামের হ্রাস-বৃদ্ধি সাব্যস্ত করেছেন। কোথাও মহব্বতের আলোচনা, কোথাও তাকওয়ার হ্রাস-বৃদ্ধির বিবরণ। মহব্বত এবং তাকওয়া হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যাপার আমরাও অস্বীকার করি না। ইসলামে আমল অন্তর্ভূক্ত, আমরাও তা অস্বীকার করি না। কিন্তু মূল ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধি পাওয়ার যে দাবি আপনি করেছেন, তা এসব প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয় না।

٧. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ .

৭. উবায়দুল্লাহ ইবনে মূসা রা. .... হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। ১. আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য দান। ২. সালাত কায়েম করা। ৩. যাকাত দেয়া। ৪. হজ্জ করা এবং ৫. রমযানের সিয়াম পালন করা।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ

হাদীসটি ইমাম বুখারী তাফসীরে ৬৪৮ পৃষ্ঠায় হাদীস নং ৪১ এবং বুখারী ১ম খন্ডে, ৬নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। এটি ইমাম মুসলিম র. প্রমূখও বর্ণনা করেছেন।

শিরোনামের সাথে মিলঃ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সম্পূর্ণ স্পষ্ট। কারণ, এ হাদীসটি হুবহু শিরোনামই।

রাবীদের বিবরণ ঃ

এ হাদীসে চারজন রাবী রয়েছেন–

১. উবায়দুল্লাহ ইবনে মূসা। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় ২১৩ বা ২১৪ হিজরীতে ওফাত লাভ করেছেন।

২. হানজালা ইবনে আবু সুফিয়ান। তিনি হলেন কুরাশী, মক্কী। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার বংশধর। ১৫১ হিজরীতে ওফাত লাভ করেছেন।

৩. ইকরামা ইবনে খালিদ ইবনে আসী। তাঁর ওফাত হয়েছে আতার পরে। আতার ওফাত হয়েছে ১১৪ বা ১১৫ হিজরীতে। –উমদাহ।

সতর্কবাণী ঃ

ইকরামা ইবনে খালিদ ইবনুল আসীর শ্রেণীতে ইকরামা ইবনে খালিদ ইবনে সালামা ইবনে হিশাম মাখযূমীও। কিন্তু তিনি দুর্বল। সহীহ বুখারীতে তাঁর রেওয়ায়াত নেই। ইবনে উমর রা. থেকে তাঁর কোন রেওয়ায়াতও নেই। অতএব, সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, এটি সংশয়ের স্থান। –উমদাহ।

৪. ইবনে উমর রা.।

হযরত ইবনে উমর রা. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

তিনি হলেন হযরত ফারুকে আজম উমর ইবনে খাত্তাব রা. এর সাহেবযাদা। উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা রা.এর আপন ভাই। তাঁর মাতা হলেন যয়নব বিনতে মাজঊন রা.। যিনি হযরত উসমান ইবনে মাজঊন রা.এর সহোদরা ছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. ছিলেন পুরোনো মুসলিম। স্বীয় সম্মানিত পিতার সাথে মক্কা মুআজজমায় শৈশবে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পিতার সাথেই হিজরতও করেন।

কারো কারো মতে হযরত ইবনে উমর রা. আপন পিতার পূর্বে ইসলামও গ্রহণ করেন, আবার হিজরতও করেন। তবে এই উক্তিটি সহীহ নয়। যেমন– স্বয়ং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর শিষ্য নাফি' র. এ বিষয়টি রদ করে দিয়েছেন। (বুখারী ঃ ২/৬০১, নাসরুল বারী কিতাবুল মাগাযী, হাদীস নং-২১৪।) বয়স কম হওয়ার কারণে বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। উহুদের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু পূর্ণ পনের বছর না হওয়ার কারণে ফিরিয়ে দেয়া হয়। এর পর সমস্ত যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত আবু হোরায়রা রা.এর পরে রেওয়ায়াতের দিক দিয়ে সবচেয়ে শীর্ষস্থানীয় সাহাবী। -উমদাহ ঃ ১/১১৬। তাঁর থেকে ২৬৩০টি হাদীস বর্ণিত আছে। ১৭০টি রেওয়ায়াত বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে বর্ণনা করেছেন। বুখারী শরীফে তাঁর ৮১টি হাদীস এরূপ রয়েছে, যেগুলো মুসলিমে নেই। আবার মুসলিমে একত্রিশটি হাদীস রয়েছে, যেগুলো বুখারীতে নেই। -উমদাহ ঃ ১/১১৬।

ওফাত ঃ আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে তাকিদ দিয়েছিলেন, হজ্জ সংক্রান্ত বিষয়াবলীতে ইবনে উমর রা.এর বিরোধিতা করো না। এ বিষয়টি হাজ্জাজের কাছে খুব খারাপ

লাগল। যখন আরাফাত থেকে লোকজন প্রত্যাবর্তন করে, তখন হাজ্জাজের ইঙ্গিতে বিষাক্ত নেযা তার পায়ে লাগিয়ে দেয়া হয়। ফলে তিনি কয়েকদিন রোগাক্রান্ত থেকে জিলহজ্জ ৭৩ হিজরীতে শাহাদত লাভ করেন।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ

এ হাদীসে ইসলামকে একটি তাবুর সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। যেটি ৫টি স্তম্বের উপর দন্ডায়মান। একটি হল, عمود وقطب মধ্যবর্তী স্তম্ভ। আর চারদিকে হল চারটি খুঁটি। যেরূপভাবে তাবুর মূল বুনিয়াদ মধ্যবর্তী স্তম্ভ قطب । আর এটিকে পূর্ণাঙ্গতা দানের জন্য অর্থাৎ, এটিকে প্রসারিত করে দাড় করিয়ে রাখার জন্য চতুর্দিকে খুঁটি গেড়ে রশি দিয়ে বেঁধে দেয়া হয় এবং তাবুটি পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়।

এতে মধ্যবর্তী স্তম্ভ না থাকলে চাই খুঁটি থাকুক না কেন, তাবু কায়েম থাকবে না। হুবহু ইসলামের এই পাঁচটি জিনিসের ধরণও অনুরূপ। তাওহীদ ও রিসালতের সাক্ষ্য মধ্যবর্তী স্তম্ভের পর্যায়ভূক্ত। এর উপর ইসলামের তাবু দন্ডায়মান। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত চারটি খুঁটির পর্যায়ভূক্ত। যদি শাহাদ্বতদয় তথা আন্ত রিক বিশ্বাস থাকে, আর চার রোকনের সবগুলো অথবা কোন একটি পড়ে যায়, তবুও অবশিষ্ট থাকবে। অবশ্য যে দিকের খুঁটি পড়ে যাবে, সেদিকের অংশ ঢিলা হয়ে যাবে। এদিক থেকে ত্রুটিযুক্ত থাকবে। কিন্তু যদি শাহাদতদ্বয়ই পড়ে যায়, তবে ঈমানের নাম নিশানাও বাকি থাকবে না।

অতএব, যেরূপভাবে তাবু ঠান্ডা, উষ্ণতা, বৃষ্টি ইত্যাদি দৈহিক বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে, এরূপভাবে ইসলাম পরকালীন আপদবিপদ থেকে রক্ষা করে।

একটি প্রশ্ন ঃ আরকানে ইসলাম তো আরো আছে। শুধু পাঁচটিকে কেন খাস করা হল?

উত্তর ঃ ১. এ পাঁচটি রোকনে সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়। বরং শুধু প্রসিদ্ধতম রোকনগুলো বর্ণনা করেছেন।

২. আরকানে ইসলামের বিভিন্ন প্রকার থেকে প্রতিটি প্রকারের একটি রোকন বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ, আহকাম হয়ত আকীদার অন্তর্ভূক্ত হবে, অথবা আমলের। ই'তিকাদী বিষয়গুলো থেকে শাহাদাতদ্বয় উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর আমল দুই প্রকার ঃ ১. ইতিবাচক ও ২. নেতিবাচক। নেতিবাচকগুলো থেকে শুধু রোযার উল্লেখ করেছেন। অতঃপর ইতিবাচক আমলগুলো তিন প্রকার – ১. শুধু দৈহিক, ২. শুধু আর্থিক, ৩. দৈহিক ও আর্থিক দ্বারা যুক্ত। নামায শুধু দৈহিক। যাকাত শুধু আর্থিক। যুক্ত হজ্জ। এই তিনটির বিবরণ দেয়া হয়েছে।

হাদীসের শব্দরাজির আগপিছ ঃ

সহীহ বুখারীর এই রেওয়ায়াতে হজ্জ আগে রোযা পরে। ইমাম বুখারী র. এই রেওয়ায়াতের উপর নির্ভরও করেছেন। সহীহ বুখারীতে কিতাবুল হজ্জকে পূর্বে, আর কিতাবুস সওমকে পরবর্তীতে উল্লেখ করেছেন।

এটাও হতে পারে যে, এই রেওয়ায়াত দ্বারা ইমাম বুখারী র. স্বীয় কিতাবের বিন্যাসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

সহীহ মুসলিমে আছে– হযরত ইবনে উমর রা. এর এক শিষ্য (বিশ্‌র ইবনুস সাকসাকী) তাঁকে এ রেওয়ায়াত পড়ে শুনিয়েছেন। তখন তিনি বলেছেন, والحج وصيام رمضان। এতদশ্রবণে হযরত ইবনে উমর রা. বলেছেন-

لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

এর দ্বারা বুঝা গেল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের রোযাকে হজ্জের আগে উল্লেখ করেছেন। অতএব, সহীহ্ বুখারীতে যে হজ্জের উল্লেখ আগে আছে, এটাকে অর্থগত বিবরণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে।

আবার হতে পারে কোন রাবীর ভুল হয়ে গেছে।

সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে উমর রা. এর শুদ্ধি দ্বারা ইমাম নববী র.এর উস্তাদ হাফিজ ইবনে সালাহ র. প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ওয়াও হরফটি তরতীবের জন্য আসে। ইবনে সালাহ র. এর এই প্রমাণের উত্তর স্বয়ং শাফিঈদের মধ্য থেকে নববী ও হাফিজ র. এই দিয়েছেন যে, ইবনে উমর রা. এই শুদ্ধি এ জন্য করেননি যে, তাঁর মতে ওয়াও তারতীবের জন্য আসে। বরং শুদ্ধি দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শব্দরাজি যেরূপভাবে প্রমাণিত সেগুলোকে যথাসম্ভব সেরূপই বর্ণনা করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা উচিত।

ওয়াও যদিও তারতীবের জন্য আসে না, কিন্তু আলোচনাগত তারতীবে উচ্চাঙ্গের ভাষা সাহিত্যে সাধারণত এবং বিশেষতঃ আল্লাহর কালাম ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালামে কোন সুক্ষ্ম কারণ অবশ্যই থাকে। এ জন্য রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

انَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ.

এর আলোচনাগত তারতীবের প্রতি লক্ষ্য রেখে সাফা পাহাড় থেকে সাঈ শুরু করেছেন। তিনি বলেছেন-

انَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ نبدأ بمابدأ الله به.

এ হাদীসে রোযাকে হজ্জের আগে উল্লেখ করার হিকমত হাফিজ র. এই বর্ণনা করেছেন যে, রোযা ফরয হয়েছে হজ্জের আগে। রোযা ফরয হয়েছে দ্বিতীয় হিজরীতে। আর হজ্জ ফরয হয়েছে মতান্তরে ৬ বা ৯ হিজরীতে। যেহেতু রোযা আগে ফরয হয়েছিল, সেহেতু ধারাবাহিক উল্লেখেও এটিকে আগে রাখা সমীচীন ছিল।

তাছাড়া রোযাকে এ জন্যও আগে উল্লেখ করা সমীচীন যে, রোযার মুকাল্লাফ প্রতিটি বালেগ ব্যক্তি। কিন্তু হজ্জের মুকাল্লাফ সমস্ত বালেগ নয়।

তাছাড়া হজ্জ পূর্ণ জীবনে শুধু একবার ফরয। আর রোযা প্রতিটি বছর আবশ্যক হয়।

আমল চতুষ্ঠয়ের ব্যাখ্যা ঃ

এসব আমল ও ইবাদত দু'ধরণের- ১. একটির সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার শাসকসুলভ শানের সাথে। তিনি হলেন শাসক, আমরা শাসিত। ২. দ্বিতীয় প্রকার প্রেমাস্পদসুলভ শানের সাথে সম্পৃক্ত। অন্য ভাষায় এরূপ বলা যায় যে, কোন কোন ইবাদত হল শানে জালালীর বহিঃপ্রকাশ। আর কোনটি শানে জামালীর। নামায ও যাকাত শাসকসুলভ শানের বহিঃপ্রকাশ, যদ্দারা আল্লাহ তা'আলার জালাল বা মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। এজন্য আযান শাহী দরবার উন্মুক্ত করার ঘন্টি। দরবারে উপস্থিতির জন্য শরীর ও পোশাক পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। উত্তম পোশাক পরিধান করা হয়।

خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.

'তোমরা মসজিদে উপস্থিতির সময় নিজেদের পোশাক পরিধান কর।'

দরবারের দিকে দৌড়ে নয়, বরং গাম্ভীর্যের সাথে যেতে হয়। শাসকের বিশেষ মজলিসে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। অতএব, নামাযেও জামাআত কায়েম হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে মসজিদে পৌঁছে অপেক্ষা করা সমীচীন। এর পর আল্লাহু আকবার বলে হাতের ইশারায় এ জগতকে পিছনে রেখে দরবারে ইলাহীতে উপস্থিত হতে হয়। এটাই হল তাকবীরে তাহরীমা।

শায়খে আকবর র. লিখেছেন– হাত তুলে বাঁধার পূর্বে সামান্য ছেড়ে দিবে। তাতে হাতের তালু দ্বারা সামান্য ইশারা হবে পিছনের দিকে যে, সমস্ত গাইরুল্লাহকে পিছনে ফেলে দিয়েছি।

শাসকের দরবারে পৌঁছে সবাই প্রথমে সালাম ও আদর প্রদর্শন করে। এই জন্য নির্দেশ হয়েছে, নামায শুরু করা মাত্রই ইমাম ও সব মুক্তাদী ছানা পড়বে। এর পর সব হাজিরীনের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি দরখাস্ত পেশ করবে। এ জন্য ইমাম আজম র. বলেন, সূরা ফাতিহা ইমামই পড়বেন। কারণ, এটি হল দরখাস্ত। বস্তুতঃ আবেদনের বিষয়ও আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং শিখিয়ে দিয়েছেন। এ কারণে এ সূরাটির একটি নামও হল سورة تعليم المسئلة

ফাতিহার বাক্যগুলোর উপর আল্লাহ তা'আলার দান ঃ

এ দরখাস্তের প্রতিটি বাক্যের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রতিদানও দেয়া হয়। এ জন্য হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– আল্লাহ তা'আলার বাণী রয়েছে–

قسمت الصلوة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل. فاذا قال العبد اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قال الله تعالى حمدنى عبدى واذا قال اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قال الله اثنى على عبدى واذا قال مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قال مجدنى عبدى فاذا قال اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قال هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل. فاذا قال اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قال هذا لعبدى ولعبدى ما سأل –

'আমি আমার ও আমার বান্দার মাঝে নামাযকে বন্টন করে দিয়েছি। আমার বান্দা যা চায়, তা সে পায়। বান্দা যখন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ বলে, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার তা'রিফ করেছে। আর বান্দা যখন বলে اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। আর বান্দা যখন مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ বলে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে। বান্দা যখন বলে اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে অর্ধেক অর্ধেক বন্টন। আর আমার বান্দা যা চায়, সে তা পাবে। (সূরার শেষাংশ আমার বান্দার জন্য) যখন বান্দা বলে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ الآية তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, এসব আমার বান্দার। বস্তুতঃ আমার বান্দা যা চাইবে, সে তা পাবে। –সহীহ মুসলিম ঃ ১/১৬৯-৭০, মিশকাত শরীফ।

এর দ্বারা বুঝা গেল, সূরা ফাতিহার প্রতিটি আয়াতে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার (দাদ) দেয়া হয়। হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতিহার প্রতিটি আয়াতে ওয়াকফ করেন। অতএব, আমাদেরও উচিত, সূরা ফাতিহার প্রতিটি আয়াতে ওয়াকফ করা এবং কল্পনা করা যে, আল্লাহ তা'আলা তা শুনেছেন এবং উত্তর দিয়েছেন।

এ উদ্দেশ্যে ওয়াকফ করার ব্যাপারে শায়খে আকবর, হাফিজ ইবনে কাইয়্যিম ও শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী র. সতর্ক করেছেন। অধম স্বীয় শায়খ ও উস্তাদ হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী র. কে সর্বদা এর উপর আমল করতে দেখেছে।

অতঃপর সব মুক্তাদী আমীন বলে ইমামের আবেদনকৃত দরখাস্তের সত্যায়ন করছে। তার দো'আর জবাবে ইমামের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কুরআন মজীদের কিছু অংশ পাঠ করে শুনিয়ে দেয়া হয় যে, তোমরা اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ আয়াতে যে হেদায়াত প্রার্থনা করছ, তার জবাবে আমি তোমাদেরকে এই প্রদান করছি, যা هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

নামাযে এ পর্যন্ত তো শুধু মৌখিক হামদ ও ছানা ছিল, পরবর্তীতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারাও শিষ্টাচার আদায়ের জন্য রুকূতে ঝুকে পড়ে। এর পর ইমাম سمع الله لمن حمده বলে সুসংবাদ দেয় যে, তোমার বাচনিক ও ক্রিয়াগত প্রশংসা কবুল হয়ে গেছে। এ সুসংবাদে শুকরিয়া রূপে মক্তাদী ربنا ولك الحمد বলে অতিরিক্ত প্রশংসা করে। এর পর আহকামুল হাকিমীনের সামনে নেহায়েত বিনয় প্রকাশার্থে সর্বোত্তম অঙ্গ চেহারাকে মাটিতে লাগিয়ে দেয়। দু'বার সিজদা করে প্রকাশ করে যে, শানে জালালী ও জামালী উভয়ের উপর উৎসর্গিত হতে প্রস্তুত।

যাকাতের হিকমত ঃ

নামায পড়ে যখন আহকামুল হাকিমীনের হুকুমত স্বীকার করে নেয় এবং নিজের গোলামী ও শাসিত হওয়ার কথা স্বীকার করে ও ঘোষণা দেয় যে, আমি তোমার গোলাম ও ফরমাবরদার শাসিত। তোমারই হুকুমতে বসবাস করছি।

আর হুকুমতের নিয়ম হল, প্রজাদের উপর ট্যাক্স আরোপ করা। যাতে একথা জানা হয়ে যায় যে, আমাদের প্রজারা জান-মাল উভয়টি নিয়ে উপস্থিত। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা শাসকসুলভ শানে যাকাত ফরয করে নির্দেশ দেন, তোমরা যাকাত আদায় করো। আর বান্দা যাকাত আদায় করে প্রমাণ করে, আমরা যেরূপ স্বীয় জান নিয়ে উপস্থিত, এরূপভাবে মাল নিয়েও উপস্থিত।

মোটকথা, নামায ও যাকাত শানে জালালী তথা শাসকসুলভ শানের বহিঃপ্রকাশ। আর রোযা ও হজ্জ শানে জামালী তথা প্রেমাস্পদসুলভ শানের বহিঃপ্রকাশ।

প্রথম ইবাদত রোযা। এতে গাইরুল্লাহকে বর্জন করা হয়। তিনটি জিনিসই এরূপ, যেগুলো অর্জনের পর মানুষের কোন জিনিসের প্রয়োজন থাকে না। সে তিনটি জিনিস হল খানা-পিনা ও সহবাস।

ইমাম গাযালী র. বলেন, রিয়াযত তথা সাধনা হল দু'টি চাহিদা খতম করার নাম। সেটি হল পেটের চাহিদা এবং লজ্জাস্থানের চাহিদা। এ দু'টি চাহিদা বর্জন করার নাম রোযা। তবে শর্ত হল নিয়্যত থাকতে হবে, আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন ও তার দিকে সম্বন্ধযুক্ত হওয়া।

রোযা, হজ্জ ঃ

বান্দা এ দুটি দায়িত্ব পালন করে স্বীয় প্রেমিকসুলভ অবস্থা প্রকাশ করে। কারণ, নিয়ম হল যখন কেউ কারো প্রতি আসক্ত হয়, তখন প্রেমের প্রথম মঞ্জিল হল তার খাবার-দাবার এবং রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়। অতঃপর দ্বিতীয় মঞ্জিল হল প্রকৃত প্রেমিক সব কিছু থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে নির্জনে বসে প্রেমাস্পদের জল্পনা-কল্পনায় পরিপূর্ণ নিমগ্ন হয়ে পড়ে।

جي جاهتاهي بس يهي فرصت كي رات دن

بیٹھي رہیں تصور جانان کئي ہوئي.

অতঃপর তৃতীয় মঞ্জিল আসে, যখন নির্জনে প্রেমাস্পদের কল্পনা করে করে তার ভালবাসা শিরা-উপশিরায় প্রবিষ্ট হয়, তখন প্রকৃত প্রেমিক নির্জনতা ছেড়ে প্রেমাস্পদের ঘরের পথ অবলম্বন করে।

ہٹو میري نظروں سي امواج رنگین

یہ کشتي بیاکي نکَر جارہي ہي.

তখন প্রেমাস্পদের অলিগলিতে চক্কর লাগায়, প্রদক্ষিণ করে, দেয়ালে চুম্বন দেয়।

امر على الديار ديار ليلى ÷ اقبل ذا الجدار وذا الجدارا.

وما حب الديار شغفن قلبي ÷ ولكن حب من سكن الزيارا.

پائي سگَ بوسيده مجنون خلق گفته اين چه بود

گفت گاهي گاهي اين در كوئي ليلى رفته بود.

٣. بَابُ أُمُوْرِ الْاِيْمَانِ

وَقَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ الي قوله اَلْمُتَّقُوْنَ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الاية –

২. পরিচ্ছেদ ঃ ঈমানের মর্ম বা বিষয়সমূহ।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ (ইবাদতে) পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন কল্যাণ নেই, কিন্তু আসল নেকী ও কল্যাণ আছে কেউ আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান আনলে, আখিরাত, ফিরিশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নবীগণের উপর ঈমান আনলে এবং আল্লাহর মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্য-প্রার্থীদের এবং দাসত্ব মোচনের জন্য সম্পদ দান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত দিলে এবং ওয়াদা দিয়ে তা পূরণ করলে, অর্থসংকটে, দুঃখ-কষ্টে ও যুদ্ধকালে ধৈর্য ধারণ করলে। তারাই সত্যপরায়ণ ও তারাই মুত্তাকী।' (২ ঃ ১৭৭)

قَدْ اَفْلَحَ ... خَاشِعُوْنَ "অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ, যারা বিনয়-নম্র নিজেদের নামাযে।" (২৩ ঃ ১-২)

ব্যাখ্যা ঃ

باب امور الايمان এটি মুবতাদা মাহযূফের খবর। অতএব, باب শব্দটি মারফূ'। অর্থাৎ, اي هذا باب في امور الايمان। -উমদাহ। অতঃপর হয়ত ইযাফত বয়ানিয়া হবে। এমতাবস্থায় আসল ইবারত হবে– باب الامور التي هي الايمان। অর্থাৎ, সে সব জিনিস যেগুলো হুবহু ঈমান।

ইমাম বুখারী র.-এর মূলনীতি অনুযায়ী এতে কোন প্রশ্ন নেই। কারণ, তাঁর আলোচনা ঈমানে কামিল সংক্রান্ত। আর আমলগুলো পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

অথবা ইযাফত হবে লামিয়া। এমতাবস্থায় ইবারত হবে– باب الامور التي هي مكملات للايمان। وقول الله عزّوجل যের সহকারে। এটি امور এর উপর আতফ। -কাসতাল্লানী।

যোগসূত্র ঃ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে ঈমানের পাঁচটি মৌলিক জিনিসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে বলতে চাচ্ছেন যে, ঈমানের আরো অনেক রোকন আছে।

২. কুতবুল আকতাব হযরত গাঙ্গুহী র. থেকে বর্ণিত আছে যে, উপরের হাদীস بني الاسلام على خمس দ্বারা সন্দেহ হতে পারত যে, ইসলামের রোকন হল শুধু পাঁচটি। অতএব, এ সন্দেহ দূরীভূত করার জন্য ইমাম বুখারী র. এই অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন এবং বলেছেন যে, পাঁচটিতে সীমাবদ্ধ নয়। বরং ঈমানের তো ষাটের অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। পূর্বে তো শুধু পাঁচটি বড় বড় বুনিয়াদী রোকন উল্লেখ করা হয়েছে। পরিপূর্ণ রোকন উল্লেখ করা হয়নি। -ইমদাদুল বারী ঃ ৪।

ইমাম বুখারী র. সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে বলছেন যে, ঈমান কয়েকটি জিনিসের সমষ্টির নাম এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য মুরজিয়ার মত খন্ডন। যারা আমলকে কোন কিছুই সাব্যস্ত করে না।

উপরোক্ত আয়াতগুলোর সাথে শিরোনামের সম্পর্ক ঃ

ইমাম বুখারী র. শিরোনামে দু'টি আয়াত উল্লেখ করেছেন। যেগুলো ঈমান সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর শিরোনামও ঈমান সংক্রান্তই। অতএব, আয়াত ও শিরোনামের সাথে স্পষ্ট। প্রথম আয়াত হল-

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ الخ

-পারা-২, রুকূ-২। এই আয়াতের তরজমা পূর্বেই হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা গেল, কিবলার দিকে মুখ করা নেককাজ নয়। অথচ কিবলার দিকে মুখ করা ফরয।

উত্তর ঃ একটি হয় নেক কাজের ছূরত, আরেকটি হয় রূহ ও হাকীকত। উদ্দেশ্য এই যে, কিবলার দিকে মুখ করা নেক কাজের একটি ছূরত। আর নেক কাজের হাকীকত আল্লাহর হুকুম পালন করা। তিনি যেদিকে মুখ করার নির্দেশ দেন, সেদিকেই মুখ করা নেক কাজ হবে।

সূরা বাকারার উপরোক্ত আয়াত যেটিকে ইমাম বুখারী র. মনোনয়ন করেছেন, এগুলো ঈমান ও বিভিন্ন প্রকারের আহকাম সংক্রান্ত খুবই ব্যাপক। পূর্ণ আয়াতটিতে তিনটি জিনিসের বিবরণ দেয়া হয়েছে–

প্রথম বিষয়টি হল আকাইদ বিশুদ্ধকরণ সংক্রান্ত।

مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيِّيْنَ

'যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং ফিরিশতা ও কিতাবের প্রতি এবং সমস্ত পয়গাম্বরের প্রতি।'

দ্বিতীয় বিষয়টি হল উত্তম সামাজিকতা সংক্রান্ত

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّه ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ

'এবং সম্পদ দিবে আত্মীয়স্বজনকে, ইয়াতীমদেরকে, মিসকীনদেরকে মুখাপেক্ষীদেরকে, মুসাফিরদেরকে এবং ভিক্ষুকদেরকে এবং গরদান আযাদ করার কাজে।'

তৃতীয় জিনিস হল নফসের সংশোধনের সাথে সম্পৃক্ত। এতে দু'টি দিক রয়েছে–

১. ফারায়েয আদায় সংক্রান্ত। ২. উত্তম চরিত্র সংক্রান্ত। ফারায়েয আদায়ের কথা وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে এবং নফস পরিশুদ্ধকরণ সংক্রান্ত আয়াতগুলো

وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَاعَاهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ তে বর্ণনা করা হয়েছে।

এ আয়াতে সমস্ত নেক কাজের প্রকার বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে-

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

ইমাম বুখারী এই আয়াত দ্বারা এভাবে প্রমাণ পেশ করেছেন যে, নেক কাজে আকাইদ ও আমল সবগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা গেল, আমল ঈমানের অন্তর্ভূক্ত। ইমাম বুখারী র. এর রুচি অনুযায়ী নেক কাজ ও ঈমান একই জিনিস। কিন্তু হানাফীদের মতে মূল ঈমান বির বা নেক কাজ এক নয়। এই আয়াতটি এক হিসেবে হানাফীদের সমর্থক। কারণ, আয়াতে আমলকে ঈমানের উপর আত্ফ করা হয়েছে। আত্ফের আসল হল বিভিন্নতা তথা মা'তূফ এবং মা'তূফ আলাইহ একটি অপরটি থেকে ভিন্ন হয়। এই আত্ফ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল আমল ঈমান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

ইমাম বুখারী র. দ্বিতীয় আয়াতটি উল্লেখ করেছেন–

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ. سورة المؤمنون جزء ١١.

'নিশ্চয় সে সব মুসলমান সফলতা লাভ করেছে, যারা স্বীয় নামাযে বিনয়ী এবং যারা অনর্থক ক্রিয়াকলাপ ও কথাবার্তা থেকে দূরে থাকে এবং যারা (আমল-আখলাকে) পরিশুদ্ধি করে এবং যারা স্বীয় লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। কিন্তু ব্যতিক্রম শুধু স্বীয় স্ত্রী অথবা বাদী। কারণ, তাদের ব্যাপারে কোন ভর্ৎসনা নেই। হ্যাঁ, যারা এছাড়া অন্য পথ অন্বেষণ করে, তারা সীমালংঘনকারী এবং যারা স্বীয় আমানত ও প্রতিশ্রুতির কথা খেয়াল রাখে এবং যারা স্বীয় নামাযের পাবন্দি করে, এরূপ লোকই উত্তরাধিকারী হবে। যারা ফিরদাউসের ওয়ারিস হবে এবং তারা সেখানে চিরস্থায়ী থাকবে।

এসব আয়াতে মুমিনদের সিফত বর্ণনা করা হয়েছে। চাই সিফতে কাশিফা হোক অথবা মাদিহা-প্রশংসাকারী। মুফাসসিরীনে কিরাম উভয় সম্ভাবনাই বর্ণনা করেছেন। মোটকথা, এতটুকু অবশ্যই জানা গেছে যে, সফলকাম সে সমস্ত লোকই, যারা এসব কাজ করবে।

অতএব, মুরজিয়ার এই উক্তি ভুল সাব্যস্ত হল যে, অন্তরে বিশ্বাসের পর কোন নেক কাজের প্রয়োজন নেই। বরং আমল ছাড়াই মানুষ সফলকাম হতে পারে।

٨.حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ.

৮. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ জু'ফী র. .... হযরত আবূ হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঈমানের শাখা রয়েছে ষাটের কিছু বেশী। আর লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা।

রেওয়ায়াতের শব্দরাজিতে বিভিন্নতা ঃ

সিহাহ সিত্তায় এ হাদীসের শব্দরাজি চারভাবে বর্ণিত আছে। ১. সহীহ বুখারীর এ হাদীসে بضع وستون আছে। ২. সহীহ মুসলিমের কিতাবুল ঈমানে ৪৭ পৃষ্ঠায় এক রেওয়ায়াতে আছে الايمان بضع وسبعون شعبة । ৩. সহীহ মুসলিমের এ পৃষ্ঠাতেই আরেক রেওয়ায়াতের শব্দ হল بضع وسبعون او بضع وستون الخ । অর্থাৎ, বর্ণনাকারীর সন্দেহের সাথে বর্ণিত আছে। ৪. তিরমিযী দ্বিতীয় খণ্ডের কিতাবুল ঈমানের এক রেওয়ায়াতে আছে- الايمان اربعة وستون بابا ।

তিরমিযীর রেওয়ায়াত সম্পর্কে হযরত হাফিজ র. বলেন, এটি মা'লূল (ত্রুটিযুক্ত)।

এবার শুধু সহীহ বুখারী, মুসলিমের রেওয়ায়াতে যে বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হচ্ছে, এগুলোতে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য মুহাদ্দিসীনে কিরাম বিভিন্ন ছূরত বর্ণনা করেছেন।

১. কাযী ইয়ায ও ইমাম নববী র. বলেন, সমস্ত রাবী ও রেওয়ায়াতগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায়, অধিক সংখ্যার রেওয়ায়াত তথা بضع وسبعون প্রধান।

১। প্রাধান্যের কারণ হল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের অতিরিক্ত বিবরণ গ্রহণযোগ্য।

২। কম সংখ্যা বেশি সংখ্যাকে অস্বীকার করে না। অর্থাৎ, بضع وسبعون তে بضع وستون ও অন্তর্ভূক্ত।

৩। হতে পারে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কম সংখ্যক শাখাগুলোর জ্ঞান দান করা হয়েছে। তখন তিনি ستون বলেছেন। পরবর্তীতে আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে। তখন তিনি বলেছেন, سبعون এবং এটা সম্পূর্ণ স্পষ্ট বিষয়। কারণ, আহকাম ক্রমশঃ অবতীর্ণ হয়েছে।

২. ১। ইমাম বুখারী ও ইবনে সালাহ র. প্রমূখের মত হল- কমের রেওয়ায়াত তথা ستون এর বিবরণ প্রধান। কারণ, কম হল নিশ্চিত। যেটি সব রেওয়ায়াতে আছে।

২। অন্যান্য রেওয়ায়াতের উপর সহীহ বুখারীর রেওয়ায়াতের প্রাধান্য হবে।

৩. কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীগণের মত হল- সুনির্দিষ্ট সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হল আধিক্য। অর্থাৎ, এটা বলা উদ্দেশ্য যে, ঈমানের অনেক শাখা রয়েছে। বস্তুতঃ এটা খুবই প্রসিদ্ধ যে, আরবে سبعون শব্দ আধিক্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় ইখতিলাফী রেওয়ায়াতগুলোর প্রশ্নও তিরোহিত হয়ে যায়।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ

এ হাদীসে ঈমানকে একটি বৃক্ষের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। ইরশাদে বারী রয়েছে- مَثَلُ كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ এ আয়াতে এ বিষয়টির সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। স্পষ্ট বিষয় যে, গাছে যতই ফল-ফুল ও ডাল-পালা থাকবে, ততই বৃক্ষ পূর্ণাঙ্গ হবে। তাতে রওনক ও শোভা-সৌন্দর্য সৃষ্টি হবে। অতএব, যেরূপভাবে ফল-ফুল ও ডাল-পালা দ্বারা গাছে পরিপূর্ণতা সৃষ্টি হয়, রওনক আসে, এরূপভাবে আমলের মাধ্যমে ঈমানে রওনক সৃষ্টি হয়, পূর্ণাঙ্গতা আসে।

অনুরূপভাবে পত্রপল্লব ইত্যাদি ঝরে গেলে যেমন গাছের রওনক খতম হয়ে যায়, এরূপভাবে আমল না হলেও ঈমানের রওনক ও শোভা-সৌন্দর্য খতম হয়ে যায়, ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়। অতএব, এ হাদীস দ্বারা মুরজিয়ার মত খন্ডন হয়ে গেল। বরং বলা যেতে পারে, যে সব আমলকে কিতাব ও সুন্নাহ জরুরী সাব্যস্ত করেছে এবং সেগুলোর অবিদ্যমানতা ক্ষতিকর সাব্যস্ত করেছে, সেসব আয়াত ও হাদীস দ্বারা

মুরজিয়ার মত খন্ডন ভালরূপে হয়ে যায়। কারণ, মুরজিয়া না আমলকে জরুরী সাব্যস্ত করে, না গুনাহকে ক্ষতিকর মনে করে।

এ থেকে মু'তাযিলা ও খারিজীদেরও মত খন্ডন হয়ে যায়। কারণ, বৃক্ষের কোন ডাল খতম হয়ে গেলে বৃক্ষ শেষ হয়ে যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত মূল গাছ বিদ্যমান থাকে। এরূপভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত মূল বিশ্বাস বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমল না হলে ঈমান খতম হয়ে যায় না।

بضع বা এর নিচে যের সহ। কখনো কখনো যবর দেয়া হয়। এ শব্দের অর্থ ও পরিমাণ সম্পর্কে কিছু মতানৈক্য রয়েছে। কিন্তু বিশুদ্ধতম মত হল, بضع শব্দের প্রয়োগ তিন থেকে নয় পর্যন্ত হয়। অতএব, بضع وستون এর অর্থ হল ষাটের কিছু বেশি।

الحياء شعبة من الايمان

حياء এর আভিধানিক অর্থ লজ্জা, শরম। অর্থাৎ, অভিধানে হায়া বলে এক ধরণের সংকোচকে যা কোন শাস্তি অথবা ভর্ৎসনার ভয়ে মানুষের অন্তরে সৃষ্টি হয়।

কেউ কেউ হায়ার অর্থ এভাবে ব্যক্ত করেছেন- কোন অপছন্দনীয় কাজে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে অন্তরে যে সংকোচ সৃষ্টি হয়, তাই হায়া।

হায়ার শরঈ অর্থ ঃ

হায়া সে স্বভাবজাত যোগ্যতা যা খারাপ কাজ থেকে বিরত হতে উদ্বুদ্ধ করে এবং হকদারের হকে ত্রুটি করতে বারণ করে। এ কারণে এক হাদীসে আছে- الحياء خير كله।

একটি প্রশ্ন ঃ হায়া-শরম তো স্বভাবজাত জিনিস। আর ঈমান হল ঐচ্ছিক বিষয়। তাহলে এটাকে ঈমানের শাখা কিভাবে সাব্যস্ত করা হল?

উত্তর ঃ ১. হায়া দুই প্রকার- ১. স্বভাবজাত ২. শরঈ। এখানে শরঈ হায়া উদ্দেশ্য।

২. দ্বিতীয় উত্তর হল হায়া দ্বারা উদ্দেশ্য এর ফল ও পরিণতি। অর্থাৎ, অর্জিত হায়া উদ্দেশ্য। যা রীতিমত সর্বদা আমল করার ফলে অর্জিত হয়। যেমন- এক ব্যক্তি সর্বদা পাবন্দির সাথে নামায পড়ে। নামায পরিহার করলে মনে হায়া বা লজ্জা আসবে। একজন দীর্ঘ দিন থেকে দাড়ি রাখে, তার দাড়ি মুন্ডানোর প্রতিবন্ধক হবে হায়া।

আরেকটি প্রশ্ন ঃ এখানে আরেকটি প্রশ্ন হয়, ঈমানের প্রচুর শাখা থেকে হায়াকে কেন বিশেষভাবে উল্লেখ করা হল? অথচ بضع وستون شعبة তে এটিও তো অন্তর্ভূক্ত।

উত্তর ঃ হায়া এরূপ একটি শাখা, যার ফলে অনেক শাখার অস্তিত্ব হয়। এ জন্য বলা হয়-

بي حيا باش وهرجه خواهي كن.

তথা বেহায়া হও, আর যা ইচ্ছে তাই কর।

যেহেতু হায়া মিথ্যা, চুরি, সিনেমা এবং সর্বপ্রকার মন্দ কাজ থেকে বাঁচায়, সেহেতু হায়া থাকলে চিন্তা করবে, যদি কালকে মিথ্যা প্রকাশ পায়, তবে কি অবস্থা হবে? যদি কোন ছাত্র বা মুরীদ আমাকে সিনেমা হলে দেখে, তবে কি অবস্থা হবে? মোটকথা, মন্দকর্ম হতে রক্ষা করে হায়া। সারকথা হল, এটিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হল বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপের কারণে।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ

হাদীসের মিল স্পষ্ট। কারণ, শিরোনাম হল ঈমানী বিষয়াবলী সংক্রান্ত আর হাদীস শরীফে ঈমানের শাখা-প্রশাখার বিবরণ রয়েছে।

٤. بَابُ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ

৪. পরিচ্ছেদ ঃ পূর্ণাঙ্গ মুসলিম সে-ই, যার রসনা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।

هذا باب তানভীন সহকারে। অতএব, মুবতাদা উহ্য। অবশ্য এখানে পরবর্তী বাক্যের দিকে ইযাফত করে তানভীন বর্জন করাও জায়েয আছে। সাকিন করে ওয়াকফ করাও বৈধ। উভয় অনুচ্ছেদের মাঝে মিল স্পষ্ট। কারণ, পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈমানের অনেক শাখা রয়েছে। এই অনুচ্ছেদে তন্মধ্য হতে দু'টি শাখার বিবরণ রয়েছে। সে দু'টি হল মুসলমানের মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমানদের নিরাপদ থাকা। আরেকটি হল কামিল মুহাজির সে যে নিষিদ্ধ বিষয়গুলো পরিহার করে। -উমদাহ।

٩. حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

৯. আদম ইবনে আবূ ইয়াস র. .... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, (প্রকৃত) মুসলিম সে-ই, যার জিহবা ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে এবং (প্রকৃত) মুহাজির সে-ই, যে আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করে। আবূ আবদুল্লাহ র. বলেন, আবূ মু'আবিয়া র. বলেছেন, আমার কাছে দাঊদ ইবনে আবূ হিন্দ র. 'আমির র. সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি এবং আবদুল আ'লা র. দাঊদ র. থেকে দাঊদ র. আমির র. থেকে, আমির র. আবদুল্লাহ রা. থেকে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, হাদীস বর্ণনা করেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ

শিরোনামের সাথে এ হাদীসটির মিল স্পষ্ট। কারণ, শিরোনামটি হাদীসটিরই একটি অংশ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এ হাদীসটি ইমাম বুখারী র. ৬নং পৃষ্ঠায় কিতাবুল ঈমান এবং কিতাবুর রিকাকে ৯৬০পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

যোগসূত্র ঃ পূর্বের অনুচ্ছেদের সাথে এর যোগসূত্র হল পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদটি ছিল মূলনীতির পর্যায়ভূক্ত। আর এ অনুচ্ছেদে তার খুটিনাটি ও শাখাগত বিষয়গুলোর বিবরণ দেয়া হচ্ছে।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারাও পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের ন্যায় মুরজিয়া সম্প্রদায়ের মত খন্ডন উদ্দেশ্য। কারণ, তারা না গুনাহকে ঈমানের জন্য ক্ষতিকর মনে করে, না আমলকে জরুরী মনে করে। এ জন্য যে সব আমল দ্বারা ঈমানে দুর্বলতা আসে, সেগুলোকে মুরজিয়ার মত খন্ডনের ক্ষেত্রে পেশ করা যায়।

المسلم من سلم المسلمون

এ বাক্যে মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহ উভয়টি মা'রিফাহ। বস্তুতঃ এটি একটি সর্বজন স্বীকৃত বিষয় যে, উভয়টি মা'রিফাহ হলে সীমাবদ্ধতার ফায়দা দেয়। অতএব, এ বাক্যটিতেও সীমাবদ্ধতা থাকবে। এর অনুবাদ হবে মুসলমান কেবল সেই, যার হাত ও রসনা থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে।

একটি প্রশ্ন ঃ এ রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, যার দ্বারা অন্য মুসলমানরা কষ্ট পায়, সে মুসলমানই নয়। অথচ এটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা পরিপন্থী।

উত্তর ঃ এখানে পরিপূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বে সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য। বিশুদ্ধতার সীমাবদ্ধতা নয়। উলামায়ে কিরাম বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রকমের উত্তর দিয়েছেন।

১. কাযী ইয়ায র. বলেন, এই রেওয়ায়াতে মুসলিম দ্বারা উদ্দেশ্য المسلم الكامل الجامع لخصاله

২. কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন যে, উদ্দেশ্য হল المسلم الممدوح তথা প্রশংসিত মুসলিম।

৩. কারো কারো ঝোক হল افضل المسلمين من سلم المسلمون। তথা যার হাত ও রসনা থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে, সে শ্রেষ্ঠ মুসলিম।

নিঃসন্দেহে ইলমী তাহকীকের সময় المسلم কে আসলে المسلم الكامل অথবা শ্রেষ্ঠতম ও প্রশংসার্হ মুসলমান বলা ঠিক। কিন্তু এ সব ব্যাখ্যা এজন্য উত্তম নয় যে, এর ফলে হাদীসের ওজন কমে যায় এবং হাদীসের মূল উদ্দেশ্য (মানুষকে সাবধান ও সতর্ক করা) দুর্বল হয়ে যায়। বরং লক্ষ্য উদ্দেশ্যই ফওত হয়ে যায়। কারণ, হাদীসের উদ্দেশ্য হল কাউকে যেন কষ্ট না দেয়া হয়। আর এই ব্যাখ্যার পর লোকজন বলবে, এটা তো কামিল মুসলমানের নিদর্শন। আমরা আর কোন ইমাম আজম আবু হানীফা এবং জিলানী? আমরা আগে থেকেই ত্রুটিযুক্ত। অতএব, আমরা যদি কাউকে কষ্ট দেই, তাহলে কোন অসুবিধা নেই।

এই জন্য উত্তম হল, হাদীসকে এর বাহ্যিক অর্থের উপর রেখে দেয়া। তা সত্ত্বেও কষ্টদায়ক মুসলমানকে কাফির বলা যাবে না। এর উদাহরণ ঠিক এরূপ মনে করুন, যেমন অভিধানে মালদার এরূপ প্রতিটি ব্যক্তিকে বলা ঠিক, যার কাছে সম্পদ আছে। চাই কমই হোক না কেন। মালের অর্থ হল এরূপ জিনিস যদ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। অতএব, যার কাছে ন্যূনতম উপকৃত হওয়ার মত সম্পদ থাকে, সেই আভিধানিকভাবে মালদার হবে। কিন্তু তাকে ওরফে মালদার বা বিত্তশালী বলা হয় না। ওরফে তাকে বিত্তশালী বলা হয়, যার নিকট উল্লেখযোগ্য সম্পদ থাকে।

এরূপভাবে অন্যদেরকে কষ্টদাতা ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে তো মুসলিম, কিন্তু ওরফে মুসলমান বলার মত উপযোগী নয়। এটাকে বলে تنزيل الناقص منزلة المعدوم তথা ত্রুটিপূর্ণ বস্তুকে অস্তিত্বহীন বস্তুর পর্যায়ে রাখা।

হযরত নূহ আ. এর ছেলে সম্পর্কে বলা হয়েছে- اَنَّه لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اَنَّه عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ অথচ সে প্রকৃত অর্থে নূহ আ.এর ছেলে ছিল। কিন্তু যোগ্যতার ত্রুটির কারণে তার সন্তান হওয়ার কথা অস্বীকার করা হয়েছে অর্থাৎ, পুত্র বলার যোগ্যতা নেই।

এ বক্তব্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পরিপন্থীও নয়, আবার এর দ্বারা হাদীসের ওজনও অবশিষ্ট থাকে। সতর্ক করার উদ্দেশ্যও অর্জিত হয়।

রসনাকে আগে উল্লেখের কারণ ঃ ১. সাধারণতঃ সর্বপ্রথম মৌখিক কথা হয়, এর পর হাত চলে।

২. মুখ চালানো সহজ, ৩. মুখের কষ্ট অর্থগতভাবেও কঠোরতর ও দীর্ঘস্থায়ী। কোন কবি কতই না সুন্দর বলেছেন–

جراحات السنان لها التيام ÷ ولايلتام ما جرح اللسان

৪. জবানের কষ্টদানে লিপ্ততা বেশি। এমনকি খাস লোকগণও এতে লিপ্ত।

৫. মৌখিক কষ্টদান জীবিত, মৃত উভয়ের জন্য ব্যাপক। আর হাতের কষ্টদান জীবিতদের সাথে খাস।

এ হাদীসটি جوامع الكلم (শব্দ কম, অর্থ ব্যাপক) এর অন্তর্ভূক্ত। এটি সে পাঁচটি হাদীসের অন্তর্ভূক্ত, যেগুলোকে ইমাম আজম র. পাঁচ লাখ হাদীস থেকে বাছাই করেছেন।

والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه মুহাজির সেই, যে আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়াবলী বর্জন করেছে।

হিজরত দু'প্রকার– ১. জাহিরী, ২. বাতিনী।

জাহিরী হিজরত হল আল্লাহর জন্য স্বদেশ ত্যাগ করা। আর বাতিনী ও প্রকৃত হিজরত হল শরঈ সমস্ত নিষিদ্ধ বস্তু পরিহার করা।

قال ابو عبد الله الخ ইমাম বুখারী র. এখানে দু'টি তা'লীক উল্লেখ করেছেন। প্রথম তা'লীকটি দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আমির শা'বী (ইমাম আবু হানীফা র. এর উস্তাদ) এর শ্রবণ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে প্রমাণিত। প্রথম রেওয়ায়াতটি ছিল মুআনআন। যদ্বারা অশ্রবণের সন্দেহ হতে পারত। এ জন্য ইমাম বুখারী র. প্রথম তা'লীকটি উল্লেখ করেন। কারণ, এতে سمعت عبد الله এর সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।

দ্বিতীয় তা'লীক দ্বারা উদ্দেশ্য আবদুল আ'লার রেওয়ায়াতে যে আবদুল্লাহ অস্পষ্ট শব্দ রয়েছে, তদ্বারা উদ্দেশ্য আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.। যেমন– আবু মুআবিয়ার রেওয়ায়াতে এর সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।

আসল কথা হল মুহাদ্দিসীনের মূলনীতি হল, যখন আবদুল্লাহ শব্দ কোন ব্যাপক আকারে নিঃশর্তভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন এর দ্বারা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. উদ্দেশ্য হয়। এখানে আবদুল আ'লার রেওয়ায়াতে যেহেতু আবদুল্লাহ শব্দটি নিঃশর্ত এসেছে, যদ্বারা সন্দেহ হতে পারত যে, এখানে বোধ হয় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-ই উদ্দেশ্য, এ সন্দেহের অবসানের জন্য এ তা'লীকটি উল্লেখ করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. ঃ

হযরত আবদুল্লাহ হলেন সাহাবী। তাঁর পিতাও সাহাবী। তাঁর পিতা হযরত আমর ইবনে আস রা. হলেন মিসর বিজয়ী সুপ্রসিদ্ধ সাহাবী। তাঁর মাতা হলেন রীতা বিনতে মুনীহ। হযরত আবদুল্লাহ রা. পিতার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হযরত আমর ইবনে আস রা. তার চেয়ে বার বছরের বড় ছিলেন। তিনি ছিলেন আবিদ, যাহিদ, প্রচুর ইলমের অধিকারী সাহাবী। আবদুল্লাহ চতুষ্ঠয়ের মধ্যে তাঁর নামও অন্তর্ভূক্ত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় যুগেই তিনি হাদীস লিখতেন। যেমন– সহীহ বুখারী প্রথম খণ্ডের কিতাবুল ইলমে আছে, তাঁর থেকে সাতশ হাদীস বর্ণিত আছে। ১৭টি হাদীসের ব্যাপারে বুখারী ও মুসলিম একমত।

পার্থক্য ঃ আমর শব্দটি রফা ও জর অবস্থায় ওয়াও সহকারে লেখা হয়। যাতে উমর থেকে পৃথক হয়ে যায়। অবশ্য নসব অবস্থায় ওয়াও লেখার প্রয়োজন নেই। কারণ, উমর গাইরে মুনসারিফ। আর আমর মুনসারিফ। অতএব, নসব অবস্থায় আলিফ দ্বারা ব্যবধান হয়ে যাবে। -উমদাহ।

বিশেষ নির্বাচন ঃ

এ হাদীসটি جوامع الكلم এর অন্তর্ভূক্ত। ইমাম আবু দাঊদ র. পাঁচ লাখ হাদীস থেকে বাছাই করে স্বীয় সুনানে চার হাজার আটশ হাদীস উল্লেখ করেছেন। অতঃপর এগুলো থেকে চারটি হাদীস বাছাই করেছেন। কারণ, মানুষের জন্য স্বীয় দীনের উপর আমল করার জন্য শুধু এই চারটি হাদীসই যথেষ্ট।

১. انما الاعمال بالنيات - ইবাদত ঠিক করার জন্য।

২. من حسن اسلام المرء تركه مالايعنيه - প্রিয় জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলোর হেফাজতের জন্য।

৩. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبّ لنفسه - বান্দার হক যথার্থভাবে আদায় করার জন্য।

৪. الحلال بيّن والحرام بيّن وما بينهما مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه - সন্দেহজনক জিনিস থেকে বাঁচার জন্য।

যদিও একথাটি ইমাম আবু দাঊদ র. এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে প্রসিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু তাঁর পূর্বে ইমাম আজম আবু হানীফা র. স্বীয় সাহেবযাদা হাম্মাদ র. কে বলেছিলেন, আমি পাঁচ লাখ হাদীস থেকে পাঁচটি হাদীস বাছাই করেছি। অতঃপর তিনি উক্ত চারটি হাদীসের সাথে পঞ্চম হাদীস المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده বর্ণনা করেছেন।

৫. بَابٌ اَيُّ الْاِسْلَامِ اَفْضَلُ

৫. পরিচ্ছেদ ঃ কোন ইসলাম উত্তম

এ অনুচ্ছেদে বর্ণনা দেয়া হবে, ইসলামের কোন কাজটি উত্তম?

ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য ইসলামের শ্রেণীগুলো বিভিন্ন রকম। কারো ইসলাম উত্তম থাকে, আর কারোটি নিচু পর্যায়ের। যেহেতু ঈমান ও ইসলাম পরিপূর্ণতার স্তরে একই রকম, সেহেতু ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি প্রমাণিত হল এবং মুরজিয়া সম্প্রদায়ের মত খন্ডন হল।

١٠. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

১০. সাঈদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কুরাশী র. .... হযরত আবূ মূসা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইসলামে কোন্ কাজটি উত্তম? তিনি বললেন ঃ যার জিহবা ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছিল যে, মুসলমান সেই, যার হাত ও রসনা থেকে মুসলমানরা নিরাপদ। এর দ্বারা বাহ্যতঃ এই সন্দেহ হতে পারত যে, যার জবান ও হাত থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ নয়, সে মুসলমান নয়। ফলে ইমাম বুখারী র. এই শিরোনাম কায়েম করে এই সন্দেহ দূর করেছেন। যার সারমর্ম হল, এখানে শ্রেষ্ঠত্বের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী ছিল একটি প্রশ্নের উত্তরে।

একটি প্রশ্নের উত্তর ঃ প্রশ্নকারী জিজ্ঞেস করেছিল اىّ الاسلام افضل প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন من سلم المسلمون الخ। অর্থাৎ, যার জবান ও হাত থেকে লোকজন নিরাপদ থাকবে, সে উত্তম।

একটি প্রশ্ন ঃ আরবী ব্যাকরণ হিসেবে اىّ এর মুযাফ ইলাইহ একাধিক থাকা জরুরী। অথচ এখানে মুফরাদ।

উত্তর ঃ মূলতঃ ছিল اىّ اصحاب الاسلام افضل অথবা اى خصال الاسلام افضل। প্রথম ছূরতটি উত্তম। কারণ, দ্বিতীয় ছূরতে পূণরায় প্রশ্ন হয় যে, প্রশ্নোত্তরের মধ্যে মিল নেই। প্রশ্ন হল গুণের, আর উত্তর হল সত্তা সংক্রান্ত। কিন্তু প্রথম ছূরতে কোন প্রশ্ন নেই। তাছাড়া সহীহ মুসলিম প্রথম খণ্ডের ৪৮পৃষ্ঠার রেওয়ায়াত اىّ المسلمين افضل দ্বারাও এর সমর্থন হয়।

٦. بَابٌ إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ

৬. পরিচ্ছেদ ঃ খানা খাওয়ানো ইসলামী গুণ

১. هذا بابٌ তানভীন সহকারে।

২. ইযাফতের কারণে বাব শব্দটিতে তানভীন ছাড়া رفع ও জায়েয আছে।

৩. তাছাড়া আসমায়ে মা'দুদা রূপে بابْ সাকিন করে পড়াও জায়েয আছে। -উমদাতুল কারী।

١١. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالد قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ .

১১. আমর ইবনে খালিদ র....... আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আমর রা. থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোন্ কাজটি উত্তম? তিনি বললেন, তোমার খাবার খাওয়ানো ও পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম করা।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ ইমাম বুখারী র. এটি এখানে ছয় পৃষ্ঠায় এবং নয় পৃষ্ঠায় এবং কিতাবুল ইসতিযানে ৯২১ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম র. প্রমূখও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ মিল স্পষ্ট। কারণ, শিরোনামটি হাদীসের শব্দ থেকে গৃহীত।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র ঃ

বুখারীর ব্যাখ্যাতাগণের মত হল, ইমাম বুখারী র. যেহেতু বলেছেন, ঈমানের অনেক শাখা রয়েছে এবং এর দ্বারা ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর প্রমাণ পেশ করেছেন, সেহেতু এবার কিতাবুল্লাহ এবং বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত শাখাগুলো একের পর এক নমুনাস্বরূপ বর্ণনা করছেন। এর পূর্বেকার অনুচ্ছেদে ইসলামের একটি শাখার বিবরণ দেয়া হয়েছে। আর এই অনুচ্ছেদে বর্ণনা রয়েছে দু'টি শাখার– ১. খানা খাওয়ানো, ২. সালামের প্রসার ঘটানো। -ফাতহুল বারী, উমদাতুল কারী।

২. কিন্তু হাকীকত হল এই অনুচ্ছেদটি অগ্রগামী হয়ে উন্নয়নরূপে পেশ করা হয়েছে। ইমাম বুখারী র. এক বিশেষ তারতীব এবং বিস্ময়কর সুক্ষ্মদৃষ্টিতার সাথে অনুচ্ছেদ কায়েম করছেন এভাবে যে, এই অনুচ্ছেদ ও পরবর্তী আসন্ন অনুচ্ছেদগুলোতে নিচ থেকে উঁচু শ্রেণীর দিকে তরক্কী করছেন।

ঈমানী কামালের সর্বপ্রথম স্তর হল কাউকে কষ্ট না দেয়া। আর এই অনুচ্ছেদে বলছেন, এর চেয়ে উঁচুস্তর হল শুধু হাত ও জবানের হেফাজতই না করা। বরং নিজের জবান ও হাত দ্বারা অন্যদের উপকৃতও করবে। জবানে নিরাপত্তার দো'আ করবে এবং নিজের হাতে অর্জিত খানাও খাওয়াবে। এরপর এদিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, এর চেয়ে উঁচু পর্যায় হল নিজের ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা নিজের জন্য পছন্দ করতে হবে। যেন অন্য ভাষায় এরূপ ঐক্যের সম্পর্ক সৃষ্টি করে, যাতে উভয়ের পছন্দ একই হয়ে যায়। যেমন– আনসার, মুহাজিরীনের সাথে আমলী নমুনারূপে পেশ করেছি।

অতঃপর দর্শকের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট করেছেন যে, যেহেতু এই উঁচুস্তরে পৌঁছে গেছে, যে নিজের আকর্ষনীয় ও পছন্দসই জিনিসকে নিজের ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করে, তাহলে স্পষ্ট হল যে পবিত্র সত্তা সমস্ত মাখলূক থেকে শ্রেষ্ঠ এবং মানবতার মহা উপকারী, তার সাথে এরূপ ভালবাসা হওয়া উচিত, যার ফলে নিজের মর্জিগুলোকে তাঁর মর্জির অনুগত করে দিবে। তনুমন, ধন, জান-মাল, পিতা-পূত্র সবকিছু তার মর্জির

উপর উৎসর্গ করে দেয়া উচিত। অতঃপর যখন কারো সাথে চুড়ান্ত পর্যায়ের মহব্বত, ভালবাসা হয় এবং ফানার পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন যার সাথে ভালবাসা হবে, প্রেমাস্পদের খাতিরেই হবে। আর বিদ্বেষ হলে তাও হবে তার সন্তুষ্টির জন্য। অতঃপর তার সাথে সংশ্লিষ্ট আনসার ও সহযোগীদের সাথেও ভালবাসা আবশ্যক। যেমন– পেয়ালা যখন পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তখন তা ছাপিয়ে আসে পাশের জমিনকেও সিঞ্চন করে। এর বিবরণের জন্য সামনে গিয়ে বর্ণনা করেছেন- علامة الايمان حبّ الانصار। এর বিস্তারিত বিবরণ থেকে জানা গেল যে, যে সব অনুচ্ছেদের বিষয় বাহ্যতঃ এক মনে হয়, প্রকৃত অর্থে এগুলোতে পার্থক্য আছে। কারণ, ন্যূনতম থেকে উঁচু পর্যায়ের দিকে আরোহন করে ঈমানের বিভিন্নস্তর বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

ایّ الاسلام خیر প্রবল ধারণা প্রশ্নকারী হযরত আবু যর রা.।

উত্তরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি ভাল গুণের বিবরণ দিয়েছেন। একটি হল খানা খাওয়ানো, আরেকটি হল সালামের প্রসার ঘটানো।

تقرء السلام খাওয়ানো,পান করানো, যিয়াফত, গরীব-গোরাবাদের খানা খাওয়ানো ইত্যাদি সবই অন্তর্ভূক্ত। এরূপভাবে খানা খাওয়ানো কারো সাথে বিশেষিত নয়- কাফির হোক অথবা মুসলমান, আপন হোক বা পর, এমনকি মানুষ হোক অথবা পশু, সবই ব্যাপক।

প্রতিটি জাতির রীতি হল, যখন একজন অপরজনের সাথে সাক্ষাত করে, তখন বাচনিকভাবে একটি তোহফা পেশ করে। যেমন– হিন্দুরা 'জয় রামজি' অথবা 'আদাব'। খৃষ্টানরা 'গুডমর্ণিং' ইত্যাদি বলে। কিন্তু এগুলোতে ব্যাপকতা নেই।

সালাম হল সর্বোৎকৃষ্ট তোহফা ঃ

অর্থাৎ, ইসলামের এই উপঢৌকনও পৃথিবীর সমস্ত জাতির উপঢৌকন অপেক্ষা উত্তম। কারণ, এতে সব ধরণের নিরাপত্তার দো'আ রয়েছে- জান, মাল, ইজ্জত আবরু এবং দুনিয়া-আখেরাতের। মোটকথা, নেহায়েত সংক্ষিপ্ত, কিন্তু মূল্যবান এবং ব্যাপক উপঢৌকন।

সালামের সূচনা ঃ ইমাম বুখারী র. কিতাবুল ইস্তিযানে (২/৯১৯) সর্বপ্রথম باب بدء السلام এনেছেন। এতে এই রেওয়ায়াতটি আছে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত আদম আ.কে সৃষ্টি করেন, তখন বলেন, যাও, এসব ফিরিশতাদলকে সালাম কর এবং শোন, তারা কি উত্তর দেয়? সেই উত্তরই তোমার এবং তোমার সন্তান-সন্ততিদের সালাম। তখন হযরত আদম আ. বললেন– السلام عليكم। ফিরিশতারা উত্তর দিলেন- وعليك السلام ورحمة الله। এর দ্বারা বুঝা গেল, সালাম মানবতার উপঢৌকন। বড়-ছোট সমস্ত আদম সন্তানের সালাম এটাই।

জান্নাতীদের মুবারকবাদও হবে এটাই। কুরআনে কারীমে আছে– وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ 'জান্নাতে তাদের উপঢৌকন হবে সালাম।' –সূরা ইউনুস।

আল্লাহ তা'আলাও স্বীয় জান্নাতী বান্দাদেরকে দো'আ রূপে নয়, বরং জান্নাতীদের সম্মানার্থে এবং নিজের পক্ষ থেকে রহমত ও শান্তি নিরাপত্তাদানের সংবাদ হিসেবে এই মুবারকবাদ দ্বারা সম্বোধন করবেন যেমন– ইরশাদে ইলাহী রয়েছে– سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ অর্থাৎ, সে অনুগ্রহশীল দয়াবান আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতীদেরকে বলা হবে সালাম। চাই ফিরিশতাদের মাধ্যমে হোক, অথবা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ তা'আলা বলবেন। যেমন– ইবনে মাজাহর রেওয়ায়াতে আছে– প্রত্যক্ষভাবে স্বয়ং রব্বে কারীম সালাম বলবেন। তখনকার ইজ্জত সম্মান ও আনন্দের কথা আর কি বলব!

اللهم ارزقنا هذه النعمة العظمى ببركة نبيّك محمد صلى الله عليه وسلم

হাদীস শরীফে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা রা. সালাম উপহার পাবেন বলে উল্লেখিত হয়েছে। এরূপভাবে সহীহ বুখারীতে হযরত জিবরাঈল আমীনের পক্ষ থেকে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. সালাম উপঢৌকন দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন বলে উল্লেখ রয়েছে। -বুখারী ঃ২/৯২৩-২৪।

একটি প্রশ্ন ঃ সহীহ বুখারীতে এই বিষয়ের ৪টি হাদীস রয়েছে-

১. পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের হাদীস- রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল- ایّ الاسلام افضل। উত্তরে তিনি বললেন- من سلم المسلمون من لسانه ويده।

২. আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে আছে- এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল- ای الاسلام خير। তখন তিনি বললেন- تطعم الطعام وتقرء السلام الخ।

৩. তৃতীয় হাদীস বুখারীর ৮নং পৃষ্ঠাতে আছে-

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ایّ العمل افضل؟ فقال ايمان بالله ورسوله قيل ثمّ ماذا قال الجهاد فى سبيل الله قيل ثمّ ماذا قال حج مبرور . مسلم : ١/٦٢.

৪. চতুর্থ হাদীসটি হল, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. বলেন-

سألت النبى صلى الله عليه وسلم ایّ العمل احبّ الى الله قال الصلوة على وقتها قال ثمّ ایّ قال ثم برّ الوالدين قال ثم ایّ قال الجهاد فى سبيل الله. بخاري : ١/٧٦، مسلم : ١/٦٢.

বাহ্যতঃ এই চারটি হাদীসে পারস্পরিক বিরোধ রয়েছে। কারণ, চারটি প্রশ্ন প্রায় একই রকম। কিন্তু উত্তর বিভিন্ন রকম।

উত্তর ঃ আল্লামা কাসতাল্লানী র.বলেন-

قد اجيب بان اختلاف الاجوبة فى ذلك لاختلاف الاحوال والاشخاص الخ

এ উত্তরের সারমর্ম হল, উত্তরের বিভিন্নতা ব্যক্তি ও অবস্থার বিভিন্নতার কারণে ছিল। প্রবল ধারণা, একারণে এ অনুচ্ছেদের হাদীসগুলোতে নামায, যাকাত এবং রোযার উল্লেখ নেই। ওরফ ও বাগধারায় কোন কোন সময় বলা হয়- অমুক জিনিসটি সর্বশ্রেষ্ঠ। এর উদ্দেশ্য এই হয় না যে, এ জিনিসটি সর্বদিক দিয়ে সর্বাবস্থায় এবং প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম ও উপকারী। বরং উদ্দেশ্য হয়, বিশেষ অবস্থায় এতে শ্রেষ্ঠত্ব ও উত্তমতা অথবা প্রিয়তা রয়েছে। অতএব, হাদীসগুলোতে কোন বিরোধ রইল না।

২. জবাবের বিভিন্নতা শ্রোতাদের অবস্থার বিভিন্নতার কারণে। অর্থাৎ, কারো নামাযে ত্রুটি অনুভব করলেন, তখন তার জন্য উত্তম সাব্যস্ত করলেন- الصلوة لوقتها আবার কারো সম্পর্কে মাথা-পিতার হকের ক্ষেত্রে ত্রুটির সন্দেহ হল। তাই তার জন্য برّ الوالدين কে উত্তম আমল সাব্যস্ত করলেন। অনুরূপ কিয়াস করুন।

৩. জবাবের বিভিন্নতা বক্তার অবস্থার বিভিন্নতার কারণে। আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন শান হয়ে থাকে। শেখ সা'দী র. বলেন-

بتهديد اكر بركشد تيغ حكم ÷ بمانند كرو بيان صم وبكم.

وگر در دهد يك صلائي كرم ÷ عزازيل گويد نصيبي برم.

এরূপভাবে আম্বিয়ায়ে কিরামের শানও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। পার্থক্য হল, আল্লাহ তা'আলার শান অন্য কারো অধীনস্থ হয় না। কিন্তু নবীগণের শান আল্লাহ তা'আলার শানের অধীনস্থ হয়। যখন আল্লাহ তা'আলার শানে রহমতের প্রতি দৃষ্টিপাত হল, তখন বললেন- ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة -। আর যখন সংশোধন অথবা ক্রোধ ও প্রতিশোধের শানের দিকে মনোযোগ হল, তখন বললেন- لا يدخل الجنة قتات -বুখারী, মুসলিম। মুসলিমের আরেক রেওয়ায়াতে আছে- نَمَّامٌ

من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام । -বুখারী, মুসলিম।

একবার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু হোরায়রা রা. কে বললেন-

اذهب بنعلي هاتين فمن لقيك من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة

সামনে হযরত উমর ফারুক রা. এর সাথে সাক্ষাত হল। তিনি হযরত আবু হোরায়রা রা. এর কিস্‌সা সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন কঠোরভাবে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরয করলেন, এই ঘোষণার কারণে লোকজন আমলে অলসতা প্রদর্শন করতে শুরু করবে। অতএব, ঘোষণা যেন না দেয়া হয়। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠিক আছে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই জবাবের বিভিন্নতা অর্থাৎ, প্রথমে ঘোষণার নির্দেশ এবং পরবর্তীতে তা থেকে নিষেধ শানের বিভিন্নতার উপর নির্ভর ছিল। কখনো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর শানে রহমত প্রবল ছিল। পরবর্তীতে হযরত উমর রা. এর মনোযোগ আকর্ষণের ফলে শানে হিকমত ও ইসলাহ প্রবল হয়ে গেছে।

৪. জবাবের বিভিন্নতা হয়েছে সময়ের বিভিন্নতার কারণে। অর্থাৎ, কোন সময় একটি আমল উত্তম হয়ে থাকে। আর অন্য সময় অন্যটি। যেমন- আল্লাহ না করুন, শহরে দূর্ভিক্ষ দেখা দিল, লোকজন ক্ষুধায় মরছে, এমন সময় কোন ব্যক্তি নফল হজ্জের ইচ্ছা করলে তাকে নিষেধ করা হবে। তখন লোকজনকে খানা খাওয়ানো শ্রেষ্ঠ আমল সাব্যস্ত করা হবে। মোটকথা, মওকা ও স্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী।

তাবাকাতে শাফিইয়্যাতে এক বুযুর্গের ঘটনা লিখেছেন। এক নেতা ছিলেন তার মুরীদ। তিনি সে বুযুর্গের খেদমতে উপস্থিত হতেন। নেতাসুলভ মনমানসিকতা অনুযায়ী সেখানে অবস্থানস্থল না পাওয়ার কারণে কষ্ট হত। তিনি বুযুর্গকে অনেক অর্থ দিয়ে দরখাস্ত করলেন, আমার জন্য একটি উত্তম বাড়ি তৈরি করে দিন। তখন শহরে ছিল দুর্ভিক্ষ। সে বুযুর্গ এ টাকা-পয়সা মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করে সে নেতাকে লিখে দিলেন, বাড়ি প্রস্তুত। তিনি ভীষণ খুশি হলেন। বুযুর্গের খেদমতে এসে দেখলেন, কোন বাড়ি ঘর নেই। জিজ্ঞেস করলে বুযুর্গ উত্তর দিলেন, জান্নাতে বাড়ি প্রস্তুত। সে বড় লোক বললেন, দলীল-দস্তাবেজ লিখে দিন, যাতে কবরে সাথে নিয়ে যেতে পারি। তিনি দস্তাবেজ লিখে দিলেন। রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন, আল্লাহ তা'আলার সামনে হাজির হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কঠোরতা আরোপ করা হচ্ছে। সতর্ক করা হচ্ছে যে, তুমি কি জান্নাতের ঠিকাদার যে, যাকে ইচ্ছা দস্তাবেজ লিখে দিবে? আরো ইরশাদ হল, যেহেতু তোমার নিয়্যত ভাল ছিল, এ জন্য তোমাকে মাফ করে দেয়া হচ্ছে। আমি তোমার কথা অনুযায়ী কাজ করে দিয়েছি। ভবিষ্যতে কখনো এরূপ আচরণ করবে না।

৫. এই শ্রেষ্ঠত্ব ছিল কোন এক কারণবশতঃ অর্থাৎ, একটি আমল কোন কারণবশতঃ শ্রেষ্ঠ, অপর আমলটি অন্য কারণে শ্রেষ্ঠ। যেমন- হাদীসে আছে-

ارحم امتي بامتي ابوبكر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي واقرءهم ابي بن كعب واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل واصدقهم لهجة ابو ذر وافرضهم زيد بن ثابت وامين هذه الامة ابو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم-

এতে বিভিন্ন সাহাবীর শ্রেষ্ঠত্ব কোন কারণবশতঃ বর্ণনা করা হয়েছে। তথা সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্ব নয়। বরং শাখাগত ও খুটিনাটি কারণে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্ব তো হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.এর। ইত্যাদি।-ইরশাদুল কারী।

٧. بَابٌ مِنَ الْإِيمَانِ اَنْ يُّحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

৭. পরিচ্ছেদ ঃ নিজের জন্য যা পসন্দনীয়, ভাইয়ের জন্যও তা পসন্দ করা ঈমানের অংশ

١١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

১২. মুসাদ্দাদ ...... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত (কামিল) মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় ভাই (মুসলমান) এর জন্য তা পছন্দ না করে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ

এ হাদীসটি মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ প্রমূখ বর্ণনা করেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ

মিল সম্পূর্ণ স্পষ্ট। কারণ, শিরোনামটি হাদীসের শব্দ থেকে গৃহীত।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র ঃ

কেবলমাত্র আলোচনা এসেছে যে, এ অনুচ্ছেদটি হল তরক্কীরূপে। অর্থাৎ, যদিও খানা খাওয়ানো এবং সালামের প্রসার ঘটানো ইসলামের উত্তম গুণ। কিন্তু এর উপর ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়। বরং এর চেয়েও সামনে বেড়ে যাওয়া উচিত। যে জিনিস নিজের জন্য পছন্দ হবে, এরূপ জিনিস নিজের ভাইয়ের জন্যও পছন্দ কর। অথবা বলা হবে, খানা খাওয়ানো এবং সালামের প্রসার ঘটানো, কৃপণতা ও নফসানিয়তের কারণে নিজের কাছে কষ্টকর হয়ে থাকে। এজন্য উদ্বুদ্ধকরণ ও বুঝানোর ভঙ্গিতে এ অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন যে, যেহেতু তোমাদের আন্তরিক চাহিদা হয়, লোকজন যেন তোমাকে সালাম করে এবং তোমাকে খানাপিনা খাওয়া, সেহেতু তোমারও উচিত, স্বীয় ভাইদের সাথে অনুরূপ আচরণ করা। কারণ, এটা ঈমানের নিদর্শন।

২. পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে খানা খাওয়ানোর বিবরণ ছিল। একাজটি সাধারণতঃ তার সাথেই করা হয়, যার সাথে কোন কারণে মহব্বত ভালবাসা হয়। আর এ অনুচ্ছেদেও মুসলমান ভাইয়ের মহব্বতের বিবরণ রয়েছে। এ জন্য উভয়ের মধ্যে মিল হয়ে যায়।

একটি প্রশ্ন ঃ কেউ যদি সম্রাট হয়, তবে কি তার জন্য যে কোন লোককে তার হুকুমতে অংশীদার বানানো জরুরী? শিশু ও পাগলদেরকেও নিজের সাথে সিংহাসনে বসাবে? এর ফলে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনাই উলটপালট হয়ে যাবে। তাছাড়া মানবিক স্বভাবের দাবি হল, মানুষ দীন-দুনিয়ায় সবার চেয়ে অগ্রগামী হতে চায়।

উত্তর ঃ ১.হাদীস শরীফের উদ্দেশ্য এই নয় যে, সবাইকে নিজের মাল, সম্পদ ও স্বত্বে শরীক করবে। বরং উদ্দেশ্য হল, প্রতিটি ব্যক্তি যেমন- নিজের ব্যাপারে পছন্দ করে, লোক যেন তার সম্মান করে, উত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, ভাল কাজে প্রতিদান দেয়, মন্দকাজ হলে ক্ষমা করে দেয়, তা থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে নেয়, এরূপভাবে তারও উচিত, অন্যদের সাথে এরূপ আচরণ করা।

নিঃসন্দেহে এ হাদীস রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম। যেটি বিশ্ব শান্তির যিম্মাদার। উলামায়ে কিরাম এ হাদীসটিকে جوامع الكلم এর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। যদি বিশ্ববাসী শুধু এ হাদীসের উপর আমল করত, তবে সমস্ত ফিতনা-ফাসাদের মূলোৎপাটন হয়ে যেত। চোর কারো ঘরে সিঁধ কাটার সময়, পকেটমার কারো পকেটে হাত দেয়ার সময়, কারো স্ত্রী, কন্যার প্রতি কুদৃষ্টিতে তাকানোর সময় যদি চিন্তা করে, আমি যা করতে চাই যদি এ আচরণই আমার সাথে কেউ করে, তবে কি আমি তা পছন্দ করতাম!

ইনশাআল্লাহ, শুধু এতটুকু চিন্তা করলে চুরি, যেনা, গীবত, অপবাদ এবং সমস্ত ফিতনা-ফাসাদ নাস্ত নাবুদ হয়ে যাবে।

হাফিজ ইবনে কাসীর র. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. এর সনদে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যার সারনির্যাস হল, এক ব্যক্তি দরবারে নববীতে উপস্থিত হয়ে বলল, আমি এ শর্তে ঈমান এনেছি যে, আমাকে যেন যেনা-ব্যভিচারের অনুমতি দেয়া হয়। এতদশ্রবণে সাহাবায়ে কিরাম তাকে ধমকাতে শুরু করেন। কিন্তু রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন প্রজ্ঞাবান। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে বারণ করলেন। লোকটিকে বসিয়ে বললেন- তোমার মা, কন্যা অথবা বোনের সাথে কেউ এ অশোভনীয় আচরণ করুক, তা কি তুমি পছন্দ কর? সে বলল, কখনো নয়। আমি তো তলোয়ার দিয়ে তার খবর নিব। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- যার সাথে এ মন্দ আচরণ করতে চাও, সেও তো কারো মা, কারো কন্যা এবং কারো বোন হবে! সুবহানাল্লাহ! বুঝানো ও উপদেশের ধরণ কত প্রিয়! প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর হস্ত মুবারক রেখে দো'আ করলেন- اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه واحصن فرجه الخ এর পর থেকে তিনি কারো দিকে চোখ তুলেও কুনজরে তাকাননি।

২. এ হাদীসটিকে খাস পরামর্শের সাথে সংশ্লিষ্ট সাব্যস্ত করা হবে। অর্থাৎ, যদি কেউ কোন কাজে আপনার কাছ থেকে পরামর্শ নিতে আসে, তবে আপনি এরূপ পরামর্শ দিবেন, যেটা আপনি নিজের জন্য পছন্দ করেন। এটি চিন্তা করে মশওয়ারা দিবেন, যদি আমি পরামর্শপ্রার্থীর স্থানে হতাম, তাহলে কি করতাম?

সনদের বিভিন্নতা ঃ

এখানে দু'টি সনদ উল্লেখিত হয়েছে। উভয়টি মুত্তাসিল। একটি সনদ হল- حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس رضـــ দ্বিতীয় সনদ হল- حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حسين المعلم عن

عن شعبة عن قتادة عن عن انس رضـــ অতএব, সহীহ বুখারীর উপরোক্ত সনদে عن حسين এর আতফ عن شعبة এর উপর। যেন আসল ইবারত এই হবে যে, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তান বলেন- عن شعبة وحسين المعلم كلاهما عن قتادة।

* এবার প্রশ্ন হবে, ইমাম বুখারী র. উভয়কে একত্র কেন করলেন না?

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী প্রমূখ উত্তর দেন যে, ইমাম বুখারী র. স্বীয় উস্তাদের অনুসরণে এরূপ করেছেন। তাঁর উস্তাদ উভয় রাবীকে আলাদা আলাদা বর্ণনা করেছেন। একত্রে আনেননি। এজন্য ইমাম বুখারী র.ও একত্রে আনেননি। বরং সংক্ষেপের জন্য আত্ফ করে রেওয়ায়াত করেছেন।

অতঃপর উভয় রেওয়ায়াতে একটি পার্থক্য ছিল। শো'বা বলেছেন- عن قتادة। আর হোসাইন মুআল্লিম বলেছেন- حدثنا قتادة। এ পার্থক্য স্পষ্ট করার জন্যও একত্রিকরণের পন্থা অবলম্বন করেননি। অবশ্য এখানে যে মূলপাঠ উল্লেখিত হয়েছে, এটি শো'বারই বর্ণিত শব্দরাজি।

٨. بَابُ حُبُّ الرَّسُوْلِ صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِيْمَانِ

৮. পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ভালবাসা ঈমানের অংশ

الرسول আলিফ লাম عهدى। এর দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কারণ, রেওয়ায়াতে اكون মুতাকাল্লিমের সীগা এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই। যদিও সত্তাগতভাবে আম্বিয়া আ.এর প্রতি ভালবাসা ওয়াজিব, কিন্তু সর্বাধিক প্রিয় হওয়ার বিষয়টি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই বিশেষিত। অতএব, শিরোনামে আলিফ লাম জিন্স অথবা ইসতিগরাকের জন্য নেয়া ঠিক নয়। -উমদাহ, ফাতহ, কাসতাল্লানী।

١٣. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ .

১৩. আবুল ইয়ামান র. .... হযরত আবূ হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ সেই পবিত্র সত্তার (আল্লাহর) কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমার মহব্বত তার কাছে তার পিতা ও সন্তানের চেয়ে অধিক না হয়।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি ঃ ইমাম বুখারী র. এ অনুচ্ছেদে দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন এবং দু'টি হাদীসই ৭নং পৃষ্ঠায় রয়েছে। দ্বিতীয় রেওয়ায়াতটি এর পর সাথে সাথেই ইনশাআল্লাহ আসবে। ইমাম মুসলিম র.ও এটি বর্ণনা করেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ হাদীসের সাথে শিরোনামের মিল স্পষ্ট।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র ঃ

১. উভয় অনুচ্ছেদে ঈমানী ভালবাসার বিবরণ রয়েছে। এজন্য যোগসূত্র ও মিল স্পষ্ট।

২. পূর্বের অনুচ্ছেদে সাধারণ ভালবাসার বিবরণ ছিল। আর এ অনুচ্ছেদে বিশেষ ভালবাসার তাকিদ রয়েছে। যেন এ অনুচ্ছেদটি হল আমের পরে খাসের অন্তর্ভূক্ত। মূলনীতি হল, আমের পর বিশেষিতকরণ হয়ে থাকে সাধারণতঃ বিষয়ের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য।

৩. অথবা এটি নিচুস্তর থেকে উঁচুস্তরে উন্নয়নের অন্তর্ভূক্ত। প্রথম অনুচ্ছেদে প্রিয়ভাজন নিজের ভাই ছিল এবং ভালবাসাও ছিল নিজের মত। আর এ অনুচ্ছেদে প্রেমাস্পদ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব, ভালবাসাও সর্বোচ্চ স্তরের কাম্য।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালবাসা ঈমানের অংশ। যদি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কারো ভালবাসা না থাকে, তবে সে মুসলমানই নয়।

মহব্বতের অর্থ ও এর প্রকারভেদ ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন-

المحبة في اللغة ميل القلب الى الشئ لتصور كمال فيه بحيث يرغب فيما يقربه اليه

অর্থাৎ, অন্তর কোন আতর্ষনীয় জিনিসের প্রতি এই কল্পনায় ঝুকে পড়া যে, তাতে কোন গুণ রয়েছে। ফলে তার নৈকট্য লাভে সে আগ্রহী হবে। -উমদাহ ঃ ১/১৪২।

আল্লামা নববী র. বলেন-

وبالجملة اصل المحبة الميل الى مايوافق المحب ثمّ الميل قد يكون لما يستلذه الانسان ويستحسنه بحواسه كحسن الصورة والصوت والطعام الخ.

ইমাম নববী র.এর বাণীর সারমর্ম হল অভিধানে কোন আকর্ষনীয় ও পছন্দসই জিনিসের প্রতি আন্তরিক ঝোঁককে বলে মহব্বত। অতঃপর এ ঝোক কখনো এরূপ জিনিসের প্রতি হয়, যাতে মানুষ নিজের ইন্দ্রিয় শক্তিগুলো দ্বারা মজা অনুভব করে এবং সুন্দর মনে করে। যেমন– সুন্দর রূপ, সুন্দর স্বর ইত্যাদি। আবার কখনো এরূপ জিনিসের প্রতি আন্তরিক টান হয়, যার মজা অনুভূত হয় বাতিনী কারণ ও গুণাবলীর ফলে বিবেকের মাধ্যমে। যেমন– নেককার আলিম এবং গুণীজনের প্রতি সাধারণ ভালবাসা অর্থাৎ, কোন স্বার্থ উদ্ধার বা ক্ষতি প্রতিহত করণ ছাড়া। আর কখনো মহব্বত হয় কোন ইহসানের কারণে। যেমন– কেউ কোন কঠিন বিপদের মুহুর্তে অনুগ্রহ প্রদর্শন করল।

প্রশ্ন ঃ এসব সংজ্ঞা দ্বারা স্পষ্ট হল, মহব্বত অন্তরের টানকে বলে। এটি স্বভাবজাত বিষয়। কিছু কিছু কারণ এরূপ হয়ে থাকে যে, মানুষ অনিচ্ছাকৃতভাবে সেদিকে ঝুকে যায়। সেখানে মানুষের ইচ্ছার কোন দখল থাকে না। যেমন- মাতা-পিতার প্রতি মহব্বত, সন্তান-সন্তুতি ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি মহব্বত। বস্তুতঃ স্বভাবজাত প্রিয় জিনিসগুলোর প্রতি ভালবাসা হয় স্বাভাবিক। এটি অনৈচ্ছিক বিষয়। পক্ষান্তরে মানুষকে অনৈচ্ছিক বিষয়ের মুকাল্লাফ বানানো যায় না। দায়িত্ব চাপানো হয় সর্বদা ঐচ্ছিক বিষয়ে।

উত্তর ঃ এই প্রশ্নের উত্তর মুহাদ্দিসীনে কিরাম ও বুখারীর ব্যাখ্যাতাগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহব্বত তিন প্রকার–

১. মহব্বতে তবঈ– স্বভাবজাত ভালবাসা। অর্থাৎ, অনৈচ্ছিক।

২. মহব্বতে আকলী- তথা যৌক্তিক ভালবাসা।

এ দু'টি মহব্বত ঐচ্ছিক। এখানে হাদীস শরীফে মহব্বতে আকলী ও ঈমানী উদ্দেশ্য।

এবার হাদীসের অর্থ হল, যতক্ষণ পর্যন্ত যৌক্তিক ভালবাসা ও ঈমানী মহব্বত প্রবল না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কামিল মুমিন বলার যোগ্য হতে পারবে না।

যৌক্তিক মহব্বতের অর্থ হল, কোন জিনিস স্বভাবতঃ কঠিন মনে হলেও কিন্তু বিবেকের দাবি হল তাকে সমস্ত কিছুর উপর প্রাধান্য দান। যেমন– রোগী ব্যক্তি তিতা ঔষধকে অপছন্দ করে। কিন্তু যেহেতু এর দ্বারা সুস্থতা লাভ হয়, এ কারণে যুক্তির আলোকে তা সেবন করে। অথবা কাউকে ডাক্তার অপারেশনের জন্য বলল, স্বাভাবিকভাবে কেউ চায় না, কারো শরীরের কোন অংশ কেটে ফেলতে। কিন্তু বিবেক নির্দেশ দেয়, যদি অপারেশন না করা হয়, তাহলে অন্যান্য অঙ্গও প্রভাবিত হবে, বিপদগ্রস্থ হবে, রোগ ছড়িয়ে পড়বে, তা সংক্রমন করবে। তখন ডাক্তারকে বিরাট অংকের অর্থ দিয়ে অপারেশন করায়। অতএব, এই অপারেশনের চাহিদা হল যৌক্তিক মহব্বত।

যেহেতু যৌক্তিক ভালবাসায় লাভ-ক্ষতির প্রতি দৃষ্টি থাকে, সেহেতু উপকারী জিনিসকে বিবেক সর্বদাই প্রাধান্য দিবে। অতএব, যুক্তির দাবি হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত ও আনুগত্যে উপকারিতা রয়েছে। অতএব, দুনিয়ার সমস্ত কিছু অপেক্ষা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত বেশি হওয়া উচিত। তাছাড়া পৃথিবীতে ভালবাসার যত কারণ রয়েছে, সেগুলো সব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে পূর্ণাঙ্গতর রূপে বিদ্যমান। এজন্য সমস্ত জ্ঞানীগণ এ ব্যাপারে একমত যে, ভালবাসার কারণ চারটি–

১. সৌন্দর্য, ২. গুণ, ৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক, ৪. ইহসান-অনুগ্রহ।

এগুলোর কোন একটি বিদ্যমান হলে ভালবাসা হবে। স্পষ্ট বিষয়, স্বাভাবিক ভালবাসাও এসব কারণেই সীমাবদ্ধ।

সৌন্দর্য ঃ

ভালবাসার একটি কারণ হল, সৌন্দর্য। অর্থাৎ, বাহ্যিক সৌন্দর্য ভালবাসার কারণ। যেমন- শিরীন, ফরহাদ, লায়লা, মজনূর ঘটনাবলী এর প্রমাণ। এমনিভাবে হযরত ইউসুফ আ. ও যুলায়খার ঘটনাও এর প্রমাণ যে, রূপ সৌন্দর্যকে ভালবাসার কারণ।

নূরে মুজাসসাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূপ সৌন্দর্য কোন স্তরের ছিল? রূপস্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা যিনি সৌন্দর্য ভালবাসেন, (ان الله جميل يحبّ الجمال) তিনি স্বীয় প্রেমাস্পদকে কি পরিমাণ রূপ-সৌন্দর্যে সুসজ্জিত করেছিলেন!

منزه عن شريك فى محاسنه ÷ فجوهر الحسن فيه غير منقسم.

স্বচক্ষে দর্শনকারী সাহাবায়ে কিরামের জবানে শুনুন-

হযরত জাবির ইবনে সামুরা রা. বলেন, একবার পূর্ণিমার রাত্রে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখছিলাম। তখন তিনি এক জোড়া লাল পোশাক পরিহিত। আমি কখনো চাঁদের দিকে তাকাচ্ছিলাম, আবার কখনো তাঁর দিকে। অবশেষে আমি এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদের চেয়ে বেশি সুন্দর ও চমৎকার। -শামাইলে তিরমিযী।

ياصاحب الجمال وياسيّد البشر ÷ من وجهك المنير لقد نوّر القمر.

لايمكن الثناء كما كان حقه ÷ بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر.

হযরত আবু হোরায়রা রা. বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতটা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও রূপ সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন, যেন তাঁর দেহ মুবারক রূপার দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল।

-শামাইলে তিরমিযী।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, আমি রাতের অন্ধকারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোকোজ্জল চেহারার আলোকে সুঁই তালাশ করেছি।

আল্লামা মুনাবী র. লিখেছেন, প্রতিটি মানুষের উপর এই বিশ্বাস রাখার দায়িত্ব যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মুবারক যে সব সুন্দর গুণে গুণান্বিত, এরূপ অন্য কেউ হতে পারে না। এটি শুধু বিশ্বাসগত বিষয়ই নয়। সীরাত, হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থাবলী এগুলোতে ভরপুর যে, আল্লাহ তা'আলা বাতিনী গুণাবলীর সাথে সাথে তাঁকে বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্য পূর্ণাঙ্গতমরূপে দান করেছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. থেকে দুটি কাব্য বর্ণিত আছে, যেগুলোর অর্থ হল, যুলায়খার সখীরা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্যোতির্ময় চেহারা দেখত, তাহলে তাদের হাতের স্থলে অন্তর কেটে ফেলত।

-খাসায়েলে নববী।

হযরত সিদ্দীকা রা. বলেন-

لواحی زلیخا لورأین جبینه ÷ لاثرن بالتقطیع الصدور علی الید

একটি প্রশ্ন ঃ হযরত আয়েশা রা. এর উপরোক্ত কাব্যে কারো হয়ত প্রশ্ন হতে পারে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দর্শন করে কারো অন্তর তো দূরে থাক, কেউ হাতও কাটেনি।

উত্তর ঃ এ প্রশ্ন তার হতে পারে, যে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কিরামের ঘটনাবলী ও কীর্তি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রাণ উৎসর্গকারীদের ঘটনাবলী এত প্রচুর যে, তা আয়ত্বের বাইরে।

কোন যুবতী রমনী কর্তৃক সুদর্শন যুবকের প্রতি আসক্তি কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। এটা তো পৃথিবীতে অব্যাহতভাবে হয়েই আসছে। অস্বাভাবিক ও অলৌকিক বিষয় হল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শিশুদের থেকে নিয়ে বৃদ্ধ পর্যন্ত রমনীদের থেকে নিয়ে পুরুষগণ পর্যন্ত বরং তার চেয়েও অগ্রসর হয়ে জীবজন্তু পর্যন্ত প্রাণ উৎসর্গ করেছে। উদ্ভিদ ও জড় পদার্থগুলোও আসক্তি প্রকাশ করেছে। রমনী ও শিশুদের প্রাণ উৎসর্গের ঘটনাবলীর তালিকা সুদীর্ঘ। বিদায় হজ্জে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একশত উটনী কুরবানী করেছেন। তন্মধ্য থেকে ৬৩টি কুরবানী করেছেন নিজ হাতে বাকিগুলো কুরবানী করার নির্দেশ দিয়েছেন হযরত আলী রা.কে। সেসব উট কুরবানীর জন্য এক পা বেঁধে এক সাড়িতে দাড় করিয়ে দেয়া হয়। যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর জন্য হাতে নেযা নেন, তখন এ উটগুলো প্রতিযোগিতা শুরু করেছিল কোনটি সর্বপ্রথম তার বুকে নেযার আঘাতে কুরবান হবে?

نه شود نصیب دشمن که شود هلاك تیغت ÷ سر دوستان سلامت که تو خنجر آزمائي.

মাওয়াহিবে লাদুনিয়ায় লিখেছেন- রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের বেদনায় তাঁর গাধাটি কুপে পড়ে জান দিয়ে দেয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনীটি খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেয়। অবশেষে ক্ষুধা-পিপাসায় মরে যায়। উস্তুয়ানায়ে হান্নানার ঘটনা প্রসিদ্ধ। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- আমি সেসব পাথর খুব ভাল করে চিনি, যেগুলো আমাকে সালাম করত এবং আমার সাথে কথোপকথন করত। -ইরশাদুল বারী।

গুণ ঃ মহব্বতের দ্বিতীয় কারণ গুণ। অর্থাৎ, বাতিনী সৌন্দর্য। এটিও মহব্বতের একটি বড় কারণ। প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য রয়েছে- کسب کمال کن تا عزیز جهان شوی

হযরত বিলাল রা. ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ হাবশী। কিন্তু গুণের কারণেই গোটা মাখলূকের প্রিয় হতে পেরেছেন এমনকি আমীরুল মুমিনীন সাইয়্যিদেনা উমর ফারুক রা. বলতেন- ابو بکر سیدنا وأعتق سیدنا یعنی بلالاً তথা

আবু বকর আমাদের নেতা। তিনি আমাদের আরেক নেতা অর্থাৎ, বিলাল রা.কে মুক্ত করেছেন। -বুখারী ঃ ১/৫৩১।

ইমাম আজম আবু হানীফা র. এর প্রতি আমরা উৎসর্গিত। বরং সারা বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান তাঁকে মহব্বত করেন এবং তাঁর অনুসরণ করেন, গৌরব ও সৌভাগ্যের বিষয় মনে করেন। অথচ তাঁর সাথে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। স্পষ্ট বিষয়, এ মহব্বতের কারণ শুধু তাঁর গুণ। এমনিভাবে আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও আউলিয়ায়ে কামিলীনের সাথে আমাদের যে মহব্বত এবং এ মহব্বতও অনৈচ্ছিক-এর কারণ তাঁদের গুণ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তায় তো সমস্ত মানবীয় পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী বিদ্যমান ছিল।

حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری ÷ آنچه خوباں همه دارند تو تنها داری.

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলী কে বর্ণনা করতে পারে?

لایمکن الثناء کما کان حقه ÷ بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر.

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- اوتیت علم الاولین والاخرین

স্পষ্ট বিষয়, সবচেয়ে বড় গুণ হল, ইলম। তাছাড়া মাখলূকাতের মধ্যে যত গুণাবলী আছে, সবগুলোর মাধ্যম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি ইরশাদ করেন – انما انا قاسمٌ والله یعطی। অতএব, তিনি যে কামিলদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গতম, তা স্পষ্ট।

হযরত শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ারদী র. স্বীয় গ্রন্থ আওয়ারিফুল মা'আরিফে এক বুযুর্গ থেকে বর্ণনা করেন- আল্লাহ তা'আলা বিবেককে একশ ভাগে বিভক্ত করেন। এর পর নিরানব্বই ভাগ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেন। আর এক ভাগ সমস্ত মাখলূকাতের মধ্যে বণ্টন করে দেন।

সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলীর স্বীকারোক্তি সমস্ত জাতি করেছে। ইসলাম বিরোধীরাও গ্রন্থ রচনা করেছে।

আজ থেকে প্রায় শত বছর পূর্বে প্রসিদ্ধ ইসলামী ওয়ায়েজ মাষ্টার হাসান আলী 'নূরে ইসলাম' নামক একটি পত্রিকা বের করতেন। তাতে তিনি স্বীয় একজন হিন্দু শিক্ষিত বন্ধুর মত লিখেছেন– তিনি একদিন মাষ্টার সাহেবকে বললেন, আমি আপনার পয়গাম্বরকে পৃথিবীর সবচেয়ে কামিল মানব স্বীকার করি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি তাঁর জীবনে একই সময়ে এ পরিমাণ পরস্পর বিরোধী ও বিচিত্র ধরণের গুণাবলী দেখি, যা কোন মানবে ইতিহাস কখনো একত্র করে দেখায়নি। তিনি এরূপ সম্রাট যে, পূর্ণ একটি রাষ্ট্র তাঁর হাতের মুঠোয়। সম্পদশালী এত বড় যে, বিপুল সম্পদের বহু ভাণ্ডার উটের উপর নিয়ে তাঁর রাজধানীর দিকে আসছে। মুখাপেক্ষী এমন যে, মাসের পর মাস তাঁর ঘরে চুলা জ্বলত না। কয়েক দিন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকতে হত। এরূপ সেনাপ্রধান যে, মুষ্টিমেয় লোক নিয়ে হাজারো সশস্ত্র সৈন্যের বিরুদ্ধে সফল লড়াই করেছেন। আর সন্ধিপ্রিয় এতটা যে, হাজার হাজার উত্তেজনাময় প্রাণ উৎসর্গকারী সঙ্গী-সাথী নিয়ে সন্ধিনামায় দস্তখত করে দেন। এরূপ বীর-বাহাদুর যে, হাজার হাজারের মুকাবিলায় একা নিজে দাড়িয়ে যান। আবার এরূপ নরম দিল যে, মানবরক্তের একটি ফোটাও নিজ হাতে প্রবাহিত করেননি। আবার এরূপ সুসম্পর্কশীল যে, আরবের প্রতিটি অনুপরমাণুর ফিকির, স্ত্রী-সন্তানদের ফিকির, দুঃখী-দরিদ্র মুসলমানদের ফিকির, আল্লাহভোলা বিশ্বের সংশোধনের ফিকির তথা, গোটা বিশ্বসংসারের ফিকির তাঁর।

আবার সম্পর্কহীনও এরূপ যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো কথা তাঁর স্মরণ নেই। সমস্ত গাইরুল্লাহ্‌কে তিনি ভুলে আছেন। তিনি কখনো নিজ সত্তার জন্য তাঁর সমালোচকদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেননি।

ব্যক্তিগত শত্রুদের জন্য সর্বদা কল্যাণের দো'আ করেছেন, মঙ্গল কামনা করেছেন। কিন্তু আল্লাহর শত্রুদের তিনি কখনো ক্ষমা করেননি। সত্য পথের প্রতিবন্ধকদেরকে সর্বদা জাহান্নামের সতর্কবাণী দিতেন। আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাতেন। হুবহু সে সময় একজন শবজিন্দাদার দুনিয়াত্যাগী রূপে প্রকাশমান, যখন একজন তলোয়ার দ্বারা আঘাতকারী সৈনিকের ধোঁকা হয়। ঠিক তখন আমাদের সামনে সে পয়গাম্বরসুলভ নিস্পাপতা এসে যায়। যখন তাঁর উপর কিশওয়ারকুশা দেশ বিজয়ীর সন্দেহ হয়, তখন আমরা তাঁকে দেখি একটি খেজুরের খালি চাটাইয়ের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েন, যখন আমরা তাঁকে আরব সম্রাট বলে ডাকতে চাই। ঠিক সেদিনও তাঁর পরিবার পরিজনে ক্ষুধা-দারিদ্রের প্রস্তুতি, যখন আরবের বিভিন্ন দিক থেকে তাঁর মসজিদের আঙ্গিনায় ধনসম্পদ ও আসবাবপত্রের স্তূপ লেগে যায়, ঠিক সে সময় ফাতিমা বিনতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতের ফোসকা এবং সীনার দাগ পিতাকে দেখান, যেগুলো চাক্কি পিষতে পিষতে এবং মশক পূর্ণ করে আনতে আনতে হাত ও সীনায় পড়ে গিয়েছিল এবং তিনি খাদেমার দরখাস্ত করেছিলেন। তখন ইরশাদ করলেন, এখন পর্যন্ত সুফ্‌ফার গরীবদের ব্যবস্থা হয়নি। ফাতিমা! বদরের ইয়াতীমরা তোমার পূর্বে দরখাস্ত করে রেখেছে। (খুতবাতে মাদরাজ ঃ পৃষ্ঠা-৮০)।

আত্মীয়তা ঃ মহব্বতের তৃতীয় কারণ আত্মীয়তা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হিসেবেও সবচেয়ে বেশি ভালবাসা পাওয়ার অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনদের আত্মা অপেক্ষাও অধিক নিকটবর্তী।'

চিন্তা করলে দেখা যাবে, মুমিনের ঈমান একটি মহাজ্যোতির কিরণ, যেটি নবী ভাস্কর থেকে ছড়িয়ে পড়ে। নবুওয়াত সূর্য হলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ফলে মুমিন মুমিন হিসেবে যদি নিজের তাৎপর্য বুঝার জন্য চিন্তা জগতে নাড়াচাড়া আরম্ভ করে, তবে আপন ঈমানী অস্তিত্বের পূর্বে তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচয় লাভ করতে হবে। এ হিসেবে বলতে পারেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাগ্যবান অস্তিত্ব আমাদের অস্তিত্বের চেয়েও অনেক বেশি নিকটবর্তী। আর যদি এই রূহানী সম্পর্কের কারণে তাঁকে মুমিনদের পিতার পর্যায়ভূক্ত বলা হয়, বরং এর চেয়েও অনেক স্তর অগ্রসর বলা হয়, তবে তা সম্পূর্ণ যথার্থ হবে। এ জন্য সুনানে আবু দাউদে আছে- انما انا لكم بمنزلة الوالد الخ এমনিভাবে হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. প্রমূখের কিরাআতে আয়াতে কারীমা النبى اولى بالمؤمنين الخ এর সাথে আছে- وهو اب لهم বাক্য। উভয়টি এ তাৎপর্য স্পষ্ট করে তুলে।

বাপ-সন্তানের সম্পর্ক নিয়ে চিন্তা করলে সারনির্যাস বের হবে যে, পুত্রের দৈহিক অস্তিত্ব এসেছে পিতার দেহ থেকে। আর বাপের তরবিয়ত ও স্বাভাবিক স্নেহ-মমতা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু নবী ও উম্মতের সম্পর্ক এর চেয়েও অগ্রগামী। নিশ্চয় উম্মতের রূহানী ও ঈমানী অস্তিত্ব নবীর মহা রূহানিয়তের একটি ছায়া। আর যে স্নেহ মমতা ও তরবিয়ত নবীর পক্ষ থেকে প্রকাশমান হয়েছে, মা-বাপ কোথায়, সমস্ত মাখলূকে এর নমুনা পাওয়া যায় না। বাপের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পার্থিব ক্ষনস্থায়ী জীবন দান করেছেন। কিন্তু নবীর বদৌলতে চিরন্তন জীবন লাভ করা যায়। নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সে সহানুভূতি ও শুভাকাংখামূলক স্নেহ, মমতা দেন ও তরবিয়ত করেন, যা আমাদের নিজেদের আত্মাও নিজেদের জন্য করতে পারে না। এ জন্য পয়গাম্বরের মধ্যে আমাদের জানমালে হস্তক্ষেপের সে অধিকার এসে যায়, যা কোন মাখলূকের অর্জিত হয় না।

শাহ আবদুল কাদির র. লিখেন– নবী হলেন আল্লাহর নায়েব। নিজের জানমালে নিজের হস্তক্ষেপ চলে না, যতটা চলে নবীর। নিজেকে প্রজ্জলিত আগুনে নিক্ষেপ করা জায়েয নেই। আর যদি নবী হুকুম দেন, তবে জান কুরবান করা ফরয এবং নেহায়েত সৌভাগ্যের বিষয়।

এসব হাকীকতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে হাদীসগুলোতে বলেছেন, তোমাদের কেউ কামিল মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট পিতা-পুত্র এবং সব মানুষ বরং তার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় না হব। -ফাওয়াইদে উসমানী।

ইহসান-অনুগ্রহ ঃ

ভালবাসার চতুর্থ কারণ ইহসান-অনুগ্রহ। প্রসিদ্ধ বাগধারা রয়েছে-الانسان عبد الاحسان। মানুষ অনুগ্রহের দাস। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কি কি অনুগ্রহ গণনা করা যাবে? ইহকাল থেকে পরকাল পর্যন্ত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহসান আমাদের ঈমানদারদের উপর এবং গোটা সৃষ্টির উপর রয়েছে।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তকালে গোটা বিশ্ব সীমাহীন নীচতা-হীনতায় নিমজ্জিত ছিল। মানবতা থেকে সম্পূর্ণ দূর। হত্যা, চুরি-ডাকাতি, সুদখোরী, যেনাকারী, মোটকথা, মানব বিশ্বে হিংস্রতা ও বর্বরতার সয়লাব ছিল। কিন্তু রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত অপরাধ ও গুনাহের মুলোৎপাটন করেছেন। পশুগুলোকে মানুষ বানিয়েছেন। মহামানবতার সবক শিখিয়ে সৃষ্টিজগতের শিক্ষক বানিয়েছেন। এটা কত বড় বিশাল অনুগ্রহ, যার নজির পৃথিবীর ইতিহাস পেশ করতে পারবে না।

২. পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর যে কঠোর বিধিবিধান ছিল, সেগুলো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের উপর থেকে রহিত করে দেয়া হয়েছে। যেমন– মসজিদ ছাড়া নামায হত না, গণিমতের মাল হারাম ছিল, (কাপড়) কর্তন ব্যতীত পবিত্রতা অর্জন হত না, যাকাতে মালের এক চতুর্থাংশ দিতে হত। ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩. পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর যেসব কঠোর শাস্তি ছিল, সেগুলো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত থেকে তুলে নেয়া হয়েছে। যেমন– হত্যা ছাড়া তওবা কবুল হত না। কেউ রাত্রে লুকিয়ে গুনাহ করলে সকালে স্বীয় ঘরের দরজায় তা লিপিবদ্ধ পেত, গোটা জাতি বিকৃত হয়ে যাওয়া, ধ্বসে যাওয়া ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ

'প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উপর থেকে সে সব বোঝা নামিয়ে ফেলেন এবং তাদের উপরে থাকা বাঁধনগুলো খুলে ফেলেন।' -পারা-৯, রুকূ-৯।

বিশ্বজগতের সমস্ত জাতি এ ব্যাপারে একমত যে, মানুষের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত ইনসানিয়্যত ও মানবিক শরাফত-আভিজাত্য থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা অনুগ্রহ ভুলে যেতে পারে না। অনুগ্রহ ভুলে যাওয়াকে কাফির, মুশরিকরাও নেহায়েত নিন্দনীয় মনে করত।

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী (যিনি মক্কার কুরাইশের একজন বড় সম্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তখন তিনি কাফির ছিলেন, পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আলোচনাকালে বলেছেন, হে মুহাম্মদ! আমি দেখছি, আপনার নিকট বিভিন্ন জাতির লোকজন জমা হয়েছে। এরা সাধারণ মুসিবত দেখলে আপনাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে। হযরত আবু বকর রা. একথা শুনলে তাঁর রাগ এসে যায়। তিনি উরওয়াকে ক্রুদ্ধ অবস্থায় গালি দিয়ে বললেন, আমরা কি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছেড়ে পালিয়ে যাব? উরওয়া জিজ্ঞেস করল, এ কে? লোক জন

বলল, ইনি আবু বকর। উত্তরে উরওয়া বলল, আবু বকর! যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ না হত, তবে আমি জবাব দিতাম। অর্থাৎ, শুধু ইহসানের কারণে জবানকে বারণ করলাম এবং শুধু মানুষের উপরই মওকূফ নয়, বরং কোন কোন প্রাণীও ইহসানের কারণে ঝুকতে শুরু করল।

সারকথা হল, এসব কারণের প্রত্যেকটি ভালবাসার কারণ। অতএব, যদি কারো মধ্যে ভালবাসার এ সবগুলো কারণ বিদ্যমান হয়, তবে কি পরিমাণ ভালবাসা হওয়া উচিত? অতএব, এর দ্বারা পরিস্কার বুঝা গেল যে, সুস্থ বিবেকের দাবি ছাড়া স্বাভাবিকভাবেও সবচেয়ে বেশি ভালবাসা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হওয়া উচিত। যেমন– সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈনে ইজাম এর প্রমাণ।

সাহাবায়ে কিরামের মহব্বতের কয়েকটি প্রমাণ ও উদাহরণ ঃ

হযরত খুবাইব রা.-এর গ্রেফতারী ও তাঁর শাহাদতের ঘটনা প্রসিদ্ধ। বুখারী (২/৫২৫) তে বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন- নাসরুল বারী শরহে বুখারী কিতাবুল মাগাযী-১৩৩-১৩৮)। প্রথমতঃ তাকে গ্রেফতার করে বন্দি করা হয়। হারাম মাসগুলো শেষ হওয়ার পর তাঁকে হেরেম থেকে বাইরে বের করে শুলিতে ঝুলানোর সময় সর্বশেষ মনের চাহিদা কি? তা জিজ্ঞেস করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মনের কোন আকাঙ্খা থাকলে বল।

کہا مجہ کو کسي شئ کي نه حاجت هي نه رغبت هي ÷ فقط حب نبي کا ذوق هي شوق عبادت هي.

তিনি বললেন, আমাকে এতটুকু সময় দাও, যাতে দু'রাক'আত নামায পড়তে পারি। কারণ, এখন দুনিয়া থেকে বিদায়ের সময়। আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাত নিকটবর্তী। তাঁকে সুযোগ দেয়া হল, তিনি দু'রাক'আত নামায খুব প্রশান্তির সাথে আদায় করে বললেন– যদি আমি একথা মনে না করতাম যে, তোমরা মনে করবে মৃত্যুর ভয়ে বিলম্ব করছি, তাহলে আরও দু'রাক'আত আদায় করতাম। এরপর তাঁকে শুলিতে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। হুবহু শুলিতে থাকার সময় এক কাফির শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি পছন্দ কর, মুহাম্মদকে তোমার স্থলে হত্যা করে দিই, আর তোমাকে ছেড়ে দিই? হযরত খুবাইব রা. বললেন, আমার নিকট আমার প্রাণের বদলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ে একটি কাটা বিদ্ধ হোক, তাও আমি বরদাশত করব না।

২. অনুরূপভাবে হযরত যায়েদ ইবনে দাসিনা রা. এর শাহাদতের সময় আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করল, যায়েদ! কসম খেয়ে বলছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এখানে তোমার পরিবর্তে হত, আর তুমি নিজ ঘরে থাকতে, তবে তা কি তোমার নিকট প্রিয় হত? হযরত যায়েদ রা. বললেন, আল্লাহর শপথ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে আছেন, সেখানেও তাঁর গায়ে একটি কাটা বিদ্ধ হোক, তাও আমি পছন্দ করি না। এ উত্তর শুনে কুরাইশ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। আবু সুফিয়ান বলল, মুহাম্মদের সাথে তাঁর সঙ্গিদের যতটা ভালবাসা, এর নজির অন্য কোথাও আমি দেখি না।

قال ابو سفيان ما رأيت من الناس احدًا يحبّ احدًا كحب اصحاب محمد محمدًا

৩. হযরত আলী রা. বলেন, হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত সত্তা আমাদের নিকট ধনসম্পদ, সন্তানসন্ততি, মাতা-পিতা এবং পিপাসার মুহূর্তে ঠান্ডা পানি অপেক্ষাও অধিক প্রিয় ছিল।

৪. এক আনসারী মহিলার পিতা, ভাই এবং স্বামী উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে যায়, পালাপালা করে এসব দুর্ঘটনার সংবাদ এ মহিলার নিকট আসতে থাকে। প্রতিটিবার তিনি তাই জিজ্ঞেস করেন যে, সরকারে

দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? লোকজন সংবাদ দিল, তিনি ভাল আছেন। সে মহিলা বললেন- ارونيه –আমাকে তাঁর জ্যোতির্ময় চেহারা দেখান। তিনি কাছে এসে চেহারা মুবারক দেখলেন এবং অনৈচ্ছিকভাবে চিৎকার করে বলে উঠলেন- كل مصيبة بعدك جلل। তথা আপনাকে পাবার পর সমস্ত মুসিবত আমার নিকট তুচ্ছ। আল্লামা শিবলী নো'মানী র. এ ঘটনাটি কাব্যের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, রণক্ষেত্রে পৌঁছার পর লোকজন বলল, –

تیری بھائی نے لڑائی میں شہادت پائی ÷ تیری والد بھی ہوئی کشتہ شمشیر ستم.

سب سی بڑھ کر یہ کہ شوہر بھی ہوا تیرا شہید ÷ گھر کا گھر صاف ہوا ٹوٹ پڑا کوہ الم.

اس عفیفہ نہ یہ سب سن کے کہا تو یہ کہا ÷ یہ تو بھلا بتلاؤ کہ کیسی ہیں شہنشاہ امم.

سبنی دی اس کو بشارت کہ سلامت ہیں حضور ÷ گرچہ زخمی ہیں سر وسینہ وپہلو وشکم.

کہا چل کر دکھا دو مجھکو صورت کملی والے کی ÷ کہ ان تاریک آنکھوں کوضرورت ہی اجالی کی.

بڑھ کے اس نے رخ اقدس کو جو دیکھا تو کہا ÷ آپ سالم ہیں تو پھر ہیچ ہیں سب رنج والم.

میں بھی اور باب بھی شوہر بھی اور بھی فدا ÷ آئی شہ دین تیری ہوتی ہوئی کیا چیز ہیں ہم.

৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদে রব্বিহী রা. একটি বাগানে ছিলেন। কেউ এসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সংবাদ তাঁকে পৌঁছায়। সাথে সাথে তিনি চোখ বন্ধ করে নেন। রাব্বুল আলামীনের দরবারে আরয করলেন, আয় আল্লাহ! যে চক্ষুদ্বয় দ্বারা আমি দু'জাহানের প্রিয় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশ্বসৌন্দর্য দেখেছি, এগুলো দ্বারা অন্য কোন কিছু আর দেখতে চাই না। আমার কাছ থেকে আমার চক্ষু নিয়ে নিন। ফলে তার দৃষ্টিশক্তি খতম হয়ে যায়।

৬. হযরত উয়াইস করনী র.এর ঘটনা প্রসিদ্ধ। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দান্দান মুবারক যখন শহীদ হয়ে গিয়েছিল, তখন তিনি স্বীয় সমস্ত দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। কারণ, সুনির্দিষ্ট দান্দান মুবারক সম্পর্কে তাঁর জানা ছিল না।

এসব ঘটনা দ্বারা পরিস্কার বুঝা যায়, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে যৌক্তিক ও ঈমানী মহব্বত ছিল, তা স্বাভাবিক মহব্বতের চেয়ে অনেকগুণ প্রবল হয়ে মহব্বতে ইশকির স্তর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। পক্ষান্তরে ইশকের অবস্থা ছিল-

عشق آن شعلہ ایست کہ جون بر افروخت ÷ برجہ جز معشوق باشد جملہ سوخت.

١٤. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .

১৪. ইয়া'কূব ইবনে ইবরাহীম ও আদম র.......... আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ তোমাদের কেউ পূর্ণাঙ্গ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল স্পষ্ট।

ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম বুখারী র. এ অনুচ্ছেদে দুইটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। এর কারণ স্পষ্ট। কেননা, এই দ্বিতীয় রেওয়ায়াতটিতে والناس اجمعين শব্দ অতিরিক্ত আছে। এতে অধিক ব্যাপকতা ও সার্বজনীনতা রয়েছে। এমনকি ব্যক্তির স্বীয় সত্তাও অন্তর্ভূক্ত।

এই দ্বিতীয় রেওয়ায়াতে দু'টি সনদ রয়েছে। মধ্যে রয়েছে حاء تحويل। যার বিস্তারিত বিবরণ কিতাবুল ওহীতে এসেছে। ৫নং হাদীসের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

উপকারিতা ঃ ইবনে বাত্তাল আবুয যিনাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, এই হাদীসটি جوامع الكلم এর অন্তর্ভূক্ত। সংক্ষিপ্ত শব্দে মহব্বতের সমস্ত প্রকারকে অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছে। কারণ, মহব্বতের তিনটি প্রকার রয়েছে–

১. মাহাত্মের কারণে মহব্বত। যেমন– মাতা-পিতার প্রতি ভালবাসা।

২. দয়া ও স্নেহ মমতার কারণে ভালবাসা। যেমন– সন্তানের প্রতি মহব্বত।

৩. সমরূপের কারণে ভালবাসা। যেমন– সমস্ত মানুষের পারস্পরিক ভালবাসা।

স্পষ্ট বিষয় যে, মহব্বতের সমস্ত প্রকার এ তিন প্রকারে অন্তর্ভূক্ত। কোন প্রকার এর বাইরে নেই অতএব, এ হাদীসটি যে جوامع الكلم এর অন্তর্ভূক্ত তা স্পষ্ট। বাকি বিস্তারিত আলোচনা প্রথম হাদীসে এসেছে।

يا ربّ صلّ وسلم دائما ابدا ÷ على حبيبك خير الخلق كلّهم

٩. بَابُ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ

৯. পরিচ্ছেদ ঃ ঈমানের স্বাদ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ .

১৫. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না র. .... আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের স্বাদ অনুভব করে ঃ ১। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সব কিছু থেকে প্রিয় হওয়া; ২। কাউকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই মহব্বত করা; ৩ কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মত অপসন্দ করা।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল স্পষ্ট। কারণ, শিরোনাম হাদীসেরই অংশ।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র ঃ

পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, ঈমানে তখন পরিপূর্ণতা আসবে, যখন মাহবুবে রাব্বুল আলামীনের ভালবাসা সমস্ত মাখলূক থেকে বেশি হবে। এ অনুচ্ছেদে পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের ফলের বিবরণ রয়েছে। কারণ, এ অনুচ্ছেদের তিনটি জিনিসের প্রথমটি তাই, যা পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে এসেছে। অর্থাৎ, ان يكون الله ورسوله احبّ اليه مّما سواهما-

আল্লামা আইনী র. বলেন-

هذا الباب مشتمل على ثلاثة اشياء والباب الذى قبله جزء من هذه الثلاثة وهذا اقوى وجوه المناسبة-

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এটি ইমাম বুখারী র. ৭, ৮, ৮৯২, ১০২৬পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম ও তিরমিযীও বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ ثلاثٌ তানভীনটি মুযাফ ইলাইহের পরিবর্তে وجد - اى ثلاث خصال অর্থাৎ, যার মধ্যে তিনটি গুণ পাওয়া যাবে, সে ঈমানের স্বাদ পাবে। ইমাম নববী র. বলেন- هذا حديث عظيم اصل من اصول الاسلام الخ। তথা এটি সুমহান একটি হাদীস। ইসলামের একটি মূলনীতি।

হাদীস শরীফে তিনটি জিনিসের উল্লেখ রয়েছে– প্রথমটি হল, আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত অন্য সব কিছুর মহব্বতের উপর যেন প্রবল থাকে। আল্লাহ তা'আলার মহব্বত তো এ কারণে যে, তিনিই হলেন প্রকৃত নেয়ামতদাতা। তাছাড়া মহব্বতের যে সব কারণ রয়েছে- সৌন্দর্য, গুণ, অনুগ্রহ ও নৈকট্য সবগুলোই আল্লাহ তা'আলার মধ্যে পূর্ণাঙ্গতম রূপে এবং সবচেয়ে বেশি বিদ্যমান। সৌন্দর্য, গুণ এবং অনুগ্রহ যে, আল্লাহ তা'আলা মধ্যে উঁচু পর্যায়ের এবং পূর্ণাঙ্গতম তা তো স্পষ্ট - বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। বাকি রইল নৈকট্য। এর জন্য কুরআনে কারীমের সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ 'আমি তার শাহরগ থেকেও অধিক নিকটবর্তী।' -সূরা ক্বাফ।

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ 'তিনি তোমাদের সাথে আছেন, তোমরা যেখানেই থাক না কেন।' -সূরা হাদীদ।

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ 'এবং আমি তোমাদের চেয়েও তার অধিক নিকটবর্তী।' -সূরা ওয়াকিয়া।

আল্লাহর নিকটতম হওয়ার অর্থ ঃ

আল্লাহর নৈকট্য সম্ভাব্য জিনিসের নৈকট্যের মত নয়। বরং তার শান উপযোগী নৈকট্য উদ্দেশ্য। এটি একটি স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয় যে, আল্লাহ তা'আলার নিকটতম হওয়ার অর্থ কি?

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম সাহেব র. কাছাকাছি বোধগম্য করার জন্য এটাকে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন। যেমন– সূর্যের আলোতে রশ্মি ও উষ্ণতাও আছে। মনে করুন, এই আলো স্বয়ং নিজের হাকীকত জানতে চায় এবং এ বিষয়ে চিন্তাগত গতিশীলতা আনয়ন করে। তাহলে এই চিন্তাগত গতিশীলতায় সর্বপ্রথম পড়বে সূর্য এবং তাকে বুঝতে হবে, সূর্যের পরিপূর্ণ জ্যোতির একটি টুকরা বা অংশ সে। স্পষ্ট বিষয় যে, সূর্যের হাকীকত জানার পর সে নিজের হাকীকত জানতে পারে। আর চিন্তাগত গতিশীলতায় সূর্য এসেছে প্রথমে, আর তার নিজের হাকীকত আসবে পরে।

বুঝা গেল, সূর্য আলোর স্বীয় সত্তা ও হাকীকত থেকেও নিকটতর। কারণ, গতিতে যে জিনিসটি প্রথমে আসে, সেটি নিকটবর্তী। আর যেটি পরে আসবে, সেটিই দূরবর্তী। যেমন– তুমি এক স্থান থেকে গতিশীল হয়ে দূরবর্তী কোন স্থানে যেতে চাও। এই গতিতে যে সব স্থান তোমার সামনে আসবে, সেগুলো সে সব স্থান

অপেক্ষা তোমার অধিক নিকটবর্তী, যে স্থানে তুমি যেতে চাচ্ছ। পার্থক্য হল, এখানে গতি স্বাধিষ্ট বিষয়ের আর ওখানে গতি হল চিন্তাগত। মৌলিকভাবে এতটুকু বুঝে নিন যে, মা'লূল (কৃতবস্তু) যদি নিজের হাকীকত বুঝতে চায় এবং চিন্তাগতভাবে গতিশীল হয়, তবে তার গতিতে প্রথমে আসবে ইল্লত (কারণ)। পরবর্তীতে মা'লূল নিজের সত্তা ও হাকীকত বুঝতে পারবে। অতএব, যদি সম্ভাব্য বস্তুগুলো যেমন- আমরা আমাদের নিজেদের হাকীকত বুঝতে চাই, তাহলে প্রথমে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে হবে। কারণ, আমরা হলাম মা'লূল, আল্লাহ হলেন ইল্লত। আমাদের অস্তিত্ব আল্লাহর অস্তিত্বের একটি ছায়া ও শাখা। আমি প্রথমেই বর্ণনা করেছি, গতিতে যে জিনিস প্রথমে আসে, সেটি নিকটবর্তী, যেটি পরে আসে, সেটি দূরবর্তী অতএব, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সত্তা ও হাকীকত অপেক্ষাও বেশি নিকটবর্তী হল।

এ পন্থাতেই النبيّ اولى (اى اقرب) بالمؤمنين من انفسهم বলা যেতে পারে। কারণ, একজন মুমিন মুমিন হিসেবে যদি নিজের হাকীকত বুঝার জন্য চিন্তাগতভাবে গতিশীল হয়, তাহলে তাকে নিজের ঈমানী অস্তিত্বের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হবে। এ হিসেবে বলতে পারেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্তিত্ব আমাদের চেয়েও আমাদের অস্তিত্বের অধিক নিকটবর্তী

প্রসিদ্ধ একটি প্রশ্ন ঃ

এ হাদীসে রয়েছে– ان يكون الله ورسوله احبّ اليه مما سواهما । এতে سواهما এর مرجع আল্লাহ ও রাসূল। এখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই সর্বনামে উভয়কে একত্রিত করেছেন। অথচ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্তমানে কোন খতীব স্বীয় ওয়াজের শুরুতে ومن يعصهما فقد غوى বললে তিনি বললেন- بئس الخطيب انت –'তুমি নিকৃষ্ট খতীব।' -উমদাহ ঃ ১/১৭৫।

এবার প্রশ্ন হল, যে একত্রিতকরণ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন, এর পরিপন্থী এই রেওয়ায়াতে কোন হিকমতের ভিত্তিতে তিনি একত্রিত করেছেন? পার্থক্যের কারণ কি?

উত্তর ঃ এর বিভিন্ন রকম উত্তর দেয়া হয়েছে–

১. উত্তর হল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে এ হাদীসে একত্রিত করেছেন, এটি হল মহব্বতের ব্যাপার। যেহেতু আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বত লাযিম ও মালযূম তথা ওতপ্রোতভাবে জড়িত মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য উভয়টি জরুরী। আল্লাহর মহব্বত তখনই উপকারী, যখন রাসূলের মহব্বতও থাকবে। এরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত তখনই ধর্তব্য ও উপকারী, যখন আল্লাহর মহব্বতও থাকবে। শুধু এক মহব্বত যথেষ্ট নয়। এ জন্য এখানে একই যমীরে একত্রিত করা সমীচীন ছিল। যাতে এ দিকে ইঙ্গিত হয়ে যায় যে, দুই মহব্বতের সমষ্টি শরীয়তে কাম্য।

বস্তুতঃ খতীব সংক্রান্ত রেওয়ায়াতে বিষয়টি হল অবাধ্যতার। এটি সর্বজন স্বীকৃত বিষয় যে, প্রত্যেকের অবাধ্যতা স্বতন্ত্রভাবে ভয়ংকর ও ধ্বংসের কারণ। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যমীরে (সর্বনামে) একত্রিত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন। কারণ, উভয়টিকে আলাদা আলাদা উল্লেখ করা উচিত। কারণ, এক সর্বনামে একত্রিত করলে সন্দেহ হয়, বোধহয় উভয়ের অবাধ্যতার সমষ্টি ক্ষতিকর হবে। শুধু একজনের অবাধ্যতা ধ্বংসের কারণ হবে না। এ জন্যই বলেছেন- قل ومن يعص الله ورسوله الخ। -উমদাহ।

২. হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী র. ও আল্লামা উসমানী র.-এর তাহকীক হল- بئس الخطيب انت قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى বাক্যে নিষেধাজ্ঞা হারামের জন্য নয়, বরং কথাবার্তায়, আদব শিক্ষা ও তাহযীবের জন্য যেমন- আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ রয়েছে– لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا। (ফয়যুল বারী)

وان يحبّ المرء لايحبّه الا لله এটি হল দ্বিতীয় বাক্য। অর্থাৎ, যার সাথেই মহব্বত রাখবে, শুধু আল্লাহর জন্য রাখবে। উদ্দেশ্য হল, না পার্থিব স্বার্থোদ্ধার উদ্দেশ্য, না ক্ষতি প্রতিহত করণ। যেমন- কোন ব্যক্তি মহব্বতের কারণসমূহের (সৌন্দর্য, গুণ, নৈকট্য ও অনুগ্রহের) কোন একটিতে বাহ্যতঃ গুণান্বিত নয়। কিন্তু মুত্তাকী ও শরীয়তের অনুসারী। একারণে তার সাথে মহব্বত হলে এ মহব্বত খালেস আল্লাহর জন্য হবে।

সারকথা, প্রথম বাক্যে আল্লাহর সাথে মহব্বত ও সম্পর্কের বিবরণ ছিল। দ্বিতীয় বাক্যে মাখলূকের সাথে ভালবাসা ও সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে। যেন এরূপ বলা হয়েছে যে, কামিল মুমিন সে, যে এসব সম্পর্কের হক আদায় করে। আল্লাহর হকের সাথে সাথে বান্দার হক আদায়ের প্রতিও গুরুত্বারোপ করে। যখন মানুষের মধ্যে এ দু'টি গুণ পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাবে, তখন অবশ্যই সে সব জিনিসের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে, যেগুলো আল্লাহ, রাসূল ও নেককারদের নিকট অপ্রিয় ও খারাপ। অতএব, কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়া তার নিকট এতটা অপছন্দনীয় হওয়া উচিত, যতটা অপছন্দনীয় আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া। বরং তার চেয়েও বেশি।

لانّ حبّ الشئ مستلزم لبغض نقيضه 'কারণ, কোন কিছুকে ভালবাসলে তার বিপরীত জিনিসকে অপছন্দ করা আবশ্যক।' এ বিষয়টি তৃতীয় বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে।

وجد حلاوة الايمان ঈমানের মিষ্টতা বা স্বাদ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? অনুভূত, মিষ্টতা উদ্দেশ্য, না বাতিনী,মা'নবী? সাধারণতঃ ব্যাখ্যাতাগণ লিখেন যে, বাতিনী মা'নবী মিষ্টতা উদ্দেশ্য। কারণ, ঈমান কোন অনুভূত জিনিস নয় যে, তার মিষ্টতা উদ্দেশ্য হবে। বরং ইবাদতে অন্তরে মিষ্টির ন্যায় স্বাদ অনুভূত হবে। যেমন- কুতবুল আকতাব হযরত গাঙ্গুহী র. স্বীয় একটি চিঠিতে লিখেছেন। এ চিঠি তিনি স্বীয় শায়খ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী র. এর খেদমতে লিখেছিলেন যে, বান্দা আলহামদুলিল্লাহ তিনটি জিনিস লাভ করেছে। এটা শুধু আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করম। প্রথম জিনিসটি হল বিভিন্ন এলাকার দু'শতের অধিক ছাত্র আমার নিকট থেকে হাদীস শরীফ পড়ে স্ব-স্ব স্থানে দরস দিচ্ছে। দ্বিতীয় বিষয়টি হল, শরঈ বিষয়াবলী স্বভাবজাত জিনিসের মত হয়ে গেছে। অর্থাৎ, শরঈ বিষয়াবলী বর্জনে অতটাই কষ্ট অনুভূত হয় যেমন- ক্ষুধা-পিপাসা ও রৌদ্র দ্বারা স্বভাবতঃ কষ্ট হয়। শরঈ বিষয়াবলীর প্রতি অনুরূপই আকর্ষন হয়, যেরূপ মানুষের ক্ষুধার সময় রুটির প্রতি এবং পিপাসার সময় ঠান্ডা পানির প্রতি স্বভাবতঃ আগ্রহ হয়। তৃতীয় জিনিসটি হল, প্রশংসাকারী ও বদনামকারী উভয়কে সমান মনে হয়।

হযরত গাঙ্গুহী এ চিঠিতে দ্বিতীয় যে বিষয়টি লিখেছেন, সেটি মূলতঃ ইবাদত দ্বারা মজা অনুভব। যেমন- ইমাম নববী র. ও অন্যান্য মুহাদ্দিস বলেন যে, মা'নবী মিষ্টতা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, ইবাদতে মজা অনুভূত হওয়া, আল্লাহ ও সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টির জন্য বড় বড় কষ্ট স্বতঃস্ফর্তভাবে আনন্দের সাথে বরদাশত করা। আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টিকে সারা দুনিয়ার ধনসম্পদ ও ভোগসম্ভারের উপর প্রাধান্য দেয়া। -শরহে মুসলিম ঃ ৪৯।

সুমহান মুহাদ্দিস আরিফ বিল্লাহ শায়খ ইবনে আবি জামরাহ মুনতাখাব বুখারীর যে শরাহ 'বাহজাতুন নুফূস' নামে লিখেছেন, তাতে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, শীর্ষস্থানীয় সুফীগণ অনুভূত মিষ্টতা উদ্দেশ্য করেছেন এবং বলেন- والصواب معهم فى ذالك والله اعلم। অর্থাৎ, শীর্ষস্থানীয় সুফীগণের তাহকীকই এ মাসআলাতে সঠিক। কারণ, তারা হাদীসের শব্দকে তা'বীল ব্যতীত স্বীয় বাহ্যিক অর্থের উপর রেখে দিয়েছেন। সাথে সাথে এটাও বলেছেন যে, هذا الامر لايدركه الا من وصل الى ذلك المقام অর্থাৎ, বিষয়টি এরূপ যা কেবল তারাই অনুভব করতে পারেন, যাঁরা এ মাকাম পর্যন্ত পৌছেছেন। কাজেই যদি তোমাদের অনুভূত না হয়, তবে যাদের অনুভূত হয়, তাদের কথা মেনে নাও। এ দাবি সমীচীন নয় যে, সে মরতবা (অনুভূত মিষ্টতা) উদ্দেশ্য নয়।

اذا لم تر الهلال فسلّم ÷ لاناسٍ راوه بالابصار

'যেহেতু তুমি চাঁদ দেখ না, সেহেতু যারা স্বচক্ষে দেখেছে, তাদের কথা মেনে নাও।'

অতঃপর বলেন, সাহাবায়ে কিরাম যেমন- হযরত বিলাল, আম্মার, খুবাইব রা. এবং সলফে সালিহীনের অবস্থা এর ন্যায়নিষ্ঠ প্রমাণ যে, তারা অনুভূত মিষ্টতা দ্বারা উপকৃত হয়েছেন, তা উপভোগ করেছেন ও এর দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন।

١٠. بَابٌ عَلَامَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ

১০. পরিচ্ছেদ ঃ আনসারকে ভালবাসা ঈমানের নিদর্শন

١٦. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ .

১৬. আবুল ওয়ালীদ র. .... ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ ঈমানের চিহ্ন হল আনসারের প্রতি ভালবাসা আর মুনাফিকীর লক্ষণ হল আনসারের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ

হাদীসের মিল স্পষ্ট। কারণ, শিরোনাম হাদীস শরীফেরই একটি অংশ।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র ঃ

পূর্বের সাথে এই অনুচ্ছেদের যোগসূত্র সংক্রান্ত আলোচনা باب اطعام الطعام من الاسلام এর অধীনে বর্ণিত হয়েছে।

একটি প্রশ্ন ঃ আনসারের মহব্বতকে ঈমানের লক্ষণ এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষকে মুনাফিকীর নিদর্শন বলেছেন। মুহাজিরদের সাথে ভালবাসা বা বিদ্বেষের কথা কেন আলোচনা করলেন না?

উত্তর ঃ মুহাজিরগণ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোত্রের লোক ছিলেন। অতঃপর দেশ ত্যাগ ও হিজরতের কষ্ট এবং ক্ষুধা দারিদ্রের কারণে তাদের ফযীলতে কারো কোন সন্দেহই হতে পারে না। মোটকথা, তাদের ফযীলত যেহেতু সর্বজন স্বীকৃত ছিল এবং তাঁরা ছিলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন খান্দানেরই সদস্য। একারণে তাদের ফযীলত বর্ণনার কোন প্রয়োজন ছিল না। এর পরিপন্থী আনসারীদের যেহেতু এসব ফাযায়েল ছিল না, এ জন্য তাদের ফযীলতের ব্যাপারে কোন সন্দেহ সৃষ্টি এবং তাদের আজমত ও মহব্বত যথাযথ অন্তরে সৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এ জন্য বিশেষভাবে আনসারীদের ভালবাসার কথা বর্ণনা করেছেন।

সারকথা হল, যেহেতু আনসারীদের মহব্বতের প্রতি এতটা তাগিদ রয়েছে, সেহেতু মুহাজিরদের মহব্বত উত্তম রূপেই জরুরী হবে।

প্রশ্ন ঃ সিফ্‌ফীন ইত্যাদি যুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ আনসার ছিলেন হযরত আলী রা.-এর সাথে। কাজেই যে সব সাহাবী তাদের মুকাবিলায় যুদ্ধকাতারে দাড়িয়ে ছিলেন, নাউযুবিল্লাহ তাদেরকে কি মুনাফিক বলা হবে?

উত্তর ঃ ১. বিদ্বেষ ও লড়াইয়ে পার্থক্য আছে। লড়াইয়ের জন্য বিদ্বেষ হওয়া আবশ্যক নয়। তাদের পারস্পরিক যুদ্ধ ঘৃণা-বিদ্বেষের কারণে ছিল না। বরং প্রতিটি দলের উদ্দেশ্য ছিল দীনের হেফাজত। যেমন- দু

ভাইয়ে পারস্পরিক লড়লে তাদের মধ্যে বিদ্বেষ হয় না। বরং লড়াই সত্ত্বেও স্বাভাবিক ভালবাসা অবশিষ্ট থাকে। এর প্রকাশ তখন ঘটে, যখন অন্য কারো সাথে মুকাবিলার সুযোগ হয়।

এ জন্য হযরত আলী ও মুআবিয়া রা. এর পারস্পরিক মতানৈক্য যুগে রোম সম্রাট হযরত মুআবিয়া রা.-এর পক্ষ থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে ইরানের কিছু অঞ্চল কব্জা করতে চান। যেটি হযরত আলী রা.-এর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রোম সম্রাট হযরত মুআবিয়া রা.এর নিকট চিঠি লিখলেন, আমি সংবাদ পেয়েছি, আপনার সাথী অর্থাৎ, হযরত আলী রা. আপনার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করছেন। যদি আপনি বলেন, তবে আমি আপনার নিকট সাহায্যের জন্য সৈন্য পাঠাব।

হযরত মুআবিয়া রা. স্বীয় উত্তরপত্রে খুব ক্রোধের সাথে লিখেন, হে নাসারা কুকুর! তোমার এই কল্পনা হল যে, সুযোগ পেয়ে এখন মদীনার দিকে এবং মুসলমানদের উপর আক্রমণ করবে! এবং ইসলামের গোড়া কেটে মুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্থ করবে! মনে রেখো, যদি তুমি মদীনা অভিমুখে এবং মুসলমানদের দিকে এক কদমও অগ্রসর হও, তাহলে আলী রা. এর পক্ষ থেকে প্রথম সৈনিক হবে মুআবিয়া। খবরদার, মস্তিষ্কে কখনো এরূপ কল্পনা আনবে না। এ ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাদের ইখতিলাফগুলো রায় ও ইজতিহাদগত মতপার্থক্যের কারণে হয়েছিল। দীনিভাবে উদ্দেশ্য এক এবং পরস্পরে একে অপরজনকে ভালবাসতেন।

কুরআন, হাদীস গভীরভাবে অধ্যয়ন ও অনুধাবন করলে এ বিষয়টি ভালভাবে জানা হয়ে যায় যে, হাদীসের বিষয়টি কুরআনে হাকীমের কোন আয়াত থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে অথবা হাদীস কুরআনে হাকীমের কোন আয়াতের ব্যাখ্যা হয়ে থাকে।

মাওলানা সাইয়্যিদ আনওয়ার শাহ সাহেব র. আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, এর উৎস হল, সূরা হাশরের আয়াত-

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ-

'আর তাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এ নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে, তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসত।' -সূরা হাশর ঃ আয়াত নং-৯।

এই ঘর দ্বারা উদ্দেশ্য মদীনা তাইয়্যিবা। আর এসব লোক হলেন মদীনার আনসার। যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাস করতেন এবং ঈমান ও মা'রিফাতের পথে খুব দৃঢ়তার সাথে অটল রয়েছিলেন। মদীনা তাইয়্যিবাকে ঘর বানানো স্পষ্ট। কিন্তু ঈমানকে ঘর বানানোর উদ্দেশ্য হল, মানুষ যেভাবে ঘরে নিরাপদ হয় এবং রক্ষা পায়, এরূপভাবে আনসার ঈমানের বাউন্ডারীতে চলে এসেছে। ঈমান ছিল স্থানের ন্যায়, আর তারা হলেন স্থানাধিকারী বস্তুর ন্যায়। এতে বুঝা গেল, মুমিনের ঘর ঈমান। যার বাউন্ডারীতে থেকে কুফর ও শিরকের হামলা থেকে নিরাপদ থাকে। সাথে সাথে এই দূর্গে থেকে গুনাহ ও ফিসক-ফুজুরের হামলা থেকেও বেঁচে থাকে।

২. এ হুকুমে আনসারের সিফত লক্ষ্যনীয়।

اى اية الايمان حب الانصار من حيث انهم انصار واية النفاق بغض الانصار من حيث انهم انصار-

অর্থাৎ, আনসারের সাথে মহব্বত যেন এ জন্য হয় যে, তাঁরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইসলামের সাহায্য করেছেন। আর মুনাফিকের আলামত হল, তারা আনসার বিদ্বেষী হবে। বিদ্বেষের কারণ হবে, তাঁরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনসার ও মদদগার (এ জন্য)।

স্পষ্ট বিষয়, যে ব্যক্তি এ কারণে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে, তার অন্তরে ঈমানের অণুপরিমাণও অবশিষ্ট থাকতে পারে না। এর নজির ইসলামী আইনবিদগণের উক্তি سبّ العلماء كفر তথা আলিমদের গালি দেয়া কুফরী। এতেও মর্যাদার বিষয়টি লক্ষ্যনীয়। অর্থাৎ, سبّ العلماء মানে উলামায়ে দীন হিসেবে (গালি দেয়া)। স্পষ্ট বিষয়, যে ব্যক্তি আলিমদের এ জন্য গালি দেয় যে, তাঁরা দীনের ধারক-বাহক, সে দীনের দুশমন, তার কুফরীতে কোন সন্দেহ নেই।

মদীনার আনসারীগণের অবস্থা ঃ

মদীনার আনসারীগণের মূল বাড়ি মদীনা ছিল না। বরং তারা ইয়ামান রাষ্ট্রের একটি খোশহাল শহর মাআরিবে বসবাস করতেন। যেখানে কওমে সাবা আবাদ ছিল। তাদেরকে বলা হত আউস ও খাজরায। যখন কওমে সাবার উপর প্লাবনের আযাব আসে, তখন এক ভবিষ্যদ্বক্তা তাদের জানিয়ে দেয় যে, এখানে শীঘ্রই এক আযাব আসন্ন। যারা বাঁচতে চায়, তারা যেন এখান থেকে চলে যায়। ফলে কওমে সাবার লোকজন ও বনু কায়লার দুই গোত্র আউস ও খাজরায বেরিয়ে যায়। আউস ও খাজরায মদীনায় এসে বসবাস করে। তখন মদীনায় ছিল ইয়াহুদীদের প্রভাব। যখন আউস গোত্র মদীনায় পৌছে, তখন ইয়াহুদীরা এ শর্তে মদীনায় অবস্থানের অনুমতি দেয় যে, যখনই তোমাদের এখানে কারো বিয়ে হবে, তখন প্রথম রাত নববধুকে আমাদের এখানে পাঠাতে হবে। তারা বাধ্য হয়ে এ শর্ত গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু ঘটনা এই হল যে, যখন বিয়ে হল, তখন এক বিবাহিতা নববধু চেহারা উন্মুক্ত করে সমাবেশের সামনে এসে যায়, সমাবেশে তাদের সব আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত ছিল। তারা তাকে এই হিজাববিহীন আগমনের ফলে লজ্জা দেয়। নববধু বলল, তোমাদের ডুবে মরা উচিত। কারণ, তোমরা আমাকে স্বামী ছাড়া অন্যের কাছে পাঠাতে রাজি হয়েছ।

কথাটি তাদের গায়ে তীরের ন্যায় বিদ্ধ হল। আত্মমর্যাদাবোধ চাঙ্গা হয়ে উঠল। উত্তেজনা সৃষ্টি হল। তারা প্রস্তুত হল, এই জিল্লতি কখনো বরদাশত করবে না। যুদ্ধের সুযোগ এলে তারা মুকাবিলা করবে। ফলে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইয়াহুদীদের উপর বিজয়ী করে দেন। এর পর মদীনার ইয়াহুদীরা আউস খাজরাযকে বলত, আমরা শেষ জমানার নবীর অপেক্ষা করছি। তাঁর আবির্ভাবের পর তোমাদের এসব আচরণের উত্তর দেব। আউস খাজরায প্রতিমাপূঁজক পৌত্তলিক ছিল। তারা কিছু জানত না। ইয়াহুদীদের এই ভর্ৎসনায় আউস খাজরাযও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল।

হজ্জের মৌসূম এল। তখন খাজরাযের ছয় ব্যক্তি মক্কায় এসে মিনায় অবস্থান করলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে তাশরীফ এনে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি রাত্রে তাশরীফ আনুন। ততক্ষন পর্যন্ত আমরা নিজেরা কিছু পরামর্শ করে নেব। মশওয়ারায় সিদ্ধান্ত হল, তিনি তো সেই আখিরী যমানার নবী, যার আলোচনা ইয়াহুদীরা করত। এমন যেন না হয় যে, এই সৌভাগ্য ও ফযীলত অর্জনে ইয়াহুদীরাই আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যায়।

অতঃপর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে তাশরীফ আনেন, তখন তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন। এর পর যখন দ্বিতীয় বছর আসে, যেটি ছিল নবুওয়তের ১২তম বৎসর। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে ১২জন ব্যক্তি উপস্থিত হন এবং সে ঘাটিতেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হস্ত মুবারকে বাইআত হন। যেটি ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম বাইআত। যাকে বলে বাইআতে আকাবায়ে উলা।

এরপর নববী ১৩ সনে ৭৫ ব্যক্তি নবীজীর দরবারে উপস্থিত হন এবং সে ঘাটিতেই বাইআত হন। এ হল বাইআতে আকাবায়ে ছানিয়া। এই দ্বিতীয় বাইআতে আকাবা যেটি মূলতঃ লাইলাতুল আকাবাতিছ

ছালিছা (তৃতীয় আকাবা রজনী), সেখানে আনসারীগণের দরখাস্তে মক্কা থেকে মদীনা তাইয়্যিবায় হিজরতের সিদ্ধান্ত হয়।

আলিমদের ইখতিলাফ ঃ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ঃ

আলিমগণের ইখতিলাফ নিঃশেষ হয়ে যাওয়া অসম্ভব। যে তা কামনা করে, সেও অনেক বড় আহমক। কারণ, আলিমগণের ঐকমত্য তখন হওয়া সম্ভব, যখন কুরআন ও হাদীসে প্রতিটি ব্যক্তি সম্পর্কে প্রতিটি কাজের, প্রতিটি ধরণের হুকুম সুস্পষ্ট ভাষায় বিবৃত হয়। আর এটা অসম্ভব। কারণ, পৃথিবীতে মানুষ অগণিত। যদিও অসীম নয়। অতঃপর প্রতিটি ব্যক্তির কাজ কর্ম অগণিত। প্রতিটি কাজের ধরণ ও বিধিবিধান অগণিত। অতএব, যদি এত বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ণ করা হয়, যাতে প্রতিটি খুটিনাটি ও শাখাগত বিষয় উল্লেখিত হয়, তবে এটি এত বিশাল হত, যা সংরক্ষণ করা সম্ভব হত না। তা বর্ণনা করাও মানুষের ক্ষমতাধীন থাকত না এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ার কোন ছুরতও সম্ভব হত না। অগনিত মানুষের মধ্যে নিজের নাম তালাশ করাই মুশকিল হয়ে যেত। নিজের অগনিত কাজের অগনিত আহকাম থেকে কোন বিধান তালাশ করা অসম্ভব হত। অতএব, এরূপ গ্রন্থ অবতীর্ণ করাও একটি দোষনীয় ব্যাপার, যা থেকে মানুষ উপকৃত হতে পারবে না এবং তা সংরক্ষনও করতে অক্ষম। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলার মধ্যে দোষ-ক্রটি থাকা অসম্ভব। অতএব, ইখতিলাফ মিটমাট হওয়াও অসম্ভব। পক্ষান্তরে অসম্ভব জিনিস কামনাকারীও হবে আহমক।

অতএব, জরুরী হল কুরআন হাদীসে শাখাগত ও বিচ্ছিন্ন বিষয়াবলীর পরিবর্তে মৌলিক জিনিস উল্লেখিত হওয়া। যেগুলো থেকে শাখাগত প্রতিটি বিষয়ের বিধান উৎসারণ করা যায় পক্ষান্তরে মৌলিক বিষয় থেকে উৎসারণে মানুষের বিবেক বুদ্ধি ও বুঝের দখল থাকে। মানুষের বিবেক বিচিত্র ধরণের। যার ফলে কোন বিষয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। কোন কোন সময় শাখাগত বিষয় একটি হয়। মৌলিক বিষয়াবলীও দ্বিপাক্ষিকভাবে স্বীকৃত হয়, কিন্তু এ বিষয়ে মতানৈক্য হয় যে, এ শাখাটি কোন মৌলিক বিষয়ের অধীনে?

এর উদাহরণ মনে করুন, বিচারকের নিকট কোন মুকাদ্দমায় বাদী-বিবাদীর উকিলগণ মতপার্থক্য করেন। অথচ শাখাগত বিষয়ও একটি। যার উপর উভয় দল আলোচনা করছেন এবং যে সব মূলনীতির আলোকে নিজের মত প্রমাণ করতে চাচ্ছেন, সে মূলনীতিগুলোও একই সরকারের এবং পক্ষ বিপক্ষের নিকট স্বীকৃত হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও উভয় উকিলের মাঝে মতপার্থক্য হয়। বাদীর উকিল বলেন, অমুক মূলনীতির আলোকে এ শাখাগত বিষয়ে বিবাদীর শাস্তি হওয়া উচিত। বিবাদীর উকিল প্রমাণ করেন, এ শাখাগত বিষয়টি বাদীর উকিল কর্তৃক বর্ণিত এই মূলনীতির আওতায় আসে না। বরং এর সাথে অধিক মিল অন্য আরেকটি মূলনীতির সাথে। যে দিকে লক্ষ্য করলে বিবাদী মুক্ত হয়ে যায়।

মোটকথা, উভয়ের আলোচনা এ বিষয়ে হয় যে, এ শাখাগত বিষয়টি কোন মূলনীতির শাখা এবং কোন মূলনীতিটি এর সাথে খাপ খায়? আমরা দিনরাত দেখছি, উকিলদের আলোচনা এভাবে অব্যহত থাকে। উভয় পক্ষের উকিল সরকারের পক্ষ থেকে অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। তাদের মতানৈক্যের উপর না উভয় পক্ষের প্রশ্ন হয়, না অন্যরা এটাকে খারাপ মনে করে। না বিচারক তাদের মতানৈক্যের উপর অসন্তুষ্ট হন, না সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে মতবিরোধ থেকে বারণ করা হয়। বরং তাদেরকে ভাল করে আলোচনার ও প্রমাণাদি বর্ণনার সুযোগ দেয়া হয়। যে উকিল বেশি আলোচনা ও বিতর্ক করতে পারেন, তিনি পুরস্কার পান।

এর পর বিচারক উভয় পক্ষ থেকে যার প্রমাণাদি প্রধান মনে করেন, তার পক্ষে সিদ্ধান্ত দেন। কিন্তু দ্বিতীয় উকিলের না অনুমোদন ছিনিয়ে নেয়া হয়, না তাকে শাস্তি দেয়া হয়, না তাকে মন্দ মনে করা হয়।

বরং ভবিষ্যত মুকাদ্দামাগুলোতে তাকে রীতিমত বিতর্কের অনুমতি দেয়া হয়। হুবহু অনুরূপ উদাহরণ উলামায়ে কিরামের। নির্দিষ্ট শাখাগত বিষয়টিতে কোন মূলনীতি খাপ খায়? এতে মতপার্থক্য হয়।

পৃথিবীতে উকিলদের মতানৈক্য ছাড়া আরো কয়েক প্রকার মতানৈক্য আমরা দেখি ও শুনি। যেমন– রাজনৈতিক মতপার্থক্য এ পর্যন্ত পৌঁছে যে, সংসদে কোন কোন সময় চেয়ার মারামারি পর্যন্ত হয়। এরূপভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানেও বিরাট মতপার্থক্য হয়। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, ইউনানী, আয়ূর্বেদী ইত্যাদির তো মূলনীতিই আলাদা আলাদা। এলোপ্যাথিতে বিপরীত জিনিস দ্বারা চিকিৎসা হয়। হোমিওপ্যাথিতে সমপর্যায়ের জিনিস দ্বারা। প্রতিটি চিকিৎসা পদ্ধতিতে রোগ নির্ণয়, এর উপকরণ ও ঔষধ নির্ণয়, পরস্পর বিরোধী বড়ি এবং বড়ির সংখ্যা, চিকিৎসার ব্যবহার পদ্ধতি, খাবার এবং বাছ নির্ণয়ে মতপার্থক্য হয়ে থাকে। চাই একই পদ্ধতি, দুই বিশেষজ্ঞ তথা দু'জন ডাক্তার অথবা দু'জন হেকীম দেখুন, তাদের মধ্যেও পরস্পর মতপার্থক্য হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই মতপার্থক্যকে কেউ খারাপ বলে না। মতপার্থক্য যারা করে, তাদের উপর প্রশ্নোত্থাপন করে না। তাদের মতপার্থক্য দেখে কেউ চিকিৎসা বর্জন করে না। বরং যে হেকীম বা ডাক্তারের উপর আস্থা হয়, তার দ্বারা চিকিৎসা করানো হয়।

উলামায়ে কিরামের মতপার্থক্য এর চেয়ে আরো ন্যূনতম পর্যায়ের। কারণ, তাদের মূলনীতি এক। তা সত্ত্বেও তাদের মতপার্থক্যকে খারাপ বলা হয়। উলামায়ে কিরামকে ভর্ৎসনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়। সাথে সাথে বলা হয় যে, আমরা বুঝতে পারি না, কোন আলিমের কথা মানব। বস্তুতঃ এটা হল দীন এবং ইলমের তরফ থেকে অমনোযোগিতার ফসল।

দৈহিক চিকিৎসার গুরুত্ব রয়েছে। এ জন্য ডাক্তারদের মতপার্থক্য চিকিৎসার জন প্রতিবন্ধক হয় না। এর পরিপন্থী বাতিনী রোগের চিকিৎসার প্রয়োজন মনে করা হয় না। অন্তরে দীনের গুরুত্ব নেই। এ জন্য উলামায়ে কিরামের মতপার্থক্যকে উসীলা বানানো হয়।

এপর্যন্ত এ বিষয়ের বিবরণ ছিল যে, মতপার্থক্য হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তা মিটা অসম্ভব। পরে আরেকটু বুঝতে হবে যে, মতপার্থক্য তিন প্রকারের হয়ে থাকে-

১. উভয় পক্ষের লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি। প্রতিটি ব্যক্তি মনে করে সে যা বলছে, তাতে দীনের উপকার হয়। প্রতিপক্ষের যে মত, তাতে দীনের ক্ষতি হয়। এমতাবস্থায় উভয় পক্ষের জন্য এ মতপার্থক্য করা ফরয হয়ে যায়। এতে উভয় পক্ষ সওয়াব পায়। আর যদি মতপার্থক্য ছেড়ে দেয়, তাহলে গুনাহগার হবে।

২. এ পক্ষের উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি। অপর পক্ষ শুধু কুপ্রবৃত্তির অনুসরণের খাতিরে মতবিরোধ করছে। যেমন– এক ব্যক্তি আরেকজনকে নামাযের তালকীন করছে, মন্দ কাজ থেকে বারণ করছে, বিরত না হলে তার সাথে মতপার্থক্য করছে। আরেকজন শুধু এজন্য তার বিরোধী যে, সে তাকে মন্দ কাজ থেকে বারণ করছে কেন?

এখানে প্রথম ব্যক্তির জন্য এই ইখতিলাফ ওয়াজিব, দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য হারাম।

৩. উভয়ে খাহেশাতে নফসানীর ভিত্তিতে মতপার্থক্য করছে। এই ইখতিলাফ উভয় পক্ষের জন্য হারাম তা বর্জন করা ওয়াজিব। সাহাবায়ে কিরামের ইখলিতাফ ছিল প্রথম প্রকারের।

মতপার্থক্যের বৈধতার শর্তশরায়েতঃ

১. ইখতিলাফ প্রশংসিত হওয়ার প্রথম শর্ত হল, এর উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি।

২. দ্বিতীয় শর্ত হল, ইখতিলাফকারীর মতবাদ স্বতঃসিদ্ধতার পরিপন্থি যেন না হয়। যেমন– কেউ উটকে ছাগল বলতে আরম্ভ করছে এবং বলছে যে, আমার গবেষণা ও তাহকীক এটাই। আমি আমার

দিয়ানত ও আন্তরিকতার সাথে এটাই মনে করি। তা সত্ত্বেও এ মতবিরোধকে প্রশংসিত বলা যায় না, এটা বরং নিন্দনীয়।

ما انا عليه واصحابى এর পরিপন্থি উক্তি করাও এরই অন্তর্ভূক্ত। কারণ, যেরূপভাবে কুরআন তার অর্থে সুন্নতের মুখাপেক্ষী, ঠিক অনুরূপ কিতাব ও সুন্নত উভয়টি স্বীয় অর্থে সাহাবায়ে কিরামের মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ, কিতাব ও সুন্নাতের অর্থ তাই নেয়া হবে, যা সাহাবায়ে কিরাম বুঝেছেন। সাহাবায়ে কিরাম থেকে সরে কিতাব ও সুন্নাতের অর্থ বুঝা পথভ্রষ্টতা। এর সংক্ষিপ্ত প্রমাণাদি নিম্নরূপ-

১. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এতে صراط مستقيم এর ব্যাখ্যা صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ দ্বারা করা হয়েছে। الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এর ব্যাখ্যা صراط الله অথবা صراط الرسول অথবা صراط القرآن দ্বারা করা হয়নি। কারণ, মানুষ এর অর্থে মতবিরোধ করে। প্রতিটি ব্যক্তি স্বীয় নির্ণয়কৃত অর্থকে কুরআনের পথ সাব্যস্ত করে। ফলে صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ দ্বারা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, সিরাতে মুস্তাকীম দ্বারা উদ্দেশ্য নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাদের পথ। যা একটি দল।

২. وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلّى وَنُصْلِه جَهَنَّمَ الآية. سورة النساء.

এতেও سبيل الله এর স্থলে سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ বলা হয়েছে।

৩. قُلْ هذِه سَبِيْلِىْ اَدْعُوْ اِلَى اللهِ عَلى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ. سورة يوسف.

এতে আল্লাহ তা'আলা سبيل এর পর اَنَا এর উপর مَنِ اتَّبَعَنِىْ এর আতফ করে এ বিষয়টির বিশদ বিবরণ দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ সেটি, যার দিকে তাঁর অনুসারী তথা সাহাবায়ে কিরাম দাওয়াত দিচ্ছেন।

৪. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী - عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين এতে سنتى এর পর سنة الخلفاء الراشدين এর উল্লেখ সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটি হবে, যেটি খুলাফা অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ, এই আতফ হল তাফসীরী। এছাড়া অন্য কোন অর্থ হতে পারে না।

৫. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাও বলেছেন যে, মুক্তিপ্রাপ্ত দল হল সেটি, যেটি ما انا عليه واصحابى অনুযায়ী হবে। যদি সুন্নাত স্বীয় অর্থে সাহাবায়ে কিরামের মুখাপেক্ষী না হত, তাহলে শুধু ما انا عليه বলাই যথেষ্ট ছিল। اصحابى এর শব্দ বলা অনর্থক হয়ে যেত।

৬. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-- اصحابى كلهم كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم।

৭. এ বিষয়টি যৌক্তিকভাবেও স্পষ্ট যে, কুরআন ও হাদীসের অর্থ তাই নির্ধারিত হবে, যা সাহাবায়ে কিরাম বুঝেছেন। কারণ, বক্তার উদ্দেশ্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে কয়েকটি জিনিসের দখল থাকে। যেমন- স্ব-

ভাষাভাষী হওয়া, বক্তার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া, বক্তার জাহিরী ও বাতিনী নৈকট্য থাকা। আলোচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া। অর্থাৎ, এ কথাটি কোন মহলে, কোন মওকায় এবং কখন বলা হয়েছিল?, বক্তার কথার স্বর শ্রবণ, তার হাত ও চেহারার নির্দশনাবলী দর্শন। বিশেষতঃ আল্লাহ ও রাসূলের কালাম বুঝার ক্ষেত্রে পবিত্রতা, তাকওয়া, বাতিনী তাহারাত ও অন্তর জ্যোতি নেহায়েত জরুরী।

এ সব বিষয় সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে পূর্ণাঙ্গতম অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। এ জন্য যখন কোন সাহাবী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হুকুমের অতিরিক্ত তাকিদ বর্ণনা করতে চান, তখন রেওয়ায়াতকালে বলেন– ابصرته عيناى وسمعته اذناى ووعاه قلبى

তাদের ইখতিলাফ আহলে হকের সাথে মৌলিক, যারা কুরআন হাদীসকে সাহাবায়ে কিরামের তাফসীরের মুখাপেক্ষী মনে করেন না, যেমন– পারভেজ কুরআনকে হাদীসের মুখাপেক্ষী মনে করেন না। কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুযায়ী ফিট করার জন্য আমি এ সাহাবী জামা'আতকে রিজালুল্লাহ দ্বারা ব্যক্ত করি। আর এ শব্দটি গৃহীত হয়েছে رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله থেকে।

৩. ইখতিলাফের বৈধতার তৃতীয় শর্ত হল- ইখতিলাফের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অতঃপর ধারাবাহিকভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি খেয়াল করা। যেমন– كما مرّ من صنيع معاوية رض। হযরত মুআবিয়া রা. এর আচরণে তা আগেই এসেছে। মোটকথা, গুরুত্বপূর্ণ ইখতিলাফ থাকলে ন্যূনতম ইখতিলাফী বিষয়গুলো ছেড়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাওয়া জরুরী।

١١. بَابٌ

১১. পরিচ্ছেদ ঃ

١٧. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ .

আবুল ইয়ামান র. .... 'হযরত আয়িযুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ র. বলেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী লাইলাতুল 'আকাবার একজন নকীব 'উবাদা ইবনুস সামিত রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পার্শ্বে একজন সাহাবীর উপস্থিতিতে তিনি ইরশাদ করেন ঃ তোমরা আমার নিকট এই মর্মে বাই'আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কাউকে জাল মিথ্যা অপবাদ দেবে না এবং নেক কাজে নাফরমানী করবে না তোমাদের মধ্যে যে তা পূরণ করবে, তার বিনিময় আল্লাহর কাছে। আর কেউ এসব গোনাহের কোন

একটিতে লিপ্ত হয়ে দুনিয়াতে তার শাস্তি পেয়ে গেলে, তা হবে তার জন্য কাফফারা। আর কেউ শিরক ছাড়া এর কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়লে এবং আল্লাহ তা অপ্রকাশিত রাখলে, তবে তা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি যদি চান, আখিরাতেও তাকে মাফ করে দেবেন, আর যদি চান, তাকে শাস্তি দেবেন। হযরত উবাদা রা. বলেন, আমরা এর উপর বাই'আত হলাম।

হাদীসটির পুনরাবৃত্তি ঃ

ইমাম বুখারী র. এ হাদীসটি দশ জায়গায় উল্লেখ করেছেন- ১. পৃষ্ঠা ৭। ২. পৃষ্ঠা ৫৫০-৫৫১ দু'টি রেওয়ায়াত। ৩.পৃষ্ঠ ৫৭০। ৪. পৃষ্ঠা ৭২৭ । ৫. পৃষ্ঠা ১০০৩। ৬. পৃষ্ঠা ১০০৪। ৭. পৃষ্ঠা ১০১৫। ৮.পৃষ্ঠা ১০৬৯। ৯. পৃষ্ঠা ১০৭১। ১০. পৃষ্ঠা ১১১২।

ইমাম মুসলিম ও তিরমিযী র.ও এটি বর্ণনা করেছেন।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র ঃ

পূর্বোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে- علامة الايمان حبّ الانصار। এ অনুচ্ছেদটি হল শিরোনামহীন প্রমাণ। কারণ, আনসারের মহব্বত ঈমাণের লক্ষণ একারণে যে, তাঁরা নেহায়েত নাজুক অবস্থায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসলামের দাওয়াতের উপর নিজের জানমাল দ্বারা সাহায্য করতে বাইআত হয়েছিলেন। একারণে তাঁদের উপাধি দেয়া হয়েছে আনসার।

উবাদা ইবনে সামিত রা. ঃ

عبادةআইনের উপর পেশ। ইবনে সামিত ইবনে কায়েস খাযরাজী আনসারী রা.। আকাবায়ে উলা, ছানিয়া এবং বদরযুদ্ধ ইত্যাদিতে তিনি ছিলেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সমারোহী। وهو اول من ولى القضاء بفلسطين وكان طويلا جسيما جميلا فاضلا توفى سنة اربع وثلاثين অর্থাৎ, তাঁকে সর্বপ্রথম ফিলিস্তিনে বিচারক নিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি ছিলেন দীর্ঘাঙ্গী, স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন ও গুনীজন। তাঁর ওফাত ৩৪ হিজরীতে ৭২বছর বয়সে (ফিলিস্তিনে) হয়েছে।

উপকারিতা ঃ উবাদা নামের বারজন সাহাবী রয়েছেন। কিন্তু উবাদা ইবনে সামিত শুধু এই একজন সাহাবীই।

بابٌ اى هذا بابٌ بالتنوين

সহীহ বুখারীর অধিকাংশ কপিতে باب তো আছে, কিন্তু শিরোনাম নেই। কোন কোন কপিতে باب ও নেই। এমতাবস্থায় শিরোনাম তালাশ করার প্রয়োজনই নেই। কারণ, এ হাদীসটিও পূর্ববর্তী বাবের সাথে সংযুক্ত হবে। এবার প্রশ্ন হয়, ইমাম বুখারী র. এখানে শিরোনাম কায়েম করেননি কেন? অথচ উদ্দেশ্য তরজমা দ্বারাই বুঝা যায়। ব্যাখ্যাতাগণ থেকে শিরোনাম উহ্য করার কয়েকটি কারণ বর্ণিত আছে, কিন্তু অধম শুধু সহীহ এবং গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো এখানে বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয়েছে।

১. كالفصل من الباب السابق যেমন- আল্লামা কাসতাল্লানী র. বলেছেন- وعلى رواية ثباته (اى الباب) كالفصل عن سابقه مع تعلقه به- । -ইরশাদুস সারী।

অর্থাৎ, পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদ علامة الايمان حب الانصار এর فصل এর স্থলাভিষিক্ত। যেটাকে ذيلى باب বা অধীনস্থ অনুচ্ছেদ বলে। কারণ, এক হিসেবে পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের মিল হয়, আরেক হিসেবে ভিন্নতা। এ জন্য উভয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। ভিন্নতার দিকে লক্ষ্য করে باب রেখেছেন। আর মিলের কারণে শিরোনামের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। কারণ, এ স্থানে পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে আনসারের ভালবাসার উল্লেখ

ছিল। এবার এই শিরোনামহীন অনুচ্ছেদে আনসারের কিছু অবস্থার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ মিল এ জন্য নেই যে, এতে আনসারের ভালবাসার কথা উল্লেখ নেই। বরং আনসার নামকরণের কারণ ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ প্রকাশ করা হয়েছে।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে وهو احد النقباء ليلة العقبة দ্বারা আনসার নামকরণের কারণ জানা গেছে যার বিস্তারিত বিবরণ হল মক্কা মুকাররমা থেকে মিনায় যাবার সময় রাস্তার বাম দিকে মিনার নিকটবর্তী এই আকাবা। যেখানে মদীনা মুনাওয়ারার মুষ্ঠিমেয় লোক রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হস্ত মুবারকে বাইআত হয়েছেন। এটাকে বলে বাইআতে আকাবায়ে উলা। এর পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত বিবরণ 'আনসারের ইতিহাস' শিরোনামে আসছে।

অতঃপর দ্বিতীয় বছর তারা আরও কিছু সাথী নিয়ে এ স্থানে উপস্থিত হয়ে বাইআত হন। এটাকে বলে বাইআতে আকাবায়ে ছানিয়া। এবারে লোক ছিলেন প্রায় ৭৫জন। তারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দরখাস্ত করলেন, আপনি মদীনায় তাশরীফ আনুন। আমরা জানমাল দিয়ে আপনার সর্বপ্রকার সাহায্য করব। যেহেতু আনসার অর্থ হল সাহায্যকারী, সেহেতু তাদেরকে আনসার উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

২. হযরত শায়খুল হিন্দ র. বলেন- ব্যাখ্যাতাগণের উপরোক্ত কারণ যথার্থ। তবে এই ব্যাখ্যা অর্থাৎ كالفصل من الباب السابق কোন কোন স্থানে চলে না। এ কারণে সর্বোত্তম ও স্পষ্ট ব্যাখ্যা হল ইমাম বুখারী র. মেধা তীক্ষ্ণ করার উদ্দেশ্যে শিরোনাম উল্লেখ করেননি। شحذ از باب فتح শব্দটির অর্থ হল তেজ করা অর্থাৎ, ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দান যে, এতগুলো স্থানে আমরা অনুচ্ছেদে শিরোনাম লিখেছি। যার ফলে আমাদের পথপদ্ধতি তোমরা জানতে পেরেছ। এবার তোমরা আমাদের উল্লেখিত শিরোনামগুলোর আলোকে ব্রেণে চাপ সৃষ্টি করে হাদীস শরীফের আলোকে কোন সংগত শিরোনাম নির্ণয় কর। আর এই ব্যাখ্যা ইমাম বুখারী র.-এর শান উপযোগীও বটে। কারণ, সামনে কিতাবুল ইলমের পঞ্চম অনুচ্ছেদে শিরোনাম কায়েম করবেন- باب طرح الامام المسئلة الخ। যার অর্থ হল শিক্ষকের উচিত কখনো কখনো ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ অব্যাহত রাখা। যাতে ছাত্র গাফিলতি প্রদর্শন না করে। তাছাড়া উস্তাদও ছাত্রদের যোগ্যতা সম্পর্কে বুঝতে পারবেন। অতঃপর যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষা দিতে পারবেন। অতএব, এখানে পবিত্র হাদীস শরীফে চিন্তা করে নিম্নোক্ত শিরোনাম কায়েম করা যায়-

باب اجتناب الكبائر من الايمان ، يا باب اجتناب المعاصى من الايمان ، يا من الايمان ترك البهتان ، وغيره

৩. কখনো শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ উহ্য প্রশ্নের উত্তর হয়ে থাকে। অর্থাৎ, ইমাম র. পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদগুলোতে বলেছেন- ঈমান মুরাক্কাব-যুক্ত। আমলসমূহ ঈমানের অন্তর্ভূক্ত। এর দ্বারা মুরজিয়ার মত খন্ডন হয়েছিল। কিন্তু এর দ্বারা আশংকা সৃষ্টি হয়েছিল যে, কেউ আবার মুরজিয়ার বিরুদ্ধে খারিজী ও মু'তাযিলার সমর্থন মনে করে কি না? এজন্য এ অনুচ্ছেদে ইমাম সাহেব র. শিরোনামহীন অনুচ্ছেদ দ্বারা দুধারী তলোয়ার ব্যবহার করেছেন। যার ফলে মুরজিয়ার মত খন্ডনও হয়, আবার খারিজী ও মু'তাযিলার মূলোৎপাটনও হয়। ان شاء عاقبه দ্বারা মুরজিয়ার মত খন্ডন হয়। কারণ, যদি গুনাহ ক্ষতিকর না হত, তাহলে শাস্তির কি অর্থ? পক্ষান্তরে ان شاء عفا عنه দ্বারা মু'তাযিলা ও খারিজীদের মত খন্ডন হয়। কারণ, এর দ্বারা পরিস্কার স্পষ্ট যে, কবীরা গুনাহকারী ব্যক্তির ঈমান অবশিষ্ট আছে। তবে এ ব্যক্তি অপরাধী। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে অপরাধীর শাস্তি দিবেন। আর ইচ্ছা করলে শাস্তি ছাড়া মাফ করে দিবেন। এটা তখনি সম্ভব, যখন অপরাধীর ঈমান স্বীকার করা হয়। অন্যথায় অমুমিনের ক্ষমার প্রশ্নই আসে না।

اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

তাছাড়া فهو كفارة له দ্বারাও খারিজী ও মু'তাযিলার মত খন্ডন হয়। কারণ, তাদের মতে এখানে কবীরা গুনাহকারী মুমিন নয় এবং অমুমিনের জন্য কোন শাস্তি গুনাহের কাফ্ফারা হতে পারে না।

وكان شهد بدرًا শব্দটির অর্থ উপস্থিত হয়েছে। হযরত উবাদা রা. বদরযুদ্ধে উপস্থিত ও শরীক ছিলেন। যেহেতু বদরে অংশগ্রহণকারীদের বিরাট মর্তবা রয়েছে, সেহেতু হযরত আবু ইদরীস রা. ফযীলত রূপে উল্লেখ করছেন যে, হযরত উবাদা রা. বদরী সাহাবী। বদর যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন- নাসরুল বারী কিতাবুল মাগাযী।

وهو احد النقباء - نقباء**শব্দটি** نقيب এর বহুবচন। যার অর্থ হল কওমের নেতা, চৌধুরী, অফিসার। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১২জন নকীব (অফিসার) নিযুক্ত করেছিলেন। বস্তুতঃ ১২ সংখ্যা কুরআনে হাকীম থেকে গৃহীত। وَبَعَثْنَا عَلَيْهِمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا –সূরা মায়িদা।

عصابة আল্লামা আইনী ও কাসতাল্লানী র. লিখেছেন- عصابة শব্দ দশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত সংখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়। বর্ণনাকারীর উদ্দেশ্য সে বাইআত মজলিসে দশের অধিক এবং চল্লিশের কম সাহাবী ছিলেন।

এর দ্বারা এতটুকু বিষয় অবশ্যই জানা গেল যে, এ হাদীসে যে বাইআতের উল্লেখ রয়েছে, সেটি ছিল কোন ছোট দলের। হুদাইবিয়া ও মক্কা বিজয়কালে মুসলমানদের যে বিশাল বাহিনী ছিল, তখনকার বাইআতের মওকায় এরূপ ছিল না।

দন্ডবিধিগুলো কাফ্ফারা কি না?

এ হাদীসে ইখতিলাফ রয়েছে যে, দন্ডবিধিগুলো কাফ্ফারা না সতর্ককারী? কার্যতঃ আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, দন্ডবিধিগুলো গুনাহের কাফ্ফারা। ইমাম শাফিঈ র.এর মাযহাবও তাই। ইমাম বুখারী র. এর মতও এটাই।

কারো কারো মতে দন্ডবিধিগুলোও কাফ্ফারা নয়। শুধু সাবধানকারী। অর্থাৎ, কোন অপরাধে দন্ডবিধি প্রয়োগ হলে গুনাহ মাফ হয় না। বরং তওবা জরুরী। كذا فى عقيدة السفارينى

আইম্মায়ে হানাফিয়া (ইমাম আজম, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র.) থেকে এ সম্পর্কে কোন রেওয়ায়াত নেই। মাশায়েখে হানাফিয়ার উক্তিগুলো বিভিন্ন ধরণের। দূররে মুখতারে আছে- শরঈ দন্ডবিধিগুলো সতর্ককারী, কাফ্ফারা নয়। মুলতাকাত গ্রন্থকার হানাফী হওয়া সত্ত্বেও দন্ডবিধি কাফ্ফারা হওয়ার প্রবক্তা। শায়খ নাজমুদ্দীন নাসাফী স্বীয় তাফসীর তাইসীরে فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ আয়াতের অধীনে মুহরিমের উপর শিকারের বদলা সম্পর্কে বলেন, যারা বারবার তা করে না, তাদের জন্য কাফ্ফারা, আর যারা বারবার করে, তাদের জন্য কাফ্ফারা নয়। তাইসীর গ্রন্থকারের এই উক্তি হানাফীদের বিভিন্ন উক্তিতে সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা হতে পারে। كذا فى جنايات الحج من الشامية ।

শাফিঈদের প্রমাণাদি ঃ

শাফিঈগণ আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। হানাফীদের পক্ষ থেকে উত্তর। হানাফীগণ এর বিপরীত হযরত আবু হোরায়রা রা.এর হাদীস পেশ করেন। এ হাদীসটি মুস্তাদরাকে হাকিম র. বর্ণনা করেছেন। এটি বুখারী, মুসলিমের শর্তে উন্নীত সহীহ।

لا ادرى الحدود كفارات لاهلها ام لا؟। আবু হোরায়রা রা. এর এ হাদীসটি আলোচ্য অনুচ্ছেদের এ হাদীস থেকে নিশ্চয় পরবর্তী। কারণ, হযরত আবু হোরায়রা রা. সপ্তম হিজরীতে ঈমান এনেছেন। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে হিজরতের পূর্বে আকাবা রজনীর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারা বুঝা গেল, আলোচ্য

অনুচ্ছেদের হাদীসে فعوقب فى الدنيا দ্বারা দন্ডবিধি উদ্দেশ্য নয়। বরং সাধারণ বিপদাপদ উদ্দেশ্য। যদি দন্ডবিধি উদ্দেশ্য হয়, তবে এর পর لا ادرى الحدود كفارات لاهلها ام لا؟ এর কি অর্থ?

তাছাড়া এ ঘটনাটি হিজরতের পূর্বেকার। আর দন্ডবিধি ফরয হয়েছে মদীনা মুনাওয়ারায়।

তাছাড়া আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে যে সব গুনাহের উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো থেকে চুরি ও যিনা ছাড়া অন্য কোন গুনাহের দন্ডবিধি নেই। এর দ্বারাও প্রমাণিত হল, عوقب فى الدنيا দ্বারা দন্ডবিধি উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রাকৃতিক বিপদাপদ উদ্দেশ্য।

হাফিজ আসকালানী র. প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস হযরত আবু হোরায়রা রা.এর হাদীসের পরবর্তী। তিনি বলেন, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে وهو احد النقباء ليلة العقبة দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত উবাদা ইবনে সামিত রা. এর মরতবা বর্ণনা করা। এ উদ্দেশ্য নয় যে, এ হাদীসের বিষয় আকাবা রজনীর সাথে সংশ্লিষ্ট।

হাফিজ আসকালানী র. এর উপর কয়েকটি নিদর্শন পেশ করেছেন–

১. মুসতাদরাকের হাদীসে عدم علم (জ্ঞান না থাকা) এর উল্লেখ রয়েছে। আর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে কাফ্ফারা হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। জ্ঞান না থাকা জ্ঞান হওয়ার পূর্বে হয়ে থাকে।

২. আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসের বিষয় সূরা মুমতাহানার আয়াত يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ الخ থেকে গৃহীত। যা সর্বসম্মতিক্রমে হুদাইবিয়ার সন্ধির পর অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব, বুঝা গেল, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে আকাবা রজনীর বাইআতের উল্লেখ নেই।

৩. হাফিজ র. কয়েকটি রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন, মক্কা বিজয়ের পরও রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইআত নিয়েছেন। অতএব, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে এ বাইআতেরই উল্লেখ রয়েছে।

◆ আল্লামা কাসতাল্লানী র. এ বিষয়টি জোরদারভাবে খন্ডন করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন এ ঘটনা আকাবা রজনীরই। বরং নাসাঈর একটি সুস্পষ্ট রেওয়ায়াত তিনি উল্লেখ করেছেন, যাতে সুস্পষ্ট ভাষায় এখানে আকাবা রজনীর বাইআতের উল্লেখ রয়েছে।

একটি প্রশ্ন ঃ عوقب এর বিপরীত দ্বিতীয় বাক্যে ثمّ ستره الله শব্দ আছে। এর দ্বারা বুঝা গেল, عوقب فى الدنيا দ্বারা এরূপ শাস্তি উদ্দেশ্য, যাতে ستر নেই। আর এটা দন্ডবিধিতেই হয়। প্রাকৃতিক বিপদাপদে এটা প্রকাশ হয় না যে, এ ব্যক্তি কোন অপরাধ করেছে। এটাতো নেককার-বদকার সবার উপরে আসে।

উত্তর ঃ কোন কোন সময় প্রাকৃতিক বিপদও এভাবে আসে যে, সবাই বুঝতে পারে, এটা অমুক গুনাহ ও অপরাধের শাস্তি। অতএব, عوقب فى الدنيا দ্বারা এ ধরণের মুসিবত উদ্দেশ্য এবং এ প্রকারের বিপরীতে ثمّ ستره الله দ্বারা উদ্দেশ্য হল গুনাহের পর এরূপ কোন কষ্ট বা মুসিবত আসে না, যার পর মানুষ জানতে পারে না যে, এটি অমুক গুনাহের শাস্তি।

এ পর্যন্ত ইমাম শাফিঈ র. এর প্রমাণ হাদীসের উত্তরগুলো এসেছে। পরবর্তীতে উভয় হাদীসের সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা বর্ণনা করা হবে।

সামঞ্জস্য বিধান পদ্ধতি ঃ

বাস্তবতা হল, দন্ডবিধিতে দুইটি দিক থাকে- ১. من حيث انها مصيبة من جملة المصائب -এ হিসেবে যে এটি একটি মুসিবত। ২. শরঈ শাস্তি হওয়ার দিক। প্রথম হিসেবে এটা গুনাহের কাফ্ফারা আমরাও স্বীকার

করি। যেহেতু কাঁটা বিদ্ধ হলে, পিপড়ায় দংশন করলে গুনাহ মাফ হয়, সেহেতু বেত্রাঘাত, হাতকর্তন ও প্রস্ত রাঘাতের ফলে গুনাহ মাফ হবে না কেন?

মোটকথা, আমরা বলি, মুসিবত হিসেবে গুনাহের কাফ্ফারা। কিন্তু এটা নির্দিষ্ট করি না যে, যে গুনাহের কারণে দন্ডবিধি প্রয়োগ করা হয়েছে, সুনির্দিষ্ট সে গুনাহই মাফ হয়েছে। সাধারণ ক্ষমার কথা আমরা বলি। যেরূপভাবে প্রাকৃতিক বিপদাপদ দ্বারা অনির্দিষ্টভাবে সাধারণ গুনাহ মাফ হয়।

এর পরিপন্থী শাফিঈগণ সে গুনাহের জন্য কাফ্ফারা সাব্যস্ত করেন, যার উপর এ দন্ডবিধি প্রয়োগ করা হয়েছে।

সুনানে তিরমিযী باب لايزنى الزانى وهو مؤمن তে হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত আছে-

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من اصاب حدا فجعل عقوبته فى الدنيا فالله اعدل من ان يثنى على عبده العقوبة فى الاخرة ' ومن اصاب حدا فستره الله عليه وعفا عنه فالله اكرم من ان يعود فى شئ قد عفا عنه.

এ হাদীস দ্বারা নির্দিষ্ট গুনাহ মাফ হওয়ার আশা বুঝা যায়, প্রতিশ্রুত গুনাহ মাফের নয়। কারণ, এতে সে গুনাহের কথাও উল্লেখিত হয়েছে, যার ফলে দন্ডবিধি আরোপিত হয়নি। অতএব, দন্ডবিধি সুনির্দিষ্ট গুনাহের কাফ্ফারা প্রমাণিত হয়নি।

সারকথা, আমরা বলি, দন্ডবিধিগুলোকে সত্তাগতভাবে সতর্ককারী এবং সাময়িক গুনাহ ঢেকে রাখে। শাফিঈগণ এর পরিপন্থী সত্তাগতভাবে গুনাহ ঢেকে রাখে বলে উল্লেখ করেন এবং যৌগিকভাবে সতর্ককারী হয় বলে উল্লেখ করেন।

হানাফীদের প্রমাণাদি ঃ

১. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِه وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ اِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

এই আয়াতে فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا এর উপর চুরির হুকুম শেষ হয়ে গেছে। পরবর্তীতে বলেছেন- جَزَاءً بِمَا كَسَبَا অর্থাৎ, এ হাত কর্তন তার কাজের শাস্তি। এর পর نَكَالًا مِّنَ اللهِ দ্বারা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হল দন্ডবিধিগুলোর বিধিবদ্ধতা কি কারণে হয়েছে? نكال এরূপ শাস্তিকে বলা হয়, যা অপরাধী ছাড়া অন্যান্য দর্শকশ্রোতাকেও অপরাধ থেকে বিরত রাখে। এর আভিধানিক অর্থ হল বারণ করা। এ জন্য হাতকড়াকেও نكال বলা হয়। হতে পারে, হিন্দি শব্দ نكيل (উটের নাকের রশি)ও এ থেকে গৃহীত।

মোটকথা, نَكَالًا مِّنَ اللهِ যুক্ত করে বুঝিয়েছেন যে, দন্ডবিধিগুলো দ্বারা সতর্ক করা উদ্দেশ্য।

পরবর্তীতে বলেন- وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ। অর্থাৎ, কোন কাজ হিকমতশূন্য নয়। বর্তমান যুগের আইনের মত নয় যে, যে ব্যক্তি একবার জেল থেকে আসবে, সে পূণরায় জেলে যেতে আকাঙ্খী থাকবে। নতুন অন্ধকারের যুগের লোকজন প্রশ্ন করে যে, চোরের হাত কর্তন হিংস্রতা। অন্ধ বিবেক সম্পন্ন লোকেরা এটা চিন্তা করে না যে, চুরি করা কোন অভিজাত কাজ? যদি একটি হিংস্র কাজের বদৌলতে লাখ লাখ হিংস্র আচরণের পথ রুদ্ধ হয়, তবে এটাই তো হিকমত। وَلَكُمْ فِىْ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا اُولِى الْاَلْبَابِ আয়াতে এ হিকমতের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। মুলহিদ কবি আবুল আলা মুআররা হস্ত কর্তনের বিধানের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।

يدٌ بخمس مئين عسجد وديت ÷ مابالها قطعت فى ربع دينار

'যে হাতের দিয়ত দেয়া হয় পাঁচশ দিনার, সেটি এক চতুর্থাংশ দিনারের বদলে কি কারণে কর্তন করা হয়?'

تحكّم مالنا الاّ السكوت له ÷ وان نعوذ به ولا نامن النار

এটি একটি বিচারকসুলভ সিদ্ধান্ত। আমাদের জন্য নীরবতা ছাড়া অন্য কোন গত্যান্তর নেই। আমরা জাহান্নাম থেকে স্বীয় মনিবের পানাহ চাই। যখন ফুকাহায়ে কিরাম তাকে তলব করেন, তখন সে পালিয়ে যায়।

অনেকেই এর উত্তর দিয়েছেন। আলামুদ্দীন সাখাবী র. বলেছেন–

عزّ الامانة اعلاها وارخصها ÷ ذل الخيانة فافهم حكمة البارى

'আমানতের ইজ্জত ও শরাফত হাতের মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে। এবার খেয়ানতের যিল্লত তার মূল্য কমিয়ে দিয়েছে। বুঝ তুমি সৃষ্টিকর্তার হিকমত।'

ইমাম শাফিঈ র. বলেছেন-

هناك مظلومة غالت بقيمتها ÷ وههنا ظلمت هانت على البارى

'যখন সে মজলূম ছিল, তখন তার মূল্য স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বেশি ছিল। আর যখন খেয়ানত করে সে জুলুম করেছে, ফলে আল্লাহর নিকট অপমানিত হয়ে গেছে।'

আল্লামা শামসুদ্দীন কুর্দী র. থেকে বর্ণিত আছে–

فقيمة اليد نصف الالف من ذهب ÷ فان تعدت فلا تسوى بدينار

'হাতের মূল্য পাঁচশ দিনার। কিন্তু যখন এ হাতই সীমালংঘন করে, তখন এর মূল্য এক দিনার সমানও থাকে না।'

আবদুল ওয়াহহাব মালিকী র. বলেছেন- لما كانت امينة كانت ثمينة لما خانت هانت। অর্থাৎ, এ হাত যখন আমানতদার ছিল, তখন ছিল মূল্যবান। কিন্তু যখন খেয়ানত করেছে, তখন হয়েছে অপদস্ত, অপমান।

পরবর্তীতে ইরশাদ রয়েছে-

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ

যদি হস্ত কর্তন কাফ্ফারা হয়, তবে তওবার কি প্রয়োজন থাকল? এ আয়াতে ধারাবাহিকভাবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালাও বর্ণিত আছে।

ইমাম তাহাবী র. একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তির হস্ত কর্তনের পর তিনি বলেছেন- تب الى الله عز وجل فقال تبت الى الله فقال تاب الله عليك। এর দ্বারা প্রমাণিত হল, তওবা ছাড়া শুধু দন্ডবিধি আরোপিত হলে গুনাহ মাফ হয় না।

২. اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِىْ الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ–

আবু বকর জাসসাস র. এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, ডাকাতদের শাস্তি উল্লেখের পর ذَالِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَفِىْ الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ রয়েছে যে, পার্থিব শাস্তির ফলে আখিরাতের শাস্তি মাফ হয় না।

যদিও এ আয়াতের এ উত্তর দেয়া হয়েছে যে, এতে মুরতাদদের হুকুম রয়েছে। কিন্তু সহীহ হল, এ আয়াতে যে শাস্তির বিবরণ দেয়া হয়েছে, এটি ডাকাতদেরই শাস্তি, মুরতাদদের শাস্তি নয়। কারণ, মুরতাদ হওয়ার শাস্তি হল হত্যা। বাকি রইল يحاربون الله ورسوله শব্দ। এর কারণ হল, সহীহ রেওয়ায়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত যে, এর শানে নুযূল উরানীদের সাথে সংশ্লিষ্ট। মুরতাদ হওয়া, ডাকাতি ও হত্যা সবগুলোই একত্রিত হয়েছে। এই আয়াতে হুকুম তো ডাকাতদেরই বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু আয়াতে এরূপ শব্দও এসেছে, যেগুলো মূল ঘটনার দিকে ইঙ্গিতবাহী।

মোটকথা, আয়াতে কারীমার শব্দরাজি ব্যাপক। যদিও শানে নুযূল খাস। والعبرة لعموم الالفاظ لا لخصوص المورد

৩. যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে দন্ডবিধি বাতিল হয় না, অথচ গুনাহ মাফ হয়ে যায়- التائب من الذنب كمن لاذنب له অতএব, দন্ডবিধি আরোপিত হওয়ার পরও তা বাতিল না হওয়ার কথা। এতে বুঝা গেল, দন্ডবিধিবদ্ধতা গুনাহ ক্ষমার জন্য নয়। অন্যথায় তওবার পর দন্ডবিধি আরোপ করার কোন অর্থ হবে না।

١٢. بَابٌ مِنَ الدِّيْنِ الْفِرَارُ مِنَ الْفِتَنِ

১২. পরিচ্ছেদ ঃ ফিতনা থেকে পলায়ন দীনের অন্তর্ভূক্ত

بابٌ তানভীন সহকারে। অর্থাৎ, هذا باب ولايجوز فيه الاضافة । এতে ইযাফত জায়েয নেই। - উমদাহ।

من الدين الفرار من الفتن আল্লামা আইনী র. বলেন, এখানে ইবারত উহ্য আছে। মূল ইবারত হল الفرار من الفتن شعبة من شعب الدين-

প্রশ্ন ঃ ইমাম বুখারী র. এখানে দীন শব্দ ব্যবহার করেছেন। ইতোপূর্বে এবং পরবর্তী কোন কোন অনুচ্ছেদে ঈমান, আবার কোন কোনটিতে ইসলাম শব্দ এনেছেন। পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদগুলোর ন্যায় من الايمان الفرار من الفتن কেন বললেন না?

উত্তর ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন,

انّما قال ذلك ليطابق الترجمة الحديث الذى يذكره فى الباب.

অর্থাৎ, এ অনুচ্ছেদে যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, তার সাথে যেন শিরোনামের মিল হয়ে যায়, এ জন্য এরূপ বলেছেন। তাছাড়া এদিকেও ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, বাস্তবে ঈমান, ইসলাম ও দীন একই।

١٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ.

১৮. আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা র. ....হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ শীঘ্রই এমন দিন আসবে, যেদিন মুসলিমের উত্তম সম্পদ হবে কয়েকটি বকরী, যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় অথবা বৃষ্টিস্থলে চলে যাবে। ফিতনা থেকে সে তার দীন নিয়ে পালিয়ে যাবে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ

ইমাম বুখারী এ হাদীসটি এখানে কিতাবুল ঈমানে ৭পৃষ্ঠায়, বাদউল খালকে ৪৬৬পৃষ্ঠায়, কিতাবুল মানাকিবে ৫০৮পৃষ্ঠায়, রিকাকে ৯৬১পৃষ্ঠায় এবং ফিতানে ১০৫০পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ

শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট يفر بدينه من الفتن বাক্যে।

শব্দ বিশ্লেষণ ঃ

يوشك ইয়া এর উপর পেশ। শীন এর নিচে যের। অর্থাৎ, নিকটবর্তী হবে। এটি আফ‘আলে মুকারাবার অন্তর্ভূক্ত। মাযীতে اوشك বলা হয়। এ থেকেই اوشك ان يّموت এসেছে। কেউ কেউ এর মাযীর ব্যবহার অস্বীকার করেছেন। কিন্তু এটা ভুল। অবশ্য মাযীর তুলনায় মুযারে এর ব্যবহার অধিক।

ان يكون خير مال المسلم এতে خير শব্দের মধ্যে যবর। غنم বকরীসমূহ, বকরীর পাল। ইসমে মুয়ান্নাছ জিনসের জন্য প্রণীত হয়েছে। স্ত্রীলিঙ্গ পুরুষলিঙ্গ উভয়টির জন্য ব্যবহৃত। তাসগীরের সময় এর শেষে তা বাড়িয়ে غُنيمة বলা হয়।

شَعَف দুই যবরসহ شعفة এর বহুবচন। পাহাড়ের শৃঙ্গ। مَوَاقع যবরসহ। شعف এর উপর আতফ। موقع এর বহুবচন। قَطْر - قطرة এর বহুবচন। মানে বৃষ্টি। مواقع القطر বৃষ্টিবর্ষণক্ষেত্র। অর্থাৎ, উপত্যকা ও ময়দান জঙ্গল ইত্যাদি। يفر بدينه من الفتن এতে বা কারণ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। من الفتن শব্দে من ابتدائيه। অর্থাৎ, পালানোর উদ্দেশ্য ও কারণ দীনই হবে, পার্থিব কোন স্বার্থ নয়। দীনের হিফাজতের জন্য দেশ ত্যাগ করবে।

তাছাড়া ‘বা’ সঙ্গ অর্থ দেয়ার জন্যও হতে পারে। অর্থাৎ, নিজের দীনকে সাথে নিয়ে পালিয়ে যায়। যেমন হযরত মূসা আ.এর ঘটনায় فرّ بثوبه এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, সে পাথর কাপড় নিয়ে দৌড় দিয়েছে।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র ঃ

আগে আনসারের মরতবার বিবরণ ছিল যে, তারা কুফর ও গোমরাহীর ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য মিনার ঘাটিগুলোতে উপস্থিত হয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হস্ত মুবারকে বাইআত হন। দীনের খাতিরে সবকিছু উৎসর্গ করেন। এ অনুচ্ছেদেও আছে যে, যখন দীনের ব্যাপারে আশংকা সৃষ্টি হয়, তখন ঘর-বাড়ি সব ছেড়ে সবাইকে উৎসর্গিত করে নির্জনতা অবলম্বন করা উচিত।

২. দীনে দু‘ধরনের জিনিস থাকে– ১. ইতিবাচক ও ২. নেতিবাচক তথা করনীয় ও বর্জনীয়। কোন কোন কাজ করতে হয়, আবার কোনটি বর্জন করতে হয়। এ পর্যন্ত যে সব বিষয়ের বিবরণ হয়েছে, এগুলো করণীয় ও অর্জনীয়। এবার এখানে এরূপ কিছু বিষয় বর্ণনা করছেন, যেগুলো বর্জনীয়। যেগুলো থেকে বেঁচে থাকা উচিত। দীনের হেফাজতের জন্য দেশ ছাড়াও দীনই। এ জন্য এবার তার বিবরণ দিচ্ছেন। -ইমদাদুল বারী।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যতবাণী রূপে ইরশাদ করেছেন যে, শীঘ্রই এরূপ একটি যুগ আসবে। কুফর ও গুনাহের এতটা প্রবলতা হবে যে, দীনদারদের জন্য শহর ও জনপদে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। বাধ্য হয়ে স্বীয় দীনের হেফাজতের খাতিরে শহর থেকে পালিয়ে পাহাড়ের শৃঙ্গে তাদের আবাস বানাবে।

জনসমক্ষে থাকা ভাল, না নির্জনে ?

কোন কোন আলিমের মত হল, নির্জনতা উত্তম। কারণ, যখন ফিতনা-ফাসাদের যৌবনকাল হবে, তখন সমাজ থেকে বেঁচে থাকা মুশকিল। এরূপ সময় নিজেকে নির্জনে রেখেই আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক কায়েম করে আবাদ করতে পারে।

আরেক দল বলে, জনসমক্ষে থাকা তথা সামাজিক জীবন উত্তম। কারণ, নির্জনে অনেক কাজ সম্ভব হয় না। যেমন– জুমআর নামায, জামাআত সহকারে নামায, জানাযায় অংশগ্রহণ, ভালকাজের নির্দেশ, মন্দকাজ থেকে বারণ, এগুলো সব সামাজিক জীবনেই সম্ভব। নির্জনে এসব কিছু থেকে মাহরুম থেকে যাবে।

৩. সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাক্কিকীনের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, মৌলিকভাবে কোন ফয়সালা করা সংগত নয়। বরং পরিস্থিতিও ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করে একটির উপর অপরটির শ্রেষ্ঠত্ব হবে। উপরোক্ত হাদীস দ্বারা এটাই বুঝা যায়। কারণ, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের যুগ ছিল সামাজিকতার। চিন্তা করলে বুঝা যাবে, নবীগণের প্রেরণের উদ্দেশ্যই হল মানবজাতির সংশোধন। অতএব, যে সব লোকের সাথে অধিকারওয়ালাদের অধিকার সংশ্লিষ্ট হয় অথবা জনসাধারণের সংশোধন তাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়, যেমন- উলামায়ে ইসলাম, তাদের জন্য নির্জনতা অবলম্বন জায়েয নেই। অবশ্য যখন ফিতনা এত প্রচুর ও শক্তিশালী হয়ে যায় যে, নিজের দীন বাঁচানো মুশকিল হয়ে যায়, তখন উলামা ও সংশোধনকারীদের জন্যও নির্জনতা অবলম্বন করা জায়েয আছে।

এ হাদীসের যে বিষয় হুবহু এর উৎস কুরআনে কারীমে আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা, যা তাতে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। তারাও নিজেদের দীন ঈমান নিয়ে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গিয়েছেন। তাদের উক্তি কুরআন বর্ণনা করেছে-

وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوُاْ اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ–

'তোমরা যখন তাদের এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্য থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তখন গর্তে আশ্রয়গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালক রহমত ছড়িয়ে দিবেন।' -সূরা কাহ্ফ।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. ঃ

আবু সাঈদ উপনাম। নাম হল সা'দ ইবনে মালিক। প্রপিতাদের মধ্য থেকে উবাইদ নামক এক ব্যক্তি ছিলেন, যার পিতার নাম ছিল আবজার। তাকে খুদরাও বলা হত। (এ কারণেই তাঁকে খুদরী বলা হয়।) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. কে উহুদে কম বয়স্ক হওয়ার কারণে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়নি। এর পরবর্তী ১২টি যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। তার পিতা মালিক ইবনে সিনান রা. উহুদ যুদ্ধে শাহাদতের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ছিলেন আলিম, গুণী ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তার সূত্রে ১১৭০টি হাদীস বর্ণিত আছে। ৬৪হিজরীতে মতান্তরে ৭৪ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় ওফাত লাভ করে জান্নাতুল বাকীতে চিরনিদ্রায় শায়িত হন।

١٣. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِاللهِ وَاَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالِي وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ .

১৩. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাণী,

'আমি তোমাদের তুলনায় আল্লাহ্ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী। আর মারিফাত (ইয়াকীন) অন্তরের কাজ।' যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ

'কিন্তু তিনি তোমাদের (জেনে বুঝে) অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন।' (২ ঃ ২২৫)

١٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنْ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ. قَالُوا إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا .

১৯. মুহাম্মদ ইবনে সাল্লাম র. .... 'হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের যখন কোন (আমলের) নির্দেশ দিতেন, তখন তাঁরা যতটুকুর সামর্থ্য রাখতেন, ততটুকুরই নির্দেশ দিতেন। একবার তাঁরা আরয করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তো আপনার মত নই। আল্লাহ্ তা'আলা আপনার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল ত্রুটি মা'ফ করে দিয়েছেন।' (আমাদের জন্য কঠোর আমলের নির্দেশ হওয়া উচিত।) একথা শুনে তিনি রাগ করলেন, এমনকি তাঁর চেহারা মুবারকে রাগের নিদর্শন প্রকাশ পাচ্ছিল। এরপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের চাইতে আল্লাহকে আমিই বেশী ভয়কারী ও (তার সম্পর্কে) অধিক অবগত।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ

শিরোনামের সাথে মিল হাদীসে সর্বশেষ বাক্য انا اعلمكم بالله তে।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র ঃ

পূর্বের অনুচ্ছেদে ফিতনা থেকে পলায়নের বিবরণ ছিল। স্পষ্ট বিষয়, মানুষের দীন ও ঈমান যত শক্তিশালী হবে এবং আল্লাহর মা'রিফাত যত শক্তিশালী হবে, তাকওয়া এবং আল্লাহভীতিও তার মধ্যে বেশি হবে, ফিতনা থেকে সে এত বেশি দূরে থাকবে। দেশ ত্যাগ এবং আয়েশ-আরামের ভোগসম্ভার দীনের মহব্বতে কুরবান করে দেয়া তার জন্য সহজ হবে। এ জন্য ইমাম বুখারী র. ইলম ও মা'রিফাতের বিবরণ দিয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ এই শিরোনামের উপর একটি প্রশ্ন আছে। সেটি হল, ইমাম বুখারী এখানে শিরোনাম কায়েম করেছেন انا اعلمكم بالله। এটি বাহ্যতঃ কিতাবুল ইলমের সাথে সমীচীন। অথচ এখানে কিতাবুল ঈমানের সাথে সম্পর্কের কারণে পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদগুলোর ন্যায় من الايمان অথবা من الاسلام অথবা من الدين শিরোনাম হওয়া উচিত ছিল। كتاب الايمان পূর্বের সাথে انا اعلمكم بالله অনুচ্ছেদের কি মিল?

উত্তর ঃ ১. আল্লাহ সংক্রান্ত জ্ঞান মানে আল্লাহর প্রতি ঈমান। ইরশাদে নববী انا اعلمكم بالله তে اعلم ইসমে তাফযীল রয়েছে। যদ্বারা বুঝা গেল, আল্লাহ সংক্রান্ত জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর হয়। অতএব, আল্লাহর প্রতি ঈমানের বিভিন্ন মরতবা হবে। এক স্থানে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলম বাড়ানোর কামনা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে قُلْ رَّبِّ زِدْنِیْ عِلْمًا। –সূরা ত্বহা।

ইলমের বিভিন্নস্তর আছে- وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ।

২. اعلمكم بالله অর্থাৎ, আল্লাহর মা'রিফাত তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমার। ফলে কোন কোন কপিতে অর্থাৎ, ইসরাঈলীর রেওয়ায়াতে اعلمكم بالله এর স্থলে اعرفكم بالله আছে। এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল, এখানে ইলম মা'রিফাতের অর্থে ব্যবহৃত। যদিও প্রসিদ্ধ উক্তি এটাই যে, ইলম ও মা'রিফাতের মধ্যে পার্থক্য আছে। মৌলিক বিষয়াবলী জানার নাম ইলম। শাখাগত বিষয়াবলী জানার নাম মা'রিফাত। অথবা মুরাক্কাব তথা যুক্ত জিনিসগুলো জানার নাম ইলম। আর বসীত তথা একক জিনিসগুলো জানার নাম মা'রিফাত। অথবা ইলম দুই মাফউলে মুতাআদ্দী হয়। যেমন– বলা হয়- علمت زيدًا كريما। পক্ষান্তরে মা'রিফাত একই মাফউলের উপর সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন- عرفت زيدًا। উদ্দেশ্য হল, ইলমের সম্পর্ক হুবহু সত্তার সাথে নয়, বরং সিফাতের সাথে হয়। আর মা'রিফাতের সম্পর্ক হয় হুবহু সত্তার সাথে। যেমন- علمت زيدا كريما। অতএব, ইলমের সম্পর্ক কারীমের সাথে হল। যায়েদ পূর্ব থেকেই জানা। আর عرفت زيدًا তে মা'রিফাত হল, স্বয়ং যায়েদের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেন মানতিকী পরিভাষা হিসেবে ইলম হল তাসদীকের পর্যায়ভুক্ত। কারণ, এর সম্পর্ক সত্তার জন্য সিফাত প্রমাণিত হওয়ার সাথে। যেমন– উল্লেখিত উদাহরণে স্পষ্ট। আর মা'রিফাত হল تصور-এর পর্যায়ভূক্ত। কারণ, এর সম্পর্ক হয় হুবহু সত্তার সাথে। যেটি মুফরাদ বস্তু। কিন্তু উভয়টি কাছাকাছি হওয়ার কারণে প্রতিটি অন্যটির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এ কারণে এই স্থলে কপিগুলোর মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। মোটকথা, উদ্দেশ্য একই। চাই اعلمكم হোক অথবা اعرفكم। যেমন- হাদীসে বলা হয়েছে– من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله الخ। অতএব, এখানে يعلم - يؤمن এর অর্থে ব্যবহৃত।

ইমাম বুখারী র. এর প্রমাণ সংশ্লিষ্ট হিসেবে নজিরের সাথে নজির। যেরূপভাবে ইলমে বিভিন্ন মরতবা থাকে, এরূপভাবে ঈমানেও রয়েছে। কারণ, ইলম হল ঈমানের কারণ। কাজেই যখন কারণে সন্দেহ আসবে, তখন মুসাব্বাব অর্থাৎ, ঈমানেও তা প্রমাণিত হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ

শিরোনামের দু'টি অংশ– ১. انا اعلمكم بالله। ২. فعل القلب انا اعلمكم بالله।

এ দু'টির মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক কিসের?

উত্তরঃ এর উত্তর প্রথম প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তরে এসেছে তথা এখানে اعلمكم- اعرفكم অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী র. শিরোনামে দুটি অংশ উল্লেখ করেছেন- ১. انا اعلمكم بالله। ২. انّ المعرفة فعل القلب।

এ অনুচ্ছেদ দ্বারাও ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য যারা ঈমানকে বসীত তথা একক মনে করে, তাদের মত খন্ডন, যারা الايمان لا يزيد ولاينقص এর প্রবক্তা। এ উদ্দেশ্যের জন্য ইমাম বুখারী র. এ অনুচ্ছেদ কায়েম

করেছেন- انا اعلمكم بالله। যেটি মূলতঃ হাদীস শরীফের অংশ। যদ্দারা বুঝা গেল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন।

এরপর ইমাম বুখারী র.এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন– ان المعرفة فعل القلب। যদ্দারা তিনি বলেছেন যে, এখানে اعلمكم بالله এর অর্থ হল اعرفكم بالله। বস্তুতঃ মা'রিফাত হল অন্তরের একটি কাজ। অতএব, বুঝা গেল, আন্তরিক বিষয়াবলীতেহ্রাস-বৃদ্ধি হয়। পক্ষান্তরে ঈমানও আন্তরিক বিষয়। অতএব, ঈমানেওহ্রাস-বৃদ্ধি হবে। অতএব, এর দ্বারা মুরজিয়ার মত খন্ডন হয়ে গেল।

এবার মা'রিফাত অন্তরের কাজ হওয়ার প্রমাণ হল– وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ। (কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরের অর্জিত কাজের উপর তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন।) এই আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় কলবের দিকে অর্জনের সম্বন্ধ করা হয়েছে। যেটি কাজ ও আমলের অর্থে ব্যবহৃত। অতএব, মা'রিফাত অন্তরের কাজ, এটা প্রমাণিত হল।

এখানে ইলম ও মা'রিফাত দ্বারা সে অনৈচ্ছিক মা'রিফাত উদ্দেশ্য নয়, যার উপর ঈমান স্থগিত। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সুফীদের মা'রিফাত। যা ঈমানের পর রিয়াযত-সাধনা দ্বারা অর্জিত হয়। যা ঐচ্ছিক বিষয়। তাছাড়া শিরোনামের দ্বিতীয় অংশ ان المعرفة فعل القلب দ্বারা কাররামিয়ার মত খন্ডন হয়ে গেছে। যারা শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তিকে ঈমান সাব্যস্ত করে। কারণ, আল্লাহর প্রতি ঈমান হল, আল্লাহ সংক্রান্ত জ্ঞান। আর ইলমের অর্থ হল মা'রিফাত। বস্তুতঃ মা'রিফাত হল অন্তরের কাজ। অতএব, প্রমাণিত হল, ঈমান অন্তরের কাজ। কাজেই আন্তরিক সত্যায়ন ব্যতীত শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তি যথেষ্ট নয়।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ

এখানে রেওয়ায়াত সংক্ষিপ্ত। কিন্তু বুখারীর কিতাবুন নিকাহে এ ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত– তিনজন সাহাবী (হযরত আলী, উসমান ইবনে মাজঊন ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা.) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণের নিকট এসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। যখন উত্তর দেয়া হল, তখন সাহাবায়ে কিরাম এসব ইবাদতকে কম মনে করলেন এবং বলতে লাগলেন, কোথায় আমরা, আর কোথায় নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! (অর্থাৎ, আমাদের সাথে তাঁর কি তুলনা?) তাঁর তো পূর্বাপরের সমস্ত ক্রুটি ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। (অর্থাৎ, যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদত কমও করেন, তার পরেও কোন অসুবিধা নেই। তিনি তো নিষ্পাপ, তিনি তো ক্ষমাপ্রাপ্ত। কিন্তু আমরা তো গুনাহগার। অতএব, আমাদের তো বেশি ইবাদত করা উচিত।) ফলে এক সাহাবী বললেন, আমি সর্বদা সারারাত নামায পড়তে থাকব। দ্বিতীয়জন বললেন, সর্বদা রোযা রাখব। কখনো দিনে রোযাহীন থাকব না। তৃতীয়জন বললেন, আমি সর্বদা মহিলাদের থেকে দূরে থাকব। কখনো বিয়ে করব না। এমতাবস্থায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন, তিনি বললেন- তোমরা কি এরূপ এরূপ কথা বলেছ? শোন, আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের সবার চেয়ে বেশি ভয় করি। তোমাদের সবার চেয়ে বেশি মুত্তাকী আমি। কিন্তু আমি রোযাও রাখি, (বেরোযাও থাকি) নামাযও পড়ি আবার ঘুমাইও। রমনীদের বিয়েও করি। (তোমরা যা বলেছ, এগুলো থেকে অনুমিত হয় যে, তোমরা এসব ইবাদতকে কম মনে করেছ এবং তোমরা আমার চেয়েও অগ্রসর হতে চাচ্ছ।)

শুনে রেখো, যে ব্যক্তি আমার আদর্শ থেকে বিমূখ হবে, সে আমার দলভূক্ত নয়। -বুখারী ঃ ২/৭৫৭।

قوله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك الخ এর দ্বারা ইঙ্গিত হল, لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (সূরা ফাতহ্) আয়াতে কারীমার দিকে।

ذنب দ্বারা উদ্দেশ্য ইজতিহাদী ভুল অথবা বাহ্যিক শব্দের উপর পাকড়াও উদ্দেশ্য। কারণ, حسنات الابرار سيئات المقربين (ফরমাবরদারদের নেক কাজ নৈকট্যপ্রাপ্তদের স্তরে পৌঁছে মন্দ কাজ হয়ে যায়।) যেমন- হযরত মূসা আ. انا اعلم বললে তাঁর প্রতি ভর্ৎসনা হয়। অথচ কথাটি যথার্থও ছিল। হযরত ইয়াকূব আ.

اِنِّىْ لَيَحْزُنُنِىْ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ

বলার ফলে কয়েক বছর পর্যন্ত বিচ্ছেদ বরদাশত করতে হয়। যেটি বাহ্যতঃ তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী ছিল।

হযরত ইউনুস আ. সম্পর্কে বলেছেন-

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ

অথচ প্রকৃত অর্থে তাঁর এই ধারণা ছিল না। বাহ্যতঃ তাঁর কাজের এ দাবি ছিল।

ইবনে উম্মে মাকতূম রা.এর ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- عبس وتولى ان جاءه الاعمى। অথচ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য শুধু এই ছিল যে, তিনি তো ঘরের মানুষ। যখন ইচ্ছা জিজ্ঞেস করতে পারেন। এ সব শীর্ষ কাফিরকে দীনের কথা পৌঁছানোর মওকা হয়ত আবার হবে না।

حتى يعرف الغضب فى وجهه। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু গোটা মাখলূকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রূপ ও সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন, সেহেতু আনন্দ ও ক্রোধ অবস্থার নিদর্শন স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে যেত।

ক্রোধের কারণ ঃ

১. সে সব সাহাবীর ইবাদতে সীমালঙ্ঘন। ২. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদতকে কম মনে করা। অথচ ইবাদত নবী ও গরনবীর রূহে (স্পিরটে) এরূপ পার্থক্য, যেমন- (পাথর)টুকরো ও রুইয়ের ওজনে।

৩. ত্রুটি মাফকে ইবাদত কমের কারণ মনে করা। অথচ এটার দাবি হল, ইবাদত বেশি করা। যেমন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا

١٤. بَابُ مَنْ كَرِهَ اَنْ يَّعُوْدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّلْقٰي فِي النَّارِ مِنَ الْاِيْمَانِ .

১৪. পরিচ্ছেদ ঃ কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার ন্যায় অপসন্দ করা ঈমানের নিদর্শন।

٢٠. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ

مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ .

২০. সুলায়মান ইবনে হারব র. .... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকবে, সে ঈমানের স্বাদ পাবে- ১. যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্য সব কিছু থেকে প্রিয় ; ২. যে একমাত্র আল্লাহরই জন্য কোন বান্দাকে মহব্বত করে এবং ৩. আল্লাহ্ তা'আলা কুফর থেকে মুক্তি দেয়ার পর যে কুফরে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষেপ্ত হওয়ার মতই অপসন্দ করে।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ

হাদীসের মিল স্পষ্ট। অর্থাৎ, ومن يكره ان يعود فى الكفر الخ এর সাথে।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র ঃ আল্লামা আইনী ও কাসতাল্লানী র. যোগসূত্র বর্ণনা করেছেন- পূর্বের রেওয়ায়াতে আছে, সাহাবায়ে কিরাম ইবাদত বেশি করতে চেয়েছিলেন। বরং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এর অনুমতিও চেয়েছিলেন। এই বেশি ইবাদতের কারণও স্পষ্ট। কেননা, তারা ঈমানের স্বাদ পেয়েছিলেন। বস্তুতঃ এই অনুচ্ছেদের হাদীসেও ঈমানের স্বাদ ও এর কারণের বিবরণ রয়েছে। অতএব, মিল স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ

হাদীসটি বুখারীর ৭, ৮, ৮৯২ ও ১০২৬পৃষ্ঠায় এসেছে। মুসলিম র. বর্ণনা করেছেন ৪৯পৃষ্ঠায়। এটি তিরমিযীতেও আছে।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ

এর ব্যাখ্যার জন্য ১৫নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

এ হাদীসে কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তনের অর্থ এই নয় যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য নতুন ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিই। সেও উদ্দেশ্য, যে প্রথমে মুসলমান হয়েছে। এতে উভয় ছূরত অন্তর্ভূক্ত। কারণ, যখন নওমুসলিম কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তনে এতটা ঘৃণা করবে, তাহলে যে পূর্বপুরুষ থেকে মুসলমান হয়ে আসছে, তার তো কুফর শিরক থেকে আরও বেশি ঘৃণা হওয়া উচিত। তার তো ঈমানী মিষ্টতাও অধিক হওয়া উচিত।

١٥. بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيْمَانِ فِي الْأَعْمَالِ

১৫. পরিচ্ছেদ ঃ আমলের দিক থেকে ঈমানদারদের শ্রেষ্ঠত্বের স্তরভেদ

اى هذا باب تفاضل اهل الايمان والاصل هذا باب فى بيان تفاضل اهل الايمان فى اعمالهم- وتفاضل مجرور باضافة الباب اليه ويجوز ان يكون مرفوعًا بالابتداء وقوله '' الاعمال '' خبره الخ (عمدة)

শিরোনাম فِي الاعمال আল্লামা আইনী ও কাসতাল্লানী র. লিখেন-فى-শব্দটি কারণ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য হল, আমলের কারণে ঈমানদারদের মধ্যে পার্থক্য হয়।

٢١. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَخْرِجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدْ اسْوَدُّوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الْحَيَا أَوْ الْحَيَاةِ شَكَّ مَالِكٌ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً قَالَ وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرٌو الْحَيَاةِ وَقَالَ خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ .

২১. ইসমাঈল র. .... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ হিসাব নিকাশের পর জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবেন এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে। পরে আল্লাহ্ তা'আলা (ফিরিশতাদের) বলবেন, যার অন্তরে একটি সরিষা পরিমাণও ঈমান রয়েছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আস। তারপর তাদের জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এমন অবস্থায় যে, তারা (পুড়ে) কালো হয়ে গেছে। এরপর তাদের বৃষ্টিতে বা হায়াতের [বর্ণনাকারী মালিক র. শব্দ দু'টির কোনটি এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছেন] নদীতে ফেলা হবে। ফলে তারা সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন নদীর পাশে শষ্যবীজ গজিয়ে উঠে। তুমি কি দেখতে পাও না, সেগুলো কেমন হলুদ রঙের হয় ও লতিয়ে গজায়? উহাইব র. বলেন, 'আমর র. আমাদের কাছে حيا এর স্থলে حياة এবং خردل من ايمان এর স্থলে خردل من خير বর্ণনা করেছেন।

যোগসূত্র ঃ আল্লামা আইনী ও কাসতাল্লানী র. বলেন, পূর্ববর্তী হাদীসে ঈমানের তিনটি গুণের বিবরণ ছিল। স্পষ্ট বিষয়, এতে মানুষের মধ্যে পার্থক্য হয়। যার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে এই তিনটি গুণ পাওয়া যাবে, সে উত্তম হবে। আর যার মধ্যে এই তিনটি গুণে অথবা কোন একটিতে ত্রুটি থাকবে, সে তার চেয়ে নিম্নমানের থাকবে। যেমন- পূর্বে মুমিনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের পার্থক্যের বিবরণ ছিল পরোক্ষভাবে, অধীনস্থ আকারে। এবার ইমাম বুখারী র. এ বিষয়টি স্পষ্ট আকারে বর্ণনা করছেন।

২. পূর্বে ঈমানের মিষ্টতা, তার প্রতি ভালবাসা ও অপছন্দের বিবরণ ছিল। والناس فيها متفاضلون তথা এতে মানুষ বিভিন্ন স্তরের হয়ে থাকে। কেউ উঁচুস্তরের, কেউ নিচুস্তরের। অতএব, এখন ঈমানদারদের শ্রেষ্ঠত্বে পার্থক্যের বিবরণের অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট।

اخرجوا من كان فى قلبه مثقال حبّة من خردل من ايمان

" উক্তির সাথে। অর্থাৎ, ঈমানের ন্যূনতম অংশ হলেও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। অতএব, বুঝা গেল, ঈমানদারদের মধ্যে পার্থক্য ও শ্রেণীভেদ রয়েছে। -উমদাহ।

প্রশ্ন ঃ শিরোনামে تفاضل في الاعمال এর উল্লেখ ছিল, আর হাদীসের শব্দরাজি اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان. দ্বারা ঈমানে বৃদ্ধির প্রমান হয়। এজন্য শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হল না।

উত্তর ঃ সহীহ বুখারীতে এখানে হাদীসটি সংক্ষিপ্ত। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. এর এ রেওয়ায়াতটি সহীহ মুসলিমে باب اثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى এর অধীনে সবিস্তারে নেয়া হয়েছে। যদ্দারা আমলে বৃদ্ধি সাব্যস্ত হয়। ১০৩ পৃষ্ঠার শব্দগুলো নিম্নরূপ,

يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون الى قوله قد اخذت النار الى نصف ساقيه والى ركبتيه.

এতে সে সব লোকের আমলের বিবরণ রয়েছে, আর এ সব আমলে বেশ কম প্রমানিত হয়। কারণ, জাহান্নামের আগুন কারো পায়ের গোছার অর্ধাংশ পর্যন্ত আর কারো হাটু পর্যন্ত হবে আর আযাবে এ তারতম্য আমলে বেশ কমের কারণেই হবে।

সামনে গিয়ে বলেন,

ثم يقولون ما بقي فيها أحد ممن امتنا به فيقولوا ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فاخرجوه.

এর দ্বারা সে সব লোক উদ্দেশ্য যাদের কাছে দৈহিক কোন আমল থাকবে না, অবশ্য আন্তরিক আমল থাকবে। যেমন, আল্লাহর ভয়, ইখলাস, নিয়্যত ইত্যাদি। অর্থাৎ, কলবী যিকির এবং মন্দ জিনিস পরিবর্তন করার পরিপক্ক ইচ্ছা।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من رای منکم منکرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. مسلم : ٥١/١

তোমাদের যে কোন মন্দ কাজ দেখবে, সে তা হাত দ্বারা মিটিয়ে দিবে, এর শক্তি-সামর্থ না থাকলে মৌখিকভাবে নিষেধ করবে, আর এতটুকুও করতে না পারলে অন্তরে সুদৃঢ় ইচ্ছা রাখবে যখনই সুযোগ হবে এর মুলোৎপাটন করবে। আর এটা ঈমানের সর্বশেষ ও দুর্বল স্তর।

এ হাদীস দ্বারা অন্তরের আমলের অস্তিত্ব প্রমানিত হল। কারণ, تغيير بالقلب এর অর্থ হল, পরিবর্তনের দৃঢ় সংকল্প। যেমন, মোল্লা আলী কারী র. বলেছেন, সহীহ মুসলিম শরীফের এ অনুচ্ছেদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে-

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله تعالى في امة قبلي الا كان له من امته حواريون واصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل . مسلم : ٥١/١.

এ হাদীসে জিহাদ বিল কলব تغيير بالقلب এর অর্থের সমর্থন করছে। অতএব বুঝা গেল, এখানে খায়ের দ্বারা উদ্দেশ্য আমল। পরবর্তীতে বলেন, فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. مسلم ص ١٠٣ এর দ্বারাও প্রমানিত হয়, দ্বিতীয় বার যে সব লোককে (জাহান্নাম থেকে) বের করা হয়েছে, তাদের মধ্যে আমলে বেশ কম থাকার কারণে আন্তরিক আমলে কম বেশী উদ্দেশ্য। শেষে অর্থাৎ, অষ্টম লাইনে বলেন, ادخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. এর দ্বারাও প্রমানিত হল, যে উপরে খায়ের দ্বারা উদ্দেশ্য কলবের আমল, ঈমান উদ্দেশ্য নয়। কারণ, ঈমান ছাড়া তো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

মোটকথা, ইমাম বুখারী র. باب تفاضل أهل الايمان في الاعمال এর অধীনে যে সংক্ষিপ্ত হাদীস এনেছেন, তদ্বারা প্রমাণ পেশ করার সময় ইমাম সাহেব র. এর দৃষ্টি এ দ্বিতীয় সূত্রের প্রতিও ছিল। যার বিস্তারিত বিবরণ সহীহ মুসলিমে আছে। এই বিস্তারিত হাদীস থেকে আমলে হ্রাস বৃদ্ধি প্রমানিত হচ্ছে।

ইমাম বুখারী র. আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসের শেষে তা'লীক রূপে من خير শব্দ এনে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এই রেওয়ায়াতটি আমলে বেশ কম সাব্যস্ত করে। কারণ, ওরফে খায়ের শব্দের প্রয়োগ হয় আমলের উপর। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

يَوْمَ يَأْتِيْ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا.

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, পৃঃ ৮, রিকাক ঃ ৯৭০, এর সমার্থক হাদীস রয়েছে, হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত ১১১ পৃষ্ঠায়।

শব্দরাজির ব্যাখ্যা ঃ

اخرجوا হামযার উপর যবর। আমরের সীগা। তথা নির্দেশসূচক শব্দ। এটির মাসদার বা ক্রিয়ামূল হল- اخراج

এ সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে যে, এখানে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে?

আল্লামা আইনী র. বলেন, وهو خطاب للملائكة অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে বলবেন, اخرجوا الخ

مثقال - ثقل মূলধাতু থেকে ইসমে আলা। مثقال হল একটি বাট ও ওজন। যা সাড়ে চার মাশা পরিমাণ হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে সাধারণ ওজন ও পরিমাণ উদ্দেশ্য। যেমন, কুরআনে কারীমে مثقال ذرة (অনুপরিমাণ) পরিমাণই উদ্দেশ্য।

حبة হা এর উপর যবর। এটি ব্যাপক, সর্বপ্রকার শস্যকে বলা হয়। যেমন, গম ইত্যাদি। এর বহুবচন হল, حبوب। حبة হা এর নিচে যের বা এর উপর তাশদীদ জংলী বীজ। বা ময়দানের বীজ। অর্থ হল, যেরূপভাবে জংলী বীজ পানির ঢলে প্রবাহিত হয়ে সর্বত্র দ্রুত জমে যায়, এরূপভাবে তারা নাহরুল হায়াতে পড়ে তৎক্ষনাৎই একটি সবুজ শ্যামল জীবন লাভ করবে।

في نهر الحيا او الحياة হায়া শব্দটি কসর সহকারে। এর অর্থ হল, বৃষ্টি। যেহেতু বৃষ্টির মাধ্যমে শস্যদানা উৎপন্ন হয়, এগুলোতে প্রাণ আসে, সেহেতু বৃষ্টি হল, জীবনের কারণ। এখানে এটি একটি নহরের নাম।

قال وهيب উহাইব ইবনে খালিদও আমর ইবনে ইয়াহইয়া থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মালিক র. এর ন্যায়। কিন্তু ইমাম মালিক র. এর সন্দেহ হয়েছে যে, উস্তাদ আমর ইবনে ইয়াহইয়া حيا বলেছেন, না حياة বলেছেন। কিন্তু উহাইব র. এর রেওয়ায়াতটি সংশয়হীন। দ্বিতীয় পার্থক্য হল, উহাইব র. এর রেওয়ায়াতে خردل من ايمان এর পরিবর্তে خردل من خير রয়েছে। যদ্বারা বুঝা গেল, ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য আমল।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম বুখারী র. এখানে দুটি হাদীস এনেছেন। উদ্দেশ্য হল, মুরজিয়া ও খারিজীদের মতখন্ডন। যেন ইমাম বুখারী র. এখানে দুধারী তলোয়ার চালিয়েছেন। যার ফলে এ হাদীস দ্বারা উভয়ের মতখন্ডন হয়। কারণ, মুরজিয়ার আকীদা হল, ঈমানের পূর্ণাঙ্গতা দানেও আমলের কোন দখল নেই। ঈমান

থাকলে অবাধ্যতা বা গুনাহ ক্ষতিকর নয়। অতএব মুরজিয়ার মতখন্ডন এভাবে হবে যে, গুনাহ ক্ষতিকর না হলে গুনাহগার মুমিন জাহান্নামে কি ভাবে গেল?

খারিজীদের মতখন্ডন এভাবে হবে যে, তাদের আকীদা হল, কবীরা গুনাহকারী কাফির এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী। অতএব এ হাদীসে তাদের মত সুস্পষ্টভাবে খন্ডিত হয়েছে যে, তাহলে জাহান্নাম থেকে তাদেরকে কেন বের করা হল?

উপকারিতা ঃ

এ অনুচ্ছেদ দ্বারা পরিস্কার বুঝা গেল যে, ইমাম বুখারী র. তাই বলেন, যা হানাফী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামী আইনবিদ বলেন যে, ঈমান বসীত বা একক জিনিস। শুধু আন্তরিক বিশ্বাসের নাম। মূল ঈমান যুক্ত বা অংশবিশিষ্ট নয়। হ্যাঁ, আমলের দিক দিয়ে হ্রাস বৃদ্ধি হয়। অবশ্য ইমাম বুখারী র. ঈমানের ধরণে হ্রাস বৃদ্ধির প্রবক্তা। যেমন, ان المعرفة فعل القلب ও اعلمكم দ্বারা স্পষ্ট। বাস্তবে আমরাও কিন্তু এর প্রবক্তা। বিশুদ্ধ হল, ইমাম বুখারী র. বেশীরভাগ মুরজিয়া সম্প্রদায়ের মতখন্ডন করেন, আবার কখনো কখনো খারিজী ও মু'তাযিলার। যেমন, উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

٢٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضـــ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدِّينَ .

২২. মুহাম্মদ ইবনে উবায়দুল্লাহ র. .... হযরত আবূ উমামা ইবনে সাহল ইবনে হুনাইফ র. থেকে বর্ণিত, তিনি আবু সাঈদ খুদরী রা.-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- একবার আমি ঘুমন্ত অবস্থায় (স্বপ্নে) দেখলাম যে, লোকদেরকে আমার সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে। আর তাদের পরণে রয়েছে জামা। কারো জামা বুক পর্যন্ত আর কারো জামা এর নীচ পর্যন্ত প্রলম্বিত। আর উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-কে আমার সামনে হাযির করা হল এমন অবস্থায় যে, তিনি তাঁর জামা (এত লম্বা যে) টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন (জমি পর্যন্ত প্রলম্বিত)। সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি এর কি ব্যাখ্যা করেছেন? তিনি বললেন- (এ জামার ব্যাখ্যা হল) দীন। অর্থাৎ, কামিসের ব্যাখ্যা দিলেন দীন দ্বারা। যার সারমর্ম হল, আমাকে লোকজনের ধর্মীয় অবস্থা দেখানো হয়েছে। আমার সামনে পেশকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে উমর রা. এর জামা ছিল সবচেয়ে বড়। এর দ্বারা বুঝা গেল, তাঁর দীন (পেশকৃত সবার চেয়ে) উঁচু পর্যায়ের ও পূর্ণাঙ্গতর।

জামার সাথে দীনের সম্পর্ক হল, যেরূপভাবে পোশাক পরিধানের তিনটি উদ্দেশ্য থাকে। ১. সতর ঢাকা, ২. শীত ও তাপ থেকে রক্ষা, ৩. শোভা ও সৌন্দর্য্য। এরূপভাবে দীনও দোষত্রুটি ঢেকে রাখে পরকালীন বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করে ও শোভা সৌন্দর্য্যের কারণ হয়।

এতে বুঝা গেল, দীন শব্দটির প্রয়োগ ঈমান ও ইসলামের সমষ্টির ক্ষেত্রে হয়। অতএব মূল ঈমানে এর দ্বারা হ্রাস বৃদ্ধি প্রমানিত হয় না। পক্ষান্তরে আমলের কারণে ব্যবধান ও উঁচু নিচুর কথা হক্বপন্থী কেউ অস্বীকার করেন না।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ৮, ফযলে উমর ঃ ৫২১, তা'বীর ঃ ১০৩৭, ১০৩৮।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة من جهة تاويل القميص بالدين وذكر فيه انهم متفاضلون في لبسها فدل على انهم متفاضلون في الايمان اى في الاعمال

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল স্পষ্ট। কারণ, জামার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে দীন দ্বারা এবং তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, লোকজন পোশাক পরিচ্ছদে একজন অপরজনের চেয়ে উঁচু ও নিচু পর্যায়ের হয়ে থাকে। এতে বুঝা গেল, ঈমান-আমলের দিক দিয়েও মানুষের মর্যাদা উঁচু নিচু হয়ে থাকে।

একটি প্রশ্ন ঃ টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলানো না জায়িয। তাহলে কি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম স্বপ্নযোগে হযরত উমর ফারুক রা.কে গুনাহে লিপ্ত দেখেছেন?

উত্তর ঃ এটি ভিন্ন জগতের ঘটনা। এটিকে এ জগতের সাথে তুলনা করা যায় না।

২। এখানে জামা দ্বারা প্রকৃত জামা উদ্দেশ্য নয়। বরং এটি দ্বারা উদ্দেশ্য দীন। মানে দীন তার ব্যাখ্যা।

كما عبره النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوافق قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير.

আরেকটি প্রশ্ন ঃ এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত উমর ফারুক রা. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা. অপেক্ষা উত্তম।

উত্তর ঃ হাদীসে সুস্পষ্ট ভাষায় এ কথার উল্লেখ নেই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে সব লোক দেখানো হয়েছে, তাঁদের মধ্যে হযরত সিদ্দীকে আকবার রা. ছিলেন। হতে পারে হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. এই দলে ছিলেন না।

২। এখানে প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব উদ্দেশ্য নয়। বরং দীনের নিদর্শন দেখানো হয়েছে। হযরত আবূ বকর রা. মূল দীনের দিকে লক্ষ করে উত্তম। কিন্তু নিদর্শনাদি দেখা গেছে হযরত উমর ফারুক রা. এর উপর বেশী। যেমন, তাঁর খিলাফত যুগে প্রচুর বিজয় হয়েছে। প্রথমত তো হযরত আবূ বকর রা. এর খিলাফতকাল খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল। অতঃপর এতে মুরতাদদের দমনের প্রতি মনোযোগী ছিলেন। যেন বিজয়ের পথ মসৃন ও সুগম করেছেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা.। অতঃপর হযরত উমর রা. একাজে লাগেন।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী র. বলেন, একবার হযরত আবূ বকর ও উমর রা. এর মরতবা জানতে ইচ্ছে হল, তখন মিসাল জগতে দেখলাম, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিগন্তে দাড়ানো এবং তাঁর নিচে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতার নিকট মিলিত হযরত আবূ বকর রা. এর মাথা, আর হযরত আবূ বকর রা. এর জুতা থেকে কিছুটা নিচে দূরত্বে রয়েছে হযরত উমর রা. এর মাথা। যার অর্থ হল, হযরত সিদ্দীকে আকবার রা. এর শেষ হল, নবীর শুরু। আর হযরত ফারুক রা.এর শেষ স্তর থেকে অনেক উপরে হযরত সিদ্দীকে আকবার রা. এর শুরু। এ হাদীস দ্বারা দীনে উঁচু নিচু এবং পার্থক্য সাব্যস্ত হল। বস্তুতঃ দীন ও ঈমান একই। -ইরশাদুল কারী।

١٦. بَابُ اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ.

১৬. পরিচ্ছেদ ঃ লজ্জা ঈমানের অংশ

٢٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رضـــ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنْ الْإِيمَانِ.

২৩. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ র. .... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর ভাইকে তখন (অধিক) লজ্জা ত্যাগের জন্য উপদেশ দিচ্ছিলেন (সতর্ক করছিলেন এত লজ্জা কেন রাখছ?)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ ওকে ছেড়ে দাও। কারণ, লজ্জা ঈমানের অংশ।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল স্পষ্ট। কারণ, ইমাম বুখারী র. এর রীতি অনুযায়ী হাদীসের একটি অংশ নিয়ে তিনি অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ৮, কিতাবুল আদব ঃ ৯০৩।

যোগসূত্র ঃ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে আমলের ক্ষেত্রে ঈমানদারদের উঁচু নিচু মর্যাদার বিবরণ ছিল। আর এ অনুচ্ছেদে রয়েছে লজ্জার বিবরণ। বস্তুতঃ হায়া বা লজ্জার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এতে পারস্পরিক উঁচু নিচু পার্থক্য স্পষ্ট।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ

এখানে এ রেওয়ায়াতটি সংক্ষিপ্ত। বুখারীর কিতাবুল আদবে (৯০৩) এটি কিছুটা বিস্তারিত আকারে এসেছে। যদ্বারা বিষয়টি পরিপূর্ণ স্পষ্ট হয়ে যায়।

مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب في الحياء يقول انك لتستحيي حتى كانه يقول قد اضر بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الايمان.

'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। যিনি তাঁর ভাইকে হায়া সম্পর্কে ভর্ৎসনা করছিলেন (অসন্তুষ্ট হচ্ছিলেন)। তাকে বলছিলেন, তুমি বেশী লজ্জা কর, এক পর্যায়ে তিনি বলতে লাগল, শরম তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে (ধ্বংস করে দিয়েছে)। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কারণ, হায়া ঈমানের একটি অংশ।'

ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য মুরজিয়ার মতখন্ডন। ইমাম বুখারী র. বলতে চান যে, ঈমানের জন্য আমলের প্রয়োজন। চাই অন্তরের আমল হোক বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের। আমল ছাড়া ঈমান অসম্পূর্ণ থাকবে। কারণ, আমল ঈমানকে পূর্ণাঙ্গতা দান করে।

এই রেওয়ায়াত দ্বারাও প্রমাণিত হল, হায়া পূর্ণাঙ্গ ঈমানের একটি অংশ। হায়া সংক্রান্ত কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা ৮ নং হাদীসে এসেছে। সেখানে দেখা যেতে পারে।

হায়ার একটি সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, هو انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره اعم من ان يكون شرعيا اوعقليا او عرفيا. তথা অপছন্দনীয় জিনিসে লিপ্ততার ভয়ে নফসের বিরতি ও সংকোচ। অপছন্দনীয় চাই শরঈ হোক অথবা যৌক্তিক অথবা ওরফীভাবে। এবার যদি সে শরঈভাবে অপছন্দনীয় জিনিসে লিপ্ত হয়, তবে তাকে বলা হবে ফাসিক। আর যদি যৌক্তিক অপছন্দনীয় কাজে লিপ্ত হয়, তবে তাকে পাগল, আর যদি ওরফী অপছন্দনীয় কাজে লিপ্ত হয়, তবে তাকে বেওকূফ বলা হবে।

এর দ্বারা বুঝা গেল, হায়া সর্বাবস্থাতেই উত্তম। যেমন, হাদীস শরীফে আছে, الحياء خير كله

١٧. باب فَإِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ

১৭. পরিচ্ছেদ ঃ যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে। (৯ ঃ ৫)

٢٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.

২৪. আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল-মুসনাদী র. ...... হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আমি (কাফির) লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য (আল্লাহর পক্ষ থেকে) আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, আর নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়। যদি তারা এ কাজগুলো করে, তবে আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করল; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা। আর তাদের (আন্তরিক বিষয়ের) হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলার উপর ন্যস্ত থাকবে।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ হাদীসের অর্থের সাথে আয়াতের অর্থের মিল রয়েছে। অর্থাৎ, আয়াতে তাওবা তথা শিরক থেকে তাওহীদের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং নামায ও যাকাতের উল্লেখ রয়েছে। এরূপভাবে হাদীসেও এই তিনটি জিনিসের উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর আয়াতে যেরূপভাবে বলা হয়েছে যে, যারা এ তিনটি কাজ সম্পাদন করবে, তাদেরকে নিরাপদ করে দেয়া হবে। এরূপভাবে হাদীসে আছে, যারা এ তিনটি কাজ করবে, তাদের জান মাল নিরাপদ করে দেয়া হবে। আয়াতে কারীমায় تخليه এবং হাদীসে عصمت উভয়টির অর্থ এখানে একই।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ৮, মুসলিম ঃ ৩৭।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য মুরজিয়া ও কাররামিয়া সম্প্রদায়ের মতখন্ডন। কারণ, ঈমানের জন্য আমলের প্রয়োজন নেই। আয়াতে কুরআনী ও হাদীসে নববী উভয়টি দ্বারা তাদের পরিপূর্ণ

মতখন্ডন হয়েছে। কারণ, যদি আমলের প্রয়োজন না থাকে, তাহলে সাক্ষ্য দানের সাথে সাথে নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায়ের ফলে পথ উন্মুক্ত করে দেয়া কেন মওকুফ করা হয়েছে? বুঝা গেল, পূর্ণাঙ্গ ঈমান এ সব জিনিস দ্বারা গঠিত ও যুক্ত।

প্রশ্ন ঃ আয়াত ও হাদীস উভয়টিতে ইসলামের আরকান সমূহ থেকে শুধু নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য ইসলামী রুকন তথা রোযা হজ্ব ইত্যাদির উল্লেখ নেই। এর কারণ কি?

উত্তর ঃ কেউ কেউ বলেছেন, হতে পারে এ হুকুম রোযা ও হজ্ব ফরয হওয়ার পূর্বেকার।

তবে এ উত্তর হাদীসের ক্ষেত্রে সম্ভব, কিন্তু আয়াতে এর অবকাশ নেই। কারণ, এটি হল সূরা বারাআতের আয়াত। আর সূরা বারাআত অবতীর্ণ হয়েছে ৯ম হিজরীতে। নিঃসন্দেহে রোযা ফরয হয়েছে এর পূর্বে।

◆ অতএব আসল উত্তর হল, সালাত দ্বারা দৈহিক ইবাদতের দিকে ইঙ্গিত। আর যাকাত দ্বারা আর্থিক ইবাদতের দিকে। নামাযকে দীনের স্তম্ভ, আর যাকাতকে ইসলামের পুল বলা হয়েছে। অতএব এ দুটির গুরুত্বের কারণে শুধুমাত্র এগুলোকে উল্লেখ করা যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। অন্যথায় উদ্দেশ্য হল, ক্রমানুসারে সমস্ত আহকামে শরঈ। এমতাবস্থায় সমস্ত দৈহিক, আর্থিক ও উভয় দ্বারা গঠিত ইবাদত অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ এ আয়াত দ্বারা প্রমানিত হল, নিজের জান রক্ষা ও পথমুক্তির শুধু একই পন্থা, সেটি হল ঈমান আনা, নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করা। অথচ অন্যত্র ইরশাদ রয়েছে-

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُوْلُه وَلاَ يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ. سورة توبة

যদ্বারা বুঝা যায়, জিযিয়া কর গ্রহণ করা দ্বারাও হত্যার হুকুম খতম হয়ে যায়।

উত্তর ঃ ফাতহুল বারীতে এর ছয়টি উত্তর দেয়া হয়েছে। এখানে অধিক নির্ভরযোগ্য উত্তরগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

১। কেউ কেউ বলেছেন, হয়তো তখন পর্যন্ত জিযিয়ার হুকুম অবতীর্ণ হয়নি। তবে এটা শুধু সম্ভাবনাই।

২। সর্বোত্তম জবাব হল জিহাদ দ্বারা কুফর খতম করা উদ্দেশ্য নয়, বরং কুফরের শান-শওকত ভেঙ্গে দেয়া ও পরাভূত করা উদ্দেশ্য। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

لِيُظْهِرَه عَلَى الدِّيْنِ كُلِّه وَقَالَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا

অর্থাৎ, আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা ও সমস্ত ধর্মের উপর ইসলামের প্রবলতা উদ্দেশ্য।

মোটকথা, অন্যান্য ধর্মকে নাস্তানাবুদ করা নয়, বরং পরাভূত করা উদ্দেশ্য। কাজেই যদি কোন দল ঈমান গ্রহণ না করে কিন্তু জিযিয়া প্রদান করে মুসলমানদের অধীনস্থ হয়ে যায় এবং মুসলমানদের দলে সংশ্লিষ্টের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়, তবে জিহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়।

নামায বর্জনকারীর হুকুম ঃ

ইমামত্রয় নামায তরককারীর হত্যার প্রবক্তা। তাঁদের মধ্যে দৃষ্টিকোনগত পার্থক্য ও মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম আহমদ র. মুরতাদ হওয়ার কারণে হত্যার প্রবক্তা। অর্থাৎ, তাঁর মতে নামায বর্জনকারী মুরতাদ। অতএব তার উপর মুরতাদের সমস্ত বিধি-বিধান জারী করেন।

ইমাম শাফিঈ ও মালিক র. মুরতাদ সাব্যস্ত করেন না। কিন্তু দন্ডবিধি হিসেবে হত্যার হুকুম দেন। যেমন, কিসাস। অথবা বিবাহিত ব্যভিচারীদের দন্ডবিধিরূপে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়।

ইমামত্রয়ের প্রমাণ ঃ ১. আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস।

ইমাম নববী র.ও এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন।

উত্তর ঃ স্বয়ং শাফিঈ মতাবলম্বী ইনসাফপ্রিয় উলামায়ে কিরাম এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেছেন। দেখুন, আল্লামা তাকীউদ্দীন ইবনে দাকীকুল ঈদ র. প্রথমে মালিকী ছিলেন, পরবর্তীতে শাফিঈ হয়ে যান। তিনি খুবই ইনসাফস্বভাব মনীষী। তিনি স্বীয় গ্রন্থ ফাওয়াইদুল আহকাম গ্রন্থে বলেন, এ হাদীস দ্বারা নামায বর্জনকারীর হত্যার উপর প্রমাণ পেশ করা যথার্থ নয়। কারণ, হাদীসে মুকাতালা বা লড়াইয়ের নির্দেশ রয়েছে। বস্তুতঃ মুকাতালা ও কতলের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মুকাতালার অর্থ হল, লড়াই করা, ঝগড়া করা। যদি লড়াইয়ে কেউ নিহত হয়, তবে সেটা ভিন্ন ব্যাপার। মুকাতালা কতল বা হত্যাকে আবশ্যক করে না। ইসলামের কোন কোন প্রতীক যেমন, আযান অথবা খতনা বর্জনে মুসলিম শাসকের প্রতি লড়াইয়ের নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু এরূপ লোককে হত্যা করা জায়িয নেই।

এমনিভাবে মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে। فان ابى فليقاتله অথচ তাকে হত্যা করা জায়িয নেই।

একস্থানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ রা. কে বলেছেন- اقتالا يا سعد! অর্থাৎ, তুমি তোমার কথার উপর এতটা অটল যেন আমার সাথে লড়াই করে কাজ উদ্ধার করতে চাও! দেখুন, এখানে হত্যার কোন অর্থ হতে পারে না। কুরআন মাজীদে ইরশাদ রয়েছে-

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا

এখানে লড়াই দ্বারা যদি হত্যা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে উভয় পক্ষের নিহত হবার পর কাদের মধ্যে সন্ধি করানো হবে?

স্বয়ং ইমাম শাফিঈ র. থেকে বাইহাকী র. বর্ণনা করেছেন-

ليس القتال من القتل بسبيل قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله

অতএব আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা নামায বর্জনকারীর বিরুদ্ধে কিতাল বা জিহাদ প্রমাণিত হয়, কিন্তু হত্যার বৈধতা প্রমাণিত হয় না।

২। ইবনুল কাইয়্যিম র. كتاب الصلوة واحكام تاركها নামে নামাযের আহকাম সংক্রান্ত একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা লিখেছেন, তাতে হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেননি। বরং শিরোনামে উল্লেখিত আয়াতে কারীমা-

اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ الى قوله تعالى فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ

এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। তিনি বলেন, হাদীসে যদিও লড়াইয়ের হুকুম রয়েছে, কিন্তু কুরআনে হত্যার হুকুম উল্লেখিত হয়েছে।

ইবনে কাইয়্যিম র.এর এই প্রমাণের কয়েকটি উত্তর দেয়া যেতে পারে।

১. কুরআন মাজীদে কতলের উল্লেখ রয়েছে, আর হাদীসে রয়েছে কিতালের। অতএব বিরোধ অবসানের জন্য একটিকে অপরটির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা আবশ্যক হবে। অর্থাৎ, হয়তো কতল দ্বারা কিতাল বা জিহাদ উদ্দেশ্য হবে বা এর পরিপন্থী কিতাল দ্বারা কতল উদ্দেশ্য হবে। যেহেতু হাদীস কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা সেহেতু কুরআনে উল্লেখিত কতল শব্দ দ্বারা কিতাল বা লড়াই উদ্দেশ্য হবে। যা হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। ইমাম বুখারী র.ও শিরোনামে উপরোক্ত আয়াত এবং এর অধীনে এ হাদীসটি এনে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ হাদীসটি এ আয়াতের ব্যাখ্যা।

২. কুরআন মাজীদে শুধু কতলের হুকুম নেই, বরং এর সাথে আরো কয়েকটি আহকামও রয়েছে। ইরশাদ রয়েছে-

اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْالَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ

এর দ্বারা বুঝা গেল, পথমুক্তি উপরোক্ত সব বিধি-বিধান তথা হত্যা, গ্রেফতার, অবরোধ ইত্যাদিকে অন্তর্ভূক্ত করে।

হানাফীগণও নামায বর্জনকারীর পথমুক্ত করে দেন না। তারাও বন্দী ও মারের নির্দেশ দেন। যতক্ষন না তওবা করে অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শুধু তওবার সুযোগ দেন।

৩. ইবনে কাইয়্যিম র. এর প্রমাণ, আয়াতে কারীমা দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, যাকাত বর্জনকারীকেও হত্যা করতে হবে। অথচ ইমাম চতুষ্টয়ের কেউ এর প্রবক্তা নন। শুধু ইমাম মুহাম্মদ র. থেকে একটি দুর্বল বিবরণ রয়েছে। অতএব আপনাদের যে উত্তর সেটাই আমাদের উত্তর।

৪. ইমাম নববী র. আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, কিন্তু امرت ان اقاتل الناس দ্বারা নয়, বরং فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دمائهم واموالهم দ্বারা। কারণ, ذلك এর দ্বারা ইঙ্গিত হল, তিনটি জিনিসের দিকে- তাওবা, নামায কায়েম ও যাকাত দান। ইসমত তথা রক্ষাও তিন প্রকার। ১. عصمة الدم ২. عصمة المال ৩. عصمة الدم والمال তথা জান রক্ষা, মাল রক্ষা ও জান মাল উভয় রক্ষা। অতএব যদি শর্তে উপরোক্ত তিনটি জিনিস পাওয়া যায় তবে জান-মাল উভয়টি রক্ষা হবে, আর যাকাত না দিলে মাল রক্ষা হবে না। নামায তরক করলে জান রক্ষা হবে না।

উত্তর ঃ আমাদের নিকটও নামায বর্জনকারীর জান নিরাপদ থাকে না বা জান রক্ষা হয় না। লক্ষ করুন, حتى يتوب او يموت শব্দের দিকে। কামূস গ্রন্থকার মজদুদ্দীন সিরাজী র. المرقات الارفعية في طبقات الشافعية নামক গ্রন্থে ইমাম শাফিঈ ও আহমদ র. এর মুনাজারার বিবরণ দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ র. জিজ্ঞেস করেছেন, যদি নামায বর্জনকারী কাফির হয়, তবে তাকে পূনরায় মুসলমান কিভাবে বানাবেন? ইমাম আহমদ র. উত্তর দিলেন, তাকে ইসলামের কালিমা পড়াবে। ইমাম শাফিঈ র. বলেন, কালিমা তো সে পূর্ব থেকেই পড়ে। ইমাম আহমদ র. বলেন, নামায পড়ার নির্দেশ দিবে। ইমাম শাফিঈ র. বলেন, মুরতাদের নামায কিভাবে কবুল হবে? তখন ইমাম আহমদ র. নিরুত্তর হয়ে গেলেন। والله اعلم بالصواب

١٨. بَاب مَنْ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَقَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ عَنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَالَ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ .

১৮. পরিচ্ছেদ ঃ যে বলে 'ঈমান আমলেরই নাম'

আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে তোমাদের আমলের ফলস্বরূপ। (সূরা যুখরুফ ঃ ৭২)

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

সুতরাং কসম আপনার প্রতিপালকের। আমি তাদের সবাইকে প্রশ্ন করবই সে (لا اله الا الله) বিষয়ে। (সূরা হিজর ঃ ৯০)।

আল্লাহ তা'আলার এ বাণী সম্পর্কে আলিমদের একদল বলেন, لا اله الا الله -এর স্বীকারোক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ

এরূপ সাফল্যের জন্য আমলকারীদের উচিত আমল করা। (সূরা সাফফাত ঃ ৬১)

٢٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ.

২৫. আহমদ ইবনে ইউনুস ও মূসা ইবনে ইসমাঈল র. .... হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হল, 'কোন্ আমলটি উত্তম?' তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা।' প্রশ্ন করা হল, 'তারপর কোনটি?' তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহর পথে জিহাদ করা।' প্রশ্ন করা হল, 'তারপর কোনটি?' তিনি বললেন ঃ 'মকবূল হজ্জ।'

باب শব্দটি পরবর্তী বাক্যের দিকে মুযাফ। ইবারত হবে- هذا باب من قال الخ - উমদা।

যোগসূত্র ও লক্ষ-উদ্দেশ্য ঃ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে তাওবা, নামায কায়েম ও যাকাত আদায়ের বিবরণ ছিল। আর এগুলো হল আমল। তাওবা অন্তরের আমল, নামায কায়েম ও যাকাত আদায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল। বস্তুতঃ এ অনুচ্ছেদে আমলেরই বিবরণ রয়েছে। কারণ, ঈমান তো স্বয়ং আমলই। ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য, ঈমানের এককত্বের সমস্ত প্রবক্তাদের উক্তি খন্ডন করা। যারা আমলকে ঈমানের সাথে অসংশ্লিষ্ট সাব্যস্ত করেন। ইমাম বুখারী র. এ অনুচ্ছেদে সবার মতখন্ডন করেছেন। কাররামিয়া সম্প্রদায় শুধু উক্তিকে ঈমান বলে। জাহমিয়া শুধু মা'রিফাতকে, আর মুরজিয়া শুধু সত্যায়ন

বা আন্তরিক বিশ্বাসকে ঈমান বলে। ইমাম বুখারী র. বলেছেন, শুধু উক্তি ঈমান নয়। যতক্ষন পর্যন্ত অন্তরের কাজ অর্থাৎ, বিশ্বাস ও সত্যায়ন না হয়। এমনিভাবে শুধু মা'রিফাত ও সত্যায়ন যদি অনৈচ্ছিকভাবে হয়, তবে সেটা কখনোই ঈমান নয়। হ্যাঁ, ঐচ্ছিক সত্যায়ন বা বিশ্বাস যা কলবের কাজ সেটি ঈমান। অতএব বুঝা গেল, ঈমান আমলই। বরং সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ কলবের কাজ।

ঈমান আমল হওয়ার প্রথম দলীল ঃ সূরা যুখরুফের আয়াত, তিনি উল্লেখ করেছেন, تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِى الخ স্পষ্ট বিষয়, জান্নাতে প্রবেশ করবে ঈমানের কারণে। অতএব আয়াতের كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ এর অর্থ হবে, كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ

দুটি প্রশ্নোত্তর ঃ

প্রথম প্রশ্ন হল, এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, জান্নাতে প্রবেশের কারণ হবে আমল। অথচ বুখারী শরীফের রেওয়ায়াতে ইরশাদে নববী রয়েছে- لن يدخل احدكم عمله الجنة "তোমাদের কেউ শুধু নিজ আমলের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। বরং আল্লাহর অনুগ্রহে জান্নাতে যাবে।" অতএব আয়াত ও হাদীসে বিরোধ হয়ে গেল।

উত্তর ঃ আয়াতে কারীমায় بِمَا كُنْتُمْ শব্দে باء কারণের জন্য ব্যবহৃত হয়নি। বরং ملابست এর জন্য। আয়াত ও হাদীসে বিরোধ তখন হবে, যখন باء কে কারণের অর্থে ব্যবহার করা হবে। কারণ, কারণের উপর মুসাব্বাব বা কৃতের বাস্তবায়ন ঘটে দলীলরূপে। বস্তুতঃ ملابست এর ছুরতে কোন প্রশ্ন নেই। কারণ, এমতাবস্থায় بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ এর অর্থ হবে, সে সব আমলের সওয়াব ও ফল সহকারে তোমাদেরকে জান্নাতের মালিক বানানো হয়েছে।

এমনিভাবে باء কে যদি বিনিময় ও মুকাবিলার জন্য নেয়া হয়, তবুও বিরোধ থাকবে না। কারণ, তখন অর্থ হবে, জান্নাত তোমাদেরকে আমলের বিনিময়ে দেয়া হয়েছে। কারণ ও বিনিময় বা মুকাবিলার মধ্যে পার্থক্য হল, যেরূপভাবে কারণের উপর কৃত মওকুফ থাকে, মুকাবিলায় অনুরূপ নয়। কারণের সুরত তো হল, জান্নাত আমলের মুকাবিল বা বিনিময়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এটাকে আমলের উপর মওকুফ রাখেননি, পুরস্কার স্বরূপ দিয়েছেন।

২। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী র. বলেন, আমল দুই প্রকার। কোন কোন আমল হয়ে থাকে মকবূল, আর কোনটি অমকবূল। স্পষ্ট বিষয়, আমরা ত্রুটিপূর্ণ, আমাদের আমলও ত্রুটিপূর্ণ। অতএব আমাদের কোন আমল আল্লাহ অনুগ্রহ ব্যতীত মকবূল হতে পারে না। বস্তুতঃ জান্নাত মকবূল আমল ছাড়া অর্জিত হতে পারে না। অতএব জান্নাত মওকুফ হল, মকবূল আমলের উপর। আর আমলের কবূলিয়্যত মওকুফ হল, আল্লাহর অনুগ্রহের উপর। কাজেই জান্নাতে প্রবেশ মওকুফ হল, আল্লাহর অনুগ্রহের উপর। অতএব দুটি কথাই যথার্থ-আমলও, অনুগ্রহও। একটিকে আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, অপরটিকে হাদীসে। -ইমদাদ, ফাতহুল বারী ঃ ১/৭৩।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ আয়াতে কারীমায় বলা হয়েছে, اورثتموها অথচ وراثت তথা উত্তরাধিকার শব্দটির প্রয়োগ সে জিনিসের ক্ষেত্রে হয় যেটি মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যাওয়া হয়। জান্নাত কারো মালিকানা নয় যে, তার ইনতিকালের পর উত্তরাধিকারীদেরকে দেয়া যায়। জান্নাত তো আল্লাহর মালিকানা।

উত্তর ঃ ১. এখানে উপমা স্বরূপ وراثت শব্দ ব্যবহায় করা হয়েছে। যেমনিভাবে উত্তরাধিকার অকাট্য জিনিস, কারো কাছ থেকে ফেরত নেয়া যায় না, উত্তরাধিকার লাভের পর তার ব্যবহারে পরিপূর্ণরূপে স্বাধীন হয়ে থাকে, এরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জান্নাতীদেরকে চিরস্থায়ীভাবে

স্বাধীনভাবে ব্যবহারের এখতিয়ার দেয়া হয়। এরপর আর তাদের কোন প্রকার পাবন্দি নেই। যেমন, ইরশাদে ইলাহী রয়েছে-

وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ. جزء ٢٤ ركوع ١٨

অর্থ ঃ "তোমাদের জন্য এ জান্নাতে রয়েছে সে সব জিনিস যেগুলোর প্রতি তোমরা আগ্রহী হবে এবং তাতে সে সব জিনিসও থাকবে যা তোমরা চাবে।"

অর্থাৎ, সে জিনিসের চাহিদা ও আগ্রহ হবে বা যা তলব করবে সব পাবে। যেন, এই উপমা শুধু স্থায়িত্বে। -উমদা।

২। এখানে কাফিরকে মুরিস তথা উত্তরাধিকারী বানানেওয়ালা সাব্যস্ত করা হয়নি। হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, প্রতিটি ব্যক্তির জন্য জান্নাতে একটি বাড়ী আছে, অনুরূপ জাহান্নামেও একটি। মুমিন যখন জান্নাতে যাবে তখন স্বীয় স্থান কব্জা করবে এবং কাফিরদের জায়গাও করায়ত্ব করে নিবে। কারণ, কাফির কুফরীর কারনে জান্নাত থেকে বঞ্চিত রয়েছে। মুসলমান তার উত্তরাধিকারী হয়ে যাবে। এ ছুরতটিকেই ঈরাস তথা ওয়ারিস বানানো দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এমনিভাবে নিম্নে বর্ণিত আয়াত দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ اَىْ عَنْ قَوله لاَ الهَ الاَّ الله

এখানে উক্তি দ্বারা ব্যাপক উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, আন্তরিক উক্তি তথা আন্তরিক বিশ্বাস ও আকীদা আর মৌখিক উক্তি তথা স্বীকারোক্তি। উদ্দেশ্য পরিস্কার। সেটি হল, ঈমান।

৩। সূরা সাফফাতের আয়াত- لِمِثْلِ هذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ اَىْ فَلْيُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُوْنَ এর দ্বারা ঈমান আমল হওয়া প্রমাণিত হয়।

তাছাড়া আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারাও এটাই প্রমাণ করতে চান। এর পদ্ধতি হল, প্রশ্ন হয়েছে, اى العمل أفضل؟ এর উত্তরে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ রয়েছে, ايمان بالله ورسوله এর দ্বারা পরিস্কার বুঝা গেল ঈমান হল আমল।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল স্পষ্ট। সেটা হল, ঈমানের ক্ষেত্রে আমলের প্রয়োগ।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, কিতাবুল ঈমান ঃ ৮, কিতাবুল মানাসিক ঃ ২০৬, মুসলিম, কিতাবুল ঈমান ঃ ৬২ ইত্যাদি।

ব্যাখ্যা ঃ

হাদীস শরীফে আছে- اي العمل افضل তথা কোন আমল শ্রেষ্ঠ? প্রশ্নকর্তা হলেন, হযরত আবূ যর রা.। এর উত্তরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ايمان بالله তথা সমস্ত আমলে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও রাসূলের প্রতি ঈমানই উত্তম। এর দ্বারা পরিস্কার বুঝা যায়, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রতি ঈমানকে আমল সাব্যস্ত করেছেন। তাছাড়া ঈমান ও আমলের সাথে ওতপ্রোত সম্পর্ক প্রমাণিত হয়ে গেছে। কারণ, কোথাও কোথাও আমলের প্রয়োগ ঈমানের ক্ষেত্রে, আবার কোথাও ঈমানের প্রয়োগ আমলের ক্ষেত্রে হয়েছে।

একটি প্রশ্নোত্তর ঃ প্রশ্নটি হল, প্রশ্ন একটি হওয়া সত্তেও উত্তর বিচিত্র ধরণের কেন?

উত্তর ঃ ১. এই বৈচিত্র প্রশ্নকর্তা অথবা অবস্থা বা স্থান কালের বৈচিত্রের কারণে হয়েছে।

২। অথবা সর্বত্র من শব্দটি উহ্য মানা হবে। অর্থাৎ, এটিও উত্তম আমল, আবার সেটিও উত্তম আমল।

١٩ . بَاب إِذَا لَمْ يَكُنْ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَة وَكَانَ عَلَى الِاسْتِسْلَامِ أَوْ الْخَوْفِ مِنْ الْقَتْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى قَالَتْ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَة فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ .

১৯. পরিচ্ছেদ ঃ ইসলাম গ্রহণ যদি খাঁটি না হয় বরং বাহ্যিক আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য বা হত্যার ভয়ে হয়, তবে তার ইসলাম গ্রহণ মহান আল্লাহর এ বাণী অনুযায়ী হবে ঃ

قَالَتْ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا —

'আরব বেদুঈনরা বলে, আমরা ঈমান আনলাম; আপনি বলে দিন, 'তোমরা ঈমান আননি; বরং তোমরা বল, 'আমরা বাহ্যত মুসলিম হয়েছি।' (৪৯ ঃ ১৪)

আর ইসলাম গ্রহণ খাঁটি হলে তা হবে আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী অনুযায়ী

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

'নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন।' (৩ ঃ ১৯)

قوله باب শব্দটি তানভীন সহকারে। এটি উহ্য মুবতাদার খবর। অর্থাৎ, هذا باب আর যদি ইসলাম স্বীয় প্রকৃত অর্থে তথা শরঈ অর্থে ব্যবহৃত না হয়, শুধু বাহ্যিক আনুগত্য তথা আভিধানিক অর্থের উপর থাকে, অথবা হত্যার ভয়ে ইসলাম গ্রহন করে, তবে তা ধর্তব্য ও উপকারী হবে না (মানে আখিরাতে) কারণ, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ রয়েছে, বেদুঈনরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি, হে নবী! আপনি বলে দিন, তোমরা ঈমান আননি। তবে বল, আমরা মুসলমান হয়েছি। কিন্তু ইসলাম যখন প্রকৃত অর্থে তথা শরঈ অর্থে ব্যবহৃত হবে, তখন সে ইসলাম উদ্দেশ্য হবে, যেটি সূরা আলে ইমরানের এ আয়াতে উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট (আসল) দীন হল, ইসলামই।

যোগসূত্র ঃ পূর্বের অনুচ্ছেদে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমানের বিবরণ ছিল। এবার এ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করছেন যে ধর্তব্য ঈমান কোন টি?

٢٦ . حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُّ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسْلِمًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي وَعَادَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا سَعْدُ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ وَرَوَاهُ يُونُسُ وَصَالِحٌ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ.

২৬. আবুল ইয়ামান র. .... হযরত সা'দ রা. থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোককে কিছু দান করলেন। সা'দ রা. সেখানে বসে ছিলেন। সা'দ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এক ব্যক্তিকে (জুয়াইল ইবনে সুরাকা রা.কে) কিছু দিলেন না। সে ব্যক্তি আমার কাছে তাদের চেয়ে অধিক পসন্দনীয় ছিল। তাই আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুককে আপনি বাদ দিলেন কেন? আল্লাহর কসম! আমি তো তাকে মু'মিন বলেই জানি। তিনি বললেন- (মু'মিন) না মুসলিম? তখন আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি, তা প্রবল হয়ে উঠল। তাই আমি আমার কথা আবার বললাম, আপনি অমুককে প্রদানের ব্যাপারে বিরত রইলেন? আল্লাহর কসম! আমি তো তাকে মু'মিন বলেই জানি। তিনি বললেন ঃ 'না মুসলিম?' তখন আমি কিছুক্ষণ নীরব থাকলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তা প্রবল হয়ে উঠল। তাই আমি আমার কথা পুনরায় বললাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারও সে উত্তর দিলেন। তারপর বললেন ঃ 'সাদ! আমি কখনো ব্যক্তি বিশেষকে দান করি, অথচ অন্য লোক আমার কাছে তার চাইতে বেশী প্রিয় হয়ে থাকে। তা এ আশঙ্কায় যে (সে ঈমান থেকে ফিরে গোমরাহ হয়ে যেতে পারে), আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

এ হাদীস ইউনুস, সালিহ, মা'মার এবং যুহরী র.-এর ভাতিজা যুহরী র. থেকে (শু'আইবের ন্যায়) বর্ণনা করেছেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ৯, যাকাত ঃ ২০০, মুসলিম, ঈমান ঃ ৮৫, যাকাত, এমনিভাবে আবূ দাঊদেও হাদীসটি আছে।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন,

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهي ان الاسلام ان لم يكن على الحقيقة لا يقبل فلذلك قال عليه السلام او مسلما لان فيه النهي عن القطع بالايمان لانه باطن لا يعلمه الا الله والاسلام معلوم بالظاهر.

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল স্পষ্ট। সেটি হল, ইসলাম যদি প্রকৃত অর্থে না হয়, তবে তা গ্রহণ করা হবে না। এজন্য রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম او مسلما শব্দ বলেছেন, কারণ তাতে সুনিশ্চিতভাবে ঈমানের কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এটি বাতিনী জিনিস। তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেনা। পক্ষান্তরে ইসলাম হল, বাহ্যিক জানা জিনিস।

يعني لاراه مؤمنا فقال او مسلما এর সাথে শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। কারণ, হযরত সা'দ রা. কসম খেয়ে মুমিন বলেছিলেন। এজন্য রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, ঈমান বলে আন্তরিক বিশ্বাস ও আভ্যন্তরীন আনুগত্যকে। যার জ্ঞান শুধু মাত্র আল্লাহরই আছে যে, এই আনুগত্য ও ইসলাম প্রকৃত না বাহ্যিক। হ্যাঁ, তোমরা বাহ্যিক আনুগত্যের ফলে মুসলিম বলতে পার। শিরোনামের সারমর্ম তাই যে, ইসলামের দুটি অর্থ আছে, একটি প্রকৃত ও বাস্তব, আর অপরটি বাহ্যিক। অতএব মিল স্পষ্ট।

২। শিরোনাম ছিল, যখন ইসলাম প্রকৃত অর্থে এবং বাস্তবতার নিরীখে সহীহ হবে না, তখন সেটি পরকালে ধর্তব্য হবে না। অর্থাৎ, এটি মুক্তিদায়ক হবে না। অতএব হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হল যে, এরূপ ইসলাম ঈমান থেকে ভিন্ন জিনিস হবে।

ব্যাখ্যা ঃ এই শিরোনাম দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ঈমান ও ইসলামের মাঝে সম্পর্কের বিবরণ দান ও একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান।

প্রশ্ন ঃ প্রশ্ন হল,

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا لَمْ يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ

দ্বারা বুঝা যায়, ঈমান ও ইসলাম একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।

আর দ্বিতীয় আয়াত- اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ দ্বারা প্রমাণিত হয়, উভয়টি এক।

উত্তর ঃ ইসলামের একটি হল, ছুরত বা কায়া, আর অপরটি হল রূহ। অতএব ইসলামের শুধু রূপ হল, ঈমান থেকে আলাদা। আর ইসলামের রূহ হল, হুবহু ঈমান। অতএব قَالَتِ الْاَعْرَابُ الخ আয়াতে ঈমানের ছুরত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, যখন আন্তরিক বিশ্বাস থাকবে না, বরং হত্যার ভয়ে বা কোন কিছুর লোভে আনুগত্য প্রকাশ করা হয়, তবে সেটি পরকালে উপকারী হবে না। পক্ষান্তরে اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامَ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, প্রকৃত ইসলাম। অর্থাৎ, যখন অন্তরেও বিশ্বাস থাকে।

قالت الاعراب الخ দ্বারা বাস্তবে কারা উদ্দেশ্য?

এব্যাপারে দুটি উক্তি রয়েছে। ১. তারা ছিল, মুনাফিক, ২. তারা ছিল মুমিন, কিন্তু তখন পর্যন্ত তাদের অন্তরে ঈমান সুদৃঢ় হয়নি।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে হযরত সা'দ রা. এর উক্তি فوالله اني لاراه مؤمنا এর উত্তরে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ- او مسلما ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য সাব্যস্ত করে। অতএব এখানেও ইসলামের রূপ উদ্দেশ্য। অন্যথায় প্রকৃত ইসলাম ঈমান থেকে ভিন্ন।

এখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদবের পন্থা শিক্ষা দিচ্ছেন যে, অদৃশ্য বিষয়াবলী সম্পর্কে বিশেষতঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে সুনিশ্চিত হুকুম আরোপ করা আদবের পরিপন্থী। যেমন, হযরত আয়েশা রা. একটি শিশুর মৃত্যুতে বলেছিলেন, عصفور من عصافير الجنة ফলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে সতর্ক করলেন, অথচ বাস্তবে বিষয়টি সহীহ। কিন্তু অদৃশ্য বিষয়াবলীতে এরকমভাবে সুদৃঢ় ও অকাট্য হুকুম দেয়া আদবের পরিপন্থী। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- ومن تكلم في القرآن برأيه فاصاب فقد أخطأ

কাজেই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী- أو مسلما দ্বারা এ ভুল ধারনা যেন না হয় যে, এ ব্যক্তির ঈমানে কিছুটা সন্দেহ ছিল। তাঁর নাম জুয়াইল ইবনে সুরাকা আয যামরী রা. যিনি ছিলেন সুমহান মুহাজির সাহাবী।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র তাঁর বহু প্রশংসা করেছেন, হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী র. বলেন-

ورويناه في مسند محمد بن هارون الروياني وغيره باسناد صحيح الى ابى سالم الجيشاني عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كيف ترى جعيلا؟ قال قلت كشكله من

الناس يعني من المهاجرين قال كيف ترى فلانا؟ قال قلت سيد من سادات الناس، قال فجعيل خير من ملأ الارض من فلان.

'হযরত আবূ যর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি জুয়াইলকে কিরূপ মনে কর? তিনি বলেন, আমি বললাম, মুহাজির অনুরূপ লোকের মত। তিনি বললেন, অমুককে কিরূপ মনে কর, বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, তিনি লোকজনের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। তখন তিনি বললেন, তাহলে জুয়াইল অমুকের মত পৃথিবীপূর্ণ মানুষ থেকে উত্তম। - ইরশাদুল কারী।'

একটি প্রশ্নোত্তর ঃ প্রশ্নটি হল, যেহেতু সুনির্ধারিত ও অকাট্যভাবে হুকুম আরোপ করতে প্রথম বারেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন এবং এই শিরোনাম পাল্টানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেহেতু দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার হযরত সা'দ রা. এ ব্যাপারে ধৃষ্টতা কিভাবে দেখালেন?

উত্তর ঃ হযরত সা'দ রা. এর অন্তরে এ ব্যক্তি সম্পর্কে তার বাহ্যিক অবস্থা শরীয়তের অনুকুল দেখে তিনি সুধারণা পোষন করেছেন। অথবা তার কল্যান ও নেকীর প্রতি অন্তর এতটা মশগুল ছিল, যার ফলে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদের দিকে তার মনই পুরাপুরি আকৃষ্ট হয়নি। যেন হযরত সা'দ রা. তাঁর এই ধারণার প্রবলতার কারণে এক ধরণের মা'যূর ছিলেন। ইরশাদে নববীর প্রতি পরিপূর্ণরূপে মনযোগী হতে পারেননি। কিন্তু এই বারবার অনুরোধ এবং বাহ্যিক বাদানুবাদ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অপছন্দনীয় হয়। এজন্য মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, !اقتالا ياسعد তথা সা'দ! সুপারিশ করছ, না লড়াই করছ?

٢٠. بَاب إِفْشَاءُ السَّلَامِ مِنْ الْإِسْلَامِ وَقَالَ عَمَّارٌ ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ وَالْإِنْفَاقُ مِنْ الْإِقْتَارِ.

২০. পরিচ্ছেদ ঃ সালামের প্রচলন দান ইসলামের অন্তর্ভুক্ত

আম্মার রা. বলেন, 'তিনটি গুণ যে আয়ত্ত করে, সে (পূর্ণ) ঈমান লাভ করে ঃ ১. নিজ থেকে ইনসাফ করা, ২. বিশ্বে সালামের প্রচলন দান, এবং ৩. অভাবগ্রস্ত অবস্থায়ও দান করা।

٢٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ .

২৭. কুতায়বা র. .... আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, 'ইসলামের কোন কাজ সবচাইতে উত্তম?' তিনি বললেন ঃ তুমি লোকদের আহার করাবে এবং পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সবাইকে সালাম করবে।

باب তানভীন সহকারে। অর্থাৎ, هذا باب সালামের প্রচার-প্রসার (সালামের প্রচলন দান) ইসলামের একটি শাখা। হযরত আম্মার রা. বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি জিনিস একত্রিত করেছে, সে ঈমান পূর্ণাঙ্গ করে নিয়েছে। নিজের নফসের প্রতি ইনসাফ করা, বিশ্বজগতে সালামের প্রসার ঘটানো ও দরিদ্রতা সত্তেও আল্লাহর পথে ব্যয় করা।

যোগসূত্র ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন, পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল, ان الدين هو الاسلام আর ইসলামকে পূর্ণাঙ্গতা দানের জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য ও আমলের প্রয়োজন। এবার এ হাদীসে সে সব গুনাবলীর বিবরণ দেয়া হচ্ছে।

وقال عمار الخ ইমাম বুখারী র. হযরত আম্মার রা. এর রেওয়ায়াত মাওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যেহেতু এটি বিবেক দ্বারা অনুধাবনযোগ্য নয়, সেহেতু এটি মারফূ'র পর্যায়ভূক্ত। তাছাড়া এর অনেক প্রমাণও আছে।

হযরত আম্মার রা. বলেন, তিনটি বিষয় (তিনটি নৈতিক চরিত্রের বিষয় রয়েছে) কেউ এগুলোর সমন্বয় ঘটালে সে ঈমানকে পূর্ণাঙ্গ করে দিবে। ১. নিজের আত্মার প্রতি ইনসাফ করা, এখানে من শব্দটি ইবতিদাইয়্যাহ, অর্থাৎ, নিজের নফসের প্রতি ইনসাফ করা। নিজের অন্তর থেকে আমলের খোজ খবর নেয়া। চাই আল্লাহর হক সংক্রান্ত হোক, বা বান্দার হক সংক্রান্ত।

হাফিজ আসকালানী র. বলেন,

اذا اتصف العبد بالانصاف لم يترك لمولاه حقا واجبا عليه الا اداه ولم يترك شيئا مما نهاه عنه الا اجتنبه وهذا يجمع اركان الايمان. فتح البارى

উদ্দেশ্য হল, সমস্ত আদিষ্ট বিষয় আদায় করতে হবে, সমস্ত নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এমতাবস্থায় যে, ফায়েল বা কর্তা হবে অর্থগতভাবে ইনসাফের। অর্থাৎ, الانصاف الناشي من نفسك উদ্দেশ্য হল, ইনসাফ তার স্বভাবজাত জওহর ও শক্তি হয়ে যাবে। কোন ভয়, লোভ, ভালবাসা ও সুসম্পর্ক আর নাম প্রদর্শনের জন্য হবেনা।

من শব্দটি في এর অর্থে এবং مع এর অর্থেও হতে পারে। মানে নিজের নফসের ব্যাপারে ইনসাফ কর। অর্থাৎ, যেরূপ লোকজনের ব্যাপারে ইনসাফ করে, এরূপভাবে নিজের নফসের ব্যাপারে হলেও ইনসাফ করবে। যদি কারো উপর জুলুম করে অথবা কাউকে কষ্ট দেয় তবে নিজেকে পেশ করে দিবে যে, আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নাও।

২. بذل السلام للعالم মানে প্রতিটি মুসলমানকে সালাম করা, নিজস্ব লোক হোক অথবা অপরিচিত। চেনা জানা হোক অথবা অচেনা জানা। শুধু মুসলমান হওয়ার কারণে সালাম করবে। মুসলমানকে বিশেষভাবে খাস করার কারণ হল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, لا تبدؤا اليهود ولا النصارى بالسلام. عمدة. অর্থাৎ, ইয়াহুদী খ্রিষ্টানদেরকে আগে সালাম দিওনা। -উমদা।

সালাম সংক্রান্ত কিছু মাসায়িল ঃ

সালাম এরূপভাবে দিতে হবে যাতে শ্রোতা ভাল করে শুনে। সুন্নত তরীকা হল, হাতের ইঙ্গিত ব্যতীত السلام عليكم বলা, যদি এর সাথে ورحمة الله وبركاته ومغفرته বাড়িয়ে বলে, তবে দশ দশটি করে নেকী পাবে।

চিঠিপত্রে السلام عليكم এর পরিবর্তে সালাম মাসনূন লেখার ফলে পূর্ণ সুন্নাতের উপর আমল হবে না। তিরমিযীর এক হাদীসে আছে, এক সাহাবী রা. عليك السلام يا رسول الله! বললে নবী কারীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এটি মৃতদের সালাম ও মুবারকবাদ। তোমরা পরস্পরে বলবে, السلام عليكم

ব্যাখ্যাতাগণ লিখেছেন, এর দ্বারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম ও পূর্ণাঙ্গতর পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, এটি সালাম হবে না।

وعليكم السلام বলার সময় হাতের দ্বারা ইঙ্গিতও করা যায়। তবে শুধু ইঙ্গিত সালাম হতে পারে না। আসসালামু আলাইকুমের জবাব তৎক্ষনাৎই দিতে হবে। যদি দেরি করে উত্তর দেয়, তবে উত্তর বর্জনের গুনাহ হবে।

যদি সাক্ষাতে আসসালামু আলাইকুম এবং ওয়াআলাইকুমুস সালাম হয়ে যায় এবং সামান্য কিছুক্ষনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এরপর সাক্ষাত ঘটে তবে পুনরায় সালাম দেয়া সুন্নত এবং সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব। -ফযলুল বারী।

৩. الانفاق من الاقتار - من শব্দটি مع অথবা عند অথবা في এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। اقتار এর অর্থ মুখাপেক্ষী হওয়া। আর্থিক সংকট সত্তেও বা আর্থিক সংকটকালে কিংবা আর্থিক সংকট ও দুর্ভিক্ষের সময় খরচ করা ঈমানের পূর্ণাঙ্গতার প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِه فَاُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وقال تعالى وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُه فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاه اللهُ. سورة الطلاق

যার আয় কম তার উচিত আল্লাহ তা'আলা যতটুকু দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করা।

হযরত আম্মার রা.

নাম হল, আম্মার। মীমের উপর তাশদীদ। তাঁর উপনাম হল, আবুল ইয়াকজান, পিতার নাম ইয়াসির, মাতার নাম সুমাইয়্যা রা.। হযরত আম্মার রা. মাতা পিতা সহ আগের দিকে ইসলাম গ্রহন করেছেন। হযরত আম্মার ও সুহাইব রা. উভয়ে একইসাথে দারে আরকামে উপস্থিত হয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। -ত্বাবাকাতে ইবনে সা'দ ঃ ৩য় খণ্ড।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. এর সম্মানিতা জননী হযরত সুমাইয়া রা.কে ইসলাম গ্রহণের অপরাধে অভিশপ্ত আবু জেহেল এরূপভাবে বর্ষা নিক্ষেপ করেছিল যার ফলে তিনি শহীদ হয়ে যান। কিন্তু ইসলাম থেকে তিনি সরেন নি। তিনি হলেন, ইসলামের সর্বপ্রথম শহীদ। হযরত আম্মার রা. ও তাঁর পিতাকে ভীষন কষ্ট দেয়া হয়েছে। প্রচন্ড গরম প্রস্তরময় ভূমিতে শুইয়ে দেয়া হত, প্রচন্ড গরমের ফলে হুশ হারিয়ে ফেলতেন। একবার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে দিক দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি বললেন, صبرا آل ياسر! فان موعدكم الجنة. -উমদা।

একবার জালিমরা তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করে। তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত ফিরিয়ে দু'আ করলেন-

يانار كوني بردا وسلاما على عمار كما كنت على ابراهيم عـــ تقتلك الفئة الباغية

"হে আগুন! আম্মারের ক্ষেত্রে ঠান্ডা ও প্রশান্তিদায়ক হয়ে যাও, যেমন হয়েছিলে হযরত ইবরাহীম আ. এর ক্ষেত্রে। আম্মার! তোমাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।"

ওফাত ঃ সিফফীনের যুদ্ধে হযরত আম্মার রা. হযরত আলী রা. এর সাথে ছিলেন, এই সিফফীনের যুদ্ধে ৩৭হিজরীতে তিনি শহীদ হয়েছেন। তখন হযরত আম্মার রা. এর বয়স ছিল ৯৪ বছর। সেখানেই তিনি সমাহিত হন। হযরত আলী রা. তাঁর জানাযা নামায পড়ান।

তাঁর সূত্রে সর্বমোট ৬২টি হাদীস বর্ণিত আছে। ২টি হাদীসের ব্যাপারে ইমাম বুখারী ও মুসলিম একমত। স্বতন্ত্রভাবে বুখারীতে ৩টি রেওয়ায়াত আছে, আর মুসলিমে স্বতন্ত্র রেওয়ায়াত আছে ১টি। -উমদা।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ৬, ৯, ইসতিযান ঃ ৯২১।

অবশিষ্ট ব্যাখ্যার জন্য **১১** নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

٢١. بَاب كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضـــ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২১. পরিচ্ছেদ ঃ স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা। আর এক কুফর (এর স্তর) অন্য কুফর থেকে ছোট। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে।

بَاب - بَاب اي هذا باب في بيان كفران العشير الخ - শব্দটি পরবর্তী শব্দের দিকে মুযাফ। এ হাদীসটি হযরত আবূ সাঈদ রা. থেকে মুত্তাসিলরূপে কিতাবুল হায়েযে (৪৪) আসবে।

٢٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـــ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ .

২৮. আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসলামা র. .... হযরত ইবনে ‘আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়। (আমি দেখি), তার অধিবাসীদের অধিকাংশই মহিলা; (কারণ,) তারা কুফরী করে। জিজ্ঞেস করা হল, ‘তারা কি আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করে?’ তিনি বললেন ঃ (না) ‘তারা স্বামীর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং অনুগ্রহ অস্বীকার করে।’ তুমি যদি দীর্ঘকাল তাদের কারো প্রতি অনুগ্রহ করতে থাক, এরপর সে তোমার সামান্য কিছু অপছন্দনীয় দেখলেই বলে, ‘আমি কখনো তোমার নিকট থেকে সদ্ব্যবহার পেলামনা।’

যোগসূত্র ঃ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদগুলোতে ঈমানের বিভিন্ন স্তরের বিবরণ ছিল। এবার এ অনুচ্ছেদে বলতে চান যে, ঈমানের পরিপন্থী ও বিপরীত বিষয় কুফরেরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। وبضدها تتبين الاشياء তথা প্রতিটি জিনিসকে তার বিপরীত জিনিসের মাধ্যমে চেনা যায়।

২. যোগসূত্রের বিবরণ এভাবেও দেয়া যায় যে, ইমাম বুখারী র. যেরূপভাবে পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে বলেছিলেন যে, ইসলাম শব্দ কখনো প্রকৃত ইসলামের অর্থেও ব্যবহৃত হয়, তথা শরঈ অর্থে, এরূপভাবে কখনো কখনো বাহ্যিক আনুগত্যের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মুক্তি নির্ভর করে শরঈ ইসলামের উপর ।

শুধু বাহ্যিক আনুগত্যের উপর নয়। এমনিভাবে এ অনুচ্ছেদে বলতে চান যে, কুফরের প্রয়োগও দুটি অর্থের ক্ষেত্রে হয়, কখনো প্রকৃত ও শরঈ কুফরের ক্ষেত্রে, আবার কখনো নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতার ক্ষেত্রে। কিন্তু চিরস্থায়ী জাহান্নামে নেয়ার বিষয় হল, প্রকৃত ও শরঈ কুফর, নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা নয়।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল يكفرن العشير বাক্যে স্পষ্ট

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ঈমান ঃ ৯, সালাত ঃ ৬২, ১০৩, নিকাহ ঃ ৭৮২-৭৮৩।

শব্দরাজির ব্যাখ্যা ঃ

كفران العشير ঃ كفران ও كفر উভয়টি মাসদার বা ক্রিয়ামূল। باب نصر থেকে। এর আভিধানিক অর্থ হল, কোন কিছু গোপন করা। কাফিরকে এজন্য কাফির বলে যে, সে স্বীয় অন্ধকারে বিভিন্ন জিনিস গোপন করে ফেলে। একজন কৃষককেও আভিধানিকভাবে কাফির বলা হয়। কারণ, সে জমিনে বীজ গোপন করে। এটাকেই কেউ বলেছেন- رايت الكافر يكفر في كافر অর্থাৎ, আমি এক কৃষককে দেখেছি রাত্রে ক্ষেতে বীজ বপন করছে। অর্থাৎ, জমিনে বীজ গোপন করছে। এ হিসেবে কুফরে নেয়ামত ও কুফরানে নেয়ামতের অর্থ আসে, শোকরিয়া আদায় না করে নেয়ামত গোপন করা। কিন্তু কুফরান শব্দটির ব্যবহার অধিকাংশ সময় নেয়ামতের না শোকরির ক্ষেত্রে হয়, আর কুফর শব্দের ব্যবহার প্রকৃত কুফর ও নেয়ামতের না শোকরি উভয়ের ক্ষেত্রে সমানভাবে হয়ে থাকে।

عشير মানে معاشر তথা জীবনসঙ্গী। যার সাথে জীবন কাটানো হয়। এখানে উদ্দেশ্য হল, স্বামী।

كفر دون كفر শব্দটির আত্‌ফ كفران এর উপর। এ কারণে প্রথম কুফর শব্দটিতে যের। دون كفر মুরাক্কাবে ইযাফী। دون শব্দটি যরফ হিসেবে মানসূব।

কেউ কেউ كفر دون كفر শব্দে প্রথম কুফরটিকে মারফূ' পড়েছেন। এমতাবস্থায় ই'রাব হবে হেকায়ী। কারণ, এটি হযরত আতা ইবনে আবু রাবাহ র. এর উক্তি।

সারকথা, কুফর শব্দটি প্রকৃত কুফরের অর্থেও আসে, আবার নেয়ামতের না শোকরির অর্থেও। মানে এক হল, ধর্মের কুফরী, আরেক হল নেয়ামতের কুফরী। প্রকৃত কুফরীর কারণে মানুষ ঈমান ও ধর্মের গন্ডি থেকে বের হয়ে যায়, আর নেয়ামতের না শোকরির ফলে ঈমান থেকে খারিজ হয় না। এজন্য স্বামীর না শোকরিকে ইমাম বুখারী র. كفر دون كفر দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

আল্লামা আইনী র. বলেন, আল্লাহর সাথে কুফরী অর্থাৎ, প্রকৃত কুফরী চার প্রকার।

১. كفر انكار ২. كفر جحود ৩. كفر عناد ৪. كفر نفاق

এ চারটি প্রকৃত কুফর। কুফরুল মিল্লাতে যারা লিপ্ত হবে এর উপর যদি তাদের জীবনাবসান ঘটে তবে তার মাগফিরাত হতেই পারে না।

كفر انكار অর্থাৎ, আন্তরিক বিশ্বাসও নেই, আবার মৌখিক স্বীকারোক্তিও নেই। সর্বদিক দিয়ে আল্লাহকে অস্বীকারকারী। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

كفر جحود মানে অন্তরে ইয়াকীন রয়েছে, কিন্তু মৌখিক স্বীকারোক্তি নেই। যেমন ইবলিস প্রমুখের কুফর।

كفر عناد মানে আন্তরিক মা'রিফাত এবং মৌখিক স্বীকারোক্তি উভয়টি আছে, কিন্তু একত্ববাদের প্রতি ঈমান কবূল করেনি। চাই সম্পদ ও প্রতিপত্তির কারণে হোক, যেমন, হিরাক্লিয়াস, বা পিতা প্রপিতাদের অনুসরণের কারণে, যেমন, আবু তালিবের কুফর।

كفر نفاق মানে মৌখিক স্বীকারোক্তি করবে, কিন্তু অন্তরে অস্বীকার করবে। যেমন, মুনাফিকদের কুফরী।

دون এর অর্থ ঃ دون শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনো غير এবং سوى অর্থে আর কখনো ادون ও اقل এর অর্থে। অভিধানে এ দ্বিতীয় অর্থটি আসল মনে হয়। এজন্য ইমাম রাগিব র. বলেছেন, دون এর অর্থ হল, القاصر من الشيئ তথা নিম্নস্তরের ও কমমর্তবা সম্পুন্ন জিনিস। এটাই প্রধান। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

اِنَّ اللّٰہَ لاَ یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَكَ بِہٖ وَیَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ یَّشَاءَ

অতএব كفر دون كفر এর অর্থ হল, বড় কুফরের তুলনায় নিম্নস্তরের। এতে প্রমাণিত হল, কুফরের বিভিন্ন স্তর থাকে।

واما الكفر الذى هو دون ما ذكرنا فالرجل يقر بالوحدانية والنبوة بلسانه يعتقد ذلك بقلبه لكنه يرتكب الكبائر الخ. عمدة.

অর্থাৎ, সে কুফর যেটি কুফরের উপরোক্ত প্রকারগুলোর চেয়ে নিম্নস্তরের। তথা অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস রয়েছে, মৌখিক স্বীকারোক্তিও আছে, কিন্তু কবীরা গুনাহেও লিপ্ত হয়। যেমন, হত্যা করা, স্বামীর না শোকরি করা ইত্যাদি। যেমনিভাবে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে ও শিরোনামে রয়েছে।

فيه عن ابي سعيد الخ ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য হল, এ অনুচ্ছেদের অধীনে সে রেওয়ায়াতটিও আছে যেটি কিতাবুল হায়েযে আসছে- প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে বলেছেন, يا معشر النساء! تصدقن، فاني اريتكن اكثر اهل النار الخ দ্রষ্টব্য ঃ বুখারী ১/৪৪।

قيل ايكفرن بالله الخ এ হাদীস দ্বারাও এটাই প্রমানিত হয় যে, এখানে কুফরের সে স্তর উদ্দেশ্য নয়, যেটি ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে দেয়, মুক্তির জন্য প্রতিবন্ধক হয়, বরং এর চেয়ে নিম্নস্তরের কুফর উদ্দেশ্য। যেটি ঈমানের পরিপন্থী নয়।

প্রশ্ন ঃ এখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়েছে। তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠই ছিল মহিলাদের। অপর হাদীসে রয়েছে, জান্নাতে প্রতিটি জান্নাতি ব্যক্তিকে দু জন করে রমনী দেয়া হবে। এর দ্বারা বুঝা যায়, জান্নাতে বেশীর ভাগ মহিলা হবে।

হাফিজ ইবনে হাজার র. এর উত্তর দিতে পারেন নি।

হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী র. তার উত্তরে বলেছেন, এই দু স্ত্রী হবে জান্নাতের হুর। যেমন, সহীহ বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, لكل امرء زوجتان من الحور العين.

২। আরেকটি উত্তর দেয়া হয়েছে যে, প্রথম যুগে স্বামীর অকৃতজ্ঞতা ইত্যাদির কারণে জাহান্নামে মহিলাদের সংখ্যা গরিষ্ঠ হবে। কিন্তু যেহেতু তারা ঈমানদার হবে এজন্য শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে প্রবেশ করবে। ফলে জান্নাতে মহিলা বেশী হবে।

৩। যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করা হয়, তবে শর্ত সাপেক্ষ্যে চার রমনী বিয়ের অনুমতিতে একটি সুক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে, নারী সৃষ্টি ও তাদের সংখ্যাধিক্যের দিকে। -ইমদাদুল বারী। والله اعلم

পূনরাবৃত্তি ছাড়া বুখারীর রেওয়ায়াত সংখ্যা ঃ

আল্লামা আইনী র. এখানে এটাও লিখেছেন যে ইমাম বুখারী র. এখানে হযরত ইবনে আববাস রা. এর হাদীসের একটি অংশ বর্ণনা করেছেন। অন্যত্র এ সূত্রে পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই অংশত বিবরণ দ্বারা ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রকার শিরোনাম কায়েম করে প্রভূত ফায়দা উৎসারণ করা। তাঁর এ কর্ম এজন্য প্রশ্ন সাপেক্ষ নয় যে, তিনি এরুপভাবে হাদীসে সংক্ষেপ করেন, যারফলে অর্থে কোন ফাসাদ বা সমস্যা না হয়। অতঃপর লিখেছেন, এরূপভাবে বিভিন্ন টুকরোর কারণে কোন কোন হিসাবকারী সহীহ বুখারীর পূর্ণ হাদীস সংখ্যা পূনরাবৃত্তি ছাড়া কমবেশ ৪০০০ লিখেছেন। ইবনে সালাহ্ ও ইমাম নববী র. এবং পরবর্তীগণও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অথচ পূর্ণ তত্ত্ব সন্ধানের পর প্রমানিত হয়েছে যে, পূনরাবৃত্তি ছাড়া সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা হল, ২৫১৩। -উমদাতুল কারী ঃ ১/২০১।

٢٢. بَاب الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّة وَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلَّا بِالشِّرْكِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ .

২২. পরিচ্ছেদ ঃ গুনাহের কাজ জাহিলী যুগের স্বভাব

আর শির্‌ক ছাড়া অন্য কোন গুনাহে লিপ্ত হওয়াতে ঐ পাপীকে কাফির বলা যাবে না। যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম [আবূ যর রা.কে লক্ষ্য করে] বলেছেন- তুমি এমন ব্যক্তি, তোমার মধ্যে জাহিলী যুগের স্বভাব রয়েছে। আর আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ .

'আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।' (৪ ঃ ৪৮)

وَانْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا.

'মু'মিনদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করো।' (৪৯ ঃ ৯)। (সংঘর্ষের গুনাহে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও) তাদের তিনি মু'মিন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

যোগসূত্র ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন, وجه المناسبة بين البابين ظاهر الخ. কারণ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে স্বামীর অকৃতজ্ঞতার বিবরণ ছিল আর এ কাজটিও গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ এ অনুচ্ছেদে দুটি শিরোনাম রয়েছে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য হল প্রথম শিরোনামটি। যদ্বারা মুরজিয়া সম্প্রদায়ের মত খন্ডন হয়ে যায় এবং এটাই মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় শিরোনামটিকে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর মনে করুন। অর্থাৎ, শিরোনামের দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশটি হল المعاصي من أمر الجاهلية অর্থাৎ, গুনাহগুলো জাহিলি যুগের এবং কুফরী যুগের কাজ। প্রতিটি

গুনাহে কোন না কোন পর্যায়ের কুফরের রং ফুটে উঠে। এতে ইঙ্গিত হল كفر دون كفر এর দিকে। অতএব এগুলো ঈমানের জন্য ক্ষতিকর হওয়া সুনিশ্চিত ও স্পষ্ট।

জমানায়ে জাহিলিয়্যাত দ্বারা উদ্দেশ্য ফাৎরতকাল তথা হযরত ঈসা আ. এর পর থেকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়াতের পূর্বেকার সময় পর্যন্ত।

উদ্দেশ্য হল, শিরোনামে জাহিলিয়্যাতের কাজ দ্বারা উদ্দেশ্য কুফরী কাজগুলো। কারণ, সে জমানায় কুফরই কুফর ছিল। এবার আশংকা ছিল এই শিরোনাম দ্বারা খারিজী ও মু'তাযিলীরা কাচা আশা করে বসে কি না, এ জন্য ইমাম বুখারী র. لا يكفر صاحبها بارتكابها الا بالشرك. বলে এ আশার গুড়ে বালি দিয়েছেন যে, গুনাহগুলো কুফরেরই শাখা। কিন্তু كفر دون كفر এর কারণে শুধু শিরক ছাড়া অন্য কোন গুনাহের ভিত্তিতে কাউকে কাফির বলা যায় না।

لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخ প্রথমাংশের সাথে সম্পর্কিত, আর আল্লাহর বাণী- انَّ الله لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ الخ এর দ্বিতীয়াংশের প্রমাণ।

قوله لا يكفر صاحبها بارتكابها الا بالشرك এর দ্বারা খারিজী ও মু'তাযিলীদের মতখন্ডন উদ্দেশ্য। কারণ, তারা কবীরা গুনাহকারী ব্যক্তিকে কাফির ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলে।

একটি প্রশ্ন ঃ যেহেতু গুনাহের কাজগুলো কুফরের অংশ সেহেতু এগুলোতে যে লিপ্ত হবে তার কাফির হওয়া উচিৎ। যেহেতু ক্রিয়ামূল পাওয়া যায় সেহেতু নিস্পন্ন বিষয়ের প্রয়োগও আবশ্যক।

উত্তর ঃ আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম র. كتاب الصلوة واحكام تاركها গ্রন্থে বলেন, ক্রিয়ামূলের বর্তমানে নিস্পন্ন শব্দ ওরফে প্রযোজ্য হওয়া জরুরী নয়। ওরফে নিস্পন্ন শব্দ প্রয়োগ তখন হয় যখন ক্রিয়ামূলের নির্ভরযোগ্য অংশ পাওয়া যায়। যদি ক্রিয়ামূল নেহায়েত দুর্বল হয়, তবে সেখানে নিস্পন্ন শব্দের প্রয়োগ হবে না। যেমন, ইলম এর অর্থ হল জানা। কেউ যদি দু একটি বিষয় সম্পর্কে জানে যদিও সে আভিধানিকভাবে আলিম, কিন্তু ওরফে তাকে আলিম বলা সহীহ নয়। এরূপভাবে দু চারটি মাসআলা জানলে ফকীহ এবং দু চারটি প্রেসক্রিপশন জানলে ডাক্তার বলা যায় না।

এরূপভাবে যদিও প্রতিটি গুনাহ কুফরের অংশ, কিন্তু যতক্ষন পর্যন্ত কুফরের নির্ভরযোগ্য অংশ জরুরীয়্যাতে দীন থেকে কোন কিছুর অস্বীকৃতি অথবা কুফরের সাথে বিশেষিত কোন নিদর্শনে লিপ্ততা পাওয়া না যায়, ততক্ষন পর্যন্ত কাফির হওয়ার হুকুম লাগানো যায় না। এ জন্য ইমাম বুখারী র. لا يكفر صاحبها الخ বলেছেন,

একটি প্রশ্ন ঃ কিন্তু একটি প্রশ্ন এখনো থেকে যায় যে, কুরআনে কারীমে আছে-

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَاُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ

এ আয়াতে একটি বিশেষ গুনাহের উপর কুফরের প্রয়োগ করা হয়েছে।

উত্তর ঃ এর উত্তর হল, প্রথমতো তো এ আয়াতের তাফসীরেই মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এ আয়াত তখনকার ছুরতে প্রযোজ্য যখন কেউ ما انزل الله কে অস্বীকার করে। ইয়াহুদীরা রজম বা প্রস্তরাঘাতে হত্যার আয়াতটিকে অস্বীকার করত। এ জন্য তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে- هم الكافرون তথা তারাই কাফির। যেরূপভাবে শয়তান শুধু সিজদা পরিহার করার কারণে কাফির নয়, বরং অস্বীকৃতি ও অহংকারের কারণে কাফির হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- اَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ

◆ কেউ বলেছেন, তারা আল্লাহর নাযিল কৃত জিনিসগুলোকে হালাল মনে করত এবং বলত যে, প্রস্তরাঘাতে হত্যা বিচারকের স্বার্থ ও উপকারিতার উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ, তারা আল্লাহ কর্তৃক নাযিল কৃত জিনিসের পরিপন্থী বিষয়কে হালাল মনে করত।

◆ কেউ কেউ বলেছেন, এ আয়াতটি ইয়াহুদীদের সম্পর্কে প্রযোজ্য, মুসলমানদের ব্যাপারে নয়।

◆ কিন্তু এর উত্তর এটাও যে, একটি হুকুম হল, সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর, আরেকটি হুকুম হল, শিরোনামগত গুনের উপর। উভয়টির মধ্যে পার্থক্য আছে। لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ বলা দুরস্ত আছে, কিন্তু কোন বিশেষ ব্যক্তিকে নির্ধারিত করে তার প্রতি অভিশম্পাত দান বৈধ নয়, যতক্ষন না কুফরের উপর তার মৃত্যুর ইয়াকীন না হবে। এর কারণ স্পষ্ট। কারণ, কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি লা'নতের অধিকার আমাদের নেই। কারণ, হতে পারে লোকটি তওবা করে ফেলেছে, বা পরবর্তিতে তওবা করে ফেলবে। মিথ্যুকদের উপর আল্লাহর লা'নত- একথা বলতে কোন অসুবিধা নেই, যে আল্লাহর জ্ঞানে মিথ্যুক হবে এবং তার মৃত্যু মিথ্যার উপর হবে তার প্রতি লা'নত হবে। কিন্তু যায়েদ মিথ্যাবাদী, তার উপর লা'নত দেয়া বৈধ হতে পারে না। কারণ, হতে পারে সে তওবা করে ফেলেছে বা ফেলবে। কাজেই আল্লাহর রহমত থেকে দুরীভূত হওয়ার জন্য বদ দোয়া করা বৈধ নয়।

সারকথা হল, ইমাম বুখারী র. ব্যক্তি বিশেষের ব্যাপারে বলেছেন, لا يكفر صاحبها الخ আর আয়াতে কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কুফরের হুকুম নেই, বরং একটি বিশেষ সিফতে লিপ্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে হুকুম রয়েছে। বস্তুতঃ উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। -ইমদাদুল বারী।

٢٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قُلْتُ أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ.

২৯. 'আবদুর রহমান ইবনুল মুবারক র. ...... আহনাফ ইবনে কায়েস র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (সিফফীনের যুদ্ধে) এ মনীষীকে [হযরত আলী রা.কে] সাহায্য করতে যাচ্ছিলাম। হযরত আবূ বাকরা রা.-এর সাথে আমার সাক্ষাত হলে তিনি বললেন ঃ 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' আমি বললাম, 'আমি এ মনীষীকে সাহায্য করতে যাচ্ছি।' তিনি বললেন- 'ফিরে যাও, কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, দু'জন মুসলমান তাদের তরবারি নিয়ে মুখোমুখি হলে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামে যাবে।' আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ হত্যাকারী (তো অপরাধী), কিন্তু নিহত ব্যক্তির কি অপরাধ? তিনি বললেন, '(নিশ্চয়ই) সে তার সঙ্গীকে হত্যা করার জন্য উদগ্রীব ছিল।'

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হল, শিরোনামে রয়েছে, গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফির বলা যাবে না। আর হাদীস শরীফে পারস্পরিক যুদ্ধরত লোকদেরকে মুসলমান বলা হয়েছে। অথচ এটা কবীরা গুনাহ। এর দ্বারা মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মত খন্ডন সুস্পষ্ট আকারে হয়ে গেছে।

২। কোন কোন কপিতে এ হাদীসটি পরে আছে এবং এ হাদীসের উপর স্বতন্ত্র শিরোনাম রয়েছে। এখানে হযরত মা'রূর রা. এর ৩০নং হাদীসটি রয়েছে।

দ্রষ্টব্য ঃ উমদাতুল কারী, ফাতহুল বারী, কাসতাললানী

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী কিতাবুল ঈমান ঃ ৯, দিয়াত ঃ ১০১৫ ফিতান ঃ ১০৪৮-১০৪৯,

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটির সম্পর্ক উষ্ট্রী যুদ্ধের সাথে। হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস র. বলেন, উষ্ট্রী যুদ্ধে হযরত আলী রা. এর সাহায্যের নিয়তে আমি বের হলে হযরত আবু বাকরা রা. নিষেধ করলেন, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস اذا التقى المسلمان الخ শুনালেন। ফলে আমি বিরত থাকলাম।

কোন কোন আলিম লিখেছেন, হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস র. এর এই ঘটনা সিফফীনের যুদ্ধ সংক্রান্ত। তবে এটা সুনিশ্চিতরূপে সহীহ নয়। আল্লামা কাস্তাললানী র. সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, وكان ذلك يوم الجمل -ইরশাদুস সারী ১/১৯৯

হাফিজ আসকালানী র. বলেন,

وكان الأحنف اراد ان يخرج بقومه الي علي بن طالب رضي الله تعالى عنه ليقاتل معه يوم الجمل فنهاه أبو بكرة فرجع.

অর্থাৎ, আহনাফ ইবনে কায়েস র. মনস্থ করেছিলেন, স্বীয় কওমের সাথে হযরত আলী রা. এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে উষ্ট্রী যুদ্ধের দিন তাঁর পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করবেন। হযরত আবু বাকরা রা. নিষেধ করলে হযরত আহনাফ র. ফিরে চলে আসেন।

হযরত আবু বাকরা রা. এ জন্য নিষেধ করেছিলেন যে, তাঁর নিকট তখন স্পষ্ট হয়নি যে হকের উপর কে আছেন। এ জন্য হযরত আবু বাকরা রা. প্রমুখ সম্পূর্ণ আলাদা থেকে যান।

হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস র. ও হযরত আবু বাকরা রা. কর্তৃক নিষেধের পর উষ্ট্রী যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেননি। কিন্তু পরবর্তিতে যখন হযরত আহনাফ রা. এর নিকট হক স্পষ্ট হয়ে যায় এবং আন্তরিক প্রশান্তি এসে যায় যে, হযরত আলী রা. হকের উপর আছেন তখন তিনিও সিফফীনের যুদ্ধে হযরত আলী রা. এর সাথে থাকেন এবং হযরত আলী রা. এর পক্ষে লড়াই করেন।

সিফফীন যুদ্ধের ঘটনা অধম লেখক নাসরুল বারী কিতাবুল মাগাযীতে বর্ণনা করেছে। এর জন্য দ্রষ্টব্য ঃ নাসরুল বারী, কিতাবুল মাগাযী ঃ ১৬৫-১৬৮।

আহনাফ ইবনে কায়েস র.

তাঁর নাম যাহ্হাক উপনাম আবু বাহ্র ইবনে কায়েস। আর কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর নাম সাখ্র আহনাফ উপাধিতে তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি তাবিঈ। আল্লামা আইনী র. লিখেন, ادرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم واسلم في عهده و لم يره.

অর্থাৎ, তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগেই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহন করেন, কিন্তু ঈমান আনয়নের পর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে) সাক্ষাত থেকে বঞ্চিত থাকেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর খেলাফত আমলে কুফায় ওফাত লাভ করেন।

হযরত আবু বাকরা রা. ঃ

তাঁর জীবনীর জন্য দেখুন, নাসরুল বারী কিতাবুল মাগাযী ৩৯৫। অবশ্য ওফাত সন লেখাতে ভূল হয়ে গেছে। বিশুদ্ধ হল তাঁর ওফাত হয়েছে ৫২ হিজরীতে।

٣٠. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ .

৩০. সুলায়মান ইবনে হারব র. .... হযরত মা'রূর র. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি একবার রাবাযা নামক স্থানে আবূ যর রা.-এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তখন তাঁর পরনে ছিল এক জোড়া পোশাক (লুঙ্গি ও চাদর) আর তাঁর চাকরের পরনেও ছিল ঠিক একই ধরনের এক জোড়া কাপড়। আমি তাঁকে এর সমতার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ একবার আমি এক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিলাম এবং আমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ 'আবূ যর! তুমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছ? তুমি তো এমন ব্যক্তি যে, তোমার মধ্যে এখনো বর্বরতা যুগের স্বভাব রয়েছে। জেনে রেখো, তোমাদের দাস-দাসী তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। তাই যার ভাই তার অধীনে থাকবে, সে যেন তাকে নিজে যা খায় তাকে তা-ই খাওয়ায় এবং নিজে যা পরে, তাকে তা-ই পরায়। তাদের উপর এমন কাজ চাপিয়ে দিও না, যা তাদের জন্য খুব বেশী কষ্টকর। যদি এমন কষ্টকর কাজ করতে দাও, তাহলে তোমরাও তাদের সে কাজে সাহায্য করো।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। কারণ, انك امرأ فيك جاهلية الخ বাক্যটি হাদীসেরই একটি অংশ।

লক্ষ্য উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে গেল যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যর রা. কে সাবধান তো করেছেন, কিন্তু ঈমান থেকে বহির্ভূত বলেন নি। অতএব দাবী প্রমানিত হয়ে গেল যে, কোন গুনাহের কারণে কাফির বলার অনুমতি নেই।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, কিতাবুল ঈমান ঃ ৯, ইত্ক ঃ ৩৪৬, কিতাবুল আদব ঃ ৮৯৩-৮৯৪।

হযরত আবু যর রা.ঃ

তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী পূর্বে এসেছে। দ্রষ্টব্য ঃ নাসরুল বারী, কিতাবুত তাফসীর ঃ ৫৩৫।

ব্যাখ্যা ঃ

ربذة শব্দটির রায়ের উপর যবর, যাতু ইরকের নিকটবর্তী একটি গ্রাম। এটি মদীনা মুনাওয়ারা থেকে ৩ মারহালা বা মনযিল দূরে অবস্থিত। এ স্থানে সৈন্য থাকত, অর্থাৎ, এ জায়গাটি ছিল সেনাছাউনি। যেখানে হাজার হাজার ঘোড়া অবস্থান করত।

عليه حلة এক ধরণের এক জোড়া কাপড়কে বলে হোল্লা। একটি লুঙ্গির স্থলে, অপরটি শরীরের উপরের অংশে। বর্তমান যুগের ওরফে এটাকে বলে স্যুট।

وعلي غلامه حلة তাঁর গোলামও এক স্যুট পোশাক পরিহিত ছিল।

হতে পারে, উভয় জোড়া এক প্রকারের একই দামের ছিল। এমতাবস্থায় হযরত মা'রূর রা. এ সমতা দেখে বিস্ময়াভিভূত হন ও প্রশ্ন করেন। কিন্তু অধিকাংশ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, কাপড় এক জোড়াই ছিল কিন্তু এই জোড়ার একটি হযরত আবু যর রা. এর গায়ে ছিল, আরেকটি ছিল গোলামের গায়ে। প্রত্যেকের গায়ে একেকটি কাপড় ছিল কম মূল্যের। এ কম মূল্যের দুটি ছিল দু জনের গায়ে। ফলে এই বেজোড় স্যুট দেখে হযরত মা'রূর রা. বিস্ময়াভিভূত হন এবং জিজ্ঞেস করেন, ঘটনা কি? যদি আপনি গোলামকে নিজের একটি কাপড় দিয়ে দ্বিতীয় মূল্যবান কাপড়টি আপনি নিয়ে নিতেন তাহলে আপনার পুরো স্যুট একরকম হয়ে যেত। উত্তরে তিনি বললেন, প্রথমে ঘটনা শুনে নাও। আমি এক ব্যক্তিকে (হযরত বিলাল রা.কে) গালি দিয়েছিলাম, তাঁকে আমি বলেছিলাম, يا ابن السوداء অর্থাৎ, হে কৃষ্ণাঙ্গ মহিলার ছেলে! তখন তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ করলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, انك امرأ فيك جاهلية অর্থাৎ, তোমার মধ্যে জাহিলিয়্যাতের স্বভাব বিদ্যমান।

امرأ এ শব্দটির একটি বৈশিষ্ট্য হল, এর আইন কালিমা লাম কালিমার অধীনস্থ হয়, অর্থাৎ, হামযার উপর যে হরকত হবে সেটি আইন কালিমা অর্থাৎ, রায়ের উপরও হবে।

اخوانكم خولكم বাহ্যত خولكم اخوانكم হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এই আগ পিছে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ভ্রাতৃত্ব হল আসল। কারণ, সবাই হযরত আদম আ.এর সন্তান। আর খাদেম ও অধীনস্থ চাকর নকর হওয়া একটি যৌগিক ও সাময়িক বিষয়। অতএব গোলামদের সাথে (এরূপভাবে চাকর নকরদের সাথে) লেন-দেনে, আচার-আচরণে মূল ভ্রাতৃত্বের বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

فليطعمه مما يأكل এর দ্বারা পূর্ণাঙ্গ সমতা উদ্দেশ্য নয়। অন্যথায় বিশ্ব ব্যবস্থাপনা উলট পালট হয়ে যাবে। মূলত সহমর্মিতা উদ্দেশ্য। مما তে من تبعيضية এর প্রমান। তা ছাড়া দ্বিতীয় হাদীসে এর সুস্পষ্ট বিবরণ বিদ্যমান যে, যখন তোমাদের খাদেম খানা পাকিয়ে আনবে তখন তাকেও নিজের সাথে খাওয়ানোর জন্য বসাও। আর যদি কোন কারণে সাথে না খাওয়াতে পার তবে তাকে এক দুই লোকমা হলেও দিয়ে দাও। অথবা অনুরূপ বলেছেন।

হযরত আবু যর রা. এ হাদীস দ্বারা সাম্যের নির্দেশ বুঝেছেন। অথবা যথার্থ অর্থ তো বুঝেছেন যে, উদ্দেশ্য হল সহমর্মিতা, সাম্য জরুরী নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও উত্তম পর্যায়ের আমলের জন্য সাম্যের আচরণ করতেন। যেমন, হযরত ফারূকে আজম রা. গোলামের সাথে বাইতুল মুকাদ্দাস সফরে উটের উপর আরোহনের ক্ষেত্রে সমতা প্রদর্শন করেছেন। যা জরুরী ছিল না। এক মনযিল নিজে আরোহন করতেন, আরেক মনযিল পর্যন্ত গোলাম আরোহন করত। বাইতুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী হওয়ার পর আরোহনের পালা ছিল গোলামের। গোলাম আরজ করল, আপনি আরোহন করুন। কিন্তু তিনি তা মঞ্জুর করলেন না। তিনি যখন বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছেন তখন গোলাম ছিল উটের উপর আরোহী। সমস্ত খ্রিষ্টান আলিম গোলামের উপর পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর চিত্র মিলিয়ে বলতে লাগলেন, তিনি সে খলীফা নন যার আলোচনা পূর্বোক্ত গ্রন্থরাজিতে আছে। হযরত আবু উবাইদা রা. বললেন, আমীরুল মুমিনীন উটের লাগাম ধারণ করে আছেন। খ্রিষ্টান কেঁপে উঠল। কারণ, যে ব্যক্তির হাতে রোম পারস্য বিজয় হয়েছে তাঁর এ অবস্থা! হাওদার ঘর্ষনে তাঁর জামা ছিড়ে গেছে। এক ইয়াহুদীকে রিপু করার জন্য দিলে সে এটি ঠিক করে সাথে সাথে আরেকটি নতুন জামাও দিয়ে দেয়। হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. আরজ করলেন, আমীরুল মুমিনীন! এখানকার লোকজন ধনী। এ জন্য আপনি এ নতুন জামাটি পরিধান

করুন। হযরত উমর রা. বললেন, كفي بالايمان زينة অর্থাৎ, শোভা সৌন্দর্যের জন্য ঈমানই যথেষ্ট। অতএব পুরনো জামাটিই লও, এতে ঘাম চোষার ক্ষমতা বেশি রয়েছে।

খ্রিষ্টানরা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে গোটা বাজার সাজিয়ে মহিলাদেরকে দোকানে দোকানে বসিয়েছে। তাদেরকে বলে দিয়েছে, মুসলমান সেনাবাহিনীর লোকজন যা কিছু চাইবে বিনা প্রশ্নে তাই তোমরা করবে। হযরত আবু উবাইদা রা. সেনাবাহিনীর মধ্যে শুধু নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করে শুনান-

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ.

ফলে কোন একজন সৈনিক চোঁখ তুলেও তাকায়নি। খ্রিষ্টানরা তখন স্বীকার করে যে, তাঁদের মুকাবিলা গোটা বিশ্ব করতে পারবে না। -ইরশাদুল কারী।

٢٣. بَاب ظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ

২৩. পরিচ্ছেদ ঃ জুলুমের প্রকারভেদ

এ অনুচ্ছেদে প্রমান করা উদ্দেশ্য হল, জুলুমের বিভিন্ন স্তর হয়ে থাকে। বড় স্তর হল, কুফর ও শিরকের যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَالْكَافِرُوْنَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

মধ্যবর্তী স্তর হল, গুনাহসমূহের। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বিয়ে, তালাক, রাজআত (তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা) ও খুলার আহকাম উল্লেখের পর ইরশাদ করেন-

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه.

সর্বনিম্ন স্তর হল, অনুত্তমের। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَلاَ تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ. وقال آدم عليه السلام : رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وقال موسى عليه السلام رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ وقال يونس عليه السلام سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ.

٣١. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ و حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضـ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ .

৩১. আবুল ওয়ালীদ এবং বিশর র. .... হযরত আবদুল্লাহ্ (ইবনে মাসঊদ) রা. থেকে বর্ণনা করেন ঃ

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুম যারা কলুষিত করেনি' (৬ ঃ ৮২) এ আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ বললেন, 'আমাদের মধ্যে এরূপ কে আছে যে জুলুম করে নি?' তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيم

'নিশ্চয়ই শিরক মহা জুলুম।' (৩১ ঃ ১৩)

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনাম হল ظلم دون ظلم

তথা কোন কোন জুলুম অপর জুলুম থেকে নিম্ন স্তরের। আর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারাও জানা গেল যে, জুলুমের বিভিন্ন স্তর ও প্রকার রয়েছে। কোন কোন প্রকার কুফর আর কোন কোন প্রকার কুফর থেকে নিম্ন স্তরের। তা ছাড়া আয়াতে শিরক ও কুফরকে জুলমের একটি শাখা বলা হয়েছে। অতএব মিল স্পষ্ট।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী কিতাবুল ঈমান ঃ ১০, কিতাবুল আম্বিয়া ঃ ৪৭৪, ৪৮৭, তাফসীর ঃ ৬৬৬, ৭০৪, কিতাবু ইসতিতাবাতিল মুআনিদীন ঃ ১০২২, ১০২৫, মুসলিম ১/৭৭।

ব্যাখ্যা ঃ

لم يلبسوا লামের উপর যবর باب ضرب মিশ্রিত করা, গুলিয়ে ফেলা, যাতে পার্থক্য না থাকে। بظلم জুলুমের অর্থ হল, وضع الشيئ في غير محله অর্থাৎ, কোন কিছুকে অস্থানে অপাত্রে রাখা। অতএব এর আভিধানিক অর্থের দিকে লক্ষ্য করলে প্রতিটি অপরাধ ও গুনাহ জুলুম, চাই বড় গুনাহ হোক বা ছোট গুনাহ।

যখন সুরা আনআমের আয়াত

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ.

অবতীর্ণ হয়, তখন بظلم শব্দ নাকিরা এবং নফীর অধীনস্থ হওয়ার কারণে মূলনীতি অনুসারে ব্যাপকতা বুঝা যায়। এই হিসেবে সাহাবায়ে কিরামের উপর এ বিষয়টি কঠিন হয়ে দাড়াল। তারা ভয় পেয়ে গেলেন। কারণ, দুনিয়াতে আম্বিয়া আ. ছাড়া কোন মানুষ নিষ্পাপ নয় এবং لهم الأمن তে لهم শব্দটিকে আগে উল্লেখ করার ফলে সীমাবদ্ধতা বুঝা যায়। কাজেই আয়াতে কারীমার অর্থ হল, নিরাপত্তা ও হেদায়াত শুধু তাদের জন্যই যারা নিজের ঈমানকে কোন জুলুমের সাথে মিশ্রিত করে ফেলেনি। চাই সে জুলুম বড় হোক বা ছোট হোক। অর্থাৎ, যে কোন গুনাহই করুক না কেন। এ কারণেই সাহাবায়ে কিরাম রা. আরজ করলেন, اينا لم يظلم অর্থাৎ, আমাদের মধ্যে এরূপ কে আছে, যার থেকে কোন গুনাহ হয়নি? তাহলে কি আমরা জাহান্নাম থেকে নিরাপদ হব না?

◆ এর উত্তরে গ্রন্থ শিক্ষক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, نَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ, وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ আয়াতে জুলুম শব্দটির উপর তানভীন তা'জীমের জন্য। অতএব এর দ্বারা জুলুমের সব চেয়ে বড় উঁচুস্তর তথা শিরক উদ্দেশ্য।

◆ এবার আরেকটি আলোচনা থেকে যায় সেটি হল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ظلم শব্দটির তানভীনকে তা'জীমের জন্য সাব্যস্ত করে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, মহাজুলুম দ্বারা। এর উপর কোন নিদর্শন আছে কি না?

হযরত নানুতবী র. থেকে বর্ণিত আছে যে, স্বয়ং আয়াতে কারীমায় এর নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। সেটি হল, لم يلبسوا যার অর্থ হল, তারা সংমিশ্রন করেনি। জানা কথা যে, সংমিশ্রন সেখানেই সম্ভব যেখানে উভয় জিনিসের পাত্র একই হয়, স্পষ্ট বিষয় চুরি, জেনা, শরাব, মদপান, সিনেমা দর্শন এসব গুনাহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ। ঈমানের স্থান হল অন্তর। অতএব সংমিশ্রন তখনই হতে পারে যখন উভয়ের স্থান ও পাত্র একই হয়। যেমন, শরবত তখনই হতে পারে, যখন পানিতে চিনি মেশানো হয়। এরপর আর পার্থক্য অবশিষ্ট থাকে না। অতএব যদি এখানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া কর্ম উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ঐক্য হবে না। ঐক্য তখনই হবে যখন জুলুমের সে অর্থ হয়, যেটি ঈমানের স্থানে জুলুম। আর এটা হল শিরক ও কুফর। অতএব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতে কারীমার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দিলেন। এটাই হল يعلمهم الكتاب আয়াতের বাস্তব রূপ।

হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী র.ও বলেছেন, হযরত নানূতবী র. যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন হুবহু এ ব্যাখ্যাটি আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী র. আরূসুল আফরাহ্ নামক গ্রন্থে স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন।

জমখশরীর প্রমাণ ঃ

আল্লামা জমখশরী লিখেছেন, ঈমান ও শিরক পরস্পর বিরোধী। এ দুটি একই স্থানে একত্রিত হওয়া অসম্ভব। অতএব জুলুম দ্বারা শিরক উদ্দেশ্য হতে পারে না। বরং কবীরা গুনাহ উদ্দেশ্য। এর দ্বারা প্রমাণিত হল, ঈমান অবস্থায় কবীরা গুনাহে লিপ্ত হলে জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তা থাকবেনা।

উত্তর ঃ কুরআনের শিক্ষক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুলুমের তাফসীর করেছেন শিরক দ্বারা। অতএব এখানে আমাদের কোন প্রকার কথা বলার অনুমতি নেই।

২। যদি আমরা জমখশরীর ব্যাখ্যা গ্রহণ করে নেই, তাহলে সে প্রশ্ন তার উপর আসবে যে প্রশ্নটি আমরা উত্থাপন করেছি। এভাবে প্রশ্ন আবশ্যক হবে যে, মু'তাযিলার মতে কবীরা গুনাহে লিপ্ততার ফলে ঈমান বাকি থাকে না। অতএব জুলুম মানে কবীরা গুনাহ এবং ঈমান পরস্পর বিরোধী বিষয় হল। অতএব একই স্থানে দুটি পরস্পর বিরোধী জিনিস একত্রিত হওয়া আবশ্যক হয়। অতএব যা তোমাদের উত্তর সেটাই আমাদের উত্তর।

তাছাড়া আমরা জিজ্ঞেস করছি, وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللهِ اِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ আয়াতে পরস্পর বিরোধী দুটি জিনিস একত্রিত কিভাবে হল? জমখশরী এর উত্তর দিয়েছেন, এখানে ঈমান দ্বারা শরঈ ঈমান উদ্দেশ্য নয়, বরং আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য হবে। অতএব আমরাও وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ আয়াতে এটাই বলব, যে এখানে আভিধানিক ঈমান উদ্দেশ্য।

৩। আমরা জিজ্ঞেস করব, কবীরা গুনাহকারীর জন্য জাহান্নামে প্রবেশের নিরাপত্তা নেই, না কি চিরস্থায়ী জাহান্নামে অবস্থান থেকে নিরাপত্তা নেই? যদি জাহান্নামে প্রবেশ থেকে নিরাপত্তা না থাকে, তবে তা আমরাও স্বীকার করি, আর যদি চিরস্থায়ী অবস্থান থেকে নিরাপত্তা না থাকে তবে এটা ভূল। কারণ, আয়াতে কারীমা اِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ এ বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে।

قوله فانزل الله عز وجل

একটি প্রশ্ন ঃ এর দ্বারা বুঝা যায়, সাহাবায়ে কিরাম রা. এর প্রশ্নের পর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, অথচ অপর বর্ণনায় আছে, এ আয়াতটি প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছিল, এখানে সাহাবায়ে কিরাম রা. এর প্রশ্নের উত্তরে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেছেন।

উত্তর ঃ কোন উপলক্ষ্যে কোন আয়াত তিলাওয়াতকে **ইনযাল** দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। যদিও এটি অনেক পূর্বেই অবতীর্ণ হোক না কেন। যদি আজকে কেউ চুরি করে, তাহলে তাকে বলা হয়, سَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا الخ আয়াত তোমাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

এ মূলনীতি স্মরণ রাখার মত। কারণ, এর দ্বারা অনেক জটিল বিষয়ের সমাধান হয়ে যায়। - ইরশাদুল কারী।

٢٤. بَاب عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ মুনাফিকের নিদর্শন

٣٢. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضـــ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ .

৩২. সুলায়মান আবুর রাবী' র. .... হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি ঃ ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে ; ২. যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে ; এবং ৩. আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে।

٣٣. حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضـــ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ .

৩৩. কাবীসা ইবনে 'উকবা র. .... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকে সে হবে খাঁটি মুনাফিক। যার মধ্যে এর কোন একটি স্বভাব থাকবে, তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায়। ১. আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে ; ২. কথা বললে মিথ্যা বলে; ৩. চুক্তি করলে ভঙ্গ করে ; এবং ৪. বিবাদে লিপ্ত হলে সীমালংঘন করে অশ্লীল গালি দেয়া। শু'বা আ'মাশ র. থেকে হাদীস বর্ণনায় সুফিয়ান র.-এর মুতাবা'আত বা অনুসরণ করেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ উপরোক্ত দুটি হাদীসের সাথে শিরোনামের মিল সম্পূর্ণ স্পষ্ট।

হাদীসটির পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১০, ৩৬৮-৩৬৯, ৩৮৪, ৯০০, মুসলিম, কিতাবুল ঈমান ঃ ৫৬।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র ঃ

পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে জুলুমের আলোচনা ছিল আর এ অনুচ্ছেদে নিফাক সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে এটি স্বতন্ত্র এক জুলুম।

২। পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, জুলুমের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কোন কোনটি এরূপ যে, ইসলাম থেকে বের করে দেয়, আর কোনটি অনুরূপ নয়। এরূপভাবে এ অনুচ্ছেদে বলা হচ্ছে যে, মুনাফিকিরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে।

একটি প্রশ্ন ঃ অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তাতে মুনাফিকের তিনটি নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. এর, যদ্বারা বুঝা যায় মুনাফিকের আলামত চারটি। এতে বাহ্যত বিরোধ বুঝা যায়।

উত্তর ঃ কম সংখ্যা বেশী সংখ্যার পরিপন্থী নয়।

২। হতে পারে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তিনটি আলামত সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। পরবর্তীতে চতুর্থ আলামত সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

৩। ইমাম মুসলিম র. সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق ثلاثة الخ

এতে من تبعيضية শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তিনটিতে সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়।

◆ কেউ কেউ বলেন, উভয় বর্ণনার আলামতগুলোকে একত্রিত করলে সর্বমোট পাঁচটি হয়ে যায়- ১. মিথ্যা, ২. খিয়ানত, ৩. ওয়াদা খেলাফ করা, ৪. চুক্তি ভঙ্গ, ৫. ফুজূর সীমালংঘন বা গালাগালি-পাপাচার। এই পাঁচটিকে তিনটি দ্বারাই ব্যক্ত করা যায়। ফুজূর মিথ্যার অধীনে আসতে পারে। ঝগড়াঝাটিতে নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে গিয়ে গালিগালাজ করাকে ফুজূর বলে। তাছাড়া ওয়াদা খেলাফ ও চুক্তি ভঙ্গের মধ্যে বাস্তবে কোন পার্থক্য নেই। এমতাবস্থায় তিনটি স্বভাবই থেকে যায় এবং উভয় রেওয়ায়াতের মাথে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়।

মুনাফিকের সংজ্ঞা ঃ

মুনাফিক শব্দটি نفاق থেকে নিষ্পন্ন। অন্তরে একটি রেখে বাইরে তার পরিপন্থী বিষয় প্রকাশ করাকে অভিধানে নিফাক বলে। আর শরীয়তে অন্তরে কুফরী রেখে বাহিরে ঈমান প্রকাশ করাকে মুনাফিকী বলে। অর্থাৎ, মনে থাকবে কুফরী কিন্তু কোন স্বার্থের কারনে মৌখিক ইসলাম প্রকাশ করা। মানে মুনাফিক সেই যার ভিতরে হল কাফির আর বাইরে হল মুসলমান। এর দুটি প্রকার রয়েছে। ১. কথা ও কাজ সহীহ অর্থাৎ, বাহ্যত মুসলমান কিন্তু আকীদা খারাপ। কুরআন ও হাদীসে মুনাফিক দ্বারা এ প্রকারই উদ্দেশ্য হয়। তথা আকীদাগত মুনাফিক। সে কাফির বরং তার চেয়েও আরো নিকৃষ্টতর। যেমন, কুরআনে কারীমে রয়েছে-

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

২। আকীদা সহীহ অন্তর থেকে মুসলমান কিন্তু আমল খারাপ। এ হল, কার্যত মুনাফিক। সে ঈমান থেকে বহির্ভূত নয়।

আল্লামা আইনী র. বলেন,

زعم ابن سيده انه الدخول في الاسلام من وجه والخروج عنه من آخر مشتق من نافقاء اليربوع

অর্থাৎ, ইবনে সায়্যিদিহী র. বলেন যে, ইসলামে এক দিয়ে প্রবেশ করা অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার নাম নিফাক। আর মুনাফিক শব্দটি نافقاء থেকে নিষ্পন্ন।

বস্তুতঃ نافقاء বলে গুই সাপের জঙ্গলকে। গুই সাপ ও জংলি ইদুরের মত এক প্রকার জন্তুকে আরবীতে يربوع এবং ضب বলে। এ গুই সাপের অভ্যাস হল, নিজের আবাস স্থলের দুটি পথ তৈরী করে। একটি পথ খোলা ও স্পষ্ট থাকে এটিকে বলে, قاصعاء আর অপর বিপরীত পথটি খোলা ও স্পষ্ট থাকে না। বরং এটিকে শুধু ভিতর থেকে ফোকলা রেখে এরূপ নরম করে দেয় যেন প্রয়োজনের সময় এক বার ঠোকর মেরে সহজে পথ তৈরী করে পালাতে পারে। এটাকে বলে نافقاء। যখন কোন শিকারী তাকে শিকার করতে আসে তখন এ জন্তুটি প্রথম দরজা দিয়ে ঢুকে পরে। শিকারী মনে করে এটি এখানে কোথাও লুকিয়ে আছে। সে এই পথের অপেক্ষা করতে থাকে। অতঃপর তা খুড়ে দেখে। তখন বুঝতে পারে এটি নাফিকা নামক অন্য দরজা দিয়ে পালিয়ে গেছে।

মুনাফিকের অবস্থা অনুরূপই। এক পথে ইসলামে প্রবেশ করে অন্য পথ দিয়ে বেরিয়ে যায়। যেমন. কুরআনে কারীমে আছে-

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيَاطِيْنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ.

অথবা এ কারণে যে, যেরূপভাবে গুই সাপ একটি পথ প্রকাশ করে আর অপরটি গোপন রাখে এরূপভাবে মুনাফিক ইসলাম প্রকাশ করে, কিন্তু কুফরী গোপন রাখে।

অথবা এ কারণে যে, যেরূপভাবে গুই সাপ শিকারীকে ধোঁকা দেয়, এরূপভাবে মুনাফিক মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়।

ব্যাখ্যা ঃ প্রথম হাদীসে মুনাফিকদের তিনটি আলামত বাতানো হয়েছে।

১. اذا حدث كذب - যখন কোন কথা বলে তখন অবাস্তব মিথ্যা কথা বলে। উদ্দেশ্য হল, জেনে বুঝে সে মিথ্যা কথা বলে। কারণ, সাজা এবং সতর্কবাণীর জন্য ঐচ্ছিক হওয়ার শর্ত থাকবে। অতএব যদি কেউ নিজে জেনে বুঝে সহীহ মনে করে মিথ্যা বলে অথচ এটি বাস্তবে এর পরিপন্থী তবে সে তার অন্তর্ভূক্ত নয়। তা ছাড়া মিথ্যার অভ্যাসও থাকতে হবে।

২. اذا وعد اخلف - যখন কোন ওয়াদা করে সে তা পূর্ণ করে না। উদ্দেশ্য হল, ওয়াদা করার সময়ই তা পূর্ণ করার ইচ্ছা রাখে না। কিন্তু যদি ওয়াদা করার সময় তা পূর্ণ করার পাকাপোক্ত ইচ্ছা করে অতঃপর কোন অপারগতা বা ওযরের কারণে পূর্ণ করতে না পারে, তবে সে তার অন্তর্ভূক্ত নয়।

৩. اذا اؤتمن خان - যখন আমানত রাখা হয় তখন সে খেয়ানত করে। চাই মাল ও আসবাব উপকরনের আমানত হোক অথবা কেউ তার নিকট কোন গোপন তথ্য বলুক, তা অন্যদের কাছে প্রকাশ করে দিল, উভয় ছুরত খেয়ানতের অন্তর্ভূক্ত। এটা মুনাফিকির নিদর্শন।

একটি প্রশ্ন ঃ প্রশ্নটি হল, এ সব আলামতের কোন কোনটি মুসলমানদের মধ্যেও পাওয়া যায় তবে কি তাদেরকে মুনাফিক সাব্যস্ত করা হবে? সংখ্যাগরিষ্ট আলিমের সিদ্ধান্ত হল, এরূপ ব্যক্তি মুমিন মুসলমান। তাহলে হাদীস শরীফের অর্থ কি হবে?

এই প্রশ্নের প্রতি লক্ষ্য করে উলামায়ে ইসলামের একটি বড় দল এ হাদীসটিকে জটিল রেওয়ায়াতের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। এর উত্তরে বিভিন্ন রকমের উক্তি রয়েছে।

১। কুরআনে হাকীমে মুনাফিকের যে শাস্তি ও সতর্কবাণী উল্লেখিত হয়েছে সেটি হল, মুনাফিকের আকীদা সংক্রান্ত। অর্থাৎ, অন্তরে কুফর পরিপূর্ণ, শুধু বাহ্যিকভাবে মুসলমান হয়েছে। আর হাদীসে উদ্দেশ্য হল আমলী মুনাফিকী। যেমন, মিথ্যাচার ইত্যাদি।

২। اية المنافق তে আলিফ লাম আহদী (সুনির্দিষ্ট মুনাফিক বুঝায়)। যদ্বারা উদ্দেশ্য বিশেষ দল। যারা ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে। অর্থাৎ, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার অনুসারীরা।

৩। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই ইরশাদ সতর্কবাণী ও ধমকরূপে এসেছে। যাতে মুসলমান যথাসম্ভব এসব বদ খাসলত থেকে পরহেয করে এবং তা থেকে দুরে থাকা আবশ্যক মনে করে।

৪। এটি হল উপমার অধ্যায়। অর্থাৎ, এরূপ স্বভাব বিশিষ্ট মানুষ মুনাফিক সদৃশ্য, যেমন, নামায তরককারী।

হযরত হাসান বসরী র. এর মত প্রত্যাহার ঃ

হযরত হাসান বসরী র. বলেছিলেন,

من كان فيه ثلاث خصال لم اتحرج ان اقول انه منافق، اذا حدث كذب الخ

অর্থাৎ, যার মধ্যে তিনটি স্বভাব থাকবে আমি তাকে মুনাফিক বলতে কোন দোষ মনে করি না। যখন সে কথা বলে, তো মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে খেলাফ করে, আমানত রাখলে খেয়ানত করে।

এক ব্যক্তি হযরত আ'তা র. এর সামনে হযরত হাসান বসরী র. এর এ উক্তি বর্ণনা করলে তিনি বললেন, তাঁকে বল আ'তা সালাম বলেছেন এবং বলেছেন হযরত ইউসুফ আ. এর ভাইদের ঘটনা স্মরণ করুন। আর এ কথাও স্মরণ করুন যে, নিফাক শব্দটি তার ক্ষেত্রেও বলা যায়, যার অন্তরে ঈমান নেই। কারণ, আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেছেন,

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا

অতএব যার অন্তরে কুফর নেই তাকে মুনাফিক কিভাবে বলা হবে? সে ব্যক্তি হযরত হাসান র.কে হযরত আ'তা র. এর এ পয়গাম পৌঁছালে তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। তখন তিনি তার মত প্রত্যাহার করেন। অতঃপর হাসান র. স্বীয় শিষ্যদেরকে বলেন, অনুরূপভাবে যদি কোন আলিম আমার কথা বেঠিক সাব্যস্ত করেন তবে তোমরা আমাকে অবহিত করবে।

উলামায়ে কিরাম লিখেছেন, এই ফরমানে নববী জাওয়ামিউল কালিমের অন্তর্ভূক্ত। কারণ, মানুষের মধ্যে তিনটি জিনিস রয়েছে। বচন, কর্ম ও নিয়ত। এই তিনটি জিনিস ঠিক হয়ে গেলে আর কি বাকি থাকে।

এরূপভাবে আমলের তিনটি স্তর রয়েছে। ১. মনের কাজ, ২. জবানের কাজ, ৩. অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজ। মিথ্যাচার বচন খারাপ হওয়া বুঝায়। খেয়ানত কর্ম নষ্ট হয়ে যাওয়া বুঝায়। ওয়াদা খেলাফ নিয়ত খারাপ হয়ে যাওয়া বুঝায়।

٢٥ . بَاب قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْ الْإِيمَانِ

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ শবে কদরে ইবাদত ঈমানের একটি শাখা

٣٤. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضـــ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল من يقم ليلة القدر উক্তিতে স্পষ্ট।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১০, সাওম ঃ ২৫৫, ২৭০।

পূর্বেকার সাথে যোগসূত্র ঃ

ইমাম বুখারী র. এর মূল উদ্দেশ্য ঈমানী বিষয়াবলীর বিবরণ দিয়ে বাতিল ফিরকা মুরজিয়া, কাররামিয়া, জাহমিয়া, মু'তাযিলা ও খারিজীদের মত খন্ডন। মধ্যখানে অধীনস্থ রূপে চারটি অনুচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন। কারণ, একটি জিনিসের পরিচয় তার পরিপন্থী জিনিস দ্বারা হয়ে থাকে।

এবার অধীনস্থ অনুচ্ছেদগুলো থেকে অবসর হয়ে মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ঈমানের অংশ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর দিকে ফিরে যাচ্ছেন। পিছনের অনুচ্ছেদগুলোতে ঈমান সংক্রান্ত শেষ অনুচ্ছেদটি ছিল باب افشاء السلام من الاسلام তাতে সালামের আলোচনা ছিল। বস্তুত এই অনুচ্ছেদ হল শবে কদর সংক্রান্ত আলোচনা। যাতে ফিরিশতা সালামের প্রচার প্রসার করেন। এক হাদীসে এসেছে- শবে কদরে হযরত জিবরাঈল আ. ফিরিশতাদের একটি দল নিয়ে আগমন করেন। যাকে নামায, তিলাওয়াতে কুরআন এবং আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত দেখেন তাকে সালাম করেন। অর্থাৎ, এসব আবিদ ও যিকিররত ব্যক্তির জন্য রহমত ও নিরাপত্তার দোয়া করেন। এই ধারা সকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। যেমন, কুরআনে কারীমে রয়েছে

تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ.الْفَجْرِ. سورة القدر

(এই রাতে ফিরিশতা রূহুল কুদস (জিবরাঈল আ.) স্বীয় প্রভূর নির্দেশে কল্যাণময় বিষয় নিয়ে অবতীর্ণ হয়। এমনকি শবে কদরে ফজর উদয় পর্যন্ত এ অবস্থা থাকে।)

প্রশ্ন ঃ এখানে প্রশ্ন হয়, باب قيام ليلة القدر ও باب افشاء السلام **অনুচ্ছেদে চারটি অনুচ্ছেদের** দুরত্ব কেন?

উত্তর ঃ হযরত শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া র. থেকে উত্তর বর্ণিত আছে, ইমাম বুখারী র. এ পদ্ধতি অবলম্বন করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, লাইলাতুল কদরের যে সব ফযীলত হাদীস সমূহে এসেছে, সেগুলো শবে কদরের কোন বিশেষ সময়ের সাথে বিশেষিত নয় যে, আসল আর শেষ হয়ে গেল। বরং এটি পূর্ণ শবে কদরে প্রলম্বিত।

দ্বিতীয় যোগসূত্র ঃ পিছনের অনুচ্ছেদে মুনাফিকীর আলামতের বিবরণ ছিল, এ অনুচ্ছেদে ঈমানের আলামত সমূহের বিবরণ রয়েছে।

قوله ايمانا واحتسابا প্রতিটি আমল ইবাদতের জন্য সর্ব প্রথম শর্ত হল ঈমান। ঈমান ছাড়া কোন আমল কার্যকর নয়। সব বেকার হয়ে যাবে। এ কারণেই কাফিরদের সব আমল নিরর্থক। আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ রয়েছে-

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ لاَ يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلى شَيْئٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلاَلُ الْبَعِيْدُ.

(যারা স্বীয় প্রতিপালকের সাথে কুফরী করে তাদের অবস্থা আমল হিসেবে এই। যেমন, কিছু ছাই যেগুলোকে প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়ার দিনে বাতাস দ্রুত বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়, আর তারা যা কিছু আমল করেছিল এর কোন অংশ (উপকার) তাদের অর্জিত হবে না। এটা ছিল অনেক দূরবর্তী (মারাত্মক) ভ্রান্তি।) -সুরা ইবরাহীম

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, কাফিরদের আমল চাই যতই ভাল মনে হোক না কেন মাখলূক এগুলো দ্বারা যতই উপকৃত হোক না কেন, এগুলো ছাইয়ের স্তুপের ন্যায় কিয়ামতের দিন উড়ে যাবে। তারা আক্ষেপ করতে থাকবে। এতে বুঝা গেল ঈমান ছাড়া আমল ধর্তব্য নয়।

দ্বিতীয় স্থানে (সুরা নূরে) ইরশাদ করেছেন-

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتّٰى اِذَا جَاءَه لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَه فَوَفّٰهُ حِسَابَه وَاللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ. سورة النور

(যারা কুফরী করেছে, তাদের আমল এরূপ যেমন ধূ ধূ ময়দানে চমকিত বালু বা মরীচিকা পিপাসার্তরা তা দূর থেকে দেখে পানি মনে করে। এক পর্যায়ে যখন তার কাছে আসে তখন আর কিছুই পায় না, বরং আল্লাহর সিদ্ধান্ত তথা মৃত্যুকেই পায়। অতএব আল্লাহ তা'আলা তার হিসাব সমান সমান মিটিয়ে দিয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা হিসাবে তৎপর।) -সুরা নূর।

যে সব কাফির মনে করেছিল, আমরা বড় বড় কাজ করি, হাজার হাজার মাখলূকের কাজে আসি, এসব কি বেকার হয়ে যাবে? তাদেরকে উত্তর দিলেন যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান ছাড়া কোন আমল মূল্যবান নয়। পৃথিবীতে দেখ, রাষ্ট্রদ্রোহীর কোন ভাল কাজের কোন মূল্য সরকারের দৃষ্টিতে নেই। তাহলে আল্লাহদ্রোহীর কোন ভাল কাজও মূল্যহীন হবে।

احتساب এটি দ্বিতীয় বন্ধন। অর্থাৎ, রাত্রিতে ইবাদতের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও সওয়াব অন্বেষন।

নেক কাজ যদিও এমনিতেই সওয়াবের কারণ, কিন্তু তাতে সওয়াবের নিয়ত করাও স্বতন্ত্র একটি আমল। এর ফলে অতিরিক্ত সওয়াব পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে যে সব আমলের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো আদায়কালে এগুলোর বৈশিষ্ট্যের কল্পনা ও তা অর্জনের নিয়ত দ্বারা তাড়াতাড়ি ফল লাভ হয়।

হযরত শাহ ওলীউল্লাহ র. এর 'আনফাসুল আরিফীনে' একটি ঘটনা লিখেছেন, জনৈক বুযুর্গ দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুজাহাদা করেছেন, আওয়াজ এল, ইবাদত কি জন্য করছ? কি চাচ্ছ? আমি তা দিব। সে বলল, আমি কিছুই চাই না। তখন বললেন, তাহলে ইবাদত কেন করেছ? উত্তর দিল, আমার কাজই এটা। কারণ, আমাকে তো সৃষ্টিই করা হয়েছে এ জন্য। যেমন, গাভীর কাজ দুধ দেয়া। এ ছাড়া তো আর কোন উপায় নেই। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ইরশাদ হল, তুমি যা চাও আমি তাও দেই আর যা চাও না তাও দেই।

যদিও গোলামদের কাজই হল এটা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অর্জনের নিয়তও খারপ নয়। বরং এটাও একটি স্বতন্ত্র সওয়াবের কাজ। হযরত ফারূকে আজম রা. এর উক্তি রয়েছে, ঈমান ও সওয়াব মনে করে যে ইবাদত করবে, সে দ্বিগুন সওয়াব পাবে।

قوله غفر له ما تقدم من ذنبه

এর দ্বারা উদ্দেশ্য সগীরা গুনাহসমূহ। কবীরা গুনাহ ক্ষমা করার বিষয়টি আল্লাহর সোপর্দ। অর্থাৎ, তওবা ছাড়াও মাফ হতে পারে, কিন্তু মূলনীতি ও প্রতিশ্রুতি নয়।

একটি প্রশ্ন ঃ আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে বলেছেন, লাইলাতুল কদরে ইবাদতে গুনাহ মাফ হয়। পরবর্তীতে باب تطوع قيام رمضان من الايمان অনুচ্ছেদে হাদীস রয়েছে, من قام رمضان الحديث. যদ্দারা প্রমাণিত হয়, সারা রমযান ইবাদত করলে গুনাহ মাফ হবে।

সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা ঃ

মূলতঃ উদ্দেশ্য লাইলাতুল কদরের ইবাদতই। গুনাহ মাফের প্রতিশ্রুতি এরই উপর। কিন্তু যেহেতু লাইলাতুল কদর সুনির্দিষ্ট নয়, গোটা রমযানে হতে পারে, অতএব লাইলাতুল কদরে ইবাদত সুনিশ্চিতরূপে লাভ হতে পারে যদি পূর্ণ রমযানে ইবাদত করে। এ জন্য লাইলাতুল কদরের সাথে من يقم শব্দ বলেছেন, আর রমযানের সাথে উল্লেখ করেছেন, من قام শব্দ। কারণ, রমযানে লাইলাতুল কদরের ইবাদত অর্জন সুনিশ্চিত। কাজেই নিশ্চয়তা বুঝানোর জন্য من قام উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর পরিপন্থী যে শুধু লাইলাতুল কদরে ইবাদত করতে চায়, যেহেতু এর সুনিশ্চিত জ্ঞান হতে পারে না, এ জন্য من يقم শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এটি দোদুল্যমানতা বুঝায়।

লাইলাতুল কদর ঃ

লাইলাতুল কদর বা শবে কদর দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এ সম্পর্কে প্রায় পঞ্চাশটি উক্তি রয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে ইনশাআল্লাহ আসবে।

কুরআনে হাকীম দ্বারা বুঝা যায়, লাইলাতুল কদর রমযান শরীফে-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنَ

সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, রমযানুল মুবারকের শেষ দশকে বিশেষতঃ বেজোড় রাতগুলোতে (একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ, উনত্রিশ তারিখের রজনীতে) লাইলাতুল কদর তালাশ করা উচিত। অতঃপর বেজোড় রাতগুলোতেও প্রবল ধারণা অনুসারে সাতাশ তারিখের রজনী। والله اعلم بالصواب

লাইলাতুল কদরের বাহ্যিক শব্দের অর্থ হবে কদরের রাত। কদর শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১। তাকদীরের অর্থে। এ হিসেবে এ রজনীকে এ জন্য লাইলাতুল কদর বলা হয় যে, এ রাতে ব্যবস্থাপক ফিরিশতাদেরকে পুরো বছরের সমস্ত বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং তাদের নিকট সোপর্দ করার মত বিষয়গুলো তাদের নিকট অর্পন করা হয়। কারো মৃত্যু, কারো জীবন, কারো উন্নয়ন, কারো অধঃপতন, এরূপভাবে রিযিকের ঘাটতি ও বৃদ্ধি ইত্যাদি।

২। ইযযত ও আজমত। অর্থাৎ, ইযযতের রাত আজমতের রাত। لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ.

এই রাতেই কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়েছে। اَنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

তা ছাড়া এই ইযযত ও আজমত ইবাদতকারীদের সাথেও সংশ্লিষ্ট হতে পারে। কারণ, এ রাতে ইবাদতকারীদের বিরাট মর্যাদা রয়েছে আল্লাহ তা'আলার নিকট।

৩। এ রাতে যে সব ইবাদত করা হয় এগুলোর মর্যাদা অন্য রাতের ইবাদতের তুলনায় অনেক বেশী ইত্যাদি ইত্যাদি।

٢٦. بَاب الْجِهَادُ مِنْ الْإِيمَانِ

২৬ অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদ ঈমানের একটি অংশ

٣٥. حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضــ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ

أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ .

৩৫. হারমী ইবনে হাফ্স র. ..... হযরত আবূ যুর'আ ইবনে আমর ইবনে জারীর র. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হযরত আবূ হুরায়রা রা. কে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে বের হয়, যদি সে শুধু আল্লাহর উপর ঈমান এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাসের কারণে বের হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দেন যে, আমি তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনব তার সওয়াব বা গনীমত (ও সওয়ার) সহ কিংবা তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করব।

আর আমার উম্মতের জন্য কষ্টদায়ক হবে বলে যদি মনে না করতাম, তবে কোন সেনাদলের সাথে না গিয়ে বসে থাকতাম না। আমি অবশ্যই এটা পসন্দ করি যে, আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই।

পূর্বেকার সাথে যোগসূত্র ঃ

এর পূর্বেকার অনুচ্ছেদে লাইলাতুল কদরের বিবরণ ছিল। স্পষ্ট বিষয় লাইলাতুল কদরের তালাশে মুজাহাদা করতে হয়, পরিশ্রম করতে হয়, পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়, এরূপভাবে জিহাদেও জীবনকে শঙ্কায় ফেলতে হয়, পরিবার পরিজন থেকে দূরে থাকতে হয়, তা ছাড়া শবে কদর তালাশে মেহনত পরিশ্রম করে মুজাহাদা করে শবে কদর অন্বেষন করে কখনো তা লাভ হয় কখনো হয়না। এমনিভাবে মুজাহিদ ফী সাবিল্লিাহও আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য শাহাদত অন্বেষী হয়, তা কামনা করে, এরপর কখনো শাহাদতের মর্যাদা লাভ হয় কখনো হয় না। অতএব উভয় অনুচ্ছেদের মাঝে শক্তিশালী মিল হয়ে গেল। মোটকথা, উভয়ের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে হয়। উভয়টি ঈমানের অন্তর্ভূক্ত।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল من خرج في سبيله শব্দে।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, কিতাবুল ঈমান ঃ ১০, জিহাদ ঃ ৩৯১, ৩৯২, ৪১৭, ৪৪০, ১০৭৩, ১১১১, ১১১২, মুসলিম ২/১৩৩।

একটি প্রশ্ন ঃ জিহাদ দুই প্রকার। নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ ও কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ। স্পষ্ট বিষয়, কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদে কষ্ট বেশী। জীবনকে আশঙ্কায় ফেলে দিতে হয়। এ হিসেবে জিহাদকে লাইলাতুল কদরের আগেই উল্লেখ করা উচিত ছিল।

উত্তর ঃ নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের মরতবা উঁচু। এর দ্বারা মানুষ নিজেকে আল্লাহ তা'আলার বিধি বিধানের অনুগত বানায়। ইরশাদে নববী রয়েছে- المجاهد من جاهد نفسه অর্থাৎ, কামিল মুজাহিদ সে যে, নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। কারণ, মানুষের শত্রুগুলোর মধ্যে সব চেয়ে বড় হল নফস। কাজেই নফসের জিহাদ হবে সর্বোচ্চ পর্যায়ের। তা ছাড়া কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের সুযোগ তো কখনো কখনো হয়। কিন্তু নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ এর পরিপন্থী। তার বিরুদ্ধে সর্বদা জিহাদ করতে হয়। অতঃপর শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করলে কখনো কখনো মানুষ মজাও লাভ করে। কিন্তু নিজের নফসের বিরুদ্ধে মুজাহাদায় কোন মজা নেই। এ জন্য নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, বরং কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হয়।

কারণ, যতক্ষন পর্যন্ত নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাকে সন্তুষ্ট না বানাবে, তাকে নিয়ন্ত্রনে ন' আনবে ততক্ষন পর্যন্ত জিহাদের জন্য প্রস্তুত হওয়া কঠিন। কারণ, এমতাবস্থায় শথ সহস্র ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রনা মনে আসবে যে, আমি শহীদ হলে আমার পরিবার পরিজন ও বাল বাচ্চাদের কি হবে? ইত্যাদি ইত্যাদি। এ জন্য নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের কথা আগে বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা সমস্ত ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রনা খতম হয়ে যাবে।

২। যদি নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ ছাড়া কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাহলে হয়তো মালে গনিমতের লোভে করবে অথবা কোন প্রতিশোধ প্রবনতার অধীনে করবে। নিজের নফসের ক্রোধ নামানোর জন্য অথবা বাঁদির লোভে কিংবা অন্য কোন ফাসিদ উদ্দেশ্যে জিহাদ করবে যা বস্তুত জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ হবে না। এ জন্য নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের কথা আগে উল্লেখ করেছেন।

শব্দ বিশ্লেষন ঃ

انتدب হামযার নিচে যের, নূনের উপর জযম, তা এর উপর যবর, এর পরে দাল তারপর বা। এখানে অর্থ হল, জিম্মাদার হওয়া। যেমন, কিতাবুল জিহাদের ৪৪০পৃষ্ঠায় এসেছে, تكفل الله من جاهد في سبيله অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা তার পথে জিহাদকারীর জিম্মাদারী তিনি গ্রহণ করেন, তার জামিন হয়ে যান।

لا يخرجه الا ايمان ঃ ايمان শব্দটি ফায়েল হিসেবে মারফূ'। وتصديق برسلي প্রসিদ্ধ ও অধিকাংশ কপিতে এখানে ওয়াও রয়েছে। বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ উমদাতুল কারী, ইরশাদুস সারী ইত্যাদিতে ওয়াওই আছে। তাছাড়া আমাদের ভারতীয় কপির টীকায়ও অনুরূপ আছে। ওয়াও হলে কোন প্রশ্নও নেই কারণ, আল্লাহর প্রতি ঈমানও জরুরী, রাসূলের প্রতি বিশ্বাসও আবশ্যক। কিন্তু আমাদের ভারতীয় কপির মূলপাঠে আছে او تصديق এমতাবস্থায় প্রশ্ন হবে, বাহ্যত বুঝা যায় এ দুটির একটি যথেষ্ট অথচ কারো ঈমান যদি শুধু আল্লাহর প্রতি হয়, তদ্বীয় রাসূলের প্রতি না হয়, অথবা শুধু রাসূলের প্রতি ঈমান হয় আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস না হয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে এরূপ লোক মুক্তি পেতে পারে না।

উত্তর ঃ যদি او শব্দটিকে এখতিয়ার দান অথবা দুটি জিনিসের মধ্যে সমতার জন্য নেয়া হয়, তবে নিঃসন্দেহে প্রশ্ন হবে। আর যদি او শব্দটিকে ওয়াও এর অর্থে নেয়া হয় তবে অন্যান্য কপির নিদর্শন থাকার ফলে কোন প্রশ্ন হবে না। এমনিভাবে যদি او শব্দটিকে বর্ণনাকারীর সন্দেহের জন্য নেয়া হয়, তথা রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো একটিই বলেছিলেন, কিন্তু বর্ণনাকারীর সহীহ শব্দ মনে ছিল না, তাহলে অর্থগত রেওয়ায়াত করে বলেছেন, او تصديق برسلي এমতাবস্থায়ও কোন প্রশ্ন হবে না। কারণ, আল্লাহর প্রতি ঈমান রাসূলগণের প্রতি ঈমানকে আবশ্যক করবে। আর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস আল্লাহর প্রতি ঈমানকে আবশ্যক করবে।

ان ارجعه হামযার উপর যবর من باب ضرب رجع يرجع رجعا থেকে মানে ফেরানো। অর্থাৎ, আমি তাকে ফিরিয়ে নিব। আর এটি رجع يرجع رجوعا লাযিম রূপেও ব্যবহৃত হয়। অর্থ ফিরে আসা। কিন্তু এখানে প্রথম অর্থ মুতাআদ্দী উদ্দেশ্য। কোন কোন কপিতে হামযার উপর পেশ সহকারে এসেছে।

من اجر او غنيمة এখানে او শব্দটি مانعة الخلو এর জন্য এসেছে, مانعة الجمع উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ কমপক্ষে এক সওয়াব তো পাবেই। হতে পারে সওয়াব এবং গনিমত উভয়টিই লাভ করবে।

অথবা او কে و এর অর্থে নেয়া হবে। যেমন, মুসলিম ইত্যাদির রেওয়ায়াতে আছে, من اجر وغنيمة الخ

আল্লামা কুরতুবী র. বলেন, من اجر فقط او اجر مع غنيمة এতে যেহেতু পুনরাবৃত্তি ছিল, সেহেতু সংক্ষেপের জন্য দ্বিতীয় اجر কে উহ্য করা হয়েছে।

او ادخله الجنة এখানে او বিচ্ছিন্নতার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, এ দুটি না একত্রিত হতে পারে, না এক সাথে উঠে যেতে পারে। মোটকথা, দুটি বিষয়ের একটি অবশ্যই পাবে। যদি জীবন্ত ফিরে আসে তবে সওয়াব তো সর্বাবস্থায় আর গনিমতও বেশীর ভাগ সময় লাভ হয়। আর শহীদ হয়ে গেলে সোজা জান্নাতে প্রবেশ করবে। মোটকথা, লাভই লাভ। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا اِلاَّ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُصِيْبَكُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِه اَوْ بِاَيْدِيْنَا فَتَرَبَّصُوْا اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُوْنَ.

(তোমরা তো আমাদের ব্যাপারে দুটি কল্যাণকর জিনিসের একটির অপেক্ষা করতে থাক। আমরা তোমাদের ব্যাপারে অপেক্ষমান যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর আযাব অবতীর্ণ করুন অথবা আমাদের হাতে তোমাদের শাস্তি দিন। তোমরাও অপেক্ষা কর। আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান।) -সুরা তাওবা।

ولو لا ان اشق على امتي الخ যদি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি যুদ্ধে তাশরীফ নিতেন, তাহলে উম্মতের জন্য বিভিন্ন রকমের জটিলতা দেখা দিত। যেমন, ১. আসন্ন সময় খলীফা ও শাসকের উপর প্রতিটি যুদ্ধে বের হওয়া ওয়াজিব হত। (সারিয়্যা ও গাযওয়ার সংজ্ঞা ও পার্থক্যের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ নাসরুল বারী -কিতাবুল মাগাযী)

২. যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় থেকে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ইন্তেজাম না করতেন, তাহলে মুমিনদের জন্য কষ্টের কারণ হত।

৩. যে সব মা'যূর জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে পারতেন না, তাদের মন ভেঙ্গে যেত, ফলে তাদের মন জয়ের উদ্দেশ্যে কোন কোন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদের সাথে মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করতেন।

ولوددت اني اقتل الخ অর্থাৎ, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহতে আমার এমন মজা লাগে যে, এক দু বার নয় বরং মনে চায় বার বার জান দেই।

প্রশ্ন ঃ শহীদের উপরে হল সিদ্দীকের মরতবা এর উপর নবীর মরতবা। অতএব নবী শহীদ অপেক্ষা দু স্তর উত্তম। অতএব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদত কামনা করলেন কেন?

উত্তর ঃ ১। এই কামনা প্রকাশ করে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্য ছিল উম্মতকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা ও শাহাদাতের প্রতি আগ্রহী করে তোলা।

২। নিঃসন্দেহে নবুওয়াত ও রিসালাত শাহাদাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। কিন্তু শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন কারণে কখনো কখনো নিম্নস্তরের জিনিসের প্রতি আগ্রহ হয়। যেমন, কারো সামনে পোলাও কোর্মা ভর্তি পাত্র রাখা আছে। তিনি তা থেকে খাচ্ছেন, কিন্তু বিচিত্র স্বাদের জন্য তথা স্বাদ পরিবর্তনের জন্য তার চাটনির শখ ও চাহিদা হয়।

হযরত উমর রা. যখন হযরত খালিদ রা.কে বরখাস্ত করে দেন, তখন তিনি একটি খুশি প্রকাশ করেন। সেটি হল, এতদিন পর্যন্ত সেনাবাহিনী দ্বারা যুদ্ধ করাতাম। এবার নিজে যুদ্ধ করব। স্পষ্ট বিষয়, জেনারেলের মর্যাদা সিপাহী অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু সিপাহী হয়ে লড়ার মধ্যে এক বিশেষ প্রকার মজা রয়েছে।

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব র. বলেছেন, যদি আমি জান্নাত পেয়ে যাই তবে শুধু একটি মুসল্লার জায়গা আল্লাহর কাছে কামনা করব, যাতে আমি ইবাদতই করতে থাকব। দেখুন, জান্নাত কষ্টের

নিবাস নয়, কিন্তু ইবাদতের মজার কারনে তা কামনা করছেন। হযরত শাইখুল হিন্দ র. এর নিকট কেউ বললেন, আপনার কবর হযরত নানুতবী র. এর কবরের পাশে হলে কতই না ভাল হয়।

হযরত শাইখুল হিন্দ র. বললেন, আমি তো এটা কামনা করি না, আমার কামনা হল, আল্লাহর পথে যেন আমার দেহ টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

২৭. بَاب صَوْمُ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنْ الْإِيمَانِ.

অনুচ্ছেদ ঃ রমযানের রাতে সওয়াব মনে করে নফল ইবাদতও ঈমানের অংশ

٣٦. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৩৬. ইসমাঈল র. .... হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি রমযানের রাতে ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তার পূর্বের গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল من قام رمضان বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১০, সাওম ঃ ২৬৯।

ব্যাখ্যা ঃ

হযরত শাইখুল হিন্দ র. বলেন, উলামায়ে মুহাদ্দিসীন যে আমলকে ঈমানের অন্তর্ভূক্ত করেন, তাদের দুটি দল রয়েছে। একদলের উক্তি হল, শুধু ফরযগুলো ঈমানের অন্তর্ভূক্ত। আরেক দলের মতে ফরয, নফল ও সমস্ত আমল তাতে অন্তর্ভূক্ত। প্রবল ধারণা, ইমাম বুখারী র. এ শিরোনামে تطوع শব্দ বাড়িয়ে দ্বিতীয় উক্তির প্রাধান্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। والله اعلم

تطوع قيام رمضان দ্বারা উদ্দেশ্য তারাবীহ। যেটি রমযানুল মুবারকের রাতের বিশেষ আমল। তা ছাড়া তাহাজ্জুদ, নফল, তিলাওয়াতে কুরআন ইত্যাদি সব স্ব স্ব স্থানে কিয়ামের অন্তর্ভূক্ত। অবশ্য নফলের জামাআত চাই তাহাজ্জুদের হোক বা অন্য কোন নামাযের, তারাবীহ, সূর্য গ্রহণ ও ইস্তিসকার নামায ছাড়া যদি তিনের অধিক মুক্তাদি হয় তবে হানাফীদের মতে মাকরূহ। অবশ্য দুজন হলে মাকরূহ নয়।

٢٨. بَاب صَوْمُ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِنْ الْإِيمَانِ

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ সওয়াবের নিয়তে রমযানের রোযা রাখা ইমানের অংশ

٣٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضــ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৩৭. ইবনে সালাম র. .... হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা রাখে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ হাদীসের সাথে মিল স্পষ্ট من صام رمضان الخ বাক্যে।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ১/১০, সাওম ঃ ২২৫, ২৭০।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, রমযানের রোযা রাখা ঈমান ও সওয়াব মনে করা সত্ত্বেও গুনাহ মাফের কারণ। রমযানুল মুবারকের পূর্ণ মাস খায়ের বরকতের মাস। আল্লাহর রহমতের জোশ থাকে। যেমন, হাদীস শরীফে আছে- রমযানের প্রথম রাতে ঘোষনা শুরু হয়ে যায়-

يا باغي الخير! اقبل ويا باغي الشر! اقصر. مشكوة

হে কল্যাণকামী! (হে নেক ও সওয়াব অন্বেষী!) সামনে অগ্রসর হও। (এবং রহমত দ্বারা পূর্ণ উপকৃত হও) হে অনিষ্টকামী! বিরত হও। (মন্দ ও অনিষ্ট কর্ম সম্পূর্ণ ছেড়ে দাও যাতে ক্ষতিগ্রস্থতা থেকে বেঁচে থাকতে পার।)

এক হাদীসে আছে, رغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له ধুলিময় হোক তার নাক, যার উপর রমযান এল, অতঃপর তা সমাপ্ত হয়ে গেল, তার মাগফিরাতের পূর্বেই।

তার চেয়ে কঠোর সতর্কবাণী এসেছে হযরত কা'ব ইবনে উজরা রা. এর হাদীসে। প্রিয়নবী সা. একবার বললেন, তোমরা মিম্বরের কাছে এসে যাও, আমরা কাছে এলাম, তিনি মিম্বরে আরোহন করলেন। প্রথম সিড়িতে কদম রেখে বললেন, আমীন! অতঃপর দ্বিতীয় সিড়িতে কদম রেখে বললেন, আমীন! এমনিভাবে তৃতীয় সিড়িতে কদম রেখে বললেন, আমীন! আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ একটি নতুন বিষয় দেখলাম, তিনি বললেন, হ্যাঁ, ঘটনা এই হয়েছিল, এখন হযরত জিবরাঈল আমীন আ. আমার সামনে এসেছিলেন। আমি যখন প্রথম সিড়িতে কদম রাখি, তখন তিনি বললেন, ধংস হোক সে ব্যক্তি, রমযান মুবারকের মাস পেয়েছে তা সত্ত্বেও তাঁর মাগফিরাত হল না। আমি বললাম, আমীন! অতঃপর যখন আমি দ্বিতীয় সিড়িতে আরোহন করলাম, তখন তিনি বললেন, ধংস হোক সে ব্যক্তি, যার সামনে আমার নাম আলোচিত হয়, অথচ সে দুরূদ প্রেরণ করে না। আমি বললাম, আমীন! আমি যখন তৃতীয় সিড়িতে পৌঁছলাম, তখন জিবরাঈল আমীন আ. বললেন, ধংস হোক সে ব্যক্তি যে তার মাতা পিতা দুজন বা একজনকে বার্ধক্যে পাবে, অথচ তারা তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করায়নি। আমি বললাম, আমীন!

আল্লাহর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের রাতে ইবাদত এবং দিনের রোযাকে মাগফিরাতের মাধ্যম সাব্যস্ত করেছেন। আর ইমাম বুখারী র. স্বীয় দৃষ্টিকোন থেকে এগুলোকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

প্রশ্ন ঃ এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, রমযানের রোযা ফরয, আর কিয়ামে রমযান তথা তারাবীহ হল সুন্নাত। অতএব ধারাবাহিকতার দিকে লক্ষ্য করলে রমযানের রোযা তারাবীহের আগে উল্লেখিত হওয়া উচিত ছিল। ক্রমবিন্যাসে ফরযের আগে নফলকে কি কারনে আনা হল?

উত্তর ঃ ১। রমযানুল মুবারকের আমলগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম আমল হল, কিয়ামে রমযান। এটি চাঁদ দেখার পরই শুরু হয়ে যায়। কারণ, শরীয়তে রাত হয় পূর্বে, দিন হয় পরে। অতএব চাঁদ দেখার পর প্রথম রাতেই তারাবীর আমল করা হয়। রোযা রাখা হয় দিনে।

২। রমযানে তারাবীহর নফল রমযানের রোযার ভূমিকা। মূলনীতি হল, ভূমিকা মূল বস্তুর আগেই হয়। কেউ কেউ বলেছেন, ইমাম বুখারী র. স্বীয় এই ক্রম দ্বারা সম্ভবত এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, সুন্নতের পথে ফরযে প্রবেশ করা উচিত। কারণ, মকবূলিয়্যাতের পথ এটাই।

٢٩. بَاب الدِّينُ يُسْرٌ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ

২৯. পরিচ্ছেদ ঃ দীন সহজ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পসন্দনীয় হল সহজ সরল দীনে হানীফিয়্যা।

٣٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضـــ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَةِ .

৩৮. আবদুস সালাম ইবনে মুতাহ্হার র. .... হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ নিশ্চয়ই দীন সহজ-সরল। দীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে দীন তার উপর বিজয়ী হয়। কাজেই তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং (মধ্যপন্থার) নিকটবর্তী থাক, শুভ সংবাদ গ্রহণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও রাতের কিছু অংশে (ইবাদতের মাধ্যমে) সাহায্য প্রার্থনা কর।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ان الدين يسر বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১০, ৯৫৭।

একটি প্রশ্ন ঃ পূর্বাপরের সাথে বাহ্যত এ অনুচ্ছেদের কোন মিল নেই।

উত্তর ঃ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে রমযানের রোযার আলোচনা ছিল। কুরআন মজীদে রোযার হুকুমের পর ইরশাদে ইলাহী রয়েছে-

يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

২৯৮ (আল্লাহ তা'আলা চান তোমাদের জন্য সহজ করতে, তোমাদের জন্য কঠোর করতে চান না।)

এই মিলের কারণে গ্রন্থকারও রমযানের রোযা অনুচ্ছেদের পর الدين يسر অনুচ্ছেদ এনেছেন। এর দ্বারা অনুমিত হয়, ইমাম বুখারী র. কুরআনে কারীমেরও কত বড় পারদর্শী হাফিজ ছিলেন!

ইমাম বুখারী র. রোযার অনুচ্ছেদ কায়েম করে তৎক্ষনাৎ কুরআনে হাকীমের দিকে চলে যান। ইরশাদে ইলাহী রয়েছে-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنَ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَات مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. الآية (سيقول)

ذو الدين يسر আলিফ লাম আহদী। উদ্দেশ্য হল দীন ইসলাম। يسر শব্দটির الدين - حمل এর উপর يسر তা'বীলে হয়েছে। অথবা এটি زيد عدل এর অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ, দীন চূড়ান্ত পর্যায়ের সহজ হওয়ার কারনে নিজেই সহজ হয়ে গেছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য খারিজী ও মু'তাযিলার মত খন্ডন। কারণ, তারা দীনকে এত কঠিন বানিয়ে দিয়েছে যে, এক ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দিলে তাদের মতে সে কাফির হয়ে যায় বা ঈমান থেকে বেরিয়ে যায়, কোন কবীরা গুনাহ হয়ে গেলে কাফির হয়ে যায়। ইমাম বুখারী র. বলেন, দীন এত কঠিন নয়, যতটা কঠিন তারা বানিয়ে রেখেছে, বরং দীন সহজ।

২। এর পূর্বে ধারাবাহিক চারটি অনুচ্ছেদে উল্লেখিত আমল দ্বারা বুঝা যায় দীনে অনেক কষ্ট রয়েছে। লাইলাতুল কদরে ইবাদত, কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, রমযানের রোযা এবং তারাবীহর দ্বারা তো বুঝা যায়, দীনে নেহায়েত পরিশ্রম ও মুজাহাদা কাম্য। এবার ইমাম বুখারী র. বলতে চান, যদিও কষ্ট মুজাহাদা কাম্য, কিন্তু এতটুকুই, যতটুকু সর্বদা ও পাবন্দি সহকারে নিয়মিত করা সম্ভব। যেমন, ইরশাদে নববী রয়েছে- احب الدين الى الله مادام عليه صاحبه

সারকথা, সহনীয় পরিমাণ উদ্দেশ্য এবং সমস্ত আমলে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কাম্য।

الدين يسر দীন ইসলাম সহজ। এর এক অর্থ হল, পূর্ববর্তী অন্যান্য দীনের তুলনায় ইসলাম খুবই সহজ। মানে সাবেক উম্মতদের প্রতি যে সব কঠোর আহকাম ছিল সেগুলোতে মারাত্মক পরিশ্রম ছিল, তা এ উম্মত থেকে তুলে দেয়া হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلاَلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ. سورة الاعراف

অর্থাৎ, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যে সব গুনাবলী তাওরাত ও ইঞ্জিলে উল্লেখিত হয়েছে, সেগুলোতে এটাও আছে যে, তিনি এ উম্মত থেকে বনী ঈসরাইলের উপর যে সব বোঝা ও গলার ফাঁস ছিল সেগুলো নামিয়ে দিবেন। মানে জটিলতা তুলে দিবেন। যেমন, কবীরা গুনাহ থেকে তওবার ক্ষেত্রে নিজেকে হত্যা করা। এ উম্মতের তওবা হল আন্তরিকভাবে লজ্জিত হয়ে সে গুনাহ পরিহার করা ও বেঁচে থাকার সুদৃঢ় ইচ্ছা ও সংকল্প করা।

২। কাপড়ে নাপাক লাগলে সে অংশ কর্তন বা পুড়িয়ে ফেলা ব্যতীত পবিত্র হত না। আমাদের এখানে যে কোন প্রকার নাপাকিই হোক না কেন, তিন বার ধুলে পবিত্র হয়ে যাবে। এমনিভাবে যাকাতে মালের এক চতুর্থাংশ দিতে হত। আমাদের এখানে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। এমনিভাবে পূর্ববর্তী

উম্মতদের মধ্যে গনীমতের মাল হালাল ছিল না। এ উম্মতের জন্য তা হালাল করা হয়েছে। আহলে কিতাবের নামাযগুলো শুধু ইবাদতখানায় হত, আমাদের এখানে ওয়াক্ত হলে যে কোনখানে পড়লেই আদায় হয়ে যাবে। ইত্যাদি।

২। যদি বাস্তবতার নিরিখে দেখা যায় তবেও দীন ইসলাম অনেক সহজ। আমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার যত অনুগ্রহ রয়েছে সেগুলো অসীম। اِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ لَاتُحْصُوْهَا মায়ের পেট থেকে মানুষের উপর আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও নেয়ামতের বৃষ্টি বর্ষন শুরু হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করম দেখুন, ১৫ বছর পর্যন্ত তার উপর কোন দায় দায়িত্ব অর্পন করা হয় না। এরপরও দিবারাত্রি শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দায়িত্ব অর্পন করা হয়। প্রায় ১৫ বছরের পর শুধু এক মাসের রোযা ফরয করা হয়। সারা জীবনে শুধু একবার হজ্ব ফরয করা হয়। মোটকথা, আল্লাহ তা'আলার এহসান ও অনুগ্রহের প্রতি চিন্তা করলে দেখা যাবে তাঁর নেয়ামত সীমাহীন।

شکر نعمتهائي تو جندانکه نعمتهائي تو ÷ عذر تقصيرات ما جندانکه تقصيرات ما.

احب الدين الى الله الحنيفية السمحة আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় দীন হল সহজ দীনে হানীফ হানীফের অর্থ হল, বাতিল ধর্ম পরিহার করে সত্য ধর্ম অবলম্বনকারী। যেমন শেখ ফরীদুদ্দিন আত্তার র. স্বীয় পুস্তিকায় 'মানতিকুত তাইরে' ইঙ্গিত করেছেন-

از يکي کو واز همه يك سوي باش ÷ يك دل و يك قبله ويك روي باش.

হানীফ মূলত হযরত ইবরাহীম আ. এর উপাধি। এমনিতো সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম হানীফ।

وَمَا اُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ. سورة البينة

তাঁদের নির্দেশ এটাই দেয়া হয়েছিল যে, আল্লাহর ইবাদত এরূপভাবে করবে, যেন তার জন্যই কেবল মাত্র তা খালিস থাকে, সম্পূর্ণ একমূখী হয়ে।

আল মিলাল ওয়ান নিহাল গ্রন্থে আছে, হানীফ শব্দটি সাবীর বিপরীত। হানীফ নবুওয়াত স্বীকারকারী, আর সাবী হল, নবুওয়াত অস্বীকারকারী। যেহেতু হযরত ইবরাহীম আ.কে সাবীদের দিকে নবীরূপে প্রেরণ করা হয়েছিল, আর তাদের আকীদা ছিল, আমলের মাধ্যমে তারকাগুলোকে অনুগত বানানো যায়, এজন্য এই হানীফী গুনে হযরত ইবরাহীম আ. হলেন মূল। যেহেতু তারা তারকা পূঁজা করত, সেহেতু তাদের সংশোধনের জন্য হযরত ইবরাহীম আ. প্রেরিত হন।

لن يشاد الدين احد দালের উপর তাশদীদ ফে'লে মা'রূফ, বাবে মুফাআলা থেকে। মূলত শব্দটি ছিল, يشادد মূলনীতি অনুসারে ইদগাম করা হয়েছে। এর অর্থ হল, একজনের অপরজনের উপর বিজয় লাভ করার জন্য শক্তি পরীক্ষা করা। অর্থাৎ, যে কেউ দীনের সাথে শক্তি পরীক্ষা করতে যাবে সে পরাস্ত হবে। দীন তার উপর বিজয়ী হবে।

مشادة في الدين এর অর্থ হল, দীনি আমল দুই প্রকার। ১. আযীমত, ২. রুখসত। আযীমত সে আমলকে বলে, যেটি মূলত ওয়াজিব। অর্থাৎ, শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে ওযরের প্রতি লক্ষ্য না করে নির্ধারিত করা হয়। আর যে আমলের মধ্যে বান্দাদের ওযরের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়, সেটি হল রুখসত এ দুটি জিনিস দীনের অন্তর্ভূক্ত। অতএব দাসত্বের মূল দাবী হল, স্থান ও অবকাশের দিকে লক্ষ্য করে উভয়টির উপর আমল করা। কিন্তু কেউ যদি মনে মনে ইচ্ছা করে যে, সর্বাবস্থায় আযীমতের উপরই

আমল করবে, রুখসতের উপর কখনই আমল করবে না, তবে অভিজ্ঞতা সাক্ষী যে, অনেক সময় মানুষ এ ব্যাপারে সফলকাম হয়না। শুধু আযীমতের উপর আমল করা শরঈ রুখসত দ্বারা উপকৃত না হওয়াও কঠোরতা। আমরা বান্দা বন্দেগীর দাবী হল, শরীয়তের পক্ষ্য থেকে যে হুকুমই যে অবস্থায় আসবে আমরা তার উপর আমল করব। আযীমতের অবস্থায় আযীমতের উপর, রুখসত অবস্থায় তদ্বারা উপকৃত হব। শুধু আযীমতের উপর আমল করার সুদৃঢ় ইচ্ছা বস্তুত শানে বন্দেগীর পরিপন্থী এবং নিজেকে অনেক উঁচু মনে করার নামান্তর। এটা কোন ক্রমেই বৈধ নয়। যেমন, রোগীর জন্য আল্লাহ তা'আলা অবকাশ দিয়েছেন, নামাযে দাড়ানোর শক্তি না থাকলে বসে পড়তে পারবে। ওযরের অবস্থায় ওযুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করতে পারবে। শরঈ সফরে রোযা ভাঙতে পারবে। ইত্যাদি।

কিন্তু শয়তানের ধোকায় পড়ে এ সব অবকাশের উপর আমল করে না। বরং তায়াম্মুমের স্থলে ওযু করে রোগ বৃদ্ধি করে, সফরে ভীষন কষ্ট হওয়া সত্তেও রোযা ভাঙ্গে না। ফলে ভীষন পেরেশানী বরদাশত করে। হাদীসে নববীতে আছে, ليس من البر الصيام في السفر

এটাও অভিজ্ঞতা যে, মানুষ যখন আযীমতের উপর আমলকে আবশ্যক করে নেয়, তখন অনেক সময় বিরক্ত হয়ে মূল জিনিসই পরিহার করে। কেউ কেউ পূর্ণ রাত জাগ্রত থাকে অতঃপর শেষ রাতে ঘুমের এরূপ চাপ সৃষ্টি হয় যে, ফজরের নামাযের জামাআত অথবা নামাযই পরিত্যাগ করে বসে। হযরত উমর ফারূক রা. বলেছেন, ফজরের নামায জামাআতের সাথে আদায় আমার নিকট সারা রাত ইবাদত করে ফজরের নামায বাদ দেয়া অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

এরূপভাবে প্রতিটি স্থানে রুখসত (অবকাশ) অন্বেষন করলেও দীনের আজমত খতম হয়ে যাবে। যেমন, কেউ যদি নিজের আরামের জন্য ইমাম চতুষ্টয়ের মাযহাবগুলো থেকে প্রতিটি মাসআলায় রুখসত অবলম্বন করে এর উপর আমল শুরু করে দেয়, তবে সেটা দীন তো দূরে থাক বরং খাহেশাতে নফসানীর সমষ্টি এবং শিশুদের খেলনা হয়ে যাবে।

فسددوا - মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। উপরে উঠতে যেও না। সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় মধ্যমটি।

وقاربوا যদি পূর্ণাঙ্গরূপে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে না পার তবে কাছাকাছি থাক। قاربوا এর আরেকটি অর্থ এটাও হতে পারে যে, পরস্পর একজন অপরজনের সাথে মিলে মিশে থাক। পরস্পরে মতবিরোধ কর না।

وابشروا হামযায়ে কাতঈ সহকারে। الابشار اي ابشروا بالثواب على العمل وان قل. عمدة থেকে। অর্থাৎ, সওয়াবের সুসংবাদ লাভ কর, যদিও আমল কম হোক। সর্বদা নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে সামান্য আমলেও সুসংবাদ রয়েছে। ইমাম গাযযালী র. লিখেন, এক ফোটা করে নিয়মতান্ত্রিক ও ধারাবহিকভাবে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত পানি পাথরের উপর পড়তে থাকলে সে পাথরে ছিদ্র হয়ে যাবে। কিন্তু সে পরিমাণ একবারে ফেলে দিলে তার উপর কোন প্রভাব পড়বে না। এমনিভাবে সর্বদা আল্লাহর যিকির করলে অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করে।

হযরত শাহ ওলীউল্লাহ র. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায় বলেন, শরীয়ত ইবাদত কম করার নির্দেশ বেশি করার উদ্দেশ্যে করেছে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি রীতিমত অল্প অল্প আমল করতে থাকবে তার আমল বেশি হবে। আর একবারে অনেক বেশী করলে সারা জীবন রীতিমত করতে পারবে না। ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে ছেড়ে দিবে। যে দোকানদার কম লাভ নেয় সে বিক্রি করে বেশি, এজন্য লাভও বেশি করে। আর যে দোকানদার বেশি লাভ করে সে টিকে থাকতে পারে না। এজন্য অবশেষে লাভও কম হয়। হুবহু ইবাদতের ব্যাপারটিও অনুরূপই। ইবাদত এ পরিমাণ কর যাতে সামলাতে পার।

واستعينوا بالغدوة والروحة وشيئ من الدلجة সকাল বিকাল এবং রাতের শেষাংশে (নিজের ইবাদত ও অন্য কাজে) সাহায্য অর্জন কর। غدوة দিনের শুরুভাগে চলার নাম। আর روحة এর অর্থ হল, বিকেলে চলা। دلجة এর অর্থ রাতের শেষাংশে সফর করা। এই তিনটি শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত হল, স্বতঃস্ফুর্ততার সময়ের দিকে। আমরা সবাই যেহেতু এ পৃথিবীতে মুসাফির, আমাদের আখিরাতমুখী সফর অব্যাহত. প্রতিটি মিনিট আখিরাতের নিকটবর্তী হচ্ছি, তাই এ বাক্যটিকে কেউ মজবুতভাবে ধারণ করলে ওলী হয়ে যেতে পারবে। এ তিনটি সময় মানুষের জন্য যথেষ্ট। যদি নিয়মতান্ত্রিকভাবে লেগে থাকে।

شيئ من الدلجة অন্ধকার রাতের সামান্য অংশ মেহনত পরিশ্রম বরদাশত করুন। এটা হল বাস্তবতা যে, ইলমে দীন হোক বা ইলমে তরীকত রাত্রি জাগরণ ব্যতীত কামাল (পরিপূর্ণতা) সৃষ্টি হবে না।

٣٠. بَاب الصَّلَاةُ مِنْ الْإِيمَانِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ يَعْنِي صَلَاتَكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ

৩০. পরিচ্ছেদ ঃ নামায ঈমানের অংশ আর আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ

আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন। (২ ঃ ১৪৩) অর্থাৎ, বায়তুল্লাহর নিকট (বায়তুল মুকাদ্দাসমুখী হয়ে) আদায় করা তোমাদের নামাযকে তিনি নষ্ট করবেন না।

নামায পূর্ণাঙ্গ ঈমানের একটি অংশ।

وقول الله تعالى : وَمَاكَانَ اللهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ يعني صلوتكم عند البيت.

আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ- তিনি তোমাদের ঈমান নষ্ট করতে চান না। -(সুরা বাকারা) অর্থাৎ বাইতুল্লাহর নিকট তোমরা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে যে নামায আদায় করেছ তা নষ্ট করতে চান না

٣٩. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِد قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضـــ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ أَوْ قَالَ أَخْوَالِهِ مِنْ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَّةَ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَتْ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو

إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ فِي حَدِيثِهِ هَذَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ رِجَالٌ وَقُتِلُوا فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ .

৩৯. 'আমর ইবনে খালিদ র. .... হযরত বারা (ইবনে আযিব) রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করে সর্বপ্রথম আনসারীদের মধ্যে তাঁর নানাদের গোত্র [আবূ ইসহাক র. বলেন] বা মামাদের গোত্রে এসে ওঠেন। তিনি ষোল-সতের মাস বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে নামায আদায় করেন। কিন্তু তাঁর পসন্দ ছিল, তাঁর কিবলা যেন এই বাইতুল্লাহর দিকে হয়। আর তিনি (বাইতুল্লাহর দিকে) প্রথম যে নামায আদায় করেন, তা ছিল আসরের নামায এবং তাঁর সঙ্গে একদল লোক উক্ত নামায আদায় করেন। তাঁর সঙ্গে যাঁরা নামায আদায় করেছিলেন তাঁদের একজন লোক বের হয়ে এক মসজিদে মুসল্লীদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁরা তখন রুকূ' করছিলেন। তখন তিনি বললেন ঃ 'আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, কেবলমাত্র আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মক্কার দিকে ফিরে নামায আদায় করে এসেছি। তখন তাঁরা যে অবস্থায় ছিলেন সে অবস্থাতেই বাইতুল্লাহর দিকে (নামাযের জন্য) মুখ ফিরালেন। পক্ষান্তরে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায পড়তেন, তখন তা ইয়াহুদী ও আহলে কিতাবদের আনন্দ দিত। কিন্তু যখন তিনি বাইতুল্লাহর দিকে চেহারা ফেরালেন, তখন তারা এর প্রতি চরম অসন্তুষ্ট হল।

যুহাইর র. বলেন, আবূ ইসহাক র. হযরত বারা' রা. থেকে আমার কাছে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে এ বিষয়ও রয়েছে যে, কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে বেশ কিছু সংখ্যক লোক ইনতিকাল করেছিলেন এবং শাহাদাত লাভ করেছিলেন, তাঁদের ব্যাপারে আমরা কি বলব, বুঝতে পারছিলাম না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ .

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নামাযকে (যা বাইতুল মুকাদ্দাস-এর দিকে ফিরে আদায় করা হয়েছিল) বিনষ্ট করার মত নন।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের দুটি অংশ রয়েছে।

١. وقول الله تعالى وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ يعني صلوتكم عند البيت .٢. الصلوة من الايمان

দ্বিতীয় শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল অর্থাৎ, আয়াতে কারীমার সাথে সম্পূর্ণ স্পষ্ট। কারণ, আয়াতে ঈমান প্রয়োগ করা হয়েছে নামাযের ক্ষেত্রে। যেমন, ইমাম বুখারী র. ايمانكم এর তাফসীর করে দিয়েছেন يعني صلوتكم عند البيت দ্বারা। আর নামাযের উপর ঈমানের প্রয়োগ হল অংশের উপর পূর্ণ বস্তুর প্রয়োগের অন্তর্ভূক্ত। -উমদাতুল কারী।

যেহেতু হাদীস শরীফে নামাযের উল্লেখ রয়েছে সেহেতু মিল স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ঈমান ঃ ১০-১১, সালাত ঃ ৫৭, তাফসীর ঃ ৬৪৪, ৬৪৫, আখবারুল আহাদ ঃ ১০৭৭।

যোগসূত্র ঃ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে الدين يسر (দীন সহজ) বলা হয়েছে। এবার এ অনুচ্ছেদে দীন সহজ হওয়ার একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। যদি দীনের সহজতা দেখতে হয়, তবে দীনের স্তম্ভ নামাযের প্রতি লক্ষ্য করুন। যার সম্পর্কে ইরশাদে নববী রয়েছে, الصلوة عماد الدين যেটিকে ঈমান ও কুফরের মাঝে ব্যবধানকারী সাব্যস্ত করা হয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে- الفرق بين الايمان والكفر ترك الصلوة او كما قال عليه السلام

এই গুরুত্বপূর্ণ মহা ইবাদতের প্রতি লক্ষ্য করুন, এতে কতটা আসানী রয়েছে। চব্বিশ ঘন্টায় শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। যা আসলে এক ঘন্টা বা সোয়া ঘন্টার আমল। এতেও আবার সফর ও রুগ্ন অবস্থায় বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও সহজতা প্রদান করা হয়েছে। তা ছাড়া পানির ব্যবহারে সক্ষম হলে ওযু করতে হয়, অন্যথায় তায়াম্মুম যথেষ্ট। মোটকথা, সহজই সহজ।

শিরোনামের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য মুরজিয়া ও জাহমিয়া প্রমুখের মত খন্ডন। যারা আমলকে ঈমানের পূর্ণাঙ্গতা দানেও দখলদার মনে করে না। তারা বলে, ঈমান বসীত বা একক। ঈমানের সাথে আমলের কোন সম্পর্ক নেই। ইমাম বুখারী র. বলেন, দেখ, ما كان الله ليضيع ايمانكم আয়াতে কারীমাতে নামাযকে ঈমান বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আয়াতে ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য নামায এবং শানে নুযূলও তাই প্রমাণ করছে। অতএব নামাযের উপর ঈমানের প্রয়োগ অংশের উপর পূর্ণ বস্তুর প্রয়োগের ন্যায়। অতএব নামায ঈমানের অংশ তা প্রমাণিত হয়।

قوله عند البيت — البيت যখন নিঃশর্তভাবে বলা হয়, তখন বাইত দ্বারা বাইতুল্লাহ শরীফ উদ্দেশ্য হয়, যেমন, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ রয়েছে-

وَمَا كَانَ صَلَوتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلاَّ مُكَاءً

(এবং তাঁদের নামায ছিল শুধু কাবার নিকটে হুইসেল বাজানো ও তালি বাজানো) -সুরা আনফাল ; পারা ৯- রুকু ১৮

একটি প্রশ্ন ঃ প্রশ্নটি হল, সাহাবায়ে কিরামের দোদুল্যমানতা ছিল বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে আদায়কৃত নামায সম্পর্কে। বাইতুল্লাহমুখী আদায়কৃত নামায সম্পর্কে নয়। এবার প্রশ্ন হল, ইমাম বুখারী র. আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যা عند البيت দ্বারা কেন করলেন? যদি عند البيت দ্বারা বাইতুল মুকাদ্দাস উদ্দেশ্য হয়, তবে সে দিকে তো মন দ্রুত এগোয়না।

হাফিজ আসকালানী র. আবু দাউদ তায়ালিসী ও নাসাঈর একটি রেওয়ায়াত এনেছেন, তাতে يضيع ايمانكم এর তাফসীর صلوتكم الي البيت المقدس দ্বারা সুস্পষ্ট ভাষায় করা হয়েছে। এতে কোন প্রশ্ন নেই।

উত্তর ঃ কেউ কেউ পরিষ্কার বলেছেন, আসলে শব্দ ছিল, لغير البيت। লিপিকার عند البيت লিখে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় ইবারত তো ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু জটিল ব্যাপার হল, বুখারী শরীফের সমস্ত কপিতে عند শব্দ আছে। যদি কোন একটি কপিতেও لغير البيت থাকত, তবে আমরা মেনে নিতাম অন্য কপিগুলোতে ভূল হয়েছে। অন্যথায় বিনা কারণে কিয়াস প্রদর্শন ঠিক নয়।

হাফিজ আসকালানী র. এর জবাব ঃ

البيت দ্বারা বাইতুল্লাহ শরীফ উদ্দেশ্য। عند শব্দটি যরফের অর্থের উপর বিদ্যমান। অবশ্য ইবারতে সামান্য সংক্ষেপ করা হয়েছে। আসল ইবারত ছিল-

مَا كَانَ اللهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ يعني صلوتكم التي صليتموها عند البيت المقدس.

অর্থাৎ, বাইতুল্লাহর কাছে থাকা অবস্থায় তোমরা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে যে সব নামায পড়েছ সেগুলোকেও আল্লাহ তা'আলা নষ্ট করবেন না। অতএব যে সব নামায বাইতুল্লাহ শরীফ থেকে দূরে থেকে অর্থাৎ, মদীনা মুনাওয়ারায় থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে আদায় করেছ, সেগুলোও উত্তমরূপে বিনষ্ট হবে না।

এ বক্তব্য দ্বারা এক দিকে সাহাবায়ে কিরামেরও সান্ত্বনা হয়ে গেল। প্রশ্নের উত্তরও হয়ে গেল। অপরদিকে সিদ্ধান্ত হয়ে গেল যে, হিজরতের পূর্বে মক্কা মুয়াজ্জামাতে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়া হত।

এর সমর্থন হয় হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর রেওয়ায়াত দ্বারা। এ রেওয়ায়াতটি বিভিন্ন গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পূর্বে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায পড়তেন। অবশ্য তিনি এরূপ ভাবে দাঁড়াতেন যাতে কা'বা শরীফের দিকে পিঠ না পড়ে।

قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره الى بيت المقدس لكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس. قسطلاني

অর্থাৎ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফের দক্ষিন দিকে (হাজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানীর মাঝে) দাড়াতেন। যাতে বাইতুল্লাহ শরীফের দিকেও চেহারা থাকে।

◆ কিন্তু এর উপর প্রশ্ন হয়, ইমামতে জিবরাঈর সংক্রান্ত হাদীসের কোন কোন সূত্রে عند باب البيت এসেছে। এবং বাইতুল্লাহ শরীফের দরজার নিকট দাঁড়িয়ে বাইতুল্লাহ ও বাইতুল মুকাদ্দাস উভয় দিকে চেহারা ফিরানো যায় না। কারণ, বাইতুল্লাহ শরীফের দরজা পূর্ব দিকে। আর বাইতুল মুকাদ্দাস উত্তর দিকে। এ জন্য এমতাবস্থায় শুধু কা'বা শরীফের দিকে চেহারা ফিরে, বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে নয়।

অবশ্য এতে এর সুস্পষ্ট বিবরণ নেই যে শুরুতে বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করার জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদিষ্ট ছিলেন, না তাতে এখতিয়ার ছিল? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ এখতিয়ারে বাইতুল্লাহর দিকে চেহারা ফিরাতেন? তবে দ্বিতীয় ছুরতটি প্রধান মনে হয়। বাইতুল্লাহ শরীফের দিকে মুখ করার প্রতি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্বভাবজাত ঝোক। কারণ, তিনি ছিলেন, হযরত ইবরাহীম আ. এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

اِنَّ اَوْلَي النَّاسِ بِاِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اَمَنُوْا. آل عمران ٦٨.

"নিঃসন্দেহে মানুষের মধ্যে হযরত ইবরাহীম আ. এর সাথে সবচেয়ে বেশী মিল হল তাদের, যারা তাঁর সময়ে ইবরাহীম আ. এর অনুসরণ করেছে এবং এই নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এবং যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে তাদের।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

رأيت ابراهيم عليه السلام انا اشبه ولده به. مسلم ١/٩٥.

وايضا قال صلى الله عليه وسلم واذا ابراهيم عليه السلام قائم يصلي اشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. مسلم ١/٩٦.

হযরত শাহ ওলীউল্লাহ র. বলেন, শরীয়তে মুহাম্মাদিয়া বস্তুত মিল্লাতে ইবরাহীমিয়্যার বিস্তারিত বিবরণ ও পূর্ণাঙ্গতা দানকারী। মোটকথা, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃজনগতভাবে ও নৈতিকভাবে হযরত ইবরাহীম আ. এর সাথে অধিক সাদৃশ্য রাখতেন। তা ছাড়া কা'বা শরীফের একটি বৈশিষ্ট্য হল, এটি যদিও সমস্ত নবীর কিবলা ছিল না, কিন্তু হজ্ব কা'বা শরীফ ছাড়া অন্য কোথাও হয় নি। সে জন্য তাঁর ঝোক ছিল কা'বা শরীফের দিকে। যার ফলে তিনি কা'বার দিকে চেহারা ফিরাতেন।

অতঃপর হিজরতের তিন বছর পূর্বে যখন বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে চেহারা ফিরানোর নির্দেশ হয়, তখন আদেশের সাথে স্বাভাবিক ঝোকের উপরও আমল করার জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ শরীফের দক্ষিন দিকে রুকনে ইয়ামানীদ্বয়ের মাঝখানে দাড়িয়ে বাইতুল্লাহ ও বাইতুল মুকাদ্দাস উভয়ের দিকে চেহারা ফিরাতেন। মদীনা মুনাওয়ারায় যেয়ে উভয়টি একত্রিত করা অসম্ভব হয়ে যায়, তখন অন্তরে কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তনের ভীষন আগ্রহ সৃষ্টি হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. سيقول

এই বক্তব্যের আলোকে বারবার হুকুম রহিত হওয়ার অসুবিধা ও আবশ্যক হয় না।

হাদীসে ইমামতে জিবরাঈল আ. দ্বারা বারবার রহিত করণের হুকুমের প্রবক্তারা প্রমান পেশ করেন, উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে এরও উত্তর হয়ে যায় যে, প্রথম দিকে কিবলার দিকে চেহারা ফিরানোর নির্দেশ ছিল না, বরং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্বাভাবিক ঝোক ছিল। এজন্য হযরত জিবরাঈল আ.ও তাঁর আনুকল্য প্রদর্শন করেন। -ইরশাদুল ক্বারী।

তাত্ত্বিক বিশ্লেষন ও ব্যাখ্যা ঃ

كان اول ما قدم দালের নিচে যের نصب اول শব্দে যরফের ভিত্তিতে যবর এ বাক্যটি انّ এর খবর, কিন্তু মহল হিসেবে মারফূ' অর্থাৎ, في اول قدومه المدينة عند الهجرة।

نزل علي اجداده او قال اخواله من الانصار এ সন্দেহ আবু ইসহাক থেকে। এখানে নানা হলেন, মায়ের দিক থেকে । প্রকাশ থাকে যে, তারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নানা, মামা ছিলেন না, বরং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাদা আবদুল মুত্তালিবের নানা, মামা ছিলেন। যেহেতু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের নাতি, সেহেতু রুপকার্থে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে সম্বন্ধ করে দেয়া হয়। হিজরতের ঘটনা সংক্রান্ত রেওয়ায়াতে পরিষ্কার বিদ্যমান রয়েছে نزل على بني النجار اخوال عبد المطلب এর বিস্তারিত বিবরণ হল, আবদে মানাফের চার ছেলে ছিল। ১. মুত্তালিব, ২. হাশিম, (একই মায়ের সন্তান) ৩. নাওফিল, ৪. আবদে শামস্ (অন্য মায়ের সন্তান)। হাশিম বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে শামে যাতায়াত করতেন। মধ্যখানে পড়ত মদীনা তাইয়্যিবা। তিনি এখানে অবস্থান করতেন। এক সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহিলা। মহিলার নাম ছিল সালমা বিনতে উমর। তিনি ছিলেন বনু নাজ্জার গোত্রের লোক। তিনি সম্ভ্রান্ত ও ছিলেন, ছিলেন সুন্দরী রুপবতী। হাশিম যাঁর মেহমান ছিলেন, তাঁর কন্যা ছিলেন এ সালমা। হাশিমের নজর তার প্রতি পড়লে তিনি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। বিয়ে এ শর্তে হল যে, সালমা স্বাধীন থাকবেন। অর্থাৎ, বিচ্ছেদের এখতিয়ার তার কাছে থাকবে। তার জন্য মক্কা মুয়াজ্জমায় যাওয়া আবশ্যক থাকবে না। হাশিম এ শর্ত মঞ্জুর করে নেন এবং বিয়ে হয়ে যায়।

মোটকথা, সালমা ছিলেন মদীনা মুনাওয়ারায়। তার ঘরে জন্ম হয় আবদুল মুত্তালিব নামক এক সন্তানের। তাঁর নাম ছিল শায়বাতুল হামদ। হাশিমের ইনতিকালের সময় তিনি আপন ভাই মুত্তালিবের নিকট ওসিয়ত করেন, আমার ছেলে শায়বার প্রতি লক্ষ্য রেখ। শায়বা যত দিন বেঁচে ছিলেন মায়ের কাছেই ছিলেন, অতঃপর মুত্তালিব আপন ভাইয়ের ওসিয়ত অনুযায়ী শায়বাকে আনতে যান। মুত্তালিব আপন ভাতিজা শায়বাকে উটের পিছনে বসিয়ে দেন। লোকজন শায়বাকে পিছনে উপবিষ্ট দেখে আবদুল মুত্তালিব বলতে শুরু করল। সেদিন থেকে শায়বা আবদুল মুত্তালিব নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যান।

قبل بيت المقدس — المقدس এ শব্দটির মীমের উপর যবর, কাফের উপর জযম, দালের নিচে যের, মীম মাসদারবোধক। এটি ইসমে মাকান القدس থেকে। এর অর্থ পবিত্রতা। অর্থাৎ, এরূপ স্থান যাতে ইবাদত করে একজন আবিদ গুনাহ থেকে পবিত্র হয়। অথবা সেখানে প্রতিমা থেকে ইবাদতকে পবিত্র করা হয়। মুকাদ্দাস শব্দটির মীমের উপর পেশ, কাফের উপর যবর, দালের উপর তাশদীদ সহকারেও এসেছে।

ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا মদীনা মুনাওয়ারায় বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে চেহারা ফিরানোর সময় কতটুকু ছিল?

হাফিজ আসকালানী র. এব্যাপারে নয়টি রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন, সাথে সাথে একথাও বর্ণনা করেছেন যে, অনেকগুলো রেওয়ায়াত দুর্বল। তার মধ্যে তিনটি রেওয়ায়াত প্রসিদ্ধ। ১. ১৬/১৭ মাস সংশয় সহকারে।

كما في هذه الرواية وكذا في صلوة صحيح البخاري صـ٥٧، وعند الترمذي ايضا وكذا ذكره السيوطي في الجلالين بالشك.

২. মুসলিম, নাসাঈ ও মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বলে সংশয় ছাড়া ১৬ মাসের কথা আছে। ৩. বাযযার ও তাবারানীতে সংশয়হীন ভাবে ১৭ মাসের রেওয়ায়াত আছে।

বাহ্যত এ সব রেওয়ায়াতের মাঝে বিরোধ বুঝা যায়। সামঞ্জস্য বিধান এভাবে করা হয়েছে যে, সর্বসম্মতিক্রমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসে মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ আনেন। হযরত ইবনে আববাস রা. এর রেওয়ায়াত অনুযায়ী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবারে মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের বিশুদ্ধ উক্তি হল, পরবর্তী বছর দ্বিতীয় হিজরীতে ১৫ রজবে কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ আসে। অতএব ১২ ই রবিউল আউয়াল থেকে ১৫ ই রজব পর্যন্ত ১৬ মাস ৩ দিন হয়। এটাই বিশুদ্ধতম ও নির্ভরযোগ্য উক্তি। কাজেই যারা প্রবেশের মাস তথা রবিউল আউয়াল এবং কিবলা পরিবর্তনের মাস তথা রজব উভয়টিকে স্বতন্ত্র গণ্য করেছেন, তারা ১৭ মাস উল্লেখ করেছেন। আর যারা উভয় মাসকে মিলিয়ে এক মাস গন্য করেছেন এবং অতিরিক্ত তিন দিন ছেড়ে দিয়েছেন, তারা উল্লেখ করেছেন ১৬ মাস। যাদের সন্দেহ ও দোদুল্যমানতা ছিল তারা সংশয় সহকারে বর্ণনা করেছেন। -ফাতহুল বারী, উমদাতুল কারী ইত্যাদি

وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মানবিক চাহিদা ছিল তাঁর কিবলা যেন বাইতুল্লাহর দিকে হয়। এর বিভিন্ন কারণ বর্ণিত আছে। ১. কা'বা শরীফ হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আ. এর কিবলা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি নির্দেশ ছিল মিল্লাতে ইবরাহীমির অনুসরণের। যেমন, اِنْ اَتَّبِعُ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا.

২. জালালাইন গ্রন্থকার সংক্ষিপ্ত ও ব্যাপক উত্তর দিয়েছেন- لانه ادعى اسلام العرب

মক্কাবাসীর সম্মান ও মর্যাদা ছিল গোটা বিশ্বে। তাদের ইসলাম গোটা আরবের ইসলাম গ্রহণের কারণ হতে পারত। মক্কাবাসী কা'বা ঘরকে সীমাহীন ভালবাসত ও এর প্রতি তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল এ জন্য রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্বাভাবিক ঝোক ছিল, যেন কা'বা ঘরের দিকে চেহারা ফিরানোর হুকুম হয়। যাতে ইসলাম প্রচার সহজ হয়।

৩. বাইতুল্লাহ শরীফ হল বাহ্যিক বিশ্বের কেন্দ্রভূমি। কারণ, বিশ্বের নাভি হল, কা'বা ঘর। গোটা বিশ্ব সেখান থেকেই বিস্তৃত করা হয়েছে। যেরূপভাবে কা'বা ঘর বাহ্যিক বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু, এরূপভাবে রূহের জগতের বা আধ্যাত্মিক জগতের কেন্দ্রবিন্দু হলেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কেন্দ্রের সাথে কেন্দ্রের যোগসূত্র থাকা উচিত। এজন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্তরে এ কিবলার প্রতি স্বাভাবিক কামনা ছিল।

৪. মানুষ সৃজিত হয়েছে মাটি দ্বারা। আর গোটা বিশ্ব এস্থান থেকেই বিস্তৃত হয়েছে যেখানে আজ কা'বা ঘর। যেন মানুষের কেন্দ্রস্থল হল কা'বা ঘর। আর কেন্দ্রের দিকে ঝোক হল স্বভাবজাত ও প্রাকৃতিক।

فخرج رجل هو عباد بن بشر وقيل عباد بن نهيك بفتح النون وكسر الهاء

فمر على أهل مسجد এটি হল, মসজিদে বনী হারিসা। কুবাবাসীদের সামনেও এরূপ ঘটনা ঘটেছে। তাঁরা ফজরের নামায পড়ছিলেন। যখন কেউ কিবলা পরিবর্তনের সংবাদ দেয় তখন তারা নামাযের মধ্যেই বাইতুল্লাহর দিকে চেহারা ফিরিয়ে নেন।

একটি প্রশ্ন ঃ বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে চেহারা ফিরানোর নির্দেশ ছিল অকাট্য। আর খবরে ওয়াহিদ হল ধারণা নির্ভর। তাহলে এর দ্বারা অকাট্য হুকুম বর্জন করা কিভাবে জায়িয হল?

উত্তর ঃ কোন কোন সময় নিদর্শন সংশ্লিষ্ট খবরে ওয়াহিদ নিশ্চিত জ্ঞানের কারণ হয়। এখানে এরূপ অকাট্য নিদর্শনাদি বিদ্যমান ছিল। যেমন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কিবলা পরিবর্তন কামনা করা, তার জন্য অপেক্ষমান থাকা, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا

আয়াত দ্বারা তাঁকে সান্ত্বনা দান, ইত্যাদি। এসব নিদর্শনের কারণে এ খবরে ওয়াহিদ অকাট্য হয়ে যায়। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মানবিক এ আগ্রহের কথাও সাহাবায়ে কিরামের জানা ছিল। অতএব এসব নিদর্শনের কারণে এই খবরে ওয়াহিদ অকাট্য হয়ে যায়। যেমন, এক ব্যক্তি রোগাক্রান্ত। তার জাঁকান্দানির খবর আপনি জানতে পারলেন। সামান্য কিছুক্ষন পর আপনি ঘর থেকে বের হলে সে ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ আসতে শুরু করে। দরজায় লোকজন কাফন তৈরি করছে। আপনি কাউকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? সে সংবাদ দিল, অমুক মারা গেছে। তখন তার মৃত্যু সম্পর্কে আপনার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে যাবে, সামান্যতম সন্দেহও থাকবে না। অথচ এটাও খবরে ওয়াহিদ।

٣١. بَاب حُسْنُ إِسْلَامِ الْمَرْءِ قَالَ مَالِكٌ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضــ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا .

৩১. পরিচ্ছেদ ঃ ব্যক্তির উত্তমরূপে ইসলাম গ্রহণ।

ইমাম মালিক র. বলেন, ... হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, বান্দা যখন ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ইসলাম উত্তম হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার আগের সব গুনাহ্ মাফ করে দেন। এরপর শুরু হয় প্রতিদান; একটি সৎ কাজের বিনিময়ে দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত; আর একটি মন্দ কাজের বিনিময়ে ঠিক সে পরিমাণ মন্দ প্রতিফল । অবশ্য আল্লাহ্ যদি মাফ করে দেন তবে ভিন্ন ব্যাপার।

পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের সাথে যোগসূত্র ঃ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদ الصلوة من الايمان তে নামাযের বিবরণ ছিল। আর এ অনুচ্ছেদে ইসলামের সৌন্দর্যের বিবরণ রয়েছে। উভয়ের মধ্যে মিল স্পষ্ট। কারণ, দীন ইসলামে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় নামায দ্বারা। বরং যে সব আমল দ্বারা ইসলামের সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল নামায।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ হাদীসের সাথে শিরোনামের মিল فحسن اسلامه বাক্যে স্পষ্ট।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ ইসলামে বিচিত্র ধরণের মরতবার বিবরণ দান উদ্দেশ্য। কারণ, কারো কারো ইসলাম সুন্দর আর কারোটি অসুন্দর হয়ে থাকে। এটা জানা কথা যে, ইমাম বুখারী র.এর মতে ঈমান ও ইসলাম সমার্থক।

٤٠. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضــ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا .

৪০. ইসহাক ইবনে মানসূর র. .... হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন উত্তমরূপে ইসলামের উপর অটল থাকে তখন সে যে নেক আমল করে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে সাতশ গুণ পর্যন্ত সওয়াব লেখা হয়। আর সে যে মন্দ কাজ করে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে তার জন্য ঠিক সে পরিমাণই মন্দ লেখা হয়।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল اذا احسن احدكم اسلامه الخ বাক্যে স্পষ্ট।

ব্যাখ্যা ঃ ইরশাদ রয়েছে, যখন কেউ মুসলমান হবে এবং তার ইসলাম সুন্দর হবে (অর্থাৎ, ইখলাসের সাথে ইসলাম গ্রহন করবে, মনের গভীর থেকে ইসলাম কবুল করবে এবং তার ইসলাম শুধু লৌকিকতা ও মুনাফিকী নির্ভর হবে না) يكفر الله عنه الخ - তখন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিটি গুনাহ

মাফ করে দিবেন। زلفها লামের উপর তাশদীদ এবং তাশদীদ ছাড়া উভয়ভাবে পড়া যায়। তা ছাড়া باب افعال তিনভাবে বর্ণিত আছে। এর অর্থ হল, পূর্বে যা গুনাহ করেছে সেগুলো সব মাফ হয়ে যাবে, তবে বান্দার হক মাফ হবে না। অবশ্য আল্লাহর হক সগীরা হোক বা কবীরা সবই মাফ হয়ে যায়। তবে শর্ত হল, প্রকৃত ইসলাম হতে হবে। لان الاسلام يهدم ما كان قبله

৩২. بَاب أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَدْوَمُهُ

৩২. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে পসন্দনীয় দান বা আমল সেটাই যা সর্বদা নিয়মিত করা হয়।

٤١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رضــ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ فُلَانَةُ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا قَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ .

৪১. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না র. .... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাঁর কাছে আসেন, তাঁর নিকট তখন এক মহিলা ছিলেন। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'ইনি কে?' হযরত আয়েশা রা. উত্তর দিলেন, অমুক মহিলা, এ বলে তিনি তাঁর নামাযের কথা উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'থাম, তোমরা যতটুকু সামর্থ্য রাখ, ততটুকুই তোমাদের করা উচিত। আল্লাহর কসম! আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত (সওয়াব প্রদান থেকে) বিরত হন না, যতক্ষণ না তোমরা নিজেরা ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে পড়। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পসন্দনীয় আমল তা-ই, যা আমলকারী সব সময় নিয়মিত করে থাকে।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল وكان احب الدين اليه ما داوم عليه صاحبه বাক্যে স্পষ্ট।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র ঃ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে ইসলামের সৌন্দর্যের বিবরণ ছিল। আর এ অনুচ্ছেদে বলতে চান যে, ইসলামে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় সর্বদা নিয়মিত আমল করার কারণে। -আল কাওলুন নাসীহ ঃ ৪২

হাফিজ র. এর উক্তির সারমর্ম হল, পূর্বে একটি নেক কাজের উপর সাত শত নেকীর সুসংবাদ ছিল। তাহলে হতে পারে কেউ আবেগ তাড়িত হয়ে সীমার অধিক আমল শুরু করে দিবে। যার ফলে সর্বদা নিয়মিত করা জটিল হয়ে পড়বে। ফলে এ অনুচ্ছেদ কায়েম করা হয়েছে আবেগে মধ্যপন্থা সৃষ্টি করার জন্য।

-ফাতহুল বারী, ইমদাদুল বারী।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ঈমান ১১, তাহাজ্জুদ ঃ ১৫৪, মুসলিম ১/২৬৭।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ হাফিজ আসকালানী র. বলেন, مراد المصنف الاستدلال على ان الايمان يطلق على الاعمال لان المراد بالدين هنا العمل. فتح অর্থাৎ, ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য একথার প্রমাণ পেশ করা যে, ঈমানের প্রয়োগ হয়েছে আমলের উপর। কারণ, হাদীস শরীফে احب الدين শব্দে দীন দ্বারা উদ্দেশ্য

আমল। এটা জানা কথা যে, ইমাম বুখারী র. এর মতে দীন ও ঈমানের অর্থ এক। অতএব মুরজিয়া সম্প্রদায়ের মত খন্ডন হয়ে গেল। কারণ, হাদীস শরীফ দ্বারা আমল ও ঈমানের গভীর সম্পর্ক প্রমাণিত হল।

২। **শিরোনাম হল,** احب الدين, **শব্দটি** صيغة اسم تفضيل। এর দ্বারা প্রমানিত হল দীনের স্তর বিভিন্ন রকম। কারো কারোটি অপরজনের মর্যাদার চেয়ে অধিক প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ। যেহেতু দীন ও ঈমানের অর্থ এক, সেহেতু ঈমানের দরজা বিভিন্ন রকম প্রমানিত হল।

ব্যাখ্যা ঃ قالت فلانة এটি মারফূ'। কারণ, এটি উহ্য মুবতাদার খবর। অর্থাৎ, هي فلانة الحولاء (بنت تويت) الاسدية وهى غير منصرف الخ. عمدة অর্থাৎ, فلانة **শব্দটি** দ্বারা যেহেতু নামের দিকে ইঙ্গিত, সেহেতু এটি আলমের স্থলাভিষিক্ত। কাজেই تانيث و علميت এর কারণে غير منصرف। মুসলিম শরীফে নাম উল্লেখ করা হয়েছে। فقالت هذه الحولاء بيت تويت الخ. مسلم ٢٦٧/١

تذكر তা এর উপর যবর واحد مؤنث غائب মুযারে মারূফ। ফায়েল হল আয়েশা। অর্থাৎ, হযরত আয়েশা রা. তার নাম বলে এটাও বলতে শুরু করেন, সে খুব নামায পড়ে। রাত ভরে নফল নামায পড়তে থাকে। কোন কোন রেওয়ায়াতে يُذكر রয়েছে। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, তিনি সেই, যার নামাযের খুব চর্চা হয়।

একটি প্রশ্ন ঃ সামনা সামনি প্রশংসা করা নিষিদ্ধ। পূনরায় কেন হযরত আয়শা রা. তাঁর সামনে প্রশংসা করলেন?

উত্তর ঃ প্রথমত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর প্রশংসা উদ্দেশ্য ছিল না, বরং তার পরিচয় দান উদ্দেশ্য ছিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে তার অবস্থা বর্ণনা করে উপদেশ গ্রহণ করা উদ্দেশ্য ছিল। এজন্য সব কথা তাঁর সামনেই বলা প্রয়োজন ছিল যাতে কোন কথা বেশী না হয়ে যায়।

২। আল্লামা কাসতাল্লানী র. বলেন,

لعل عائشة رضي الله عنها امنت عليها الفتنة فمدحتها في وجهها.

তথা হযরত আয়শা রা. হযরত হাওলা রা. এর প্রশংসা তার সামনে এজন্য করেছেন যে, তাঁর প্রতি হযরত আয়েশা রা. এর এ বিশ্বাস ছিল, তিনি কোন ফিতনা (অহংকার, ঈর্ষা ইত্যাদিতে) পতিত হবেন না।

৩। এক বর্ণনাতে এও আছে যে, হযরত আয়শা রা. হযরত হাওলা রা. এর প্রশংসা ঐ সময় করেছেন, যখন তিনি উঠে চলে গেছেন।

في مسند الحسن بن سفيان كانت عندي امرأة فلما قامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ يا عائشة! ارشاد الطالبين.

অতএব যেহেতু হাওলা রা. এর প্রত্যাবর্তনের পর প্রশংসা করা হয়েছে, তাই কোন প্রশ্ন থাকে না।

قال مه মীমে যবর ও হা সাকিন। ধমকির শব্দ اكفف। এর অর্থে (বিরত হও)।

অর্থাৎ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, দাড়াও, ক্ষ্যান্ত কর, থাম, عليكم بما تطيقون এখানে সম্বোধন মহিলাকে। একারণে বাহ্যত عليكِ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সমস্ত উম্মতের জন্য এ শিক্ষা উদ্দেশ্য ছিল যাতে পুরুষ ও মহিলা সবাই অন্তর্ভূক্ত। এ কারণে تغليب الرجال على النساء কায়দানুসারে পু.লিঙ্গ শব্দ নেয়া হয়েছে।

একটি প্রশ্ন ঃ ملال এর অর্থ হল, অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ, সে ক্লান্তি ও অবসন্নতা যা কষ্ট করার ফলে দেখা দেয়। আল্লাহ তা'আলার শান এর চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। আল্লাহ তা'আলার মধ্যে কোন কষ্ট ও অবসন্নতা বা বিরক্তি আসে না।

◆ আল্লামা আইনী র. বলেন, আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে ملال শব্দের ব্যবহার হয়েছে صنعت مشاكلة হিসেবে। যেমন, جزاء سيئة سيئة بمثلها. شورى ٤٠ অর্থাৎ, মন্দ কাজের বদলা অনুরূপ মন্দই। বস্তুতঃ মন্দের মুকাবিলায় যে মন্দ করা হয়, সেটা প্রকৃত অর্থে মন্দ নয়, বরং শুধু বাহ্যিক আকারে মন্দ হয়ে থাকে। মন্দের প্রয়োগ এখানে করা হয়েছে শুধু বাহ্যিক আকারে। কারণ, বদলা নেয়া মন্দ কাজ নয়।

◆ আল্লামা আইনী র. আরেকটি উদাহরণ পেশ করেছেন,

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ. بقرة

সীমালংঘনের প্রতিশোধকে সীমালংঘন বলা হয়েছে। এটাও مشاكلة রূপে। অথচ এটা হল, বদলা ও ইনসাফ।

◆ আল্লামা খাত্তাবী র. উত্তর দিয়েছেন,

فكنى عن الترك بالملال الذي هو سبب الترك

অর্থাৎ, বিরক্তির ফলশ্রুতি হল বর্জন। অর্থাৎ, বিরক্তির কারণে কোন জিনিস পরিহার করা হয়। অতএব এখানে কারণ বলে কৃত জিনিস (রূপকার্থে) উদ্দেশ্য করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলা ততক্ষন পর্যন্ত সওয়াব বন্ধ করেন না যতক্ষন পর্যন্ত তোমরা আমল পরিহার না কর। স্পষ্ট বিষয়, যতক্ষন পর্যন্ত তোমরা সামর্থের বাইরে আমল করবে, এর ফলে কোন দিন বিরক্ত হয়ে আমলই পরিহার করবে। তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সওয়াবও বন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই মধ্যপন্থা অবলম্বন করে আমল করতে থাক, যাতে সর্বদা এরূপ আমল করা সম্ভব হয়। যতক্ষন পর্যন্ত নিয়মিত ও রীতিমত সর্বদা আমল করতে থাকবে ততক্ষন পর্যন্ত সওয়াবও পেতে থাকবে। এখানে تقليل হল تكثير এর জন্য (কম বেশি আমলের উদ্দেশ্যে।)।

সতর্কবাণী ঃ এহুকুমটি সাধারণ উম্মতের জন্য। বিশেষ ব্যক্তিগণ তা থেকে ব্যতিক্রম। এজন্যই ইমামুল আয়িম্মা ইমাম আজম আবূ হানীফা র. ৪০ বছর পর্যন্ত (আরেক উক্তি অনুযায়ী ৩০ বছর পর্যন্ত) ইশার অযু দ্বারা ফজর আদায় করেছেন।

٣٣. بَاب زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِه وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَقَالَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنْ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ .

৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি।

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ আমি তাদের হেদায়াত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। (সূরা কাহাফ ঃ ১৩) যাতে মু'মিনদের ঈমান আরো বেড়ে যায়। (সূরা মুদদাসসির ঃ ৩১) তিনি আরও ইরশাদ করেন, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাংগ করে দিলাম। (সূরা মায়িদা ঃ ৩) পূর্ণ জিনিস থেকে কিছু বাদ দেয়া হলে তা হয় অসম্পূর্ণ।

٤٢. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رض عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ قَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِيمَانٍ مَكَانَ مِنْ خَيْرٍ .

৪২. মুসলিম ইবনে ইবরাহীম র. .... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে আর তার অন্তরে একটি যব পরিমাণও নেকী থাকবে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে আর তার অন্তরে একটি গম পরিমাণও নেকী থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। জাহান্নাম থেকে সে ব্যক্তিকে বের করা হবে যার অন্তরে এক অনু পরিমাণ নেকী বা কল্যাণ থাকবে।

ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ বুখারী র. বলেন, আবান র. - কাতাদা র. - আনাস রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে خير -এর স্থলে 'ঈমান' শব্দটি বর্ণনা করেছেন।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের অর্থের সাথে মিল রয়েছে। কারণ, কালিমায়ে ঈমানের স্বীকারোক্তির পর হাদীসে জব, গম এবং অনুপরিমাণ উল্লেখের ফলে মর্তবার বিভিন্নতা স্পষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য প্রশ্ন হতে পারত যে, হাদীসে ঈমান শব্দ নেই, যদিও خير বা কল্যাণের পারস্পরিক পার্থক্য স্পষ্ট। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ইমাম বুখারী র. মুতাবি' পেশ করে। সেটি হল, এ হাদীসে خير দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঈমান।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র ঃ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে সবচেয়ে প্রিয় দীনের বিবরণ ছিল, স্পষ্ট বিষয়, যার দীন সবচেয়ে প্রিয় হবে, তার দীনে বৃদ্ধি হবে। আর যার দীন অপ্রিয় হবে, তাতে ক্রুটি থাকবে। অতএব পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে যে বিষয়টি অধীনস্থরূপে উল্লেখিত হয়েছে, এবার সেটির সুস্পষ্ট বিবরণ দিতে চান।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, কিতাবুল ঈমান ঃ ১১, কিতাবুত তাওহীদ ঃ ১১০২, মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, তিরমিযী।

নোট ঃ ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধির মাসআলাটি কিতাবুল ঈমানের শুরুতে সবিস্তারে এসেছে। এ হাদীস দ্বারা বিশেষত খারিজী ও মু'তাযিলীদের পরিপূর্ণ মতখন্ডন হয়ে যায়। তারা বলে, গুনাহগার মুসলমান চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। হাদীস শরীফ দ্বারা বুঝা গেল, গুনাহগার মুমিনকে শুধু ঈমানের কারণে অবশ্যই জাহান্নাম থেকে বের করে দেয়া হবে।

মুতাবা'আতের উপকারিতা ঃ এই মুতাবা'আত সহীহ বুখারীতে তা'লীক রূপে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু হাকিম র. কিতাবুল আরবাঈনে এটাকে মাওসূলরূপে উল্লেখ করেছেন। من طريق ابي سلمة موسى بن اسماعيل قال حدثنا آبان الخ তথা আবূ সালামা মূসা ইবনে ইসমাঈল-আবান সূত্রে এই মুতাবা'আতের প্রথম ফায়দা হল, কাতাদা মুদাল্লিস। যদি শ্রবনের সুস্পষ্ট বিবরণ না হয়, তবে তার মুআনআন রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হত না। বস্তুতঃ এই রেওয়ায়াতটি মুআনআন। এজন্য ইমাম বুখারী র. মুতাবি' বর্ণনা করেছেন। যাতে تحديث এর সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।

দ্বিতীয় উপকারিতা হল, মুতাবি'এ خير এর পরিবর্তে ايمان শব্দ যদ্বারা এদিকে ইঙ্গিত হল যে, রেওয়ায়াতে خير দ্বারা উদ্দেশ্য ايمان ।

তৃতীয় ফায়দা হল, এই মুতাবা'আত দ্বারা হিশামের রেওয়ায়াতের সমর্থন ও এটি শক্তিশালী হয়।

٤٣. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضـــ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا قَالَ أَيُّ آيَةٍ قَالَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ .

৪৩. হাসান ইবনুস সাব্বাহ র. .... হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণনা করেন, এক ইয়াহুদী তাঁকে বলল ঃ আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের কিতাবে একটি আয়াত আছে, যা আপনারা তিলাওয়াত করে থাকেন, তা যদি আমাদের ইয়াহূদী জাতির উপর নাযিল হত, তবে অবশ্যই আমরা সে দিনকে ঈদ রূপে পালন করতাম। তিনি বললেন, কোন আয়াত? সে বলল। اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ الخ অর্থাৎ, আজকের দিবসে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করলাম। ইসলাম তোমাদের জীবনবিধান হোক, তাতে আমি সন্তুষ্ট হলাম। হযরত উমর রা. বলেন, সে দিনটি আমি চিনি, চিনি সে স্থানটিও যেখানে এ আয়াতটি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। তিনি দাড়িঁয়েছিলেন আরাফায় জুমআর দিনে।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ মিল স্পষ্ট। কারণ, হাদীস শরীফে শিরোনামের আয়াতের শানে নূযুল উল্লেখিত হয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, কিতাবুল ঈমান ঃ ১১, মাগাযী ঃ ৬৩২, তাফসীর ঃ ৬৬২, ই'তিসাম ঃ ১০৭৯, মুসলিম ঃ ২/৪১৯-৪২০, তিরমিযী।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের সনদে سمع جعفر বাক্যে উহ্য ইবারত হল, انه سمع جعفر الخ মুহাদ্দিসীনে কিরামের রীতি হল, এ ধরনের স্থানে লেখাতে انه উহ্য করে দেন। কিন্তু এটা পাঠ করা জরুরী। যেরূপভাবে قال শব্দ সংক্ষেপ করার কারণে উহ্য করে দেয়া হয়, লেখাতে না এলেও পড়াতে আসে। -উমদা।

ان رجلا من اليهود কোন কোন রেওয়ায়াতের সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। এর প্রবক্তা ছিলেন কা'বে আহবার। যিনি ছিলেন, শামের বড় ইয়াহুদী আলিম। তিনি হযরত উমর রা. এর যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

কিতাবুল মাগাযীর রেওয়ায়াতে আছে, ان اناسا من اليهود যদ্বারা বুঝা যায়। কা'বে আহবারের সাথে আরো কিছু লোকও ছিল, কিন্তু কা'ব হযরত উমর ফারূক রা. এর নিকট বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! যদি এ আয়াতটি আমাদের ইয়াহুদীদের উপর অবতীর্ণ হত, তবে আমরা এদিনটিকে ঈদ উদযাপনের দিবস বানাতাম।

ইনসাফের কথা হল, ইয়াহুদীরা খুব যাচাই বাছাই করেছে, পূর্ণ কুরআন মজীদ থেকে খুব ভাল রকমে যাচাই বাছাই করেছে। কারণ, যে দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সমস্ত নেয়ামত পূর্ণাঙ্গ করার ঘোষনা দিয়েছেন সে দিনটি অপেক্ষা অধিক আনন্দের দিন আর কোনটি হতে পারে? হযরত উমর ফারূক রা.ও খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হে বেখবর! আমরা যা জানি, যদি তুমি তা জানতে তবে প্রশ্নের জন্য মুখ খোলার দুঃসাহস কখনো করতে না। আরাফার দিন হল, শীর্ষ দিবস, যেমন, জুম'আ হল পূর্ণ সপ্তাহের শীর্ষ দিবস। আরাফার দিন হল, প্রকৃত ঈদের দিন, আর প্রচলিত ঈদ হল যিলহজ্বের ১০ তারিখ। মূলতঃ আরাফা দিবসের ফযীলত পূর্ণ দশকে ছেয়ে আছে।

এতে মতবিরোধ রয়েছে যে, যিল হজ্বের দশ দিন শ্রেষ্ঠ, না কি রমযানের (শেষ) দশ দিন?

ইবনে কাইয়্যিম র. যাদুল মা'আদে এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, যিলহজ্বের দশটি দিবস সমস্ত দিবসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পক্ষান্তরে রমযানের দশরাত্রি হল, সমস্ত রাতগুলোর মধ্যে উত্তম। কারণ, রমযানের (শেষ) দশ দিনে লাইলাতুল কদর রয়েছে। যেটি হল সর্বশ্রেষ্ঠ রাত, আর যিলহজ্বের (প্রথম) দশকে রয়েছে আরাফা দিবস। এটি হল সর্বশ্রেষ্ঠ দিন।

وفي رواية الطبري في تفسيره نزلت يوم جمعة يوم عرفة كلاهما بحمد الله عيد.

অর্থাৎ, আমাদের (নিজ থেকে) ঈদ উদযাপনের প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা এদুটি দিবসকে আমাদের জন্য ঈদের দিবস বানিয়েছেন। আমরা নিজেরা ঈদ বানালে এটি হত বিদ'আত।

وفي رواية الطبري وهما لنا عيدان وعند الترمذي نزلت في يوم عيدين يوم جمعة ويوم عرفة.

এদুটি ঈদ হল কালগত। তৃতীয় আরেকটি ঈদ হল স্থানগত। যেটি শুধু হাজীদের সাথে বিশেষিত। অর্থাৎ, আরাফাতের ময়দান।

فإن قيل كيف دلت هذه القصة على ترجمة الباب؟

اجيب من جهة انها بينت ان نزولها كان بعرفة وكان ذلك في حجة الوداع التي هي آخر عهد البعثة حين تمت الشريعة واركانها والله اعلم.

وقد جزم السدي بانه لم ينزل بعد هذه الآية شيئ من الحلال والحرام. ارشاد الطالبين.

নোট ঃ এ হাদীসের অতিরিক্ত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, নাসরুল বারী- কিতাবুল মাগাযী ঃ ৪৮৪-৪৮৫।

٣٤. بَاب الزَّكَاةُ مِنْ الْإِسْلَامِ وَقَوْلُهُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ .

৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ যাকাত ইসলামের অংশ ।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ 'তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং নামায কায়েম করতে, যাকাত দিতে। আর এটাই সঠিক দীন বা জীবন বিধান।' (৯৮ ঃ ৫)

٤٤. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ رضـــ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ .

৪৪. ইসমা'ঈল র. .... হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাজদবাসী এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এল। তার মাথার চুল ছিল এলোমেলো আমরা তার কথার মৃদু আওয়ায শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু সে কি বলছিল, আমরা তা বুঝতে পারছিলাম না এভাবে সে কাছে এসে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- 'দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায'। সে বলল, 'আমার উপর এ ছাড়া আরো নামায আছে কি?' তিনি বললেন- 'না, তবে নফল আদায় করলে ভিন্ন ব্যাপার।' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'আর রমযানের রোযা।' সে বলল, 'আমার উপর এ ছাড়া আরো রোযা আছে কি?' তিনি বললেন ঃ 'না, তবে নফল আদায় করলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার।' বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে যাকাতের কথা বললেন। সে বলল, 'আমার উপর এ ছাড়া আরো দেয় আছে কি?' তিনি বললেন ঃ 'না: তবে নফল হিসেবে দিলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার।'

বর্ণনাকারী বলেন, 'সে ব্যক্তি এই বলে চলে গেল; 'আল্লাহর শপথ! আমি এর চেয়ে বেশীও করব না এবং কমও করব না।' তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'সে সফলকাম হবে যদি সত্য বলে থাকে।'

শিরোনামের সাথে মিল ঃ

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لان الترجمة الزكوة من الاسلام وموضع الدلالة في الحديث هو قوله فاذا هو يسأله عن الاسلام فذكر الصلوة والصوم والزكوة وهذا ظاهر في كونها من الاسلام وكذلك مطابقته للآية ظاهرة من حيث ان المذكور في كل واحد منهما الصلوة والزكوة. عمدة ٣١٥

শিরোনামের দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ, আয়াতে কারীমার প্রথমাংশ তথা الزكوة من الاسلام এর প্রমাণ। কারণ, আয়াতে কারীমায় ويؤتوا الزكوة এর পরে وذلك دين القيمة বলা হয়েছে। ذلك দ্বারা ইঙ্গিত হল, পূর্বোক্ত সবগুলো জিনিসের দিকে। যেগুলোতে যাকাতও অন্তর্ভূক্ত।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র ঃ এর পূর্বের অনুচ্ছেদে ঈমানের হ্রাস বৃদ্ধির বিবরণ ছিল, বস্তুতঃ যে সব আমল দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পায়, সেগুলো দু প্রকার। ক. দৈহিক ও খ. আর্থিক।

দৈহিক ইবাদতগুলোর বিবরণ প্রথমে দিয়েছেন। এখানে আর্থিক ইবাদতগুলোর বিবরণ দিচ্ছেন।

একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্র ঃ এটিও যে, পূর্বে হ্রাস-বৃদ্ধির বিবরণ ছিল, আর এ অনুচ্ছেদের হাদীসে রয়েছে, والله لا ازيد على هذا ولا انقص. এর দ্বারা বুঝা যায়, ইসলামে হ্রাস বৃদ্ধি হতে পারে। অন্যথায় শপথ করে তা অস্বীকার করার প্রয়োজন হত না। -ইমদাদুল বারী।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, কিতাবুল ঈমান ঃ ১১, সাওম ঃ ২৫৪, শাহাদাত ঃ ৩৬৮, হিয়াল ঃ ১০২৯, মুসলিম, কিতাবুল ঈমান ঃ ৩০।

ব্যাখ্যা ঃ جاء رجل الخ জনৈক নজদী ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন।

আরবের উঁচু এলাকাকে বলে নজদ। (নূনের উপর যবর, জীম সাকিন) নিচু অংশকে বলে তিহামা। মধ্যবর্তী অংশকে বলে হিজায। এখানে নজদ দ্বারা উদ্দেশ্য তিহামার বিপরীত হিজাযের উঁচু অংশ। যেটি ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত।

ثائر الرأس পেশ সহকারে। এটি رجل এর সিফাত। আর যবর সহ হলে হাল। তার মাথার চুলগুলো ছিল বিক্ষিপ্ত এলোমেলো। দূরদূরান্ত এলাকা থেকে সফর করে আসলে এরূপ হয়। এ রেওয়ায়াত দ্বারা এ বিষয়টিও বুঝা গেল, যদি তা'লিবে ইলমের জন্য ইলম অর্জন করতে গিয়ে দূর দূরান্ত এলাকা সফর করতে হয়, তবে তাও নির্দ্বিধায় করা উচিৎ। তাছাড়া তালিবে ইলমের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত সাজ সজ্জার চক্করে পড়া উচিৎ নয়। ধ্যান খেয়াল শুধু একটিই থাকবে। আমরা ছাত্র-

طالب علم هين همين دنيا سي كيا مطلب مدرسه هي وطن ميرا

مرين كي هم كتابون بر ورق هوكا كفن ميرا.

এই আগুন্তুক ও প্রশ্নকারী নজদী সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কিরামের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে।

কাজী ইয়ায ও ইবনে বাত্তাল র. এর মত হল, নজদী ব্যক্তি ছিলেন, যিমাম ইবনে সা'লাবা রা.। তাঁরা তাঁদের মতের সমর্থনে বিভিন্ন প্রমান ও নিদর্শন বর্ণনা করেন।

১। প্রথম প্রমাণ হল, ইমাম মুসলিম র. ত্বালহা রা. এ হাদীসের পর যিমাম ইবনে সা'লাবা রা. এর হাদীস বর্ণনা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, ত্বালহা রা. এর হাদীসে رجل من اهل نجد দ্বারা যিমাম ইবনে সা'লাবা রা. উদ্দেশ্য। কারণ, ইমাম মুসলিম র. এর সাধারণ নিয়ম হল, তিনি হাদীসগুলো এরূপ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেন যে, প্রথম রেওয়ায়াতে কোন অস্পষ্টতা ও সম্ভাবনা থাকলে দ্বিতীয় রেওয়ায়াত দ্বারা যেন তা স্পষ্ট হয়ে যায়। এখানেও ঠিক তাই।

২। দ্বিতীয় প্রমাণ হল, যিমাম ইবনে সা'লাবা রা. এর রেওয়ায়াতের অনেক শব্দ এই রেওয়ায়াতের সাথে মিলে যায়। কারণ, হযরত যিমাম ইবনে সা'লাবা রা. কে আ'রাবী তথা বেদুঈন বলা হয়েছে। এই নজদীর অবস্থাও ثائر الرأس এর মাধ্যমে বেদুঈন বলে স্পষ্ট হয়ে যায়। হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. এর রেওয়ায়াতে رجل من اهل البادية দ্বারা নিশ্চিতরূপে হযরত যিমাম ইবনে সা'বালা রা. উদ্দেশ্য।

৩। তৃতীয় প্রমাণ হল, প্রত্যাবর্তনকালে তারা দুজন لا ازيد على هذا ولا انقص منه. বলেছেন।

◆ মুহাদ্দিসীনে ইজাম ও আয়িম্মায়ে হাদীসের একটি দল এ ব্যাপারে একমত নন। আল্লামা কুরতুবী, হাফিজ আসকালানী, আল্লামা আইনী ও আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী র. বলেন, এই অস্পষ্ট ব্যক্তি যিমাম নন। উভয়ের প্রশোত্তরে অনেক পার্থক্য রয়েছে। যদিও কোন কোন বিষয়ে মিলও রয়েছে।

نسمع دوي صوته - আমরা তাঁর গুনগুন আওয়াজ শুনছিলাম। دَوِي (দালের উপর যবর, ওয়াও এর নিচে যের, তাশদীদযুক্ত ইয়া) এর আভিধানিক অর্থ হল, মাছির গুনগুন আওয়াজ। এখানে বেদুঈনের গুনগুন আওয়াজের কারণ হল, তিনি একটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছিলেন। স্বীয় জিম্মাদারী অনুভব করতে গিয়ে নিজস্ব প্রশ্নগুলো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশ করতে হবে। তাই বলে এগুলো তিনি মুখে বারবার দোহরাচ্ছিলেন। যাতে আলোচনার সময় কোন ভুল-ভ্রান্তি না ঘটে।

মূলনীতি হল, কেউ যখন কোন বড় মনীষীর কাছে যায়, তখন তার উপর তার প্রভাব পড়ে যায়। ভয়-ভীতি যুক্ত হয়। এজন্য সে মনীষী আস্তে আস্তে বিষয়টি মুখস্থ করছিলেন, যাতে কোন কথা ছুটে না যায়।

اذا مفاجاتية — فاذا هو يسأل عن الاسلام অর্থাৎ, তার জীর্ন শীর্ন অবস্থা দ্বারা সে ইসলাম সংক্রান্ত প্রশ্ন করবে বলে আসা করা যাচ্ছিল না।

আল্লামা আইনী র. বলেন, اى عن اركان الاسلام অর্থাৎ, এ নজদীর প্রশ্ন ইসলামের হাকীকত সংক্রান্ত ছিল না, বরং ইসলামের আরকান ও ফারায়েয সংক্রান্ত প্রশ্ন ছিল। একারনেই এতে শাহাদতদ্বয়ের উল্লেখ নেই।

◆ হতে পারে প্রশ্ন ছিল, ইসলামের হাকীকত সংক্রান্তই এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদাতদ্বয়ের কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বর্ণনাকারী সংক্ষেপের জন্য তা উল্লেখ করেননি। কারণ, এগুলো তো সবাই জানে।

خمس صلوات في اليوم والليلة রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, রাত দিনে পাঁচ নামায (ফরয)।

فقال هل علي غيرها؟ قال : لا. এরপর লোকটি প্রশ্ন করলেন, এ ছাড়াও কোন নামায আমার দায়িত্বে রয়েছে কি না? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, না। এর দ্বারা সন্দেহ হয় যে, বিত্‌র ও দুই ঈদের নামায ওয়াজিব নয়।

বিত্‌রের মাসআলা ঃ ইমাম শাফিঈ র. কিতাবুল উম্মে এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন, ففرائض الصلوات خمس وما سواهما تطوع. অর্থাৎ, ফরয নামায পাঁচটি, এছাড়া বাকীগুলো নফল। স্বয়ং ইমাম শাফিঈ র. এতটুকু শব্দই বলেছেন, বিতর সম্পর্কে বিশেষভাবে আবশ্যক হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে কিছু বলেননি। পরবর্তীতে শাফিঈগণ বিতর নামায ওয়াজিব না হওয়ার ব্যাপারে এ রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করতে আরম্ভ করেন। এজন্য হাফিজ আসকালানী র. বলেন, এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, বিতর ইত্যাদি ওয়াজিব নয়। -ফাতহুল বারী ১/৮৮।

উত্তর ঃ যদি এই রেওয়ায়াত দ্বারা আপনি বিতর নামায ওয়াজিব নয় প্রমাণ করেন, তাহলে সামনে যেয়ে যাকাত সম্পর্কেও হুবহু এ শব্দই বর্ণিত আছে, لا الا ان تطوع, তাহলে এর দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব নয়। অথচ শাফিঈগণ ও স্বয়ং ইমাম বুখারী র. এর মতেও সদকাতুল ফিতর ফরয। অতএব এক্ষেত্রে আপনাদের যে উত্তর আমাদের উত্তরও তাই।

২। এ হাদীসটি বিতর নামায ওয়াজিব হওয়ার পূর্বেকার। যেমন, আবূ দাউদের রেওয়ায়াতে এসেছে,

ان الله تعالى قد امدكم بالصلوة هى خير لكم من حمر النعم وهي الوتر. ابو داود ١/٢٠١

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নামাযগুলোতে আরেকটি সংযুক্ত করেছেন, যেটি তোমাদের জন্য লাল উঁটগুলো অপেক্ষা উত্তম-সেটি হল, বিতরের নামায। -আবূ দাঊদ, রশীদিয়া, দিল্লী ঃ ১/২০১।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, প্রথমে পাঁচ নামাযই ফরয ছিল, অতঃপর বিতরের আরেকটি নামায যুক্ত হয়েছে। যেহেতু এ হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ সেহেতু এর দ্বারা ওয়াজিব হওয়াই প্রমাণিত হবে।

৩। عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا الصبح بالوتر. ابو داود ۲۰۳.

৪। الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. ابو داود ۲۰۱.

৫। من نسي الوتر او نام عنها فليصلها اذا ذكرها.

যে বিতর নামায ভুলে যায় অথবা নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে তার যখন স্মরণ হবে তখন যেন সে তা পড়ে নেয়। যেরূপভাবে ফরযগুলোর কাযার হুকুম রয়েছে, এরূপভাবে বিতরের কাযারও নির্দেশ রয়েছে। এটাই ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ। যদি বিতরের নামায ওয়াজিব না হত, তাহলে কাযা কেন ওয়াজিব হয়, কাযার হুকুম তো ওয়াজিবগুলোতে হয়ে থাকে, সুন্নতসমূহে নয়।

যেহেতু এ হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ সেহেতু এর দ্বারা ফরযিয়াত প্রমাণিত হবে না, বরং এর স্তর ফরয থেকে কম, সুন্নত থেকে উপরে, অর্থাৎ, ওয়াজিব হবে।

৬। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اهل القرآن! اوتروا. ابو داود ۲۰۰

والمراد باهل القرآن المؤمنون فان الاهلية عامة شاملة لمن آمن به سواء قرأ او لم يقرأ.

এতে নির্দেশসূচক শব্দ আছে। যদ্বারা ওয়াজিব বুঝা যায়।

৭। عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلوتكم الليل وترا. ابو داود ۲۰۳.

এরূপভাবে বহু হাদীসে বিতরের প্রতি তাকিদ রয়েছে। যদ্বারা ওয়াজিবের স্তর বুঝা যায়। এখানে শুধু প্রমাণসমূহের দিকে ইঙ্গিত দেয়া হল। ইনশাআল্লাহ প্রমাণ নির্ভর বিস্তারিত বিবরণ বিতর অধ্যায়ে জানা যাবে।

إلا ان بفتح الهمزة تطوع

নফল ও কাযা এবং পূর্ণাঙ্গ করা ঃ এ হাদীসের অধীনে একটি আলোচ্য বিষয় হল, যদি নফল নামায বা রোযা শুরু করা হয়, তবে তা পূর্ণাঙ্গ করা এবং কোন কারণে ফাসিদ হয়ে গেলে তা কাযা করা জরুরী কি না? হানাফীদের মতে তা কাযা করা আবশ্যক ও ওয়াজিব। সাধারণ গ্রন্থরাজিতে মালিকীদের মাযহাব এটাই বর্ণিত আছে। কোন কোন গ্রন্থে আছে, ইমাম মালিক র. এর মতে কোন নফল আরম্ভ করার পর বিনা ওযরে ফাসিদ করলে কাযা ওয়াজিব হয়।

শাফিঈদের প্রমাণাদি ঃ যেহেতু استثناء তে আসল হল মুত্তাসিল হওয়া। আর শাফিঈগণ মুনকাতি'এর প্রবক্তা। তাহলে الا ان تطوع শব্দে শাফিঈদের মতে مستثنى منقطع অর্থাৎ — مستثني منه থেকে مستثني বহির্ভূত থাকবে। مستثني منه তে ফরয ওয়াজিব সব ছিল, আর مستثنى তে নফল ও মুস্তাহাবগুলো অন্তর্ভূক্ত। যদি مستثنى متصل মানা হয়, যেমন হানাফীগণ বলেন, তবে হাদীসের অর্থ এই হবে যে, এগুলো ছাড়া আর কোন কিছু

ফরয নেই, তবে নফল পড়লে শুরু করার পর ওয়াজিব হয়ে যাবে। কারণ, مستثنى متصل এ মুসতাসনা মুসতাসনা মিনহুর সমজাতীয় হওয়া জরুরী। এটিও সর্বজন স্বীকৃত বিষয় যে, متصل হল আসল। এজন্য হাফিজ আসকালানী শাফিঈ র. বলেন-

وحرف المسئلة دائرة على الاستثناء فمن قال انه متصل تمسك بالأصل ومن قال انه منقطع احتاج الى دليل والدليل عليه ما روي النسائى وغيره. فتح الباري ١/٨٨

"এ মাসআলাটি নির্ভর করে ইসতিসনার উপর। যিনি বলেছেন, ইসতিসনা মুত্তাসিল, তিনি আসলের উপর নির্ভর করে উক্তি করেছেন। আর যিনি বলেছেন, মুনকাতি' তার উক্তি দলীলের মুখাপেক্ষী। বস্তুত ঃ এর উপর প্রমাণ হল, সুনানে নাসাঈ ইত্যাদির একটি রেওয়ায়াত।" -ফাতহুল বারী ঃ ১/৮৮।

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো নফল রোযার নিয়ত করতেন, অতঃপর তা ভেঙ্গে ফেলতেন। বুখারী শরীফের আরেকটি রেওয়ায়াতে আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জুয়াইরিয়া বিনতুল হারিস রা. কে শুক্রবার দিন রোযা আরম্ভ করার পর ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। -বুখারী ১/২৬৭

হাফিজ আসকালানী র. এ দুটি রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। এগুলোতে কাযা সম্পর্কে নীরবতা রয়েছে। আর যে সব রেওয়ায়াতে কাযা করার সুস্পষ্ট হুকুম রয়েছে, সেগুলো জেনে বুঝে ছেড়ে দিয়েছেন, এটা ইনসাফ পরিপন্থী কাজ।

হানাফীদের প্রমাণাদি ঃ

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, আমি ও হাফসা রা. রোযা রেখেছিলাম। বকরির গোশত হাদিয়া স্বরূপ এলে তা আমরা উভয়ে খাই। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট তাশরীফ আনেন। (হযরত হাফসা রা. একথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দেন।) তখন তিনি বললেন, اقضيا يوما آخر مكانه. (তিরমিযী ঃ ১/৯২, মিশকাত ঃ ১/১৮১, মুসনাদে আহমদ। অর্থাৎ, এর পরিবর্তে অন্য কোন দিন কাযা করে নিও।

২। দারাকুতনী হযরত উম্মে সালামা রা. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একদিন রোযা রেখেছিলেন, অতঃপর কোন কারনে ভেঙ্গে ফেলেছিলেন, তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কাযার নির্দেশ দিয়েছেন।

নির্দেশসূচক শব্দ আসে ওয়াজিব বুঝানোর জন্য। অতএব বুঝা গেল কাযা ওয়াজিব।

৩। ইরশাদে ইলাহী রয়েছে- لا تبطلوا اعمالكم. অর্থাৎ, স্বীয় আমলগুলো বাতিল করনা। এখানে নিষেধাজ্ঞাসূচক শব্দ রয়েছে। নিষেধাজ্ঞায় আসল হল, হারামের জন্য হওয়া। যেহেতু আমল বাতিল করা হারাম হল, সেহেতু সে আমল টিকিয়ে রাখা আবশ্যক হল। অর্থাৎ, শুরু করার পর পূর্ণ করা ওয়াজিব।

৪। ইজমা দ্বারাও হানাফীদের মাযহাব প্রমাণিত হয়। যদি কেউ নফল হজ্ব শুরু করে দেয়, তবে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব। ভেঙ্গে ফেলা জায়িয নেই। ভেঙ্গে ফেললে সর্বসম্মতিক্রমে কাযা ওয়াজিব। অতএব নফল নামায ও রোযারও এই হুকুমই হওয়া উচিত।

৫। ইবাদতে সতর্কতা অবলম্বন উত্তম। স্পষ্ট বিষয় ইবাদত করা ও তা পরিহার করার ক্ষেত্রে ইবাদত করাই অধিক সতর্কতামূলক।

৬। সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হল, বাদায়ি' গ্রন্থকার (১/২৯০) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, وليوفوا نذورهم. অর্থাৎ, তারা যেন তাদের মান্নতগুলো পূর্ণ করে।

এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, সহীহ মান্নত পূর্ণ করা ওয়াজিব। বস্তুত ঃ মান্নত দুই প্রকার।

ক. বাচনিক মান্নত যা প্রসিদ্ধ, খ. কার্যত মান্নত।

নফল শুরু করা কার্যত মান্নত। যখন মানুষ আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোন কিছু করার মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেয়, তখন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ থেকে বাঁচার জন্য তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। অতএব যে সব জিনিস মানুষ নিয়ত সহকারে আরম্ভ করে দেয়, তা পূর্ণ করা সর্বোত্তম রূপেই ওয়াজিব হবে।

والله لا ازيد على هذا ولا انقص.

প্রশ্ন ঃ অতিরিক্ত ইবাদত না করার কসম কেন খেলেন? (এর উপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফলতার সুসংবাদ কিভাবে দিলেন?)

উত্তর ঃ কোন কোন সময় দুটি অংশ উল্লেখ করে একাংশের তাকীদ উদ্দেশ্য হয়। যেমন, ক্রেতা মূল্যে হ্রাস করতে চাইলে বিক্রেতা উত্তরে বলেন, এতে একটুও কম বেশী হবে না। এর উদ্দেশ্য হয়, কম হবে না, কিন্তু তাকীদের জন্য বেশীর কথাও সাথে মিলিয়ে বলা হয়। এটা ওরফ হয়ে গেছে। অতএব এখানেও শুধু لا انقص উদ্দেশ্য।

২। এ ব্যক্তি স্বীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ্য থেকে প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন, এজন্য রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীগুলো কওম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া তার দায়িত্বে ওয়াজিব ছিল। কাজেই তাঁর এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য হল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীগুলোর প্রচারে নিজের পক্ষ্য থেকে কোন হ্রাস বৃদ্ধি করবেন না।

৩। এ উদ্দেশ্যও হতে পারে যে, ধরণগত কোন হ্রাস-বৃদ্ধি করব না। অর্থাৎ, ফরযকে অফরয, অফরযকে ফরয মনে করব না। তাছাড়া ফজরের নামাযে দু রাকআতের স্থলে চার রাকআত, জোহরে চার রাকআত স্থলে দু রাকআত করব না।

৪। এ উক্তিটিকে বাহ্যিক অর্থে রাখাও যথার্থ হতে পারে যে, আমি নফল ইবাদত করব না, বস্তুত ঃ এর উপর কসম বিমূখতা ও ঘৃণার কারণে নয়, বরং ফুরসত না থাকার কারণে এ শপথ করেছেন।

হযরত উসমানী র. বলেন, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী র. হযরত হাজী সাহেবের খেদমতে আরজ করলেন, আমি শুধু বায়আত হতে চাই। যিকির শোগল ইত্যাদি আমার দ্বারা কিছুই হবে না। বললেন, কিছুই করতে হবে না, কিন্তু কমপক্ষ্যে শিখে নাও, হতে পারে কখনো মন চাইতে আরম্ভ করবে। এরপর বার তাসবীহের পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন। তিনিও শুধু শিখে নিলেন, খেয়াল ছিল এগুলো করবেন না।

হাজী সাহেব র. একটি তদবীর করলেন, খাদেমকে বললেন, তাঁর বিছানা আমার কাছে যুক্ত করে দাও। হঠাৎ রাত্রে চোখ খুলে গেল। যৌবনকাল ছিল। রাত্রে উঠার কল্পনাও ছিল না। চোখ খোলার পর পুনরায় ঘুমানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঘুম আসছে না। মনে করলেন, ঘুম যেহেতু আসছে না, তাহলে আজকে হযরতের বাতানো ওযীফাই পড়ে নেই। তাহাজ্জুদ পড়ে খুব আগ্রহের সাথে যিকির করলেন। যিকিরের মজা এরকম অনুভূত হল যে, পূরা রাত্র যিকিরেই কাটিয়ে দিলেন। এমনিভাবে হতে পারে, সে সাহাবী রা. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে لا ازيد তো বলেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে প্রচুর পরিমাণ নফল ইবাদতেও রত হয়েছিলেন।

افلح ان صدق যদি সে নিজের কথায় সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে সে সফলকাম।

মুসলিম শরীফের একটি রেওয়ায়াতে আছে, .افلح وابيه ان صدق, (মুসলিম ঃ ১/৩০) অর্থাৎ, তার পিতার শপথ, যদি সে সত্যবাদী থাকে, তবে সফলকাম হবে।

প্রশ্ন ঃ এতে রয়েছে, গায়রুল্লাহর কসম। অথচ ইরশাদে নববী রয়েছে, .٩٨٣/٢ لا تحلفوا بآبائكم. بخاري তথা তোমাদের পিতা-প্রপিতাদের নামে শপথ কর না। -বুখারী ঃ ২/৯৮৩।

যেহেতু গায়রুল্লাহর কসম খাওয়া নিষেধ, তাহলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে গায়রুল্লাহর শপথ করলেন?

উত্তর ঃ গায়রে মুকাল্লিদ আল্লামা শাওকানী র. নাইলুল আওতারে না বুঝে শুনে উত্তর দিয়েছেন। هو من فلتات لسانه. অর্থাৎ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে এটি এমনিতেই নিঃসৃত হয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক) নিঃসন্দেহে এ উত্তর ভ্রান্ত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে এটা অনর্থক ধৃষ্টতা।

উত্তর ঃ ১। হতে পারে এটা গায়রুল্লাহর কসম খাওয়া হারাম হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা।

২। এ কানূন থেকে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতিক্রমভূক্ত। স্পষ্ট বিষয়, আল্লাহ তা'আলার উপর তো কোন কিছু হারাম বা ফরয হওয়ার প্রশ্নই আসে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জন্য ব্যতিক্রমভূক্ত যে, এখানে হারামের কারণ অবিদ্যমান। গায়রুল্লাহর নামে কসম হারাম হওয়ার কারণ হল, যার নামে কসম খেল তার মাহাত্ম্য শিরকের দিকে পৌঁছে দেয় কি না। বস্তুত ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে এর কোন সম্ভাবনাই নেই।

৩। এখানে رب শব্দটি উহ্য। আসলে ছিল, ورب ابيه

৪। কোন কোন মাশায়েখ থেকে বর্ণিত আছে, এ শব্দটি মূলত ছিল, افلح والله লিপিকারের ভূলে فلح وابيه হয়ে গেছে। والله اعلم بالصواب

ত্বালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা.

হযরত ত্বালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা. এর উপনাম আবু মুহাম্মদ। তিনি আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভূক্ত। ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম আট মনীষীর মধ্যে তিনি শীর্ষস্থানীয়। হযরত উমর ফারূক রা. নিজের পর খলীফা মনোনীত করার জন্য যে ছয় মনীষীকে বাছাই করেছিলেন, তিনিও তাদের একজন ছিলেন। দশই জুমাদাল উলা ৩৬ হিজরীর মর্মান্তিক উষ্ট্রি যুদ্ধে কোন পক্ষ থেকে একটি তীর লেগে শহীদ হয়ে যান শাহাদাত কালে তাঁর বয়স হয়ে ছিল ৬৪/৬৩ বা ৫৮ বছর।

তাঁর সূত্রে ৩৮ টি হাদীস বর্ণিত আছে। দুটি হাদীসের ব্যাপারে বুখারী মুসলিম একমত, আর দুটি রেওয়ায়াত স্বতন্ত্রভাবে ইমাম বুখারী র., তিনটি রেওয়ায়াত স্বতন্ত্রভাবে ইমাম মুসলিম র. বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ, বুখারীতে তাঁর সর্বমোট চারটি হাদীস, আর মুসলিমে পাঁচটি হাদীস রয়েছে।

٣٥. بَابُ اِتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ مِنَ الْاِيْمَانِ

৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ জানাযার অনুগমন ঈমানের অংশ

٤٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَنْجُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضـــ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا

وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ تَابَعَهُ عُثْمَانُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ .

৪৫. আহমদ ইবনে 'আবদুল্লাহ্ আলী আল-মানজূফী র. ...... হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় কোন মুসলমানের জানাযার অনুগমন করে এবং তার নামায-ই জানাযা আদায় ও দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সাথে থাকে, সে দুই কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে। প্রতিটি কীরাত হল উহুদ পর্বতের মত। আর যে ব্যক্তি শুধু তার জানাযা আদায় করে, তারপর দাফন শেষ হওয়ার আগেই চলে আসে, সে এক কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরে আসবে।

'উসমান আল-মুয়াযযিন র. .... হযরত আবূ হুরায়রা রা. সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হল, من اتبع جنازة مسلم الخ বাক্যে।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, কিতাবুল ঈমান ঃ ১২, জানায়িয ঃ ১৭৭।

পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের সাথে যোগসূত্র ঃ যোগসূত্র হল, যাকাত প্রদান ও জানাযার সাথে একটি বিষয়ে উভয়টি যৌথ, অর্থাৎ, মুসলমানের হক আদায়। অথবা বলা হবে, যেরূপভাবে একজন ফকীর ও দরিদ্র মুসলমানের প্রয়োজন ও জরুরিয়্যাত অন্যের সাহায্যে পরিপূর্ণ হয়, এমনিভাবে মৃত ব্যক্তিও স্বীয় প্রয়োজনাদির ক্ষেত্রে সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়। এ পরিমাণ যৌথ বিষয়ের কারণে ইমাম বুখারী র. الزكوة من الاسلام এরপর اتباع الجنائز অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য, মুরজিয়ার মতখন্ডন। কারণ, জানাযার সাথে যাওয়া একটি আমল। অতঃপর অংশগ্রহণকারীদের অংশগ্রহণে পার্থক্যের ফলে সওয়াবে তফাতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যদ্বারা আমলের তফাতের ফলে ঈমানের হ্রাস বৃদ্ধি প্রমাণিত হল।

ব্যাখ্যা ঃ হানাফী ও শাফিঈদের মধ্যে এ বিষয়টি আলোচিত হয়ে রয়েছে যে, জানাযার সাথে যারা যাবে তারা খাটের আগে থাকবে না পরে। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, জানাযার আগে পিছে ডানে বামে সব দিকে চলা জায়িয আছে। মতবিরোধ শুধু উত্তমতার ক্ষেত্রে। শাফিঈগণ বলেন, মৃতের আগে হাটা উচিত। কারণ, যারা সাথে যাবে তারা যেন সুপারিশকারী। বস্তুত ঃ হানাফীগণ বলেন, মায়্যিতের সাথে পিছনে যাওয়া উত্তম। এই মতবিরোধের সম্পর্ক জানাযা বহনকারীদের সাথে নয়, বরং জানাযার সাথে যারা চলবে তাদের সাথে সম্পৃক্ত।

◆ শাফিঈগণ বলেন, যারা জানাযার সাথে চলবে তারা সুপারিশকারী হিসেবে গিয়ে থাকে। সাধারণ রীতি হল, অপরাধী পিছনে থাকে সুপারিশকারী থাকে আগে ।

◆ হানাফীগণ বলেন, মায়্যিতকে আল্লাহর দরবারে অপরাধীরূপে পেশ করার এ মতবাদ ঠিক নয়। যদি এরূপ হত তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দূরাবস্থায় ছেঁড়াফাঁড়া কাপড়ে নিয়ে যেত, কিন্তু শরীয়তের হুকুম হল, মৃতকে ভাল করে গোসল দিয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে ভাল ও নতুন কাপড় পড়িয়ে সুগন্ধি ব্যবহার করে সম্মানের সাথে নিয়ে যাওয়া হয়। জানাযার সময়ও মায়্যিতকে সামনেই রাখা হয়।

মোটকথা, হানাফীদের মতে যারা জানাযার সাথে যাবে তাদের জন্য মায়্যিতের পিছনে যাওয়াই উত্তম। اتباع শব্দ দ্বারা এ অর্থই বুঝা যায়। এখানে ইমাম বুখারী র. শিরোনামে اتباع শব্দ রেখেছেন। হাদীসেও تبع শব্দ রয়েছে। আভিধানিকভাবে اتباع শব্দের অর্থ হল, পিছনে চলা।

জানাযা নামায কোথায় পড়া উত্তম?

এ মাসআলাতেও মতবিরোধ রয়েছে যে, মসজিদে জানাযা নামায পড়া মাকরূহ কি না?

◆ শাফিঈগণের মাযহাব হল, জানাযা নামায উত্তম তো মসজিদের বাহিরেই কিন্তু মসজিদের ভিতরেও তা বিনা মাকরূহ জায়িয।

◆ হানাফীদের মতে উত্তম হল, মসজিদের বাইরে জানাযা নামায পড়া উত্তম। মসজিদের ভিতরে মাকরূহ। অতিরিক্ত বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ কিতাবুল জানায়িযে আসবে।

ايمانا واحتسابا -ঈমান রেখে ও সওয়াবের নিয়তে। অর্থাৎ, এ দুটি বিষয় যেন কোন মুসলমানের জানাযার সাথে চলার কারণ হয়, শুধু রসম রেওয়াজ অথবা পারিবারিক সম্পর্কে যেন না হয়। যেমন, বর্তমানে সাধারণত হয়ে থাকে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম احتساب শব্দ উল্লেখ করে সওয়াবের নিয়তের দিকে মনযোগী করলেন। কারণ, যদি তোমাদের ছোট আমলের সাথেও এই নিয়ত করে নাও, তাহলে সওয়াব অনেক বৃদ্ধি পাবে। এজন্য ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি মৃতের সাথে থাকল এবং জানাযা নামাযে অংশ গ্রহণের পর দাফন পর্যন্ত সাথে থাকল, সে দু কীরাত নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে, আর যদি কেউ শুধু জানাযা নামাযে অংশ গ্রহনের পর দাফনের পূর্বে ফিরে আসে, সে এক কীরাত সওয়াব পায়। কীরাতও পার্থিব নয়, যেটি এক দিনারের ১২ ভাগের এক ভাগ হয়ে থাকে, বরং আখিরাতের কীরাত উদ্দেশ্য, যেটি উহুদ পাহাড় পরিমান হবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল উদ্বুদ্ধকরণ। এর ফলে ঈমান বৃদ্ধির দিকেও কিছুটা ইঙ্গিত হয়ে গেল।

تابعه عثمان المؤذن এ হাদীসে রাওহের মুতাআবাত করেছেন উসমান মুয়াযযিন। অর্থাৎ, তিনি স্বীয় সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। উদ্দেশ্য হল, যে রাওহের সনদে আবূ হুরায়রা রা. এর হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, তার সমর্থনে উসমান মুয়াযযিন থেকেও একটি রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে। ইমাম বুখারী র. এ পার্থক্য বর্ণনা করতে চান যে, আমার রেওয়ায়াত হল শব্দগত, আর উসমানের রেওয়ায়াত হল অর্থগত। এ জন্য مثله এর পরিবর্তে نحوه দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

٣٦. **بَاب خَوْف الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ** وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلَّا خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذَّبًا وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ إِنَّهُ عَلَى إِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَيُذْكَرُ عَنْ الْحَسَنِ مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ وَمَا يُحْذَرُ مِنْ الْإِصْرَارِ عَلَى النِّفَاقِ وَالْعِصْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ .

৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ অজ্ঞাতসারে মু'মিনের আমল নষ্ট হওয়ার আশংকা।

(ওয়াযেজ) ইবরাহীম তাইমী র. বলেন ঃ আমার আমলের সাথে যখন আমার কথার তুলনা করি, তখন আশঙ্কা হয়, আমি মিথ্যাবাদী হই কি না। ইবনে আবূ মুলাইকা র. বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এমন ত্রিশজন সাহাবীকে পেয়েছি, যাঁরা সবাই নিজেদের সম্পর্কে মুনাফিকির আশংকা করতেন। তাঁরা কেউ এ কথা বলতেন না যে, তিনি জিবরাঈল আ. ও মীকাঈল আ.-এর তুল্য ঈমানের অধিকারী। হাসান (বসরী) র. থেকে বর্ণিত, নিফাকের ভয় মু'মিনই করে থাকে। আর কেবল মুনাফিকই তা থেকে নিশ্চিন্ত থাকে। তওবা না করে পরস্পর লড়াই করা ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে সতর্কী করন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ .

'এবং তারা (মুত্তাকীরা) যা করে ফেলে, জেনে শুনে তারা (মন্দকাজ) বারবার করে না।'

(আলে-ইমরান ঃ ১৩৫)

যোগসূত্র ঃ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছিল যে, জানাযার পিছনে চলা এবং দাফনে অংশ গ্রহণের ফলে বিশাল সওয়াব তখন অর্জিত হবে, যখন ঈমান ও সওয়াব মনে করে তা করবে। কোন পার্থিব স্বার্থে না করবে, বরং শুধু খালিস ভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করবে। এবার এ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করছেন যে, কখনো আমলের সাথে বা তার পরে এরূপ কিছু জিনিস যুক্ত হয়ে যায়, যার ফলে মানুষ প্রতিশ্রুত সওয়াব থেকে মাহরূম হয়ে যায়। অথচ সে তা টেরও পায় না। কাজেই মানুষের জন্য উচিত হল, আমলের সময় ও পরবর্তী কালে এরূপ যৌগিক বিষয়াবলী থেকে পরহেয করা, যেগুলো প্রতিশ্রুত সওয়াব বাতিল হওয়ার কারণ হতে পারে।

এ অনুচ্ছেদে দুটি শিরোনাম রয়েছে।

১। خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر

অর্থাৎ, মুমিনের আশংকা থাকা চাই যাতে কোন গাফিলতির সময় ও বিনা অনুভূতিতে তার আমল বেকার না হয়ে যায়।

২। ما يحذر من الاصرار على االنفاق والعصيان من غير توبة.

অর্থাৎ, সে সব বিষয়ের বিবরণ যেগুলো থেকে মুমিনদের সতর্ক করা হয়। যেমন, পারস্পরিক লড়াই এবং তওবা ছাড়া বারবার গুনাহে লিপ্ততা।

ইমাম বুখারী র. প্রথম শিরোনামটি প্রমাণ করার জন্য ইবরাহীম তাইমী র. প্রমুখের উক্তিগুলো উল্লেখ করেছেন। আর দ্বিতীয় শিরোনামের জন্য দুটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। যেহেতু হাদীসে তওবা ছাড়া বারবার গুনাহের উল্লেখ ছিল না, সেহেতু একটি আয়াত ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. উল্লেখ করে সে ঘাটতি পূর্ণ করে দিয়েছেন।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ এ অনুচ্ছেদ দ্বারাও ইমাম বুখারী র. এর আসল উদ্দেশ্য মুরজিয়া সম্প্রদায়ের মতখন্ডন, কিন্তু ইমাম বুখারী র. এ অনুচ্ছেদ থেকে দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এ পর্যন্ত তিনি ঈমানে পূর্ণাঙ্গতা দানকারী বিষয়গুলোর বিবরণ দিয়েছেন। এ অনুচ্ছেদ থেকে ঈমানের জন্য ক্ষতিকর জিনিসগুলোর বিবরণ দিচ্ছেন।

মুরজিয়া সম্প্রদায় বলে, আমল কোন নির্ভরযোগ্য কিছুই নয়, আমল না ঈমানের প্রকৃত অংশ, না পূর্ণাঙ্গতা দানকারী অংশ। ইমাম বুখারী র. এ পর্যন্ত অর্থাৎ, اتباع الجنائز من الايمان' পর্যন্ত من الاسلام এবং من الدين এ ধরনের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ কায়েম করে বলেছেন যে, এ সব আমল ঈমানে কামিলের অংশ। এগুলো দ্বারা ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয়, রওনকদার হয়, এবার এ অনুচ্ছেদে অপরদিক থেকে মুরজিয়ার মতখন্ডন করছেন। মুরজিয়া এটাও বলে যে, لا تضر مع الايمان معصية

ইমাম বুখারী র. এ অনুচ্ছেদ থেকে বলছেন যে, গুনাহের কাজ ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যদি ঈমানের জন্য গুনাহের কাজ ক্ষতিকর না হত, তবে আল্লাহ তা'আলা ان تحبط اعمالكم বলতেন না। অথচ আল্লাহ তা'আলা তা বলেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল, অবাধ্যতার কারণে আমল বরবাদ হয়, এমনকি কখনো কখনো মানুষ বারবার গুনাহের কাজ করতে থাকলে এবং তওবা না করলে কুফরীতে লিপ্ততার মুহূর্তও এসে যায়।

خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لايشعر. মুমিনের জন্য উচিত হল, বেখবর অবস্থায় আমল বাতিল হয়ে যাওয়ার আশংকায় থাকা। এই শিরোনামটি একটি আয়াত থেকে নির্বাচিত। আয়াতটি হল,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ. سورة حجرات

এতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আদব-ইহতিরামের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। যেরূপভাবে পরস্পরে একজন অপরজনের সাথে অকৃত্রিমভাবে কথাবার্তা বল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা বে আদবী। হতে পারে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এতে মনোকষ্ট হবে। যার ফলে তোমাদের আমল তোমাদের বেখবর অবস্থায় বাতিল হয়ে যাওয়ারও আশংকা আছে।

কোন কোন জিনিস বাহ্যত মামুলি মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে বড়ই বিপদজনক প্রমাণিত হয়। যেমন, ডায়নামাইট সামান্য হয়ে থাকে, কিন্তু পাহাড়কে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

প্রশ্ন ঃ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের নিকট এ বিষয়টি সর্বসম্মত যে, কুফর ছাড়া কোন গুনাহ আমল নষ্ট করে দেয় না। মু'তাযিলার মতে যেহেতু গুনাহের কাজ ঈমান থেকে বহিস্কার করে দেয় সেহেতু গুনাহের কাজগুলো আমল সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে দেয়। এজন্য আল্লামা জমখশরী এ মাসআলাতে উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়াজের সামনে উঁচু

স্বরে কথা বলা কুফরী নয়, তা সত্ত্বেও ان تحبط اعمالكم বলা হয়েছে। এতে বুঝা গেল, কুফর ছাড়া অন্যান্য গুনাহও আমল বিনষ্টকারী।

উত্তর ঃ এর অনেক উত্তর দেয়া হয়েছে। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তর হল, ইবনে মুনাইয়্যির মালিকী র. এরটি। কাশশাফের টীকায় সে উত্তরটি বর্ণিত হয়েছে। এটি দুটি ভূমিকার উপর নির্ভরশীল।

১। বড় মনীষীর সামনে ছোট মানুষের উচ্চস্বরে কথোপকথন কোন কোন সময় কষ্টের কারণ হয়ে যায়।

২। নবীকে কষ্টদান সর্বসম্মতিক্রমে কুফর। আল্লাহ তা'আলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্টদানের ব্যাপারে কঠোর শাস্তির ঘোষনা দিয়েছেন।

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ. سورة توبة

অতএব যেহেতু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তাঁর স্বরের উপর উচ্চ স্বরে কোন কোন কথা কুফরীর কারণ হয়, আর এতে তারতম্য করাও মুশকিল যে, কোন সীমা পর্যন্ত উচ্চস্বরে কথা বলা কুফরীর কারণ, আর কোন সীমা পর্যন্ত নয়। অতএব মূল বিষয়টির মূলোৎপাটনের জন্য উচ্চস্বরে প্রতিটি কথা বলা থেকেই নিষেধ করে দিয়েছেন। যাতে বেখবর অবস্থায় উচ্চস্বরে কোন কথা বলার ফলে কুফরী আবশ্যক না হয়। যার ফলে সমস্ত আমল বেকার হয়ে যায়। এর নজির হল-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ. سورة حجرات

অথচ কোন কোন কুধারণা গুনাহের কাজ। কিন্তু অধিক কুধারনা থেকে বাঁচার নির্দেশ দেয়ার কারণ হল, তারতম্য করা মুশকিল। এমন যেন না হয়ে যায়, যাতে এমন কোন কুধারণায় লিপ্ত হয়ে গেল যেটি আসলে গুনাহের কাজ।

قال ابراهيم التيمي ইমাম বুখারী র. প্রথমে শিরোনাম প্রমাণ করার জন্য সর্বাগ্রে ইবরাহীম তাইমী র. এর উক্তি পেশ করেছেন।

ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا.

অর্থাৎ, আমি নিজের উক্তিকে কাজের সাথে যখন মিলিয়েছি, তখনই আশংকা হয়েছে যে, আমি আবার শরীয়তকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের অন্তর্ভূক্ত কি না!

مكذّبا ইসমে ফায়েল হয়। যালের নিচে যেরও হতে পারে, আবার ইসমে মাফঊল হয়ে যালের উপর যবরও হতে পারে। প্রথম ছুরতে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে।

১। দীনকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। ২। নিজেকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী।

◆ প্রথম ছুরতে উদ্দেশ্য হবে। যখন আমি ঈমানের দাবী অনুসারে আমল করব না, তখন যেন আমি নিজের আমল দ্বারা দীনকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। কারণ, যদি ঈমান ও ঈমানী আমল উপকারী হত, তাহলে এর উপর আমি আমল কেন করি না। এতে বুঝা গেল, ঈমান সত্য ধর্ম হওয়া এবং ইসলামী কাজ ও আহকাম ভাল হওয়ার দাবী শুধু মৌখিক, অন্তর থেকে তা মানি না। অন্যথায় এর উপর অবশ্যই আমল করতাম। এ ছুরতে (দীনকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী হওয়ার ছুরতে) এক অর্থ হতে পারে, মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের সদৃশ হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ, আমল হিসেবে দীনকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের সাথে সাদৃশ্যের কারণে আমিও مكذب । যেন দীনকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের অন্তর্ভূক্ত না হয়ে যাই। কারণ, মুনাফিকদের মুখ তো খুব চলে, কিন্তু আমলের ময়দান তাদের শূন্য।

◆ দ্বিতীয় ছুরত مكذبا لنفسي এর অর্থ হবে, যখন আমি নিজের উক্তিকে আমলের সামনে পেশ করি তখন আশংকা করি, আমি নিজে নিজেকে মিথ্যা বলছি না তো। কারণ, আমার কথা সত্য হলে তো এর উপর অবশ্যই আমি আমল করতাম।

মোটকথা, বুখারীর ব্যাখ্যাতাদের মত হল, ইসমে ফায়েলের শব্দই সর্বপ্রধান। তবে যবরের রেওয়ায়াতটিও প্রমাণিত। এমতাবস্থায় ইসমে মাফঊলের সীগা হবে। অর্থ হবে- যখন আমি নিজের আমল ও উক্তিতে তুলনা করি, তখন আমার আশংকা হয় যে, আমি আবার মিথ্যা প্রতিপন্ন হই কি না যে, তোমার কথা ও কাজ এক রকম নয়। অর্থাৎ, প্রতিটি দর্শক আমাকে মিথ্যুক বলবে।

◆ হযরত ইবরাহীম তাইমী র. বড় আবিদ, জাহিদ, মুত্তাকী, পরহেযগার তাবিঈ ছিলেন। তিনি ওয়ায়েজ ছিলেন এবং আমলও করতেন। অতএব ইবরাহীম তাইমী র. এর এ উক্তি বিনয় ও আল্লাহ ভীতির প্রবলতার উপর নির্ভরশীল। তিনি সে সব ওয়ায়েজের অন্তর্ভূক্ত নন, যাদের সম্পর্কে হাফিজ সিরাজী র. বলেছেন-

واعظان كين جلوه بر محراب ومنبر ميكنند ÷ جون بخلوت مي روندآن كار ديكر ميكنند.

مشكلي دارم زدانشمند مجلس باز برس ÷ توبه فرمايان جرا خود توبه كمتر مين كنند.

তাঁর ইঙ্গিত হল, নিম্নোক্ত আয়াতের দিকে-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ. جزء ٢٨/ ركوع ٩.

আল্লামা আইনী র. বলেন,

ان ابراهيم هو ابن زيد بن شريك الكوفي قتله الحجاج بن يوسف وقيل مات في سجنه الخ.

অর্থাৎ, প্রসিদ্ধ জালিম হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত ইবরাহীম নাখঈ র.কে গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়, কিন্তু সিপাহী সমনামী হওয়ার কারণে হযরত ইবরাহীম তাইমী র.কে গ্রেফতার করে জেলে আবদ্ধ করে। লোকজন বলল, আপনাকে ভূলে ধরে আনা হয়েছে। আপনি সাফাই পেশ করুন। তিনি বললেন, আমি নিজেকে বাঁচিয়ে একজন নিরপরাধ লোকের শাস্তির কারণ হতে পছন্দ করি না। ফলে সে জেলেই ৯২ হিজরীতে তিনি ওফাত লাভ করেন।

وقال ابن ابي مليكة الخ. মীমের উপর পেশ। তিনি হলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ কুরাশী মক্কী তাইমী। প্রসিদ্ধ তাবিঈ আলিমদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর বিচারক ও মুয়াযযিন ছিলেন। ১১৭ হিজরীতে তিনি ওফাত লাভ করেন। ইমাম বুখারী র. প্রথমে শিরোনাম প্রমাণ করার ধারায় ইবরাহীম তাইমী র. এর পর আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকার উক্তি পেশ করেন।

ادركت ثلاثين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه.

ইবনে আবু মুলাইকা র. বলেন, আমি ৩০ জন সাহাবী পেয়েছি, যাদের প্রত্যেকে নিজের ব্যাপারে মুনাফিকীর আশংকা করতেন। অর্থাৎ, আমলী মুনাফিকীর আশংকা করতেন। অথবা বলা হবে, এখানে নিফাক দ্বারা উদ্দেশ্য উভয় প্রকার মুনাফিকী-ই।

এর দ্বারা বিদ'আতী মুরজিয়ার মতখন্ডন হয়ে যায়। যারা ঈমানের সাথে আমলের কোন গুরুত্ব দেয় না সাহাবায়ে কিরামের অন্তর আল্লাহর ভয়ে পরিপূর্ণ ছিল। আল্লাহ তা'আলার আজমত ও মাহাত্ম্য তাঁদের অন্তরে ছিল চুড়ান্ত পর্যায়ের। ফলে তারা সর্বদা ভীত কম্পিত থাকতেন।

◆ হযরত ফারূকে আজম রা. এর ন্যায় পবিত্র খলীফা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন তথ্যজ্ঞানী হযরত হুযাইফা রা. কে জিজ্ঞেস করতেন যে, আমার নাম মুনাফিকদের তালিকায় আছে কি না? অথচ তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবান মুবারক থেকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনেছিলেন। আবার ছিলেন তাঁর মন্ত্রী ও উপদেষ্টা। এসব এরই প্রতিফল যে, ঈমান হল ভয় ও আশার মাঝখানে।

◆ ইহইয়াউল উলূমে হযরত উমর ফারূক রা. এর একটি আছর বর্ণিত আছে যে, যদি মেনে নেই, হাশরের ময়দানে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এই ঘোষনা হয় যে, পূর্ণ মাখলূকের মধ্য থেকে একজন ছাড়া আর কেউ জাহান্নামী হবে না, তবে আমার আশংকা থাকবে, সে এক ব্যক্তি বোধ হয় আমি-ই হব। আর যদি ঘোষনা হয়, শুধু এক ব্যক্তি জান্নাতে যাবে, তবে আল্লাহর ফযল ও রহমতে আমি আশাবাদী হব, বোধ হয় সে ব্যক্তি আমি-ই হব। আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এবং তার আযাব থেকে নির্ভয় হয়ে যাওয়া উভয়টি কুফর ও ক্ষতিগ্রস্ততার নিদর্শন।

ما منهم احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل এসব সাহাবীর মধ্য থেকে কেউ এরূপ বলতেন না যে, আমার ঈমান হযরত জিবরাঈল ও মিকাঈল আ. এর ন্যায়।

◆ কোন কোন মাশায়েখে দরসের খেয়াল হল, এ বাক্যটির উদ্বৃতি দিয়ে বাহ্যত ইমাম আজম আবু হানীফা র. এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তবে প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতাগণ যেমন, নববী, কিরমানী, হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী, হাফিজ আইনী, কাসতাল্লানী এবং তাইসীরুল কারী গ্রন্থকার কেউ এটি লেখেননি যে, এ বাক্য দ্বারা ইমাম আজম আবূ হানীফা র. এর মতখন্ডন উদ্দেশ্য।

এর একটি স্পষ্ট নিদর্শন হল, ইমাম বুখারী র. এর কথায় .ايماني كايمان جبريل وميكائيل রয়েছে। বস্তুতঃ ইমাম আজম র. থেকে কোন গ্রন্থে মীকাঈল শব্দ বর্ণিত নয়, এজন্য হতে পারে ইমাম বুখারী র. এর সমকালীন কোন বিদ'আতী মুরজিয়ার এই উক্তি হতে পারে। যেটি খন্ডন করা উদ্দেশ্য। ইমাম আবূ হানীফা র. এর ইবাদত, ইসতিকামাত, ইখলাস, লিল্লাহিয়্যাত, তাকওয়া, আল্লাহভীতি সমস্ত মাখলূকের মধ্যে প্রসিদ্ধ। মুতাওয়াতিররূপে এসব প্রমাণিত। ইমাম বুখারী র. এ সম্পর্কে না ওয়াকিফহাল হতে পারেন না। এজন্য এই শিরোনাম এবং এধরণের উক্তিগুলো দ্বারা তাঁর মতখন্ডন উদ্দেশ্যই হতে পারে না। এধরনের শিরোনামগুলো দ্বারা তারই মতখন্ডন উদ্দেশ্য হতে পারে যে, গুনাহের কাজগুলোকে ক্ষতিকর মনে করে না এবং যে বলে, নবী, রাসূল, সিদ্দীকগণ এবং সাধারণ মুমিনদের ঈমান এক সমান। তাঁদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। অতঃপর এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী র. যে রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন, তাতে পরিষ্কার মুরজিয়া শব্দ আছে, বস্তুতঃ سباب المسلم فسوق দ্বারা তারই মতখন্ডন হতে পারে যে, গুনাহকে ক্ষতিকর মনে করে না। ইমাম আবূ হানীফা র. এর মাযহাব তো এটাই যে, মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসিকী। অতএব এর দ্বারা ইমাম আজম র. এর মতখন্ডন কিভাবে হতে পারে? অবশ্য গায়রে মুকাল্লিদরা ইমাম বুখারী র.কে বেওকূফ মনে করে। এজন্য এ ধরনের কথাবার্তা তার দিকে সম্বন্ধ করে।

তারা যে বলে ইমাম আজম র.এর মতখন্ডন করা হয়েছে এর অর্থ- তারা যেন বলে যে, ইমাম বুখারী র. ইমাম আজম র. এর কথা বুঝেননি। কারণ, ইমাম আজম র. এর উক্তি হল, ايماني كايمان جبريل অতএব ইমাম আজম র. একথা বলে مثل ايمان جبريل কে না করে দিলেন। এর সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা র. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, اقول ايماني كايمان جبريل ولا اقول مثل ايمان جبرئيل কারণ, مثليت এর

দাবী হল, সমস্ত গুনাবলীতে সমতা। বস্তুতঃ সাদৃশ্যের জন্য সর্বদিক দিয়ে সাম্য জরুরী নয়, কোন দিক দিয়ে এক রকম হলেই যথেষ্ট।

আল্লামা ইবনে হুমাম র. সাইরাতে এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

মূলনীতি হল, كاف দ্বারা সত্ত্বার ব্যাপারে সাদৃশ্যদান উদ্দেশ্য হয়। আর مثل শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, সমস্ত গুনাবলীতে সাদৃশ্যদান।

অতএব ইমাম সাহেব র. মূল ঈমানে নিজের ঈমানকে জিবরাঈল আ. এর ঈমানের সাথে উপমা দিয়েছেন। আর সিফাতগুলোর ক্ষেত্রে সাম্য অস্বীকার করেছেন। অতএব ইমাম সাহেব র. এর উদ্দেশ্য এই হল যে, যে সব বিষয়ের প্রতি তাঁর ঈমান রয়েছে, সেগুলোর প্রতি আমাদেরও ঈমান রয়েছে। যে সব বিষয়ের প্রতি ঈমান রয়েছে সেগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে কোন পার্থক্য নেই। বাকী রইল, গুনাবলীতে সুনিশ্চিতরূপে হযরত জিবরাঈল আ. এর ন্যায় ঈমান হতে পারে না।

আল্লামা শামী র. রদ্দুল মুহতারে লিখেছেন যে, খুলাসাতুল ফাতাওয়ায় ইমাম সাহেব র. থেকে বর্ণিত আছে,

أكره ان يقول الرجل ايماني كايمان جبرئيل ولكن يقول آمنت بما آمن به جبرئيل.

এর দ্বারা এ বিষয়টি সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে যায় যে, অভিব্যক্তির বৈচিত্র সত্ত্বেও আসল কথা একটিই যে, مؤمن به এক। ইমাম আজম আবূ হানীফা র. এর উদ্দেশ্য হল, আমার مؤمن به (যার প্রতি ঈমান আনা হয়) ও হযরত জিবরাঈল আ. এর مؤمن به একই। যে সব জিনিসের প্রতি বিশ্বাস রেখে হযরত জিবরাঈল আ. ঈমানদার হয়েছেন, সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস রেখে আমিও মুমিন। একথা উদ্দেশ্য নয় যে, ঈমানের ধরণ ও সমস্ত গুনাবলীতে আমি হযরত জিবরাঈল আ. এর সমান। বস্তুতঃ مؤمن به এক হওয়ার ব্যাপারে স্বয়ং কুরআনের নস প্রমান।

آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ. سورة بقرة

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সব জিনিসের প্রতি ঈমান রাখেন যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং মুমিনরাও তাঁরই প্রতি ঈমান রাখে। -সূরা বাকারা।

এই আয়াতে কারীমা দ্বারা স্পষ্ট আকারে বুঝা গেল যে, সাধারণ মুমিন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঈমান আনয়নের বস্তু একই।

হযরত হাসান বসরী র. এর উক্তি ঃ

ইমাম বুখারী র. প্রথমে خوف المؤمن من أن يحبط عمله. শিরোনাম প্রমাণ করার জন্য ইবনে আবূ মুলাইকা র. এর পর হযরত হাসান বসরী র. এর উক্তি বর্ণনা করেন।

ويذكر عن الحسن ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق.

হযরত হাসান বসরী র. থেকে বর্ণিত আছে যে, মুনাফিকীর আশংকা সেই করে, যে ঈমানদার হয়ে থাকে। আর এ থেকে নির্ভয় সেই হয়ে থাকে যে মুনাফিক। মুমিনের শান হল, তার মধ্যে ভয়ও থাকে, আশাও থাকে। ইমাম নববী র., ইবনুত তীন র. ও মুতাআখ্‌খিরীন তথা পরবর্তী উলামায়ে কিরামের একটি দলের মত হল, ما خافه এবং لا امنه বাক্যে ضمير منصوب আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরেছে। এমতাবস্থায় অর্থ

হবে, আল্লাহকে সেই ভয় করবে যে ঈমানদার। তাঁকে ভয় করবে না সেই যার অন্তরে মুনাফিকী রয়েছে। এ অর্থটি যদিও সহীহ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان.

আরেক আয়াতে আছে-

فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُوْنَ

নিঃসন্দেহে আল্লাহর ভয় প্রশংসিত ও কাম্য, কিন্তু এখানে এ অর্থ গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নয়, স্বয়ং হাসান বসরী র. এর উক্তির পূর্বাপরেরও পরিপন্থী। হাফিজ আসকালানী র. ফাতহুল বারীতে হযরত হাসান বসরী র. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন,

والله ما مضى مؤمن ولا بقى الا وهو يخاف النفاق وما امنه الا منافق.

'আল্লাহর কসম! অতীত বর্তমানের এমন কোন মুমিন নেই যে মুনাফিকীর আশংকা করে না, বস্তুতঃ মুনাফিক এই নিফাক থেকে নিঃশ্চিন্ত থাকে। অন্যান্য সূত্রেও হাসান বসরী র. থেকে এরূপ রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে, যেগুলোতে নিফাক শব্দের সুস্পষ্ট বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে। আল্লামা আইনী র.ও বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সবগুলোর সারনির্যাস এটাই যে, ما خافه এর যমীর نفاق এর দিকেই ফিরেছে। ইবনে আবু মুলাইকা র. এর আছরের অনুকূলও এটাই। কারণ, তাতে একথাই রয়েছে যে, كلهم يخاف النفاق على نفسه. অতএব এবার অর্থ হবে, মুনাফিকীর আশংকা সেই করে যে মুমিন, আর তা থেকে বেফিকির ও নির্ভয় থাকে সেই যে মুনাফিক।

يذكر মাজহূলের সীগা। মাজহূলের সীগা দ্বারা কোন কিছুর আলোচনা এর প্রমাণ মনে করা হয় যে, এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে। অথচ এখানে হাসান বসরী র. এর উক্তি সম্পূর্ণ সহীহ।

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী র. ফাতহুল বারীতে স্বীয় শায়খ আবুল ফযল ইবনে হুসাইন থেকে একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম বুখারী র. এর মতে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার শুধু সনদের দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্যই হয় না, বরং তিনি যখন অর্থগত মূলপাঠ উল্লেখ করেন অথবা কারো উক্তি সংক্ষেপে বর্ণনা করেন, তখনো এ শব্দ ব্যবহার করেন। ইমাম বুখারী র. এর পূর্বে ইবরাহীম তাইমী ও ইবনে আবূ মুলাইকা র. এর উক্তির উদ্বৃতি দানে কোন প্রকার পরিবর্তন বা সংক্ষেপ করেন নি। এজন্য এগুলোর আলোচনা সুদৃঢ় শব্দে করেছেন। আর হযরত হাসান বসরী র. এর উক্তি উল্লেখ করেছেন, সংক্ষেপে অর্থগত বিবরণ দিয়ে, সেহেতু তার বিবরণের জন্য দুর্বল শব্দ ব্যবহার করেছেন।

এবার এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় শিরোনামের ব্যাখ্যা করা হল,

وما يحذر من الاصرار ـــ. خوف المؤمن শব্দের উপর আতফ। ما يحذر শব্দে ما হল মাসদারিয়্যা (ক্রিয়ামূলবোধক)। এটি ফেলকে ক্রিয়ামূলের অর্থে পরিণত করে। এখানে যে বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে, সেটি হল, বারবার গুনাহের কাজ করা।

من غير توبة শব্দের তাফসীর। অর্থাৎ, দ্বিতীয় আরেকটি জিনিস যা থেকে একজন ঈমানদার ব্যক্তির ভয় করা উচিত সেটি হল, বারবার গুনাহের কাজ করা, যা খুবই বিপদজনক।

اصرار على المعصية তখনই বলা হয়, যখন মানুষ ধৃষ্ট হয়ে যায়। গুনাহের পর গুনাহ করতে থাকে, সামান্যতম সংকোচবোধ করে না, যার ফলে তওবা ইস্তিগফার করে। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলে

আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বান্দা যখন কোন গুনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়, তওবা করলে তা মিটে যায়, অন্যথায় যত গুনাহ করতে থাকবে সে দাগ বাড়তে থাকবে। এমনিভাবে পূর্ণ অন্তর কালো হয়ে যায়। এটাই সে জং বা মরিচা যার আলোচনা কুরআন মজীদে এসেছে-

كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

তথা তারা যা অর্জন করত সে সব গুনাহের ফলে তাদের অন্তরে জং পরে গেছে। অর্থাৎ, আমার আয়াতগুলোতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশই নেই। আসলে লাগাতার বেশি গুনাহ করতে থাকলে এগুলোর কারণে অন্তরে জং পড়ে যায়। এজন্য যথার্থ বাস্তব চিত্র সেগুলোতে প্রতিবিম্বিত হয় না।

শিরোনামে من غير توبة এ জন্য বলেছেন যে, যদি গুনাহর পর বান্দা লজ্জিত হয়ে সত্যিকার অর্থে অন্তর থেকে তাওবা করে অতঃপর মানুষ হিসেবে তার থেকে গুনাহ হয়ে যায়, তবে এটাকে ইসরার বলা হয় না। তিরমিযী শরীফে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

ما اصر من استغفر وان عاد في اليوم سبعين مرة.

٤٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنِ الْمُرْجِئَةِ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ رضـــ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

৪৬. মুহাম্মদ ইবনে 'আর'আরা র. ...... হযরত যুবাইদ র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আবূ ওয়াইল র. কে মুরজিয়া' (এর আকাইদ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, (যারা ঈমানের সাথে গুনাহকে ক্ষতিকর মনে করে না।) তিনি বললেন, 'আবদুল্লাহ (ইবনে মাস'ঊদ) রা. আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসিকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন-

حديث عبد الله هذا للترجمة الثانية وهي قوله وما يحذر من الاصرار الى آخر. عمد ١/٢٧٧.

অর্থাৎ, 'মুরজিয়া বলে, কবীরা গুনাহকারী এবং অন্যান্য গুনাহকারী যেমন, মুসলমানদের গালিদাতা ফাসিক নয়। অথচ এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসিকী।'

২। শিরোনামের প্রথমাংশ خوف المؤمن من ان يحبط عمله الخ দ্বারাও হাদীসের মিল হতে পারে। কারণ, এ হাদীসে قتاله كفر বলা হয়েছে। স্পষ্ট বিষয় মুমিনের সাথে লড়াইকে জায়িয ও বৈধ মনে করা কুফরী যার ফলে আমল বেকার হয়ে যাওয়ার আশংকা স্পষ্ট।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, কিতাবুল ঈমান ঃ ১২, আদব ঃ ৮৯৩, ফিতান ঃ ১০৪৮।

ব্যাখ্যা ঃ ابو وائل শাকীক ইবনে সালামা কুফী শীর্ষ তাবিঈনের অন্তর্ভূক্ত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. এর শীর্ষস্থানীয় একজন ছাত্র। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. ছাড়া হযরত উমর ফারুক, আলী, ওসমান, আম্মার রা. প্রমুখ থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতপ্রাপ্তি কালে তাঁর বয়স ছিল ১০ বছর। যদ্বারা পরিস্কার বুঝা গেল, তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ পেয়েছেন, কিন্তু যেহেতু সাক্ষাত করতে পারেন নি, সেহেতু তিনি সাহাবার অন্ত র্ভূক্ত নন। ৮৩ হিজরীতে তিনি ওফাত লাভ করেছেন।

মুরজিয়ার আকীদা সম্পর্কে হযরত আবু ওয়াইল র. কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে এ হাদীসটি পড়েছেন, سباب المسلم فسوق وقتاله كفر অর্থাৎ, মুরজিয়ার আকীদা অনুযায়ী মন্দ কাজ ঈমানের জন্য ক্ষতিকারক নয়, তাহলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসিকী এবং তার সাথে লড়াই করাকে কুফরী কেন সাব্যস্ত করলেন? এই হাদীস দ্বারা পরিস্কার বুঝা গেল যে, গুনাহের কাজ মানুষকে ফাসিক বানিয়ে দেয়। আবার কোন কোনটি কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। স্পষ্ট বিষয়, কুফর ও ফিসক ঈমানের জন্য ক্ষতিকর। কুফর তো ঈমানেরই পরিপন্থী, কিন্তু ফাসিকী ও অবাধ্যতাও কুফরেরই শাখা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ. سورة حجرات.

'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তোমাদের অন্তরে এটিকে সুসজ্জিত করে দিয়েছেন, আর কুফর ও ফাসিকী ও অবাধ্যতার প্রতি ঘৃনা সৃষ্টি করেছেন।' -সূরা হুজুরাত

আয়াতে কারীমায় কুফর, ফিসক ও নাফরমানীকে ঈমানের বিপরীতরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব বুঝা গেল, ফাসিকী ও অবাধ্যতাও কুফরেরই শাখা। অতঃপর ঈমানকে প্রিয় এবং কুফরী, ফাসিকী ও অবাধ্যতাকে অপছন্দনীয় করে দেয়ার ইহসান ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয়েছে। কাজেই যদি ফাসিকী ও নাফরমানী ক্ষতিকর না হত, তবে এগুলোর প্রতি বিদ্বেষ মুমিনের শান কেন বলা হয়?

মুরজিয়া সম্প্রদায়ের কার্যকর ধোঁকাবাজি

১। যেরূপভাবে কাফির অবস্থায় নেককাজগুলো উপকারী নয়, এরূপভাবে ঈমান অবস্থায় মন্দকাজগুলো ক্ষতিকারক নয়।

২। যেরূপভাবে কাফির জান্নাতে যেতে পারবে না, এরূপভাবে ঈমানদার জাহান্নামে যেতে পারবে না।

উত্তর ঃ কুরআন ও হাদীসের মুকাবিলায় ইবলিসের ধোকাবাজিতে কাজ হয় না। ঈমানদার গুনাহগাররা যে জাহান্নামে যাবে এটা সুস্পষ্ট মুতাওয়াতির অনেক নস দ্বারা প্রমাণিত। অতএব মুরজিয়া সম্প্রদায়ের ধোকাবাজির যৌক্তিক উত্তর দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই, তা সত্ত্বেও নফলরূপে এ উত্তরটি দেয়া হল।

প্রথম প্রতারণার উত্তর ঃ ঈমান ও কুফরের উদাহরণ হায়াত ও মওত। যেমন, ঈমান হল, অন্তরের জীবন আর কুফর হল মৃত্যু। বস্তুতঃ জীবনে শত সহস্র স্তর রয়েছে। একটি হল দুর্বল শিশুর জীবন, আরেকটি বীর বাহাদুরের । উভয়ের মাঝে জীবনের অনেক স্তর রয়েছে। বস্তুতঃ মওতের শুধু একটিই দরজা অর্থাৎ, অধর্তব্য। এখানে দ্বিতীয় স্তর কল্পনাই হতে পারে না। এমনিভাবে কুফর দ্বারা সমস্ত আমল উড়ন্ত ধূলোর ন্যায় হয়ে যায়, মৃতের মত অধর্তব্য জিনিস হয়ে যায়। এর পরিপন্থী গুনাহের কাজ যদিও ঈমানে ত্রুটির কারণ হয়, কিন্তু ঈমান বিদুরনকারী নয়। যেমন, দেহ থেকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো কাটলে যদিও সেটি ক্ষতিকর হয়, কিন্তু জীবন খতম করে দেয় না। এবার যদি কেউ বলে, যেরূপভাবে মৃতের জন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো নিরাপদ থাকা উপকারী নয়, এরূপভাবে জীবিত ব্যক্তির জন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো কাটা ক্ষতিকর নয়, তাহলে এই কিয়াস ব' যুক্তি কি কেউ গ্রহন করতে পারে?

দ্বিতীয় ধোঁকাবাজির উত্তর ঃ কাফির এ জন্য জান্নাতে যেতে পারে না যে, তার সাথে জান্নাতে নিয়ে হওয়ার জিনিস নেই। কিন্তু এর পরিপন্থী নাফরমানের ঈমান। কারণ, এর সাথে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার

উপকরণ তথা গুনাহের কাজগুলো বিদ্যমান। মুমিন গুনাহগারদের উদাহরণ, ময়লা কাপড়ের ন্যায়। যেটিকে পরিস্কার করার জন্য ধোপার কাছে দেয়া হয়। আর কাফির হল, ছেড়া ফাড়া জীর্ণ শীর্ণ কাপড়ের ন্যায় যেটি ধোলাই করার যোগ্যই নয়। হাত লাগালেই টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

সুফিয়ায়ে কিরামের ব্যাখ্যা ঃ সুফিয়ায়ে কিরাম বলেন, ঈমানদার গুনাহগারদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপকালে তাদের অন্তর থেকে ঈমান বের করা হবে। যেমন, কয়েদীদের মূল পোষাক বাইরেই খুলে রাখা হয় এবং জেলের বিশেষ পোষাক পরিধান করিয়ে ভিতরে প্রবিষ্ট করানো হয়। এর নজির হল, অন্য হাদীসে আছে-

ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. (الحديث)

এর ব্যাখ্যা স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে-

اذا زنى العبد خرج عنه الايمان حتى يصير اليه كالظلة فاذا اقلع رجع اليه الايمان.

কিন্তু বিভিন্ন রেওয়ায়াত তালাশ করার ফলে বুঝা যায় যে, জাহান্নামে ঈমানদার গুনাহগারদের অন্তরে ঈমানের আছর বা প্রভাব জানা যাবে। তাদের অন্তর জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদ থাকবে। কোন কোন রেওয়ায়াতে সিজদার স্থানগুলো নিরাপদ থাকবে বলে উল্লেখিত হয়েছে। বস্তুতঃ আয়াতে কারীমা تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةُ কাফিরদের সম্পর্কে প্রযোজ্য। যদি মেনে নেই, এখানে মুমিনরাও অন্তর্ভূক্ত তবে অন্তরে যেয়ে লাগা তাতে ক্রিয়াশীল হওয়াকে আবশ্যক করে না।

খারিজী ও মু'তাযিলীদের ধোঁকা

খারিজী ও মু'তায়িলীরা বলে, কবীরা গুনাহকারী পুনরুত্থান ও হিসাব কিতাবে দৃঢ় বিশ্বাসী নয়, সে এ কারণে ঈমান থেকে বহির্ভূত। যদি কিয়ামতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস এবং বদ আমলির শাস্তির প্রতি ঈমান থাকত, তবে কখনো সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হত না। কারণ, যে ব্যক্তি সাপ ধ্বংসাত্মক বলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে সে কখনো এর বিলে আঙ্গুল প্রবিষ্ট করানোর ধৃষ্টতা দেখাতে পারে না। কাজেই কবীরা গুনাহে লিপ্ততা ইয়াকীন না থাকার প্রমাণ।

উত্তর ঃ কবীরা গুনাহে লিপ্ততা ইয়াকীনের অবিদ্যমানতাকে আবশ্যক করে না। কিয়ামত, হিসাব, কিতাব, প্রতিদান ও শাস্তির পরিপূর্ণ ইয়াকীন থাকা সত্ত্বেও কবীরা গুনাহে লিপ্ততার ধৃষ্টতা এজন্য হয়ে যায় যে, তার সুদৃঢ় বিশ্বাস মনে উপস্থিত থাকে না। অতএব ক্ষমার আশা তাকে ধৃষ্ট বানিয়ে দেয়। যদিও এ আশায় গুনাহে লিপ্ততা মারাত্মক ভূল। কারণ, আল্লাহ তা'আলার কিতাবে রয়েছে-

قُلْ يَعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ اِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّه هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

وَلاَ تَيْئَسُوْا مِنْ رَوْحِ اللهِ اِنَّهُ لاَ يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ.

اِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِه وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ.

তাওবার তাওফীকের কথা সামনে থাকলেও মানুষ হিসাব-কিতাবের প্রতি ইয়াকীন থাকা সত্ত্বেও গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়।

سباب — سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. শব্দটির সীনের নিচে যের। যেমন قتال এর দ্বারাও মু'তাযিলা ও খারিজীরা প্রমাণ পেশ করে, তারা বলে, قتاله كفر বাক্যে প্রকৃত কুফরী উদ্দেশ্য। كفر دون كفر এর ব্যাখ্যা এখানে চলতে পারে না। কারণ, প্রথম বাক্যে ফাসিকীও كفر دون كفر তাহলে উভয় বাক্যে পার্থক্য কি হবে? কাজেই মুসলমানের সাথে লড়াই করাও কুফরী হবে। যেটি ঈমান থেকে বহিষ্কার করে দেয়।

আক্রমনাত্মক উত্তর ঃ মুসলমানকে গালি দেয়াও কবীরা গুনাহ। কাজেই তাতে লিপ্ততাও তোমাদের মতে ঈমানের গন্ডি থেকে বহিষ্কারক হওয়া উচিত। তাহলে উভয় বাক্যে কি পার্থক্য রইল? অতএব তোমাদের যে উত্তর আমাদেরও সে উত্তর।

প্রকৃত উত্তর ঃ قتاله كفر এর মধ্যে كفر دون كفر ই উদ্দেশ্য, কিন্তু এই কুফরের স্তর বিভিন্ন ধরনের। অতএব প্রথম বাক্যে فسوق আর দ্বিতীয়টিতে كفر বলে বিচিত্র স্তরের দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য। -ইরশাদ

٤٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضــ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رضــ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ إِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ وَإِنَّهُ تَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ .

৪৭. কুতাইবা ইবনে সাঈদ র. ...... 'হযরত উবাদা ইবনে সামিত রা. বর্ণনা করেন যে, (একবার) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাইলাতুল কদর রজনী (এর সুনির্দিষ্ট তারিখ) সম্পর্কে সংবাদ দেয়ার জন্য বের হলেন। তখন (তিনি দেখলেন) দু'জন মুসলমান পরস্পর বিবাদ করছিল। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের লাইলাতুল কদর সম্পর্কে সংবাদ দেয়ার জন্য বেরিয়েছিলাম; কিন্তু তখন অমুক অমুক ব্যক্তি বিবাদে লিপ্ত থাকায় তা (আমার অন্তর থেকে নির্দিষ্ট তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান) উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। হয়ত এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। তোমরা তা (রমযানের) ২৭, ২৯ ও ২৫ তম রাতে অনুসন্ধান কর।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন,

هذا الحديث للترجمة الاولى ووجه تطابقه اياها من حيث ان فيه ذم التلاحي وان صاحبه نا قص لانه يشتغل عن كثير من الخير بسببه سيما اذا كان في المسجد وعند جهر الصوت بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم بل ربما ينجر الى بطلان العمل وهو لا يشعر. عمدة

সারকথা হল, শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মিল প্রথম বাক্য خوف المؤمن الخ এর সাথে। মিলের কারণ হল, এ হাদীসে মুসলমানদের পারস্পারিক ঝগড়ার প্রতি নিন্দাবাদ রয়েছে। পারস্পরিক ঝগড়া অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চনা ও ক্ষতির কারণ হয়। বিশেষতঃ মসজিদে। আর সেটাও রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উচ্চস্বরে। অনেক সময় আমল বেকার হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

২। وقال في فيض الباري في وجه المطابقة ان التنازع صار سببا لرفع علم ليلة القدر فكذلك المعصية قد تكون سببا للحبط.

অর্থাৎ, যেরূপভাবে মুসলমানদের পারস্পারিক ঝগড়া কদরের রাত্রি সংক্রান্ত জ্ঞান তুলে নেয়ার কারণ হয়েছিল, এরূপভাবে গুনাহগুলোও আমল বেকার হয়ে যাওয়ার কারণ হয়।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, কিতাবুল ঈমান ঃ ১২, লাইলাতুল কদর ঃ ২৭১, আদব ঃ ৮৯৩, নাসাঈ, ইতিকাফ।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথমে সুনির্দিষ্টভাবে লাইলাতুল কদর বাতলে দেয়া হয়েছিল, বাহ্যত সে রমযানে যে লাইলাতুল কদর ছিল তা সুনির্দিষ্ট আকারে বলে দেয়া হয়েছিল। সাহাবায়ে কিরাম রা.কে তা জানানোর জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে বেরিয়ে আসেন। তখন মসজিদে নববীতে দু ব্যক্তি ঝগড়া করছিলেন। একজন ছিলেন, কা'ব ইবনে মালিক রা.। যিনি ঋণ পাওনাদার ছিলেন। আর অপরজন ছিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবু হাদরাদ আসলামী রা., যিনি ছিলেন ঋণগ্রস্ত। উভয়ের মধ্যে এই ঋণ সংক্রান্ত কথাবার্তা পূনরাবৃত্তি ঘটছিল। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, ارتفع صوتهما في المسجد। তথা মসজিদে তাদের উচ্চস্বরে কথা হচ্ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋণ পাওনাদারকে বললেন, অর্ধেক মাফ করে দাও, তিনি মাফ করে দিলেন। অতঃপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋণগ্রস্তকে বললেন, বকেয়াটুকু আদায় করে দাও। এভাবে ঝগড়া মিটমাট হয়ে যায়। ইতোমধ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন থেকে সে কথা ছুটে যায়, তিনি সতর্কবাণী স্বরূপ ইরশাদ করেন, আমি তো লাইলাতুল কদর কোন রাতে হচ্ছে- সেটা তোমাদেরকে জানাতে ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম, যাতে তোমাদের জন্য সহজ হয়, কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তির ঝগড়া তোমাদের বঞ্চনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই ঝগড়ার অশুভ প্রভাবের কারনে আমার অন্তর থেকে লাইলাতুল কদরের সুনির্দিষ্ট সময় তুলে নেয়া হয়। হয়ত এতেই তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে।

শিয়ারা বলে, লাইলাতুল কদরের অস্তিত্বই তুলে নেয়া হয়েছে, কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভূল। যদি লাইলাতুল কদর তুলে নেয়া হয়, তবে তা অন্বেষনের হুকুম কেন দেয়া হয়েছে? হাদীস শরীফে সুস্পষ্ট ইরশাদ রয়েছে, التمسوها في السبع والتسع والخمس. তথা তোমরা এটিকে (রমযানের বিশ তারিখের পর) ৭, ৯ ও ৫ তারিখে অন্বেষন কর।

٣٧. بَاب سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ وَعِلْمِ السَّاعَةِ

وَبَيَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ ثُمَّ قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ دِينًا وَمَا بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ مِنْ الْإِيمَانِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ .

৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ জিবরাঈল আ. কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ঈমান, ইসলাম, ইহসান ও কিয়ামতের জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন।

আর তাঁকে দেয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তর। তারপর তিনি বললেন ঃ জিবরাঈল আ. তোমাদের দীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। তিনি এসব বিষয়কে দীন বলে আখ্যায়িত

করেছেন। (এ অনুচ্ছেদে তারও বিবরণ রয়েছে) ঈমান সম্পর্কে আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবরণ দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ.

'কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবূল করা হবে না। (আলে ইমরান ঃ ৮৫)

باب শব্দটি الى السوال শব্দের দিকে مضاف। السوال শব্দটি الى جبريل শব্দের দিকে مضاف। এখানে মাসদারের ইযাফত হয়েছে ফায়েলের দিকে। জিবরাঈল শব্দটি غير منصرف ও علمية ও عجمة এর কারণে।

قوله النبي শব্দটি منصوب কারণ, এটি مصدر এর مفعول। -উমদা।

ব্যাখ্যা ঃ এই শিরোনামটি পূর্বোক্ত সবগুলো অনুচ্ছেদের সমন্বয়কারী। পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদগুলোতে ঈমান, ইসলাম ও দীন সবগুলো এক প্রমাণিত করা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদেও তা এভাবে প্রমাণ করা হয়েছে যে, প্রথমে হাদীসে জিবরাঈল এনেছেন, তাতে সমস্ত আহকামকে দীন বলা হয়েছে। অতঃপর আবদুল কায়েস প্রতিনিধি দলের ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে সমস্ত আহকামকে ঈমান বলা হয়েছে। অতএব দীন ও ঈমান একই জিনিস প্রমাণিত হল, অতঃপর وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. দ্বারা দীন ও ইসলাম এক প্রমাণ করেছেন। -ইরশাদুল কারী।

যোগসূত্র ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন, وجه المناسبة بين البابين من حيث ان المذكور فى الباب الأول الخ. অর্থাৎ, এর পূর্বেকার অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছিল, خوف المؤمن من ان يحبط عمله الخ. এবার এ অনুচ্ছেদে বলা হচ্ছে, ঈমান কিভাবে অর্জিত হতে পারে এবং শরীয়তে মুমিন কে? উমদা ১/২৮২

٤٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضــ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ قَالَ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الْآيَةَ ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ رُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ جَعَلَ ذَلِك كُلَّهُ مِنْ الْإِيمَانِ .

৪৮. মুসাদ্দাদ র. ...... হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনসমক্ষে স্বতন্ত্র স্থানে বসা ছিলেন, এমন সময় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল, 'ঈমান কি?' তিনি বললেন- 'ঈমান হল, আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি,

(আখিরাতে) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ও পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস রাখা।' লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'ইসলাম কি?' তিনি বললেন ঃ 'ইসলাম হল, আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁর সঙ্গে শরীক না করা, নামায কায়েম করা, ফরয যাকাত আদায় করা এবং রমযান-এর রোযা পালন করা।' ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'ইহসান কি?' তিনি বললেন ঃ 'এমনভাবে আল্লাহর 'ইবাদত করা যেন তুমি তাঁকে দেখছ, আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও তবে (মনে করো যে,) তিনি তোমাকে দেখছেন।' ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'কিয়ামত কবে?' তিনি বললেন ঃ 'এ ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তিনি জিজ্ঞেসকারী অপেক্ষা বেশী জানেন না। তবে আমি তোমাকে কিয়ামতের আলামতসমূহ বলে দিচ্ছি ঃ বাঁদী যখন তার মনিবকে প্রসব করবে এবং উটের নগণ্য রাখালেরা যখন বড় বড় অট্টালিকা নির্মানে অহংকারমূলক প্রতিযোগিতা করবে। (কিয়ামতের বিষয়) সে পাঁচটি জিনিসের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।' এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা লুকমানের এই আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন-

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الْآيَةَ.

'কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই নিকট .....।' (লুকমান ঃ ৩৪)

এরপর ঐ ব্যক্তি চলে গেলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'তোমরা তাকে ফিরিয়ে আন।' তখন তারা কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন তিনি বললেন, 'ইনি জিবরাঈল আ.। লোকজনকে তাদের দীন শেখাতে এসেছিলেন।'

আবু আবদুল্লাহ বুখারী র. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব বিষয়কে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সম্পূর্ণ স্পষ্ট। কারণ, শিরোনামে যেসব বিষয়ে হযরত জিবরাঈল আ. কর্তৃক প্রশ্ন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তর উল্লেখ করা হয়েছে, হাদীস শরীফে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী-কিতাবুল ঈমান ঃ ১২, তাফসীর ঃ ৭০৪, মুসলিম, তিরমিযী-ঈমান, আবূ দাউদ-কিতাবুস সুন্নাহ ঃ ২/৬৪৫, ইবনে মাজাহ-ঈমান ঃ ৭।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটি এখানে সংক্ষিপ্ত। মুসলিম শরীফে সবিস্তারে উল্লেখিত হয়েছে। এ হাদীসটিকে সাধারণত হাদীসে জিবরাঈল বলা হয়, এটি নেহায়েত আজীমুশশান ও ব্যাপক। আল্লামা কুরতুবী র. বলেন, يصلح ان يقال له ام السنة তথা এ হাদীসটিকে উম্মুস সুন্নাহ আখ্যায়িত করা যেতে পারে। অর্থাৎ, যেরূপভাবে পূর্ণ কুরআন মাজীদের সারনির্যাস সূরা ফাতিহা, সেহেতু সূরা ফাতিহার নাম উম্মুল কুরআন রাখা হয়েছে, এরূপভাবে পূর্ণ হাদীস ভাণ্ডারের সমস্ত বিষয়ের ইজমালী সারসংক্ষেপ এ হাদীসে বিদ্যমান। এটি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ২৩ বছর জিন্দেগীর বাণী ও দিক নির্দেশনার মগজ ও সারকথা এজন্য ইমাম মুসলিম র. এ হাদীস দ্বারা স্বীয় গ্রন্থ সহীহ মুসলিমের সূচনা করেছেন। মিশকাত গ্রন্থকারও তাঁর অনুসরণ করেছেন। ইমাম বাগবী র. মাসাবীহুস সুন্নাহ ও শরহুস সুন্নাহ গ্রন্থদ্বয় এ হাদীস দ্বারাই শুরু করেছেন। এটি হল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ জীবনের হাদীস। ২৩ বছরের জীবনে যে সব বিধি-বিধান তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয় এবং যে সব ব্যাখ্যা তিনি প্রদান করেন, সেগুলোর সারনির্যাস তিনি এ

হাদীসে বর্ণনা করেছেন। যেমন, কোন ওয়ায়েজ ও বক্তা দু তিন ঘন্টা ধরে বক্তব্য রাখার পর সর্বশেষে পূর্ণ বক্তব্যের সারনির্যাস তুলে ধরেন যাতে ইজমালীভাবে সবাই কিছু না কিছু মনে রাখতে পারে এবং সহজে আমল করতে পারে।

দীনের সমস্ত বিদ্যা এ হাদীসে এসে গেছে।

১। আকাইদ- এটি ঈমানে এসেছে।

২। আহকাম ও আ'মাল- ইসলামের অধীনে এসে গেছে।

৩। আত্মাধিক উন্নয়ন, অর্থাৎ, সুলূক ও তাসাওউফ এবং আত্মশুদ্ধিকরণ ইহসানের অধীনে এসে গেছে।

ঈমান হল, মূল গোড়া, ইসলাম হল এর শাখা প্রশাখা। কারণ, ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয় ও তার রওনক আসে ইসলাম দ্বারা। আর সর্বশেষ হল ইহসানের পর্যায়। এটি ফলের পর্যায়ভূক্ত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহা অনুগ্রহ, তিনি হযরত জিবরাঈল আ. এর মাধ্যমে ২৩ বছর পর্যন্ত দীনি বিষয়াবলী অবতীর্ণ করতে থাকেন, অবশেষে তারই মাধ্যমে এই দীনের সারনির্যাসও বর্ণনা করে দিয়েছেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছেন, هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য যে, প্রশ্নোত্তর দ্বারা দীনের সারনির্যাস জানা হয়ে যায়।

كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. অর্থাৎ, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনের সামনে তাশরীফ রাখছিলেন, মানে স্বতন্ত্র স্থানে আভির্ভূত হয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। এর বিস্তারিত বিবরণ আবূ দাঊদ শরীফের রেওয়ায়াতে আছে, যার সারনির্যাস হল- প্রথমতো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছাড়া মিলে মিশে বসতেন। বাইর থেকে কোন মুসাফির এলে অপরিচিত হওয়ার কারনে জিজ্ঞেস করতে হত (যেমন, যিমাম ইবনে সা'লাবা রা. এর রেওয়ায়াতে আছে, ايكم محمد صلى الله عليه وسلم. –বুখারী ঃ ১/১৫)

সাহাবায়ে কিরাম রা. বলেন, আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবেদন করলাম, যদি অনুমতি হয় তাহলে আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বসার জন্য একটি চবুতরা বানিয়ে দিব। আর আপনি সেখানে তাশরীফ রাখবেন, যাতে অপরিচিতদের জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দেন। আমরা মাটির চবুতরা বানিয়ে দেই। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই চবুতরায় উপবেশন করতেন। সাহাবায়ে কিরাম রা. চতুর্দিকে বসতেন। এটাকেই এ হাদীসে بارزا শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

উৎসারিত মাসআলা ঃ এই ঘটনা দ্বারা এ মাসআলা জানা গেল, মুদাররিস অথবা বক্তার জন্য যদি কোন খাস স্বতন্ত্র বসার স্থান (ষ্টেজ) তৈরী করা হয় অথবা স্বতন্ত্র স্থানে তাকে বসানো হয়, তবে সেটা জায়িয। তবে বেশী কৃত্রিমতা অবলম্বন না করা উচিত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চবুতরা সম্পর্কে বিবরণ এসেছে, فبنينا له دكانا من طين অর্থাৎ, আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মাটির একটি চবুতরা তৈরি করেছি।

فاتاه جبريل অর্থাৎ, হযরত জিবরাঈল আ. মানবরূপে আগমণ করেছেন। মুসলিম শরীফে কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে- رجل شديد بياض الثياب অর্থাৎ, নেহায়েত শ্বেত-শুভ্র পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাকে তিনি এসেছেন। এর দ্বারা সাদা পোষাক ব্যবহার ও পরিচ্ছন্নতা মুসতাহাব বুঝা যায়।

شديد سواد الشعر মিশ কালো কেশ বিশিষ্ট। এর দ্বারা বুঝা যায়, বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকালে ইলম অর্জন করা উচিত। কারণ, তখন শরীরে শক্তি থাকে, মেধা শক্তিশালী থাকে।

لا يرى عليه اثر السفر তার উপর সফরের কোন নিদর্শন পরিলক্ষিত হচ্ছিলনা। এর দ্বারা বুঝা গেল, তিনি বাইরের কোন মুসাফির নন। অন্যথায় গায়ে ধুলাবালি থাকত, পোষাক এতটা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকত না। মনে হয় যেন কোন স্থানীয় বাসিন্দা। কিন্তু আমাদের কেউ তাকে চিনত না। এটা এর নিদর্শন যে, তিনি বাইরের কোন মানুষ। কারণ, নিকটবর্তী কেউ হলে অবশ্যই কেউ তাকে চিনত।

নাসাঈ শরীফে আবু ফারওয়া সূত্রে বর্ণিত আছে, وانه جبرئيل نزل في صورة دحية الكلبي এখানে প্রশ্ন হয়, জিবরাঈল আ. যেহেতু দিহইয়ায়ে কালবী রা. এর আকৃতিতে এসেছেন, তাহলে তাকে কেউ চিনতে পারলেন না কেন? হযরত দিহইয়া রা. তো প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন?

উত্তর ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন, نزل في صورة دحية الكلبي বাক্যটি বর্ণনাকারীর ভূল। মাহফূজ রেওয়ায়াতগুলোতে এবাক্য নেই। -উমদা ১/২৯১

যদি নাসাঈর এ বাক্যটিকে ভূল না মানা হয়, তবে বলা যেতে পারে যে, হতে পারে প্রথম থেকেই হযরত দিহইয়া রা. মজলিসে উপস্থিত ছিলেন, এবার জিবরাঈল আ. দিহইয়া রা. এর আকৃতিতে এসেছেন, ফলে সাহাবায়ে কিরাম রা. এর ইয়াকীন ছিল যে, ইনি আমাদের দিহইয়া নন। কেননা, তিনি তো প্রথম থেকে আমাদের মজলিসে ছিলেন। একারণে কেউ হযরত জিবরাঈল আ.কে চিনতে পারেন নি।

মূলতঃ এবার হযরত জিবরাঈল আ. নিজের অবস্থা গোপন রাখার পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। হাদীসে এটাও এসেছে, তিনি প্রশ্ন করেছেন, ما الايمان؟ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উত্তর দেন, তখন তিনি বলেন, صدقت - আপনি ঠিক বলেছেন। সাহাবায়ে কিরাম রা. বলেন, فعجبنا له يسأله ويصدقه - আমাদের বিস্ময় হল যে, তিনি প্রশ্নও করছেন যা না জানার নিদর্শন, আবার সত্যায়নও করছেন, যেটি ওয়াকিফহাল হওয়ার নিদর্শন। এটাও নিজেকে গোপন রাখার একটি পদ্ধতি। মোটকথা, প্রতিটি স্তরে চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে কেউ জানতে না পারে, এমনকি স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত জিবরাঈল আ. ২৩ বছরের পরিচিত হওয়া সত্বেও তখন চিনতে পারেন নি। যখন হযরত জিবরাঈল আ. চলে যান, তখন বুঝতে পেরেছেন তিনি ছিলেন হযরত জিবরাঈল আ.। যিনি উম্মতকে দীন শেখাতে এসেছিলেন।

নিজের অবস্থা গোপন রাখার প্রতি এতটা গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, হতে পারে এর দ্বারা এটা বাতলানো উদ্দেশ্য যে, সমস্ত জরুরী বিদ্যা ও মা'আরিফ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সমাপ্ত করে দেয়া হয়েছে, তাঁকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জ্ঞানসমূহ দান করা হয়েছে, তা সত্বেও বান্দার অবস্থা হল এই যে, নিজের সত্ত্বা থেকে কিছুই নয়, সব কিছু আল্লাহর দান। তিনি ইচ্ছা করলে অনুভূত ও দিব্যি দর্শনের আলোকে প্রত্যক্ষদৃষ্ট জিনিসের জ্ঞানও তুলে নিতে পারেন। হাকীকত মা'রিফাতের বিষয় আর কি জিজ্ঞেস করব, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيْلاً. سورة بني اسرائيل ٨٦.

'আমি ইচ্ছে করলে আপনার প্রতি যে পরিমাণ ওহী প্রেরণ করেছি সব ছিনিয়ে নিতে পারি, অতঃপর এ ওহী ফিরিয়ে আনার জন্য আমার বিপরীতে কোন সাহায্যকারীও পাবেন না।' -সুরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৬।

এর পরবর্তী আয়াতে আছে-

اِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ اِنَّ فَضْلَه كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا. بني اسرائيل ٨٧

কিন্তু এটা আপনার প্রভুরই রহমত (যে এরূপ করেননি) নিশ্চয়ই আপনার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ অনেক বড়। -সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৭

উদ্দেশ্য এই যে, যদিও আমি এরূপ করব না, তবে করতে পারি। এর একটি নমুনা এই দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ২৩ বছরের পরিচিতি সত্ত্বেও এবার হযরত জিবরাঈল আ. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গোপন রয়ে গেছেন। তিনি তাকে চিনতে পারেন নি। যেহেতু স্বয়ং রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই এই অবস্থা, সেহেতু অন্যদের কথা আর কি জিজ্ঞেস করব? কাজেই মানুষের কোন বিষয়েই গর্ব-অহংকার করা উচিত নয়।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানুতবী র. দারুল উলূম দেওবন্দের সর্বপ্রথম সদর মুদাররিস ছিলেন, একদিন একটি ফতওয়ার উপর দস্তখত করতে গিয়ে নিজের নাম ভূলে গেছেন। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী র. খানকা থেকে বাড়িতে যাচ্ছিলেন, রাস্তায় নেমে পথ ভূলে গেছেন। দীর্ঘক্ষন পর্যন্ত রাস্তায় চক্কর দিচ্ছেলেন যে, কোন দিকে যাবেন। হযরত থানবী র. বলেন, তখন আমার এ হাদীসের কথা মনে এসে গেল।

যেহেতু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পূর্ণাঙ্গ ইলম দান করা হয়েছিল, যেমন, হাদীস শরীফে রয়েছে, علمت علم الأولين والآخرين তথা আমাকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জ্ঞান দান করা হয়েছে। সেহেতু একটি নমুনা এরও দেখানো হয়েছে যে, আমি তা সর্বক্ষন ফেরত নিতে পারি । যাকে ইচ্ছা ইলম দিয়ে আবার ফেরত নিতে পারি, চাই তিনি নবী হোন বা ওলী। এটা হল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে কিয়ামতের (সুনির্দিষ্ট সময়ের) জ্ঞান দান করা হয়নি, তার ভূমিকা।

قال الايمان ان تؤمن بالله الخ

আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ হল, আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও তার একত্ববাদের উপর ইয়াকীন রাখা এবং এব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, তিনি সমস্ত পরিপূর্ণ গুনাবলীর আধার-উৎস এবং সমস্ত ত্রুটি থেকে পূতপবিত্র।

প্রশ্ন ঃ কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, হযরত জিবরাঈল আ. !يا محمد বলে ডাক দিয়েছেন। অথচ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম নিয়ে ডাকতে নিষেধ করা হয়েছে। তাছাড়া শুরুতে তিনি সালামও দেননি। এর কারণ কি?

উত্তর ঃ

قال الحافظ رحمه الله تعالى بعد نقله الروايات المختلفة فى هذا الباب فاختلفت الروايات قال له يا محمد! أو يارسول الله! وهل سلم او لا؟ فاما السلام فمن ذكره مقدم على من سكت عنه الخ.

সারকথা, এখানে রেওয়ায়াত সংক্ষিপ্ত। কোন কোন রেওয়ায়াতে সালামের সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। আল্লামা আইনী র.ও প্রায় অনুরূপই বলেন। মোটকথা, কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আর কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলেছেন, ইয়া মুহাম্মদ!

এর উত্তর হল, প্রথম ছুরতে তো কোন প্রশ্নই নেই। দ্বিতীয় ছুরতে উত্তর হল, নিজেকে অতি গোপনীয় রাখার জন্য বেদুঈনদের পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

২। নিষেধের দায়-দায়িত্ব মানুষের উপর। আর তিনি ছিলেন ফিরিশতা।

৩। এখানে মুহাম্মদ এর গুনবাচক অর্থ উদ্দেশ্য। নামবাচক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। যেহেতু পৌত্তলিকরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদ্বেষ ও শত্রুতাবশতঃ مذمم তথা নিন্দিত বলত, সেহেতু হযরত জিবরাঈল আ. তাদের মতখন্ডনের জন্য গুনবাচক অর্থের দিকে লক্ষ্য করে প্রশংসা স্বরূপ ইয়া মুহাম্মদ! বলেছেন।

الايمان ان تؤمن بالله

প্রশ্ন ঃ এটি তো হুবহু জিনিস দ্বারা একটি বিষয়ের সংজ্ঞা দান করা হল। কারণ, ما الايمان দ্বারা প্রশ্ন হল ঈমানের। উত্তরেও বলা হয়েছে, ان تؤمن بالله অর্থাৎ, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন।

উত্তর ঃ ১। সংজ্ঞায়িত বিষয় তথা ঈমান দ্বারা শরঈ ঈমান উদ্দেশ্য। আর সংজ্ঞা তথা ان تؤمن সংজ্ঞা দ্বারা ঈমানের আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, বিশ্বাস করা, মেনে নেয়া ও সত্যায়ন করা। কাজেই কোন প্রশ্ন রইল না।

২। প্রশ্ন মূল ঈমানের ছিল না, বরং ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সংক্রান্ত ছিল। যেমন, উত্তর দ্বারা স্পষ্ট যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সব বিষয়ের বিবরণ দিয়েছেন, যেগুলোর সাথে সত্যায়নের সম্পর্ক হয়।

قال ما الاسلام তিনি দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন, ইসলাম কি জিনিস? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, ان تعبد الله الخ কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, ان تشهد ان لا اله الا الله. এতে বুঝা গেল, تعبد الله দ্বারা উদ্দেশ্য কালিমা পড়াই। কারণ, এটা- ما الاسلام এর উত্তর। আর প্রথমে বলা হয়েছে যে, ইসলাম হল একটি দেহের ন্যায়, ঈমান হল একটি আত্মার ন্যায়। আর এটাই ঈমান ও ইসলামের পূর্ণ সংজ্ঞা দান ও উভয়ের মাঝে পার্থক্য করার সংগত স্থান ছিল। এজন্য স্পষ্ট পার্থক্য করে দেয়া হল। অবশ্য রূপকার্থে এবং পূর্ণাঙ্গ স্তরে একটির প্রয়োগ অপরটির ক্ষেত্রে হয়। এর জন্য হাফিজ ইবনে রজব হাম্বলী র. এর প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে। তিনি বলেন, اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا. অর্থাৎ যখন ঈমান ইসলাম দুটি একসাথে একত্রিত হয়, তখন আলাদা আলাদা প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য হয়, আর উভয়টি আলাদা আলাদা হলে মানে শুধু ঈমান বা শুধু ইসলাম হলে একটির প্রয়োগ অপরটির ক্ষেত্রে হবে। অর্থাৎ, উভয়টি উদ্দেশ্য হতে পারে।

قال ما الاحسان

তৃতীয় প্রশ্ন হল, ইহসান কি জিনিস? ইহসানের অর্থ হল, সুন্দর করা, ভাল করা, সুসজ্জিত করা। প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই হবে যে, ঈমান ও ইসলামের হাকীকত তো জানা হল, এবার এটিকে সৌন্দর্য মন্ডিত ও সুশোভিত করার পন্থা বলুন। এর উত্তরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, ان تعبد الله كانك تراه অর্থাৎ, আল্লাহর ইবাদত এরূপভাবে কর যেন তুমি তাকে দেখছ, মূলতঃ এতে ইখলাসের তাকিদ এবং পরিপূর্ণরূপে মনোনিবেশ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যে, তুমি এ কল্পনায় আল্লাহর ইবাদত কর যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ।

এবার সন্দেহ হতে পারত, যেহেতু এ পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার দর্শন হতে পারে না, সেহেতু একটি অসম্ভব জিনিসের কল্পনা কিভাবে হতে পারে? সহীহ মুসলিম শরীফে আছে, واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى

تموتوا - 'তোমরা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কখনো তোমাদের প্রভুকে দেখবে না।' কুরআনে হাকীমে হযরত মূসা আ. কর্তৃক আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন ছিল, رَبِّ اَرِنِيْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ আল্লাহ তা'আলা এর উত্তরে ইরশাদ করেছেন- لن ترانى 'কখনো তুমি আমাকে দেখবে না।' এর দ্বারা বুঝা গেল, দুনিয়াতে জড় দেহে আল্লাহ তা'আলার দর্শন অসম্ভব।

বাকী রইল, মিরাজ রজনীতে আল্লাহর দর্শনের বিষয়টি। এটি বিতর্কিত বিষয় হওয়ার ফলে যদি দর্শনের উক্তিটি নেয়া হয়, তবে এটাকে ব্যতিক্রমভূক্ত বলা হবে। অথবা বলা হবে, এটি উর্ধ জগতের ঘটনা যা দুনিয়ার বাইরে।

এই সংশয়ের নিরসন করা হয়েছে, فان لم تكن تراه فانه يراك দ্বারা যে, যদি তুমি তাকে না দেখ, তবে তিনি তোমাকে দেখছেন সুনিশ্চিতরূপেই। একথাটি অন্তরে সুদৃঢ় করে নাও, এরপর দেখার মতই ইবাদত হবে। কারণ, আমল মজবুত করা নির্ভর করে তাঁর দেখার উপর, তোমাদের দেখার উপর নয়। ইখলাস নির্ভরশীল অন্তরে একথা হাযির করার উপর যে, আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতিটি গতি স্থিতি এমনিভাবে আন্তরিক মন্ত্রনা ও ইচ্ছা প্রত্যক্ষ্য করছেন। একারণেই অন্ধ ব্যক্তি যদিও দেখে না, কিন্তু শাহি দরবারে যখন পৌঁছে যায়, তখন রাজকীয় তা'জীমে কোন প্রকার ত্রুটি করে না। বরং সে মনে করে সম্রাটকে আমি না দেখলেও তিনি তো আমাকে দেখছেন। যেন এমন কোন আচরণ না হয়ে যায়, যা তাঁর উদ্দেশ্যের পরিপন্থী, অকাম্য এবং আমাকে দরবার থেকে বহিস্কার করে দেয়া হয়। যদি মনিব বিদ্যমান থাকেন এবং অন্ধ হন তাহলেও চাকর যথার্থভাবে কাজ করে না। আর যদি মনিব সামনে না থাকে আর চাকর জানতে পারে, আমার মনিব দুর থেকে আমাকে দেখছেন তখন ভালরূপে তনুমন লাগিয়ে কাজ করে। একারণেই মসজিদে আকসা নির্মাণে জিনগুলো ব্যস্ত ছিল যদি জিনগুলো মনে না করত যে, হযরত সুলাইমান আ. জীবিত এবং আমাদের দেখছেন তাহলে তারা পালিয়ে যেত। এতে বুঝা গেল, দরবারীর দেখার কোন দখল নেই, বরং দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তির দর্শনের দখল রয়েছে।

সারকথা, ইবাদত এরূপভাবে কর যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, আর যদি মেনে নাও, তুমি আল্লাহকে দেখছ, তাহলে কি করতে। যেরূপভাবে তখন কাজ করতে এরূপভাবে এখনো না দেখে কাজ কর। কাজেই যদি তুমি না দেখ কিন্তু তিনি তোমাকে দেখছেন, তবে কাজ নির্ভর করে তাঁর দেখার উপর, তোমার দেখার উপর নয়।

ঈমান, ইসলাম ও ইহসানের ক্রমবিন্যাস ঃ

প্রথম দরজা হল, ঈমানের। যার উপর মুক্তি নির্ভর করে। ঈমানের পর দ্বিতীয় স্তর হল, ইসলামের। যার উপর পূর্ণাঙ্গ মুক্তি নির্ভরশীল। ঈমান চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে বাচায়, ইসলাম সাধারণ প্রবেশ থেকেই নাজাত দেয়। অতএব চিরস্থায়ী অবস্থান থেকে নাজাত হল প্রথম স্তর। আর জাহান্নামে প্রবেশ থেকে মুক্তি হল দ্বিতীয় স্তর। এরপর হল উঁচু স্তরের সর্বশেষ মর্তবা। যা ইহসান দ্বারা অর্জিত হয়। সারনির্যাস হল, ঈমান ও ইসলামের জন্য ইহসান পূর্ণাঙ্গ স্তর। অতএব ঈমান ও ইসলামের পর ইহসানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

قال متى الساعة؟ -কিয়ামত কবে আসবে?

সর্বপ্রথম ঈমান সংক্রান্ত প্রশ্ন। এটি হল, আমলের মূল বুনিয়াদ। এ ছাড়া কোন আমল গ্রহণযোগ্য নয়। অতঃপর ইসলাম সংক্রান্ত প্রশ্ন। এটি ঈমানকে পূর্ণাঙ্গতা দান করে, এটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুস্থতার পর্যায়ভূক্ত। এরপর হল ইহসান সংক্রান্ত প্রশ্ন। এটি পূর্ণ সুস্থতা ও উঁচু মরতবার কারণ। এ তিনটি বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র স্পষ্ট। কিন্তু এর পরবর্তী কিয়ামত সংক্রান্ত প্রশ্ন বাহ্যত যোগসূত্রহীন মনে হয়।

হযরত নানুতবী র. এর কোন কোন গ্রন্থ দ্বারা এর যোগসূত্র বুঝা যায়। এটি দুটি ভূমিকার উপর নির্ভরশীল।

১। সমস্ত জগতকে মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعاً.

আরেক আয়াতে আছে-

سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ. ইত্যাদি।

২। মানবজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদতের জন্য। ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ.

এদুটি ভূমিকাকে একত্রে নিম্নোক্ত আয়াতে ঘোষনা দিয়েছেন-

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ، اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلاَ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

এদুটি ভূমিকা মিলালে ফলশ্রুতি এই বের হয় যে, গোটা বিশ্বজগত সৃষ্টির উদ্দেশ্য আল্লাহর ইবাদত কারণ, গোটা বিশ্ব মানবজাতির জন্য। আর মানব জাতি হল আল্লাহর ইবাদতের জন্য। অতএব বিশ্বজগত সৃষ্টির লক্ষ্য উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আল্লাহর ইবাদত। ইবাদতের পূর্ণাঙ্গ ও উচ্চস্তর হল ইহসান যেহেতু পরিপূর্ণ বান্দা হযরত মুহাম্মদ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ায় তাশরীফ এনেছেন, তাঁর স্তরের কাছাকাছিও কারও পৌঁছা সম্ভব নয়, আর তিনি ইবাদতে ইহসানের শিক্ষা ইলমী ও আমলীভাবে পরিপূর্ণ করেছেন, অতএব বিশ্বজগতের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে গেছে।

কাজেই স্বভাবত প্রশ্ন হয়, উদ্দেশ্য অর্জনের পর এই বিশ্বকারখানা কখন ধ্বংস করে দেয়া হবে? উদাহরণ স্বরূপ, জলসার জন্য বিভিন্ন প্রস্তুতি নেয়া হয়, ষ্টেজ, লাউড স্পীকার, বিদ্যুত, লাইট ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। জলসা খতম হলে সব কিছু ভেঙ্গে জায়গা মত পৌঁছে দেয়া হয়। এরূপভাবে বিশ্বজগত সৃষ্টির উদ্দেশ্য ইবাদতের উঁচু স্তর পরিপূর্ণ হওয়ার পরে স্বভাবত প্রশ্ন হয়, কিয়ামত কবে হবে? এ জন্য রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করে, بعثت انا والساعة كهاتين, যেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ দিচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ. অর্থাৎ, মু'জিযা হিসেবে চন্দ্র দিখণ্ডিত হওয়া প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের প্রমাণ। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার প্রমাণ।

প্রশ্ন ঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর অনেক যুগ পেরিয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও তো কিয়ামত আসে নি?

উত্তর ঃ বিশ্বজগতের হাজারো বছর উর্ধ্ব জগতের হিসেবে মাত্র কয়েকদিন গণ্য হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ

অতএব আমাদের হিসেবে যদিও দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার হিসেবে এখনো দেড় দিনও অতিক্রান্ত হয়নি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

اِنَّهُمْ يَرَوْنَه بَعِيْدًا وَنَرَاهُ قَرِيْبًا.

২। ইবাদতের পূর্ণাঙ্গতা দুভাবে উদ্দিষ্ট- ১। ধরণগত, ২। পরিমাণগত।

ধরণগত পূর্ণাঙ্গতা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। আর পরিমাণগত পূর্ণাঙ্গতা হবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্তদের মাধ্যমে। অর্থাৎ, আল্লাহর এত বান্দা ইবাদত করবে যে, ঘরে ঘরে ইবাদতের আওয়াজ এবং প্রতিটি শিশুর মুখে তার চর্চা হবে। এটা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্তদের মাধ্যমে হবে। হযরত ঈসা আ. এর পর এটি পূর্ণাঙ্গ হবে। এ সম্পর্কে ইরশাদে নববী রয়েছে-

لا يبقي على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله الاسلام بعز عزيز وذل ذليل.

তখন ইবাদত সর্বপ্রকার পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করবে। তখন এই বিশ্ব কারখানা ধ্বংস করে দেয়া হবে। উঠাতে কয়েক বছর লাগবে, যেমন, ধীরে ধীরে বানানো হয়েছে, এমনিভাবে তোলা হয়েছে, অবশ্য অবশেষে চোখের পলকে বা তার চেয়েও আরো কম সময়ে কিয়ামত বাস্তবায়িত হবে। প্রথমে বাইতুল্লাহ ও উম্মুল কুরা তুলে নেয়া হবে। অতঃপর অন্যান্য স্থানগুলো।

যদি আজ কেউ বাইতুল্লাহকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করে তবে হস্তিবাহিনীর ন্যায় নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যখন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এটিকে তুলে নিতে চাইবেন তখন এক হাবশী কা'বা শরীফের এক একটি ইট আলাদা করে ফেলবে। যেমনটি, হাদীস শরীফে এসেছে। -ইরশাদুল কারী

ما المسئول عنها باعلم من السائل এ বাক্যে المسئول এবং السائل শব্দে আলিফ লাম عهد خارجى এবং استغراقي উভয়টিই হতে পারে। প্রথম ছুরতে উদ্দেশ্য হবে, জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি খাস আকায়ে কায়েনাত রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আর প্রশ্নকারী খাস সর্বশ্রেষ্ঠ ফিরিশতা হযরত জিবরাঈল আ.।

দ্বিতীয় ছুরতে অর্থ হবে, কিয়ামতের ওয়াক্ত না জানার ক্ষেত্রে প্রতিটি জিজ্ঞেসিত ও প্রশ্নকারী ব্যক্তি সমান। যেমন, কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায়, হযরত ঈসা আ. এ প্রশ্নই হযরত জিবরাঈল আ. এর নিকট করলে পড়ে তিনি নিজের পাখা ঝেরে উত্তর দিলেন, ما المسئول عنها باعلم من السائل

ساحدثك عن اشراطها 'আমি তোমাকে কিছু নিদর্শন বাতলে দিচ্ছি।'

اشراط শব্দটি شَرَط এর বহুবচন। অর্থ আলামত। شَرْط এর বহুবচন شُرُوط و شرائط এখানে اشراط দ্বারা উদ্দেশ্য নিকটবর্তী পূর্ববর্তী নিদর্শন। যেমন, জবাব দ্বারা স্পষ্ট। অর্থাৎ, হুবহু কিয়ামত সংঘটনের আলামতসমূহ উদ্দেশ্য নয়।

اذا ولدت الامة ربها কোন কোন রেওয়ায়াতে ربتها আবার কোনটিতে بعلها রয়েছে। তিনটি শব্দের অর্থ এ হাদীসে, মালিক-মনিব। এ বাক্যের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন উক্তি রয়েছে।

১। সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রধান উক্তি হল, رب মানে মুরুব্বি অর্থাৎ, কিয়ামত সন্নিকটে এলে পরিস্থিতি এতটা পরিবর্তিত হয়ে যাবে যে, মুরুব্বি মুরব্বা হয়ে যাবে। মানে উঁচু শ্রেণীর লোক নিচু শ্রেণীতে চলে আসবে, ছোটরা বড়দের সম্মান করবে না।

২। দ্বিতীয় উক্তি হল, মাতা পিতার অবাধ্যতার দিকে ইঙ্গিত। অর্থাৎ, ছেলে মেয়েরা মাতা পিতার সাথে এরূপ আচরণ করবে যেমন, মালিক চাকর নকরের সাথে এবং বাঁদিদের সাথে করে থাকে। তথা কিয়ামত

নিকটবর্তী হলে সন্তান সন্ততি নিজের মাতা পিতাকে দাপট দেখাবে, মন্দচারী বলবে, মাতা পিতার উপর শাসন চালাবে।

৩। তৃতীয় উক্তি হল, কিয়ামত কাছাকাছি এলে, পরিস্থিতি এতটা খারাপ হবে যে, লোকজন জায়িয না জায়িয ও হালাল হারামের কথা খেয়াল করবে না। উম্মে ওয়ালাদ বিক্রি করবে, সে বিভিন্ন ক্রেতার কব্জায় আসবে, এমনকি তার সন্তান যে স্বীয় বাপের স্থানে মালিক হয়েছে, সে তার মাকে ক্রয় করবে। এমতাবস্থায় تلد الامة ربها সম্পূর্ণ প্রকৃত অর্থে থাকবে। তাছাড়া আরো অনেক উক্তি রয়েছে। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় উক্তিটি অধিকাংশের মতে প্রধান। এর একটি কারণ এটিও যে, অবশিষ্ট আলামতগুলো তাই প্রমাণ করে।

حفاة - حاف এর বহুবচন। অর্থ নগ্নপদ।

عراة - عاري এর বহুবচন। অর্থ নগ্নদেহ।

رعاة - راعي এর বহুবচন। অর্থ রাখাল।

بُهْم - أبهم এর বহুবচন। অর্থ বকরী, মেষ, ভেড়া, দুম্বা ও মেন্ডার ছোট ছোট বাচ্চা। তাছাড়া গাভীর বাচ্চার ক্ষেত্রেও শব্দটির প্রয়োগ হয়। এর একবচন হল بهمة। এ থেকে এসেছে البهيمة চতুষ্পদ সে জন্তু যেগুলোতে বাকশক্তি নেই। এর বহুবচন হল, بهائم।

সারকথা, নিম্নস্তরের ও নিচুস্তরের লোকজন ক্ষমতা লাভ করবে, সম্ভ্রান্ত লোকজন অপদস্থ ও দুর্বল হয়ে যাবে। নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব অযোগ্যরা লাভ করবে। হকদাররা তা পাবে না। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة তথা যখন লেনদেন অযোগ্যদের নিকট অর্পন করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর। বর্তমানে দেশে রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে ও বিভাগে, মাদরাসা ও খানকাগুলোতে কি হচ্ছে? فاعتبروا يا اولي الابصار -অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা! উপদেশ গ্রহণ কর।

فِيْ خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ الاَّ اللهُ -কিয়ামতের (সুনির্দিষ্ট সময়ের) জ্ঞান সে পাঁচটি জিনিসের অন্তর্ভূক্ত, যেগুলো আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। অতঃপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন- انَّ اللهَ عِنْدَه عِلْمُ السَّاعَةِ ... الآية. سورة لقمان অর্থাৎ, কিয়ামত কোন তারিখে হবে তার জ্ঞান আল্লাহরই নিকট, তিনিই বৃষ্টি বর্ষন করেন, তিনিই জানেন মায়ের পেটে কি (কন্যা সন্তান না ছেলে এবং কোন আকৃতির?), কেউ জানে না, সে কালকে কি অর্জন করবে? (ভাল না মন্দ) কেউ জানে না, সে কোন ভূমিতে মৃত্যু লাভ করবে?

দুটি প্রশ্ন ঃ ইমাম রাযী র. এখানে দুটি প্রশ্ন করেছেন।

প্রথম প্রশ্ন ঃ এ আয়াতের আলোকে উক্ত পাঁচটি জিনিসের কোন একটির খুটিনাটি শাখাগত বিষয়ের জ্ঞানও গায়রুল্লাহর না হওয়ার কথা, অথচ আমরা শত সহস্র ঘটনা এর পরিপন্থী পাচ্ছি। আওলিয়ায়ে কিরামের কারামত প্রচুর বর্ণিত আছে। হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. গর্ভের অবস্থা জেনে ফেলেছিলেন ইনতিকালের পূর্বে স্বীয় অন্তসত্তা স্ত্রীকে বলেছিলেন যে, তাঁর কন্যা সন্তান হবে। এ জন্য তিনি ওসিয়ত করেছেন, এ গর্ভস্থ সন্তানকে কন্যা ধরে যেন তার পরিত্যাক্ত সম্পদ বন্টন করা হয়। এরূপ অনেক ঘটনা রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, এ পাঁচটি জিনিসকে কেন খাস করা হয়েছে? এতে সীমাবদ্ধতা কেন? এ ছাড়াও তো অনেক জিনিস আছে, যেগুলো সম্পর্কে অন্যরা জানে না। তাহলে এ সীমাবদ্ধতা যথার্থ হল কিভাবে?

উত্তর ঃ দ্বিতীয় প্রশ্নের সহজ উত্তর আল্লামা সুয়ূতী র. لباب النقول গ্রন্থে এই দিয়েছেন যে, প্রশ্নকর্তার প্রশ্ন ছিল, এ পাঁচটি জিনিস সংক্রান্ত। বস্তুতঃ যে সংখ্যা কোন প্রশ্নকর্তার উত্তর অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়, সে সংখ্যা সমস্ত উলামায়ে উসূলের সর্বসম্মতিক্রমে সীমাবদ্ধতার জন্য হয় না।

◆ প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পূর্বে স্মর্তব্য যে, ইলমে গায়িব দ্বারা উদ্দেশ্য মূলনীতি সংক্রান্ত জ্ঞান। শাখাগত ও খুটিনাটি বিষয়ের জ্ঞান হলে তাকে অদৃশ্যজ্ঞাতা বা আলিমুল গায়িব বলা হয় না। যেমন, কোন ব্যক্তি একশ দুশ প্রেসক্রিপশন জানতে পারল, তবে তাকে ডাক্তার বলা হবে না। এরূপভাব যদি কেউ ফিকহী কতগুলো শাখাগত বিষয় জেনে যায়, বরং পূর্ণ বেহেশতী যেওর মুখস্থ করে ফেলে, তবে তাকে ফকীহ বলা হবে না। যতক্ষন পর্যন্ত মূলনীতিগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হবে। বস্তুতঃ মূলনীতিগুলোর জ্ঞান হল, চাবির পর্যায়ভূক্ত।

সৃষ্টিজগত সংক্রান্ত পূর্ণ ও মৌলিক জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার জন্য বিশেষিত। এসব মূলনীতিকে مفتاح الغيب বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَعِنْدَه مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا الاَّ هُوَ. سورة انعام

"আল্লাহর নিকটই অদৃশ্যের চাবি কাঠিগুলো। এগুলো তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।"

-সূরা আন'আম

স্পষ্ট বিষয়, ভান্ডার থেকে সেই কিছু বের করতে পারবে যার কাছে চাবি থাকবে।

সারকথা হল, সৃষ্টি সংক্রান্ত মৌলিক জ্ঞান এরূপভাবে সমস্ত শাখা প্রশাখার পরিপূর্ণ জ্ঞান যা থেকে কিছুই বহির্ভূত থাকবে না- এটি আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট। এ সব জ্ঞান না কোন নবীর আছে? না কোন ওলীর? তারা যা কিছু জানেন-চাই যত বেশীই হোক না কেন? সবই শাখা প্রশাখাগত।

অতএব বুঝা গেল, অদৃশ্য বিষয়াবলী দুই প্রকার।

১। তাশরীঈ, ২। তাকভীনী।

তাশরীঈ যেমন, ওহী। এগুলো সব গায়িবের অন্তর্ভূক্ত। তাশরীআতের মৌলিক বিষয়াবলীও প্রয়োজন অনুপাতে শিক্ষা দেয়া হয়। যেগুলো আম্বিয়া আ. এর দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট। এটা কামিল হয়ে থাকে।

আর তাকভীনিয়াতের মূলনীতিগুলো আল্লাহ তা'আলার সাথে বিশেষিত। এগুলো থেকে আল্লাহ তা'আলা যাকে যে পরিমাণ সঙ্গত মনে করেন দান করেন। কিন্তু এ সব শাখাগত জিনিস। কাজেই আলিমুল গায়িব বলা দুরস্ত নয়।

নোট ঃ

ইলমে গায়িব সংক্রান্ত বিস্তারিত ও প্রামাণ্য গ্রন্থাদি ছাপা হয়েছে। -ইমদাদুল বারী শরহে বুখারী ৪র্থ খণ্ডে হযরত মাওলানা আবদুল জাব্বার আ'জমী র. বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রেজাখানী বিদ'আতীদের প্রমাণাদি উল্লেখ করে কুরআনের আয়াত ও হাদীসে নববীগুলো দ্বারা যথার্থ মতখন্ডন করেছেন। এটি দ্রষ্টব্য। তাছাড়া ইরশাদুল কারীতে হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমদ র. নেহায়েত প্রামাণ্য ও বিস্তারিত আকারে বিদ'আতীদের সফল মতখন্ডন করেছেন। فجزاهم الله خير الجزاء

৩৮. باب

৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ

باب তানভীন সহকারে শিরোনাম শূন্য।

٤٩. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رض أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ رض أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لَا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ .

৪৯. ইবরাহীম ইবনে হামযা র. .... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আবূ সুফিয়ান ইবনে হারব রা. আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, হিরাকল তাঁকে বলেছিল, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তারা (ঈমানদাররা) সংখ্যায় বাড়ছে না কমছে? তুমি উত্তর দিয়েছিলে, তারা সংখ্যায় বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে ঈমানের ব্যাপার এরূপই থাকে, যতক্ষণ না তা পূর্ণতা লাভ করে। আর আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছিলাম, কেউ তাঁর দীন গ্রহণ করার পর তা অপসন্দ করে মুরতাদ হয়ে যায় কি-না? তুমি জবাব দিয়েছ, 'না।' প্রকৃত ঈমান এরূপই, ঈমানের স্বাদ অন্তরের সাথে মিশে গেলে কেউ তা অপসন্দ করে না।

এ অনুচ্ছেদটি শিরোনামহীন, শিরোনাম বর্জনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

১। এটি পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের পরিচ্ছেদের পর্যায়ভূক্ত এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট। পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে ইমাম বুখারী র. বলেছিলেন, جعل ذلك كله دينا অর্থাৎ, ঈমান, ইসলাম ও ইহসান সবগুলোকে এক সাব্যস্ত করেছেন। এ অনুচ্ছেদ দ্বারাও ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য এটাই যে, দীন ও ঈমান এক। দেখুন, হিরাক্লিয়াস প্রশ্ন করেছিলেন, هل يرتد احد سخطة لدينه الخ (তাঁর দীনের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে কেউ তা পরিহার করছে? এবং মুরতাদ হচ্ছে?) আবু সুফিয়ান নেতিবাচক উত্তর দিলে হিরাক্লিয়াস বললেন, كذالك الايمان (ঈমানের অবস্থা অনুরূপই)। বুঝা গেল, দীন ও ঈমান একই জিনিস।

২। পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদগুলোতে ঈমান হ্রাস বৃদ্ধি প্রমান করা হয়েছিল, অনুরূপভাবে এ অনুচ্ছেদেও حين تخالط بشاشة القلوب দ্বারা তার প্রমান মিলে।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ ইমাম বুখারী র. এখানে হিরাক্লিয়াস সংক্রান্ত হাদীসের একটি অংশ পেশ করেছেন। হিরাক্লিয়াসের এ কথোপকথন ওহী পর্বে সবিস্তারে এসেছে। ইমাম বুখারী র. পূর্ণ হাদীসটি কিতাবুল জিহাদে এ সনদেই বর্ণনা করবেন। এটি এখানে সংক্ষিপ্ত।

خرم এর সংজ্ঞা ও এর বৈধতা সংক্রান্ত মতবিরোধ ঃ

হাদীসের কোন অংশকে আলাদা করলে এটাকে মুহাদ্দিসীনের পরিভাষায় বলে, خرم। ইমাম বুখারী র. অনেক সময় এরূপ করেন। মুহাদ্দিসীনের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে যে, হাদীসে নববীতে خرم তথা সংক্ষিপ্তকরণ জায়িয কি না? কেউ কেউ ব্যাপক আকারে জায়িয বলেন, আবার কেউ কেউ সাধারণভাবে অবৈধ বলেন। কিন্তু সহীহ কথা হল, হাদীসের কর্তিত অংশ যদি অর্থ প্রকাশের জন্য হাদীসের অন্য অংশের

মুখাপেক্ষী হয়, অথবা টুকরো পৃথক করার পর এর অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়, মানে বিকৃত হয়ে যায়, তবে এরূপ সংক্ষিপ্ত করণ জায়িয নেই, আর যদি হাদীসের টুকরো অংশ স্বীয় অর্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে হাদীসের অন্যান্য অংশের মুখাপেক্ষী না হয়, তাহলে এরূপ সংক্ষিপ্ত করণ জায়িয আছে, আর এটা শাস্ত্র বিশেষজ্ঞের কাজ। ইমাম বুখারী র. যেখানেই হাদীস সংক্ষিপ্ত করেন, সেখানে বৈধতার সীমানাতেই হয়ে থাকে।

একটি প্রশ্নোত্তর ঃ

আরেকটি প্রশ্ন হল, হিরাক্লিয়াস তো কাফির ছিলেন, ইমাম বুখারী র. কাফিরের উক্তি দ্বারা কেন প্রমাণ পেশ করলেন?

এর উত্তর হল, হযরত আবু সুফিয়ান রা. এ ঘটনা মুসলমান হওয়ার পর বর্ণনা করেছেন, তার থেকে হযরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন, অতএব এটি মুরসালে সাহাবা ও মাওকূফাতে সাহাবার অন্তর্ভূক্ত। এগুলো আমাদের মতে প্রমাণ।

٣٩. بَاب فَضْلِ مَنْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ

৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ দীন রক্ষাকারীর ফযীলত

٥٠. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضـ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ .

৫০. আবূ নু'আইম র. .... হযরত নু'মান ইবনে বশীর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, 'হালালও স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়- যা অনেকেই জানে না। যে ব্যক্তি সে সন্দেহজনক বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকবে, সে তার দীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তার উদাহরণ সে রাখালের ন্যায়, যে তার পশু সম্রাটের সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে চরায়, অচিরেই সেগুলো সেখানে ঢুকে পড়তে পারে। জেনে রাখ, প্রত্যেক সম্রাটেরই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আরো জেনে রাখ যে, আল্লাহর যমিনে তাঁর সংরক্ষিত এলাকা হল তাঁর নিষিদ্ধ কাজসমূহ। জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। মনে রাখ, সে গোশতের টুকরোটি হল অন্তর।

যোগসূত্র ঃ এর পূর্বেকার হাদীসে জিবরাঈলে ইহসানের বিবরণ ছিল, এ অনুচ্ছেদ দ্বারা ইহসানের পদ্ধতি শিক্ষাদান উদ্দেশ্য। তিনি বলতে চান যে, ইহসান অর্জনের পদ্ধতি হল, দীনের অনুসরনের নিয়তে অন্তরের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা ও সন্দেহজনক জিনিস থেকে পরহেয করা।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ মুরজিয়া সম্প্রদায় বলে, ঈমানের সাথে গুনাহ ক্ষতিকর নয়, এ অনুচ্ছেদ দ্বারা তাদের মতখন্ডন করা হচ্ছে যে, তোমরা তো গুনাহকে ক্ষতিকর নয় বলছ, অথচ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট যে, সংশয়জনক জিনিস থেকে বেঁচে না থাকাও ক্ষতিকর।

২। তাছাড়া ইমাম বুখারী র. বলতে চান যে, সতর্কতা অবলম্বনকারীদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে অসতর্ক লোকদের উপর। এর ফল স্পষ্ট যে, দীন ও ঈমানের বিভিন্ন মর্তবা রয়েছে।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. বাক্যে।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী-কিতাবুল ঈমান ঃ ১৩, বুয়ূ ঃ ২৭৫, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবূ দাঊদ, (সবগুলোর কিতাবুল বুয়ূতে)।

الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات

ব্যাখ্যা ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন, এতে পাঁচটি রেওয়ায়াত রয়েছে। অর্থাৎ, বিভিন্ন কপি রয়েছে। - উমদা ১/২৯৭

১। مشتبهات মীমের উপর পেশ শীন সাকিন বা তে যের مُفْتَعِلَاتٌ এর ওজনে। এটি হল উসাইলির রেওয়ায়াত। ইবনে মাজাহর রেওয়ায়াতেও তাই আছে। অর্থাৎ, বাবে ইফতিআল থেকে ইসমে ফায়েলের শব্দ।

২। مُتَشَبِّهَات অর্থাৎ, বাবে তাফাউল থেকে ইসমে মাফউল। এটি তাবারীর রেওয়ায়াত।

৩। مشبَّهات অর্থাৎ, বাবে তাফঈল থেকে ইসমে মাফউল। এটি মুসলিম ইত্যাদির রেওয়ায়াত।

৪। مشبِّهات অর্থাৎ, বাবে তাফঈল থেকে ইসমে ফায়েলের।

৫। مُشْبِهَات অর্থাৎ, বাবে ইফআল থেকে ইসমে ফায়েল।

উপরোক্ত কপিগুলোর যেকোনটিই নেয়া হোক এর আসল মাদ্দা شبه

আল্লামা নববী র. বলেন, দ্রব্য তিন প্রকার।

১। সুস্পষ্ট হালাল। যার বৈধতা পরিস্কার। যেমন, ফল ও রুটি খাওয়া, কথা বলা, হাটা-চলা ইত্যাদি।

২। কোন কোন জিনিস এরূপ হারাম যেগুলোর হারাম হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ স্পষ্ট। যেমন, শরাব পান, শুকরের গোশত, রক্ত, মিথ্যা বলা ও যিনা করা ইত্যাদি।

৩। কোন কোন জিনিস সংশয়যুক্ত মানে এটি হারাম না হালাল তা স্পষ্ট নয়। উভয়ের মাঝে সন্দেহ। যেমন, প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত কুকুরের সাথে অপ্রশিক্ষনপ্রাপ্ত কুকুর শিকারের নিকট পাওয়া গেলে সন্দেহ হয় যে, এই শিকার এ দুটি কুকুরের কোনটির? প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত কুকুরের হলে হালাল, অপ্রশিক্ষনপ্রাপ্ত কুকুরের হলে হারাম। এমতাবস্থায় দীনকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখার দাবী হল, এ শিকার বর্জন করা।

মোটকথা, শরীয়তে যখন উসূলে শরীয়ত তথা প্রমাণ চতুষ্টয় -কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা কোন জিনিসের হালাল বা হারাম হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত ও নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তখন সেটি بين অর্থাৎ, এর হুকুম স্পষ্ট। যেটি হালাল প্রমাণিত হবে তা কর, আর যেটি হারাম প্রমাণিত হবে তা পরিহার কর। যেন بين শব্দের অর্থ হল, بين حكمه অর্থাৎ, এর হুকুম স্পষ্ট।

এবার সংশয়যুক্ত হওয়ার বিভিন্ন কারণ হতে পারে।

১। প্রমাণাদিতে বিরোধ থাকবে। এক হাদীস দ্বারা কোন জিনিস হালাল, অপর হাদীস দ্বারা সে জিনিসটি হারাম বুঝা যায়, তবে এর দুটি ছুরত রয়েছে।

১। প্রমাণাদির বিরোধের কারণে কোন মুজতাহিদ কোন সিদ্ধান্ত দেননি, স্বয়ং মুজতাহিদ ইমামগণ দোদুল্যমান। এমতাবস্থায় সে জিনিস বর্জন করাতেই দীন ও ইযযত আবরুর হেফাজত হয়, নিরাপদে থাকা যায়। যেমন, সন্দেহযুক্ত পানি। বাস্তবে এটি পবিত্র বা অপবিত্র। কিন্তু প্রমাণাদির বিরোধের কারণে সন্দেহ হয়ে গেছে এবং সমস্ত মুজতাহিদের নিকট এ ছুরত আসে না। এ জন্য বলেন, لا يعلمها كثير من الناس অর্থাৎ, যেগুলো অনেক লোকই জানে না। এটা বলেন নি যে, কেউ জানে না।

২। দ্বিতীয় ছুরত হল, কোন কোন মুজতাহিদ শরঈ প্রমাণাদিতে চিন্তা ফিকির করে হালাল বলেছেন, আর অন্যরা এটাকে প্রমাণাদির আলোকে হারাম বলেছেন এবং এসব মুজতাহিদের কোন সন্দেহও নেই, এমতাবস্থায় ইমামগণের মতবিরোধ থেকে বাচার জন্য যে যে মুজতাহিদের অনুসারী সে তাঁর সিদ্ধান্তের উপর আমল করবে।

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ

৩। আল্লামা যয়নুদ্দীন ইবনুল মুনাইয়্যির র. এর মাশায়েখে তরীকতের একজন হলেন, বুযুর্গ শায়েখ আবুল কাসিম কাবারী। তিনি তরীকতের ইমাম ও আরিফ ছিলেন। ইবনে মুনাইয়্যির র. তাঁর ফাযায়েল সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ লিখেছেন, তাতে এ হাদীসটিও এসেছে। এ সম্পর্কে ইবনে মুনাইয়্যির র. স্বীয় শায়েখের উক্তি বর্ণনা করেছেন, وما بينهما مشتبهات দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হল, মাকরূহ হওয়া। কারণ, এটিতে দুই ধরণের সন্দেহ রয়েছে। যেন প্রথম দুটি অর্থে শুধু দুটি স্তর ছিল। তৃতীয় আমাদের প্রমাণাদি দ্বারা সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। অতএব এবার সংশয়জনক জিনিস থেকে বাঁচার উদ্দেশ্য হল, মাকরূহ থেকে যে বাঁচল সে استبرأ لدينه وعرضه তথা নিজের দীন ও ইযযত আবরু রক্ষা করল। এর সমর্থন হয়, সহীহ ইবনে হাব্বানের হাদীস দ্বারা। যেমন, হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী র. বর্ণনা করেছেন, তিনি আরো বলেছেন, এর সনদ মুসলিমের। যদিও মূলপাঠ মুসলিমের নয়। এর শব্দরাজি হল, اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال ج : ١١٨ অর্থাৎ, হালালের প্রতিবন্ধক কায়েম করে নাও। উদ্দেশ্য হল, যদি সমস্ত হালাল কাজ করে ফেল, তবে মাঝখানে আড়াল থাকে না এরপরে বলেন, من فعل ذلك فقد استبرأ لدينه وعرضه. এর দ্বারা বুঝা গেল কিছু হালাল জিনিসও পরিহার করা উচিত।

কাবারী বলেন, বান্দা এবং হারামের মাঝে মাকরূহ একটি ঘাটি। যে হালাল থেকে অগ্রসর হয়ে সে ঘাটিতে এসে যাবে সে হারামে গিয়ে পড়বে। অতঃপর তিনি বলেন, মুবাহ হল বান্দা এবং মাকরূহের মাঝে একটি ঘাটি। অর্থাৎ, যদি সমস্ত হালাল অবলম্বন করে তবে কোথাও মাকরূহ ঘাটিতে পৌঁছে যাওয়ার আশংকা আছে, এতে বুঝা গেল হালালেরও একটি সীমা রয়েছে, মাকরূহেরও একটি সীমা রয়েছে। অতএব এবার ইবনে হাব্বানের হাদীস "হালালকে আড়াল বানিয়ে নাও" -এর অর্থ স্পষ্ট হয়ে গেল। -দরসে বুখারী ১/২৯৭

فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه. যে ব্যক্তি এ সব সন্দেহজনক জিনিস থেকে বিরত থাকল, সে নিজের দীন ও স্বীয় আবরুর পক্ষ থেকে সাফাই পেশ করল। এর দ্বারা বুঝা যায়, সন্দেহজনক জিনিসে লিপ্ত হলে পার্থিব ক্ষতিও আছে। কারণ, লোকজন মন্দ বলে, ভর্ৎসনা করে। ফলে নিজের ইযযত আবরু নষ্ট হয়।

আবার দীনী ক্ষতিও রয়েছে। দীন সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ সংরক্ষিত থাকে না। সামনে যেযে শয়তানের প্রতারনায় সম্পূর্ণ হারাম জিনিসে লিপ্ত হওয়ারও আশংকা আছে।

من وقع في المشتبهات الخ যে কেউ এসব সন্দেহজনক জিনিসে পড়ে যায়, তার উদাহরণ ঠিক সে রাখালের মত যে সরকারী চারণভূমির আশে পাশে পশু চরায়। তখন শীগ্রই সে চারণভূমিতে জন্তু প্রবেশ করিয়ে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার আশংকা আছে।

এ উদাহরণের অর্থ হল, মানুষ তো স্বয়ং রাখাল। তার নফস হল সে জন্তু যেটিকে সে চরায়। যদি মানুষ সে জন্তুটিকে আল্লাহর চারণভূমিতে যেতে বারণ না করে তাহলে চরনেওয়ালা ও রাখাল উভয়ে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ তা'আলার চারণভূমি হল, মুহাররামাত তথা হারামকৃত দ্রব্যাদি ও গুনাহের কাজসমূহ। আর এর আশপাশ হল, সন্দেহজনক জিনিসগুলো। যে নিজের নফসকে সংশয়জনক জিনিসের জন্য স্বাধীন ছেড়ে দেয়, সে নিশ্চিতভাবে হারামেও পতিত হতে পারে। কারণ, হারাম জিনিসগুলো হল, সরকারী চারণভূমি। রাজকীয় চারণভূমি নেহায়েত দৃষ্টিনন্দন, চিত্তাকর্ষক ও সুন্দর সুশোভিত হয়ে থাকে। কিন্তু তা থেকে বেঁচে থাকা জরুরী।

উপমার কারণ শুধু এতটুকু যে, যেরূপভাবে দুনিয়ার সম্রাটগণ একটি অংশকে নিজের জন্য বিশেষিত করে তার হুরমত ও সম্মান সবার উপর আবশ্যক করে দেন এবং অবশিষ্ট অংশ বৈধ থাকে, এরূপভাবে আল্লাহ তা'আলারও মুহাররামাতের একটি প্রাচীর তৈরী আছে। এর ধারে কাছেও না যাওয়া উচিত।

সতর্কবাণী ঃ এই উপমা দ্বারা বিভ্রান্তি যেন না হয়। বিস্তারিত বিবরণ তো স্বস্থানে আসবে, সংক্ষিপ্ত কথা হল, সাময়িক সম্রাটের বিশেষতঃ নিজের জন্য চারণভূমির অধিকার নেই, এটা তো জাহিলিয়্যাতের রীতি ছিল, অবশ্য বাইতুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার এবং সাধারণ প্রয়োজনের খাতিরে অর্থাৎ, শরঈ স্বার্থের জন্য চারণভূমির অধিকার রয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে প্রমানিত আছে, রাবাযাতে একটি ছাউনি ছিল, সেখানে চারণভূমি বানানো হয়েছিল, সেখানে ৩০ হাজার ঘোড়া থাকত। সেখানে বাড় তৈরী করা হত এবং ঘেরাও দিয়ে রাখা হত।

الا وان في الجسد مضغة মনে রেখ, দেহে একটি মাংসপিন্ড আছে, যখন সেটি ঠিক হয়ে যাবে, তখন গোটা দেহ ঠিক হয়ে যাবে। আর যদি সেটি বিগড়ে যায় তাহলে গোটা দেহই খারাপ হয়ে যায়।

বাহ্যত পূর্বের সাথে এ বাক্যটির যোগসূত্র নেই মনে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ এ বাক্যটি নেহায়েত নিগূঢ় রহস্য বিশিষ্ট এবং দার্শনিক সূলভ। পূর্বের সাথে এর নিপূন যোগসূত্র রয়েছে।

প্রথমে ইমাম বুখারী র. সন্দেহজনক জিনিস থেকে বাঁচার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। এবার বর্ণনা করছেন যে, হারাম ও সন্দেহজনক জিনিস থেকে বাঁচার পদ্ধতি হল, অন্তর ঠিক করে নেয়া। কারণ, এটিই হল সমস্ত কামালাতের উৎস ও খনি। এই মেশিন ঠিক হয়ে গেলে সমস্ত হারাম ও সন্দেহজনক জিনিস থেকে বাঁচাও সহজ হবে। যদি অন্তরের মেশিন খারাপ হয়ে যায়, তাহলে সংশয়জনক জিনিস থেকে সতর্ক থাকা স্বপ্ন বিষয় হয়ে দাড়াবে।

সারকথা, এবাক্য দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ একটি হাকীকত সম্পর্কে অবহিত করেছেন যে, এর উপর যে আমল করবে সে প্রকৃত তাকওয়া অর্জন করতে পারবে। যদি আল্লাহর আজমত, মহব্বত ও ভয় থাকে, আখলাকে নববী দ্বারা আলোকোজ্জল হয়, তবে আল্লাহর মর্জি মুতাবিক আমল করা এবং আল্লাহ তা'আলার অপছন্দনীয় জিনিস থেকে নিরাপদ থাকা সহজ হয়ে যায়।

الا وهي القلب. -মনে রেখ সে মাংসপিন্ড হল কলব। যার ভাল ও খারাপ হওয়ার উপর দেহের ভাল খারাপ নির্ভরশীল।

ডাক্তারদের মতে কলব একটি সনোবর (দেবদারু ফল) আকৃতির গতিশীল মাংসপিন্ড। এটি সমস্ত জিনিসের উৎস। শরীয়তে কলব হল, আল্লাহ তা'আলার সুক্ষ্ম বিষয়াবলীর একটি। যার কেন্দ্রভূমি হল, বস্তুগত কলব। অতএব এখানে মাংসপিন্ড দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সে শক্তি যার স্থান এই গোশতের টুকরা। এটি সমস্ত ভাল ও মন্দের উৎস। এজন্য একজন মুমিনের উচিত নিজের পূর্ণ মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু অন্তরের সংশোধনের দিকে রাখা। অন্যান্য অঙ্গ প্রতঙ্গ স্বয়ং এর অনুগত হয়ে যাবে। অন্য ভাষায় মনে করুন, একটি রাষ্ট্রের রাজধানীতে সম্রাট উপবিষ্ট আছেন, কিন্তু কোন সম্রাট এরূপ মজবুত ও সুদৃঢ় ক্ষমতা রাখেন যার ফলে তার নিয়ন্ত্রন থাকে গোটা অঞ্চলে। কারো কোন বিদ্রোহের হিম্মত বা ধৃষ্টতা হয় না। আবার কোন কোন সম্রাট এত দুর্বল হয়ে থাকেন যে, স্বীয় এলাকায় তার নিয়ন্ত্রন বজায় রাখতে পারেন না। উপর থেকে নির্দেশ আছে, কিন্তু অধঃস্তনরা তা ভঙ্গ করে। আজকে এক এলাকায় বিদ্রোহ হয়, কালকে আরেক এলাকায় বিদ্রোহ হয়। এরূপভাবে মানুষের পূর্ণ দেহ একটি রাষ্ট্র। সীনা হল, তার রাজধানী। কলব হল, তার সিংহাসন। এতে ঈমানের সম্রাট উপবিষ্ট আছে। যদি ঈমানের সম্রাট শক্তিশালী হয়, তবে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে অনুগত করে ফেলবে। না হাত বিদ্রোহ করতে পারে, না কান, না চোখ, না জিহ্বা। আর যদি ঈমানের সম্রাট কমজোর হয়, তাহলে একেকটি অঙ্গ বিদ্রোহী হতে পারে। মূল মেশিন বা ইঞ্জিন হল কলব। এটি ঠিক করে নিন। এটি যেদিকে যাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সব বগি তার সাথে সাথে সেদিকে যাবে।

আকলের স্থান কলব না দেমাগ?

قال العيني رحمه الله تعالى واحتج جماعة بهذا الحديث وبنحو قوله تعالى : لهم قلوب لا يعقلون بها على ان العقل فى القلب لا في الرأس، قلت فيه خلاف مشهور فمذهب الشافعية والمتكلمين انه في القلب ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى انه في الدماغ، وحكى الاول عن الفلاسفة والثاني عن الأطباء، واحتج بانه اذا فسد الدماغ فسد العقل.

وقال ابن بطال وفى هذا الحديث ان العقل انما هو في القلب وما في الرأس منه فانما هو عن القلب وقال النووي ليس فيه دلالة على ان العقل في القلب. عمدة : ١/٣٠٢.

مَنْ كَانَ لَه قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ. سورة ق،

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ اَوْعَلَى قُلُوْبٍ اَقْفَالُها. سورة محمد

এগুলো বাহ্যত ইমাম শাফিঈ র. এর সমর্থন করছে।

হযরত শাহ সাহেব র. বলেন, প্রকৃত অর্থে আকলের স্থান হল, কলব। কিন্তু কলব ও দেমাগে এতটা যোগসূত্র যে, কলব থেকে তৎখনাৎ দেমাগে নিদর্শনাদি প্রকাশ পায়। এতে বৈদ্যুতিক বোতামের মত অবস্থা রয়েছে। বোতাম টিপলে আলো এসে যায়, এরূপভাবে তো কলব আর দেমাগে রয়েছে তার লাইট।

এ বক্তব্যে আয়াতগুলোতে প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না এবং দার্শনিকদের কোন মতবিরোধও হবে না। একারনেই ইমাম আজম র. দেমাগকে আকল বা বিবেকের স্থান বলেছেন। শাহ সাহেব র. এর এ উক্তি হযরত ইবনে বাত্তাল র. এর উপরোক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস

এ হাদীসটি নেহায়েত আজীমুশশান। ইমাম নববী র. বুখারীর ব্যাখ্যায় লিখেছেন। এ হাদীসটি ইসলামের রোকনসমূহের একটি। এটি সে সব হাদীসের অন্তর্ভূক্ত যেগুলোর উপর ইসলাম নির্ভরশীল। এর ব্যাখ্যার জন্য অনেক দফতরের প্রয়োজন। অনেক আলিম এটিকে সমস্ত উসূলে ইসলামের এক তৃতীয়াংশ আর কেউ কেউ এক চতুর্থাংশ সাব্যস্ত করেছেন।

٤٠. بَاب أَدَاءُ الْخُمُسِ مِنْ الْإِيمَانِ

৪০. পরিচ্ছেদ ঃ গনীমতের এক পঞ্চমাংশ প্রদান ঈমানের অন্তর্ভুক্ত

٥١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضــ يُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْقَوْمُ أَوْ مَنْ الْوَفْدُ؟ قَالُوا رَبِيعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ وَسَأَلُوهُ عَنْ الْأَشْرِبَةِ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنْ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ وَقَالَ احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ .

৫১. আলী ইবনুল আ'দ র. .... আবূ জামরা র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস রা.- এর সঙ্গে বসতাম। তিনি আমাকে তাঁর আসনে বসাতেন। একবার তিনি বললেন ঃ তুমি আমার কাছে থেকে যাও, আমি তোমাকে আমার সম্পদ থেকে কিছু অংশ দেব। ফলে আমি দু' মাস তাঁর সঙ্গে অবস্থান করলাম। তারপর একদিন তিনি বললেন, আবদুল কায়েস-এর একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের? অথবা বললেন, কোন প্রতিনিধি দলের? তারা বলল, 'রাবী'আ গোত্রের।' তিনি বললেন ঃ মারহাবা সে গোত্র বা সে প্রতিনিধি দলের প্রতি, যারা অপদস্থ ও লজ্জিত না হয়েই এসেছে। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিষিদ্ধ মাসসমূহ ছাড়া অন্য কোন সময় আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না। (কারণ) আমাদের এবং আপনার মাঝখানে মুযার গোত্রীয় কাফিরদের বসবাস। তাই আমাদের কিছু সিদ্ধান্তমূলক স্পষ্ট হুকুম দিন, যাতে আমরা পরবর্তীদের তা জানিয়ে দিতে পারি এবং আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তারা পানীয় সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করল। তখন তিনি তাদের চারটি জিনিসের নির্দেশ এবং চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করলেন। তাদের এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আদেশ দিয়ে বললেন ঃ 'এক আল্লাহর প্রতি ঈমান কিভাবে হয় তা কি তোমরা জান?' তাঁরা বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।' তিনি বললেন ঃ 'তা

হল এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, রমযানের সিয়াম পালন করা; আর তোমরা গনীমতের মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করবে। তিনি তাদেরকে চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করলেন। তা হল ঃ সবুজ কলসী, শুকনো কদুর খোল, খেজুর গাছের গুঁড়ি থেকে তৈরীকৃত পাত্র এবং আলকাতরা জাতীয় জিনিসের পালিশকৃত পাত্র। রাবী বলেন, বর্ণনাকারী (مزفت -এর স্থলে) কখনও المقير শব্দ উল্লেখ করেছেন (উভয় শব্দের অর্থ একই)। তিনি আরো বলেন, তোমরা এগুলো ভাল করে আয়ত্ত করে নাও এবং অন্যদেরও এসব অবহিত করে দিও।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لأنه عقد الباب على جزء منه وهو قوله وان تعطوا من المغنم الخمس. عمدة

অর্থাৎ, শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল স্পষ্ট। কারণ, ইমাম বুখারী র. হাদীসের অংশ দ্বারাই শিরোনাম কায়েম করেছেন। সেটি হল, وان تعطوا من المغنم الخمس

যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য ঃ

এর পূর্বেকার শিরোনাম ছিল من استبرأ لدينه

এতে সে ব্যক্তির মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের বিবরণ ছিল যে, দীনি ব্যাপারে পরিচ্ছন্নতা রাখে। ইমাম বুখারী র. এবার এ অনুচ্ছেদে আবদুল কায়েস প্রতিনিধি দল কর্তৃক রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিখাদ ও নির্যাসমূলক কতগুলো কথা জানার বিষয় উল্লেখ করছেন। এধরণের কথা তলব করতে পারে সে ব্যক্তিই যার অন্তরে দীনি পরিচ্ছন্নতার আগ্রহ থাকে। এরূপ লোক আলিমদের মজলিসে উপস্থিত হয় এবং এরূপ কথা সর্বদা তালাশ করতে থাকে যা দুনিয়াতে শান্তি নিরাপত্তা, ইযযত, আর আখিরাতে জান্নাত লাভের জিম্মাদার হয়। -ফযলুল বারী।

২। পূর্বে সুস্পষ্ট হালাল ও সুস্পষ্ট হারামের বিবরণ ছিল। এ অনুচ্ছেদে যেন এর উদাহরণ দেয়া হয়েছে যে, স্পষ্ট হালাল সেটি যার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আর সুস্পষ্ট হারাম হল, সেটি যা থেকে সুস্পষ্টভাবে তিনি নিষেধ করেছেন। -উমদা।

৩। আরেকটি যোগসূত্র এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, পূর্বে দীনি ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের বিবরণ ছিল, সন্দেহজনক জিনিস থেকে বাঁচার তাকিদ ছিল, আর এ অনুচ্ছেদের হাদীসে যে সুনির্দিষ্ট পাত্র সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে এটি সতর্কতার কারনেই ছিল। -ইমদাদ

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ

আল্লামা আইনী র. এর মতে এ হাদীসটি নিম্নোক্ত স্থানসমূহে এসেছে- বুখারী, (১০ জায়গায়) ১. কিতাবুল ঈমান ঃ ১৩, ২. কিতাবুল ইলম ঃ ১৯, ৩. মাওয়াকীতুস সালাত ঃ ৭৫, ৪. কিতাবুয যাকাত ঃ ১৮৮, ৫. কিতাবুল জিহাদ ঃ ৪৩৬, ৪৩৭, ৬. কিতাবুল মানাকিব ঃ ৪৯৮, ৭. মাগাযী ঃ ৬২৬, ৬২৭, ৮. কিতাবুল আদব ঃ ৯১২, ৯. আখবার ওয়া আহাদ ঃ ১০৭৯, ১০. আত তাওহীদ ঃ ১০২৮।

প্রশ্নোত্তর ঃ এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, পূর্বে এরূপ অনেক অনুচ্ছেদ এসেছে যেগুলোতে ইমাম বুখারী র. ঈমানের অংশগুলোর বিবরণ দিয়েছেন। আর باب اداء الخمس من الايمان এর গভীর সম্পর্ক ছিল সে সব অনুচ্ছেদের সাথে। ইমাম বুখারী র. এর উচিত ছিল, সে সব অনুচ্ছেদের সাথে এ অনুচ্ছেদটিকে রাখা।

উত্তর ঃ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদগুলোতে ইমাম বুখারী র. সে সব ঈমানী অঙ্গগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর সম্পর্ক ঈমানের সাথে ছিল চিরস্থায়ী। যেমন, নামায, যাকাত, রোযা, ইত্যাদি। আর খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ পরিশোধ এরূপ একটি অংশ যার সম্পর্ক স্বতন্ত্র নয়, বরং কখনো কখনো। এবার শিরোনাম কায়েম করার ফলে এই সতর্কবাণী হতে পারে যে, ঈমানের অংশ গণ্য করার জন্য ঈমানের সাথে স্বতন্ত্রভাবে সে জিনিসের সম্পর্ক থাকা জরুরী নয়, বরং সে সব জিনিসও ঈমানের অংশ যেগুলো কখনো কখনো ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়।

كنت اقعد مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه হযরত আবু জামরা র. হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর শিষ্য এবং বিশিষ্ট সহচর। তিনি হলেন, তাবিঈ। তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর সাথে বসতাম।

আল্লামা আইনী র. বলেন-

يعني زمن ولايته البصرة من قبل على ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الخ

অর্থাৎ, এ ঘটনা তখনকার যখন হযরত ইবনে আব্বাস রা. হযরত আলী রা. এর খিলাফতকালে বসরার শাসক ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রা. আবু জামরা র. এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। এজন্য আবু জামরা র. কে নিজের পাশে সিংহাসনে বসাতেন। এ সম্মানের একটি কারণ এই ছিল যে, বসরা ছিল পারস্য সীমান্তে অবস্থিত। হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর নিকট পারস্যবাসীরা মামলা মুকাদ্দমা নিয়ে আসত আবু জামরা র. ফারসী ভাষা বুঝতেন। এ জন্য হযরত ইবনে আব্বাস রা. দোভাষী হিসেবে তাঁকে পাশে বসাতেন। এ জন্য কিতাবের দুই লাইনের মাঝে লেখা আছে, لانه كان يترجم لابن عباس الفارسية তা ছাড়া সহীহ বুখারীর কিতাবুল ইলমে ১৯ পৃষ্ঠায় আছে, عن ابي جمرة كنت اترجم بين ابن عباس وبين الناس الخ. অর্থাৎ আবু জামরা র. হযরত ইবনে আব্বাস রা. ও জনগণের মাঝে দোভাষীর কাজ আঞ্জাম দিতেন। কারণ, হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর ভাষা আরবী ছিল, আবু জামরা র. বসরায় বসবাস করার কারণে ফারসী ভাষা বিশেষজ্ঞও ছিলেন। (অর্থাৎ, তিনি আরবী, ফারসী উভয় ভাষায় দক্ষতা রাখতেন।)

اقم عندي حتى اجعل لك سهما الخ হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, তুমি আমার কাছে কিছু দিন অবস্থান কর, আমি তোমার জন্য আমার সম্পদ থেকে তোমার অংশ নির্ধারিত করব। এজন্য আমি তাঁর নিকট দু মাস অবস্থান করি।

দ্বিতীয় কারণ বুঝা যায়, সহীহ বুখারীর কিতাবুল হজ্ব ২২৮ পৃষ্ঠা অধ্যয়নে। ঘটনা হল, সাহাবায়ে কিরাম রা. হযত উমর ফারুক রা. এবং উসমান রা. কোন স্বার্থের কারণে হজ্বে তামাত্তু করতে নিষেধ করতেন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, কা'বা শরীফ যেন সারা বছর আবাদ থাকে। আশে পাশের লোক হজ্বের মওসুমে হজ্ব করবে আর উমরার জন্য করবে স্বতন্ত্র সফর। যখন আবু জামরা র. হজ্ব ও উমরা উভয়টির ইহরাম বেঁধে لبيك حجة وعمرة বলতে শুরু করেন, তখন কেউ কেউ তার উপর প্রশ্ন উত্থাপন শুরু করলেন, তখন হযরত আবু জামরা র. হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। স্বয়ং তাঁর মত ছিল তামাত্তু'এর পক্ষ্যে। এজন্য তাঁকে এর অনুমতি দিয়ে দেন। আবু জামরা র. প্রশান্ত হয়ে তামাত্তু'এর ইহরামে রওয়ানা হন। হজ্ব থেকে অবসর হওয়ার পর একদিন স্বপ্ন দেখলেন, কেউ বলছেন, حج مبرور و عمرة متقبلة অর্থাৎ, এই হজ্ব ও উমরা মকবুল।

ফিরে এসে আবু জামরা এই স্বপ্ন হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর নিকট বর্ণনা করলেন। ফলে ইবনে আব্বাস রা. খুবই আনন্দিত হলেন। স্বীয় মাযহাবের বিশুদ্ধতার ইয়াকীন বেড়ে গেল। তিনি বললেন, سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم

তাছাড়া এই স্বপ্ন দ্বারা আবু জামরা র. এর তাকওয়া ও নেককারীর অবস্থাও জানা গেল। এ জন্য হযরত ইবনে আব্বাস রা. আবু জামরা র. এর প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন। যেহেতু তিনি দোভাষীর কাজও করতেন সেহেতু নিজের মাল থেকে কিছু অংশ দেয়ারও মনস্থ করেন। সহীহ বুখারীতে (১/২১৩) এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এতে এতটুকু কথা বেশী আছে যে, আবু জামরা র. এর শিষ্য শো'বা র. বলেন, আমি আবু জামরা র. কে জিজ্ঞেস করলাম, لم؟ فقال للرويا التي رأيتها এতে বুঝা গেল, তাঁর প্রতি হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর সম্মান প্রদর্শনের কারণ ছিল সে স্বপ্ন। অন্যথায় দোভাষীর কাজ সম্পাদন এমন কোন বিষয় নয়, যার ফলে এতটা ইযযত সম্মান হতে পারে।

মোটকথা, হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর বলার ফলে আবু জামরা র. দুই মাস অবস্থান করেন। মুসলিম শরীফে আছে, একদিন নাবীযের পাত্র সংক্রান্ত মাসআলা জিজ্ঞেস করলে ইবনে আব্বাস রা. তাকে নিষেধ করেন। তখন এই প্রশ্নোত্তর শুনে আবু জামরা র. এর মনে হল, আমিও তো কলসীতে নাবীয তৈরী করি। আবু জামরা র. নিজের হাল অবস্থা হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর নিকট বর্ণনা করলেন। ফলে হযরত ইবনে আব্বাস রা. তাকে এই হাদীস শুনালেন।

ان وفد عبد القيس لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم الخ তা ছাড়া আবু জামরা র. ছিলেন আবদুল কায়েস গোত্রের সদস্য। এ জন্যও তাকে এ হাদীস শুনিয়েছেন।

আবদুল কায়েস প্রতিনিধি দল

আবদুল কায়েস গোত্র বসবাস করত বাহরাইনে। এই গোত্রের ব্যবসায়ী মুনকিয ইবনে হাইয়্যান পোষাক ও কাপড়-চোপড়ের ব্যবসা করতেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন, তখন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত হয়। তিনি তাকে বাহরাইনের সংবাদ জিজ্ঞেস করেন। বাহরাইনের অভিজাত ও শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের কুশলাদি নাম উল্লেখ করে করে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন। বিশেষতঃ সে গোত্র নেতা মুনযির ইবনে আয়িয (তাঁর উপাধি হল, মুনযির আল আশাজ্জ) এর হাল জিজ্ঞেস করেন। পক্ষান্তরে এ মুনযির ছিলেন মুনকিযের শ্বশুর। অতএব মুনকিয ইবনে হাইয়্যান ভীষন তাজ্জব হলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো কখনো বাহরাইন যান নি। তাহলে বাহরাইনের এ সব বিস্তারিত অবস্থা কি ভাবে জানতে পারলেন? অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে মুনকিয রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনতে থাকেন। ফলে তিনি ভীষন প্রভাবিত হন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তিনি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনকিযকে সূরা ফাতিহা ও আ'লাক তথা اقرأ باسم ربك শিক্ষা দেন। মুনকিয যখন বাড়ীর দিকে রওয়ানা হন, তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোত্র নেতাদের নামে চিঠি লেখিয়ে দেন। মুনকিয স্বদেশ বাহরাইনে যেয়ে স্বীয় ইসলামের কথা প্রকাশ করেননি। সুযোগের জন্য অপেক্ষমান ছিলেন। কিন্তু যখন নামাযের ওয়াক্ত হত, তখন ঘরে নামায পড়তেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন, মুনযির আল আশাজ্জের কন্যা। তাঁর অন্তরে এ বিষয়টি নিয়ে খটকা লাগল। তিনি তাঁর পিতার নিকট মুনকিযের কাজ

কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করলেন যে, এবার মুনকিযের মদীনা থেকে আগমনের পর রং ঢং পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তিনি হাত পা ধৌত করেন, অতঃপর কিবলামুখী হয়ে কখনো দাড়ান, কখনো ঝুকেন, কখনো যমিনে মাথা রাখেন। মুনযির এ অবস্থা শুনে জামাতা মুনকিযকে জিজ্ঞেস করলেন। নতুন কোন কিছু ঘটেছে? তিনি তখন পূর্ণ ইতিবৃত্ত শুনালেন। তিনি আরো বললেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার অবস্থা সম্পর্কেও বিশেষভাবে জিজ্ঞেস করেছেন। এতদশ্রবণে মুনযির আল আশাজ্জ ইসলামে দীক্ষিত হন। হযরত মুনকিয রা. এর তাবলীগে একটি দল ইসলাম গ্রহণ করে। ৪০ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হন ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সামান্য পূর্বে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, مرحبا بالوفد অর্থাৎ, খোশ আমদেদ-স্বাগতম। প্রতিনিধিদল আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ও আপনার মাঝে রয়েছে মুযারের কাফিরদল। এজন্য আমরা হারাম মাস (যিলক্বদ, যিলহজ্ব, মুহররম, রজব) ছাড়া আপনার দরবারে উপস্থিত হতে পারিনা। কাজেই আমাদেরকে এরূপ অকাট্য ও স্পষ্ট কিছু কথা বলে দিন, যেগুলো সম্পর্কে আমরা আমাদের পরবর্তীদেরকে সংবাদ দিতে পারি এবং এর উপর আমল করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। সে প্রতিনিধি দল পানপাত্রগুলো সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করেছিলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে চারটি জিনিসের নির্দেশ দেন এবং চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করেন।

প্রশ্নোত্তর ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, ইজমালে চারটি জিনিসের উল্লেখ রয়েছে, বিস্তারিত বিবরনে রয়েছে পাঁচটি জিনিস। ঈমান, নামায, যাকাত, রোযা এবং মালে গনীমতের এক পঞ্চমাংশ। অতএব ইজমাল ও তাফসীলে মিল হল না।

উত্তর ঃ এর বিভিন্ন উত্তর দেয়া হয়েছে।

১। মূলনীতি হল, যখন কোন কথা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয় এবং অধীনস্থরূপে প্রসঙ্গক্রমে কোন কথা এসে যায়, তখন প্রাসঙ্গিক বিষয়টিকে হিসেবে গণ্য করা হয় না। শুধু মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। আবদুল কায়েসের এ প্রতিনিধি দল যেহেতু মুসলমান ছিল, যেমন তাদের উক্তি الله ورسوله اعلم দ্বারা স্পষ্ট, সেহেতু তাঁরা ঈমান সম্পর্কে ভাল করে ওয়াকিফহাল ছিলেন। অতএব শাহাদতদ্বয়ের উল্লেখ ছিল প্রাসঙ্গিক ও তাবাররুক স্বরূপ। এটি স্বতন্ত্রভাবে হিসেবে ধর্তব্য হবে না।

২। ان تؤدوا خمسا من المغنم এটি আলাদা কোন জিনিস নয়, বরং যাকাতের তাফসীলে অন্তর্ভূক্ত কাজেই যাকাত তো সুনির্দিষ্ট এবং সর্বদা উসূল করা হয়। আবার কোন কোন সময় যখন মালে গনীমত অর্জিত হয়, তা থেকেও দিতে হয়।

৩। কেউ কেউ বলেন, রেওয়ায়াতে চারটি থেকে শুধু একটির উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহর প্রতি ঈমানের। অবশিষ্ট বিষয়গুলো ঈমানের তাফসীর বা ব্যাখ্যা। বাকী তিনটি বিষয় বর্ণনাকারী সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে কিংবা ভুলক্রমে ছেড়ে দিয়েছেন।

৪। কেউ কেউ বলেন, ইবারতে আগপিছ হয়েছে। মূল ইবারত হল, مرهم بالايمان بالله وحده وامرهم باربع واقام الصلوة الخ. এ জন্য ইমাম বুখারী র. আল আদাবুল মুফরাদে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তাতে অনুরূপ রয়েছে। অতএব ইজমাল ও তাফসীলের মিল হয়ে গেল।

শাব্দিক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ঃ

خزايا -- خزيان এর বহুবচন। অর্থ অপদস্ত, অপমানিত। যেমন, حيارى - حيران এর বহুবচন, ندامى ندمان – তথা লজ্জিত এর বহুবচন। উদ্দেশ্য হল, না তোমরা অপমান হয়ে এসেছো, না লজ্জিত হয়ে। অপমান এ জন্য হও নি যে, তোমরা নিজে নিজে এসেছো, গ্রেফতার হয়ে আসনি। লজ্জা ও শরম এ জন্য হয়নি যে.

তোমরা আমাদের সাথে কখনো মুকাবিলা করনি। যদি আমাদের ও তোমাদের সাথে পূর্বে লড়াই হত, তবে আজকে আমাদের কাছে আসতে তোমাদের লজ্জা অনুভব হত।

حَنْتَم হা এর উপর যবর, নূন সাকিন, তা এর উপর যবর। এর অর্থ মটকা, কলসী। শরাবের মটকা যেহেতু অধিকাংশ সময় সবুজ রং এর হয়ে থাকে, এজন্য এর তরজমা করা হয়, সবুজ মটকা।

دُبَّاء দালের উপর পেশ, বা এর উপর তাশদীদ ও যবর- মদ ও কসর উভয়ভাবে বর্ণিত আছে- অর্থাৎ, কদুর খোলস। কদুকে সে গাছে রেখেই শুকিয়ে ফেলে, অতঃপর তার ভিতর থেকে ফোকলা করে দেয়া হয়। ভিতর থেকে বিচিগুলো বের করে ফেলা হয়। এভাবে এটিকে পাত্র বানানো হয়।

نَقِيْر নূনের উপর যবর, ক্বাফের নিচে যের, ইয়ায়ে সাকিন। এখানে نقير শব্দটি منقور এর অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ হল, খেজুর গাছের গোড়া খোদাই করে তৈরী পাত্র।

مُزَفَّت মীমে পেশ, ফা এর উপর তাশদীদ সহকারে। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে- مُقَيَّر উভয়টির অর্থ এক। আলকাতরা জাতীয় তেলের প্রলেপযুক্ত পাত্র। مُزَفَّت শব্দটি زفت থেকে এসেছে। আর مُقَيَّر শব্দটি এসেছে, قارقير থেকে। আর قار বলে قير কে। এটি আলকাতরা জাতীয় এক প্রকার তেল। বসরা থেকে আসত। এটি নৌকা ইত্যাদিতে ছিদ্র বন্ধ করার জন্য ব্যবহার করা হত।

মাসআলা ঃ

হানাফী, শাফিঈগণের মতে পাত্র হারাম হওয়ার বিষয়টি রহিত হয়ে গেছে। হাম্বলী ও মালিকীদের মতে এখনো এ পাত্রগুলো সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তাদের প্রমাণ হল, হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বসরার গভর্নর থাকা কালে যখন এসব পাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তখন তিনি এ হাদীস শুনিয়েছেন- এর দ্বারা বুঝা গেল এ হুকুম রহিত হয়নি।

হানাফী ও শাফিঈদের পক্ষ্য থেকে এই বলা হয় যে, এ হাদীসটি রহিত। হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর রহিত হওয়ার কথা জানতেন না। এ হিসেবে তিনি এর বিবরণ দিয়েছেন। রহিত হওয়ার প্রমান মুসলিম শরীফের একটি হাদীস। তাতে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كنت نهيتكم عن الانتباذ في الاسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. ارشاد الساري : ١/٢٥٣.

٤١. بَاب مَا جَاءَ إِنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيْمَانُ وَالْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالْأَحْكَامُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَلَى نِيَّتِهِ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ-

৪১. পরিচ্ছেদ ঃ আমল নিয়ত ও সওয়াবের আশা অনুযায়ী।

প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্য তার নিয়ত অনুযায়ী। অতএব, ঈমান, ওযু, নামায, যাকাত, হজ্জ, রোযা এবং অন্যান্য আহ্‌কাম সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ .

বলুন, প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী আমল করে থাকে। (১৭ ঃ ৮৪)

شاكلته অর্থাৎ, নিয়ত অনুযায়ী। মানুষ তার পরিবারের জন্য সওয়াবের নিয়তে যা খরচ করে, তা সদকা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, (এখন মক্কা থেকে হিজরত নেই) তবে কেবল জিহাদ ও নিয়ত বাকী আছে।

যোগসূত্র ঃ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে রয়েছে, আবদুল কায়েস প্রতিনিধিদল প্রশ্ন করেছিল, আমাদের এরূপ কিছু বিষয় বলে দিন, যার ফলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কয়েকটি আমল বাতলে দিয়েছেন। এবার ইমাম বুখারী র. এ অনুচ্ছেদে বলতে চান যে, এসব আমল জান্নাতে প্রবেশের কারণ তখন হবে, যখন নিয়ত বিশুদ্ধ হবে।

২. অথবা বলা হবে, ঈমানের শাখা প্রশাখাগুলোর বিবরণের পর ইমাম বুখারী র. বলতে চান এ সব জিনিস ঈমানের শাখা তখন হতে পারবে যখন খালিস আল্লাহর জন্য হবে। -ইমদাদুল বারী।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্যে কাররামিয়া সম্প্রদায়ের মতখণ্ডন। যারা শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তিকেই ঈমান বলে। মতখন্ডনের বিশদ বিবরণ হল, الايمان عمل وكل عمل لا بدله من النية فالايمان لا بد له من النية، على شاكلته على نيته

ইমাম বুখারী র. شاكلته এর ব্যাখ্যা نية দ্বারা করেছেন। কিন্তু شاكلته এর আসল অর্থ হল, স্বাভাবিক সম্পর্ক ও মিল। কারণ, প্রতিটি মানুষ স্বীয় স্বভাবজাত সম্পর্ক ও ঝোক অনুযায়ী আমল করবে। আল্লামা আইনী র. বলেন- وقال الليث الشاكلة من الامور ما وافق فاعله والمعنى ان كل احد يعمل على طريقته التي تشاكل اخلاقه الخ. عمدة : ١/٣١٥. অর্থাৎ, প্রতিটি ব্যক্তি স্বীয় চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্য রাখে এরূপ পদ্ধতিতেই আমল করে। যেমন, কাফির তার পদ্ধতির সাথে মিল খায় এরূপ কাজ করে, আল্লাহর নেয়ামত থেকে বিমূখিতা, বিপদের সময় নৈরাশ্য ও মন ভাঙ্গা ইত্যাদি।

আর মু'মিন তার পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করে। الاناء يترشح بما فيه

٥٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ رضـــ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ .

৫২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা র. ..... হযরত উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্য তার নিয়ত অনুযায়ী হয়। অতএব, যার হিজরত হবে আল্লাহ্ ও তদ্বীয় রাসূলের উদ্দেশ্যে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হয়েছে বলেই গণ্য হবে। বস্তুতঃ যার হিজরত হয় দুনিয়া অর্জনের জন্য বা কোন নারীকে বিয়ে করার জন্য, তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে যে নিয়তে সে হিজরত করেছে।

٥٣. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضـــ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ .

৫৩. হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল র. ...... হযরত আবূ মাসঊদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষ তার পরিবারের জন্য সওয়াবের নিয়তে যখন ব্যয় করে তখন তা হয় তার জন্য সদকা স্বরূপ।

٥٤. حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ .

৫৪. হাকাম ইবনে নাফি' র. .... হযরত সাদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যা-ই ব্যয় কর না কেন, তোমাকে তার সওয়াব অবশ্যই দেয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও, তার (সওয়াব)ও।'

শিরোনামের সাথে মিল ঃ ইমাম বুখারী র. শিরোনামে তিনটি জিনিস উল্লেখ করেছেন- ১. الاعمال بالنية ২. الحسبة (নিয়ত অন্তরে হাযির রাখা) ৩. لكل امرئ ما نوى

এতিনটির জন্য ক্রমানুপাতে তিনটি হাদীস নিয়েছেন, এ হাদীসের মিল শিরোনামের শুরুর সাথে তথা- الاعمال بالنية এর সাথে স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ এর জন্য বুখারী শরীফের প্রথম হাদীস দ্রষ্টব্য।

৫৩ নং হাদীসের অর্থ উপরে এসেছে।

نفقة الرجل মুবতাদা, আর يحتسبها হাল, صدقة খবর।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মিল দ্বিতীয় অংশে। অর্থাৎ, اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهي له صدقة

পরিবার পরিজনের ব্যয় একটি সামাজিক বিষয়। মানুষ পরিবার পরিজন ও সন্তানাদির পিছনে ব্যয় করে স্বভাবজাত আবেদনের কারণে। এজন্য হতে পারে এতে সওয়াবের কল্পনাও হবে না। এজন্য احتساب শব্দ দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে যে, এগুলোতেও নেক নিয়ত ও সওয়াব অর্জনের কথা অন্তরে থাকলে মানুষ সওয়াবের অধিকারী হবে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ঈমান ঃ ১৩, মাগাযী ঃ ৫৭১, কিতাবুন নাফাকাত ঃ ৮০৫।

৫৪ নং হাদীসের অর্থ উপরে এসেছে।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে এ হাদীসের মিল তৃতীয় অংশে অর্থাৎ, لكل امرئ ما نوى বাক্যে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৩, জানায়িয ঃ ১৭৩, ওয়াসায়া ঃ ৩৮৩, ৫৬০, ৬৩২-৬৩৩, ৮০৬, ৮৪৬, ৯৪৩, ৯৯৭।

٤٢ . بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِه وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ وَقَوْلِه تَعَالَى إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِه .

৪২. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

'দীন হল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কল্যাণ কামনা করা ও তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য এবং সকল মুসলিমের জন্য। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِه .

'যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি তাদের খুলুস বা অবিমিশ্র অনুরাগ থাকে। (৯ ঃ ৯১)

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ এ অনুচ্ছেদে ইমাম বুখারী র. দুটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু প্রথম রেওয়ায়াত النصيحة لله ولرسوله ولائمة الْمُسْلِمِينَ বুখারীর শর্তে উন্নীত নয়, ফলে এটিকে শিরোনামের অংশ বানানো হয়েছে এবং আয়াতে কারীমা পেশ করে সে ক্ষতিপূরণ করেছেন।

الدين النصيحة নসীহত শব্দটিকে দীনের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারী র. এর মতে দীন ও ঈমান এক। অতএব الايمان النصيحة হল। যেহেতু নসীহতের অর্থ হল, ইখলাস। আর ইখলাসের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এজন্য ঈমানেরও বিভিন্ন স্তর হল। যার ফলে ঈমানে হ্রাস বৃদ্ধির বিষয়টিও পরিস্কার হয়ে গেছে। যেহেতু এটি কিতাবুল ঈমানের সর্বশেষ অনুচ্ছেদ, সেহেতু ইমাম বুখারী র. যে কিতাবুল ঈমান কায়েম করেছেন এর শুরু ও শেষ যোগসূত্র পূর্ণ হয়ে গেল।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র ঃ আগের অনুচ্ছেদে নিয়তের গুরুত্বের বিবরণ ছিল। এ অনুচ্ছেদে বলতে চান, প্রতিটি বিষয়ে ইখলাস জরুরী। চাই আল্লাহ সংক্রান্ত বা রাসূল সংক্রান্ত অথবা মুসলমানদের ইমাম বা শাসক সংক্রান্ত বা সাধারণ মুসলমান সংক্রান্ত বিষয়ই হোক না কেন। এর পদ্ধতি হল, কোন বিষয়ে যেন ধোকাবাজি অথবা খুঁত এর লেশ না থাকে।

٥٥. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضـ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

৫৫. মুসাদ্দাদ র. ...... হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ আল-বাজালী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বায়'আত হয়েছি নামায কায়েম করার, যাকাত দেয়ার এবং সকল মুসলিমের কল্যাণ কামনা করার জন্য।

٥٦. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضـ يَقُولُ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رضـ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمْ الْآنَ ثُمَّ قَالَ اسْتَعْفُوا لِأَمِيرِكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ

يُحِبُّ الْعَفْوَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَشَرَطَ عَلَيَّ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَبَايَعْتُهُ عَلَى هَذَا وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ إِنِّي لَنَاصِحٌ لَكُمْ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ .

৫৬. আবূ নু'মান র. ...... হযরত যিয়াদ ইবনে 'ইলাকা র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রা. যেদিন ওফাত লাভ করেন সেদিন আমি জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ রা.-এর কাছ থেকে শুনেছি, (মিম্বরে) দাঁড়িয়ে তিনি (প্রথমতঃ) আল্লাহর প্রশংসা করে (জনগণকে) বললেন, তোমরা ভয় কর এক আল্লাহকে, যাঁর কোন অংশীদার নেই, এবং (নতুন) কোন আমীর না আসা পর্যন্ত শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখ-প্রশান্ত থাক, শীঘ্রই তোমাদের আমীর আসবেন। এরপর জারীর রা. বললেন, তোমাদের (মরহুম) আমীরের জন্য মাগফিরাত কামনা কর। কারণ, তিনি ক্ষমা করা পছন্দ করতেন। তারপর (হামদ সালাতের পর) বললেন, (শুনো,) একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললাম, আমি আপনার কাছে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করতে চাই। তিনি (অন্যান্য বিষয়ের সাথে) আমার ব্যাপারে শর্ত আরোপ করলেন ঃ ইসলামের উপর অটল থাকবে আর সকল মুসলমানের কল্যাণ কামনা করবে। তারপর আমি তাঁর কাছে এ শর্তের উপর বায়'আত হলাম। এ মসজিদের রবের কসম! আমি তোমাদের কল্যাণকামী। এরপর তিনি আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করলেন এবং (মিম্বর থেকে) নামলেন।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে মিল والنصح لكل مسلم বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ঈমান ঃ ১৩, ১৪, ৭৫, ১৮৮, ২৮৯, ৩৭৫, ১০৬৯।

৫৬ নং হাদীসের অর্থ উপরে এসেছে।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে মিল والنصح لكل مسلم বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪, ৩৭৫।

ব্যাখ্যা ঃ نصيحة শব্দটি ইসমে মাসদার। এর আসল অর্থ হল, ইখলাস باب فتح থেকে نصحا و نُصحا অর্থাৎ, মুখলিস বা আন্তরিক হওয়া। শব্দটি দুভাবে ব্যবহৃত হয়। ১. হল نصح الثوب কাপড় সেলাই করা। নসীহত দ্বারাও যার জন্য শুভ কামনা করা হয় তার মন্দ অবস্থার সংশোধন হয়। সে জন্য তাওবায়ে নাসূহ এর অর্থ হল, খালেস তাওবা। যেন গুনাহের কাজসমূহ দীনের পোশাককে ছিড়ে ফেলে আর তাওবা এটিকে ঠিক করে দেয়।

২. অথবা এটি نصح العسل থেকে এসেছে। যখন মধুকে মোম ইত্যাদি থেকে পরিস্কার করা হয়, তখন বলে, نصحت العسل নসীহত বা শুভাকাংখা দ্বারাও মন্দত্ব দূর করা হয়।

আল্লামা খাত্তাবী র. বলেন, নসীহত একটি ব্যাপক শব্দ। যার অর্থ হল, যে ব্যক্তির জন্য শুভ কামনা করা হয় তার পূর্ণ হক আদায় করা।

النصيحة لله আল্লাহ তা'আলার সাথে খুলূস বা অনুরাগ-আন্তরিকতা হল, তাকে এক-লা শরীক মেনে নেয়া। তার সমস্ত পূর্ণাঙ্গ গুনাবলী আছে বলে মেনে নেয়া। সমস্ত ক্রটি ও ময়লা থেকে পবিত্র মনে করা। গোটা জীবনকে তার গোলামী ও দাসত্বে লাগানো।

ولرسوله রাসূলের সাথে খুলূস হল, তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করা। তাঁর আনীত বিষয়গুলোর সত্যায়ন করা। নিজের সমস্ত খাহেশাতকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত শরীয়তের অনুগত করে দেয়া। যেমন, ইরশাদে নববী রয়েছে - لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা'জীম সম্মানে কোন প্রকার ক্রটি না করা। দরূদ শরীফের প্রতি গুরুত্বারোপ করা।

ولائمة المسلمين ইমাম দু প্রকার। ১. ইলম ও হেদায়াতের ইমাম, ২. শাসক শ্রেণী।

প্রথম প্রকারের সাথে খুলূস হল, তাদের ইলম দ্বারা উপকৃত হওয়া। তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। যদি তাঁদের অনুসারীও না হয় তারপরেও তাদের সামনে বে আদবী না করা। কারণ, তাদের শানে বে আদবীর পরিণতি অত্যন্ত বিপদজনক হয়ে থাকে।

রাজনৈতিক নেতা বা শাসকদের সাথে খুলূস হল, হক্বের ব্যাপারে তাদের আনুগত্য ও সহযোগিতা করা। আর যদি শরীয়ত পরিপন্থী কাজ করতে শুরু করে তাহলে সুন্দর চেষ্টা ও সুন্দর পন্থায় বুঝানোর চেষ্টা করা।

وعامتهم আর সাধারণ মুসলমানদের সাথে খুলূস হল, সবার জন্য তাই পছন্দ করা যা নিজের জন্য পছন্দ করে। এর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, لايؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. হাদীস দ্বারা। আল্লামা আইনী র. الدين النصيحة সম্পর্কে বলেন-

هذا حديث عظيم عليه مدار الاسلام فيكون هذا ربع الاسلام ومنهم من قال يمكن ان يستخرج منه الدليل على جميع الاحكام. عمدة

يوم مات المغيرة الخ : كان المغيرة واليا على الكوفة في خلافة معاوية رضي الله عنه وكانت وفاته سنة خمسين من الهجرة واستناب عند موته ابنه عروة وقيل استناب جريرا المذكور ولهذا خطب الخطبة المذكورة. فتح الباري

যখন হযরত মু'আবিয়া রা. হযরত মুগীরা রা. এর ওফাতের সংবাদ পান, তখন তিনি যিয়াদকে লিখলেন, তুমি আমীর হয়ে কুফায় চলে যাও। যিয়াদ ছিল তখন বসরায় হযরত মু'আবিয়া রা. এর স্থলাভিষিক্ত-প্রতিনিধি।

هذا المسجد এর দ্বারা বুঝা যায়, হযরত জারীর রা. মসজিদে হয়ত খুৎবা দিয়েছিলেন এবং এটি কুফার সে মসজিদই উদ্দেশ্য হবে। কিন্তু তাবারানীর রেওয়ায়াতে ورب الكعبة ইবারত আছে, যদ্বারা প্রমাণিত হল যে, هذا المسجد দ্বারা উদ্দেশ্য মসজিদে হারাম। অন্তরে এটি উপস্থিত থাকার কারনে এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

উপকারিতা ঃ হাফিজ ইবনে হাজার র. বলেন, ইমাম বুখারী র. এর একটি মূলনীতি এটিও রয়েছে যে, প্রতিটি পর্বের শেষে এরূপ রেওয়ায়াত আনেন, যদ্বারা পর্ব শেষ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত হয়। এজন্য এ স্থানেও استغفر ونزل দ্বারা শুভ সমাপ্তির দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কারণ, যখন মিম্বর থেকে তিনি নিচে নামেন তখন যা কিছু বলছিলেন, তা সমাপ্ত হয়ে যায়।

হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া র. বলেন, ইমাম বুখারী র. প্রতিটি পর্বের শেষে মানুষের সমাপ্তির দিকে ইঙ্গিত করেন। যেরূপভাবে এ পর্ব শেষ হয়েছে তুমি দেখ, এরূপভাবে তোমারও পর্ব শেষ হয়ে যাবে। كل من عليها فان উভয় উক্তিতে কোন পারস্পরিক বিরোধ নেই। হতে পারে উভয় বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত। আলহামদুলিল্লাহ ঈমান পর্ব সমাপ্ত হয়েছে।

والحمد لله أولا وآخرا

كِتَابُ الْعِلْمِ
ইলম পর্ব

ইমাম বুখারী র. স্বীয় গ্রন্থ সহীহ বুখারীর সূচনা করেছেন باب بدء الوحي দ্বারা। এতে ওহীর আজমত, সত্যতা ও পবিত্রতা আর হক্কানিয়্যাতের বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। কারণ, আকাইদ হোক বা আহকাম, ইবাদত হোক বা লেনদেন, সমস্ত কিছুর উৎস ও ভান্ডার এবং সমস্ত হক্ব ইলম ও মা'রিফাতে ইলাহীর ঝর্ণাধারা হল শুধু ওহী। এরপর কিতাবুল ঈমান এনেছেন। কারণ, ঈমান ছাড়া কোন কিছু ধর্তব্য হয় না। বান্দার উপর খালিক ও মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যে সব হক্ব রয়েছে তম্মধ্যে সর্বপ্রথম ও আসল মৌলিক জিনিস হল ঈমান। ঈমান ছাড়া আল্লাহ তা'আলার নিকট আমল ও ইবাদতের কোন ওজন ও কদর নেই। অতএব সমস্ত আমলের জন্য মূল বুনিয়াদ হল ঈমান। এজন্য এটিকে অন্য সব জিনিসের আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এবার যখন এক ব্যক্তি ঈমান আনয়ন করেছে, তখন ঈমান আনয়নের অর্থ হল, সে নিজের উপর আল্লাহর আনুগত্য আবশ্যক করে নিয়েছে। আনুগত্যের অর্থ হল, আল্লাহ তা'আলার সমস্ত মর্জি অনুযায়ী কাজ করা। যেগুলো তাঁর মর্জিমত নয় সেগুলো বর্জন করা। স্পষ্ট বিষয় যে, এটা ইলমের মাধ্যমেই অর্জন হবে। অতএব কিতাবুল ঈমানের পর ইলম পর্ব এনেছেন এবং এরূপ একটি আয়াতও এখানে এনেছেন, যাতে ঈমানের পর ইলমের উল্লেখ রয়েছে। অতএব ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য হবে, আল্লাহর মর্জি জানা। কাজেই কিতাবুল ইলমের অধীনে এই ইলমের ফাযায়েল এবং এর হক্ব, আদব ও অর্জনের পন্থা বাতলিয়েছেন। এরপর সর্ব প্রথম ফযলে ইলমের তথা ইলমের মর্যাদার অনুচ্ছেদ রেখেছেন যাতে শখ ও আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

علم سي بڑہ کر کوئي طاقت نہيں ÷ جہل سي بڑہ کر کوئي آفت نہيں.

এর দ্বারা ইমাম বুখারী র. এর সুন্দর তারতীব ও দৃষ্টির সুক্ষ্ম অনুমান ভাল মতে হয়ে যায়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

٤٣. بَاب فَضْلِ الْعِلْمِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَرْفَعْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.

৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ ইলমের ফযীলত ও

আল্লাহ তা‘আলার বাণী ঃ

يَرْفَعْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদের মর্যাদা বাড়াবেন; তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।’ ৫৮ ঃ ১১)

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْماً

‘হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।’ (২০ ঃ ১১৪)

ব্যাখ্যা ঃ আয়াতে কারীমা দ্বারা ঈমান ও ইলমের মাঝে যোগসূত্র জানা গেছে এবং এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, ঈমান ও ইলমের কারণে দরজা বুলন্দ হয়।

আয়াতে কারীমায় وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ এর উপর اَلَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ এর আতফ হওয়া মানে আমের উপর খাসের আতফ। এটি অবস্থার গুরুত্ব বুঝায়। ঈমান ছাড়া ইলম উপকারী নয়। যেমন, কুরআনে কারীমে আছে-

يَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ. بقرة

একজন সাধারণ ঈমানদার বড় জবরদস্ত আলিম অপেক্ষা লাখো গুণ উত্তম।

অনুচ্ছেদ ইলমের ফযীলত ঃ

ইমাম বুখারী র. অধিকাংশ সময় সহীহ বুখারীর শিরোনামগুলোতে বরকতস্বরূপ এবং প্রমাণস্বরূপ কুরআনে হাকীমের আয়াত পেশ করেন। এ অনুচ্ছেদেও দুটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। এগুলো দ্বারা ইলমের ফযীলত প্রমাণিত হয়। প্রথম আয়াতটি সূরা মুজাদালার। এতে পুর্বে তো মজলিসের আদবের বিবরণ ছিল।

يَاۤيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ. سورة مجادلة ١١.

এ আয়াতে দুটি জিনিসের কথা বলা হয়েছে- ১. প্রশস্ত হয়ে বস, অর্থাৎ, যখন মজলিসে কেউ পরে আসে তখন মুসলমানরা তাদের জন্য জায়গা দেয়ার চেষ্টা করবে। এরূপ করলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য প্রশস্ততা ও উদারতা সৃষ্টি করবেন।

এ আয়াতে দ্বিতীয় হুকুম হল, মজলিসের আদব সংক্রান্ত। সেটি হল, যখন তোমাদের কাউকে বলা হয় যে, মজলিস থেকে উঠে যাও, তবে তার উঠে যাওয়া উচিত। এ আয়াতে قيل মাজহূল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর উল্লেখ নেই যে, এ কথা কে বলবে, কিন্তু সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায়, স্বয়ং আগন্তুক ব্যক্তির জন্য স্বীয় স্থানের উদ্দেশ্যে কাউকে তার স্থান থেকে উঠানো জায়িয নেই।

সহীহ বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি যেন অন্য কাউকে তার স্থান থেকে উঠিয়ে সে স্থানে না বসে। বরং, মজলিসে প্রশস্ততা সৃষ্টি করে আগন্তুককে জায়গা দিবে। এর দ্বারা বুঝা গেল, কাউকে তার স্থান থেকে উঠে যাওয়ার জন্য বলা আগন্তুকের জন্য জায়িয নেই। অবশ্য মজলিসের আমীর বা মজলিসের ব্যবস্থাপক যদি উঠে যেতে বলেন, তবে উঠে যাওয়া উচিত। -মা'আরিফুল কুরআন ঃ ৮ম খন্ড।

এর জাযা কি? يرفع الله الذين آمنوا الاية **আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে মু'মিন ও আলিমদের দরজা বুলন্দ** করে দিবেন।

অতএব ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য ইলমের ফযীলত প্রমাণ করা সাব্যস্ত হয়ে যায়। তাছাড়া এ ব্যাপারেও তিনি সতর্ক করেছেন যে, ঈমানের পর ইলমের বিবরণ কেন এনেছেন। কারণ, এ আয়াতে ঈমানের পর ইলমের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

والله بما تعملون خبير এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তা'আলা খবরদার ও সবিশেষ জ্ঞানের অধিকারী যে, কোন স্তরের ইলমের অধিকারী এবং কোন স্তরের ব্যক্তি, সে হিসেবে আমিও তার মরতবা উঁচু করব।

رب زدني علما এর দ্বারা ইলমের ফযীলত এ ভাবে প্রমাণিত হয় যে, সাইয়্যিদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জ্ঞান দান করা হয়েছে। তাঁকেও অতিরিক্ত ইলম অন্বেষনের জন্য শিখানো হচ্ছে। এর দ্বারা বুঝা যেতে পারে যে, ইলম কত বড় দৌলত!

بني آدم از علم يابد كمال ÷ نه از حشمت وجاه ومال ومنال.

رتبه آدم كو ملا هي اس علم سي ÷ خاك كي تو خاك بهي عظمت نهين.

প্রশ্ন ঃ যেহেতু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলম পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণতম ছিল, সেহেতু অতিরিক্ত জ্ঞান অন্বেষনের কি অর্থ?

উত্তর ঃ এখানে ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর মা'রিফাতের সেসব স্তর যার কোন শেষ নেই।

প্রশ্ন ঃ এখানে ইমাম বুখারী র. শিরোনাম কায়েম করেছেন, কিন্তু কোন হাদীস নেননি।

উত্তর ঃ হয়তো ইমাম বুখারী র. স্বীয় শর্ত অনুযায়ী কোন হাদীস পাননি। এজন্য শুধু আয়াত উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন।

২. ইমাম বুখারী র. কোথাও কোথাও শিরোনাম কায়েম করে রেওয়ায়াত উল্লেখ করেন না। যদ্বারা হাদীসের ছাত্রদের পরীক্ষা, প্রশিক্ষন ও মেধা তেজ করা উদ্দেশ্য হয়। যাতে এর সাথে সঙ্গত কোন রেওয়ায়াত নিজ থেকে তালাশ করে নেয়। যেমন, من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. مسلم : ١/٣٤٥.

٤٤. بَاب مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِي حَدِيثِهِ فَأَتَمَّ الْحَدِيثَ ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ

৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ যার নিকট কোন ইলমী প্রশ্ন করা হয়েছে অথচ সে তার কথায় রত, তবে নিজের কথা শেষ করে অতঃপর প্রশ্নকারীর উত্তর দিবে।

٥٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ح و حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضـــ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ أَيْنَ أُرَاهُ السَّائِلُ عَنْ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ .

৫৭. মুহাম্মদ ইবনে সিনান র. ও ইবরাহীম ইবনুল মুনযির র. .... হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিসে সাহাবায়ে কিরাম রা. এর সামনে কিছু আলোচনা করছিলেন। এ পর্যায়ে তাঁর কাছে জনৈক বেদুঈন এসে প্রশ্ন করলেন, 'কিয়ামত কবে হবে?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আলোচনায় রত রইলেন (প্রশ্নকারীর দিকে মনোযোগী হলেন না)। এতে উপস্থিত কেউ কেউ বললেন, লোকটি যা বলেছে তিনি তা শুনেছেন, কিন্তু (আলোচনার মাঝে) তার কথা পসন্দ করেন নি। আর কেউ কেউ বললেন, না, বরং তিনি শুনতেই পাননি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচনা শেষ করে বললেন ঃ 'কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়?' সে (বেদুঈন) বলল, 'এই যে আমি হাজির, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ (শুনো) 'যখন আমানত নষ্ট করা হবে তখন তুমি কিয়ামতের প্রতীক্ষা করবে।' সে বলল, 'কিভাবে আমানত নষ্ট করা হবে?' তিনি বললেন ঃ 'যখন লেনদেনের কাজ কর্মের দায়িত্ব অযোগ্য লোকের প্রতি ন্যস্ত হতে আরম্ভ হবে, তখন তোমার উচিৎ কিয়ামতের প্রতীক্ষা করা।'

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল جاءه اعرابي فقال متى الساعة؟ বাক্যে স্পষ্ট। অর্থাৎ, বেদুঈন প্রশ্ন করেছে এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উত্তর দিয়েছেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ইলম ঃ ১৪, রিকাক ঃ ৯৬১, আল্লামা আইনী র. বলেন, و لم يخرجه من أصحاب الستة غيره.

যোগসূত্র ঃ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে ইলমের ফযীলত এবং ইলম বৃদ্ধি কামনার বিবরণ ছিল। ইমাম বুখারী র. এটির বিবরণ দিয়েছেন আয়াতে কুরআনীর আলোকে। এ অনুচ্ছেদে ইলম অর্জনের পদ্ধতি বাতলে দিচ্ছেন এবং শিক্ষক ও ছাত্রকে শেখা ও শেখানোর আদব ও পদ্ধতি শেখাচ্ছেন।

হাদীসের রাবীদের সতর্কতা অবলম্বন ঃ قال اراه اين السائل

أُراه - হামযার উপর পেশ। এর অর্থ হল, এ সন্দেহ হয়েছে মুহাম্মদ ইবনে ফুলাইহের। অন্যথায় ফুলাইহের অন্য শিষ্য থেকে নিঃসন্দেহে বর্ণিত আছে, اين السائل؟. عمدة، فتح، قس -

এটা মুহাদ্দিসীনে কিরামের পূর্ণ সতর্কতা যে, যদি উস্তাদের শব্দে সন্দেহ হয়ে যায়, তবে তা সন্দেহ সহকারেই বর্ণনা করেন, এমনিভাবে যদি উস্তাদ শুধু বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেন, বংশের কথা উল্লেখ না করেন, তবে তাঁরা يعني ابن فلان বাক্য উল্লেখ করেন, যাতে একথা জানা যায় যে, এটি ছাত্রের পক্ষ থেকে পরিচয়ের উদ্দেশ্যে সংযুক্তি।

قال فاذا ضيعت الامانة. প্রশ্নকারীর উত্তরে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যখন আমানত নষ্ট করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর। উদ্দেশ্য হল, লোকজন যাদেরকে আমানতদার ও দিয়ানতদার মনে করবে, আর তারা খেয়ানতকারী প্রমানিত হবে, তবে কিয়ামতের অপেক্ষা কর। অতঃপর সে প্রশ্ন করল, আমানত নষ্ট করা হবে কি ভাবে? এ প্রশ্ন সে যুগে ও সে পরিবেশ অনুযায়ী ছিল। কারণ, তৎকালীন সময়ে কারো কল্পনাও হত না আমানত নষ্ট করার এবং আমানতদার ব্যক্তির খেয়ানতকারী হওয়ার। এজন্য সে বিস্ময়ের সাথে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করেছে।

قال اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যখন কোন বিষয় ও লেনদেন অযোগ্য ব্যক্তির নিকট অর্পন করা শুরু হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর। অর্থাৎ, যে আমানতদার হবে না, তাঁর দায়িত্বে কাজ সোপর্দ করা হবে। অযোগ্য লোক দায়িত্বশীল হয়ে বসবে।

হযরত আল্লামা উসমানী র. বলেন, বর্তমানে এটাই হচ্ছে। কারণ, কে যোগ্য সেটা দেখা হয়না, বরং স্বার্থ আর সুপারিশের উপর সব কিছু নির্ভরশীল রয়ে গেছে। -দরসে বুখারী ঃ ১/৩১৪

স্পষ্ট বিষয়, যখন যোগ্য, অযোগ্য, অধিকারী, অনধিকারীর মাঝে পার্থক্য থাকবে না, শুধু স্বজনপ্রীতি উদ্দেশ্য হয়ে যাবে, তার ফলে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে। আর এটি কিয়ামতের একটি বড় নিদর্শন হবে।

সুনানে তিরমিযীতে একটি রেওয়ায়াত আছে,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت امرائكم خياركم واغنيائكم سمحائكم واموركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها واذا كانت امرائكم شراركم واغنيائكم بخلاءكم واموركم الى نسائكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها. ترمذى : ٢/٥١ ابواب الفتن.

উৎসারিত মাসায়িল ঃ ১. প্রশ্নকারীর উচিত, যদি শিক্ষক তথা আলিম কারো সাথে আলোচনায় রত থাকেন, অথবা অধ্যয়নে লিপ্ত থাকেন, তাহলে মাঝখানে দখল দিবে না। বরং বসে অপেক্ষা করবে। যখন অবসর হবেন, তখন প্রশ্ন করবে। ২. প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর তৎক্ষনাৎ দেয়া জরুরী নয়। যদি শিক্ষক ব্যস্ততার দরুন তৎক্ষনাৎ উত্তর দিতে না পারেন, তবে এটা অহংকারের লক্ষন নয়। এটা ইলম গোপন করার নামান্ত

রও নয়। হ্যাঁ, যদি তৎক্ষনাৎ উত্তর দেয়াতে মাসলিহাত থাকে, তবে তৎক্ষনাৎ উত্তর দেয়া উচিত। শিক্ষক স্থান কাল পাত্র ভেদে এবং স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে যেমন সঙ্গত মনে করবেন তেমনই করবেন। যদি আলিম জানেন যে, প্রশ্নকারীর মধ্যে অনুধাবনের যোগ্যতা নেই, তবে সম্পূর্ণ উত্তর না দেয়ারও অবকাশ আছে। এটা জায়িয। কিন্তু এরূপ স্থানে হিকমতের সাথে ওযর পেশ করা উচিত, যাতে অহংকার মনে না করে। ৩. কিন্তু যদি সে ছাত্র অথবা প্রশ্নকারী অনর্থক দখল দেয়, তবে শিক্ষকের উচিত, নম্র আচরণ করা। অনর্থক ধমকাবেন না ও কঠোর আচরণ করবেন না। যেমন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথার মাঝে অনর্থক দখল দেয়ার পরও ধমকাননি, এমনিভাবে শিক্ষকেরও উচিত তখন নীরবতা অবলম্বন করা, পরবর্তীতে সুযোগমত উত্তর দেয়া।

হযরত মাওলানা নানূতবী র. এর এক খাদেম একবার প্রশ্ন করেছিল যে, লোকজন বুযুর্গদের কবরের পাশে দাফন হতে পছন্দ করে কেন? এতে মাওলানা নানূতবী র. নীরবতা অবলম্বন করেন। একদিন খাদেম পাখা দ্বারা বাতাস করছিল, বললেন, কাকে পাখা দিয়ে বাতাস করছ? সে আরয করল, আপনাকে বাতাস করছি। তিনি বললেন, এর বাতাস যিনি কাছে উপবিষ্ট তার গায়েও লাগে কি না? খাদেম আরয করল, লাগে। বললেন, এটাই তোমার প্রশ্নের উত্তর। ওলী আল্লাহদের কবরে আল্লাহর রহমতের যে হাওয়া চলে, তদ্বারা আশে পাশের লোকজনও উপকৃত হয়।

٤٥. بَاب مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْعِلْمِ

৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ উচ্চস্বরে ইলমের আলোচনা

٥٨. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضــ قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا .

৫৮. আবুন নু'মান র. ..... হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মক্কা থেকে মদীনা অভিমুখী) এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পেছনে রয়ে যান। পরে (সামনে এগিয়ে) তিনি আমাদের পেয়ে যান, এদিকে আমরা আসরের নামাযের সময় সংকীর্ণ হওয়ার কারণে (দ্রুত) আমরা ওযূ করছিলাম। (তাড়াহুড়ার ফলে ভাল করে ধোয়ার পরিবর্তে) আমরা আমাদের পা কোনমতে পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিচ্ছিলাম। (এঅবস্থা দেখে) তিনি উচ্চস্বরে বললেন ঃ পায়ের গোড়ালিগুলোর (শুষ্কতার) জন্য জাহান্নামের আযাব (এর অনিষ্ট) রয়েছে। তিনি দু'বার বা তিনবার এ কথা বললেন।

উদ্দেশ্য হল, নামাযের সময় সংকীর্ণ হওয়ার কারণে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে সাহাবায়ে কিরাম রা. ভাল করে পা ধোয়ার পরিবর্তে হাতে পানি নিয়ে পায়ে নিক্ষেপ করতে শুরু করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের থেকে একটু দূরে ছিলেন। এজন্য তিনি উঁচু আওয়াজে বললেন, যদি পায়ের গোড়ালিগুলো শুকনো থাকে, তবে ওযু পূর্ণ হবে না। এটা আযাবের কারণ হবে। এতে বুঝা গেল, نمسح على ارجلنا বাক্যে মাসেহ দ্বারা উদ্দেশ্য হালকাভাবে ধৌত করা। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের বাণী ويل للاعقاب من النار এর প্রমাণ। কারণ, যদি মাসেহ দ্বারা ওরফী মাসেহ উদ্দেশ্য হয়, তবে মাসহে পূর্ণ অংশ ঢেকে নেয়ার প্রবক্তা কেউ নন। অতএব পায়ের গোড়ালী শুকিয়ে থাকার ফলে সতর্কবাণী কেন এসেছে?

ويل এবং ويح উভয়টি সমার্থক। পার্থক্য শুধু এই যে, ধ্বংসের উপযুক্ত হলে ويل বলে। যেমন, এখানে। আর যদি ধ্বংসের উপযুক্ত না হয়, তবে ويح শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন, ويح للعمار تقتله الفئة الباغية আফসোস! আম্মারকে বিদ্রোহীদল হত্যা করবে। একটি দুর্বল হাদীসে আছে, ويل হল, জাহান্নামের একটি উপত্যকা।

٤٦. **بَاب قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا** وَقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا وَسَمِعْتُ وَاحِدًا وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضـ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ وَقَالَ شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً وَقَالَ حُذَيْفَةُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ وَقَالَ أَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضـ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ .

৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ মুহাদ্দিসের উক্তি ঃ حدثنا, اخبرنا, انبانا ;

শায়খ হুমাইদী র. বর্ণনা করেন যে, ইবনে 'উয়াইনা (হুমাইদীর উস্তাদ সুফিয়ান ইবেন উয়াইনা) র.-এর মতে মুহাদ্দিসের উক্তি سمعت (আমি শুনেছি) ও انبأنا (আমাদের বলেছেন) اخبرنا (আমাদের সংবাদ দিয়েছেন) حدثنا (আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন) একই অর্থবোধক। অর্থাৎ, কোন পার্থক্য নেই। বর্ণনাকারীর এখতিয়ার যেভাবে ইচ্ছা বর্ণনা করতে পারেন। হযরত ইবনে মাসঊদ রা. বলেন, حدثنا رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন ; আর তিনি সত্যবাদী এবং সত্যবাদীরূপে স্বীকৃত।' শাকীক (আবু ওয়াইল কুফী) র. আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণনা করেন, سمعت النبي صلي الله عليه وسلم كلمة كذا 'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ উক্তি শুনেছি' ...... । হযরত হুযায়ফা রা. বলেন, حدثنا رسول الله صلي الله عليه وسلم حديثين 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।' আবুল আলিয়া র. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, يروي عن النبي صلي الله عن ربه 'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, তিনি তাঁর রব থেকে বর্ণনা করেন' .... । আনাস রা. বলেন, عن النبي صلي الله عليه وسلم يرويه عن ربه 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, তিনি বর্ণনা করেন তার রব থেকে' .... । হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেন, عن النبي صلي الله عليه وسلم يرويه عن ربكم تبارك تعالي 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, তিনি তোমাদের মহিমময়, সুমহান রব থেকে বর্ণনা করেন'..... ।

যোগসূত্র ঃ পিছনের অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছিল যে, আলিমের উচিত ইলমী কথাবার্তা উচ্চ স্বরে বর্ণনা করা। যাতে উপস্থিত সবাই বুঝতে পারে এবং তারা পুনরায় অন্যদেরকে শিক্ষা দিতে পারে। এবার এ অনুচ্ছেদ থেকে সে সব শব্দ বলতে চান, যে সব শব্দে এ সব উপস্থিত ব্যক্তি অন্যদের নিকট কথা পৌঁছাবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী র. এ অনুচ্ছেদটি কায়েম করে ইঙ্গিত করছেন যে, তিনি স্বীয় কিতাবের বুনিয়াদ সে সব মুসনাদ হাদীসের উপর রেখেছেন, যেগুলো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি আরো সতর্ক করেছেন যে, এ ময়দানে প্রতিটি ব্যক্তিকে স্বীয় ইচ্ছা মত কথা বলার স্বাধীনতা দেয়া যায় না। কোন কথা নির্ভরযোগ্য হওয়ার জন্য সূত্রধারা জরুরী। আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক র. বলেন- الاسناد من الدين ولو لا الاسناد لقال من شاء ما شاء.

২। হাফিজ আসকালানী র. বলেন, এ অনুচ্ছেদ দ্বারা ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য হল, উপরোক্ত শব্দরাজিতে কোন পার্থক্য নেই। পূর্ববর্তীগণ, ইমাম চতুষ্টয় ও ইমাম বুখারী র. এর মতে تحديث، اخبار، انباء শব্দরাজিতে বর্ণনাকারীর ইখতিয়ার আছে, যেভাবে ইচ্ছা বর্ণনা করতে পারেন।

পরবর্তীগণও ইমাম মুসলিম র. এর মতে এগুলোতে পার্থক্য আছে।

হাদীস গ্রহণ ঃ উস্তাদ থেকে হাদীস গ্রহণকে পরিভাষায় বলে تحمل।

হাদীস গ্রহণ বা তাহাম্মুলের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে।

১. قراءة الشيخ অর্থাৎ, উস্তাদ স্বয়ং হাদীস বললেন, আর শিষ্য শুনতে থাকবে।

২. قراءة على الشيخ শিষ্য হাদীস পড়বে, আর উস্তাদ শুনতে থাকবেন।

এ দু ছুরতে রেওয়ায়াত কালে কি বলবে? কি শব্দ অবলম্বন করবে?

ইমাম বুখারী র. বলেন, দুই ছুরতেই حدثنا, أخبرنا, أنبأنا সব বলতে পারবে। এতে কোন পার্থক্য নেই। পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসীনে কিরাম থেকে এমনকি ইমাম চতুষ্টয় থেকেও বর্ণিত আছে যে, এগুলো সব সমান।

ইমাম মুসলিম র. এ দুটিতে (حدثنا و اخبرنا) তে পার্থক্য করেন। তিনি বলেন, প্রথম ছুরত অর্থাৎ, উস্তাদ পড়লে حدثنا বলবেন, আর দ্বিতীয় ছুরত তথা ছাত্র হাদীস পড়লে اخبرنا বলবেন। অতঃপর এতেও কেউ কেউ আরো বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন যে, শ্রোতা বা শিষ্য যদি একজনই হয়, তবে حدثني এক বচনের শব্দ, আর যদি একাধিক হয়, তবে حدثنا বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করবেন। কেউ কেউ এতে আরেকটু উদারতা রেখেছেন যে, সর্বাবস্থায় حدثنا বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করতে পারবেন। لجوازه في كلام العرب আবার حدثني একবচনের শব্দও ব্যবহার করতে পারেন। لان المحدث حدثه وغيره

অনুরূপভাবে এর উপর কিয়াস করে উস্তাদের সামনে ছাত্র কর্তৃক পাঠ করার ছুরতেও কেউ কেউ বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। শিষ্য নিজে পড়লে اخبرني একবচনের শব্দ বলবেন। অন্যান্য শ্রোতা اخبرنا বহুবচনের শব্দ বলবেন। আবার কেউ কেউ এতেও প্রশস্ততা ও উদারতা দেখিয়েছেন যে, সবাই اخبرني ও اخبرنا বলতে পারবেন।

৩. الاجازة তৃতীয় ছুরত হল, সামনা সামনি অনুমতি দান। এটিকে বলে الانباء অর্থাৎ, না শিষ্য পড়বে, না উস্তাদ। কেউ পড়েননি বরং উস্তাদ সামনা সামনি অনুমতি দিয়ে দিবেন। এমতাবস্থায় শিষ্য বর্ণনাকারী যাকে শায়খ অনুমতি দিয়েছেন তিনি انباني অথবা انبانا বলবেন।

৪. চতুর্থ ছুরত হল, مناولة। এর জন্য স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ আসছে।

৫. مكاتبة বা مراسلة এর আলোচনাও مناولة তে আসছে।

৬. একটি ছুরত হল, وجادة এর ওয়াও এর নিচে যের। অর্থাৎ, উপরোক্ত কোন ছুরতই বাস্তবায়িত হবে না, বরং কোথাও থেকে কোন মুহাদ্দিসের কিতাব আমাদের হাতে এসে গেলে, আমরা এ কিতাব থেকে হাদীস বর্ণনা করি এবং সে মুহাদ্দিসের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করি। কিন্তু এশব্দটি مولّد لم يسمع من العرب মানে এটি নতুন তৈরি শব্দ আরবদের থেকে বর্ণিত নয়। এমতাবস্থায় বলা উচিত وجدت في كتاب فلان

মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট হাদীস বর্ণনার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। تحديث ও اخبار এর জন্য কুরআনে হাকীমের এ আয়াত দ্বারা প্রমান পেশ করা হয় - يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. الزلزال ٤ আর انباء এর জন্য নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয়- لَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ. سورة فاطر

অতঃপর মুহাদ্দিসীনে কিরামের মতে ইখতিলাফ রয়েছে যে, تحديث ও اخبار এর মধ্যে কোনটি উত্তম, অর্থাৎ, শায়খের নিকট ছাত্র কর্তৃক পড়া উত্তম, না শায়খ কর্তৃক পড়া? এ সম্পর্কে ইমাম আজম আবূ হানীফা ও মালিক র. এর দুটি উক্তি রয়েছে।

১. উভয়টি সমান। ২. শায়খের নিকট ছাত্র কর্তৃক পাঠ অর্থাৎ, اخبار উত্তম। কারণ, যখন শিষ্য নিজে শুনাবে তখন খুব সতর্কতা অবলম্বন করবে, আর যদি উস্তাদ নিজে পড়েন, তবে এতটা গুরুত্ব দিবেন না।

হাফিজ আসকালানী র. ফাতহুল বারীতে উত্তম ফয়সালা দিয়েছেন, তিনি বলেন, অবস্থা বিভিন্ন ধরনের হয়। কোথাও তাহদীস শক্তিশালী হবে, আবার কোথাও ইখবার। যেখানে যেটি ভুল থেকে নিরাপদ থাকবে, সেখানে সেটিই অধিক শক্তিশালী হবে। অতএব এক তরফা সিদ্ধান্ত না হওয়া উচিত। ইমাম বুখারী র. উভয়টিকে এক বলেন।

٥٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضـــ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ .

৫৯. কুতায়বা ইবনে সাঈদ র. .... হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বললেন ঃ গাছপালার মধ্যে এমন একটি গাছ আছে, যার পাতা ঝরে না। আর তা মুসলিমের উপমা। তোমরা আমাকে বল 'সেটি কি গাছ?' রাবী বলেন, তখন সাহাবায়ে কিরাম রা. জঙ্গলের বিভিন্ন গাছপালার নাম চিন্তা করতে লাগলেন। হযরত আবদুল্লাহ রা. বলেন, 'আমার মনে হল, সেটা হবে খেজুর বৃক্ষ।' কিন্তু আমি তা বলতে লজ্জাবোধ করছিলাম। তারপর সাহাবায়ে কিরাম রা. বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের বলে দিন, সেটি কি বৃক্ষ?' তিনি বললেন- 'তা হল খেজুর বৃক্ষ।'

শিরোনামের সাথে মিল ঃ হাদীসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ রয়েছে, فحدثوني ما هي. শেষে সাহাবায়ে কিরাম রা. আরয করলেন, حدثنا ما هي؟ ইমাম বুখারী র. উভয়টির সমষ্টির দ্বারা প্রমাণ করেন যে, চাই উস্তাদ পড়ুন বা শিষ্য উভয়টির ক্ষেত্রে তাহদীসের প্রয়োগ হয়। -উমদাহ।

হাফিজ আসকালানী র. শুধু حدثوني শিরোনাম প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম বুখারী র.এর নজর এ হাদীসের বিভিন্ন সূত্রের সমস্ত শব্দের প্রতি। এখানে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

ইরশাদ حدثوني ماهي রয়েছে। ইসমাঈলের সূত্রে আছে, انبئوني। তাছাড়া সাহাবায়ে কিরামের পক্ষ থেকে কোন কোন রেওয়ায়াতে? حدثنا ماهي এর স্থলে? اخبرنا ما هي এসেছে। -বুখারী ঃ১/২৪

এতে বুঝা গেল এই তিনটি শব্দ সমান। একটি অপরটির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, কিতাবুল ইলম ঃ চারটি স্থানে, পৃঃ ১৪, ১৬, ২৪, বুয়ূ' ঃ ২৯৪. তাফসীর ঃ ৬৮১, আল আতইমাহ ঃ ৮১৯, কিতাবুল আদব ঃ ৯০৪, ৯০৭, মোট দশটি স্থান হল।

মু'মিনের দু'আ রদ হয় না ঃ لا يسقط ورقها এতে ইঙ্গিত রয়েছে, মু'মিনের দু'আ রদ হয় না, তবে কবুলের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। কখনো হুবহু কাম্য জিনিস পেয়ে যায়, আর যদি আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে সে জিনিসটি কামনাকারীর জন্য ক্ষতিকর হয়, তবে এর স্থলে তার জন্য অন্য কোন উপকারী জিনিস দান করা হয়। যদি মেনে নেই, দুনিয়াতে কিছুই পাওয়া যায়নি, তাহলে পরকালে অবশ্যই প্রতিদান পাওয়া যাবে কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায়, মুসলমান এবং খেজুর গাছের মধ্যে উপমার কারণ এটাই। হাফিজ আসকালানী র. বলেন-

وجه الشبه بين النخلة والمسلم من جهة عدم سقوط الورق ما رواه الحارث بن اسامة في هذا الحديث من وجه آخرعن ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال ان مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لها انملة، اتدرون ما هي؟ قالوا لا قال هي النخلة لا تسقط لها انملة ولا تسقط لمؤمن دعوة. فتح : ١١٩/١.

মুসলমান ও খেজুর বৃক্ষের মধ্যে উপমার কারণ ঃ

وانها مثل المسلم উপমার কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে।

১. কেউ কেউ বলেছেন, যেরূপভাবে মানুষের মাথা কাটলে জীবিত থাকে না, এরূপভাবে খেজুর গাছের মাথা কাটলে তা শেষ হয়ে যায়।

২. কেউ কেউ বলেছেন, খেজুর বৃক্ষ মানুষের মত পুরুষ ও স্ত্রী হয়, পরাগায়ন ছাড়া ফল দেয় না।

৩. কেউ কেউ বলেছেন, খেজুর গাছ মানুষের ফুফু। কেননা, কোন কোন বর্ণনায় আছে, হযরত আদম আ. কে সৃষ্টি করার পর, অতিরিক্ত মাটি দ্বারা খেজুর গাছ তৈরি করা হয়েছে।

উপরোক্ত কারণসমূহ এজন্য সহীহ নয় যে, প্রথম দুটি প্রাণী এবং তৃতীয়টি অমুসলিমকেও অন্তর্ভূক্ত করে। এতে মুসলমানের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। তৃতীয় কারণটি সবচেয়ে দুর্বল। কারণ, এ হাদীসটি প্রমাণিত নয়। শুধু নিম্নোক্ত দুটি কারণ সহীহ।

৪. যেরূপভাবে খেজুরের কোন অংশ নিরর্থক ও বেকার যায় না, গোড়া, পাতা, ডাল, শাখা, মগজ, ফল, বিচি সবগুলোই উপকারী, এরূপভাবে পূর্ণাঙ্গ মুসলমানের প্রতিটি কাজ উপকারী হয়। এর প্রমাণ ইমাম বুখারী র. কর্তৃক বর্ণিত আল আতইমার রেওয়ায়াতটি-

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اتى بجمار فقال ان من شجر لما بركته كبركة المسلم الخ.

৫. ما مر من قوله صلى الله عليه وسلم لا تسقط لها انملة ولا تسقط لمؤمن دعوة. ارشاد القارى

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তার কোন অংশ ঝড়ে পড়ে না বা বেকার হয় না।

এবং কোন মুমিনের দু'আ রদ হয় না।

একটি প্রশ্ন ঃ হতে পারে এসব গুন অন্য কোন বৃক্ষেও পাওয়া যায়।

উত্তর ঃ প্রথমত তো অন্য কোন বৃক্ষে এসব গুণের অস্তিত্ব প্রমাণিত নয়।

২. আরবে এসব গুন বিশিষ্ট বৃক্ষ শুধু এটাই প্রচুর পরিমাণ হত। এজন্য এর সাথে উপমা দেয়া হয়েছে।

قال عبد الله فوقع في نفسي انها النخلة فاستحييت

কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, আমি ছিলাম কওমের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। সেখানে হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর রা.এর ন্যায় মনীষীগণও উপস্থিত ছিলেন। এ জন্য বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। এজন্য হযরত উমর রা. বললেন, যদি তুমি বলে দিতে, তবে তা আমার জন্য লাল উঁট অপেক্ষাও উত্তম হত। হযরত উমর রা. এর এ উক্তির কারণ এই ছিল যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপস্থানে এরূপ ব্যক্তির জন্য দু'আ করতেন। -ইরশাদুল কারী।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর মনে যে খেজুর গাছের কথা এসেছিল এর জন্য নিদর্শনও ছিল। সেটি হল, তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট খেজুরের মাথি ছিল। যেমন, কোন কোন সূত্রে এসেছে। আর কোন কোন রেওয়ায়াতে এসেছে যে, তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াতটিও তিলাওয়াত করেছেন-

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. ابراهيم

আপনার কি জানা নেই, আল্লাহ তা'আলা কিরূপ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন উত্তম কালিমার সেটি একটি পবিত্র বৃক্ষ সদৃশ। যার গোড়া খুবই দৃঢ় আর ডালগুলো অনেক উপরে উত্থিত।

অধিকাংশ মুফাসসিরের রায় হল, পবিত্র বৃক্ষ দ্বারা উদ্দেশ্য খেজুর গাছ। এ আয়াতটি তিলাওয়াত করার ফলে এখানে আরেকটি উপমার কারণও জানা গেল। তথা যেরূপভাবে খেজুর গাছের গোড়া জমিনে প্রোথিত, আর ডাল আকাশের দিকে উত্থিত, এমনিভাবে মু'মিনের ঈমান তার অন্তরে সুদৃঢ়, অর্থাৎ, আন্তরিক বিশ্বাস যেটি ঈমানের গোড়া। আর আমলগুলো ডালের পর্যায়ভূক্ত। এগুলো কবুলিয়্যাতের আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

٤٧ . بَاب طَرْحِ الْإِمَامِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ

৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ ছাত্রদের জ্ঞান পরীক্ষার জন্য উস্তাদের কোন বিষয় উত্থাপন করা

٦٠. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَد حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ دينَار عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضـــ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ حَدِّثُونِي مَا هِيَ قَالَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ .

৬০. খালিদ ইবনে মাখলাদ র. ..... হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ইরশাদ করলেন, 'গাছপালার মধ্যে এমন একটি গাছ আছে, যার পাতা ঝরে না। আর তা মুসলিমের উপমা। তোমরা আমাকে বল দেখি, সেটি কি গাছ?' রাবী বলেন, তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছপালার নাম চিন্তা করতে লাগল। 'আবদুল্লাহ রা. বলেন, 'আমার মনে হল, সেটা হবে খেজুর বৃক্ষ। কিন্তু তা বলতে আমি লজ্জাবোধ করছিলাম।' তারপর সাহাবায়ে কিরাম রা. বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিই আমাদের বলে দিন, সেটি কি বৃক্ষ?' তিনি বললেন ঃ 'তা হল খেজুর গাছ।'

পূর্বের সাথে যোগসূত্র ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন-

والمناسبة بين البابين ظاهرة فان الحديث فيهما واحد عن صحابي واحد.

অর্থাৎ, পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে বৃক্ষ সংক্রান্ত যে হাদীসটি ছিল, সেটি এ অনুচ্ছেদেও। সাহাবীও একই জন। শিরোনাম বিচিত্র হওয়ার ফলে হাদীসের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। তাছাড়া অতিরিক্ত আরেকটি ফায়দা হল, এর ফলে মাশায়েখে বুখারী অনেক, এমনিভাবে হাদীস সংক্রান্ত জ্ঞানের প্রাচুর্য ও রেওয়ায়াতের আধিক্যের ব্যাপারেও সতর্কবাণী হয়ে গেছে। এমনকি ইমাম বুখারী র. অনেক সময় একই হাদীস স্বীয় অনেক শায়খ থেকে বর্ণনা করেন। -উমদা।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ এই শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য কি? এ সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে।

১. পিছনে এক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, দীনের কোন কথা বর্ণনা করতে হলে সনদের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। এবার এ অনুচ্ছেদে বলছেন, যেরূপভাবে দীনের কথা বর্ণনা করার সময় পূর্ণ সচেতন থাকা জরুরী এমনিভাবে ছাত্রদেরকেও সচেতন রাখার চেষ্টা করতে হবে। যাতে ছাত্ররা দরসগাহে উদাসীন না হয়। এর একটি উত্তম পন্থা হল, ছাত্রদের নিকট কখনো কখনো প্রশ্ন করা। যাতে ছাত্ররা সর্বদা সচেতন ও মনোযোগী থাকে।

২. এদিকেও ইঙ্গিত সম্ভব যে, ছাত্রদেরকে প্রথমে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে ইলমী মানদন্ড যাছাই করে ভর্তি করা দরকার। যেমন, মান সম্পন্ন মাদরাসাগুলোতে এর বাস্তবায়ন হয়। যদিও আজকাল কিছুটা ক্রটি শুরু হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে তা থেকে বাঁচা জরুরী।

৩. আবূ দাঊদ শরীফে হযরত মুআবিয়া রা. সূত্রে একটি হাদীস বর্ণিত আছে- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاغلوطات. ابو داود كتاب العلم যদ্দারা পরীক্ষা নেয়া নিষেধ বলে কল্পনা হতে পারে।

ইমাম বুখারী র. এ শিরোনাম কায়েম করে এ ধারনা দূর করেছেন। হাদীসটি প্রমাণ করেছেন, মেধা, তেজ ও সচেতন করার জন্য পরীক্ষা জায়িয আছে। এর ফলে জ্ঞানগত উন্নয়ন ঘটে।

বাকি রইল হযরত মুআবিয়া রা. এর হাদীস। এর উদ্দেশ্য হল, যদি পরীক্ষা নেয়া দ্বারা নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয়, আর মাসআলাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বিভ্রান্তিকর রূপে পেশ করা হয়, যদ্দারা আলিম বা মুফতির অবমাননা উদ্দেশ্য হয়, সেটি হযরত মুআবিয়া রা.এর হাদীসের আলোকে না জায়িয। অন্যথায় ইলমী মেধার জন্য অর্থাৎ, দিস্তান জিজ্ঞেস করা জায়িয আছে।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল স্পষ্ট- في قوله قال ان من الشجر شجرة ... الى قوله ... حدثوني ما هي؟

বাকী ব্যাখ্যার জন্য পেছনের অনুচ্ছেদের হাদীস দ্রষ্টব্য।

٤٨. بَاب مَا جَاءَ فِي الْعِلْمِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا الْقِرَاءَةُ وَالْعَرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ وَرَأَى الْحَسَنُ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ الْقِرَاءَةَ جَائِزَةً وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ بِحَدِيثِ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَذِهِ قِرَاءَةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ ضِمَامٌ قَوْمَهُ بِذَلِكَ فَأَجَازُوهُ وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِالصَّكِّ يُقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ أَشْهَدَنَا فُلَانٌ وَيُقْرَأُ ذَلِكَ قِرَاءَةً عَلَيْهِمْ وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِئِ فَيَقُولُ الْقَارِئُ أَقْرَأَنِي فُلَانٌ

৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ ইলম ও আল্লাহ্ তা'আলার বাণী

قل رب زدني علما

হাদীস পড়া ও মুহাদ্দিসের কাছে পেশ করা। হাসান (বসরী), সাওরী এবং মালিক র.-এর মতে মুহাদ্দিসের সামনে পাঠ করা (قراءة التلميذ على الشيخ) জায়েয। কোন কোন মুহাদ্দিস উস্তাদের সামনে পাঠ করার সপক্ষে যিমাম ইবনে সালাবা রা.-এর হাদীস পেশ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন, 'আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের ব্যাপারে কি আল্লাহ্ আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন?, তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ'। বর্ণনাকারী বলেন, এগুলো (যেন) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে পাঠ করা হল। যিমাম রা. অতঃপর যেয়ে কাওমের নিকট তা বর্ণনা করেছেন। তারাও এটাকে জায়েয মনে করেছেন। ইমাম মালিক র. তাঁর মতের সমর্থনে লিখিত কবলা দলীলকে প্রমাণরূপে পেশ করেন, যা লোকদের সামনে পাঠ করা হলে তারা বলে, 'অমুক আমাদের সাক্ষী বানিয়েছেন'। শিক্ষকের সামনে পাঠ করে পাঠক বলে, 'অমুক আমাকে পড়িয়েছেন।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَوْفٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفَرَبْرِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ إِذَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنِي قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ عَنْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْعَالِمِ وَقِرَاءَتُهُ سَوَاءٌ .

মুহাম্মদ ইবনে সালাম র. .... হযরত হাসান র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শিক্ষকের সামনে ছাত্রদের পাঠ করাতে কোন বাধা নেই। উবায়দুল্লাহ ইবনে মূসা র. সুফিয়ান র. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, যখন মুহাদ্দিসের সামনে (কোন হাদীস) পাঠ করা হয়, তখন حدثني (তিনি আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন) বলায় কোন আপত্তি নেই। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবূ 'আসিমকে মালিক ও সুফিয়ান র. থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, 'উস্তাদের সামনে পাঠ করা এবং উস্তাদের নিজে পাঠ করা একই পর্যায়ের।'

উপকারিতা ঃ مقرى -ইসমে ফায়েলের শব্দ। মানে কিরাআতের উস্তাদ। قارئ এর অর্থ হল, পাঠক তথা শিষ্য। অতএব উদ্দেশ্য এই হল যে, পাঠক-শিষ্য উস্তাদের সামনে পড়ে শুনায় অতঃপর বলে যে, আমাকে অমুক পড়িয়েছেন।

মুহাম্মদ ইবনে সাল্লাম (বাইকান্দী) র. বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবনে হাসান (ওয়াসিতী) র. ইমাম হাসান বসরী র. সূত্রে আওফ র. থেকে বর্ণনা করেছেন, আলিম তথা উস্তাদের সামনে পড়লে কোন অসুবিধা নেই। ইমাম বুখারী র. বলেন, উবাইদুল্লাহ ইবনে মূসা আমার নিকট সুফিয়ান সাওরী র. থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন কেউ মুহাদ্দিসের সামনে হাদীস পড়ে (শিষ্য হাদীস পড়ে মুহাদ্দিসকে শুনায়) তবে حدثني বললে কোন ক্ষতি নেই। ইমাম বুখারী র. বলেন, আমি আবূ আসিম র. থেকে শুনেছি, তিনি ইমাম মালিক ও সুফিয়ান সাওরী র. থেকে বর্ণনা করতেন যে, আলিমকে পড়ে শুনানো এবং আলিমের নিজে পাঠ করে শিষ্যদের সামনে শুনানো উভয়টি সমান।

যোগসূত্র ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন, পিছনের অনুচ্ছেদে উস্তাদের পাঠের বিবরণ ছিল। আর এ অনুচ্ছেদে উস্তাদের সামনে পাঠের বিবরন রয়েছে। উভয় পদ্ধতি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে নির্ভরযোগ্য। মিল স্পষ্ট।

২. পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে ছাত্রের পরীক্ষা আলোচনায় এসেছে, আর এ অনুচ্ছেদে উস্তাদের সামনে ছাত্রের পাঠের বিবরণ রয়েছে। যেন, ভর্তি পরীক্ষার পর পড়ার অনুমতি রয়েছে। অতএব মিল স্পষ্ট।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন-

اراد به الرد على طائفة لا يعتدون الا بما يسمع من الفاظ المشائخ الخ. عمدة : ١٦/٢

সারকথা, ইমাম বুখারী র.এর উদ্দেশ্য এ অনুচ্ছেদ দ্বারা সে সব লোকের মতখন্ডন, যারা বলে যে, শিষ্য কর্তৃক পাঠ এবং উস্তাদ কর্তৃক শ্রবণ গ্রহণযোগ নয়। অর্থাৎ, কেউ শায়খের সামনে হাদীস পাঠ করলে তার জন্য حدثنا বা اخبرنا বলা জায়িয নেই, না তার উক্তি প্রমাণ হতে পারে, যতক্ষন পর্যন্ত শায়খের শব্দ না শুনে। উদ্দেশ্য হল, শুধু শায়খের পাঠ গ্রহণযোগ্য। ইমাম বুখারী র. তাদের মতখন্ডনে প্রমানাদি পেশ করছেন।

بَابُ الْقِرَاءَةِ وَالْعَرْضِ

اى هذا باب في بيان حكم القراءة والعرض على المحدث يتعلق بالقراءة والعرض كليهما فهو من باب تنازع العاملين على معمول واحد. عمدة : ١٦/٢

এখানে দুটি বিষয় রয়েছে। ১. মুহাদ্দিস তথা উস্তাদের সামনে ছাত্র পড়বে। যেমন, বর্তমানে কেন্দ্রীয় মাদরাসাগুলোতে এ পদ্ধতি চালু আছে।

২. দ্বিতীয় বিষয়টি হল, মুহাদ্দিসের নিকট পেশ করা। অর্থাৎ, উস্তাদ শিষ্যকে স্বীয় গ্রন্থ প্রদান করবেন। আর শিষ্য কপি করে উস্তাদের সাথে মিলাবে। অথবা শিষ্যের নিকট উস্তাদের লিখিত হাদীসের সমষ্টি প্রথম থেকেই বিদ্যমান রয়েছে, এবার শিষ্য কপি করে উস্তাদের সামনে সে সমষ্টি শুনিয়ে ইজাযত অর্জন করবে। এটি হল, মুহাদ্দিসের সামনে পেশ।

হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া র. বলেন, মুহাদ্দিসের সামনে পাঠ তো সেটাই যে, শিষ্য পড়বে আর উস্তাদ শুনবেন। কিন্তু পাঠকের যে সাথী রয়েছে যদিও সে পড়ে না কিন্তু শুনে, সে হাদীসের এ কর্মও 'মুহাদ্দিসীনের নিকট عرض বা পেশ করা।' والله اعلم

واحتج بعضهم এখানে بعضهم দ্বারা কে উদ্দেশ্য? কিতাবের দুই লাইনের মাঝে লিপিবদ্ধ আছে, তিনি হলেন ইমাম বুখারী র. এর উস্তাদ হযরত হুমাইদী র.। হাফিজ ইবনে হাজার র. ফাতহুল বারীতে এ স্থানে লিখেছেন যে, আমি মুকাদ্দামায় লিখেছি, হুমাইদী উদ্দেশ্য। কিন্তু এবার আমি জানতে পারলাম, উদ্দেশ্য আবূ

সাঈদ হাদ্দাদ। অতঃপর ইমাম বায়হাকী র. এর গ্রন্থ মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম বুখারী র. বলেন, এখানে উদ্দেশ্য হল আবূ সাঈদ হাদ্দাদ। -ফাতহুল বারী ঃ ১/১২১।

বাকী ইবারত অনুবাদ দ্বারা স্পষ্ট।

واحتج مالك بالصك .. صك শব্দটির প্রথম অক্ষরে যবর। এটি چك শব্দ থেকে আরবীকৃত। বর্তমানে এটিকে দস্তাবেজ ও কবলা বলে। এর ছুরত এই হয় যে, ঋণের লেনদেন হয় বা ক্রয় বিক্রয়ের দস্তাবেজ লেখক-কবলা লেখক লেনদেন লিখে ক্রেতা বিক্রেতা তথা চুক্তিকারীদ্বয় এবং সাক্ষীদের সামনে পড়ে শুনান। পারস্পারিক চুক্তিকারীগণ তা মেনে নেন। সাক্ষীদের দস্তখত হয়। চুক্তিকারীগণ স্বয়ং পড়েন না। কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে বিচারকের আদালতে সাক্ষী দেন। আদালত তাদের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করে। এটি স্বীকৃত বিষয় যে, সাক্ষ্যের বিষয়টি সংবাদদানের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। হাদীস বর্ণনা সংবাদ দানের অন্ত র্ভূক্ত। কাজেই যেহেতু আদালতী ফয়সালাগুলোতে এ প্রকার স্বীকারোক্তি সহীহ এবং নির্ভরযোগ্য হয়, অতএব রেওয়ায়াতের ক্ষেত্রেও উত্তমরূপে নির্ভরযোগ্য হওয়া উচিত।

ويقرئ على المقري الخ. - المقري মীমের উপর পেশ কুরআন শিক্ষাদাতা, মানে উস্তাদ। ইমাম মালিক র. এর দ্বিতীয় প্রমাণ হল, কারী তথা শিষ্য المقري তথা উস্তাদকে পড়ে শুনায়। উস্তাদ পড়েন না, শুধু শুনে সত্যায়ন করেন। কিন্তু বলে, অমুক আমাকে কুরআন পড়িয়েছেন। অথচ সে নিজে পড়ে উস্তাদকে শুনিয়েছিল, হুবহু অনুরূপ হাদীসের ক্ষেত্রে উস্তাদের নিকট পাঠের।

ইমাম মালিক র. থেকে যদি কেউ বলতো যে, আপনি নিজে হাদীস শুনান, তখন তিনি রাগ করতেন এবং বলতেন, যদি কেউ কুরআন পড়ে শুনায় তবে তোমরা বিশ্বাস কর, তবে হাদীসে কেন বিশ্বাস কর না? -ফাতহ ও উমদা।

অবশ্য কখনো কখনো নিজেও শুনিয়ে দিতেন। ইমাম মুহাম্মদ র.কে পাঁচশত হাদীস শুনিয়েছেন। এটি তাঁর বৈশিষ্ট্য। অন্য কারো জন্য ইমাম মালিক র. তা সহ্য করেননি। -দরসে বুখারী ঃ ৩২১।

এর দ্বারা বুঝা গেল, ইমাম মালিক র. এর মতে শায়খের সামনে পড়া এবং শায়খ কর্তৃক পাঠ উভয়টি বৈধতা ও বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে সমান। অন্যথায় ইমাম মালিক র. এর মতে শায়খের সামনে পাঠ উত্তম। ইমাম আজম র. এর মাযহাবও এটাই।

٦١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ هُوَ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضـ يَقُولُ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَقُلْنَا هٰذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَبْتُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَلَا تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ فَقَالَ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ فَقَالَ أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ آللّٰهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ فَقَالَ اللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ آللّٰهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ اللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ آللّٰهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هٰذَا الشَّهْرَ مِنْ

السَّنَة قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّه آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذه الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنيَائنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِه وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائي مِنْ قَوْمي وَأَنَا ضمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَني سَعْد بْنِ بَكْرٍ وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعيلَ وَعَليُّ بْنُ عَبْد الْحَميد عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغيرَة عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِهَذَا .

৬১. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ র. ...... হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে মসজিদে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি সওয়ার অবস্থায় ঢুকল। মসজিদ (এর দরজায়) সে তার উটটি বসিয়ে বেঁধে রাখল। এরপর উপস্থিত সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলল, 'তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সাহাবীদের সামনেই হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আমরা বললাম, 'এই হেলান দিয়ে বসা সুন্দর-সুশ্রী ফর্সা রঙের মনীষীই তিনি।'

তারপর লোকটি তাঁকে লক্ষ্য করে বলল, 'হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তান!' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ (বল) 'আমি তোমার কথা শুনছি। 'লোকটি বলল, 'আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব এবং সে প্রশ্ন করার ব্যাপারে কঠোর হব, এতে আপনি আমার প্রতি রাগ করবেন না বা অসন্তুষ্ট হবেন না।' 'তিনি বললেন, 'তোমার ইচ্ছা মত প্রশ্ন কর।'

সে বলল, 'আমি আপনাকে আপনার রব এবং আপনার পূর্ববর্তীদের রবের কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহই কি আপনাকে সব মানুষের প্রতি রাসূলরূপে প্রেরন করেছেন?' তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ্ জানেন, হ্যাঁ।' اللهم এর অর্থ হল, হে আল্লাহ! এটি বরকত ও তাকিদের জন্য বলেছেন। -তাইসীরুল কারী।

সে বলল, 'আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে দিনরাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন?' তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ্ সাক্ষী, হ্যাঁ,। সে বলল, 'আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে বছরের এ মাসে (রমযানে) রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন?' তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ্ জানেন, হ্যাঁ'। সে বলল, 'আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমাদের ধনীদের থেকে এসব সদকা (যাকাত) উসূল করে গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দিতে?' নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'আল্লাহ্ সাক্ষী, হ্যাঁ।' এরপর লোকটি বলল, 'আমি ঈমান আনলাম, আপনি যে দীন এনেছেন তার উপর। আর আমি আমার সম্প্রদায়ের রেখে আসা লোকজনের পক্ষে প্রতিনিধি। আমার নাম যিমাম ইবনে সা'লাবা। আমি বনী সা'দ ইবনে বকর গোত্রের লোক।'

মূসা ও আলী ইবনে আবদুল হামীদ র. - সুলাইমান - সাবিত - আনাস রা. সূত্রেও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ (লাইসের ন্যায়) বর্ণনা করেছেন।

٦٢. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ نُهِيْنَا فِي الْقُرْآنِ اَنْ نَسْئَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُعْجِبُنَا اَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلِ فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ اَتَانَا رَسُوْلُكَ فَاَخْبَرَنَا اَنَّكَ تَزْعُمُ اَنَّ اللهَ

عَزَّ وَ جَلَّ اَرْسَلَكَ؟ قَالَ صَدَقَ، فَقَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ، قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالْجِبَالَ؟ قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ، قَالَ فَمَنْ جَعَلَ فِيْهَا الْمَنَافِعَ؟ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ فَبِالَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْاَرْضَ وَنَصَبَ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيْهَا الْمَنَافِعَ آللهُ اَرْسَلَكَ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَزَكٰوةً فِيْ اَمْوَالِنَا؟ قَالَ صَدَقَ، قَالَ بِالَّذِيْ اَرْسَلَكَ آللهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِيْ سَنَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِيْ اَرْسَلَكَ آللهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً؟ قَالَ صَدَقَ، قَالَ فَبِالَّذِيْ اَرْسَلَكَ آللهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَوَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ اَزِيْدُ عَلَيْهِنَّ شَيْئًا وَلاَ اَنْقُصُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ .

৬২. মূসা ইবনে ইসমাঈল র. ...... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করার ব্যাপারে কুরআনুল করীমে নিষেধ করা হয়েছিল। আমরা পসন্দ করতাম, গ্রাম থেকে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি (যার কাছে নিষেধের সংবাদ পৌছেনি) এসে তাঁর কাছে প্রশ্ন করুক আর আমরা তা শুনি। তারপর একদিন গ্রাম থেকে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, 'আমাদের নিকট আপনার একজন দূত গিয়েছে। সে আমাদের সংবাদ দিয়েছে যে, আপনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন।' তিনি বললেন ঃ ' সে সত্য বলেছে।' সে বলল, 'আসমান কে সৃজন করেছেন?' তিনি বললেন ঃ 'মহিমময় আল্লাহ তা'আলা।' সে বলল, 'পৃথিবী ও পর্বতমালা কে সৃষ্টি করেছেন?' তিনি বললেন ঃ 'মহিমময় আল্লাহ তা'আলা।' সে বলল, 'এসবের মধ্যে উপকারী বস্তুসমূহ কে রেখেছেন?' তিনি বললেন ঃ 'মহিমময় আল্লাহ তা'আলা।' সে বলল, 'তাহলে যিনি আসমান সৃষ্টি করেছেন, যমিন সৃষ্টি করেছেন, পর্বত স্থাপন করেছেন এবং তার মধ্যে উপকারী বস্তুসমূহ রেখেছেন, তাঁর কসম, সেই আল্লাহই কি আপনাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন?' তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ।' সে বলল, 'আপনার দূত বলেছেন যে, আমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা এবং আমাদের মালের যাকাত দেয়া ফরয তথা অবশ্য কর্তব্য।' তিনি বললেন ঃ 'সে সত্য বলেছে।' সে বলল, 'যিনি আপনাকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ, আল্লাহই কি আপনাকে এর আদেশ দিয়েছেন?' তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ।' সে বলল, 'আপনার দূত বলেছে যে, আমাদের উপর বছরে একমাস রোযা রাখা অবশ্য কর্তব্য।' তিনি বললেন ঃ 'সে সত্য বলেছে।' সে বলল, 'যিনি আপনাকে রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম, আল্লাহই কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন?' তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ।' সে বলল, 'আপনার দূত বলেছেন যে, আমাদের মধ্যে যার যাতায়াতের সামর্থ্য আছে, তার উপর বাইতুল্লাহর হজ্জ করা অবশ্য কর্তব্য। তিনি বললেন ঃ 'সে সত্য বলেছে।' সে বলল, 'যিনি আপনাকে সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম, আমি এতে কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি করব না। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- 'সে যদি সত্য বলে থাকে, তবে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

শিরোনামের সাথে মিল ঃ দুটি হাদীসের মিল শিরোনামের সাথে স্পষ্ট। কারণ, হযরত যিমাম রা. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত থেকে জানা কথাগুলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করেছেন। তিনি এগুলোর সত্যায়ন করেছেন। এরপর যিমাম রা. যখন কওমের নিকট ফিরে গেছেন, তখন কওমের সব লোক ঈমান এনেছে। এতে বুঝা গেল, শায়খের পাঠই জরুরী নয়, বরং শিষ্য পাঠ করলে উস্তাদ তা শুনে সত্যায়ন করলে তাও নির্ভরযোগ্য ও সঠিক। এর দ্বারা শায়খের সামনে পাঠ নির্ভরযোগ্য হওয়া প্রমাণিত হল। ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্যও এটাই।

৬১ নং হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ

نحن جلوس - جالس এর বহুবচন। যেমন راكع এর বহুবচন ركوع। نحن মুবতাদা, جلوس খবর।

دخل رجل এর দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত যিমাম ইবনে সা'লাবা রা.। যেমন, এই রেওয়ায়াতেই সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে, সে ব্যক্তি বললেন, انا ضمام بن ثعلبة الخ

على جمل فاناخه في المسجد ঃ এর দ্বারা ইবনে বাত্তাল র. প্রমুখ সে সব প্রাণীর প্রস্রাব-পায়খানার পবিত্রতার উপর প্রমাণ পেশ করেছেন, যেগুলোর গোশত খাওয়া যায়। কারণ, মসজিদে উট বসালে পেশাবের আশংকা থাকেই, তা সত্তেও রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীরবতা এর প্রমান যে, উটের প্রস্রাব পবিত্র।

তবে এ প্রমাণ সহীহ নয়। কারণ, এতে শুধু একটি সম্ভাবনা আছে যে, প্রস্রাব-পায়খানা করতে পারে; কিন্তু প্রস্রাব করা প্রমাণিত নয়। এখানে লক্ষনীয় বিষয় হল, যে পবিত্র সত্ত্বা মসজিদে থুথু বরদাশত করেননি এবং ক্রোধে চেহারা বিবর্ন হয়ে যেত, তিনি মসজিদে উট প্রবেশ করানো এবং এর প্রস্রাব ও বিষ্টা কিভাবে বরদাশত করেছেন? এটি যৌক্তিক বিষয় নয় যে, মসজিদে উট বসানো হয়েছে। বর্ণনাকারী মসজিদের নিকটকে (আঙ্গিনাকে) মসজিদ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। যেমন, মুসনাদে আহমদে হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর রেওয়ায়াত আছে-

فاناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل الخ.

হাফিজ আসকালানী র. বলেন-

فعلى هذا في رواية انس رضي الله عنه مجاز الحذف والتقدير فاناخه في ساحة المسجد او نحو ذلك. فتح الباري

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, في المسجد দ্বারা উদ্দেশ্য علي باب المسجد অথবা في ساحة المسجد (মসজিদের দরজায় বা আঙ্গিনায়)।

ثم قال لهم ايكم محمد الخ. অতঃপর তিনি মজলিসে উপস্থিত লোকজনের নিকট জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ কে? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সাহাবায়ে কিরাম রা. এর মাঝে হেলান দিয়ে বসেছিলেন।

ظَهرانَيهم - ظ ও ن এর উপর যবর। - الابيض – المشرب بحمرة والمراد بها তথা লালমিশ্রিত ফর্সা।

ظَهران শব্দটিকে মুফরাদের পর্যায়ভূক্ত সাব্যস্ত করে দ্বিবচনের আলামত তার সাথে যুক্ত করা হলে হয়ে যায় ظَهرانَين অতঃপর যমীরের দিকে ইযাফতের কারণে দ্বিবচনের নূন ফেলে দেয়া হয়। এ শব্দটি তখন বলা হয়, যখন বড় সমাবেশ হয় এবং একজন অপরজনের দিকে পিঠ দিয়ে অবস্থান করে।

প্রশ্ন ঃ কুরআন মজীদে আছে-

لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا. سورة نور ٦٣

এ আয়াতের একটি তাফসীর এটিও বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন প্রয়োজনে ডাকার বা সম্বোধন করার প্রয়োজন হয়, তখন সাধারণ লোকদের ন্যায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম নিয়ে ইয়া মুহাম্মাদ! বল না। এটা বে আদবী।

এর দ্বারা বুঝা যায়, হযরত যিমাম ইবনে সা'লাবা রা. এর এ সম্বোধন আদব ও তা'জীমের পরিপন্থী। যেটা জায়িয নেই।

উত্তর ঃ কেউ কেউ উত্তর দিয়েছেন, হযরত যিমাম ইবনে সা'লাবা রা. ততক্ষন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি। এমতাবস্থায় উত্তরের কোন প্রয়োজন নেই।

তবে ইমাম বুখারী, কাযী ইয়ায এবং হাফিজ আসকালানী র. প্রমুখের পছন্দনীয় উক্তি হল, তিনি মুসলমান হয়ে এসেছিলেন, এজন্য ইমাম বুখারী র. এর উপর ভিত্তি করে শিরোনাম কায়েম করেছেন। আবু সাঈদ হাদ্দাদ ও হুমাইদী র. এর উপর ভিত্তি করেই যিমাম ইবনে সা'লাবা রা. এর রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। কারণ, কাফিরের ক্বিরাআত সর্বসম্মতিক্রমে ধর্তব্য নয়।

◆ সম্বোধনে বে আদবী ও অসৌজন্যমূলক আচরণের উত্তর হল, তিনি নব মুসলিম ছিলেন। তখন পর্যন্ত ইসলামী আহকাম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হননি। তাছাড়া তিনি ছিলেন, একজন বেদুঈন। আদব ও সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। তাঁর মুসলমান হওয়ার সবচেয়ে বড় নিদর্শন হল, তাঁর প্রশ্নাবলীর ধরণ। কারণ, তিনি একত্ববাদ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করেননি এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন মু'জিযা তলব করেননি। বরং, পূর্ণ প্রশ্নগুলো ব্যাপক রিসালাত ও ইসলামী আহকাম সংক্রান্ত।

هذا الرجل الابيض এখানে একদম শ্বেতশুভ্র উদ্দেশ্য নয়। যেমন, শামায়েলে তিরমিযীর রেওয়ায়াতের শব্দগুলো হল- لا بالابيض الامهق ولا بالآدم অর্থাৎ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুনার মত একদম শ্বেতশুভ্র ছিলেন না, আবার একদম গোধুমী রংএর ও ছিলেন না, বরং লালমিশ্রিত ফর্সা ও সুন্দর ছিলেন। কিন্তু যেহেতু শুভ্রতা প্রবল ছিল, সেহেতু ابيض দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

يا ابن عبد المطلب এ সম্বোধন আদব ও সম্মান প্রদর্শনের পরিপন্থী নয়। কারণ, আবদুল মুত্তালিব আরবের প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন। এই সুখ্যাতির ভিত্তিতে হুনাইন যুদ্ধে তিনি নিজেই কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন-

انا النبي لا كذب - انا ابن عبد المطلب

তথা আমি নবী, আর নবী কখনো যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন না, পার্থিব দিক দিয়েও আমি আরবের প্রসিদ্ধ নেতার সন্তান।

قد اجبتك অর্থাৎ, আমি আপনার উত্তর দিয়েছি। অর্থাৎ, আমি পরিপূর্ণ প্রস্তুত আছি। যেন উত্তর দিয়ে ফেলেছি। অকৃত্রিমভাবে জিজ্ঞেস করুন।

২. اجبت অর্থ سمعت অর্থাৎ, আমি তোমার কথা শুনেছি।

امنت بما جئت به যিমাম রা. বলতে লাগলেন, যে হুকুম আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন, আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি। অর্থাৎ, এটি হল, সাবেক ঈমান সম্পর্কে সংবাদ দান। ইমাম বুখারী, আওযাঈ ও কাযী ইয়ায র. এর পছন্দনীয় উক্তি এটিই।

আল্লামা কুরতুবী র. প্রমুখ বলেন, امنت الخ এটি ঈমানের ইনশা তথা নতুনভাবে ঈমান আনয়নের কথা বলছেন। এমতাবস্থায় امنت الخ কে নতুন ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে।

انا ضمام بن ثعلبة যিমাম শব্দটির ض এর নিজে যের। আর ثعلبة শব্দটির ث و ب এর উপর যবর। - উমদা।

اخو بني سعد بن بكر বনু সা'দ এর এই পরিবার হাওয়াযিন গোত্রের একটি শাখা। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধমাতা হযরত হালীমা সা'দিয়া রা. এ গোত্রেরই মহীয়ষী নারী ছিলেন। সম্ভবত এই পরিচিতি দ্বারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আত্মীয়তা ও নৈকট্যের প্রকাশ উদ্দেশ্য ছিল। (যাতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারেন যে,) তাঁর উপর যিমাম রা. এর অধিকার রয়েছে।

এতে হজ্বের উল্লেখ নেই ঃ কেউ কেউ লিখেছেন, তখন পর্যন্ত হজ্ব ফরয হয়নি। এজন্য এ রেওয়ায়াতে তার উল্লেখ নেই। কিন্তু এ বিষয়টি কয়েকটি কারণে সঠিক নয়। ১. মূলত এ রেওয়ায়াতটি সংক্ষিপ্ত। মুসলিম শরীফের ১ম খন্ডে ৩০ নং পৃষ্ঠায় হযরত যিমাম ইবনে সা'লাবা রা.এর এ রেওয়ায়াতে হজ্বের উল্লেখ রয়েছে।

২. স্বয়ং বুখারী শরীফেই ইমাম বুখারী র. এর উস্তাদ হযরত মূসা ইবনে ইসমাঈল র. এর রেওয়ায়াত সাথে সাথে আসছে। তাতে হজ্বের সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। যদিও মূসা ইবনে ইসমাঈল র. এর রেওয়ায়াতটি শুধু ফিরাবরীর কপিগুলোতে আছে। অন্যান্য কপিতে নেই। উমদাতুল কারী, ফাতহুল বারী ও ইরশাদুস সারীর কোনটিতেই মূসা ইবনে ইসমাঈল র. এর রেওয়ায়াতটি নেই। অতএব সাধারণ কপিগুলোর দিকে লক্ষ্য করে- رواه موسي الخ তা'লীক রূপে উল্লেখ করেছেন। যদ্বারা উদ্দেশ্য শাহিদ ও প্রমাণ পেশ করা এবং উপরোক্ত রেওয়ায়াতের সমর্থন ও শক্তি যোগানো।

অবশ্য আমাদের ভারতীয় কপিতে যেহেতু মূসা ইবনে ইসমাঈল র. এর রেওয়ায়াত মাওসূলরূপে বিদ্যমান রয়েছে, এজন্য এ কপিতে- (رواه موسي الخ) ইবারতটির অস্তিত্ব সঠিক নয়। লিপিকার দুটি কপিকে একটিতে গুলিয়ে ফেলেছেন।

আল্লামা আইনী র. বলেন-

رواه موسي الخ اي روي الحديث المذكور موسي بن اسماعيل ابو سلمة المنقري التبوذكي وهو شيخ البخاري وقد مرذكره (يعني في كتاب الوحي، حديث ٤) وهو يروي هذا الحديث عن سليمان بن المغيرة ابى سعيد القيسي البصري عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه واخرجه ابو عوانة في صحيحه موصولا بهذا الطريق وكذا ابن منده في الايمان.

فان قلت لم علقه البخاري ولم يخرجه موصولا؟ قلت قال الكرماني يحتمل ان يكون البخاري يروى عن شيخه موسى بالواسطة فيكون تعليقا وفائدة ذكره الاستشهاد وتقوية ما تقدم. عمدة

৬২ নং হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ

এতেও যিমাম ইবনে সা'লাবা রা. এরই ঘটনা। এ রেওয়ায়াতটি (মূসা ইবনে ইসমাঈল র. এর হাদীসটি) বুখারীর অধিকাংশ কপিতে নেই। এটি শুধু ফিরাবরীরই কপিতে আছে। আর এ কপিটি হিন্দুস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। কিন্তু আল্লামা ফিরাবরী র. ইমাম বুখারী র. এর প্রত্যক্ষ ও বিশিষ্ট শিষ্য। আল্লামা ফিরাবরী র. ইমাম বুখারী র.এর নিকট দুবার অথবা মতান্তরে তিনবার পড়েছেন। এজন্য একপিটি বেশী প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য ভূমিকা দ্র.।

نُهينا في القرآن الاية এটা সাধারণ প্রশ্ন সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা ছিল না। বরং অনর্থক প্রশ্নাবলী থেকে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু مقربان رابيش بود حيراني মূলনীতি হিসেবে সাহাবায়ে কিরাম রা. এর মধ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত ও আজমতের প্রবলতা ছিল। একারণে তারা সম্পূর্ণ বিরত ও সংযত হয়ে যান। যাতে এমন না হয় যে, আমরা কোন প্রশ্ন করলে সেটা ভর্ৎসনা ও আযাবের কারণ হয়ে দাড়ায়। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম রা. মনেপ্রাণে চাইতেন যে, কোন জ্ঞানবান বেদুঈন যদি আসত, যে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞাত নয় এবং যথার্থ কিছু প্রশ্ন করত! এজন্য হযরত উমর ফারুক রা. যিমাম ইবনে সা'লাবা রা. এর প্রশংসা করেছেন- ما رايت احسن مسئلة ولا اوجز من ضمام رضـــ. فتح : ١٢٥/١.

٤٩. بَاب مَا يُذْكَرُ فِي الْمُنَاوَلَةِ وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ

وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضـــ نَسَخَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضـــ الْمَصَاحِفَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الْآفَاقِ وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضـــ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ذَلِكَ جَائِزًا وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ كَتَبَ لِأَمِيرِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ لَا تَقْرَأْهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ উস্তাদ কর্তৃক ছাত্রকে হাদীসের কিতাব প্রদান এবং 'আলিম তথা উস্তাদ কর্তৃক ইলমের কথা লিখে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ।

হযরত আনাস রা. বলেন, হযরত উসমান রা. কুরআনে করীমের বহু কপি তৈরি করে বিভিন্ন দেশে পাঠান। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ ও মালিক র. এটাকে (মুনাওয়ালা বা প্রদানকে) জায়েয মনে করেন। কোন কোন হিজাযবাসী ছাত্রকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি প্রদানের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যে, তিনি একটি সেনাদলের প্রধানকে একটি পত্র দেন এবং তাঁকে বলে দেন, অমুক অমুক জায়গায় না পৌঁছা পর্যন্ত এটা পড়ো না। এরপর তিনি যখন সে স্থানে পৌঁছলেন, তখন লোকজনের সামনে তা পড়ে শোনান এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেন।

যোগসূত্র ঃ হাদীস গ্রহণের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। তম্মধ্যে একটি হল, ছাত্রের নিকট উস্তাদের পাঠ। দ্বিতীয় পদ্ধতি হল, উস্তাদের নিকট ছাত্রের পাঠ। পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে ইমাম বুখারী র. এরই বিবরণ দিয়েছিলেন। উক্ত দুই পদ্ধতি শেষ করে এবার এ অনুচ্ছেদে অতিরিক্ত দুটি পদ্ধতির বিবরণ দিচ্ছেন- ১. مناولة ২. مكاتبة

প্রথম ছুরতটি হল, শায়খ স্বীয় লিখিত হাদীসগুলো সামনা সামনি কোন ছাত্রকে দিয়ে দিবেন। এবার যদি তা দিয়ে রেওয়ায়াতের অনুমতি দেন (যেমন, বললেন, আমি অনুমতি দিচ্ছি, তুমি আমার সনদে হাদীস বর্ণনা কর) তবে এটি হল, مناولة مقرونة بالاجازة বা ইজাযত সম্বলিত মুনাওয়ালা। আর যদি সামনা সামনি লিখিত গ্রন্থ দিয়ে দেন, কিন্তু হাদীস বর্ণনার বা লিপিবদ্ধ হাদীস অনুমতির উল্লেখ না থাকে, তবে এটিকে

বলে, مناولة مجردة عن الاجازة বা অনুমতিশূণ্য মুনাওয়ালা- প্রদান। এমতাবস্থায় শায়খ থেকে হাদীস বর্ণনা করা জায়িয হবে না। অবশ্য এভাবে রেওয়ায়াত করতে পারে যে, ناولني فلان كتابا فيه هذا.।

এ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পদ্ধতি হল মুকাতাবা। এর পন্থা হল, শায়খ স্বীয় লিখিত হাদীসগুলো অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করে হাদীস বর্ণনার অনুমতি দেন।

মুনাওয়ালা ও মুকাতাবা যদি অনুমতি সম্বলিত হয়, তবে এ দুটি ছুরত সহীহ এবং নির্ভরযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে ইমাম বুখারী র. উক্ত বর্ণনাটি পেশ করেন।

প্রথম প্রমাণ ঃ وقال انس رضــ نسخ عثمان رضــ المصاحف الخ - اَلْمَصَاحِف শব্দটি مصحف এর বহুবচন।

مصحف এর মীমের উপর তিন হরকত জায়িয আছে। তবে প্রসিদ্ধ হল, مُصْحَف মীমের উপর পেশ সহকারে। এর অর্থ হল, চামড়া দ্বারা বাইন্ডিংকৃত গ্রন্থ। এখানে উদ্দেশ্য কুরআন মাজীদ।

হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেছেন, হযরত উসমান রা. মাসাহিফ তথা কুরআন মজীদের বিভিন্ন কপি লিখিয়েছেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়েছেন।

ইমাম বুখারী র. এ স্থলে যে রেওয়ায়াতটির দিকে ইঙ্গিত করেছেন, সেটি বুখারী শরীফের ২য় খণ্ডে ৭৪৬ পৃষ্ঠায় পূর্ণ সনদ সহকারে সবিস্তারে বিদ্যমান রয়েছে। যার সারমর্ম হল, হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রা. আরমেনিয়া ও আযরবাইজান এলাকা বিজয়ের উদ্দেশ্যে জিহাদে যান। সেখানে দেখেন, ইরাক ও শামের মুসলমানদের কুরআন মজীদের কিরাআতে ইখতিলাফ হচ্ছে। অর্থাৎ, আলাদা আলাদা পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করছেন। সবাই নিজ নিজ পদ্ধতিকে সহীহ, আর অপরের কিরাআতকে ভুল বলছেন। হযরত হুযাইফা রা. এই ইখতিলাফ দেখে ঘাবড়ে যান। তিনি হযরত উসমান রা. এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি এ উম্মতের খবর নিন এবং ইয়াহুদী, খ্রিষ্টানদের ন্যায় আল্লাহর কিতাবে মতানৈক্যের পূর্বে মহা মসিবত থেকে বাঁচান। তখন হযরত উসমান রা. উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা রা. এর নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, আপনি আপনার মাসহাফ আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আমরা এর কপি করে, মাসহাফ পূনরায় আপনার নিকট ফেরত পাঠাব। উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা রা. স্বীয় মাসহাফ পাঠিয়ে দিলেন। তখন হযরত উসমান রা. হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, সাঈদ ইবনুল আস ও আবদুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশাম রা. কে নির্দেশ দেন। এরা সবাই এক কপি তৈরি করেন। তাঁরা যখন মাসহাফের কপি তৈরি করেন, তখন উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা রা. এর নিকট তার মাসহাফ ফেরত পাঠিয়ে দেন। হযরত উসমান রা. বিভিন্ন এলাকায় (বসরা, কুফা, শাম, মক্কা ইত্যাদিতে) এক একটি কপি পাঠিয়ে দেন।

সারকথা, যখন ২৫ হিজরীতে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান রা. ইরাক ও শামবাসীর কুরআন সংক্রান্ত মতানৈক্য দ্বারা ফিতনার আশংকা করলেন, তখন তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা. কর্তৃক সংকলিত সহীফা লিখিয়ে একাধিক কপি তৈরি করেন এবং এ সমস্ত কপি তৈরি করেছিলেন শুধু কুরাইশের ভাষা অনুযায়ী। যেহেতু কুরআন মজীদ মূলত কুরাইশের ভাষাতেই হয়েছে এবং পরবর্তী যৌগিক কারণে বিভিন্ন রকমের উদারতা খতম করে লিপিবদ্ধরূপই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যাতে মতানৈক্যের দরজা সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হয়ে যায়। আর এই কপিটির নকল বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়েছিলেন।

এতে বুঝা গেল, কিতাব পাঠানোর পদ্ধতি (মুকাতাবা)ও গ্রহণযোগ্য। যেহেতু কুরআন মাজীদের ক্ষেত্রে মুকাতাবাতের এ পদ্ধতি নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য, সেহেতু হাদীসের ক্ষেত্রে তো এটা উত্তমরূপে গ্রহণযোগ্য হবে।

দ্বিতীয় প্রমাণ : ورای عبد الله بن عمر رضـ الخ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী ও ইমাম মালিক র. এই মুনাওয়ালাকেও জায়িয মনে করেন।

স্মর্তব্য যে, এ আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে আসিম ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব হলেন, আবু আবদুর রহমান কুরাশী মাদানী। অর্থাৎ, হযরত উমর রা. এর নাতি। যিনি আবদুল্লাহ উমারী নামে প্রসিদ্ধ। এটাই তাহকীক আল্লামা আইনী ও আল্লামা কিরমানী র.এর। যদিও এখানে হযরত উমর রা. এর সাহেবযাদা আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। والله اعلم

তৃতীয় প্রমাণ : واحتج بعض اهل الحجاز الخ – بعض اهل الحجاز দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ইমাম বুখারী র. এর উস্তাদ হুমাইদী র.। শায়খ হুমাইদী র. মুনাওয়ালার বিশুদ্ধতার জন্য স্বীয় গ্রন্থ নাওয়াদিরে এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। হাদীসের সারমর্ম হল, দ্বিতীয় হিজরীর জুমাদাস সানীতে বদর যুদ্ধের পূর্বে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১২জন মুহাজিরকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রা. এর নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। এ সারিয়্যার কমান্ডার আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রা.কে একটি চিঠি দিয়ে বলেছেন, দু দিন সফর করার পর তা খুলবে এবং সাথীদেরকে পড়ে শুনাবে এবং তদানুযায়ী আমল করবে। সে স্থানে পৌছে যখন চিঠি খোলা হল, তখন দেখা গেল, তাতে এই দিক নির্দেশনা ছিল যে, মক্কা ও তায়েফের মাঝে নাখলা নামক স্থানে পৌছে কুরাইশের অবস্থা জানবে এবং এ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করবে। সাথীদের কাউকে বাধ্য করবে না। যার ইচ্ছা যাবে, যার ইচ্ছা যাবে না। সে ঘোষনার পর দু ব্যক্তি ফিরে আসেন। এমতাবস্থায় কুরাইশের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা সামনে এসে পৌছে। সে দিনটি ছিল রজবের ১লা তারিখ। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের চাঁদের ২৯ তারিখের কথা জানা ছিল না। রজবের প্রথম তারিখকে ৩০ জুমাদাস সানী মনে করে আমর ইবনে হাযরামী নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেন, দুজনকে গ্রেফতার করেন এবং কিছু গনীমতের মালও অর্জন করেন।

فكان اول مقتول من الكفار في الاسلام وذلك في اول يوم من رجب وغنموا ما كان معهم فكان اول غنيمة في الاسلام.

মোটকথা, ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য হল, এর দ্বারা অনুমতি সম্পন্ন মুনাওয়ালা প্রমাণিত হয়ে গেছে। কারণ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চিঠি সামনা সামনি দিয়েছেন, এটি না পড়ে শুনিয়েছেন, না শুনেছেন। শুধু চিঠি দিয়েছেন, আর বলেছেন, দু দিন পরিমাণ সফর করে চিঠি খুলবে এবং সাথীদের পড়ে শুনাবে। কাজেই এটি অনুমতি বিশিষ্ট্য মুনাওয়ালার প্রকার হয়ে গেল। এতে মুকাতাবার অর্থও বিদ্যমান রয়েছে এবং এর উপর আমলের হুকুম পড়েছে।

٦٣. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضـ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ .

৬৩. ইসমাঈল ইবনে আবদুল্লাহ র. .... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাইফা রা.কে) তাঁর চিঠি দিয়ে প্রেরণ করলেন এবং তাকে বাহরাইনের গভর্নর (মুনযির ইবনে সাওয়া) -এর কাছে তা পৌঁছে দিতে হুকুম করলেন। এরপর বাহরাইনের গভর্নর তা পারস্য সম্রাট (খসরু পারভেজ) এর কাছে দিলেন। পত্রটি পড়ার পর সে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল। [বর্ণনাকারী ইবনে শিহাব র. বলেন] আমার ধারণা ইবনে মুসাইয়্যিব র. বলেছেন, (এ ঘটনার সংবাদ পেয়ে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য বদদু'আ করেন, যেন ইরানী সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫, জিহাদ ঃ ৪১৪, মাগাযী ঃ ৬৩৭, ১০৭৯।

ব্যাখ্যা ঃ

رجلا দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহমী রা.। যিনি ছিলেন, পুরানো মুসলিম এবং প্রথম দিককার মুহাজিরদের একজন। তাঁর ওফাত হয়েছে, হযরত উসমান রা. এর খিলাফত যুগে।

الى عظيم البحرين তিনি হলেন, মুনযির ইবনে সাওয়া। রাজা বাদশাহদের সাধারণ রীতি ছিল, মাধ্যম ছাড়া চিঠি গ্রহণ করতেন না। এজন্য পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট চিঠি পাঠানো হয়েছিল, বাহরাইনের মহান নেতার (গভর্ণরের) মাধ্যমে।

كسرى পারস্য সম্রাটের উপাধি হত কিসরা। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত চিঠি যে কিসরা ছিড়ে ফেলেছিল, সে ছিল নওশিরওয়াঁর নাতি খসরু পারভেজ ইবনে হুরমুয ইবনে নওশিরওয়াঁ।

فحسبت এটি হল, হাদীস বর্ণনাকারী ইবনে শিহাব র. এর উক্তি।

كل ممزق এরূপ টুকরো টুকরো করা, যে এর পরে আর টুকরোই হতে পারে না।

কিসরার ধ্বংস ঃ

ঘটনা হল, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়ার সন্ধির পর বিভিন্ন রাজা-বাদশাহর নিকট ইসলাম প্রচারমূলক চিঠি পত্রগুলো প্রেরণ করেছিলেন। এর মধ্যে একটি চিঠি লিখেছিলেন কিসরার নিকট। এটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রা. এর নিকট দিয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন বাহরাইনের গভর্নর মুনযির ইবনে সাওয়ার নিকট পৌছে দেন। ফলে বাহরাইনের গভর্ণর সে চিঠি পারস্য সম্রাটের নিকট পৌছে দেন।

রীতি অনুযায়ী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ চিঠির প্রারম্ভে নিজের নাম শুরুতে লিখেছেন- من محمد رسول الله الى كسرى الخ খসরু পারভেজ তার নাম প্রথমে না দেখে ভীষন অসন্তুষ্ট হয়। ক্রুদ্ধ হয়ে সে এ বরকতময় চিঠিটি ছিড়ে ফেলে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সম্মানিত এ চিঠিটি ছিড়ে ফেলার সংবাদ এলে তিনি বদ দু'আ করলেন, সে যেমন আমার এ চিঠি ছিড়ে ফেলেছে, আল্লাহও যেন তেমনি তার রাজত্ব টুকরো টুকরো করে দেন। এ বদ 'দুআর প্রভাব তার জান ও হুকুমত উভয়টির উপর পড়ে।

বাহ্যিক কারণ এই হয়েছিল যে, খসরু পারভেজের ছেলে শিরওয়াইহ আপন সৎমা শিরীনের প্রতি আসক্ত হয়ে যায়। বাপের বর্তমানে শিরীনের উপর হস্তক্ষেপ কঠিন ছিল। এজন্য সে তার পিতাকে হত্যা

করার মনস্থ করে। এদিকে পিতা খসরু পারভেজ ছেলের ভয়ংকর ইচ্ছা সম্পর্কে অবহিত হয়ে যায়। তাই সে একটি বিষের শিশিতে 'যৌনশক্তি সৃষ্টিকারক' লেবেল লাগিয়ে শাহী ট্রেজারীতে রেখে দেয়। যাতে ছেলেও বেঁচে থাকতে না পারে। পরে ছেলে সত্যিই পিতাকে হত্যা করে। শিরীন এঘটনা শুনে আত্মহত্যা করে। কিসরা হত্যার পর যখন শিরওয়াইহ সিংহাসনে আরোহন করে এবং ট্রেজারী খুলে, তখন 'যৌনশক্তি সৃষ্টিকারক' লেবেল দেখে খুব আনন্দিত হয় এবং তা ব্যবহার করে ধ্বংস হয়ে যায়। অতঃপর তার কম বয়স্কা কন্যা পূরান রাজ সিংহাসনে আরোহন করে। পরে দেশে গন্ডগোল শুরু হয়। অবশেষে হযরত উমর ফারুক রা. এর যুগে তার রাজত্ব সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়। এমনভাবে তছনছ হয়ে যায় যে, কোনও নাম নিশানাও আর পাওয়া যায় না। - اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده

শিরোনামের সাথে মিল ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রা.কে সামনা সামনি সম্মানিত চিঠি দিয়ে অনুমতি দিয়েছেন। যাতে বাহরাইনের গভর্ণরকে বলেন, এ সম্মানিত চিঠি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। সামনা সামনি এ প্রদানকে বলে মুনাওয়ালা। কিসরার নিকট এ মর্যাদাপূর্ণ চিঠি প্রেরণ করেছেন। এর দ্বারা মুকাতাবা প্রমাণিত হয়েছে।

٦٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ قَالَ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَنْ قَالَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَنَسٌ.

৬৪. মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল র. ...... হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (অনারব বা রোমের বাদশাহর নিকট) একটি পত্র লিখলেন অথবা একটি চিঠি লিখতে মনস্থ করলেন। তখন তাঁকে বলা হল যে, তারা (রোমবাসী ও অনারবরা) সীলমোহরযুক্ত ছাড়া কোন পত্র পড়ে না (নির্ভরযোগ্য মনে করে না)। এরপর তিনি রূপার একটি আংটি (মোহর) তৈরী করালেন যার নকশা ছিল مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله (হযতর আনাস রা. বলেন,) আমি যেন তাঁর হাতে সে আংটির ঔজ্জ্বল্য (এখনো) দেখতে পাচ্ছি। [শু'বা র. বলেন] আমি কাতাদা র. কে বললাম, কে বলেছে যে, তার নকশা مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ছিল? তিনি বললেন, 'হযরত আনাস রা.।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫, ৪১৪, লিবাস ঃ ৮৭২, আহকাম ঃ ১০৬১।

ব্যাখ্যা ঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে চিঠি-পত্র পাঠানোর ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর নিকট আরয করা হল যে, সে সব রাজা বাদশাহর নিকট ছিল মোহর ছাড়া কোন লেখা দর্শনযোগ্যও মনে করা হয় না। যেহেতু এসব চিঠির সম্পর্ক প্রচার ও তাবলীগের সাথে, সেহেতু মোহর তৈরি করা ছিল জরুরী। যাতে তারা এটাকে নির্ভরযোগ্য ও সম্মানিত মনে করে পাঠ করেন এবং ইসলামের দাওয়াত তাদের নিকট পৌঁছতে পারে। এ প্রয়োজনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুপার আংটি তৈরি করান। তাতে محمد رسول الله এর চিত্র ছিল। এই নকশা ছিল, তিন লাইনে। প্রথম লাইনে الله, দ্বিতীয় লাইনে, رسول ও তৃতীয় লাইনে محمد। যেন নিচ থেকে পড়লে হবে

الله
رسول
محمد.

قال في فيض الباري علم منه انه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب اتخاذ الخاتم ثم اتخذها لاجل الضرورة فاحفظه كالاصل فانه يدل على انه قد يترك شئ مرضي عند الضرورة، وكان نقش محمد رسول الله على اختلاف في صورته، وكان نقش خاتم عمر رضي الله تعالى عنه كفى بالموت واعظا، وكان نقش خاتم امامنا رحمه الله تعالى عنه قل الخير والا فاسكت وهذا يدل على انه لا يحب كتابة اسم صاحب الخاتم على الفص وكان الخاتم في القديم امارة لاختتام الشيئ ويختم الآن للتصديق، وقوله تعالى خاتم النبيين على العرف القديم فلا حاجة فيه للشقي القادياني.

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের দুটি অংশের সাথেই হাদীসের মিল রয়েছে। মুনাওয়ালার সাথে এই সম্পর্ক যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সম্মানিত চিঠি নিজ দূতদেরকে দিয়েছেন। আর মুকাতাবার সাথে সম্পর্ক তো সম্পূর্ণ স্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه

অর্থ ঃ হে রাসূল! আপনার প্রতি আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি অনুরূপ না করেন, তবে আপনি আপনার রিসালাতের প্রচার করলেন না।

আল্লাহ তা'আলার এই ফরমানের উপর আমলের জন্য বিভিন্ন রাজা-বাদশাহর নামে তিনি চিঠি-পত্র প্রেরণ করেন। এতে বুঝা গেল, মুকাতাবাতের পন্থাও নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য।

٥٠. بَابٌ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِيْ بِهِ الْمَجْلِسُ وَمَنْ رَاٰى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيْهَا

৫০. অনুচ্ছেদ ঃ ঐ ব্যক্তির বর্ণনা যে মাহফিলের পিছনে বসে এবং ঐ ব্যক্তি যে মজলিসের মধ্যবর্তী স্থানে জায়গা পেয়ে বসে পড়ে।

٦٥. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ .

৬৫. ইসমাঈল র. ..... হযরত আবূ ওয়াকিদ আল-লাইসী রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন; তাঁর সঙ্গে আরও লোকজন (বসা) ছিলেন। ইতোমধ্যে তিনজন লোক (বাইর থেকে) এলেন। (আবু ওয়াকিদের বিবরণ) তন্মধ্যে দু'জন রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে এগিয়ে এলেন (তাঁর কথা শুনার জন্য) আরেকজন চলে গেলেন। এরপর তাঁদের একজন মজলিসের মধ্যে কিছুটা জায়গা দেখে সেখানে বসে পড়লেন, অন্যজন তাদের পেছনে বসলেন। আর তৃতীয়জন ফিরে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিস (ওয়াজ) শেষ করে (সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করে) বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলব? তাদের একজন আল্লাহর দিকে এগিয়ে এসেছে তাই আল্লাহ্ তাকে স্থান দিয়েছেন। (সে কল্যানের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে আল্লাহ তাকে এর সওয়াব দিয়েছেন) অন্যজন (ভীড় ঠেলে অগ্রসর হতে অথবা ফিরে যেতে) লজ্জাবোধ করেছে। আর অপরজন (মজলিসে উপস্থিতি থেকে) বিমুখ হয়েছে, তাই আল্লাহও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ

لان الترجمة فيمن قعد حيث ينتهي به المجلس وفيمن راى فرجة في الحلقة فجلس فيها والحديث مشتمل على ذكر الحلقة والفرجة وعلى من جلس ينتهي به المجلس. عمدة : ٣١/٢ــ٣٣.

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল স্পষ্ট। কারণ, শিরোনামে সে ব্যক্তি সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে, যিনি মজলিসের শেষে বসেন এবং যিনি চক্রের মাঝে প্রশস্ত জায়গা দেখে সেখানে বসে পড়েন। হাদীসে চক্র ও মধ্যবর্তী প্রশস্ত জায়গা এবং মজলিসের শেষে উপবেশনকারী সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য ঃ কিতাবুল ইলমের সাথে এ অনুচ্ছেদের সম্পর্ক হল, এখানে হালকা তথা পাঠচক্র এবং মজলিস দ্বারা উদ্দেশ্য ইলমের হালকা ও ইলমী মজলিস। ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য তালিবে ইলমকে কোন ইলমী মজলিসে অংশগ্রহণের আদব শিক্ষা দান যে, যেখানে স্থান পাবে সেখানেই বসে যাবে। এতে রয়েছে গর্ব-অহংকারের চিকিৎসা। অনর্থক মজলিসের লোকজনকে পেরেশান করার জন্য ঘাড় টপকে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু কোন ইলমী হালকায় যদি সামনে স্থান খালি থাকে, তাহলে সামনে অগ্রসর হয়ে শূণ্যস্থান পূর্ণ করে দেয়া জায়িয আছে। উদ্দেশ্য হল, কোন ইলম, যিকির ও ওয়াজ নসীহতের মজলিসে পৌঁছে প্রথমে দেখবে, যদি ভিতরে জায়গা থাকে তবে সামনে এগিয়ে সেখানে বসতে পারবে। অন্যথায় যেখানে সহজ সেখানেই বসে যাবে। যদি জায়গা না পাওয়া যায়, তবে সেখান থেকে ফিরে চলে যাওয়া জায়িয নেই। যদি ইলমী মজলিসে বসে তবে ইলমী উপকারিতা ছাড়াও আল্লাহর রহমতের কোলে স্থান পাবে। যদি তোয়াক্কাহীনতার ফলে সেখান থেকে ফিরে রওয়ানা করে তবে নিজেই নিজের ক্ষতি করল। ইলমী মজলিস থেকে ফিরে চলে আসা যদি অহংকারের কারণে হয়, তবে তা হারাম। আর যদি বেপরোয়া ভাবের কারণে হয়ে থাকে, তবে একটি সৌভাগ্যবান মজলিস থেকে উপকৃত হওয়া থেকে অবশ্যই বঞ্চিত হবে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৫-১৬, সালাত ঃ ৬৮, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি।

واما الآخر فاستحى فاستحى الله منه দ্বিতীয় ব্যক্তি ভিতরে প্রবেশ করতে লজ্জাবোধ করেছে ফলে আল্লাহও তার ব্যাপারে সংকোচ করেছেন।

এ বাক্যটির উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের দুটি উক্তি রয়েছে।

১. প্রথম ব্যক্তি সামনে মজলিসে স্থান দেখেছে, সে অগ্রসর হয়ে সেখানে বসে গেছে। কিন্তু দ্বিতীয় সাথী সংকোচবোধ করল মানুষের ঘাড় টপকে কিভাবে সামনে যাবে? ফলে সে মজলিসের শেষে বসে যায়, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে এ লজ্জার প্রতিদান দেন এবং মজলিসে বসার সওয়াবও দান করেন। এমতাবস্থায় তার মর্যাদা প্রথম ব্যক্তির চেয়েও বেড়ে যাবে।

২. দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, তার উদ্দেশ্য মজলিসে বসা ছিল না, তার মনে চাচ্ছিল তৃতীয় দিকে চলে যাবে, কিন্তু সংকোচ মনে হল যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলবেন! সাহাবায়ে কিরাম রা. কি বলবেন! সে সংকোচ মনে করে দরবারে বসে গেছে। এমতাবস্থায় তার দরজা প্রথম ব্যক্তির চেয়ে কম হবে। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তার এ তোয়াক্কাহীনতার ফলে আল্লাহ তা'আলাও তার থেকে বিমূখ হয়েছেন। অর্থাৎ, তার প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন। তবে শর্ত হল, তা বিনা ওযরে হতে হবে।

صنعت مشاكلة এ হাদীসে اعراض - استحياء - ايواء শব্দগুলো صنعت مشاكلة রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এরূপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে সব শব্দের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া সম্ভব হয় না, সেখানে এগুলোর ফল ও আবশ্যকীয় অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়।

একটি উপদেশমূলক ঘটনা ঃ

এ হাদীসে একটি শব্দ এসেছে, فرجة এর ফা এর উপর পেশ ও যবর উভয়রূপে ব্যবহৃত হয়। নাহব শাস্ত্রের একজন প্রসিদ্ধ ইমাম আবূল আ'লা নাহবী র. এর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে, তাঁর এ শব্দটি সম্পর্কে দোদুল্যমানতা ছিল যে, ফা এর উপর যবর অধিক ফসীহ, না পেশ? তিনি ছিলেন, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের যুগের লোক। কোন ব্যাপারে হাজ্জাজের সাথে তার সাথে বিতর্ক হলে তিনি হাজ্জাজের ভয়ে কোন গ্রামে অবস্থান করতে শুরু করেন। একদিন এক বেদুঈন হাজ্জাজের ইনতিকালে একটি কাব্য পড়তে যাচ্ছিল। প্রবল ধারণা অনুসারে আবুল আ'লার মত তার মনও আহত ছিল। সে কাব্যটি হল- ربما تكره النفوس من الدهر — له فرجة كحل العقال কখনো এরূপও হয়ে থাকে যে, যুগের তিক্ত পরীক্ষার কারণে স্বভাবে সংকীর্ণতা এসে যায়, কিন্তু আশাতীতভাবে হঠাৎ করে তা থেকে মুক্তি লাভ হয়, যেমন, উটের রশি খুলে গেল আর সে মুক্ত হয়ে গেল।

মোটকথা, সে বেদুঈন জালিম হাজ্জাজের মৃত্যুতে আনন্দিত হয়ে উপরোক্ত কাব্য আবৃতি করছিল। আবুল আ'লা বলেন, হাজ্জাজের মৃত্যুতে আমরাও বিরাট আনন্দ হল, তবে আমি ফয়সালা করতে পারছিলাম না যে, তার মৃত্যুতে আমার বেশী আনন্দ হয়েছে, না এ কারনে যে, فرجة শব্দটি যবর সহকারে বেদুঈন আবৃতি করেছে। যার ফলে আমার তাহকীক হল যে, পেশের তুলনায় যবরের ছুরতটিই অধিক ফসীহ।

এর দ্বারা ভালরূপে অনুমান করা যায় যে, আগেকার যুগে ইলমের কতটা কদর ও মূল্য ছিল যে, হাজ্জাজের কারনে তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, চিন্তা করছিলেন, কোন রকমে জান বেঁচে যায় কিনা! কত কষ্ট মুসিবত বছরের পর বছর সহ্য করেছেন! কিন্তু স্বয়ং ভাষার ইমাম হওয়া সত্ত্বেও একটি শব্দের তাহকীক লাভ করে এত বেশি খুশী হয়েছেন ও তা উদযাপন করছেন! যার ফলে এটি সমস্ত বিপদ থেকে মুক্তির আনন্দের সমান হয়ে যায়। -নাফহাতুল ইয়ামান।

٥١. بَابُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعَى مِنْ سَامِعٍ.

৫১. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঃ

যাদের কাছে হাদীস পৌঁছান হয় তাদের মধ্যে অনেকে এমন আছে, যে শ্রোতা (বর্ণনাকারীর) চেয়ে বেশী মুখস্থ রাখতে পারে। বুখারী ঃ ১৬

مبلغ লামের উপর যবর অর্থাৎ, رب مبلغ اليه (যার কাছে পৌছানো হয়)

اوعى। এই হেফাজত শব্দ ও অর্থ উভয়টিকে অন্তর্ভূক্ত করে। উম্মতের অনেক মনীষী এরূপ অতিক্রান্ত হয়েছেন, যারা হিফজ ও ফিকহী জ্ঞানে কোন কোন সাহাবী থেকেও অগ্রসর ছিলেন। কিন্তু এটি হল, একটি বিচ্ছিন্ন শাখাগত শ্রেষ্ঠত্ব। মৌলিক ফযীলত সাহাবায়ে কিরামের জন্যই বিশেষিত। কোন ব্যক্তি কোন নূন্নতম স্তরের সাহাবীর মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

٦٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رضــ ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ .

৬৬. মুসাদ্দাদ র. .... হযরত আবূ বাকরা রা. থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা উল্লেখ করে বলেন, (মিনায়) তিনি তাঁর উটের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। একজন লোক তাঁর উটের লাগাম ধরে রেখেছিল। তিনি বললেন ঃ 'আজ কোন্ দিন?' আমরা নীরব থাকলাম। ধারণা করলাম, তিনি এ দিনটির আলাদা কোন নাম দেবেন। তিনি বললেন ঃ 'এটা কি কুরবানীর দিন নয়?' আমরা বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন ঃ 'এটা কোন্ মাস?' আমরা নীরব থাকলাম, ধারণা করতে লাগলাম, তিনি হয়ত এর (প্রচলিত) নাম ছাড়া অন্য কোন নাম বলবেন। তিনি বললেন ঃ 'এটা কি যিলহজ্জ নয়?' আমরা বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন ঃ (জেনে রেখ) 'তোমাদের প্রান, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম, যেমন আজকের এ মাস, তোমাদের এ শহর, আজকের এ দিন সম্মানিত। এখানে উপস্থিত ব্যক্তি (আমার এ বাণী) যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়। কারণ, উপস্থিত ব্যক্তি হয়ত এমন এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছাবে, যে এ হাদীসকে তার থেকে বেশী মুখস্থ রাখতে পারবে।'

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে অর্থগত দিক দিয়ে। অর্থাৎ, হাদীসের শেষাংশ- ليبلغ الشاهد الغائب فان الشاهد عسى ان يبلغ من هو اوعى এর সাথে স্পষ্ট।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, কিতাবুল ইলম ঃ ১৬, ২১, মানাসিক ঃ ২৩৪, বাদউল খালক ঃ ৪৫৩, মাগাযী ঃ ৬৩২, তাফসীর ঃ ৬৭২, আযাহী ঃ ৮৩৩, ফিতান ঃ ১০৪৮, তাওহীদ ঃ ১১০৯।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে ১০ই যিলহজ্ব কুরবানী দিবসে মিনাতে প্রদত্ত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষন রয়েছে।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবূ বাকরা র. ছিলেন তাবিঈ। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ বাকরা রা. এর সন্তান। ولد في الاسلام بالبصرة سنة ١٤ وتوفي سنة ٩٩ من الهجرة النبوية.

তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাল বর্ণনা করছেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের উপর আরোহী ছিলেন। হযরত আবূ বাকরা রা. লাগাম ধরে আছেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন দিবস?

فسكتنا তথা আমরা নীরব থাকলাম। কিন্তু কিতাবুল হজ্বে ২৩৪ পৃষ্ঠায় আছে, قلنا الله ورسوله اعلم অতঃপর এ পৃষ্ঠাতে হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর রেওয়ায়াতের শব্দরাজি হল- قالوا يوم حرام

বাহ্যত উভয়টিতে বিরোধ রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কোন বিরোধ নেই, যেহেতু সমাবেশ ছিল বিশাল। কিছু সংখ্যক লোক الله ورسوله اعلم বলে নীরব হয়ে যান। আর যারা হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর কাছে ছিলেন. তারা উত্তর দিয়েছেন يوم حرام বলে।

মোটকথা, স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্নমূলক পন্থা অবলম্বন করেছেন যাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ইরশাদগুলোর গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে যায় এবং উপস্থিত লোকজন ভাল করে আত্মস্থ করে নেন যে, মুসলমানদের ইযযত, হুরমত এবং তার জান-মালের সম্মান সর্বদা প্রতিটি স্থানে জরুরী ও ফরয। বরং হারাম মাসগুলোর হুরমত থেকেও বেশী অবশেষে বলেছেন, যারা এখানে উপস্থিত আছ তাদের উচিত, অনুপস্থিত লোকদের নিকট আমার পয়গাম পৌঁছে দেয়া।

ليبلغ الشاهد গাইনের নিচে যের। নির্দেশসূচক শব্দ। এটি ওয়াজিব প্রমান করে। এতে বুঝা গেল. তাবলীগ ওয়াজিব। বাকি বিদায় হজ্বের বিস্তারিত বিবরণের জন্য লেখকের নাসরুল বারী কিতাবুল মাগাযী পৃষ্ঠা ৪৭২ দ্রষ্টব্য।

৫২. بَابٌ الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاعْلَمْ اَنَّه لَا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ فَبَدَاَ بِالْعِلْمِ نَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَرَّثُوا الْعِلْمَ مَنْ اَخَذَه اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ بِه عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَه طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَقَالَ اِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلاَّ الْعَالِمُوْنَ فَ وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ وَقَالَ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدِ اللهُ بِه خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَاِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ فَ اَبُوْ ذَرٍّ لَوْ وَضَعْتُمُ الصَّمْصَامَةَ عَلَى هَذِهِ وَاَشَارَ اِلَى قَفَاهُ ثُمَّ ظَنَنْتُ اَنِّيْ اُنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنَ نَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اَنْ تُجِيْزُوْا عَلَيَّ لَاَنْفَذْتُهَا وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ غَائِبَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كُوْنُوْا رَبَّانِيِّيْنَ حُكَمَاءَ فُقَهَاءَ عُلَمَاءَ وَيُقَالُ الرَّبَّانِيُّ الَّذِيْ يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ.

৫২. পরিচ্ছেদ ঃ কথা ও আমলের পূর্বে ইলম জরুরী।

আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ -

فَاعْلَمْ اَنَّه لَا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ

"সুতরাং জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই।" (৪৭ ঃ ১৯)

এখানে আল্লাহ তা'আলা ইলমের কথা আগে বলেছেন। আলিমগণই নবীগণের ওয়ারিস। তাঁরা ইসলামের ওয়ারিস হয়েছেন। তাই যে ইলম অর্জন করে সে বিরাট অংশ লাভ করে। আর যে ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে পথ চলে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন-

اِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলিমরাই তাকে ভয় করে।" (৩৫ ঃ ২৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন-

وَمَا يَعْقِلُهَا اِلاَّ الْعَالِمُوْنَ

"আলিমরা ছাড়া তা কেউ বুঝে না।"

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ

"তারা বলবে, যদি আমরা (গ্রহণের জন্য) শুনতাম অথবা বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামী হতাম না। (৬৭ ঃ ১০)

তিনি আরো ইরশাদ করেন-

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ

"বলুন, যাদের ইলম আছে এবং যাদের ইলম নেই তারা কি সমান?" (৩৯ ঃ ৯)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন। আর অধ্যয়নের মাধ্যমেই ইলম অর্জিত হয়। হযরত আবূ যর রা. তাঁর ঘাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, যদি তোমরা এখানে তরবারী ধর, এরপর আমি বুঝতে পারি যে, তোমরা আমার উপর সে তরবারী চালাবার আগে আমি কিছু কথা বলতে পারব, যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, তবে অবশ্যই আমি তা বলবো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী- উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে (আমার বাণী) পৌঁছে দেয়।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, كُوْنُوْا رَبَّانِيِّيْنَ (তোমরা আল্লাহ ওয়ালা- রব্বানী হও)। এখানে رَبَّانِيِّيْنَ অর্থ প্রজ্ঞাবান, আলিম ও ফকীহগণ। আরো বলা হয়, رَبَّانِي তাঁকে বলা হয় যিনি মানুষকে জ্ঞানের বড় বড় বিষয়ের পূর্বে ছোট ছোট বিষয় শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলেন।

ব্যাখ্যা ঃ এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য হল, একথা বুঝানো যে, ইলম সত্ত্বাগতভাবে বচন ও আমলের উপর প্রাধান্য রাখে। সমস্ত আমল ও উক্তি ইলমের উপরই নির্ভরশীল। কারণ, উক্তি ও আমলের সঠিকত্ব ইলমের উপরই মওকূফ। যখন জানবেই না তখন কোন কথা বলবে কিভাবে? আমল করবে কিভাবে? তাছাড়া মর্যাদাগতভাবেও আমলের উপরে ইলমের ফযীলত রয়েছে। কারণ, ইলম হল, কলবের আমল। কলব হল, সর্বশ্রেষ্ঠ দৈহিক অঙ্গ। আর আমল ও উক্তির সম্পর্ক শরীরের অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা হাত, পা, যবান ইত্যাদির সাথে রয়েছে, সেগুলো কলবের তুলনায় নিচু পর্যায়ের।

ইমাম গাযযালী র. এর উদাহরণ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, এক ব্যক্তি যাচ্ছিল, দূর থেকে এক চলন্ত ব্যক্তিকে দেখে মনে করেছে এটি সিংহ। যদি তাই মনে করে, তবে সে কখনো সে দিকে কদম বাড়াবে না। বরং উল্টো পায়ে পালিয়ে আসবে। যদিও সেটি প্রকৃত অর্থে গরু, গাভীই হোক না কেন? আর যদি সে সেটাকে বলদ মনে করে তবে সে নির্ভয়ে চলে যাবে। যদিও সে বাস্তবে সিংহই হোক না কেন? বুঝা গেল, আমল নির্ভর করে ইলমের উপর।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে দুটি শক্তি রেখেছেন। একটি হল, কোন জিনিসের জানার, দ্বিতীয়ত তা করার। প্রথমে মানুষ ইলম অর্জন করে, অতঃপর আগ্রহ কিংবা ভয় সৃষ্টি হয়। অতঃপর আকর্ষন বা ঘৃণার ফলে ইরাদায় গতি সৃষ্টি হয়। ইচ্ছার পর ক্ষমতাকে গতিশীল করে। এরপর ক্ষমতা ব্যবহার করলে পরে আমল অস্তিত্ববান হয়। এতে বুঝা গেল, আমল ইলমের শাখা প্রশাখা।

ইমাম বুখারী র. শিরোনাম প্রমাণ করার জন্য সর্বপ্রথম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা র. এর প্রমাণ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

فَاعْلَمْ اَنَّه لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ الآية

এই আয়াতে কারীমায় ইলম ও আমল উভয়টির উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু প্রথমে ইলম অর্থাৎ, فاعلم انه لا اله الا الله এরপর ইরশাদ করেন, واستغفر لذنبك এটি হল, আমল তথা ইসতিগফার করা।

ان العلماء هم ورثة الانبياء - ورثوا العلم রা এর উপর তাশদীদযুক্ত যবর। অর্থাৎ, নবীগণ ইলমী পরিত্যক্ত সম্পদই রেখে গেছেন। এর বর্ণনায় শব্দ এসেছে- ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم الحديث ابو داود كتاب العلم অর্থাৎ, নবীগণ দিরহাম দীনার তথা পার্থিব ধন সম্পদের উত্তরাধিকারী বানাননি বরং ইলমের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন।

দুনিয়াতে দু ধরনের কামাল বা গুণ হয়ে থাকে- ১. ইলমী, ২. আমলী।

নবীদের মধ্যে ইলমী ও আমলী শক্তিদ্বয় এরূপ পূর্ণাঙ্গ হয়ে থাকে যে, তাদের মুকাবিলা কেউ করতে পারে না। কিন্তু যেহেতু নবুওয়াত নবুওয়াত হিসেবে ইলমী কামালাতের অন্তর্ভূক্ত, কারণ, নবীর অভিধানিক অর্থ হল, সংবাদদাতা, আর পরিভাষায় আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদদাতাকে নবী বলা হয়, সেহেতু যদি তাঁদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সংবাদসমূহের জ্ঞান না থাকে তাহলে অন্যদের কিভাবে সংবাদ দিবেন? অতএব ইলমকে বিশেষভাবে নবীগণের উত্তরাধিকার সাব্যস্ত করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, উলামা শুধু তাঁরাই, যাঁদেরকে কুরআন ও হাদীস আলিম বলে। অন্যথায় বহু লোক ইলম থাকা সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَاَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ. سورة جاثية

اِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

এটি সীমাবদ্ধতাবোধক শব্দ। তরজমা হবে, আল্লাহ তা'আলাকে শুধু সে সব বান্দাই ভয় করে, যারা আলিম। বিষয়টি এভাবে বুঝবে, এক রাজা সফর করতে করতে কোন গ্রামে পৌছে যান। সেখানে শাহী প্রভাব ও ভয় সে ব্যক্তির মধ্যে ক্রিয়াশীল হবে এবং সে ব্যক্তিই সম্রাটের যথোপযুক্ত সম্মানের জন্য প্রস্তুত হবে যে জানবে, তিনি সম্রাট। যে তা জানবে না, সে তো তাকে একজন সাধারণ মানুষ মনে করবে এবং

তার কোন পরোয়া করবে না। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার মর্জি ও অমর্জির যথার্থ জ্ঞান যদি হয়, তাহলে আমলও বিশুদ্ধ ও সঠিক হবে।

وما يعقلها الا العالمون এখানে ها যমীর امثال এর দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ, কুরআনে কারীমে বিভিন্ন স্থানে অনেক উপমা ও উদাহরণ দেয়া হয়েছে। সে সব উদাহরণ আলিমরাই বুঝতে পারেন।

قَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ

জাহান্নামীরা বলবে, আমরা যদি নবীগণের কথা শুনতাম বা বিবেক বুদ্ধি রাখতাম তবে আজ আমরা জাহান্নামীদের অন্তর্ভূক্ত হতাম না।

মানুষের জন্য ইলম অর্জনের এ দুটি ছুরতই রয়েছে- হয়ত নিজে বুঝবে, অথবা অন্যদের কাছ থেকে শুনবে। ইলম অর্জনের এ দুটি পদ্ধতির দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে-

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَه قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعُ وَهُوَ شَهِيْدٌ. سورة ق

"নিঃসন্দেহে এতে উপদেশ রয়েছে সে ব্যক্তির জন্য যার পার্শ্বদেশে অন্তর রয়েছে, অথবা মনযোগী হয়ে কান লাগিয়ে শুনে।"

শ্রবণ ও বিবেক দ্বারা যদি অনুধাবন না করে তবে তারা নিজেরাই স্বীকার করবে যে, জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হল, ইলম না থাকা।

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِاَصْحَابِ السَّعِيْرِ. سورة ملك

অতএব তারা স্বীয় অপরাধ স্বীকার করবে। কাজেই এখন তো জাহান্নামীরা দূরীভূত। অর্থাৎ, এবার রহমতের ধারে কাছে তাদের কোন আশ্রয় স্থল নেই।

ইমাম বুখারী র. এ থেকে উৎসারণ করেছেন যে, মুক্তি নির্ভর করে ইলমেরই উপর।

وانما العلم بالتعلم আল্লামা আইনী র. লিখেছেন, এখানে تعلّم শব্দে আইনের উপর যবর ও লামের উপর তাশদীদ সহ। কিন্তু কোন কোন কপিতে بالتعليم শব্দ রয়েছে। অর্থাৎ, নির্ভরযোগ্য ও ধর্তব্য ইলম সেটি যেটি নবীগণ থেকে শেখা ও শেখানোর মাধ্যমে গৃহীত হয়।

আল্লামা আইনী র. বলেন, এর দ্বারা এটাও জানা গেল যে, ইলমের প্রয়োগ শুধু ইলমে শরীয়তের উপর হবে। অতএব যদি কেউ ওসিয়ত করে যে, আমার মাল থেকে আলিমদের সাহায্য করবে তবে এর ব্যায়খাত শুধু হাদীস, তাফসীর ও ফিকহের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকেরাই হবে। -উমদা ঃ ২/৪২।

قال ابو ذر رضي الله تعالى عنه তাঁর ঘটনাটি হল, হযরত আবূ যর গিফারী রা. শামে বসবাস করতেন। তখন হযরত আমীরে মুআবিয়া রা. হযরত উসমান রা. এর পক্ষ থেকে শামের গভর্ণর ছিলেন। হযরত আবূ যর গিফারী রা. ছিলেন দুনিয়াবিমূখ। হযরত মুআবিয়া রা. ছিলেন শাসক ও ব্যবস্থাপক। তাঁদের উভয়ের মাঝে وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ আয়াতের তাফসীরে মতবিরোধ হয়ে যায়। হযরত আবূ যর গিফারী রা. বিত্তশালীদের বলতেন, ধন সম্পদ জমা করা জায়িয নেই। হযরত আমীরে মুআবিয়া রা. আশংকা করলেন, বিষয়টি অগ্রসর হয়ে জনাসাধারণের মধ্যে বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টির কারণ হয়ে যায় কি না। তাই তৎকালীন খলীফা হযরত উসমান রা. কে লিখলেন, আপনি তাকে শাম থেকে ডেকে পাঠান। হযরত উসমান রা. মদীনায় ডেকে বিশেষভাবে তাঁকে এ বিষয়ে ফতওয়া দিতে নিষেধ করেন এবং বিভিন্ন স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করে হযরত

উসমান রা. হযরত আবূ যর গিফারী রা.কে রাবাযায় বসবাস করার কামনা প্রকাশ করেন। একারণেই হযরত আবূ যর গিফারী রা. মদীনা ছেড়ে রাবাযায় অবস্থান করেন। সেখানেই তাঁর ওফাত হয়।

ইতোমধ্যে হযরত আবূ যর গিফারী রা. হজ্বে তাশরীফ আনেন। মিনাতে লোকজন তাঁর নিকট মাসায়িল জিজ্ঞেস করতে থাকেন। আর তিনি ফতওয়া দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি বললেন, আপনাকে আমীরুল মু'মিনীন ফতওয়া দিতে বারণ করেছেন। অথচ আপনি ফতওয়া দিচ্ছেন? যেহেতু তাঁর প্রশ্ন ভূল ছিল, এজন্য হযরত আবূ যর রা. উল্টো উত্তর দিলেন, যদি আমার গরদানের উপর ধারাল তলোয়ার রেখে দেয়া হয়, আর সে অবস্থাতেও আমার সুযোগ মিলে তবে আমি অবশ্যই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শুনাব।

উপরে জানা গেছে যে, শুধু একটি বিশেষ মাসআলায় তাঁর ইজতিহাদী রায় ছিল। তাঁকে সে ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছিল আর এ বিষয়টি ছিল রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের এজন্য তা বাতলে দেয়ার অধিকার ছিল। কারো বারণের অধিকার ছিল না। এজন্য হযরত আবূ যর গিফারী রা. এর উত্তরও ছিল তীক্ষ্ম। হযরত উসমান রা. এর শত্রুরা এঘটনাটিকে খুব উসকে দিল। তারা হযরত আবূ যর রা.কে প্রতিপক্ষ বানাতে চাইল। কিন্তু সর্বাবস্থাতেই তিনি তো ছিলেন সাহাবী। আমীরের আনুগত্যকে তিনি ওয়াজিব মনে করতেন। সেহেতু এই বিশেষ মাসআলায় আমীরের আনুগত্যের হক আদায় করেছেন আর হাদীস বাতানোর ক্ষেত্রে আদায় করেছেন পবিত্র হাদীসের হক।

كونوا ربانيين حكماء فقهاء علماء – رباني মূলত رب এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। আলিফ নূন অতিরিক্ত আতিশয্যজ্ঞাপক। এজন্য رباني হয়ে গেছে। এর বহুবচন ربانيين। অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাও।

রাব্বানী কাকে বলে? হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যার মধ্যে তিনটি জিনিস একত্রিত হয় তিনি রব্বানী। ১. ইলম, ২. ফিকহ, ও ৩. হিকমত। ইলমের অর্থ স্পষ্ট। কোন জিনিস জানা। তাফাক্কুহের অর্থ ভাল করে বুঝা। অর্থাৎ, ভাসাভাসা জ্ঞান নয়, বরং গভীর জ্ঞান। বস্তুত হিকমতের অর্থ হল, وضع الشئ في محله. অর্থাৎ, প্রতিটি জিনিসকে তার যথাযথ স্থানে রাখা। আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামত ও শক্তিগুলোকে যথার্থরূপে ব্যবহার করা। যেমন, আল্লাহ তা'আলা শ্রবণশক্তি দিয়েছেন। যদি এটাকে ফিলমের গান শুনার কাজে ব্যয় করে, তবে এটা হবে বেমওকা ব্যবহার। মোটকথা, হিকমত হল, এরূপ একটি অন্তরদৃষ্টিমূলক নূর, যার মাধ্যমে প্রতিটি জিনিসকে যথার্থ স্থানে রাখার জ্ঞান অর্জিত হয় এবং বেমওকা ব্যবহার থেকে বাঁচা সহজ হয়ে যায়। এ অর্থে সমস্ত জ্ঞানের কথা তাতে অন্তর্ভূক্ত। কোন কোন মুফাসসির (ইবনে কাসীর র. প্রমুখ) হিকমত দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন সুন্নত। এটাও ঠিক আছে। কারণ, সুন্নতের কাজই হল, প্রতিটি জিনিসের মওকা ও স্থান বাতানো যেমন, যখন فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- اجعلوها في ركوعكم আর যখন- سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى আয়াত নাযিল হয়, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- اجعلوها في سجودكم অতএব প্রতিটি আয়াতের মওকা ও স্থান বাতানো সবই হিকমত। হিকমত শব্দটির মূল উপাদান হল, ح ك م। অভিধানে এর অর্থ হল. সংশোধনের উদ্দেশ্যে বারণ করা। আরবগণ বলেন, حكمت الدابة তথা আমি জন্তুকে লাগাম পরিয়েছি অতএব হিকমত যেন আকলের লাগাম। এটি বিবেককে নিয়ন্ত্রনে রাখে। যাতে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে কাজ না করে। আল্লাহ তা'আলাকে এজন্যই হাকীম বলা হয় যে, তার কোন কাজ বেমওকা-বেমহল ও স্বার্থ হিকমত পরিপন্থী হতে পারে না।

ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره মূলতঃ এটিও প্রথম তাফসীর, যেটি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। এটি আলাদা নয়। তাঁরা রব শব্দটিকে মুরব্বী তথা তরবিয়ত বা প্রশিক্ষনদাতা হিসেবে নিয়েছেন। তরবিয়ত বলে, কোন জিনিসকে ক্রমশ পূর্ণতার সীমা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া। যেমন, শিশুর তরবিয়ত হয় তার মরতবা ও বয়সের দিকে লক্ষ্য করে। এরূপভাবে আলিমে রাব্বানী তিনি যিনি লোকজনকে এভাবে তরবিয়ত দেন। প্রথমে দীনের ছোট ছোট বিষয়গুলো বাতান। অতঃপর বড় বড় ইলমী বিষয় বলেন। এর পরিণতিও এটাই যে, মওকা, মহল মত সব কিছু রাখেন। হাকীম দেখেন, কতটুকু পর্যন্ত তাঁর উপকার হতে পারে। তিনি নিজের জ্ঞানের দিকে খেয়াল করে সবচেয়ে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন না। অতএব প্রথমে অভ্যাস তৈরি করেন। যেমন, বাচ্চাদেরকে প্রথমে কাওয়ায়েদে বাগদাদী পড়ান। অতঃপর ক্রমশ উন্নয়ন ঘটান।

হিদায়াতুন্নাহব কিতাবে শরহে জামীর বক্তব্য এবং মিরকাতে মুসাল্লাম ও মোল্লা হাসানের তাকরীর হিকমত পরিপন্থী। হিকমতের দাবী হল- كلموا الناس على قدر عقولهم তথা মানুষের বিবেকের পরিমাপ করে সে অনুপাতে তাদের সাথে কথা বলা।

٥٣. بَابٌ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَيْ لَا يَنْفِرُوْا.

৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াজ-নসীহতে ও ইলম শিক্ষা দানে উপযুক্ত সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, যাতে লোকজন বিরক্ত না হয়ে পড়ে।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন-

وجه المناسبة بين البابين من حيث ان المذكور في الباب الاول هو العلم والمذكور في هذا الباب هو التخول بالعلم.

তথা প্রথম অনুচ্ছেদে ইলমের আলোচনা ছিল। আর এ অনুচ্ছেদে ইলমী বিষয়ে খেয়াল রাখা ও তত্ত্বাবধান করার ব্যাপারে আলোচনা রয়েছে।

٦٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضـــ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا .

৬৭. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ র. .... হযরত ইবনে মাসঊদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্দিষ্ট দিনে ওয়াজ-নসীহত করতেন, যাতে আমরা বিরক্ত না হই।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, কিতাবুল ইলম ঃ ১৬, পরবর্তী অনুচ্ছেদে ঃ ১৬, আদ দাওয়াত ঃ ৯৪৯।

٦٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـــ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا .

৬৮. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার র. ..... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা (দীনের ব্যাপারে) সহজ পন্থা অবলম্বন করবে, কঠিন পন্থা অবলম্বন করবে না, মানুষকে সুসংবাদ শোনাবে, বিরক্তি সৃষ্টি করবে না।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬, আদব ঃ ৯০৪।

হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের দুটি অংশ রয়েছে। আল্লামা আইনী র. বলেন-

والباب مترجم بترجمتين احداهما بالموعظة والاخرى كي لا ينفروا

ইমাম বুখারী র. অনুচ্ছেদের অধীনে উপরোক্ত দুটি হাদীস এনেছেন। প্রথম হাদীসটি প্রথমাংশ অর্থাৎ, ওয়াজ-নসীহত সংক্রান্ত আর দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় অংশ অনুযায়ী।

ব্যখ্যা ঃ

يتخولنا بالموعظة - تخول শব্দের অর্থ হল, তত্ত্ববধান করা, দেখা-শুনা করা। অর্থাৎ, বক্তব্য ও উপদেশ দানও এত দীর্ঘ না করা উচিত যাতে লোকজন বিরক্ত হয়। অবশ্য এই বিরক্তিও শুধু তাদেরটিই ধর্তব্য যারা দীনদার এবং দীনি রুচির অধিকারী।

سامة বিরক্ত হওয়া। বড় অপেক্ষা, বড় আলিমও যদি দৈনন্দিন ওয়াজ করে, তবে লোকজন বিরক্ত হয়ে ভাগবে। মোটকথা, ওয়াজ-নসীহত ও উদ্বুদ্ধকরনে বিশেষতঃ মন্দ কাজ থেকে নিষেধের ক্ষেত্রে কঠোরতা প্রদর্শন করবে না, বরং নম্রতা প্রদর্শন করবে। ফিরআউন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জানতেন, সে ঈমান আনবে না। তা সত্ত্বেও হযরত মূসা ও হারূন আ.কে নির্দেশ দিয়েছেন-

فَقُوْلاَ لَه قَوْلاً لَيِّنًا لَعَلَّه يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى. سورة طه

বিদআত ও রসম রেওয়াজ সংশোধনেও হিকমত অবলম্বন করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

اُدْعُ اِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ. سورة نحل

٥٤. بَابُ مَنْ جَعَلَ لِاَهْلِ الْعِلْمِ اَيَّامًا مَعْلُوْمَةً

৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ ইলম শিক্ষার্থীদের জন্য দিন নির্দিষ্ট করা।

যোগসূত্র ঃ পূর্বের অনুচ্ছেদে (ওয়াজের ব্যাপারে) খেয়াল করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা'লীম ও ওয়াজ নসীহতে সাহাবায়ে করিম রা. এর সময়, অবস্থা, স্বতঃস্ফুর্ততা ও বিরক্তির বিষয়টি খেয়াল করতেন।

এ অনুচ্ছেদটি হল, পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের পরিশিষ্ট। কারণ, এ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যও এটাই যাতে বিরক্তির উদ্রেক না ঘটায়।

এ অনুচ্ছেদ দ্বারা ইমাম বুখারী র. বলতে চান, শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে দিন নির্ধারণ ও সময় নির্ধারণে কোন অসুবিধা নেই। কারণ, ইলম একটি সুমহান বিষয়। এর জন্য গুরুত্বারোপ ও ব্যবস্থাপনার

প্রয়োজন রয়েছে। অতএব দিন ও সময় নির্ধারণ করে দেয়া উচিত। যাতে ছাত্র শিক্ষক উভয়ে সময় নষ্ট করা থেকে বেঁচে থাকতে পারে। যদি সময় নির্ধারণ না করা হয়, তাহলে হতে পারে এমতাবস্থাও হয়ে যাবে যে, শিক্ষক এসে যাবেন, আর ছাত্র অনুপস্থিত থাকবেন, কিংবা উস্তাদ অনুপস্থিত থাকবেন আর ছাত্র উপস্থিত থাকবে। এজন্য দিন ও সময় নির্ধারন বিদ'আত নয়, বরং এটি একটি ইনতেজামী ব্যাপার।

বিদ'আতের সংজ্ঞা ঃ এ দিন নির্ধারণ বিদ'আত নয়। কারণ, বিদ'আতের সংজ্ঞা হল, অদীনি বিষয়কে দীনে অন্তর্ভূক্ত করা। যেমন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. অতএব সময় নির্ধারন সেটা নিষেধ যেটাকে সওয়াবের কারণ কিংবা অতিরিক্ত প্রতিদানের কারণ মনে করা হয়। যেমন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصوم احدكم. مسلم : ١/٣٦١.

অতএব প্রচলিত মীলাদের সমস্ত শর্ত-বন্ধন বিদ'আত। আর জলসা ইত্যাদির তারিখ নির্ধারন বিদ'আত নয়। কারণ, এর দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা। এতে তারিখ নির্ধারনে অধিক সওয়াবের আকীদা থাকে না। -ইরশাদুল কারী।

٦٩. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ رضـ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا .

৬৯. 'উসমান ইবনে আবূ শায়বা র. .... হযরত আবূ ওয়াইল রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ইবনে মাসঊদ রা. প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদের ওয়াজ-নসীহত করতেন। তাঁকে একজন বলল, 'হে আবূ 'আবদুর রহমান! আমার মন চায়, যেন আপনি প্রতিদিন আমাদের নসীহত করেন। তিনি বললেন ঃ এ কাজ থেকে আমাকে যা রিবত রাখে তা হল, আমি তোমাদের ক্লান্ত আসন্ন করতে পসন্দ করি না। আর আমি নসীহত করার ব্যাপারে তোমাদের (অবস্থার) প্রতি লক্ষ্য রাখি, যেমন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন আমাদের ক্লান্তির আশংকায়।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল يذكر الناس في كل خميس যেহেতু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, সেহেতু ইমাম বুখারী র. এর উপর এই প্রশ্নও উত্থাপিত হবে না যে, তিনি মাওকূফ হাদীস এনেছেন।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৬, ৯৪৯।

হাদীসের মূলপাঠ স্পষ্ট। পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদ অধ্যয়ন করুন।

٥٥. بَابُ مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন।

বুখারী ঃ ৫৫

যোগসূত্র ঃ

وجه المناسبة بين البابين من حيث ان المذكور في الباب الاول شان من يذكر الناس في امور دينهم بيان ما ينفعهم وما يضرهم وليس هذا الا شان الفقيه في الدين والمذكور في هذا الباب هو مدح هذا الفقيه وكيف لا يكون ممدوحا وقد اراد الله به خيرا حيث جعله فقيها فى دينه عالما باحكام شرعه. عمدة القاري : ٢/٤٨.

তথা, উভয় অনুচ্ছেদের মাঝে যোগসূত্র হল, প্রথম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষকে দীনি বিষয়ে উপদেশ দিবেন। কোনটি তাদের জন্য উপকারী, কোনটি তাদের জন্য ক্ষতিকর, তার বিবরণের আলোকে। আর এটা কেবল ফকীহ ফিদ দীনেরই শান। পক্ষান্তরে এ অনুচ্ছেদে এরূপ ফকীহের প্রশংসা করা হয়েছে। বস্তুত ঃ এরূপ লোক কিভাবে প্রশংসিত হবেন না! আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে তো দীনি ব্যাপারে ফকীহ বানিয়ে দেন। তার শরীয়তের আহকামের আলিম বানিয়ে দেন।

٧٠. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ رضـ خَطِيبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ .

৭০. সাঈদ ইবনে উফায়র র. ...... হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি হযরত মু'আবিয়া রা.-কে খুতবারত অবস্থায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন আমি তো কেবল বিতরণকারী, আল্লাহই দানকারী। সর্বদাই এ উম্মত কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর হুকুমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হবে না, যতক্ষন না আল্লাহর হুকুম (কিয়ামত) আসে।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল স্পষ্ট। কারণ, শিরোনামটি হাদীসেরই টুকরো।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, কিতাবুল ইলম ঃ ১৬, খুমুস ঃ ৪৩৯, কিতাবুল মানাকিব ঃ ৫১৪, আল ই'তিসাম ঃ ১০৮৭, তাওহীদ ঃ ১১১১।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা ইলমের ফযীলত ও দীনি ব্যাপারে গভীর জ্ঞান অর্জন বা তাফাক্কুহ এর মাহাত্ম্য বুঝা যায়। তাছাড়া আরেকটি বিষয় জানা যায় যে, যাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দীনি ব্যাপারে গভীর জ্ঞান দিয়েছেন, তিনি বড়ই সৌভাগ্যবান।

خيرا শব্দটিতে তানভীন তা'জীমের জন্য। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা মহা কল্যাণের ফয়সালা করেছেন। এটি শুধু আল্লাহ তা'আলার দান। যেটি নেহায়েত কদরযোগ্য ও কৃতজ্ঞতাযোগ্য।

প্রশ্ন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকৃত অর্থে না বিতরনকারী, না দাতা। আর রূপকার্থে তিনি বন্টনকারী ও দাতা। অতএব এ পার্থক্য কিভাবে যথার্থ হবে?

উত্তর ঃ প্রকৃত অর্থে যদিও দাতা ও বিতরণকারীতে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু ওরফে উভয়টিতে পার্থক্য আছে। সেটি হল, মালিককে দাতা এবং কোষাধক্ষকে বিতরনকারী বলা হয়। যিনি দাতা এবং গ্রহীতাদের মাঝে মাধ্যম হন।

এ হাদীসটিকে কিতাবুল ইলমে আনার ফলে প্রমাণিত হল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু উলূমে শরইয়্যা বন্টনকারী, সব কিছুর বিতরনকারী নন। অতএব রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদ'আতীদের একচ্ছত্র বিতরকারী মনে করা যথার্থ নয়।

لن تزال هذه الامة قائمة على امر الله এ অর্থ নয় যে, উম্মতের মধ্য থেকে কেউ গোমরাহ হবে না। বরং উদ্দেশ্য হল, যেমনিভাবে পূর্ববর্তী উম্মতরা সম্পূর্ণরূপে গোমরাহ হয়ে গেছে, এরূপভাবে উম্মতে মুহাম্মাদী পরিপূর্ণরূপে সবাই গোমরাহ হবে না। এজন্য অন্য রেওয়ায়াতে এর সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে- لا تزال طائفة من امتي ظاهرين الخ. بخاري ص ١٠٨.

আরেক রেওয়ায়াতে আছে- لا يزال من امتي قوم ظاهرين على الناس. بخاري ص ١١١١.

হক্বপন্থী দল দ্বারা কোনটি উদ্দেশ্য?

মুহাদ্দিসীন, ফুকাহায়ে কিরাম এবং মুজাহিদীনের মধ্য থেকে প্রতিটি দল নিজেদেরকে এর বাস্তবরূপ বলেন। ইমাম বুখারী র.এর মতে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত দল দ্বারা উদ্দেশ্য উলামায়ে কিরাম। যেমন, ইমাম বুখারী র. এ হাদীসের উপর শিরোনামে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন- هم اهل العلم. بخاري ص ١٠٨٧.

কিন্তু স্পষ্ট বিষয় হল, এর দ্বারা মুজাহিদ দল উদ্দেশ্য। কারণ, অন্য হাদীসে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে- يقاتلون على الحق তথা হকের খাতিরে তারা লড়াই করতে থাকবে।

সবচেয়ে উত্তম হল, এটাকে ব্যাপক রেখে দেয়া। প্রতিটি এরূপ দল উদ্দেশ্য, যাদের আকীদা কুরআন ও হাদীস মুতাবিক চাই মুহাদ্দিস হোন বা ফকীহ কিংবা সূফী-সাধক। আর يقاتلون শব্দে কিতাল দ্বারা ব্যাপক লড়াই উদ্দেশ্য। চাই তরবারী দ্বারা হোক বা যবান দ্বারা।

لا يضرهم من خالفهم এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, আহলে হককে কোন কষ্ট দিতে পারবে না, বরং উদ্দেশ্য হল, তাদেরকে তাদের দীন থেকে কেউ হটাতে পারবে না। সামগ্রিকভাবে প্রমাণের আলোকে তাদের উপর বাতিলপন্থীদের বিজয় হবে না। -ইরশাদুল কারী।

حتى ياتي امر الله কোন কোন রেওয়ায়াতে এসেছে- حتى تقوم الساعة এর দ্বারা উদ্দেশ্য কিয়ামতের কাছাকাছি সময়। তখন একটি হাওয়া ইয়ামান থেকে প্রবাহিত হবে। এটি সমস্ত মু'মিনের রূহ কব্জ করে নিবে। অতঃপর কোন ঈমানদার থাকবে না। এরপর কিয়ামত আসবে।

٥٦ بَابُ اَلفَهْمُ فِي الْعِلْمِ

৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ ইলমের ক্ষেত্রে সঠিক অনুধাবন।

যোগসূত্র ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন-

وجه المناسبة بين البابين من حيث ان الفهم في العلم داخل في قوله عليه الصلوة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين

সারকথা, পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে দীনের গভীর জ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা ছিল। বস্তুত তাফাক্কুহ এর অর্থ হল, ইলমী ব্যাপারে সঠিক অনুধাবন। যেন এই শিরোনামটি হল ব্যাখ্যাদাতা।

٧١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ رضــ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِجُمَّارٍ فَقَالَ إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَثَلُهَا كَمَثَلِ الْمُسْلِمِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخْلَةُ .

৭১. আলী ইবনে আবদুল্লাহ র. ...... মুজাহিদ র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সফরে মদীনা পর্যন্ত হযরত ইবনে উমর রা.-এর সঙ্গে ছিলাম। এ সময়ে তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি মাত্র হাদীস রেওয়ায়াত করতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমরা একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছিলাম। তখন তাঁর নিকট খেজুর গাছের মাথি আনা হল। তারপর তিনি বললেন ঃ গাছপালার মধ্যে এরূপ একটি গাছ আছে, যার দৃষ্টান্ত মুসলিমের ন্যায়। তখন আমি বলতে চাইলাম, তা হল খেজুর গাছ, কিন্তু আমি ছিলাম উপস্থিত সবার চাইতে বয়সে ছোট। তাই নীরব থাকলাম। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'গাছটি হল খেজুর বৃক্ষ।'

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল স্পষ্ট। কারণ, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিদের সামনে একটি প্রশ্ন রেখেছিলেন। তখন হযরত ইবনে উমর রা. বলেন- فاردت ان اقول هي النخلة এর দ্বারা বুঝা গেল, হযরত ইবনে উমর রা. অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এটা হল, হযরত ইবনে উমর রা.এর ইলমী সঠিক জ্ঞান। যদিও বয়স কম দেখে বড়দের সামনে আদব ও ইহতিরামের কারণে নীরব থাকেন।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, কিতাবুল ইলম ঃ ১৪, ১৬, ২৪, ২৯৪, ৬৮১, ৮১৯, ৯০৪, ৯০৭।

হাদীস নং ৫৯ দ্রষ্টব্য।

جُمَّار শব্দটির জীমে পেশ, মীমের উপর তাশদীদ। এর অর্থ হল, খেজুর গাছের মাথি যেটি চর্বির মত সাদা হয়ে থাকে। এজন্য এই মগজ বা মাথিকে شحم النخل বলে। এটি মিষ্টি হয়ে থাকে এবং নেহায়েত শক্তিশালী, পুরুষালী ব্যাধিতে উপকারী। এই মাথি বের করার পর গাছ অকর্মন্য হয়ে যায়। অবশিষ্ট ব্যাখ্যার জন্য হাদীস নং ৫৯ দ্রষ্টব্য।

৫৭. بَاب الاغْتِبَاط فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَة وَقَالَ عُمَرُ رضـــ تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَبَعْدَ أَنْ تُسَوَّدُوا وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِبَرِ سِنِّهِمْ .

৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ ইলম ও হিকমতের ক্ষেত্রে সমতুল্য হওয়ার আগ্রহ। বুখারী ঃ ১৭

'হযরত উমর রা. বলেন, তোমরা নেতৃত্ব লাভের আগেই জ্ঞান হাসিল করে নাও। আবূ 'আবদুল্লাহ্ (বুখারী র.) বলেন, আর নেতা বানিয়ে দেয়ার পরও, কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ বয়োবৃদ্ধকালেও ইলম শিখেছেন।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন-

وجه المناسبة بين البابين من حيث ان في الباب الاول الفهم في العلم وفي هذا الباب الاغتياط في العلم الخ

তথা পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে ইলমী সঠিক অনুধাবনের উল্লেখ ছিল। যেটি মহা নেয়ামত। আর এ অনুচ্ছেদে ইলম ও হিকমতে ঈর্ষার বিবরণ রয়েছে। যদি কোন মানুষের কাছে এই মহা নেয়ামত থাকে তবে সে ঈর্ষনীয়। তাকে দেখে ঈর্ষা করা উচিত এবং তা অর্জনের জন্য পরিপূর্ণরূপে চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকেও এ মহা নেয়ামত দ্বারা পরিপূর্ণ করুন। আমীন!!

٧٢. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِد عَلَى غَيْرِ مَا حَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُود رضـــ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِه فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا .

৭২. হুমায়দী র. .... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ কেবলমাত্র দু'টি ব্যাপারেই ঈর্ষা করা যায়; ১. সে ব্যক্তির উপর, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদ দিয়েছেন, এরপর তাকে হক পথে অকাতরে ব্যয় করার ক্ষমতা দেন; ২. সে ব্যক্তির উপর, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা হিকমত দান করেছেন, এরপর সে তার সাহায্যে ফায়সালা করে ও তা শিক্ষা দেয়।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ হাদীস শরীফে রয়েছে- لا حسد الا في اثنتين الخ ইমাম বুখারী র. اغتباط في العلم শিরোনাম কায়েম করে ইঙ্গিত করেছেন যে, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে হাসাদের অর্থ হল ঈর্ষা।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, কিতাবুল ইলম ঃ ১৭, যাকাত ঃ ১৮৯, আহকাম ঃ ১০৫৭, ই'তেসাম ঃ ১০৮৮।

ব্যাখ্যা ঃ

كلمة لا لنفي الجنس وحسد اسمه مبني على الفتح وخبره محذوف اى لا حسد جائز او صالح او نحو ذلك.

لا حسد الخ - এখানে لا শব্দটি জিনসকে নফী করার জন্য আনা হয়েছে। حسد শব্দটি এর ইসম। এটি যবরের উপর মাবনী। এর খবর উহ্য। অর্থাৎ, لا حسد جائز او صالح او نحو ذلك

رجل - يجوز فيه الاوجه الثلاثة من الاعراب الرفع على تقدير احدى الاثنين خصلة رجل فلما حذف المضاف اكتسى المضاف اليه اعراب، والنصب على اضمار اعني رجلاً وهي رواية ابن ماجة، والجر على انه بدل من اثنين واما على رواية اثنتين بالتاء فهو بدل ايضا على تقدير حذف المضاف اى خصلة رجل لان الاثنتين معناه خصلتين. عمدة.

হাসাদ ও গিবতার মাঝে পার্থক্য ঃ

কারো ইলমী যোগ্যতা অথবা আর্থিক খোশহালি কিংবা কোন নেয়ামত ও মাহাত্ম্য দেখে নিজের জন্য কামনা করা যে, এ নেয়ামত যদি আমিও পেতাম- তবে এটা হল গিবতা। যার অর্থ হল, ঈর্ষা করা। এতে অন্যের নেয়ামত দূরীভূত হওয়ার কামনা থাকে না। এজন্য প্রশংসনীয় জিনিস (যেমন, ইলমী যোগ্যতা, ইলমী পূর্ণতা ইত্যাদি) তে ঈর্ষা করা জায়িয আছে, বরং প্রশংসনীয় ও কাম্য। যেমন, কুরআনে কারীমে রয়েছে- وَفِى ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ আগ্রহীদের এরূপ জিনিসে প্রতিযোগিতা করা উচিত। এখানে تنافس দ্বারা গিবতা তথা ঈর্ষাই উদ্দেশ্য। আর যদি আল্লাহ তা'আলা কাউকে কোন নেয়ামত দেন এবং অন্য আরেকজন কামনা করে এ নেয়ামত যদি দূরীভূত হয়ে আমি লাভ করতে পারতাম! তবে সেটা হবে হাসাদ বা হিংসা। অর্থাৎ, হাসাদে কারো নেয়ামত দূরীভূত হওয়ার কামনা থাকে। এটা না জায়িয ও হারাম।

وقال عمر رضـــ تفقهوا قبل ان تسودوا হযরত উমর রা. বলেন, নেতৃত্ব পাওয়ার পূর্বে দীনি ইলম অর্জন কর। কারণ, নেতৃত্বের পর কারো সামনে ছাত্রত্বের হাটু গেড়ে বসার ক্ষেত্রে লজ্জা-সংকোচ প্রতিবন্দক হয়ে দাঁড়াবে। তখন ইলম অর্জন থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। মুর্খতার কারণে সংশোধনের পরিবর্তে সবাইকে খারাপ করে ফেলবে। বাস্তবে নিজেও গোমরাহ হবে অন্যদেরকেও গোমরাহ করবে।

হযরত উমর রা. এর এই বাণী দ্বারা যেন কারো এই বিভ্রান্তি না হয় যে, নেতৃত্ব বা বেশি বয়স্ক হওয়ার পর ইলম অর্জন না করা চাই। ইমাম বুখারী র. উহ্য প্রশ্নের উত্তর দানরূপে বলেছেন, وبعد ان تسودوا তথা নেতা বানানোর পরেও ইলম অর্জন কর, ইলমের পিপাসা যেন কখনো নিবারিত না হয়। সামনে এর প্রমাণও পেশ করেছেন যে, সাহাবায়ে কিরাম রা. বয়স্ক হওয়ার পর ইলম অর্জন করেছেন।

প্রসিদ্ধ আছে, তালিবে ইলম দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইলম অন্বেষনকারী। ইলমের ক্ষেত্রে বড় ছোটের প্রতি লক্ষ্য করবেন না। বরং ছোট, বড়, সমবয়স্ক ও সমকালীন সবার কাছ থেকে উপকৃত হবে না।

মাদরাসাগুলো থেকে প্রচলিত সনদ অর্জন করার ফলে আলিম হয়ে যায় না। শুধু আলিম হওয়ার যোগ্যতা আসে। এরপর যে পরিমাণ ও অধ্যায়ন বাড়বে ততটাই নিজের অজ্ঞতা স্পষ্ট হবে। উদাহরণ রয়েছে, উট যতক্ষন পর্যন্ত পাহাড়ের নিচ দিয়ে অতিক্রম না করে ততক্ষন পর্যন্ত সে নিজের চেয়ে উঁচু কাউকে মনে করে না।

رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق একব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ধন সম্পদ দান করেছেন। তাকে হকের ব্যাপারে খরচ করার জন্য দিয়েছেন। অর্থাৎ, যে আল্লাহর আনুগত্যে নির্দ্বিধায় খরচ করে।

ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها এখানে حكمت শব্দ এসেছে। ১১২৩ পৃষ্ঠার রেওয়ায়াতে এসেছে- قرآن শব্দ। উভয়টিকে একত্রিত করলে বুঝা যায় যে, উদ্দেশ্য হল, কুরআন অনুধাবন। অর্থাৎ, যাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদ বুঝার শক্তি দিয়েছেন আর সে নিজের ব্যাপারে ও অন্যদের ব্যাপারে

তদানুযায়ী ফয়সালা করে। অতএব ৩টি জিনিস একত্রিত হয়ে গেল। ১. ইলম, ২. আমল ও ৩. তা'লীম। এরূপ ব্যক্তিকে উর্ধ্ব জগতে কবীর তথা বড় আলিম নামে আখ্যায়িত করা হয়।

قال حدثنا سفيان قال حدثنا اسماعيل الخ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা র. বলেন, এ হাদীসটি ইসমাঈল ইবনে আবূ খালিদ আমাদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে যুহরীর সনদে এই রেওয়ায়াতটি নয়। বরং অন্য সনদে। উদ্দেশ্য হল, ইমাম যুহরী র. এর সূত্রে এই রেওয়ায়াতটিও আছে, কিন্তু কিছু পার্থক্য আছে। হযরত যুহরী র. বর্ণনা করেন- عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم এটি ১১২৩ পৃষ্ঠায় আসছে। আর এই রেওয়ায়াতটি হল, ইসমাঈল ইবনে আবূ খালিদের। এর সূত্র হল- قيس بن ابي حازم عن عبد الله بن مسعود رضــــ এই সনদ বাতলানো দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ইসমাঈল ইবনে আবূ খালিদ যে সূত্রে এ হাদীসটি শুনিয়েছেন সেটি ইমাম যুহরী র. এর সূত্র ছাড়া অন্য সূত্র। এই সতর্কবাণী এজন্য শুনালেন যাতে সনদের বিভিন্নতা দেখে কেউ ইযতিরাবের সন্দেহে পতিত না হয়।

٥٨. بَاب مَا ذُكِرَ فِي ذَهَابِ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَحْرِ إِلَى الْخَضِرِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ সমুদ্রে খিযির আ.-এর কাছে মূসা আ.-এর যাওয়া

আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَي اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

(আমি কি আপনার অনুসরণ করব এ শর্তে যে, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা থেকে আমাকে শিক্ষা দেবেন?)। (১৮ ঃ ৬৬)

পূর্বের সাথে যোগসূত্র ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন-

وجه المناسبة بين البابين ان المذكور في الباب الاول هو الاغتباط في العلم وهذا الباب في الترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم الخ.

সারকথা হল, পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে ইলম ও হিকমতে ঈর্ষার বিবরণ ছিল। আর এ অনুচ্ছেদে ইলম অন্বেষনের উদ্দেশ্যে কষ্ট বরদাশত করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, ঈর্ষনীয় জিনিস অর্জনে কষ্ট সহ্য করতে হয়।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ এ অনুচ্ছেদ দ্বারা ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য কি? এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে।

১. হাফিজ আসকালানী ও আল্লামা আইনী র. বলেন, ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে কষ্ট বরদাশত করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

২. হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী র. এর রায় হল, এ অনুচ্ছেদ দ্বারা ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে সফরের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রশ্ন হল, শুধু দুটি অনুচ্ছেদের পর ইলম অন্বেষনের জন্য স্বতন্ত্রভাবে একটি অনুচ্ছেদ আনছেন- باب الخروج في طلب العلم নামে। এবার এখানেও সফরের বৈধতা ও এর প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ উদ্দেশ্য হলে বিনা কারণে পুনরাবৃত্তি হবে।

◆ এ প্রশ্ন থেকে বাঁচার জন্য কোন কোন মাশায়েখ থেকে বর্ণিত আছে, এখানে সামুদ্রিক সফরের বৈধতা বা এর প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ উদ্দেশ্য। আর পরবর্তী অনুচ্ছেদ- باب الخروج في طلب العلم দ্বারা স্থলীয় সফরের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ বা সাধারণ সফরের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, ইলম অন্বেষন করা চাই এর জন্য সামুদ্রিক সফর করতে হলেও করবে।

৩. হযরত শাইখুল হিন্দ র. বলেন, পূর্বোক্ত قال ابو عبد الله الخ ইমাম বুখারী র. বলেছেন, নেতা হওয়ার পরও ইলম অর্জন কর। অর্থাৎ, কম বয়সে, বেশি বয়সে, নেতৃত্বের পূর্বে, নেতৃত্বের পরে তথা সর্বাবস্থায় তা জরুরী। সেখানে সাহাবায়ে কিরাম রা. এর আমল দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। এখানে একজন সুমহান রাসূল হযরত মূসা আ. এর ঘটনা এনেছেন। তিনি স্বীয় যুগের শীর্ষ আলিম এবং সব চেয়ে বড় জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও ইলম অন্বেষনের জন্য সফর করেছেন। হযরত খিযির আ. এর নিকট ইলম অন্বেষনের জন্য গিয়েছেন।

৪. এই শিরোনাম দ্বারা এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, আবূ দাউদ শরীফের ১ম খণ্ডে একটি রেওয়ায়াত রয়েছে-. لا يركب البحر الاحاج او معتمر او غاز في سبيل الله الحديث এ হাদীস দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায়, এ ৩ জন ব্যতীত অন্যদের জন্য সামুদ্রিক সফর জায়িয নেই। এজন্য ইমাম বুখারী র. এর ব্যাপকতাকে সংকীর্ণ করার অথবা এর দ্বারা ব্যতিক্রমভূক্ত করার, কিংবা রেওয়ায়াতের দূর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করে তা রদ করার জন্য অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন।

٧٣. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـــ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ خَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَأْنَهُ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسَى لَا فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مُوسَى بَلَى عَبْدُنَا خَضِرٌ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ وَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ .

৭৩. মুহাম্মদ ইবনে গুরাইর আয-যুহরী র. .... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি (ইবনে আব্বাস রা.) এবং হুর ইবনে কায়েস ইবনে হিসন আল-ফাযারী হযরত মূসা আ.-এর সাথী সম্পর্কে বাদানুবাদ করছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বললেন, তিনি ছিলেন খিযির। ঘটনাক্রমে তখন তাদের পাশ দিয়ে উবাই ইবনে কা'ব রা. যাচ্ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রা. তাঁকে ডেকে বললেন ঃ আমি ও আমার এ ভাই মতবিরোধ পোষণ করছি হযরত মূসা আ.-এর সেই সাথীর ব্যাপারে যাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য মূসা আ. আল্লাহর কাছে পথের সন্ধান চেয়েছিলেন- আপনি কি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, একবার হযরত মূসা আ. বনী ইসরাঈলের কোন এক মজলিসে হাজির ছিলেন। তখন তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, 'আপনি কাউকে আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী বলে জানেন কি?' হযরত মূসা আ. বললেন, 'না।' (আমি জানি না) তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আ.-এর কাছে ওহী পাঠালেন ঃ হ্যাঁ, আমার বান্দা খিযির (আপনার চেয়ে বেশী জ্ঞান রাখেন)।' অতঃপর হযরত মূসা আ. তাঁর সাথে সাক্ষাত করার পথ জানতে চাইলেন যে. এর ছুরত কি? আল্লাহ্ তা'আলা মাছকে তার জন্য নিশানা বানিয়ে দিলেন এবং তাঁকে বলা হল, আপনি যখন মাছটি হারিয়ে ফেলবেন তখন ফিরে আসবেন। কারণ, কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি তাঁর সাক্ষাত পাবেন। তখন তিনি যেতে লাগলেন এবং সমুদ্রে সে মাছের নিশানা অনুসরণ করতে লাগলেন। হযরত মূসা আ.কে তাঁর খাদেম যুবক (ইউশা আ.) বললেন, (কুরআন মজীদের ভাষায় ঃ)

أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا .

আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন পাথরের কাছে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তান তার কথা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। হযরত মূসা আ. বললেন, আমরা তো সে স্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম। এরপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল। (১৮ ঃ ৬৩-৬৪)

তাঁরা খিযিরকে পেলেন। তাদের ঘটনা তা-ই, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাব কুরআন মজীদে বর্ণনা করেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لانها في ذهاب موسى عليه السلام الى الخضر وركوبه البحر وسواله منه الاتباع لاجل التعليم والحديث يبين ذلك كله. عمدة.

শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। কারণ, এ শিরোনামে শিক্ষার উদ্দেশ্যে হযরত মূসা আ. কর্তৃক খিযির আ. এর নিকট গমন এবং তাঁর সামুদ্রিক সফর এবং তাকে তার অনুসরণ করে তাঁর পিছনে যাওয়ার দরখাস্তের বিবরণ রয়েছে। আর হাদীসেও এসবের বিবরণ রয়েছে। -উমদা।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, কিতাবুল ঃ ১৭, ২৩, ইজারাত ঃ ৩০২, শুরূত ঃ ৩৭৭, বাদউল খালক ঃ ৪৬৩, কিতাবুল আম্বিয়া ঃ ৪৮১, ৪৮২-৮৩, তাফসীর ৬৮৭, ৬৮৮, ৬৯০, কিতাবুল আয়মান ও নুযূর ঃ ৯৮৭, তাওহীদ ঃ ১১১৪।

ব্যাখ্যা ঃ تمارى اي تجادل وتنازع الحر بن قيس হা এর উপর পেশ রা এর উপর তাশদীদ (حُرّ)। তিনি একজন সাহাবী। হযরত ইবনে আব্বাস রা. এবং হুর ইবনে কায়েস রা. এ দুজন সাহাবীর মধ্যে বাদানুবাদ হয়েছে যে, فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا. سورة كهف আয়াতে যে বান্দার উল্লেখ রয়েছে তিনি কে? যার সাথে সাক্ষাত করার জন্য হযরত মূসা আ. সফর করেছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, তিনি হলেন, হযরত খিযির আ.। আর হুর ইবনে কায়েস বলতেন, তার সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। কিন্তু এই মতানৈক্য দ্বারা এতটুকু স্পষ্ট হয় যে, তিনি হযরত খিযির আ. ছাড়া হয়ত অন্য কারো কথা বলে থাকবেন। এর ফয়সালা করেছেন, হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা.।

এঘটনাটি এ হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। ইমাম বুখারী র. সামনে আরেকটি অনুচ্ছেদ তথা باب ما يستحب للعالم اذا سئل الخ. এর অধীনে ২৩ পৃষ্ঠায় এ হাদীসটি আনবেন তাতে সাঈদ ইবনে জুবাইর র. ও নাওফ বিকালী র. এই দু তাবিঈর ইখতিলাফ বর্ণিত হয়েছে। এবিষয়ে তাঁদের দুজনের মধ্যে মতবিরোধ ছিল যে, হযরত খিযির আ. এর নিকট যে মূসা আ. গমন করেছিলেন, তিনি কোন মূসা ছিলেন? তিনি কি মূসা ইবনে ইমরান আ. ছিলেন? যিনি বনী ইসরাঈলের প্রসিদ্ধ নবী? যার উপর তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছিল? না কি অন্য কোন মূসা ছিলেন, হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর র. বলতেন, তিনি সেই হযরত মূসা কালিমুল্লাহই, যার উপর তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছিল। আর হযরত নাওফ বিকালী র. বলতেন, তিনি নন। বরং মূসা ইবনে মীশা ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকূব আ.। এ দুটি ঘটনা বিশুদ্ধ এবং উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এই দ্বিতীয় বাক বিতন্ডার ফয়সালা করেছিলেন, হযরত ইবনে আব্বাস রা.। বিষয়টি পরবর্তীতে আসছে।

এ হাদীসটি সংক্ষিপ্ত । সবিস্তারে এ হাদীসটি ২৩ পৃষ্ঠায় আসছে। এ হাদীসের সারমর্ম হল, হযরত ইবনে আব্বাস রা. ও হুর ইবনে কায়েস রা. এর মধ্যে ইখতিলাফ চলছিল, এমতাবস্থায় উবাই ইবনে কা'ব রা. তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন ইবনে আব্বাস রা. তাকে ডেকে বললেন, আমাদের ফয়সালা করে দিন। হতে পারে আপনি এ বিষয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কিছু শুনেছেন। উবাই ইবনে কা'ব রা. বলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ইরশাদ শুনেছি, একদিন হযরত মূসা আ. বনী ইসরাঈলের একটি দলে তাশরীফ রাখছিলেন। সেখানে তিনি বিস্ময়কর জ্ঞানগর্ভ মূলক বিষয়াদি আলোচনা করছিলেন। এসব শুনে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, পৃথিবীতে আপনার চেয়ে বড় আলিম কেউ আছেন? হযরত মূসা আ. বললেন, আমি কাউকে পাইনা। বাস্তবে এ কথাটি সত্যও ছিল। কারণ, তৎকালীন সময়ে সুনিশ্চিতরূপে হযরত মূসা আ. শরীয়তের গোপন রহস্য এবং আহকাম সংক্রান্ত সব চেয়ে বড় আলিম ছিলেন। তাঁর চেয়ে অধিক হাকিকত ও মা'আরিফে ইলাহী সংক্রান্ত জ্ঞানের অধিকারী আর কেউ ছিল না। কিন্তু হযরত মূসা আ. এর মুখে এ শব্দ নিঃসৃত হওয়া আল্লাহর নিকট পছন্দ হয়নি। এর উপর পাকড়াও হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার মর্জি ছিল, তিনি আল্লাহ তা'আলার ইলমের হাওলা করে দিতেন। যেমন, এরূপ বলে দিতেন যে, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত ও মাকবূল বান্দা অনেক রয়েছেন। সবার খবর তিনিই জানেন।

হযরত জিবরাঈল আ. ওহী নিয়ে এলেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হে মূসা! আপনি কি জানেন, আমার ইলম কোথায় কোথায় বন্টিত হয়েছে? দেখুন, আমার এক বান্দা হলেন, খিযির আ.। তার ইলম আপনার চেয়ে বেশি। হযরত মূসা আ. দরখাস্ত করলেন, আমাকে তাঁর পূর্ণ নির্দশন ও ঠিকানা বাতলে দিন, যাতে আমি সেখানে যেয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারি। নির্দেশ হল, তাঁর তালাশে বের হোন। বের হওয়ার সময় মাছ ভূনা করে থলেতে রাখুন। যেখানে এ মাছটি হারিয়ে যাবে, সেখানেই সে বান্দার সন্ধান পাবেন।

হযরত মূসা আ. এই দিক নির্দশনা অনুযায়ী স্বীয় বিশিষ্ট খাদেম ইউশা' ইবনে নূন আ.কে সাথে নিয়ে সফর আরম্ভ করেন। তাকে বলে দিলেন, মাছের প্রতি লক্ষ রেখ, আমি রীতিমত সফর করতে থাকব যতক্ষন না মনযিলে মাকসূদ (দু সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে) পৌছে যাই। চাই যত দূরত্বই সফর করতে হোক না কেন।

হযরত ইউশা' ইবনে নূন আ. ছিলেন, হযরত মূসা আ. এর বিশিষ্ট খাদেম। তাঁর সামনে তিনি পয়গম্বর এবং তাঁর পরে তাঁর খলীফা হন। সমুদ্রদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে পৌছে একটি পাথরের উপর মাথা রেখে হযরত মূসা আ. ঘুমিয়ে পড়লেন। সে পাথরের নিচেই ছিল আবে হায়াতের ঝর্ণা। হযরত ইউশা' ইবনে নূন আ. বসে

ছিলেন, তখন সে ঝর্ণার কিছু পানি অযু করার সময় অথবা অন্য কোন ভাবে থলেতে পড়ে। হযরত ইউশা' আ. দেখলেন, ভূনা মাছ আল্লাহর হুকুমে জীবিত হয়ে থলে থেকে বেরিয়ে বিস্ময়কর পদ্ধতিতে সমুদ্রে সুড়ঙ্গ পথের মত তৈরি করে চলে গেল। সেখানে পানিতে আল্লাহর কুদরতে একটি তাকের মত উন্মুক্ত রয়ে গেল। হযরত ইউশা' আ. এ ঘটনাটি দেখে বিস্ময়াভিভূত হলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল হযরত মূসা আ. জাগ্রত হলে তাঁকে বলবেন, হযরত মূসা আ. জাগ্রত হলেন। দুজনই চলতে লাগলেন। হযরত ইউশা' আ. হযরত মূসা আ. এর নিকট মাছ জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়ার ইতিবৃত্ত শুনানোর কথা ভুলে গেলেন।

রেওয়ায়াতসমূহে আছে, হযরত মূসা আ. যখন তাঁকে মাছের খবর দিতে বললেন, তখন তাঁর মুখ থেকে বের হয়েছিল, এটা তো কোন বড় কাজ নয়, এজন্য সতর্ক করা হল যে, ক্ষুদ্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র কাজেও একজন মানুষের নিজের উপর ভরসা করা উচিত নয়।

মোটকথা, উভয়েই দিনের অবশিষ্ট অংশে এবং পূর্ণ রাত চলতে থাকলেন। হযরত মূসা আ. এর এতক্ষন পর্যন্ত ক্ষুধা লাগেনি। এখন সকাল বেলা ক্ষুধা অনুভূত হল। ক্লান্তি অনুভূত হল। কারণ, আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য ছিল, তাদেরকে ফিরিয়ে আনা। হযরত মূসা আ. নাস্তা চাইলেন। তখন হযরত ইউশা' আ. এর (অতীত ঘটনা) মনে হল। তিনি বললেন-

فَانِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَانِيْهُ اِلاَّ الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ الخ سورة الكهف.

'আমি তো মাছের ইতিবৃত্ত আপনাকে বলতে ভুলে গেছি। আসলে শয়তানই আমাকে আপনার কাছে তা উল্লেখ করতে ভুলিয়েছে।'

মোটকথা, হযরত মূসা আ. বললেন, ফিরে চল, সেখানেই তো আমাদের কাম্য জিনিস। ফলে পুনরায় ফিরে চললেন। যখন সে স্থানে এসে পৌছলেন, তখন দেখলেন, সে আল্লাহ ওয়ালা সেখানে ঘুমিয়ে আছেন। হযরত মূসা আ. সালাম দিলেন, তিনি সালামের উত্তরদানের পর বললেন, কে? তিনি বললেন, মূসা ইবনে ইমরান। এরপর যে ঘটনা হয়েছে তা সবিস্তারে আসবে।

সতর্কবানী ঃ হযরত খিযির আ. নবী ছিলেন, না রাসূল? ওলী ছিলেন, না ফিরিশতা? জীবিত, না মৃত? এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ আমি নাসরুল বারী কিতাবুত তাফসীরে দিয়েছি।

দ্রষ্টব্য ঃ নাসরুল বারী, কিতাবুত তাফসীর, সূরা কাহাফ ঃ ৩৯০-৩৯৩

٥٩. بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ .

৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উক্তি ঃ হে আল্লাহ্! আপনি তাকে কিতাবের ইলম দিন।

বুখারী ১৭।

٧٤. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ ضَمَّنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ

৭৪. আবু মা'মার র. .... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাকে (বুকের সাথে) জড়িয়ে ধরে বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্! আপনি তাকে কিতাবের (কুরআনের) জ্ঞান দিন।'

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭, কিতাবুল অযু ঃ ২৬, মানাকিবে ইবনে আব্বাস ঃ ৫৩১, আল ই'তিসাম ঃ ১০৮০।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন-

المناسبة بين البابين من حيث ان من جملة المذكور في الباب الاول غلبة ابن عباس رضي الله عنه على حر بن قيس رضي الله عنه في تماريهما الخ عمدة : ١/٦٥.

সারকথা হল, পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত মূসা আ. সংক্রান্ত ইবনে আব্বাস রা. ও হুর ইবনে কায়েস রা. এর বিতর্কে হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর বিজয়ের কারণ ছিল ইলম ও ফযল তথা জ্ঞান ও গুণ।

এ অনুচ্ছেদে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস রা.এর ফযীলত ও ইলমী প্রাচুর্য ছিল রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আর বরকতে। অতএব মিল স্পষ্ট হয়ে গেল।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য ইলম এবং হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর মাহাত্ম্য ও ফযীলতের সাথে সাথে এ কথা বলা যে, ইলম যেহেতু আল্লাহ তা'আলার বিশেষ পুরস্কার ও বিশেষ অনুগ্রহ, যেমন- باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين দ্বারা জানা গেছে। অতএব মানুষ যতই মেধাবী ও সুচতুর হোক নিজের মেধা ও চেষ্টাকে যথেষ্ট মনে করবে না বরং আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আও করতে থাকবে।

২. হযরত শাইখুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া র. বলেন, ইমাম বুখারী র. এ অনুচ্ছেদ কায়েম করে এদিকে ইঙ্গিত করলেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর জন্য এ দু'আ কেন করেছিলেন? তার কারণের দিকে তিনি ইঙ্গিত করেছেন। সেটি হল, একবার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজত সেরে আসার জন্য তাশরীফ নিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রা. ওযুর জন্য পানি রেখে দেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এসে ভীষণ খুশী হন এবং জিজ্ঞেস করেন, এটা কে রেখেছে? বলা হল, ইবনে আব্বাস রা. রেখেছেন। এতদশ্রবণে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত হয়ে দু'আ করলেন। এ হাদীসটি ইনশাআল্লাহ নাসরুল বারীর দ্বিতীয় খন্ডে আসবে।

অতএব ইমাম বুখারী র. বলে দিলেন যে, এ দু'আ ছিল খেদমতের কারণে। কাজেই উস্তাদ ও মাশায়েখে কিরামের খেদমত করা উচিত।

হাদীসের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সম্পূর্ণ স্পষ্ট। কারণ, শিরোনাম হাদীসেরই একটি টুকরো।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে স্বীয় বুকের সাথে লাগিয়ে দু'আ করেছেন। আয় আল্লাহ! তাকে কিতাব তথা কুরআনের জ্ঞান দান কর। বুখারী ২৬ পৃষ্ঠায় আছে- اللهم فقهه في الدين, কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে- علمه الحكمة. আবার কোনটিতে আছে- اللهم علمه الحكمة وتاويل الكتاب এমতাবস্থায় হিকমত দ্বারা উদ্দেশ্য সুন্নাত. আর কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন মাজীদ। অতএব অনুবাদ হবে, আয় আল্লাহ! তাকে দীনের বুঝ এবং ইলমে তাফসীর দান কর।

এ কারণে বর্তমানে যত তাফসীর রয়েছে সেগুলো সব হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর তাফসীরের মুখাপেক্ষী। সবচেয়ে বেশি তাফসীর তাঁরই। একারণেই হযরত ইবনে আব্বাস রা. হিবরুল উম্মাহ ও রা'সুল মুফাসসিরীন তথা উম্মতের মহাজ্ঞানী ও শীর্ষ মুফাসসির উপাধিতে ভূষিত।

তাফাক্কুহএর অবস্থা তো এই যে, ফিকহে শাফিঈ পরিপূর্ণরূপে এরই উপর নির্ভরশীল।

٦٠. بَاب مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ ؟

৬০. পরিচ্ছেদ ঃ বালকদের কোন্ বয়সের শ্রবণ গ্রহণীয়?

٧٥. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رض— قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ .

৭৫. ইসমাঈল র. .... হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি বালিগ হবার নিকটবর্তী বয়সে (তখনো যুবক তথা বালিগ হননি) একবার একটি মাদী গাধার উপর সওয়ার হয়ে এলাম। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন কোন দেয়াল সামনে না রেখেই মিনায় নামায আদায় করছিলেন। তখন আমি কোন এক কাতারের সামনে দিয়ে গেলাম এবং মাদী গাধাটিকে চরে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিলাম। আমি কাতারের ভেতর ঢুকে পড়লাম, কিন্তু এতে কেউ আমার একাজে প্রশ্নোত্থাপন নিষেধ করলেন না (না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, না কোন সাহাবী সতর্ক করলেন)।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, কিতাবুল ইলম ঃ ১৭, সালাত ঃ ৭১, আযান ঃ ১১৯, হজ্ব ঃ ২৫০, মাগাযী ঃ ৬৩৩।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র ঃ পূর্বের অনুচ্ছেদে বিবরণ ছিল যে, হযরত ইবনে আব্বাস রা. শৈশবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ লাভ করেছিলেন। বালিগ হওয়ার পর সে সব দু'আ বর্ণনা করেছেন। আর হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর এ বিবরণের উপর নির্ভর করা হয়েছে।

এবার এ অনুচ্ছেদে ইমাম বুখারী র. বালিগ হওয়ার পূর্বেকার একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। এর সম্পর্ক হল, বিদায় হজ্বের সাথে। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, তৎকালীন সময়ে আমি ছিলাম বালিগ হওয়ার কাছাকাছি (অর্থাৎ, তখনো আমি বালিগ হইনি)। এতে বুঝা গেল যে, না বালিগের হাদীস গ্রহণ সহীহ ও ধর্তব্য।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ প্রথমে স্মর্তব্য যে, একটি হল হাদীস গ্রহণ, আরেকটি হল হাদীস পৌঁছান। প্রথমটিকে বলে, تحمل حديث আর দ্বিতীয়টিকে বলে اداء حديث। এই শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য হল, হাদীস শুনানোর সময় বর্ণনাকারীর বালিগ হওয়া শর্ত, কিন্তু হাদীস গ্রহণকালে বালিগ হওয়া শর্ত নয়।

اريد بالسماع مطلق التحمل ويوخذ من مجموع حديثي الباب ان سن صحة السماع والتحمل مطلق سن التعقل. حاشية سندهي بخاري : ٥٢.

সারকথা হল, এ অনুচ্ছেদের দুটি হাদীস (৭৫ ও ৭৬ নং) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হাদীস গ্রহণের জন্য কোন বিশেষ বয়সের শর্ত অথবা বালিগ হওয়া শর্ত নয়, বরং হাদীস গ্রহণ ও শ্রবণের জন্য বুঝার বয়স হলেই চলে। অর্থাৎ, শিশু যখন সমঝদার হয় তখনই সে হাদীস গ্রহণ করতে পারে।

٧٦. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ رض قَالَ عَقَلْتُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ

৭৬. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ র. ..... হযরত মাহমূদ ইবনুর-রাবী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এখানো আমার মনে আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বালতি থেকে পানি নিয়ে আমার মুখমণ্ডলে কুলি করে দিয়েছিলেন, তখন আমি ছিলাম পাঁচ বয়সী বালক।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল - وانا ابن خمس سنين من دلو বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭, ৩১, ১১৬, ১৫৮, ৯৪০, ৯৫০।

ব্যাখ্যা ঃ

উপরোক্ত দুটি হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, হাদীস গ্রহণের জন্য বালিগ হওয়া শর্ত নয়। যদি শৈশবে কোন হাদীস শুনে আর তা স্মরণ থাকে এবং বালিগ হওয়ার পর তা বর্ণনা করে, তবে তা গ্রহণ করা হবে। কারণ, হযরত ইবনে আব্বাস, নু'মান ইবনে বশীর ও আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এরূপ কম বয়স্ক সাহাবী ছিলেন, যাঁরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় না বালিগ ছিলেন, কিন্তু তাদের বয়স জিজ্ঞেস করা ছাড়াই উম্মত তাঁদের হাদীস গ্রহণ করেছেন। বিশেষতঃ আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ও নু'মান ইবনে বশীর রা. এর বয়স নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত কালে প্রায় দশ বছর বা তার চেয়েও কম ছিল। এতে বুঝা গেল, বয়স সম্পর্কে কোন সীমা নির্ধারিত নেই। মূল ধর্তব্য হল, বুঝ জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধি।

◆ আল্লামা উসমানী র. বলেন, সর্বোত্তম উক্তি হল, তাহরীরুল উসূলে লিখিত হযরত ইবনে হুমাম র. এরটি। হাফিজ র. এটি স্বীকার করেছেন। সেটি হল, বয়সের কোন সীমা নির্ধারিত নেই। বরং শিশুদের শক্তি ও অবস্থার বৈচিত্র ও ঘটনার ধরণের বৈচিত্রের উপর তা নির্ভর করে। না প্রতিটি শিশুর প্রতিটি কথা প্রত্যাখ্যানযোগ্য, না প্রতিটি শিশুর প্রতিটি কথা গ্রহণযোগ্য। কোন কোন শিশু মেধাবী হয়ে থাকে। আবার কোন কোন শিশু ছয় সাত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও অবুঝ থাকে। যেমন, একটি শিশু বলে, আমার স্মরণ আছে, যখন আমি পাঁচ বছর বয়সী ছিলাম তখন এ বাড়ীটি নির্মিত হয়েছিল। তার একথা গ্রহণ করলে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি বলে, আমি যখন পাঁচ বছর বয়সী, তখন আমি অমুক আলিমের বক্তব্য শুনেছিলাম। তা আমার পরিপূর্ণ স্মরণ আছে। তার একথাটি গ্রহণ করার ব্যাপারে নিশ্চয়ই দোদুল্যমানতা

থাকবে। এতে বুঝা গেল যে, ঘটনার বৈচিত্র দ্বারাও গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে পার্থক্য হয়। -দরসে বুখারী।

◆ ইমাম বুখারী র.ও কোন নির্ধারিত সীমা উল্লেখ করেন নি। দুটি শাখাগত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যদ্বারা ইঙ্গিত হয় যে, কোন বিশেষ সীমা এ প্রসঙ্গে মূলনীতিরূপে নেই।

الى غير جدار এ সম্পর্কে মতবিরোধ আছে যে, সুতরা ছিল কি না? এর বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ কিতাবুস সুতরায় আসবে। এখানে শুধু এতটুকু আলোচনা করে দিতে চাই যে, ইমাম বুখারী র. এ রেওয়ায়াতটি - سترة الامام سترة من خلفه অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। যদ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সুতরা ছিল, কিন্তু দেয়ালের সুতরা নয়, বরং লাঠি ইত্যাদির সুতরা ছিল।

আল্লামা কাশ্মীরী র. বলেন-

ما اختاره البخاري اولى وعليه تظهر فائدة التعرض الى نفي الجدار خاصة لانه اذا لم يكن هناك جدار ولا غيره فالتعرض الى نفيه خاصة لغو. فيض الباري : ١٧٥/١.

অর্থাৎ, যদি একেবারেই সুতরা বা আড়াল না হত, তাহলে الى غير جدار শব্দ অনর্থক হত। الى غير سترة বলা যথেষ্ট হত। এজন্য প্রধান হল- উহ্য ইবারত الى سترة غير جدار ।

فلم ينكر ذلك علي অর্থাৎ, কেউ আমার উপর প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। এর দ্বারা হযরত ইবনে মাসঊদ রা. এর উদ্দেশ্য সে সবের মতখন্ডন, যারা বলে যে, কুকুর, গাধা এবং মহিলা নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামায ফাসিদ হয়ে যায়।

ইবনে আসীর র. বলেন- حمار শব্দের পর اتان শব্দ আনাতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গাধী অতিক্রান্ত হলে নামায ফাসিদ হয় না, তাহলে মহিলা অতিক্রম করলে উত্তমরূপেই নামায ফাসিদ হবে না। কারণ, মানুষ হল, আশরাফুল মাখলূকাত। এ মাসআলাটির বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী, কিতাবুল মাগাযী ঃ ৪৮৮।

وانا ابن خمس سنين তিনি হলেন, মাহমূদ ইবনে রাবী' রা.। কম বয়স্ক সাহাবী। তিনি বলেন, আমার এখন পর্যন্ত সে ঘটনা মনে আছে, যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উপর কুলি করেছিলেন। তখন আমার বয়স ছিল পাঁচ বছর।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কুলি করা ছিল তাকে আপন করে নেয়ার জন্য। এটাকে বলে (বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলা) এর দ্বারা মাতা পিতাও খুশী হন, বাচ্চাও আপন হয়ে যায়।

٦١. بَاب الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رض مَسِيرَةَ شَهْرٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ

৬১. পরিচ্ছেদ ঃ ইলম অর্জনের জন্য বের হওয়া।

আর হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. একটি মাত্র হাদীসের জন্য আবদুল্লাহ্ ইবনে উনাইস রা.-এর কাছে এক মাসের পথ সফর করে গিয়েছিলেন।

٧٧. حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ خَالِدُ بْنُ خَلِيٍّ قَاضِي حِمْصَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض أَنَّهُ تَمَارَى

هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رضـــ فَقَالَ إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَأْنَهُ فَقَالَ أُبَيٌّ نَعَمْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَأْنَهُ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَتَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسَى لَا فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مُوسَى بَلَى عَبْدُنَا خَضِرٌ فَسَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ فَكَانَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ فَتَى مُوسَى لِمُوسَى أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ قَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ .

৭৭. হিমস শহরের কাযী আবুল কাসিম খালিদ ইবনে খালীয়্যি র. ...... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, একবার তিনি এবং হুর ইবনে কায়েস ইবনে হিসন আল-ফাযারী হযরত মূসা আ.-এর সাথীর ব্যাপারে বাদানুবাদ করছিলেন। তখন উবাই ইবনে কা'ব রা. তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রা. তাঁকে ডেকে বললেন ঃ আমি ও আমার এ ভাই মূসা আ.-এর সেই সাথীর ব্যাপারে মতবিরোধ করছি, যাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য তিনি পথের সন্ধান চেয়েছিলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে শুনেছেন?

উবাই রা. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর প্রসঙ্গে বলতে শুনেছি যে, একবার হযরত মূসা আ. বনী ইসরাঈলের কোন এক মজলিসে হাযির ছিলেন। তখন তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, 'আপনি কাউকে আপনার তুলনায় অধিক জ্ঞানী বলে জানেন?' হযরত মূসা আ. বললেন, 'না।' তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আ.-এর কাছে ওহী পাঠালেন ঃ 'হ্যাঁ, আমার বান্দা খিযির (তাঁর জ্ঞান আপনার চেয়ে বেশী)।' এরপর তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাত লাভের পথ জানতে চাইলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য মাছকে তার নিদর্শন বানিয়ে দিলেন। তাঁকে বলে দেয়া হল, 'যখন আপনি মাছটি হারিয়ে ফেলবেন তখন আপনি ফিরে আসবেন। তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি তাঁর সাক্ষাত পাবেন।' তিনি সমুদ্রে সে মাছের নিশানা অনুসন্ধান করতে লাগলেন। যা হোক, মূসা আ.-কে তাঁর সাথী যুবক বললেন ঃ (কুরআনের ভাষায় ঃ)

أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ .

'আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন পাথরের কাছে বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মাছের কথা (বলতে) ভুলে গিয়েছিলাম। আর শয়তান তার কথা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল' (১৮ ঃ ৬৩)। হযরত মূসা আ. বললেন ঃ

ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا

'আমরা সে স্থানটির তালাশ করছিলাম।' (১৮ ঃ ৬৪)

তারপর তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। শেষে তাঁরা খিযির আ.-কে পেয়ে গেলেন। তাঁদের (পরবর্তী) ঘটনা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৭, ২৩, ৩০২, ৩৭৭, ৪৬৩, ৪৮১, ৪৮২-৪৮৩, ৪৮৭, ৪৮৮, ৬৯০, ৯৮৭, ১১১৪।

যোগসূত্র ঃ পিছনের অনুচ্ছেদে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর উপস্থিতির বিবরণ ছিল। এই উপস্থিতি ছিল মূলত ইলম অন্বেষনের জন্যই। আর এ অনুচ্ছেদেও ইলম অন্বেষনের জন্য সফরের উল্লেখ রয়েছে। আল্লামা আইনী র. উপরোক্ত মিলের বিবরণ দেয়ার পর লিখেছেন, এই মিল সত্ত্বেও সর্বোত্তম হল, ইমাম বুখারী র. কর্তৃক এ অনুচ্ছেদটিকে- باب ما ذكر في ذهاب موسى الى الخضر এর পরে উল্লেখ করা। এতে প্রথম অনুচ্ছেদ দ্বারা সামুদ্রিক সফরের প্রমান আর দ্বিতীয়টিতে স্থলীয় সাধারণ সফরের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হত।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী র. পিছনের অনুচ্ছেদগুলোতে ইলমের ফযীলত, প্রয়োজন ও গুরুত্ব পরিপূর্ণ বিশদভাবে প্রমাণ করেছেন। এবার বলতে চান যে, ইলম নেহায়েত জরুরী জিনিস। যদি স্থানীয়ভাবে কারো এই প্রয়োজন পূর্ণ না হয় তাহলে বাড়ী ছেড়ে বাইরে সফর করা উচিত। চাই সামুদ্রিক সফর হোক বা স্থলীয়। কারণ, দুনিয়ার কোন কাজ ইলম ছাড়া সম্ভব নয়।

অবশ্য কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা সফরের কিছু নিষেধাজ্ঞা বুঝা যায়। যেমন, এক রেওয়ায়াতে আছে-

السفر قطعة من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه فاذا قضى احدكم نهمته فليتعجل الى اهله.

অর্থাৎ, সফর এক প্রকার আযাব। যা তোমাদের খানা, পিনা ও ঘুম সবগুলোতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এজন্য যখনই প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে তখন দ্রুত বাড়িতে ফিরে আসবে।

এই রেওয়ায়াত দ্বারা সফর নিষেধের সন্দেহ হতে পারে, কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, এতে সফরের অনুমতি রয়েছে। অবশ্য লক্ষ্য অর্জনের পর পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে আসার প্রতি দিক নির্দেশনা রয়েছে।

৪. আবূ দাঊদের এক রেওয়ায়াতে আছে-

لا يركب البحر الا حاج او معتمر او غاز في سبيل الله

অর্থাৎ, হজ্বআদায়কারী ও উমরাকারী এবং আল্লাহর রাস্তায় যোদ্ধা ব্যতীত অন্য কেউ যেন সামুদ্রিক সফর না করে।

এ হাদীসে অপ্রয়োজনে সফরের প্রতি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

মোটকথা, ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য হল, ইলম নেহায়েত জরুরী বিষয়। এর জন্য সফর করা জায়িয আছে। যদি কোন রেওয়ায়াত দ্বারা নিষেধ বুঝা যায় তবে তা অপ্রয়োজনীয় সফরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ইমাম বুখারী র. الخروج في طلب العلم এর শিরোনাম কায়েম করে বলে দিয়েছেন যে, ইলম অর্জনের জন্য সাধারণভাবেই সফর করা জায়িয আছে, সফর কাছের হোক বা দূরের, স্থলীয় হোক বা সামুদ্রিক।

ব্যাখ্যা ঃ শিরোনামে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. এর সফরের বিবরণ রয়েছে। ইমাম বুখারী র. আল আদাবুল মুফরাদে, ইমাম আহমদ ও আবূ ইয়ালা স্ব স্ব মুসনাদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যার সারমর্ম হল, হযরত জাবির রা. বলেন, আমি সংবাদ পেলাম এক সাহাবীর নিকট এরূপ একটি হাদীস

রয়েছে, যেটি তিনি প্রত্যক্ষ্যভাবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন। তখন আমি উঁট ক্রয় করে হাওদা বাঁধলাম এবং এক মাসের দূরত্ব সফর করে শাম পর্যন্ত পৌঁছলাম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস রা. এর বাড়ীতে এসে দারোয়ানকে অবহিত করলাম যে, জাবির দরজায় উপস্থিত। দারোয়ান এসে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা.? আমি বললাম, হ্যাঁ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস রা. এলেন এবং মুআনাকা করলেন। আমি বললাম-

حديث بلغني عنك انك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخشيت ان اموت قبل ان اسمعه.

অর্থ ঃ আমার নিকট এরূপ একটি হাদীস পৌঁছেছে যেটি আপনি স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনেছেন। আমার আশংকা হল, এ হাদীসটি শুনার পূর্বেই আমি মরে যাই কি না। ফলে তিনি তাঁকে সে হাদীসটি শুনালেন।

ইমাম বুখারী র. কিতাবুত তাওহীদের- قول الله عز وجل وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ الاَّ لِمَنْ اَذِنَ لَه অনুচ্ছেদে এ হাদীসের একটি অংশ তা'লীকরূপে উল্লেখ করেছেন-

ويذكر عن جابر عن عبد الله بن انيس رضـــ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انا الملك انا الديان. بخاري ١١١٤.

তাছাড়া আল্লামা আইনী ও হাফিজ আসকালানী র. এক একটি হাদীসের জন্য সফর সংক্রান্ত অনেক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কারো ইচ্ছা হলে সেখানে অধ্যয়ন করতে পারেন।

উঁচু সনদের জন্য মীর সাইয়্যিদ শরীফের সফর ঃ

পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরাম কি পরিমাণ কষ্ট- মেহনত বরদাশত করেছেন, তার সীমা নেই। আর এটাতো হাদীসে নববী। বুঝা গেল, যে পরিমাণ মেহনত ও চেষ্টার মাধ্যমেই তা অর্জন করা হোক না কেন, তা উত্তম। অন্যথায় লোকজন তো অন্যান্য শাস্ত্র অর্জনেও অনেক বেশি কষ্ট সহ্য করেছেন।

মীর সাইয়্যিদ শরীফ জুরজানী র. শরহে মাতালি' পড়ার পর তার মনে শখ জাগল গ্রন্থটি স্বয়ং গ্রন্থকার থেকেই পড়া উচিত। অতঃপর রওয়ানা করলেন, গ্রন্থকার আল্লামা কুতবুদ্দীন রাযী র. এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি এতটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, চোখের ভ্রু তুলে নজর করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? তিনি আরজ করলেন, আমি সাইয়্যিদ শরীফ জুরজানী। যদিও শরহে মাতালি' পড়েছি তা সত্ত্বেও শুধু আপনার কাছ থেকে পড়ার আকাঙ্খা নিয়ে হাজির হয়েছি। তিনি উত্তর দিলেন, আমি একদম দুর্বল হয়ে পড়েছি। তুমি যুবক। আমার দ্বারা তোমার আন্তরিক প্রশান্তি আসবে না। তবে আমার এক শিষ্য আছে রোমে। তার নাম হল মুবারক শাহ। তার কাছে চলে যাও। তার অধ্যাপনা যেন আমারই অধ্যাপনা। তিনি তাঁর কথামত সেখানে পৌঁছলেন এবং পূর্ণ ইতিবৃত্ত বর্ণনা করলেন। মুবারক শাহ ছিলেন আল্লামা কুতবুদ্দীন র. এর গোলাম। তিনি তাকে উত্তমরূপে লালন পালন করেছেন এবং ভাল মত পড়িয়েছেন। অবশেষে তিনি প্রতিটি শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হয়ে যান। খুব ভাল অধ্যাপনা করতে পারতেন। লোকজন বেশিরভাগ তাকে মুবারক শাহ মানতেকী নামে ডাকতেন। মীর সাইয়্যিদ শরীফ থেকে পূর্ণ ইতিবৃত্তি শুনে তিনি বললেন, আমাদের এখানে ভর্তির জন্য একটি শর্ত আছে, সেটি হল, আমি দৈনিক একটি ক্লাসের জন্য একটি স্বর্ণমুদ্রা নেই। মীর সাহেব দৈনিক একটি স্বর্ণ মুদ্রা এখন কোত্থেকে আনবেন! তিনি বলেন, আমি খুব চিন্তা করে তার নিকট আরজ করলাম যে, দৈনন্দিনের শর্ত তো পালন করতে পারব না, তবে আমার কাছে যখন একটি স্বর্ণ মুদ্রা এসে যাবে তখন একটি সবক পড়ে নিব। তিনি বললেন, ঠিক আছে মঞ্জুর হল।

মীর সাহেবের মধ্যে প্রকৃত তলব ছিল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে নামব। একটি স্বর্ণ মুদ্রা হলে একটি সবক পড়ব। এদিকে মীর সাহেব তো এই সিদ্ধান্ত নিলেন, কিন্তু আল্লাহর মঞ্জুর ছিল ভিন্ন রকম। এজন্য মীর সাহেবের এখনো ভিক্ষে করার সুযোগ আসে নি। এমতাবস্থায় এক বড়লোক জানতে পারলেন, তিনি সাইয়্যিদ এবং এভাবে পড়তে চান। তাকে তিনি ডেকে এনে বললেন, আমি আপনাকে দৈনিক একটি স্বর্ণমুদ্রা দিব, আপনি পড়তে শুরু করুন। মীর সাহেবের আকাঙ্খা পূর্ণ হল। তিনি পড়তে শুরু করলেন। এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হওয়ার পর উস্তাদ তাকে ডেকে বললেন, মিয়া! স্বর্ণমুদ্রার কোন প্রয়োজন নেই। আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল তোমাকে পরীক্ষা করা। তুমি কতটা ইলম অন্বেষনের জন্য এসেছ তা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। সে পরীক্ষা হয়ে গেছে। এবার তুমি পড় এবং নিজের স্বর্ণমুদ্রাগুলো নিজের কাছে রাখ। তবে প্রথম কাতারে বসার অনুমতি নেই। কথা বলারও অনুমতি নেই। শুধু শুনবে। তিনি এতেও রাজি হয়ে গেলেন। ক্লাসের সবক শুনতে আরম্ভ করেছেন। পিছনেই বসতেন। কিন্তু অবশেষে তিনি তো সাইয়্যিদ শরীফ ছিলেন। যিনি তাফতাযানীকে পরাস্ত করেছিলেন। ক্লাসের মাঝখানে আবেগ আসত, সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হত, কিন্তু বলার অনুমতি তো ছিল না। সে জন্য নীরব বসে থাকতে হত। অবশ্য যখন স্বীয় হুজরায় যেতেন তখন দেয়ালকে সম্বোধন করে বলতেন, গ্রন্থকার এরূপ বলেছেন, আর উস্তাদ এরূপ বলেছেন, তবে আমি এরূপ বলি।

একবার উস্তাদ ছাত্রদের অবস্থা জানতে আরম্ভ করলেন। বাইরে ঘোরাফেরার জন্য বের হলেন। তাঁর হুজরার নিকট এসে দেখলেন, সাইয়্যিদ শরীফ বক্তব্য রাখছেন, উস্তাদ আওয়াজ শুনে দাড়িয়ে গেলেন, যখন তিনি বললেন, واقول كذا, তখন পূর্ণ মনোযোগ সহকারে গভীরভাবে শুনলেন। কথা খুবই উত্তম ছিল। খুব পছন্দ হল। ভীষণ আনন্দিত হলেন। সকালে জিজ্ঞেস করলেন, অমুক রুমে কে থাকে? বলা হল, সাইয়্যিদ শরীফ থাকেন। তখন বললেন, তুমি সামনের কাতারে এসে বস এবং মন খুলে প্রশ্ন কর। এরপর তার যে মর্তবা হয়েছে তা তো সবার জানা আছে।

আমি বলি, এটি মামুলি গ্রন্থ শরহে মাতালি'। এর জন্য এতো কষ্ট পরিশ্রম বরদাশত করেছেন। তাহলে যদি হাদীসে নববীর জন্য এর চেয়ে বেশি কষ্ট সহ্য করা হয়, তবে সেটা কি অযৌক্তিক? -দরসে বুখারী ঃ ৩৫৮।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল- فكان موسى يتبع اثر الحوت বাক্যে স্পষ্ট।

٦٢. بَاب فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ

৬২. পরিচ্ছেদ ঃ ইলম শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের ফযীলত। বুখারী ১৮

যোগসূত্র ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন, পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এবার তাদের উভয়ের ফযীলত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

হযরত শাইখুল হিন্দ র. বলেন, গ্রন্থকার পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদগুলোতে শেখার প্রয়োজন ও গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন, আর এ অনুচ্ছেদে ইলম শেখানো ও তার প্রসার ঘটানোর ফযীলত বর্ণনা করতে চান।

٧٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رضـــ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا

أَجَادِبُ أَمْسَكَتْ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتْ الْمَاءَ قَاعٌ يَعْلُوهُ الْمَاءُ وَالصَّفْصَفُ الْمُسْتَوِي مِنْ الْأَرْضِ .

৭৯. মুহাম্মদ ইবনুল আলা র. .... হযরত আবূ মূসা রা. থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহর তা'আলা আমাকে যে হেদায়াত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হল জমিনের উপর পতিত প্রবল বৃষ্টির ন্যায়। কোন কোন ভূমি থাকে উর্বর যা সে পানি চুষে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে ঘাসপাতা এবং সবুজ তরুলতা উৎপাদন করে। আর কোন কোন ভূমি থাকে কঠিন (পাথুরে) যা পানি আটকে রাখে (জমা করে)। পরে আল্লাহ তা'আলা তা দিয়ে মানুষের উপকার করেন; তারা নিজেরা পান করে ও (পশুপালকে) পান করায় এবং তার দ্বারা চাষাবাদ করে। আবার কোন কোন জমি আছে যা একেবারে মসৃণ ও সমতল; তা না পানি আটকে রাখে, আর না কোন ঘাসপাতা উৎপাদন করে (এর উপর দিয়ে পানি বয়ে চলে যায়)। এই হল সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে দীনের জ্ঞান লাভ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাতে সে উপকৃত হয়। ফলে সে নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। আর সে ব্যক্তিরও দৃষ্টান্ত -যে সে দিকে মাথা তুলে তাকায়ই না এবং আল্লাহর যে হেদায়াত নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তা গ্রহণও করে না।

আবূ 'আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) র. বলেন ঃ ইসহাক র. আবূ উসামা র. থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি قَبِلَتْ এর স্থলে قَيَّلَتْ (আটকে রাখে) ব্যবহার করেছেন। (এ হাদীসে قيعان শব্দটি قاع এর বহুবচন।) قاع হল এমন ভূমি যার উপর পানি জমে থাকে। আর কুরআনে হাকীমে আছে- قاعا صفصفا এতে الصفصف বলে সমতল ভূমিকে।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল- فعَلِم وعَلّم বাক্যে স্পষ্ট।

শব্দ বিশ্লেষন ঃ

الغيث প্রয়োজনের মুহূর্তে বৃষ্টি। نقية পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। নূনের উপর যবর, ক্বাফের নিচে যের, ইয়ার উপর তাশদীদ। রফা সহ اسم كان । منها مقدماً তার খবর। قبلت الماء ক্বাফের উপর যবর, বা এর নিচে যের, باب سمع থেকে قبول ক্রিয়ামূল থেকে। অর্থ পানি গ্রহণ করেছে, চুষে নিয়েছে। الكلأ কাফ ও লামের উপর যবর, শেষে হামযা অর্থাৎ, আলিফের উপর হামযা আছে, কোন কোন কিতাবে আলিফের পর হামযা রয়েছে এটা ভুল। كلأ শব্দের অর্থ হল, ঘাস। চাই শুষ্ক হোক বা তাজা। عشب তরতাজা ঘাস, সবুজ ঘাস। অতএব এখানে আমের পর খাস জিনিস উল্লেখ করা হয়েছে। اجادب জীম ও দাল সহকারে। এটি কিয়াস পরিপন্থী جدب এর বহুবচন। সে জমিন যাতে ফসল বা ঘাস উৎপন্ন হয় না। অর্থাৎ, এটি পানিও চুষে না, আবার ঘাস বা তরুলতা কিছুই জন্মায় না।

قيعان ক্বাফের নিচে যের। قاع এর বহুবচন। তৃণলতাহীন মরুভূমি।

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীয়ে রাব্বানীকে একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, আমি যে হেদায়াত ও ইলম নিয়ে এসেছি তার উদাহরণ হল, সে সময়োপুযোগী জোরদার

বৃষ্টি যেটি জমিনের বিভিন্ন অংশে বর্ষিত হয়। এবার জমিনের কিছু অংশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র। (অর্থাৎ, নরম, হালচাষ কৃত, ফসলের উপযোগী) এ অংশটি পানি চুষে নেয় অতঃপর ফসল ইত্যাদি উৎপন্ন করে। ফল-ফুল উৎপাদন করে। যদ্দারা আম খাস নির্বিশেষে সবাই এবং জীবজন্তু পর্যন্ত উপকৃত হয়। এটা হল, মুজতাহিদীনে কিরামের উদাহরণ। তারা ওহীয়ে ইলাহী (চাই মাতলূ হোক বা গায়রে মাতলূ) গ্রহণ করেছেন। অতঃপর মূলনীতি ও শাখা প্রশাখার ফল-ফূল উৎপন্ন করেছেন এবং মাসায়েলের স্তুপ দিয়েছেন। তাদের রয়েছে এক নম্বর জমিনের সাথে সাদৃশ্য। তারা নিজেরাও উপকৃত হন, অন্যদেরকেও উপকৃত করেন।

জমিনের দ্বিতীয়াংশ হল, শক্ত। (নরম ও কর্ষনযোগ্য নয়) বৃষ্টির পানি চুষে নেয়ার যোগ্যতা নেই, তবে সমতল। যেমন, হাউজ, পুকুর এগুলো পানি তেমন চুষে নেয় না, কিন্তু পানি জমা করে রাখে। যদ্দারা মানুষ ও জীব জন্তু উপকৃত হয়। এটা হল সে ব্যক্তির উদাহরণ যে ইলম অর্জন করে নিজে তো আমল করেনি, কিন্তু অন্যদেরকে শিখিয়েছে ও উপকৃত করেছে।

জমিনের তৃতীয় প্রকার হল, তরুলতাহীন মরুভূমি। এটি না পানি ধরে রাখে, না ফসল উৎপন্ন করে। এটা সে সব লোকের উদাহরণ যাদের মধ্যে হেদায়াত ও ইলম অবস্থানই করেনি। এক কানে শুনেছে অপর কান দিয়ে বের করে দিয়েছে। অর্থাৎ, সে ইলম ও হেদায়াতের দিকে মনোযোগই দেয়নি।

প্রশ্ন ঃ এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, যার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে এবং যেটিকে উপমা দেয়া হয়েছে। এতদুভয়ের মাঝে কোন মিল নেই। কারণ, যার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে সেখানে ৩ প্রকার জমিনের উল্লেখ রয়েছে। আর যেটিকে উপমা দেয়া হয়েছে তাতে দু প্রকার লোকের উল্লেখ রয়েছে।

উত্তর ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল, উপকৃত করা ও উপকৃত হওয়া। এজন্য প্রথম দুই প্রকারকে অর্থাৎ, যে পানি পান করেছে এবং যে পানি ধরে রেখেছে ও জমা করেছে উভয়কে এক গণ্য করেছেন। কারণ, এ দু প্রকার হল উপকারী। অতএব এ হিসেবে তথা উপকৃত হওয়া যায়- এ দিকে লক্ষ্য করলে এ দুপ্রকার হল একই প্রকার।

দ্বিতীয় প্রকার তথা তৃতীয় জমিন সম্পূর্ণ অনুৎপাদনযোগ্য। উপকারযোগ্য নয়। সে সব লোক হল কাফির ও জাহিল। না স্বয়ং ইলম হেদায়াত দ্বারা নিজে উপকৃত হয়েছে না অন্যদের উপকৃত করেছে।

قال ابو عبد الله الخ অর্থাৎ, ইমাম বুখারী র. বলেন, যে ইসহাক (ইবনে রাহওয়াইহ র.) এর রেওয়ায়াতে قبلت الماء এর স্থলে قَيَّلت তাশদীদযুক্ত ইয়া সহকারে এসেছে। কোন কোন আলিম এটাকে সঠিক বলেছেন। কারণ, এর অর্থও পানি ধরে রাখা হয়ে থাকে। কিন্তু হাফিজ র. বলেছেন, এটি রাবীর বিকৃতি।

ইমাম বুখারী র.এর রীতি ঃ

আল্লামা আইনী র. বলেন, ইমাম বুখারী র. এর রীতি হল, তিনি জটিল শব্দরাজির ব্যাখ্যা করে দেন। আর যদি কুরআনে হাকীমে এর সাথে মিলযুক্ত শব্দ পাওয়া যায়, তবে তারও ব্যাখ্যা করে দেন। এ জন্য এ হাদীসে قيعان শব্দ এসেছে। অতএব এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন যে, এটি قاع এর বহুবচন। এর দ্বারা صفصف এর ব্যাখ্যাও করে দিয়েছেন। অথচ এখানে এ শব্দটি ছিল না, কিন্তু কুরআনে হাকীমে فيذرها قاعا صفصفا রয়েছে। এজন্য ইমাম বুখারী র. প্রথমে قاع এর তাফসীর করেছেন। অতঃপর এর সাথে صفصف এর ব্যাখ্যাও করেছেন।

٦٣. بَاب رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ وَقَالَ رَبِيعَةُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ الْعِلْمِ أَنْ يُضَيِّعَ نَفْسَهُ

৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ ইলমের বিলুপ্তি ও মূর্খতার প্রসার। রাবী'আ র. বলেন, 'যার কাছে (দীনের) কিছুমাত্র ইলম আছে, তার উচিত নয় নিজেকে ধ্বংস করা তথা অপমানিত করা।

বুখারী - ১৮

যোগ্যসূত্র ঃ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে আলিম ও মুআল্লিম (শেখা ও শেখানো) এর ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে এবং ইলম অর্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এবার এ অনুচ্ছেদে পূর্বোক্ত সে অনুচ্ছেদেরই পরিশিষ্ট আনা হয়েছে। অর্থাৎ, শিক্ষা দান নেহায়েত জরুরী। এধারা বন্ধ হলে ইলম উঠে যাবে। অজ্ঞতার প্রবলতা হবে। অতঃপর কোন কাজ নিয়ম মত হবে না। পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা উলট পালট হয়ে যাবে। যখন ইলম থাকবে না তখন জগতকে শেষ করে দেয়া হবে। এতে বুঝা গেল ইলম আলম তথা বিশ্বজগত টিকে থাকার কারণ।

এর দ্বারা শিরোনামের উদ্দেশ্যও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইলম অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা বুঝা যাবে যে, ইলম তুলে নেয়া (বিলুপ্ত) কিয়ামতের একটি আলামত। অতএব শেখা ও শেখানোর ধারা চালু রাখা উচিত।

٧٩. حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضــ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا.

৮০. ইমরান ইবনে মায়সারা র....... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, কিয়ামতের কিছু নিদর্শন হল ঃ দীনি ইলম লোপ পাবে, অজ্ঞতার বিস্তৃতি ঘটবে, মদপান ব্যাপক হবে এবং প্রকাশ্যে ব্যভিচার হবে।

٨٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضــ قَالَ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ .

৮১. মুসাদ্দাদ র. .... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তোমাদের এমন একটি হাদীস বর্ণনা করব যা আমার পর তোমাদের কাছে আর কেউ বর্ণনা করবে না। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের কিছু নিদর্শন হল ঃ ইলম কমে যাবে, অজ্ঞতার প্রসার ঘটবে, ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে, স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে, এমনকি প্রতি পঞ্চাশজন স্ত্রীলোকের জন্য মাত্র একজন পুরুষ হবে তত্ত্বাবধায়ক তথা কর্মসম্পাদক।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে ৮০, ৮১ নং হাদীসের মিল স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৮, নিকাহ ঃ ৭৮৭, আশরিবাহ ঃ ৮৩৬, মুহারিবীন ঃ ১০০৫- ১০০৬

قال ربيعة ঃ হযরত রবীআ র. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ

আল্লামা আইনী র. বলেন- ربيعة هو المشهور بربيعة الرائي الخ তথা এই রবীআই হলেন, প্রসিদ্ধ ইমাম রবীআ আর রাঈ। তার পূর্ণ নাম হল, আবূ উসমান রবীআ ইবনে আবূ আবদুর রহমান ফররূখ। তিনি মদীনার একজন ফকীহ্। তিনি কোন কোন সাহাবী এবং বড় বড় তাবিঈর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। শীর্ষ মুজতাহিদীনের মধ্যে তাকে গণ্য করা হয়। তিনি ইমাম মালিক র. এর উস্তাদ ও তাবিঈ। রবীআ র. এর পিতা ফররূখ বনূ উমাইয়ার যুগে খোরাসানে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। রবীআ তখন ছিলেন মায়ের পেটে। রবীআর পিতা যাবার প্রাক্কালে স্বীয় স্ত্রীর কাছে ত্রিশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা রেখে যান। ২৭ বছর পর মদীনায় আগমণ করেন। তিনি ছিলেন ঘোড়ার উপর আরোহী। হাতে ছিল নেযা। স্বীয় ঘরে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নেমে দরজায় পা দিয়ে ধাক্কা লাগানো মাত্র রবীআ বের হন এবং বলতে শুরু করেন- يا عدو الله انت دخلت على حرمي অর্থাৎ, হে আল্লাহর দুশমন! তুমি আমার হেরেমে কেন প্রবেশ করেছ! উত্তরে ফররূখ বললেন, তুমি আল্লাহর দুশমন। আমার হেরেমে প্রবেশ করেছ। উভয়ে পরস্পরে বাক বিতন্ডায় লিপ্ত হলেন। ইমাম মালিক র. এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছে। এ দিকে প্রতিবেশীরা রবীআর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। উভয়ে একজন অপরজনকে বলছেন- لافارقتك তথা আমি তোমাকে ছাড়ব না। ইমাম মালিক র. কে দেখে তারা নীরব হয়ে যান। ইমাম মালিক র. বললেন, সম্মানিত মনীষী! আপনার জন্য অন্য কোন জায়গায় প্রশস্ত স্থান হতে পারে। বড়জন উত্তর দিলেন, এটি আমার বাড়ী। আমি ফররূখ। স্ত্রী তার কথা শুনে বেরিয়ে এসে বলতে লাগলেন, ইনি আমার স্বামী আর এ হল আমার বড় ছেলে। তাকে তিনি অন্তসত্বা অবস্থায় রেখে গিয়েছেন। তখন পিতা পুত্র গলাগলি করলেন এবং খুব কাঁদলেন। ফররূখ যখন ঘরে ঢুকলেন, তখন স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন- هذا ابني؟ فقالت نعم. তথা একি আমার ছেলে? উত্তরে স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ। এরপর ফররূখ স্বীয় স্ত্রীকে বললেন, আমি তোমার নিকট যে সব অর্থ সম্পদ রেখে গিয়েছিলাম সেগুলো কোথায়? এরপর সকালে রবীআ মসজিদে নববীতে স্বীয় পাঠচক্রে গিয়ে বসেন এবং তাঁর নিকট ইমাম মালিক র. ও মদীনার অন্যান্য অভিজাত মনীষীর আগমণ ঘটে। রবীআর আশে পাশে বিরাট চক্র হয়ে যায়।

রবীআর আম্মা ফররূখকে বললেন, যান। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে নামায পড়ে আসুন। তিনি মসজিদে এসে একটি বিরাট পাঠচক্র দেখে দাড়িয়ে যান। রবীআ এভাবে মাথা ঝুকিয়ে রাখলেন যাতে তিনি মনে করেন, তিনি তাকে দেখেননি। ফররূখ ছেলে বলে সন্দেহ করলেন, তখন জিজ্ঞেস করলেন। এ কে? উত্তর এল। এ হল রবীআ ইবনে আবূ আবদুর রহমান। তখন তিনি বলতে লাগলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার ছেলেকে বড় মর্তবা দান করেছেন। ঘরে এসে স্ত্রীকে বললেন, আমি তোমার ছেলেকে এরূপ শানে দেখেছি যা উলামা ও ফুকাহার কারো মধ্যে নেই। রবীআর আম্মা বললেন, আপনার ত্রিশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা অধিক পছন্দনীয়, না আপনার সন্তানের এই শান? তিনি বলতে লাগলেন-

لا والله بل هذا، فقالت انفقت المال كله عليه، قال فو الله ما ضيعته. فضل الباري ثاني

তথা আল্লাহর শপথ! আমার নিকট ছেলের শান পছন্দনীয় হয়েছে। তখন স্ত্রী বলতে লাগলেন, আল্লাহর কসম! আমি সে সব সম্পদ তার পিছনে খরচ করেছি। স্বামী বললেন, আল্লাহর শপথ! তুমি এ সম্পদ নষ্ট করনি। -ফযলুল বারী ঃ ২য় খণ্ড।

ইমাম রবীআ র. এর ওফাত হয় ১৩৬ হিজরীতে।

আসহাবে রায় ঃ রবীআতুর রায় এর ব্যাপারে এ শব্দটি নিন্দারূপে ব্যবহৃত হত না। পূর্ববর্তীদের মধ্যে যাঁদের মধ্যে মাসআলা উৎসারণ এবং ইজতিহাদের প্রবলতা থাকত তাদেরকে আসহাবুর রায় আখ্যা দেয়া হত। সলফে সালেহীনের মধ্যে এ শব্দটি প্রশংসনীয় ছিল।

সর্বদা দুটি দল চলে আসছে। একদলের মধ্যে রেওয়ায়াত প্রবল ছিল। তাদের আখ্যায়িত করা হত মুহাদ্দিসীন বলে। অপর দলে ইজতিহাদ ও হাদীস থেকে মাসআলা উৎসারণ ও অনুধাবণ প্রবল ছিল। তাঁরা ফুকাহা নামে প্রসিদ্ধ হন।

এরূপ দল স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বিদ্যমান ছিল। এক দলের আমল ইত্তেবায়ে সুন্নতের প্রবল আগ্রহের ফলে ছিল শুধু হাদীসের শব্দরাজির উপর। অপর দলের উদ্দেশ্য ছিল হাদীসের উদ্দেশ্য তালাশ করা। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বললেন- لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة. সাহাবায়ে কিরাম রা. ভীষন চেষ্টা করেও আসর পর্যন্ত বনূ কুরায়জায় পৌঁছতে পারেননি। পথিমধ্যে আসরের সময় হয়ে যায়। এবার তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে যায়। এক দল পথে নামায পড়ে নেয়। তাঁরা বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল দ্রুত পৌঁছে যাওয়া।

দ্বিতীয় দল পথিমধ্যে নামায না পড়ে পরে কাযা করে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব জানতে পেরে উভয় দলের কারো ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করেননি। কারণ, উভয় দলের উদ্দেশ্য ছিল সুন্নতের অনুসরণ। অতএব উভয় দলের কারো প্রতি কঠোরতা আরোপ করা যায় না। অবশ্য মুজতাহিদদের দরজা আহলে জাওয়াহির থেকে উঁচু। কারণ, তারা অর্থের ধারক বাহক। আর আহলে জাওয়াহির হলেন শব্দের ধারক ও বাহক। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী, কিতাবুল মাগাযী ঃ ১৭১-১৭২।

প্রকাশ থাকে যে, ইজমালি নসগুলোর ব্যাখ্যাদান নিন্দনীয় নয়। কারণ, স্বয়ং সাহাবায়ে কিরাম রা. থেকে তা প্রমাণিত। অবশ্য নসের বিপরীতে কিয়াস করা নিন্দনীয়। এযুগের নির্বোধরা মনে করেছে, ইসলামী আইনবিদগণ হাদীসের উপর রায়কে প্রাধান্য দেন। আর মুহাদ্দিসগণ হাদীসকে রায়ের উপর প্রাধান্য দেন। অথচ এটা তাদের অজ্ঞতা, মুর্খতা ও আহমকি।

قال ربيعة لا ينبغي لاحد عنده الخ তরজমা হয়েছে।

রবীআ বলেন, যার নিকট ইলমের কিছু অংশও রয়েছে সে যেন নিজেকে নষ্ট ও বেকার না করে। কারণ, বছরের পর বছরের মেহনত ও চেষ্টা দ্বারা অর্জিত ইলমকে নষ্ট করা মানে নিজেকে নষ্ট করা। যার একটি ছুরত হল, তা'লীম তথা শিক্ষা দান এবং তাকরীর ও তাবলীগ ছেড়ে কৃষি কাজ ও ব্যবসা বাণিজ্যে রত হওয়া। যার ফলে ইলমের প্রচারের পরিবর্তে ইলম নষ্ট হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ছুরত হল, ইলমের আজমত ও মাহাত্ম্যের প্রতি খেয়াল না রাখা। ইলমকে দুনিয়া অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে নেয়া। যে আলিম নিজের ইলমকে বিত্তশালী ও আমীরদের নৈকট্যের মাধ্যম বানায় তারা সুনিশ্চিতরূপে ইলমকে নষ্ট করে এবং নিজেকে অপমান ও ধ্বংস করে। আলিমের উচিত এ সুমহান নেয়ামতের কদর করা, তার সম্ভ্রমের হেফাজত করা।

তৃতীয় ছুরত হল, অযোগ্যদের পড়ানো। অযোগ্য লোকদের নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখাও নিজেকে ধ্বংসের নামান্তর। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে-

واضع العلم عند غير اهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب. رواه ابن ماجه مشكوة المصابيح ٣٤.

কারণ, নফসকে ধ্বংস করার এক অর্থ হল, আমল পরিহার করা। কারণ, ইলম অনুযায়ী আমল না করাও নফসকে ধ্বংস করা ও ইলমকে ধ্বংস করা।

لاحدثنكم حديثا لا يحدثكم احد بعدي এ বাক্যটি বিভিন্ন স্থানে এসেছে। কিন্তু এর অর্থ কখনো এই নয় যে, এ হাদীসটি শুধু আমারই জানা, অন্য কারো জানা নেই, যার ফলে তিনিই বর্ণনা করবেন। বরং এর অর্থ হল, আমার পর বসরাতে তোমাদের কেউ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم বলে হাদীস বর্ণনা করবেন না। এর কারণ হল, তখন শুধু কয়েকজন সাহাবী এদিক ওদিক বেঁচে ছিলেন। বসরায় তিনি ছাড়া আর কোন সাহাবী ছিলেন না। কারণ, বসরাতে সর্বশেষে ওফাত লাভকারী সাহাবী হলেন, হযরত আনাস রা.।

اشراط الساعة الخ - اشراط শব্দটির হামযার উপর যবর। এটি شَرَطٌ এর বহুবচন।

ان يرفع العلم কিয়ামতের একটি নির্দশন হল, দীনের ইলম উঠে যাবে এবং এর পরবর্তী রেওয়ায়াতে আসছে- ان يقل العلم উভয় রেওয়ায়াতে সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা হল, শুরুতে হ্রাস পেতে থাকবে অতঃপর ক্রমশ সম্পূর্ণ তুলে নেয়া হবে। অথবা কম হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য অস্তিত্বহীনতা। কারণ, বাগধারায় قلت দ্বারা অস্তিত্বহীনতার অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়।

تكثر النساء الخ মহিলাদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। এর এক অর্থ হল, শেষ জমানায় যুদ্ধ, ফাসাদ ও খুন খারাবী বেশি হবে, পুরুষরা মারা যাবে। কারণ, যুদ্ধসমূহে পুরুষই বেশি যায় ও নিহত হয়। আর মহিলারা থেকে যায়। বর্তমান যুগে ভাল রূপেই তা প্রত্যক্ষ হচ্ছে।

২. মহিলাদের জন্ম হবে অধিকহারে। আজকাল এর অভিজ্ঞতা হচ্ছে।

لخمسين امراة الخ এমনকি পঞ্চাশজন মহিলার তত্ত্বাবধায়ক ও ব্যবস্থাপক হবে একজন পুরুষ, বিয়ে উদ্দেশ্য নয়।

২. অথবা পঞ্চাশের প্রকৃত সংখ্যা সীমিত করা উদ্দেশ্য নয়, বরং পঞ্চাশ দ্বারা রূপকার্থে আধিক্য উদ্দেশ্য। উভয় সম্ভাবনাই বর্ণিত আছে।

একাধিক স্ত্রী রাখার হিকমত এবং চারে সীমাবদ্ধতার কারণ ঃ

যৌক্তিক, ঐতিহ্যগত অভিজ্ঞতা ও কিয়াস সর্বদিক দিয়ে সর্বজন স্বীকৃত একটি বিষয় হল, পুরুষের মধ্যে নারীর তুলনায় যৌনশক্তি কয়েকগুণ বেশি। শরঈ দৃষ্টিকোন থেকে এ কারণে যে আল্লাহ তা'আলা একজন পুরুষকে চারজন স্ত্রী রাখার এখতিয়ার দিয়েছেন। যদি রমনীর মধ্যে যৌনশক্তি বেশী হত, তবে এর পরিপন্থী হওয়া উচিত ছিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের অনেক সতর্কবাণী শুনিয়েছেন, যদি সে পুরুষের ডাকে মিলনের জন্য প্রস্তুত না হয়। যদি নারীর মধ্যে যৌনশক্তি বেশি হত, তবে পুরুষদের জন্য এরূপ সতর্কবাণী আসা উচিত ছিল।

যৌক্তিকভাবে এ কারণে যে, পুরুষের মেজাজ গরম যা যৌনশক্তির কারণ। অপর দিকে রমনীর মেজাজ ঠান্ডা।

অভিজ্ঞতার আলোকে এ কারণে যে, কেউ একথার প্রবক্তা নেই এবং এর উদাহরণ পেশ করতে পারে না যে, মহিলা সঙ্গমের আহবান জানায় অথচ পুরুষ তা অস্বীকার করে। কিন্তু এর পরিপন্থী এর বহু উদাহরণ দৈনন্দিন এসে থাকে যে, পুরুষ আহবান করে অথচ মহিলা তাতে সম্মত হয় না।

কিয়াসের আলোকে এভাবে যে, অন্যান্য প্রাণীতে এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ দেখা যে, একটি নর শত সহস্র মাদীর জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। যদি নারীর মধ্যে যৌনশক্তি বেশি হত বা সমান হত, তবে শহরের প্রতিটি ওলি গলিতে রাত দিন বেশ্যাবৃত্তির বাজার লেগে থাকত। বাজারে প্রতিটি পুরুষের রমনীদের প্রতি স্বাভাবিক ঝোক হয়ে থাকে। الا المتقين - ব্যতিক্রম শুধু মাত্র মুত্তাকীরা।

যদি রমনীর পক্ষ থেকেও এরূপ ঝোক পাওয়া যায় তবে যিনা ব্যভিচার থেকে প্রতিবন্ধক কি হবে? বিশেষতঃ যে সরকারে যিনা ব্যভিচার অপরাধ নয় এবং রমনীদের মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজন সেটাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে না দেখে?

◆ কুরআনে কারীমে-

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.

আয়াতের অধীনে কোন কোন মুফাসসির লিখেছেন যে, ব্যভিচারীনীকে অগ্রে উল্লেখ করা এর প্রমাণ যে, রমনীর মধ্যে যৌনশক্তি বেশি থাকে, তবে মুফাসসিরদের এধারণা যথার্থ নয়। কারণ, এই ধারনা বিবেক, ঐতিহ্য, অভিজ্ঞতা ও কিয়াস সবকিছুর পরিপন্থী।

তাছাড়া পুরুষের মধ্যে রয়েছে স্বপ্নদোষের আধিক্য। আর রমনীদের মধ্যে এর অস্তিত্ব নাস্তির পর্যায়ে। এটাও স্পষ্ট প্রমাণ যে, রমনীদের মধ্যে যৌনশক্তি তুলনামূলক নাস্তির পর্যায়ে। এসব কারণে প্রমাণিত হল যে, পুরুষের মধ্যে যৌনশক্তি বেশি।

কোন কোন আলিমের একটি ফিকহী মাসআলা দ্বারাও বিভ্রান্তি হয়েছে। সেটি হল, نظر الرجل الى المرأة তথা পুরুষ কর্তৃক রমনীর প্রতি দৃষ্টিপাত نظر المرأة الى الرجل তথা রমনী কর্তৃক পুরুষের প্রতি দৃষ্টি পাত অপেক্ষা হালকা। এর কারণ এই বর্ণনা করেন যে, রমনীর মধ্যে যৌনশক্তি বেশী। অতএব পুরুষের দর্শনের কারণে যদি পুরুষের মধ্যেও যৌনশক্তি সৃষ্টি হয়, তবে ফিতনা বেশি। এর পরিপন্থী যদি রমনী দেখে তবে যেহেতু পুরুষের মধ্যে যৌন চাহিদা কম সেহেতু ফিতনার কোন সম্ভাবনা নেই।

এই মাসআলার এই ব্যাখ্যাও সরাসরি ভুল। বাস্তবতা হল, পুরুষ ফিতনায় পতিত হলেও তার সফলতা সহজ। কারণ, পুরুষের নিকট স্বার্থ সিদ্ধির মাধ্যমগুলো বিদ্যমান থাকে। স্বল্প লজ্জা, প্রচুর যৌন চাহিদা, আন্ত রিক শক্তি ও টাকা পয়সা, দৈহিক শক্তি এবং স্বাধীন গমনাগমন এসব তার স্বার্থ পূর্ণ করার ক্ষেত্রে সহকারী হয়ে থাকে। এর পরিপন্থী রমনীর দৃষ্টি পুরুষের প্রতি এতটা ভয়ংকর বা বিপদজনক হয় না। কারণ, প্রথমতঃ তো তাদের মধ্যে যৌন চাহিদা কম হওয়ার কারণে ফিতনার সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয়তঃ খুব কম সংখ্যক এই দৃষ্টিপাত যৌন চাহিদার কারণ হলেও লজ্জার আধিক্য, আন্তরিক ও দৈহিক দুর্বলতা, সম্পদের স্বল্পতা. গমনাগমনে জটিলতা এরূপ বিষয় যে, এগুলোর কারণে রমনী নিজের কু মতলব পূর্ণাঙ্গতা পর্যন্ত রূপদান করতে পারে না।

আয়াতে কারীমায় ব্যভিচারীনীকে আগে উল্লেখ করার কারণ এটাই যে, যৌন চাহিদার স্বল্পতা, লজ্জার আধিক্য, প্রতিবন্ধকতার আধিক্য এবং মাধ্যমের স্বল্পতা সত্ত্বেও একজন রমনীর ব্যভিচারে লিপ্ততা নেহায়েতই খারাপ। অতএব এর মন্দত্ব বুঝানোর উদ্দেশ্যে তার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, পুরুষের যৌন চাহিদার আধিক্যের দাবী তাদের জন্য একাধিক স্ত্রী থাকা।

তাছাড়া নারীর আধিক্য ও পুরুষের স্বল্পতার কথা উল্লেখিত হওয়ার সাথে সাথে প্রত্যক্ষও বটে। প্রথমত তো নারীর জন্ম বেশি হয়, পুরুষের জন্ম কম। দ্বিতীয়ত বিশ্ব যুদ্ধগুলোতে পুরুষই (বেশি) ধ্বংস হয়ে থাকে অতএব যদি একাধিক বিয়ের বিষয়টি স্বীকার না করা হয়, তবে মহিলার কার্য সমাধানের জন্য এতগুলো পুরুষ কোত্থেকে আসবে?

বাকী রইল চারে সীমাবদ্ধতার বিষয়টি। এর কারণ হল, কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রমনী চার মাস পর্যন্ত যৌন চাহিদা নিয়ন্ত্রন করতে পারে। কুরআনে কারীমে ঈলার (চার মাস পর্যন্ত স্ত্রীর নিকট না যাওয়ার কসম খাওয়া) এবং স্বামীহারা স্ত্রীর ইদ্দতের বিষয়টি এর সুস্পষ্ট প্রমাণ।

ঈলাতে চার মাসের অধিককাল পর্যন্ত পুরুষের স্ত্রীর নিকট গমন না করা যেহেতু জুলুম ছিল, সেহেতু শরীয়ত চার মাসের পর রমনীকে এখতিয়ার দিয়ে দেয়, এমনিভাবে বর্বরতার যুগে মৃত্যুর ইদ্দতও এক বছর ছিল। শরীয়ত এটাকে জুলুম সাব্যস্ত করে চার মাস দশ দিনের অধিক মেয়াদ বাতিল করে দেয়।

হযরত উমর রা. একবার রাত্রিকালে কোন গলি দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, কানে কোন মহিলার আওয়াজ পড়ল। সে নিম্নোক্ত কাব্য আবৃতি করছিল-

فو الله لو لا الله تخشى عواقبه ÷ لزحزح من هذا السرير جوانبه.

হযরত উমর রা. কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, তার স্বামী দীর্ঘকাল থেকে জিহাদে গেছেন। হযরত উমর রা. হযরত হাফসা রা.কে জিজ্ঞেস করলেন, সমঝদার মহিলাদের পরামর্শ সভা ডেকে সিদ্ধান্ত কর যে, একজন রমনী কতদিন পর্যন্ত (যৌন চাহিদা) নিয়ন্ত্রন করতে পারে। ফলে সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, চার মাস মেয়াদ পর্যন্ত একজন রমনী ধৈর্য্য ধারণ করতে পারে। এজন্য হযরত উমর রা. আইন প্রনয়ন করলেন যে, এ মেয়াদের অতিরিক্ত যেন কোন বিবাহিত সৈনিক জিহাদে না থাকে।

এরই দিকে লক্ষ্য করে ইসলামী আইনবিদগণ লিখেন যে, চার মাসে একবার স্ত্রী মিলন দিয়ানতরূপে ফরয এবং পুরুষের জন্য নিয়ন্ত্রনের মেয়াদ শরঈভাবে বর্ণিত নয়। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে একমাস মেয়াদকে অধিক গণ্য করা হয়। যেমন, বাইয়ে সলম এবং কারো কারো মতে উদয়স্থলের পার্থক্যে এক মাসের মেয়াদ ধর্তব্য হয়। তাছাড়া এক মাসে চাঁদ স্বীয় ঘূর্ণন পরিপূর্ণ করে ফেলে। যার প্রভাব পড়ে মানব রক্তের উপর। এ হিসেবে প্রমাণিত হয় যে, একজন পুরুষের সহ্যের চুড়ান্ত সীমা একমাস, আর নারীর চার মাস। উভয়কে মিলালে বুঝা যায় একজন পুরুষের জন্য চারজন স্ত্রী যথেষ্ট হতে পারে। তাছাড়া এটাও বলা যেতে পারে যে, সঙ্গম দ্বারা উদ্দেশ্য সন্তান জন্মদান। বস্তুত সন্তান জন্মদানের কারণ সে (সহবাস) টি হয়, যেটি মাসিকের পরে হয়। বস্তুতঃ মাসিক বন্ধ হওয়ার পর পুরুষের জন্য প্রকৃত যৌন চাহিদাও হয়। মাসিক সাধারণত একজন সুস্থ সবল রমনীর মাসে একবার এসে থাকে। এ হিসেবে একজন পুরুষ প্রতি মাসে একবার সঙ্গমের মুখাপেক্ষী হয় আর রমনী হয় চারমাসে। অতএব প্রমানিত হল যে, একজন পুরুষের জন্য চারজন স্ত্রী প্রয়োজন। -ইরশাদুল কারী।

٦٤. بَاب فَضْلِ الْعِلْمِ

৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ ইলমের ফযীলত

٨١. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضــ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعِلْمَ .

৮১. সাঈদ ইবন 'উফায়র র. .... হযরত ইবনে 'উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ইরশাদ করতে শুনেছি, একবার আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। তখন (স্বপ্নে) আমার কাছে এক পেয়ালা দুধ আনা হল। আমি তা পান করলাম (খুব পরিতৃপ্তির সাথে পান

করলাম। এমনকি তার পরিতৃপ্তি আমার সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ল।) আমার মনে হতে লাগল যে, সে পরিতৃপ্তি ও সজীবতা আমার নখ দিয়ে বের হচ্ছে। এরপর যেটুকু দুধ অবশিষ্ট ছিল, তা আমি 'উমর ইবনুল-খাত্তাবকে দিলাম। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি এ স্বপ্নের কী ব্যাখ্যা দেন? তিনি উত্তরে বললেন ঃ তা হল 'ইলম।

যোগসূত্র ঃ পিছনের অনুচ্ছেদে ছিল ইলমের আলোচনা আর এ অনুচ্ছেদেও রয়েছে ইলমের বিবরণ। পার্থক্য শুধু একটি গুণে। সেটি হল, পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে ইলম তুলে নেয়ার কথা আলোচিত হয়েছে, আর এ অনুচ্ছেদে রয়েছে ইলমের ফযীলতের কথা। অতএব দুটি অনুচ্ছেদে মিল স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৮, ৫২০, ১০৩৭, ১০৪০, ১০৪১।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ হযরত শাইখুল হিন্দ র. বলেন, এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য হল, একথা বলা যে, যে ইলম নিজের ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বরং প্রয়োজনাতিরিক্ত, সে ইলম অর্জনের সাথে এ সব ইলমী ফযীলতের সম্পর্ক হবে, নাকি এগুলো অনর্থক গণ্য হবে।

এক রেওয়ায়াতে আছে- من حسن اسلام المرء ترکه ما لا يعنيه তথা একজন মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য্য হল, অনর্থক বিষয়াবলী বর্জনে।

ইমাম বুখারী র. এ অনুচ্ছেদ কায়েম করে বলে দিয়েছেন যে, এতেও সওয়াব হবে। ইলম সাধারণত উপকারী ও কাম্য। যেমন, একজন গরীব শ্রমিক। ফলে যাকাত ও হজ্বের মাসায়েল শেখা তার জন্য সওয়াবের কারণ হবে কি না? এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল সওয়াব হবে। কারণ, যদিও নিজে উপকৃত হতে পারবে না, কিন্তু অন্যদেরকে তো শিক্ষা দিতে পারবে। কারণ, ইলম শেখা দ্বারা শুধু আমলই উদ্দেশ্য নয়, প্রচার ও শিক্ষাদানও একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। মোটকথা, এ অনুচ্ছেদ দ্বারাও তাবলীগ, তা'লীমের গুরুত্ব ও ফযীলত বুঝানো উদ্দেশ্য।

একটি প্রশ্ন ঃ এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, কিতাবুল ইলমের শুরুতে হুবহু باب فضل العلم শিরোনাম এসেছে। অতএব এখানে পুনরায় উল্লেখ করা হল কেন, এতে তো শিরোনামের পুনরাবৃত্তি হল?

উত্তর ঃ এর বিভিন্ন উত্তর বর্ণিত আছে।

১. শুরুতে উলামায়ে কিরামের ফযীলত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল, আর এ অনুচ্ছেদে উদ্দেশ্য হল, ইলমের ফযীলত বর্ণনা করা।

২. পূর্বে فضل এর অর্থ হল ফযীলত, আর এখানে এর অর্থ হল, অতিরিক্ত।

৩. পূর্বে ইলমের মৌলিক ফযীলতের বিবরণ দেয়া হয়েছিল, আর এখানে শাখাগত ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। ইত্যাদি।

ইলম ও দুধের মাঝে সম্পর্ক ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন, উভয়টি প্রচুর উপকারী হওয়ার ক্ষেত্রে যৌথ। দুধ মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য ও শরীরে শক্তি সৃষ্টিকারী। আর ইলম হল, রূহের স্বাভাবিক খাদ্য। এর উপর দীন, দুনিয়া উভয়ের কল্যাণ ও সফলতা মওকূফ। দুধ দ্বারা দেহ তরতাজা হয়, আর ইলমের উপর অন্তরের জীবন নির্ভরশীল। ইত্যাদি ইত্যাদি।

وتفسير اللبن بالعلم لاشتراكهما في كثرة النفع بهما. فتح

اني لارى الرِيَّ রা এর নিচে যের, ইয়ার উপর তাশদীদ باب سمع থেকে। ক্রিয়ামূল অধিকাংশ সময় رِيٌّ আর কখনো رَيًّا আসে। এর অর্থ হল, তৃষ্ণা নিবারিত হওয়া।

في اظفاري আল্লামা আইনী র. বলেন, এখানে فِي শব্দটি على এর অর্থে ব্যবহৃত। যেমন কুরআনে হাকীমে আছে- وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ. سورة طه 'আর আমি তোমাদেরকে খেজুরের ডালে শুলিতে চড়াবো।' আর কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে- من اظفاري. فتح শব্দ।

সতর্কবাণী ঃ এই রেওয়ায়াত দ্বারা সাইয়্যিদিনা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা. এর উপর হযরত উমর রা. এর ফযীলতের সন্দেহ ঠিক নয়। কারণ, এটি একটি বিচ্ছিন্ন ফযীলতের কথা। যা মৌলিক ফযীলতকে আবশ্যক করে না। কারণ সিদ্দীকে আকবার রা. এর শানে ইরশাদে নববী রয়েছে-

ما صب الله في صدري صببته في صدر ابي بكر

২. এ রেওয়ায়াতে হযরত সিদ্দীকে আকবার রা.এর আলোচনাই নেই। স্পষ্ট বিষয়, অনুল্লেখ অনস্তিত্ব প্রমাণ করে না যে, উপস্থিতগণের মধ্যে হযরত সিদ্দীকে আকবার রা. বিদ্যমানই নন।

মোটকথা, হযরত সিদ্দীকে আকবার রা. বড় এবং সমস্ত নবীর পর সুনিশ্চিতরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। এ ব্যাপারে আহলে সুন্নতের ঐকমত্য রয়েছে।

٦٥. بَاب الْفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا

৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ প্রাণী বা অন্য বাহনে আসীন অবস্থায় দীনী মাসআলা বলা বা ফতওয়া দান।

বুখারী - ১৮

الفُتْيا بضم الفاء وكذالك الفتوى وهو الجواب في الحادثة. عيني.

الفُتْيا ফা এর উপর পেশ, ইসম এমনিভাবে ফতওয়াও। বস্তুত ফতওয়া হল, কোন ঘটনার উত্তর। -আইনী।

٨٢. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ .

৮২. ইসমাঈল র. ..... 'হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আমর ইবনে আস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের দিনে মিনায় মানুষের (দীনী প্রশ্নের উত্তর দানের) জন্য (বাহনের উপর) বসা ছিলেন। লোকজন তাঁর কাছে এসে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করছে। এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি বুঝতে পারিনি, তাই জবাইরের পূর্বে মাথা মুড়িয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ যবেহ কর, কোন অসুবিধা বা গুনাহ নেই। আর এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি ভুলবশত কঙ্কর নিক্ষেপের আগেই কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ কঙ্কর ছুঁড়ো, কোন অসুবিধা বা গুনাহ নেই।

'আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আমর র. বলেন, 'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সে দিন আগে বা পরে করা যে কাজ সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল, তিনি একথাই বলছিলেন ঃ কর, কোন অসুবিধা বা গুনাহ নেই। আর যে কাজ বাকি আছে তা এখন করে নাও।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ

من حيث ان المذكور في الحديث هو الاستفتاء والافتاء والترجمة هي الفتيا

তথা শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এ হিসেবে যে, হাদীসে ফতওয়া জিজ্ঞেস ও ফতওয়াদানের উল্লেখ রয়েছে। আর শিরোনাম হল, ফতওয়া সংক্রান্ত।

পূর্বের সাথে যোগ্যসূত্র ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন, পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে ইলমের ফযীলতের বিবরণ ছিল আর এ অনুচ্ছেদে রয়েছে ফতওয়ার বিবরণ। আর এটাও ইলমই।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৮, ২৩, ২৪, ২৩৪, ৯৮৬।

হাদীসের উদ্দেশ্য ঃ এ অনুচ্ছেদ দ্বারা ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য কি? হাফিজ আসকালানী র. বলেন, যদি কোন আলিম কোন বাহনের উপর আরোহন করে, আর সে অবস্থাতেই কেউ মাসআলা জিজ্ঞেস করে তবে আলিমের জন্য আরোহন অবস্থায় উত্তর দেয়া জায়িয আছে।

আল্লামা আইনী র. বলেন, আলিমের নিকট সর্বাবস্থায় প্রশ্ন করা জায়িয আছে, চাই আলিম পায়ে হেটে চলতে থাকুন অথবা আরোহন করে, দাড়িয়ে থাকুন বা বসে- সর্বাবস্থায় মাসআলা বলা জায়িয আছে।

৪. এক রেওয়ায়াতে আছে-

لا تجعلوا ظهور دوابكم منابر. رواه أبو داود : ١/٣٤٧، مشكوة ٣٤٠.

অর্থাৎ, জন্তুর পৃষ্ঠকে মিম্বর বানিও না- তদ্বারা মিম্বরের কাজ নিও না।

এর দ্বারা সন্দেহ হতে পারে যে, জন্তুর উপর আরোহন অবস্থায় ফতওয়া দেয়া ও মাসআলা বলা নিষেধ। ইমাম বুখারী র. বৈধতা প্রমাণ করার জন্য এ অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন যে, শুধু মাসআলা বলে দেয়া নিষেধ নয়। অবশ্য দীর্ঘক্ষন পর্যন্ত বসে আলোচনা করা অথবা রীতিমত মামলা মুকাদ্দমার ফয়সালা করা, দীর্ঘ বক্তব্য রাখা মানে মিম্বর বানানো নিষিদ্ধ।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে আছে- وقف في حجة الوداع শিরোনামে আছে- واقف على ظهر الدابة বাহ্যত উভয়ের মধ্যে মিল বুঝা যায় না।

এর দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে।

১. হাদীসের وقوف শব্দটি ব্যাপক। আর প্রতিটি ব্যাপক জিনিসের অধীনে খাস বা বিশেষ জিনিস অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকে। অতএব মিল হয়ে গেল।

২. এ রেওয়ায়াতটি এখানে সংক্ষিপ্ত। কিতাবুল হজ্বের ২৩৪ পৃষ্ঠায় এ হাদীসটি আসছে। তাতে পূর্ণ বাক্য হল, وقف على ناقته الخ ইমাম বুখারী র. এর ইঙ্গিত হল, বিস্তারিত রেওয়ায়াতের দিকে।

اذبح ولا حرج অর্থাৎ, এবার জবাই কর এতে কোন গুনাহ নেই। অন্য আরেকজনকে বললেন- ارم ولا حرج অর্থাৎ, কংকর নিক্ষেপ করে নাও কোন গুনাহ নেই। এটি হজ্ব পর্বের মাসআলা। বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে আসবে ইনশাআল্লাহু তা'আলা।

সংক্ষিপ্ত কথা হল, কুরবানীর দিবসের সাথে সংশ্লিষ্ট চারটি জিনিস রয়েছে। ১. কংকর নিক্ষেপ, ২. জবাই, ৩. মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাটা ও ৪. তাওয়াফ।

তাওয়াফে কোন তারতীব বা ক্রমবিন্যাস নেই। আগেও করতে পারে, পরেও করতে পারে। বাকী তিনটিতে হানাফীদের মতে তারতীব বা ক্রমবিন্যাসের পরিপন্থী হলে কাফফারা তথা দম ওয়াজিব হবে। এটাই মালিকীদের মাযহাব। শাফিঈ ও হাম্বলীদের মতে তারতীব ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নত। তাঁরা এহাদীস দ্বারাই প্রমাণ পেশ করেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- ولا حرج

হানাফী ও মালিকীদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন উত্তর দেয়া হয়।

১. এ হাদীসটি আপনারও বিরোধী। কারণ, সুন্নত তরকে নিঃসন্দেহে গুনাহ রয়েছে।

২. لا حرج শব্দে শুধু পরকালীন গুনাহের কথা অস্বীকার করা হয়েছে। কারণ, তারা না জানার কারণে ভুল করেছিলেন। যেমন- لم اشعر দ্বারা স্পষ্ট। এজন্য রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা'যূর মনে করে প্রশ্নকারীর পেরেশানী দুর করেছেন। প্রশ্নকারী গুনাহ আবশ্যক মনে করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। বাকী রইল, দম ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি। এর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

৩. لا حرج গুনাহ এবং দম উভয়টি অস্বীকার করলে এর উত্তর হবে, এটা শুধু সাহাবায়ে কিরাম রা. এর জন্য বিশেষিত ছিল। কারণ, না জানা তাঁদের ওজর ছিল।

অতঃপর যদি হাজী মুফরিদ হয়, তবে তার উপর তো কুরবানী ওয়াজিবই নয়। কুরবানী শুধু কিরান ও তামাত্তু আদায়কারীর উপরই ওয়াজিব। অতএব ইফরাদ হজ্ব আদায়কারীর দায়িত্বে শুধু দুটি জিনিস কংকর নিক্ষেপ ও মাথা মুণ্ডনে তারতীব রয়েছে। মাথা মুণ্ডানোর আগে কংকর নিক্ষেপ করা জরুরী।

٦٦. بَاب مَنْ أَجَابَ الْفُتْيَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ

৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ হাত ও মাথার ইশারায় ফতওয়া বা মাসআলার জবাব দান।

যোগসূত্র ঃ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে ফতওয়ার বর্ণনা ছিল আর এ অনুচ্ছেদে ফতওয়ার আলোচনাই রয়েছে। অতএব উভয় অনুচ্ছেদে মিল স্পষ্ট।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ এ অনুচ্ছেদ দ্বারা ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য হল, কোন মাসআলার উত্তর মাথা বা হাতের ইঙ্গিতেও দেয়া জায়িয আছে। তবে শর্ত হল, সে ইঙ্গিত স্বীয় মওকা হিসেবে বুঝাতে হবে। স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইঙ্গিতের মাধ্যমে জবাব প্রমাণিত আছে। যেমন, এ অনুচ্ছেদের প্রথম দুটি হাদীস তথা ৮৩ ও ৮৪ নং রেওয়ায়াত দ্বারা স্পষ্ট।

২. দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, ইমাম বুখারী র. ফতওয়া ও বিচারে পার্থক্য বর্ণনা করতে চান অর্থাৎ, হাত অথবা মাথার ইঙ্গিতে ইতিবাচক না নেতিবাচক ফতওয়া দেয়া জায়িয, কিন্তু বিচারে তা জায়িয নেই।

٨٣. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ قَالَ وَلَا حَرَجَ قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ وَلَا حَرَجَ .

৮৩. মূসা ইবনে ইসমাঈল র. ...... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, (বিদায়) হজ্জের সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে (নানা বিষয়ে) জিজ্ঞেস করা হল। কোন একজন বলল, আমি

কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বেই যবেহ করে ফেলেছি। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ কোন গুনাহ নেই। আর এক ব্যক্তি বলল ঃ আমি যবেহ করার পূর্বে মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলেছি। তিনি হাত দিয়ে ইশারা করলেন ঃ কোন গুনাহ নেই।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৮, মানাসিক ঃ ২৩২-২৩৩, নুযূর ঃ ৯৮৬।

فاوما بيده قال ولا حرج প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের ইঙ্গিতে বললেন, কোন গুনাহ নেই।

ইমাম বুখারী র. أومأ শব্দ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। কিন্তু বাহ্যত এখানে বুঝা যায় যে, কথা ও ইঙ্গিত উভয়টির সমন্বয় ঘটিয়েছেন। যদিও এটার সম্ভাবনা আছে যে, قال لا حرج সে ইঙ্গিতের বয়ান বা বিবরণ। উর্দু তরজমার সাথে এটাই অধিক যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন।

٨٤. حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضـــ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرْجُ فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ فَحَرَّفَهَا كَأَنَّه يُرِيدُ الْقَتْلَ .

৮৪. মক্কী ইবনে ইবরাহীম র. ...... হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (শেষ যামানায়) 'দীনি ইলম তুলে নেয়া হবে, অজ্ঞতা ও ফিতনার প্রসার ঘটবে এবং 'হারজ' বৃদ্ধি পাবে। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! 'হারজ' কী? তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন ঃ 'এ রকম'। যেন তিনি এর দ্বারা 'হত্যা' বুঝাচ্ছিলেন।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামে হাত ও মাথা দ্বারা ইঙ্গিতের কথা রয়েছে। উপরোক্ত দু রেওয়ায়াতে হাতের দ্বারা ইঙ্গিত স্পষ্ট। মাথার দ্বারা ইঙ্গিতের জন্য ইমাম বুখারী র. এর পরবর্তী হাদীস অর্থাৎ, এ অনুচ্ছেদের তৃতীয় হাদীস উল্লেখ করেছেন।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৮, ১৪১, ৮৯২, ১০৪৬, ১০৫৪।

এই হাদীসের শব্দরাজির ব্যাখ্যা باب رفع العلم এ এসেছে। এখানে ইমাম বুখারী র.এর প্রমাণ হল, এ কথা দ্বারা যে, সাহাবায়ে কিরাম রা. هرج এর অর্থ বুঝতে পারেন নি বলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করেছেন। তিনি হাতের ইঙ্গিতে উত্তর দিয়েছেন এবং হাতকে বাঁকা করে বাতলে দিয়েছেন যেন, কারো গর্দান উড়ানো হচ্ছে।

٨٥. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ رضـــ وَهِيَ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ قُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ لَا أَدْرِي أَيَّ

ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ يُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُوقِنُ لَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا هُوَ مُحَمَّدٌ ثَلَاثًا فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا بِهِ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ .

৮৫. মূসা ইবনে ইসমাঈল র. ..... হযরত আসমা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা রা.-এর কাছে এলাম, তিনি তখন নামায আদায় করছিলেন। আমি বললাম, 'মানুষের কি হয়েছে?' (লোকজন পেরেশান কেন?) তিনি আকাশের দিকে ইঙ্গিত করলেন (অর্থাৎ, সূর্যগ্রহণ লেগেছে)। তখন সকল লোক (সূর্যগ্রহণের নামায আদায়ের জন্য) দাঁড়িয়ে রয়েছে। হযরত আয়েশা রা. বললেন, সুবহানাল্লাহ্! আমি বললাম, এটা কি (আযাব বা কিয়ামতের) কোন নিদর্শন? তিনি মাথা দিয়ে ইঙ্গিত করলেন, 'হ্যাঁ।' এরপর আমিও (নামাযে) দাড়ালাম। এক পর্যায়ে বেহুশ হয়ে যাবার উপক্রম হল। ফলে এরপর আমি মাথায় পানি ঢালতে লাগলাম। পরে (নামায শেষে) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন ঃ যা কিছু আমাকে পূর্বে (এখানে থেকে) দেখানো হয়নি, তা আমি আমার এ স্থানেই দেখেছি। এমনকি জান্নাত এবং জাহান্নামও দেখতে পেয়েছি। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার কাছে ওহী প্রেরণ করলেন, 'তোমাদেরকে কবরের মধ্যে পরীক্ষা করা হবে দাজ্জালের ন্যায় (কঠিন) পরীক্ষা অথবা তার কাছাকাছি।'

হযরত ফাতিমা রা. বলেন, আসমা রা. مثل (অনুরূপ) শব্দ বলেছিলেন, না قريب (কাছাকাছি) শব্দ, তা পুরোপুরি আমার মনে নেই। (কবরে) বলা হবে, 'এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি জান?' তখন মু'মিন ব্যক্তি বা মু'কিন (বিশ্বাসী) ব্যক্তি [হযরত ফাতিমা রা. বলেন] আসমা রা. কোন শব্দটি বলেছিলেন তা পুরোপুরি আমার মনে নেই- বলবে, 'তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহর রাসূল। আমাদের কাছে মু'জিযা ও হেদায়াত নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তা গ্রহণ করেছিলাম এবং তাঁর অনুসরণ করেছিলাম। তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ।' তিনবার এরূপ বলবে। তখন তাকে বলা হবে, আরামে ঘুমাও, আমরা জানতে পারলাম যে, তুমি (দুনিয়ায়) তাঁর উপর বিশ্বাসী ছিলে। আর মুনাফিক অথবা মুরতাব (সন্দেহ পোষণকারী) হযরত ফাতিমা রা. বলেন, হযরত আসমা রা. কোনটি বলেছিলেন, আমি ঠিক মনে করতে পারছি না- বলবে, আমি কিছুই জানি না। (দুনিয়াতে আমি কিছুই চিন্তা করিনি) মানুষকে (তাঁর সম্পর্কে) কি যেন বলতে শুনেছি, ফলে আমিও তাই বলেছি।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল فاشارت برأسها اي نعم বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৮, ত্বাহারাত ঃ ৩০-৩১, ১২৬, ১৪৪, ১৬৪, ৩৪২, ই'তিসাম ঃ ১০৮২।

হযরত আসমা রা. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ

هي بنت ابي بكر الصديق وزوجة الزبير رضي الله عنهم اجمعين. عمدة.

হযরত আসমা রা. ছিলেন হযরত আয়েশা রা. এর বড় বোন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. এর সম্মানিতা জননী। হিজরতের ২৭ বছর পূর্বে তাঁর জন্ম হয়। ১০০ বছর বয়সে ৭৩ হিজরীতে জুমাদাল উলা মাসে তাঁর ওফাত হয়। কিন্তু (আশ্চর্য ব্যাপার!) যে, তাঁর একটি দাতও পড়েনি বিবেক ও হুশ জ্ঞানেও কোন পার্থক্য আসেনি।

হিজরতের সফরকালে পাথেয় বাঁধার জন্য যখন কিছু পাওয়া যায়নি, তখন তিনি স্বীয় কোমরের কাপড়ের টুকরাটি ছিড়ে এক টুকরা দ্বারা পাথেয় বেঁধে দেন। সে কারণে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ذات النطاقين উপাধি দ্বারা আখ্যায়িত করেন এবং ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তাঁকে জান্নাতে দুটি নিতাক (কোমরবন্দ) দান করবেন।

বড় বীরাঙ্গনা, ধৈর্য্য ও স্বাতন্ত্রের পাহাড় ছিলেন। যখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. শহীদ হন এবং হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ তাঁর লাশ মুবারক শুলিতে চড়ায় তখন তিনি স্বীয় চোখের জ্যোতি কলিজার টুকরার লাশের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর বললেন, এখনো সময় আসেনি এ নিপূন অশ্বারোহীর বাহন থেকে নিচে অবতরনের! হাজ্জাজ তাঁকে ডাকাল। তিনি যেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। হাজ্জাজ তাঁকে ধমক দিল। কিন্তু তিনি কোন পরোয়া করলেন না। অতঃপর হাজ্জাজ নিজে আসলে তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে বলতে শুরু করলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, সাকীফ গোত্রে একজন বড় মিথ্যুক হবে, আরেকজন হবে বড় খুনী। বড় মিথ্যুককে তো আমরা দেখেছি, আর বড় খুনী তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।

قالت اتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي الخ

হযরত আসমা রা. বলেন, আমি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর নিকট এলাম সে তখন নামায পড়ছিল ....।

এতে সূর্য গ্রহণের নামাযের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এর পূর্ণ বিস্তারিত বিবরণ সূর্য্যগ্রহণ অধ্যায়ে আসবে ইনশাআল্লাহ।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ হল, দশই রবিউল আউয়াল রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহেবজাদা হযরত ইবরাহীম রা. এর ওফাত হয়। ঘটনাক্রমে সেদিন সূর্য্যগ্রহণ লেগেছিল। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম الصلوة جامعة বাক্য দ্বারা সূর্য্যগ্রহণের নামাযের ঘোষনা দেন। সাহাবায়ে কিরাম রা. নামাযের জন্য সমবেত হন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাআতে সূর্য্যগ্রহণের নামায পড়ান। নামায হচ্ছিল এমতাবস্থায় হযরত আসমা রা. হযরত আয়েশা রা. এর হুজরায় প্রবেশ করেন। দেখলেন, হযরত আয়েশা রা. নামাযে রত। হযরত আসমা রা. মসজিদে এত বড় সমাবেশ দেখে ভয় পেয়ে যান। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিতা স্ত্রীগণ হুজরাতে থেকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইকতিদা করছিলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন জামাআতে মসজিদে। হযরত আসমা রা. হযরত আয়েশা রা. এর নিকট সমাবেশের এ ভিড়ের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। হযরত আয়েশা রা. হযরত আসমা রা. এর উত্তরে আসমানের দিকে ইঙ্গিত করে সুবহানাল্লাহ বললেন। বুঝাতে চাইলেন, এ সমাবেশ, ভিড় ও পেরেশানীর কারণ সূর্য্যগ্রহণ।

فاذا الناس قيام এখানে রেওয়ায়াতে আগপিছ রয়েছে। কারণ, স্পষ্ট বিষয় হল, হযরত আসমা রা. প্রশ্নের পূর্বে লোকজনের ভিড় দেখেছেন, অতঃপর প্রশ্ন করেছেন।

فقالت سبحان الله হযরত আয়েশা রা. হযরত আসমা রা. এর প্রশ্নের উত্তর আসমানের দিকে ইঙ্গিতের মাধ্যমে দিয়েছেন। যা নামায ভঙ্গের কারণ নয়।

আর সুবহানাল্লাহ হযরত আসমা রা. এর প্রশ্নের উত্তরে বলেননি বরং হযরত আয়েশা রা. সতর্ক করে দিলেন যে, আমি নামাযে রত আছি, আর আপনি আমাকে প্রশ্ন করছেন? বস্তুতঃ সতর্কতা স্বরূপ সুবহানাল্লাহ বা আলহামদু লিল্লাহ অথবা আল্লাহু আকবার বলার কারণে নামায নষ্ট হয়না।

قلت اية হযরত আসমা রা. বলেন, আমি বললাম, এটা কি আল্লাহর নিদর্শন? অর্থাৎ, এখানে প্রশ্নবোধক হামযা উহ্য আছে। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণকে দুটি নিদর্শনরূপে উল্লেখ করেছেন, আর কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে- يخوف الله عباده -আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ভয় দেখান। যাতে চন্দ্র সূর্য্য পূজারী ও মন্দ লোকেরা আল্লাহর গযব ও ভর্ৎসনাকে ভয় করে।

فاشارت برأسها اي نعم এ রেওয়ায়াতে فاشارت শব্দ দুই জায়গায় আছে। কিন্তু প্রথম জায়গায় শুধু فاشارت আছে, আর দ্বিতীয় জায়গায় আছে- فاشارت برأسها যদি উভয় স্থানে মাথা দ্বারা ইঙ্গিত করাই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে শিরোনামের একটি অংশ "মাথা দ্বারা ইঙ্গিত" প্রমাণিত হবে। আর প্রথমাংশ "হাত দ্বারা ইঙ্গিত" প্রমাণিত হবে পূর্বোক্ত রেওয়ায়াত দ্বারা। কিন্তু মুয়াত্তায় প্রথম জায়গায় فاشارت بيدها আছে। এমতাবস্থায় পুরো শিরোনাম হাতের দ্বারা ইঙ্গিত ও মাথার দ্বারা ইঙ্গিত এ রেওয়ায়াত দ্বারাই প্রমানিত হয়ে যাবে।

তবে এটি হযরত আয়েশা রা. এর কর্ম। যেটি বাহ্যত মারফূ' নয়। অতএব ইমাম বুখারী র.এর প্রমান সঠিক নয়। কিন্তু হাফিজ র. বলেন, এটি নামাযের ঘটনা। বস্তুতঃ নামাযীদের অবস্থা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট স্পষ্ট হয়ে যেত। অথচ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পর নিষেধ করেন নি। এ হিসেবে এটি মারফূ' -এর পর্যায়ভূক্ত। কারণ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৌন সম্মতি প্রমাণিত হয়ে গেল। -ইমদাদুল বারী ঃ ৫ম খন্ড।

فقمت حتى علاني الغشي হযরত আসমা রা. বলেন, আমি নামাযের জন্য দাঁড়ালাম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামাযে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়ালেন যে, এই দীর্ঘ কিয়াম ইত্যাদি এবং প্রচন্ড গরমের কারণে আমার হুশ হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয়। উদ্দেশ্য হল, প্রায় বেহুশের কাছাকাছি অবস্থা হয়ে যায়। মানে মাথা চক্কর দিতে আরম্ভ করে। এতে বুঝা গেল, غشي দ্বারা সম্পূর্ণ বেহুশ হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য নয়। কারণ, হুশ হারানো ওযু ভঙ্গের কারণ। এর স্পষ্ট নিদর্শন স্বয়ং এ রেওয়ায়াতে আছে- فجعلت اصب على رأسي الماء যদি প্রকৃত অর্থে বেহুশ হওয়া উদ্দেশ্য হত, তবে মাথায় পানি ঢালার হুশই বা কিভাবে থাকত?

فحمد الله الخ অর্থাৎ, নামাযের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা পড়লেন। এতে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে বললেন- ما من شيئ لم اكن اريته الا رأيته অর্থাৎ, সে সব ফিতনা অথবা সওয়াব ও শাস্তি যা দুনিয়া বা আখিরাতে আসন্ন ছিল, সে সব দেখানো হয়েছে।

حتى الجنة والنار এমনকি জান্নাত জাহান্নামও। الجنة والنار শব্দে তিনটি ই'রাব জায়িয আছে। পেশ- যদি حتى ابتدائية হয়, আর حتى عاطفة হলে যবর, আর حتى جارة হলে যের।

কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায়, সমস্ত পর্দা তুলে দেয়া হয়েছে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় দৈহিক (চর্মচক্ষু) দ্বারা জান্নাত জাহান্নাম দেখেছেন। যেমন, মি'রাজের ঘটনায় কাফির মুশরিকরা যখন মসজিদে আকসা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছিল, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আকসার পূর্ণ চিত্র পেশ করে দিয়েছিলেন।

কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, জান্নাত জাহান্নামের চিত্র কিবলার দেয়ালে চিত্রায়িত করা হয়েছিল যেরূপভাবে আয়নার মধ্যে বিভিন্ন জিনিসের ছবি চিত্রায়িত করা হয়। অথবা মিছাল জগতকে সামনে এনে দেয়া হয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ প্রশ্ন হল, জান্নাত জাহান্নাম তো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ রজনীতে প্রত্যক্ষ্য করেছিলেন।

উত্তর ঃ এ রেওয়ায়াতে مقامي هذا রয়েছে। যার অর্থ হল, এ ভূমিতে থাকা অবস্থায় আমি জান্নাত জাহান্নাম দেখেছি। আর মি'রাজ রজনীর ঘটনা হল, উর্ধ্ব জগতে। অতএব কোন প্রশ্ন নেই।

জান্নাত জাহান্নাম বিদ্যমান আছে ঃ এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, জান্নাত জাহান্নাম বর্তমানেও বিদ্যমান আছে। যা কুরআনে কারীমের আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত। কিন্তু এ প্রশ্ন ঠিক নয় যে, জান্নাত জাহান্নাম যদি বিদ্যমান থেকে থাকে তো কোথায় আছে? এবং কোন দিকে আছে? এখনতো গোটা সৃষ্টির ভূগোল জানা হয়েছে। কিন্তু কোথাও তো জান্নাত জাহান্নাম পাওয়া যায়নি।

প্রথমত তো এ দাবীই ভুল যে, গোটা সৃষ্টির ভূগোল জানা হয়ে গেছে। কারণ, দুনিয়ার মহা জ্ঞানও এ দাবী মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে।

২. যদি মেনে নেয়া হয় যে, তোমরা গোটা জগতের ভূগোল জেনে নিয়েছ, তাহলে তোমরা শুধু এ পৃথিবীর ভূগোল জেনে গেছ, কিন্তু জান্নাত জাহান্নাম আছে অন্য জগতে। জান্নাত জাহান্নামের অস্তিত্বের ধরন অন্য রকম। এ জগতের দিকে লক্ষ্য করলে কোথায় ও কখনের প্রশ্ন হতে পারে, যেমন, কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে, অমুক শহর কোথায়, কোন দিকে? উত্তরে বলা যেতে পারে, পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে, উত্তরে বা দক্ষিণে। কারণ, এর সম্পর্ক আমাদের জগতের সাথে। কিন্তু জান্নাত জাহান্নামের জগতই তো ভিন্ন।

জগত তিনটি

আল্লাহ ইবনে কাইয়্যিম র. লিখেছেন, জগত ৩ টি। ১. দুনিয়া, ২. বরযখ বা কবর জগত, ও ৩. আখিরাত। প্রতিটির নিয়মনীতি ও অবস্থা আলাদা। এক জগতে অন্য জগতের প্রশ্ন অনর্থক। যে নিয়ম সেখানে আছে সেটি এখানে নেই। যেমন, প্রাণীজগত। কোন ব্যক্তি গাধাকে বলল, মানব জগত এরূপ, তার খাদ্য এরূপ, এরূপ আরামে থাকে। এসব সে কি বুঝবে? বস্তুতঃ এসব জগত বর্তমানে বিদ্যমান আছে। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি সেগুলো প্রত্যক্ষ করতে পারে না। যখন পর্দা তুলে নেয়া হবে, তখন সব প্রতিভাত হয়ে যাবে। একারনেই যখন পর্দা তুলে নেয়া হয়েছে তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা প্রত্যক্ষ্য করেছেন।

مثل او قريب لا ادري الخ হযরত আসমা রা. এর শিষ্য হযরত ফাতিমা রা. বলেন, আমার স্মরণ নেই হযরত আসমা রা. مثل فتنة المسيح الدجال বলেছিলেন, না قريب فتنة المسيح الدجال বলেছিলেন। এমনিভাবে مومن বলেছেন, না موقن বলেছেন, منافق বলেছেন, না مرتاب বলেছেন। এটি হল, পূর্ণাঙ্গ সতর্কতা যে, যে শব্দে সন্দেহ ছিল তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য হল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমাকে ওহীর মাধ্যমে বলা হয়েছে, কবরে তোমাদের পরীক্ষা হবে, যা দাজ্জালের ফিতনার ন্যায় ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক হবে অথবা তার কাছাকাছি।

দাজ্জালের ফিতনার সাথে এজন্য উপমা দিয়েছেন যে, এ ফিতনা প্রসিদ্ধ। হযরত নূহ আ. এর যুগ থেকেই সমস্ত নবী-রাসূল আ. এ ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করে আসছেন। তবে উভয় ফিতনাতে বিরাট পার্থক্য আছে। কারণ, দাজ্জালের ফিতনা হবে এ দুনিয়াতে। এ দুনিয়া হল, দায়িত্ব অর্পন ও আমলের ক্ষেত্র এবং

উপর আহকাম নির্ভরশীল। আর কবরের পরীক্ষা দায়িত্ব অর্পন ও আমল রূপে হবে না, বরং সেখানে হবে আমল প্রকাশ ও পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য।

ما علمك মুবতাদা. بهذا الرجل খবর। -কাসতাল্লানী। يقال ما علمك بهذا الرجل اي يقال للمفتون :

والجملة وقعت مقول القول অর্থাৎ, তোমাদেরকে বলা হবে, সে ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বিশ্বাস পোষণ করতে? এ বিষয় সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ কিতাবুল জানায়িযে আসবে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা হল, বলা হয়েছে, কবরে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। এ পরীক্ষা হবে দাজ্জাল যুগের পরীক্ষার ন্যায় অথবা তার কাছাকাছি। দাজ্জালের পরীক্ষার ছুরত এই হবে যে, যখন সে কবরের পাশে যেয়ে قوموا তথা তোমরা উঠে দাঁড়াও বলবে, তখন শয়তানগুলো কবর থেকে বেরিয়ে আসবে। তাদের আকৃতি হবে মৃতের। লোকজন তাদের নিকট স্বীয় আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, তখন সে তাদের জীবিত করে দেখাবে। সে খোদায়ী দাবী করবে, قوموا باذني শব্দ কবরবাসীদের সম্পর্কে বলবে। আর দেখা যাবে মৃতরা উঠছে। এ সময়টি হবে চরম পরীক্ষার। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই মহা পরীক্ষার ন্যায় একটি পরীক্ষা আসবে তোমাদের কবরে। সেটি হল, মুনকার নাকীর ভয়ঙ্কর রূপ এবং কঠোর মেজায নিয়ে নির্জনে আসবে এবং প্রশ্ন করবে- من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل؟ - তোমাদের প্রভু কে? তোমাদের জীবন বিধান কি? ইনি কে?

هذا দ্বারা কার দিকে ইঙ্গিত?

কবরে মুনকার নাকীরের তৃতীয় প্রশ্নে هذا শব্দ দ্বারা কার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে।

১. কারো কারো মত হল, هذا الرجل؟ দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সে ফিরিশতা বলবেন, ما علمك بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ এমতাবস্থায় هذا الرجل؟ হবে বর্ণনাকারীর স্বীয় অভিব্যক্তি।

কাযী ইয়ায র. বলেন, الاظهر انه سمي له অর্থাৎ, স্পষ্টতর কথা হল, ফিরিশতা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক নাম (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উল্লেখ করে প্রশ্ন করবেন। যেমন, কোন কোন রেওয়ায়াতে মুহাম্মদ শব্দ সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

২. কারো কারো মত হল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বস্থানে তাশরীফ রাখবেন। মৃত ব্যক্তি এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝের পর্দাগুলো তুলে দেয়া হবে। যেমন, মি'রাজের ঘটনায় فجلى الله لي بيت المقدس বাক্য এসেছে।

৩. আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী র. বলেন, রেওয়ায়াত সমূহ দ্বারা বুঝা যায়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সিফাত বর্ণনা করা হবে যে, এরূপ এরূপ ব্যক্তি যিনি তোমাদের কাছে এরূপ এরূপ বিষয় নিয়ে এসেছিলেন, তাঁর সম্পর্কে তোমার কি বিশ্বাস? তোমার কি মত? -দরসে বুখারী ঃ ৩৭০।

نم صالحا ভাল রূপে আরাম কর। আমি نم শব্দের অর্থ سوجا (ঘুমাও) করিনি। কারণ, রেওয়ায়াতসমূহ দ্বারা বুঝা যায়, মৃতদেরকেও কোন না কোন কাজে লাগিয়ে দেন। কেউ তিলাওয়াত করে, কেউ নামায পড়ে। মুকাল্লাফ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত না হওয়ার অর্থ হল, এখন আর তাদের উপর সে সব জিনিস আবশ্যক থাকে নি। কিন্তু তারা নিজ থেকে মজা অনুভব করে সে আমল করতে থাকে।

হযরত হাজী সাহেব র. বলতেন, আল্লাহ যদি একবার জান্নাতে পৌঁছে দেন, তবে আমরা বলব, আমাদের এবার অন্য কোন কাজের প্রয়োজন নাই। শুধু একটি মুসাল্লার জায়গা দিন। সর্বদা নামায পড়তে থাকব। এটি দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে নয়, বরং এ কারণে যে, তাতে মজা পাবেন। جعلت قرة عيني في الصلوة

এখানে সুস্পষ্ট প্রকাশ্য কাফিরের কথা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়াতে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। এজন্য তাহকীক হল, কাফিরের কাছেও প্রশ্ন করা হবে। والله اعلم

٦٧. بَاب تَحْرِيضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الْإِيمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ .

৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে ঈমান ও ইলমের হেফাজত করা এবং পরবর্তীদেরকে (যারা দেশে আছে) তা অবহিত করার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উৎসাহ দান। মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস র. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যাও এবং তাদেরকে (দীনি ইলম) শিক্ষা দাও।

যোগসূত্র ঃ পিছনের অনুচ্ছেদে ফতওয়া জিজ্ঞেস করা ও ফতওয়া দান তথা প্রশ্নোত্তরের উল্লেখ ছিল। এর সারকথা হল, ইলমী বিষয়াবলী নিজে অনুধাবন কর, অন্যদেরকেও বল। এবার এ অনুচ্ছেদে এ বিষয়টিই সুস্পষ্ট ভাষায় বলছেন।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য এ বিষয়ে তাকিদ দান যে, ইলম অর্জনের পর তা'লীম ও তাবলীগ থেকে উদাসীন থাকবে না। এ ছাড়া শিক্ষকের জন্য জরুরী হল, দুটি বিষয়ে দিক নির্দেশনা ও তালকীন দান- ১. যা কিছু পড়বে ও শিখবে তা পূর্ণরূপে মুখস্থ করবে, ২. এবিষয়গুলো নিজের সত্ত্বা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখবে না, বরং অন্যদের নিকট পৌঁছানোও নিজের জিম্মাদারি মনে করবে।

٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـــ وَبَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ الْوَفْدُ أَوْ مَنْ الْقَوْمُ قَالُوا رَبِيعَةُ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى قَالُوا إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا

رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ شُعْبَةُ رُبَّمَا قَالَ النَّقِيرِ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ قَالَ احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ .

৮৬. 'মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার র. ...... হযরত আবূ জামরা র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রা. ও (বসরার) লোকদের মধ্যে দোভাষী ছিলাম। একদিন ইবনে আব্বাস রা. বললেন, আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এলে, তিনি বললেন ঃ তোমরা কোন প্রতিনিধি দল? অথবা জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কোন গোত্রের? তারা বলল, 'রবী'আ গোত্রের। তিনি বললেন ঃ (তোমাদের আগমন মুবারক হোক) 'মারহাবা। এ গোত্রের প্রতি অথবা এ প্রতিনিধি দলের প্রতি, এরা কোনরূপ অপদস্থ ও লাঞ্ছিত না হয়েই এসেছে। তারা বলল, 'আমরা বহু দূর থেকে আপনার কাছে এসেছি। আর আমাদের ও আপনার মাঝে রয়েছে কাফিরদের এই 'মুযার' গোত্রের বাস। (তাদের ভয়ে) আমরা হারাম মাস ছাড়া আপনার কাছে আসতে সক্ষম নই। সুতরাং আমাদের এমন কিছু অকাট্য নির্দেশ দিন, যা আমাদের পশ্চাতে যারা রয়েছে তাদের কাছে পৌঁছাতে এবং তার উসিলায় আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।' তখন তিনি তাদের চারটি কাজের নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন ঃ এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা কিরূপে হয় জান? তারা বললঃ 'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।' তিনি বললেন ঃ 'তা হল এ সাক্ষ্য প্রদান যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া এবং রমযানের রোযা পালন করা আর তোমাদের গনিমতের মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ দান করা।' আর তাদের নিষেধ করলেন শুকনো লাউয়ের খোল, সবুজ কলস এবং আলকাতরা জাতীয় দ্রব্য দ্বারা পালিশকৃত পাত্র ব্যবহার করতে। শু'বা বলেন, কখনও (আবূ জামরা রা.) খেজুর বৃক্ষ থেকে তৈরী পাত্রের কথাও বলেছেন, আবার তিনি কখনও (النقير) -এর স্থলে (مقير) বলেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা এগুলো মনোযোগ সহকারে স্মরণ রেখো এবং তোমাদের পিছনে যারা রয়েছে তাদের নিকট পৌঁছে দিয়ো।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল احفظوه واخبروه من ورائكم এ বাক্যে স্পষ্ট।

পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী, কিতাবুল মাগাযী ঃ ৪৪২, অনুচ্ছেদ- আবদুল কায়েস প্রতিনিধি দল। তাছাড়া নাসরুল বারী, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ নং ৪০, হাদীস নং ১৫ দ্রষ্টব্য।

٦٨. بَاب الرِّحْلَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ

৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ উদ্ভূত মাসআলার জন্য সফর করা এবং নিজ পরিবার-পরিজনকে শিক্ষা দেয়া (কিরূপ?)।

বুখারী ঃ পৃ ১৯

যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য ঃ পিছনের অনুচ্ছেদে সাধারণ তা'লীম ও তাবলীগের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ ও এর প্রতি তাকিদ ছিল। ছিল মৌলিক ইলমের আলোচনা। এবার এ অনুচ্ছেদে একটি শাখাগত মাসআলার জন্য সফর প্রমাণ করছেন যে, আকস্মিক কোন বিশেষ শাখাগত মাসআলার সম্মুখীন হলে, হুকুম জানা না থাকলে এবং স্থানীয় কোন মুফতী মওজুদ না থাকলে এমতাবস্থায় কিয়াস প্রদর্শন জায়িয নেই, বরং সফর করে কোন আলিমের নিকট থেকে জানবে।

٨٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ رضـــ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ رضـــ وَالَّتِي تَزَوَّجَ رضـــ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ رضـــ مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.

৮৭. মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল আবুল হাসান র. ..... হযরত উকবা ইবনুল হারিস রা. বর্ণনা করেন, তিনি আবূ ইহাব ইবন আযীয র.-এর কন্যা গনীয়্যাকে বিয়ে করলে তাঁর কাছে একজন স্ত্রীলোক (তার নাম অজানা) এসে বলল, আমি উকবা রা.-কে এবং সে যাকে বিয়ে করেছে তাকে (আবূ ইহাবের কন্যা গনীয়্যাকে) দুধ পান করিয়েছি। উকবা রা. তাকে বললেন ঃ আমি জানি না যে, আপনি আমাকে দুধ পান করিয়েছেন। আর (ইতিপূর্বে) আপনি আমাকে একথা জানানওনি। এরপর তিনি (স্বদেশ মক্কা থেকে) মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ কথার পর (যে সে তোমার বোন) তুমি কিভাবে তার সঙ্গে সংসার করবে (মিলিত হবে)? এরপর উকবা রা. তাঁর স্ত্রীকে আলাদা করে দিলেন এবং সে মহিলা অন্য স্বামীর সঙ্গে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হলেন।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল فركب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৯, বুয়ূ' ২৭৬, শাহাদাত ঃ ৩৬০, ৩৬৩, নিকাহ ঃ ৭৬৪-৭৬৫।

একটি প্রশ্ন ঃ প্রশ্ন হল, ইমাম বুখারী র. পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদগুলোতে باب الخروج في طلب العلم ইলম অন্বেষনের জন্য সফরের বিবরণ দিয়েছেন। এজন্য এখানে باب الرحلة থেকে বাহ্যত পূনরাবৃত্তি মনে হচ্ছে।

উত্তর ঃ এ প্রশ্নের উত্তর শিরোনামের সাথে যোগসূত্রে দেয়া হয়েছে।

قال الحافظ رح والفرق بين هذه الترجمة وترجمة باب الخروج في طلب العلم ان هذا اخص وذلك اعم.

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম বুখারী র. হযরত উকবা ইবনে হারিস রা. এর হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যে, হযরত উকবা রা. শুধু একটি মাসআলার জন্য মক্কা থেকে মদীনা সফর করেছেন। ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয়েছে।

হযরত উকবা রা. স্বয়ং নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন। আমি আবূ ইহাব ইবনে আযীযের কন্যা গনীয়্যাকে বিয়ে করেছি। তার উপনাম ছিল উম্মে ইয়াহইয়া। বিয়ের পর এক মহিলা বললেন, আমি উকবা ও গানিয়্যা উভয়কে দুধ পান করিয়েছি। অর্থাৎ, তারা দুজন দুধ ভাই বোন। তাদের মাঝে পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্ক কিভাবে বৈধ হবে?

হযরত উকবা রা. বলেন, আমার জানা নেই, আপনি আমাকে দুধ পান করিয়েছেন। আর আপনি বিয়ের পূর্বে এ সম্পর্কে অবহিতও করেননি। হযরত উকবা রা. এর উদ্দেশ্য ছিল বিয়ের ব্যাপার গোপনে হয় না। যদি এটা বাস্তবতা হয়, তবে আপনি প্রথমে অবহিত করলেন না কেন?

হযরত উকবা রা. সে মহিলাকে তো উত্তর দিয়েছেন, কিন্তু নিজের প্রশান্তির জন্য মদীনা মুনাওয়ারা সফর করেছেন এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে এ মাসআলা জিজ্ঞেস করেছেন যে, এমতাবস্থায় একজন মহিলার উক্তি ধর্তব্য হতে পারে কি না?

শুধু দুধমাতার সাক্ষ্য দুধ পান প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট কিনা?

ইমাম আহমদ র. বলেন, শুধু দুধ মাতার সাক্ষ্য যথেষ্ট। অতিরিক্ত সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই।

ইমাম আহমদ র. এর প্রমান সে রেওয়ায়াত, যাতে রয়েছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু একজন দুধ মাতার সাক্ষ্য ধর্তব্যে এনেছেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠ আয়িম্মায়ে কিরামের মতে দুধ পান সাব্যস্ত হওয়ার জন্যও সাক্ষ্যের নেসাব জরুরী এবং এই নেসাব সাধারণ সাক্ষ্যের নিয়মানুযায়ী হতে হবে, যা অন্যান্য দাবীতে গ্রহণযোগ্যও মনে করা হয়।

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَأَتَانِ الخ. سورة البقرة

স্বীয় পুরুষদের মধ্য থেকে দুজনকে সাক্ষী বানাও অতঃপর যদি দুজন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা যথেষ্ট।

ইমাম আবূ হানীফা, মালিক ও শাফিঈ র. এর মাযহাব এটাই। এহাদীসটি বাহ্যত ইমাম আহমদ র. এর অনুকূল।

সংখ্যাগরিষ্ঠ আয়িম্মায়ে কিরামের পক্ষ থেকে হাম্বলীদের উত্তর ঃ

১. এ রেওয়ায়াত দ্বারা হাম্বলীদের প্রমাণ ঠিক নয়। কারণ, হাম্বলীদের মতে দুধ মাতার সাক্ষ্য কসম সহ জরুরী। আর এখানে সাক্ষ্যই প্রমাণিত নয়। কারণ, সাক্ষ্য হয় আদালতে। বস্তুতঃ এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট যে, দুধমাতা দরবারে নববীতে উপস্থিত হননি। কসম সহকারে সাক্ষ্যের তো প্রশ্নই আসে না।

২. ইমাম বুখারী র. কিতাবুল বুয়ূতে ইঙ্গিত করেছেন। শুধু দুধমাতার সাক্ষ্যে স্বামী-স্ত্রীতে বিচ্ছেদ ঘটানো সাধারণ নিয়ম নয় এবং না শরীয়ত হারাম প্রমাণ করে। অবশ্য এর দ্বারা এক প্রকার সন্দেহ অবশ্যই সৃষ্টি হয়ে যায়। এজন্য دع ما يريبك الى ما لا يريبك. এর প্রতি লক্ষ্য করে বেঁচে থাকার জন্য সতর্কতা মূলক বলেছেন- كيف وقد قيل এসব শব্দ প্রমাণ করছে যে, এখানে হারামের অকাট্য হুকুম নয়। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ইমাম বুখারী র.এর মতেও শুধু দুধমাতার সাক্ষ্য হারামের কারণ নয়। বরং শুধু সন্দেহ সৃষ্টিকারক হওয়ার কারণে বেঁচে থাকা উচিত। তাছাড়া সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার পর এই স্ত্রীর সাথে মেলামেশায়ও স্বতস্ফূর্ততা থাকবে না। সারা জীবনের ব্যাপার। সর্বদার জন্য সংকোচ থাকবে। এর মন্দ প্রভাব পড়বে সামাজিক বিষয়াবলীতে ও সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে। এটি হল, দুধ পান ও সাক্ষ্য সংক্রান্ত পর্বের মাসআলা। বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ যথাস্থানে আসবে।

٦٩. بَاب التَّنَاوُبِ فِي الْعِلْمِ

৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ ইলম শিক্ষার জন্য পালা নির্ধারন। বুখারী ঃ পৃ ১৯

উদ্দেশ্য হল, ব্যস্ত লোকদের জন্য ইলম অর্জনের পন্থা।

যোগসূত্র ঃ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদগুলোতে ইমাম বুখারী র. বলেছিলেন যে, ইলম অর্জনের জন্য যদি সফরের প্রয়োজন হয়, তবুও দ্বিধা করবে না। যদিও শুধু একটি মাসআলার জন্যই সফর করতে হোক না

কেন। কিন্তু কখনো এমনও হয় যে, মানুষের ইলম অর্জনের শখ ও আগ্রহ থাকে কিন্তু অধিক ব্যস্ততার কারণে সুযোগ হয় না। এরূপ লোকের জন্য ইমাম বুখারী র. পন্থা বাতলাচ্ছেন।

উদ্দেশ্য ঃ ব্যস্ত লোকদের জন্য ইলম অর্জনের একটি পন্থা বাতানো উদ্দেশ্য যে, পরিবারের সদস্যরা ইলম অর্জনের জন্য পালা নির্ধারণ করবে। একদিন একজন ইলম অন্বেষনের জন্য যাবে, অন্য সদস্যরা নিজের জরুরী কাজে রত থাকবে। এ ব্যক্তি যা কিছু শিখে আসবে, বিকেলে ঘরে এসে সাথীদেরকে ও অন্যদেরকে শিখাবে। অন্যদিন দ্বিতীয় ব্যক্তি ইলম অন্বেষনের জন্য চলে যাবে। রাত্রে এসে অন্য সদস্যদেরকে শিখাবে।

٨٨. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ عَبْد اللَّه بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رضــ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنْ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ الْوَحْيِ وَغَيْرِه وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِه فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا فَقَالَ أَثَمَّ هُوَ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْه فَقَالَ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ طَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَتْ لَا أَدْرِي ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ قَالَ لَا فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ .

৮৮. আবুল ইয়ামান র. ও ইবন ওহব র. ...... হযরত উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি ও আমার এক আনসারী প্রতিবেশী বনি উমাইয়্যা ইবনে যায়দের মহল্লায় বাস করতাম। এ মহল্লাটি ছিল মদীনার উঁচু এলাকায় অবস্থিত। আমরা দু'জনে পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে (মদীনায়) হাযির হতাম। তিনি একদিন আসতেন, আমি একদিন আসতাম। আমি যেদিন আসতাম, সেদিনের ওহী ইত্যাদির সংবাদ নিয়ে তাঁকে পৌঁছে দিতাম। আর তিনি যেদিন আসতেন সেদিন তিনি অনুরূপ করতেন। এরপর একদিন আমার আনসারী সঙ্গী তাঁর পালার দিন এলেন এবং (সেখান থেকে ফিরে) আমার দরজায় খুব জোরে করাঘাত করতে লাগলেন। (আমার নাম নিয়ে) বলতে লাগলেন, তিনি কি এখানে আছেন? আমি ঘাবড়ে গিয়ে তাঁর দিকে গেলাম। তিনি বললেন, এক মহা ঘটনা ঘটে গেছে [রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক দিয়েছেন]। আমি তখনি (আমার কন্যা) হাফসা রা.-এর নিকট গেলাম। সে তখন কাঁদছিল। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তোমাদের তালাক দিয়ে দিয়েছেন? সে বলল, 'আমি জানি না।' এরপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলাম এবং দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম ঃ আপনি কি আপনার স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ 'না।' আমি তখন বলে উঠলাম 'الله اكبر'।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল كنا نتناوب النزول বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৯, মাজালিম ঃ ৩৩৪, তাফসীর ৭২৯-৭৩০, নিকাহ ঃ ৭৮০, ১০৭৭, ১০৭৮।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত উমর রা. বলেন, আমি এবং আমার এক প্রতিবেশী আনসারী বনি উমাইয়্যা ইবনে যায়েদ গোত্রে বসবাস করতাম। সে আনসারীর নাম ছিল ইতবান ইবনে মালিক রা.। মদীনা মুনাওয়ারার পূর্ব দিককে আওয়ালী (উঁচু এলাকা), তাছাড়া মদীনার নিকটবর্তী উঁচু এলাকায় যে সমস্ত গ্রাম ছিল সেগুলোকে আওয়ালী বলা হত। যে সব এলাকা ছিল মদীনা তাইয়্যিবার পশ্চিম দিকে সতমল নিচু জায়গায়। সেগুলোকে বলা হত, সাওয়াফিল।

সারকথা হল, বনু উমাইয়্যা ইবনে যায়েদ ছিল মদীনার উঁচু এলাকার একটি গ্রাম। হযরত উমর রা. বলেন, আমরা দু'জন সিদ্ধান্ত করেছিলাম, আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পালা পালা করে যাব। কারণ, দৈনিক গ্রাম থেকে যাতায়াতে জীবিকা উপার্জন ও অন্যান্য প্রয়োজনে অসুবিধা হত।

একদিন আমার প্রতিবেশী (ইতবান ইবনে মালিক রা.) এলেন, আমার দরজায় খুব জোরে খটখট আওয়াজ দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন- اثم هو তিনি কি এখানে আছেন? আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। فقال حدث امر عظيم আনসারী প্রতিবেশী বললেন, আজকে একটি মহা ঘটনা ঘটেছে। এখানে রেওয়ায়াতে সংক্ষেপ হয়ে গেছে। বিস্তারিত রেওয়ায়াত ৭৮০ পৃষ্ঠায় আছে- হযরত উমর রা. জিজ্ঞেস করলেন- أجاء غسان যেহেতু তখন এ সংবাদ শোনা যেত যে, মদীনা তাইয়্যিবায় গাসসানী আগ্রাসন চালানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, সে আক্রমন করবে, সেহেতু হযরত উমর রা. এর অন্তরে তৎক্ষনাৎ এদিকে খেয়াল গেল। ইতবান ইবনে মালিক রা. বললেন, না বরং এর চেয়েও মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুতপবিত্র স্ত্রীগণকে তালাক দিয়েছেন। এর কারণ হল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আভিধানিক অর্থে ঈলা করেছিলেন। বর্বরতার যুগে ঈলাকে তালাক মনে করা হত। এজন্য তালাকের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। হযরত ইতবান রা. তাই বর্ণনা করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, মুসলমানদেরকে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় ফেলার জন্য মুনাফিকরা (এ সংবাদ) ছড়িয়ে দিয়েছিল। এ সংবাদ শুনে হযরত ইতবান রা. তা বর্ণনা করেছেন। মোটকথা, হযরত উমর রা. খুব কষ্টে রাত অতিক্রম করে প্রথমে স্বীয় কন্যা হযরত হাফসা রা. এর নিকট পৌঁছে দেখলেন, তিনি কাঁদছেন। জিজ্ঞেস করলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তালাক দিয়েছেন? তিনি বললেন, لا ادري এর ফলে হযরত উমর রা. এর পেরেশানী কিছুটা হ্রাস পেল। বস্তুতঃ হযরত হাফসা রা. এর মেজাজ ছিল কিছুটা তেজ। হযরত উমর রা. কন্যাকে বললেন, তুমি ধোকায় পড় না যে, যেরূপভাবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রা.কে ভালবাসেন, আমাকেও যেন তেমনি ভালবাসেন। খবরদার! কোন কিছুর প্রয়োজন হলে আমাকে বলবে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো বলবে না। অতঃপর তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌঁছে উপস্থিতির অনুমতি চাইলেন। তিনবার অনুমতি প্রার্থনার পর তা লাভ হল। দরবারে উপস্থিত হয়ে সর্বপ্রথম জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি পবিত্র স্ত্রীগণকে তালাক দিয়েছেন? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। হযরত উমর রা. ভীষণ আনন্দ এবং বিস্ময়ের সুরে বললেন- الله اكبر

মোটকথা, ইমাম বুখারী র. প্রমাণ করেছেন, প্রয়োজনের খাতিরে ইলম অর্জনের জন্য পালা নির্ধারণ করা জায়িয আছে। এ বিষয়টিও স্পষ্ট হল যে, ইলমের ব্যাপারে বেপরোয়া হওয়া জায়িয নেই। তাছাড়া হযরত উমর রা. এর এই ইলমী পালা দ্বারা সাব্যস্ত হল যে, খবরে ওয়াহিদ প্রমান। যদি খবরে ওয়াহিদ প্রমাণ না হত, তাহলে একজন অপরজনের খবর গ্রহণ করতেন না।

٧٠. بَاب الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

৭০. পরিচ্ছেদ ঃ অপসন্দনীয় কিছু দেখলে নসীহত ও শিক্ষাদানের সময় রাগ করা।

বুখারী ঃ পৃ ১৯

পূর্বের সাথে যোগসূত্র ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন, পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে ইলমের ক্ষেত্রে পালার বিবরণ ছিল যেটি ছাত্রদের একটি গুণ। এবারের অনুচ্ছেদেও ছাত্রদের কিছু গুণের উল্লেখ রয়েছে যে, উস্তাদ যদি ছাত্রদের কোন অবাঞ্ছিত আচরণ দেখেন, আইন বিরোধী ও অবাঞ্ছিত আচরণ অনুভব করেন, তবে রাগ প্রকাশ করতে পারেন। সতর্কীকরণ রূপে রাগ প্রকাশ করাও স্নেহ মমতার অন্তর্ভূক্ত। لان الرهبوت خير من الرحموت তথা ভীতি প্রদর্শন দয়া প্রদর্শনের চেয়ে উত্তম।

উদ্দেশ্য ঃ উদ্দেশ্য হল, সব জায়গায় ক্রোধ মন্দ নয়, বরং কোন কোন স্থানে রাগ করা জরুরী। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই জায়গায় ক্রুদ্ধ হতেন- ১. যখন হারাম জিনিসগুলো ভঙ্গ করা হয়, ২. অনর্থক প্রশ্নাবলীর ক্ষেত্রে।

٨٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضــ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَكَادُ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا فُلَانٌ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِئِذٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مُنَفِّرُونَ فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمْ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ .

৮৯. মুহাম্মদ ইবনে কাসীর র. ..... হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি নামাযে (জামা'আতে) শরিক হতে পারি না। কারণ, অমুক ব্যক্তি আমাদের নিয়ে খুব দীর্ঘ নামায আদায় করেন। [হযরত আবূ মাসঊদ রা. বলেন,] আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কোন ওয়াজের মজলিসে সেদিনের চেয়ে বেশি রাগান্বিত হতে দেখিনি। তিনি (রাগত স্বরে) বললেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা মানুষের মধ্যে (জামাআতের ব্যাপারে) বিরক্তির সৃষ্টি কর। অতএব, যে লোকদের নিয়ে নামায আদায় করবে সে যেন সংক্ষেপ করে। কারণ, তাদের মধ্যে রোগী, দুর্বল ও কর্মব্যস্ত- সমস্যাগ্রস্ত সব ধরনের লোক থাকে।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল في موعظة اشد غضبا من يومئذ বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৯, ৯৭, ৯৮, আদব ঃ ৯০২, আহকাম ঃ ১০৬০।

٩٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضــ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ وِكَاءَهَا أَوْ قَالَ وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوْ

قَالَ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ وَمَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرَ فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ .

৯০. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ র. ...... হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী রা. থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হারানো বস্তু প্রাপ্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন ঃ তার বাঁধনের রশি অথবা বললেন, থলে-ঝুলি ভাল করে চিনে রাখ। এরপর এক বছর পর্যন্ত তার ঘোষণা দিতে থাক। তারপর (মালিক পাওয়া না গেলে) তুমি তা (নিজের কাজে) ব্যবহার কর। এরপর যদি এর মালিক আসে তবে তাকে তা দিয়ে দেবে। সে বলল, 'হারানো উট পাওয়া গেলে?' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন রেগে গেলেন যে, তাঁর গন্ডদ্বয় (চেহারা মুবারক) লাল হয়ে গেল। অথবা বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ উট নিয়ে তোমার কি হয়েছে? তার তো আছে পানির মশক ও শক্ত পা। পানির কাছে যেতে পারে এবং গাছের লতা-পাতা খেতে পারে। তাই সেটাকে ছেড়ে দাও, যাতে তার মালিক তাকে পেয়ে যায়।' সে বলল, 'হারানো বকরী পাওয়া গেলে?' তিনি বললেন, 'সেটি হয়ত তোমার, নয়ত তোমার ভাইয়ের (মালিকের), না হয় বাঘের (খাদ্য)।'

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল فغضب حتى احمرت وجنتاه বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৯, মুসাকাতা ঃ ৩১৯, লুকতা ঃ ৩২৭-৩২৮, ৩২৯, তালাক ঃ ৭৯৭, আদব ঃ ৯০২।

ব্যাখ্যা ঃ لُقَطة লামের উপর পেশ ও ক্বাফের উপর যবর। অর্থাৎ, রাস্তায় পড়ে থাকা জিনিস, যার মালিক মওজুদ নেই, সেখান থেকে কুড়িয়ে নেয়া হয়েছে। কোন কোন অভিধানবিদ ক্বাফের উপর জযমও সহীহ বলেছেন। -উমদা।

اعرف : নির্দেশসূচক শব্দ باب ضرب থেকে।

وكاء : রশি, বাধন, যে রশি দ্বারা মশক (চর্মনির্মিত পাত্র বিশেষ) ইত্যাদি বাঁধা হয়, থলে, ডাট।

وعاء : ওয়াও এর নিচে যের। পাত্র, বরতন।

سنة : منصوب بنزع الخافض اي مدة سنة

عرفها سنة এ মাসআলাটি মূলত কিতাবুল লুকতার সংক্ষেপ হল, এক বছর পর্যন্ত এর ঘোষনা দিয়ে পরিচয় করা জরুরী নয়, বরং রাস্তার কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসের আর্থিক মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে যখন প্রবল ধারনা হবে, মালিক হয়ত নিরাশ হয়ে গেছেন, তখন হুকুম হল, প্রাপক নিজে মিসকীন হলে তা ব্যবহার করতে পারবে, আর ধনী হলে ফকীরদেরকে সদকা করে দেয়া আবশ্যক। আর যদি এরপর মালিক জেনে যান তবে উভয় ছুরতে তার জামান (ক্ষতিপূরণ) দিয়ে দেয়া আবশ্যক হবে। অবশ্য যদি মালিক সন্তুষ্ট হয়ে ছেড়ে দেন তবে ভিন্ন কথা।

فغضب ক্রোধ এ জন্য ছিল যে, তৎকালীন যুগে কল্যাণ প্রবল ছিল। এজন্য উট ধ্বংস হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। অতএব হারানো উট সম্পর্কে প্রশ্ন করা ছিল অনর্থক। কিন্তু আজকাল অনিষ্টের কারণে এ হুকুম নেই। অতএব হারানো উটের হেফাজতের জন্য সেটিকে ধরে ঘোষনা দিয়ে পরিচয় করা ও মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়া জরুরী। মোটকথা, এ যুগে হারানো উঁট ও হারানো বকরীর হুকুম একই।

٩١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رضـــ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ قَالَ رَجُلٌ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৯১. মুহাম্মদ ইবনুল আলা র. .... হযরত আবূ মূসা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কয়েকটি অপসন্দনীয় বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হল। প্রশ্নের সংখ্যা যখন অনেক হয়ে গেল, তখন তিনি রেগে গিয়ে লোকদের বললেন ঃ ‘তোমরা আমার কাছে যা ইচ্ছা প্রশ্ন কর।’ এক ব্যক্তি (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রা.) বলল, ‘আমার পিতা কে?’ তিনি বললেন ঃ ‘তোমার পিতা হুযাফা।’ আর এক ব্যক্তি (হযরত সাঈদ ইবনে সালিম রা.) দাঁড়িয়ে বলল, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা কে?’ তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা হল শায়বার মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) সালিম।’ তখন হযরত ‘উমর রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা মুবারকের অবস্থা দেখে বললেন ঃ ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আল্লাহ তা‘আলার দরবারে তওবা করছি।’

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল فلما اكثر عليه غضب বাক্যে।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৯-২০, আল ই’তিসাম ঃ ১০৮৩।

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء ঃ اشياء **শব্দটি গাইরে মুনসারিফ।**

একবার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এধরনের অপ্রিয় কিছু প্রশ্ন করা হয়েছিল। মূলত এসব অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন মুনাফিকরা করেছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিরুত্তর ও পেরেশান করার জন্য। কিছু সহজ সরল মুখলিস মুসলমানও না বুঝে তাতে লিপ্ত হয়েছিলেন। যেমন, আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রা. এবং সাঈদ ইবনে সালিম রা.। তাঁরা নিজ নিজ পিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রা.কে লোকজন তাঁর বংশ সম্পর্কে সমালোচনা ও ভর্ৎসনা করত যে, তুমি হুযাফার বীর্যে জন্ম হওনি। একারণে আবদুল্লাহ রা. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা কে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমার পিতা হুযাফা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রা. ভীষণ আনন্দিত হলেন যে, আজকে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে গেল। লোকজনের সংশয় সন্দেহের অবসান ঘটল। এবার কেউ আমার বংশের ব্যাপারে ভর্ৎসনা করবে না। খুশীতে আটখানা হয়ে ঘরে গেলেন, মাকে সুসংবাদ শুনালেন। তখন মা তাঁর নিন্দা করলেন ও বকা ঝকা দিলেন। বললেন, তুমি আমাকে লজ্জিত করার জন্য গিয়েছিলে। বর্বরতার যুগে পাপাচারের আধিক্য ছিল। আল্লাহ না করুন, যদি তোমার মা থেকে ভুল হয়ে যেত, তবে আজকে কিরূপ অপমান হতে হত! তিনি উত্তর দিলেন, যদি আজকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কাউকে পিতা বলতেন, তবে তিনি যে কেউ হন না কেন তাকেই আমি পিতা বলতাম। সুবহানাল্লাহ! এ ছিল সাহাবায়ে কিরাম রা. এর ঈমান ও ইয়াকীনের পরিপক্কতা ও দৃঢ়তা। পাহাড় স্বস্থান থেকে টলে যেতে পারে কিন্তু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার প্রতি তাদের যে ইয়াকীন ছিল তা কোন ক্রমেই টলতে পারত না।

سلوني عما شئتم রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রোধের কারণে বলেছিলেন। কেউ কেউ এটাকে প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ করে প্রশ্ন আরম্ভ করে দেন। কিন্তু হযরত উমর রা. অনুধাবন করেছেন যে, এটা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রুদ্ধ অবস্থায় বলছেন। তখন তিনি আরয করলেন- يا رسول الله! انا نتوب الى الله عز وجل সহীহ বুখারীর ১০৮৩ পৃষ্ঠায় এ হাদীসে নিম্নোক্ত শব্দরাজি বর্ণিত হয়েছে-

من احب ان يسئل عن شيئ فليسئل عنه فوالله لا تسئلوني عن شيئ الا اخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا

এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, এটি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জিযা ছিল যা সে স্থানের সাথেই বিশেষিত ছিল। চিরস্থায়ী মু'জিযারূপে এটি প্রমাণিত নয়। বরং নস তা অস্বীকার করে।

٧١. بَاب مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَوْ الْمُحَدِّث

৭১. পরিচ্ছেদ ঃ ইমাম বা মুহাদ্দিসের সামনে হাঁটু গেড়ে (আদবসহ) বসা।

যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য ঃ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে আলিম এবং উস্তাদের ক্রোধের বিবরণ ছিল, যা ছাত্রের বে আদবী এবং অসমীচীন আচরণের কারণে হয়ে থাকে। এবার এ অনুচ্ছেদে সে আদব ইহতিরামের কথা বলা হচ্ছে, যা উস্তাদের খাতিরে ছাত্রের অবলম্বন করা উচিত।

٩٢. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضـــ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ أَبِي فَقَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا فَسَكَتَ

৯২. আবুল ইয়ামান র. ..... হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার পিতা কে?' 'তিনি বললেন ঃ 'তোমার পিতা হুযাফা।' এরপর তিনি বারবার বলতে লাগলেন, 'তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন কর।' 'হযরত উমর রা. তখন হাঁটু গেড়ে বসে বললেন ঃ 'আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ -কে নবী হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নিয়েছি।' তিনি এ কথা তিনবার বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব হলেন।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল فبرك عمر رضـــ على ركبتيه বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ২০, ৭৭, তাফসীর ঃ ৬৬৫, দাওয়াত ঃ ৯৪১, ১০৫০, ই'তিসাম ঃ ১০৮৩।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনয়ন করলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রা. দাঁড়িয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার পিতা কে?

হাফিজ ইবনে হাজার র. বলেন, এ রেওয়ায়াতে কিছু শব্দ উহ্য আছে। যা অন্য রেওয়ায়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়। والتقدير خرج سئل فاكثروا عليه فغضب فقال سلوني فقام عبد الله بن حذافة الخ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে তাশরীফ আনলেন, যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রচুর প্রশ্ন করা হল, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন, যা ইচ্ছা প্রশ্ন কর। তখন হযরত উমর রা. দুটি জিনিস অবলম্বন করলেন- ১. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাটুদ্বয় গেড়ে আদব সহকারে বসে যান। দ্বিতীয়তঃ যবান থেকে এসব কথা বারবার পুনরাবৃত্তি করতে আরম্ভ করেন। আমরা আল্লাহ রব, ইসলাম দীন ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নবী হওয়ার ব্যাপারে সম্মত-সন্তুষ্ট। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে- وبالقرآن اماما তথা কুরআন ইমাম হওয়া ব্যাপারে সম্মত-সন্তুষ্ট। অর্থাৎ, এবার আমাদের কোন প্রশ্নের প্রয়োজন নেই।

হযরত উমর রা. এর বুঝ ঃ

ইবনে বাত্তাল র. বলেন, এসব কথা দ্বারা হযরত উমর রা. এর বুঝ অন্তরদৃষ্টি এবং জ্ঞান ও গুণের প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত উমর রা. যখন অনুধাবন করতে পারলেন যে, প্রশ্নগুলো সংশয় ও অবাধ্যতার ভিত্তিতে এবং কষ্ট দেয়ার জন্য করা হয়েছে, তখন তিনি ভয় পেয়ে গেলেন, হয়তো এর কারণে আযাব অবতীর্ণ হবে। ফলে হযরত উমর রা. এর এসব বাক্যের কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয়ে গেল।

হযরত উমর রা. এর এসব কথায় যেখানে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আদব ইহতিরাম ছিল, সেখানে মুসলমানদের প্রতি স্নেহ-মমতার আবেগ ছিল। যাতে উম্মতে মুসলিমা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিয়ে নিম্নোক্ত আয়াতের বাস্তব ক্ষেত্র না হয়-

انَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَه لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا. سورة احزاب

‘যারা আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূলকে কষ্ট দেয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশম্পাত করেন এবং তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাকর আযাব তৈরি করে রেখেছেন।’ -সূরা আহযাব।

এর দ্বারা প্রতিটি ছাত্র সবক লাভ করতে পারে, যাতে উস্তাদের নিকট প্রয়োজনীয় ছাড়া অপ্রয়োজনীয় কোন প্রশ্ন না করে। উদ্দেশ্য হল, যে সব প্রশ্ন দ্বারা নিজের যোগ্যতা ও বড়ত্ব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয় বা অন্যদের অপমান ও অপদস্ত করা উদ্দেশ্য হয়, সেসব নিষিদ্ধ। অন্যথায় সর্বস্বীকৃত বিষয় হল- فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرَ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ যদি জ্ঞান না থাকে তবে ফরয বিষয়গুলো জিজ্ঞেস করা ফরয, ওয়াজিব বিষয়গুলো জিজ্ঞেস করা ওয়াজিব, মুস্তাহাব বিষয়গুলো জিজ্ঞেস করা মুস্তাহাব।

৭২. بَاب مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضـــ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا

৭২. পরিচ্ছেদ ঃ ভালভাবে বুঝার জন্য কোন কথা তিনবার বলা।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ‘মিথ্যা কথা থেকে সাবধান!’ এ কথাটি তিনি বারবার বলতে লাগলেন। হযরত ইবনে উমর রা. বলেন, নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিদায় হজ্জে) বলেছেন ঃ আমি কি দীনের কথা পৌঁছে দিয়েছি? একথা তিনি তিনবার বলেছেন।

যোগসূত্র ঃ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে ছাত্রের আদব ইহতিরামের বিবরণ দেয়া হয়েছিল, এবার এ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হল যে, যেহেতু ছাত্র এতটা আদব ও শিষ্ঠাচারবিশিষ্ট ও বিশ্বস্ত, অতএব শিক্ষকেরও উচিত শিক্ষা দান ও বুঝানোর ক্ষেত্রে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা। যদি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল হয়, তবে বুঝানোর জন্য বারবার পূনরাবৃত্তি করবে। দুবার তিন বার বলবে।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য হল, শিক্ষকের উচিত ছাত্র ও শ্রোতাদের প্রতি খেয়াল রাখা। উদাহরণ স্বরূপ, বিষয়টি জটিল বা ছাত্র মেধাবী নয়, তাহলে বিষয়টি দু তিন বার বর্ণনা করবে। যেমন, لیفهم শব্দ দ্বারা স্পষ্ট হচ্ছে। এ উদ্দেশ্য নয় যে, প্রতিটি কথাই দোহরাতে হবে, বরং যে সব স্থানে পূনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয় সেখানে দোহরাবে।

২. ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য সে সব লোকের মতখন্ডন করা, যারা হাদীসের পূনরাবৃত্তি কিংবা ছাত্রের পক্ষ থেকে পূনরাবৃত্তির দাবীকে সঠিক মনে করে না।

৩. কেউ কেউ বলেছেন, ইমাম বুখারী র. এই শিরোনাম দ্বারা বলতে চান যে, মেধাহীন লোকের জন্য সর্বোচ্চ তিনবার পূনরাবৃত্তি করা যেতে পারে। -ফাতহুল বারী।

الا وقول الزور এটি হযরত আবূ বাকরা রা. এর হাদীসের একটি অংশ। এটি শাহাদাতে ৩৬২ পৃষ্ঠায় মাওসূলরূপে শীঘ্রই আসবে ইনশাআল্লাহ।

٩٣. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا

৯৩. আবদা ইবনে আবদুল্লাহ র. .... আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কথা বলতেন তখন তা তিনবার বলতেন যাতে তা (ভাল করে) বুঝে নেয়া যায়। আর যখন তিনি কোন কওমের নিকট এসে সালাম করতেন, তাদের প্রতি তিনবার সালাম করতেন।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল اذا تکلم بکلمة اعادها ثلثا বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ২০, আল ইসতিযান ঃ ৯২৩।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে।

১. দূরে উপবিষ্ট লোকদেরকে আওয়াজ পৌঁছানো উদ্দেশ্য হয়।

২. বুঝানোর জন্য পূনরাবৃত্তি।

৩. গুরুত্বারোপ করার উদ্দেশ্যে।

اذا تکلم بکلمة اعادها ثلثا প্রতি কথায় অনুরূপ হত না। বরং যার প্রতি গুরুত্বারোপ উদ্দেশ্য হত অথবা যা বুঝতে কিছুটা কষ্ট হত, তা দোহরাতেন। হাদীসের শব্দ حتی تفهم عنه এর প্রমাণ।

سلم علیهم ثلاثا কেউ কেউ বলেছেন, একটি হল, অনুমতি প্রার্থনার সালাম, দ্বিতীয়টি হল, মুবারকবাদীর -অভিবাদনমূলক সালাম, তৃতীয়টি হল বিদায়ী সালাম।

কেউ কেউ বলেছেন, এটি মহা সমাবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট। তখন শুরুতে এক সালাম, মাঝখানে এক সালাম ও শেষে আরেক সালাম বলতেন।

◆ উত্তম ব্যাখ্যা হল, এ তিনটি সালামই হত অনুমতি প্রার্থনার জন্য। এর প্রমাণ হযরত আবূ মূসা আশআরী রা. এর ঘটনা। তিনি হযরত উমর রা. এর কাছে আগমণ করলেন। তিনবার অনুমতি প্রার্থনা মূলক সালাম দেয়া সত্ত্বেও উত্তর পাওয়া গেল না। তখন তিনি ফিরে চলে এলেন। হযরত উমর রা. ডেকে প্রত্যাবর্তনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি বললেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম এটাই। হযরত উমর রা. অতিরিক্ত তাকিদের জন্য এর উপর সাক্ষ্য তলব করলেন। তখন সেখানকার লোকজনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট মনীষী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. সাক্ষ্য দিলেন।

হযরত উমর রা. শাসনরূপে সাক্ষ্য তলব করেছেন। যাতে শুরু থেকেই হাদীস বর্ণনার বুনিয়াদ সুদৃঢ় ও মজবুত হয়। ফলে হযরত উমর রা. বললেন, মদীনার একটি শিশুও উমর থেকে বড় জ্ঞানী। মূলতঃ উৎসাহ প্রদানের জন্য তিনি অনুরূপ বলেছেন।

٩٤. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضـــ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

৯৪. মুসাদ্দাদ র. ..... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেছনে রয়ে গেলেন। এরপর তিনি আমাদের নিকট এমন সময় পৌঁছলেন যখন আমাদের আসরের নামাযের প্রস্তুতিতে বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। আমরা ওযু করতে গিয়ে আমাদের পা মোটামুটিভাবে (মামুলিভাবে) পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিচ্ছিলাম যেন মাসেহ করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে ঘোষণা দিলেন ঃ 'পায়ের গোড়ালীর (শুকনো থাকার) জন্য ধ্বংস তথা জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে।' তিনি একথা দু'বার বা তিনবার বললেন।

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল مرتين او ثلثا শব্দে।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ১৪, ২০, ২৮।

ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য অনুচ্ছেদ ৪৫, হাদীস ঃ ৫৮।

٧٣. بَاب تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ

৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ আপন দাসী ও পরিবারবর্গকে (দীনি ইলম) শিক্ষাদান।

বুখারী ঃ ২০

যোগসূত্র ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন, পিছনের অনুচ্ছেদে সাধারণ শিক্ষা দানের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে বিশেষ শিক্ষাদানের বিবরণ রয়েছে। فتناسبا من هذه الجهة. عمدة -এ হিসেবে উভয়ের মধ্যে মিল রয়েছে। -উমদা।

উদ্দেশ্য ঃ উদ্দেশ্য হল, শিক্ষাদান জরুরী। প্রতিটি ব্যক্তির ইলম অর্জন করা চাই। হিন্দু ধর্মের মত নয় যে, শুধু ব্রাহ্মনই জ্ঞানের মর্যাদা অর্জন করতে পারে।

ব্যাপক শিক্ষাদানের দাবী হল, তা শুধু পুরুষের জন্যই যেন বিশেষিত না থাকে বরং মহিলাদেরও এর জরুরী অংশ পাওয়া উচিত। বরং মহিলাদের শিক্ষাদান এজন্যও গুরুত্বপূর্ণ যে, মায়ের স্নেহকোল হল

শিশুদের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অতঃপর মহিলাদের মধ্যেও শুধু স্বাধীনাদেরই বৈশিষ্ট্য নয়, বরং বাঁদীদেরও দীনি শিক্ষা দেয়া উচিত। পুরুষদের দায়িত্বগত ফরযের অন্তর্ভূক্ত এটি। তবে এখানে উদ্দেশ্য হল, দীনি শিক্ষা দীক্ষা। সে শিক্ষা ও তাহযীব-তামাদ্দুন নয় যদ্বারা মানুষ নির্লজ্জ ও শয়তান হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত কাব্য রচয়িতা কবিকে উত্তম প্রতিদান দিন।

هم ايسي هر سبق كو قابل ضبطي سمجتي هين

كه جسكو برهكر لركي باب كو خبطي سمجتي هين.

ইমাম বুখারী র. শিরোনামে امة ও اهل শব্দ উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, স্বীয় বাঁদী ও পরিবারের লোকজনকে ইলমে দীন শিখাবে। কিন্তু যে হাদীস উল্লেখ করেছেন তাতে امة শব্দের উল্লেখ রয়েছে, اهل শব্দের উল্লেখ নেই। অবশ্য বাঁদির উপর কিয়াস করে পরিবারের শিক্ষার বিষয়টি এভাবে প্রমাণিত হবে যে, যেহেতু বাঁদীর শিক্ষাদান জরুরী। তাহলে স্বাধীনা স্ত্রী ও পরিবারের লোকজনকে শিক্ষাদান উত্তমরূপেই প্রমাণিত হবে।

১. হযরত শাইখুল হাদীস র. বলেন যে, ইমাম বুখারী র. এই কারণ বর্ণনা করতে চান যে, মানুষ স্বীয় বাঁদী এবং স্ত্রীকে শিক্ষাদানে আদিষ্ট। কারণ, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ রয়েছে-

كلكم زاع وكلكم مسئول عن رعيته الامام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في اهله وهو مسئول عن رعيته. بخاري ١٢٢.

٩٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ قَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رض— قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ أَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

৯৫. মুহাম্মদ ইবনে সালাম র..... হযরত আবূ বুরদা র. -তাঁর পিতা হযরত আবূ মূসা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তিন ধরনের লোকের জন্য দ্বিগুন সওয়াব রয়েছে ঃ ১. আহলে কিতাব- (ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান) যে তার নবীর প্রতি ঈমান এনেছে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপরও ঈমান এনেছে। ২. যে ক্রীতদাস আল্লাহর হক আদায় করে এবং তার মালিকের হকও (আদায় করে)। ৩. যার একটি বাঁদী ছিল, যার সাথে সে মিলিত হত। তারপর তাকে সে সুন্দরভাবে আদব-কায়দা শিখিয়েছে এবং ভালভাবে দীনি ইলম শিক্ষা দিয়েছে, এরপর তাকে মুক্ত করে বিয়ে করেছে; তার জন্য দুটি সওয়াব রয়েছে। এরপর বর্ণনাকারী আমির শাবী র. (তাঁর ছাত্র খোরাসানীকে) বলেন, তোমাকে কোন কিছুর বিনিময় ছাড়াই হাদীসটি শিক্ষা দিলাম, অথচ আগে এর চেয়ে ছোট হাদীসের জন্যও লোকজন (দূর-দূরান্ত থেকে) আরোহন করে মদীনায় যেত।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল وعلمها فاحسن تعليمها বাক্যে স্পষ্ট

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ২০, ৩৪৬, জিহাদ ঃ ৪২২, কিতাবুল আম্বিয়া ঃ ৪৯০, নিকাহ ঃ ৭৬১

ব্যাখ্যা ঃ هو ابن سلام এখানে লামের উপর তাশদীদ নেই। এ বাক্যটি ইমাম বুখারী র. এর শীর্ষ ফিরাবরী র. এর বক্তব্য। মূল রেওয়ায়াতে নেই। ফিরাবরী র. ব্যাখ্যার জন্য এটিকে যুক্ত করেছেন। এটা মুহাদ্দিসীনে কিরামের সতর্কতা যে, যখন মূল রেওয়ায়াতে কোন শব্দ যুক্ত করেন, তখন يعني অথবা وهو শব্দ যুক্ত করেন। যাতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়।

ثلاثة لهم اجران তিন ব্যক্তি দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। ১. সে আহলে কিতাব যে আপন নবীর প্রতি ঈমান এনেছে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করেছে। কুরআনে হাকীমে এর উল্লেখ রয়েছে-

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْا اٰمَنَّا بِهٖ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ اُولٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا. سورة قصص

অর্থাৎ, যাদেরকে আমি এর (কুরআনের) পূর্বে কিতাব দিয়েছি, তারা এর (কুরআনের) প্রতি ঈমান আনয়ন করে, আর যখন তাদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এ কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি। নিঃসন্দেহে এটা হক্ব, আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে। আমরা তো প্রথম থেকেই মানতাম। তাদেরকে তাদের ধৈর্য্য ও অটলতার কারণে দ্বিগুণ সওয়াব দেয়া হবে। -সূরা কাসাস পারা ঃ ২০, রুকু ঃ ৯।

হাফিজ র. এরূপ আরো অনেক লোকের কথা উল্লেখ করেছেন, যাদের জন্য দ্বিগুন সওয়াবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। যেহেতু কম সংখ্যা অধিক সংখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে না, অতএব উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কাজেই এখানে তিনের সংখ্যা সীমাবদ্ধতার জন্য নয়, বরং বিশেষভাবে এ তিনজনের উল্লেখের কোন কারণ থাকবে।

রাত দিনের প্রত্যক্ষ দর্শন হল, বক্তা ও ওয়ায়েজরা যখন এবং যেখানে যে জিনিসের প্রয়োজন হয়, তার বিবরণ দেন। কেউ এটা মনে করে না যে, শুধু এ জিনিসগুলোরই গুরুত্ব রয়েছে, যেগুলোর কথা এখন আলোচনা করা হয়েছে। বরং প্রতিটি ব্যক্তি এটাই মনে করে যে, উপস্থিত লোকজনের স্বার্থের বিবেচনায় বিশেষভাবে এসব জিনিসের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিগুন সওয়াবের কারণ সংক্রান্ত তাত্ত্বিক আলোচনা ঃ

এখানে একটি আলোচ্য বিষয় হল, দুটি সওয়াব দুটি আমলের কারনে পাওয়া যায়। কারণ, প্রতিটি আমলের উপর একটি সওয়াব অথবা প্রতিটি আমলের উপর দুটি সওয়াব পাওয়া যায়?

উলামায়ে কিরাম উভয় মত অবলম্বন করেছেন। তবে প্রথম ছুরতে দুটি প্রশ্ন অবশ্যই এসে যায়।

প্রথম প্রশ্ন ঃ প্রথম দু ব্যক্তি দু দুটি কাজ করেছে। অতএব তাদের জন্য দুটি সওয়াব হওয়া যথার্থ। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি কয়েকটি কাজ করেছে।

উত্তর ঃ এর উত্তর দেয়া হয়েছে। মুক্ত করার পূর্বেকার শিক্ষাদান ও আদব দান ইত্যাদি মুক্ত করার অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ, একটি আমল হল মুক্তকরণ, দ্বিতীয় আমল হল বিয়ে করা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ যেহেতু আমল দুটি সেহেতু সওয়াবও দুটিই হবে। এটি সাধারণ মূলনীতি যে, আমল যত সওয়াবও তত। অতএব উপরোক্ত লোকদের ফযীলতের কারণ কি হল? এর কোন যৌক্তিক উত্তর দেয়া হয় না।

সবচেয়ে সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা ঃ

না দুটি আমলের উপর দুটি সওয়াবের প্রতিশ্রুতি উদ্দেশ্য, আর না প্রতিটি আমলের উপর দ্বিগুণ সওয়াবের। বরং উপরোক্ত আমলগুলোর মধ্য থেকে যে আমলের উপর দুটি সওয়াবের যোগ্যতা আছে শুধু সে ক্ষেত্রে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। এর বিস্তারিত বিবরণ হল, আমলে যত কষ্ট বেশী হবে তত সওয়াব বেশি হবে। প্রসিদ্ধ বাগধারা রয়েছে- العطايا على قدر البلايا এজন্য সহীহ বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়াতে আছে-

الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران. مسلم : ١/٢٦٩.

'অভিজ্ঞ কুরআন তিলাওয়াতকারী সে সব মহান ফিরিশতার সাথে থাকবে যারা লাওহে মাহফূজের নিকট লিখতে থাকেন। আর যে কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তাতে আটকে যায় (থেমে থেমে পড়ে) এবং তার কষ্ট হয় তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে।' -মুসলিম ঃ ১/২৬৯।

উদ্দেশ্য হল, যে ব্যক্তি আটকে আটকে অথবা তোতলিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করে তার কষ্ট বেশি হয়। জিহ্বাতে শব্দগুলো খুব কষ্টে উচ্চারিত হয়, কিন্তু সে হিম্মতহারা হয় না। কালামে ইলাহীর দিকে লক্ষ্য করে খুব কষ্ট করে তিলাওয়াতের চেষ্টা করে। অতএব তার জন্য একটি সওয়াব তিলাওয়াতের, আরেকটি পরিশ্রমের।

ইরশাদে ইলাহী- أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا তেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, দ্বিগুণ সওয়াব হয়, আত্মার অপছন্দীয় কাজে অটলতা ও কষ্টের কারণে। অতএব হাদীসে উল্লেখিত আমলগুলোর যেটিতে কষ্ট বেশি হবে তার উপর দ্বিগুণ সওয়াব হবে।

অতঃপর উপরোক্ত তিনটিরই বৈশিষ্ট্য নয়, বরং যে সব আদিষ্ট আমলে টানা হেচড়া ও কষ্ট হয়, যেগুলোতে কষ্ট পরিশ্রম বেশি হয় এবং শরীয়তের লক্ষ্য উদ্দেশ্য অনুযায়ী হয় তাতে দ্বিগুণ সওয়াব হবে। এজন্য আল্লামা সুয়ূতী র. ৩০ এর অধিক আমলের বিবরণ দিয়েছেন, যেগুলোতে হাদীস সমূহে দ্বিগুণ সওয়াবের শুভ সংবাদ বিদ্যমান রয়েছে। এবার হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন। এতে রয়েছে- প্রথম ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমানের কারণে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। কারণ, একটি ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম অবলম্বন করা খুবই মুশকিল কাজ। বিশেষতঃ যখন প্রথম ধর্মটিও আসমানী হয় এবং পরবর্তীতে আগমণকারী নবীও তার সত্যায়ন করেন।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি মনিবের হকের সাথে সাথে আল্লাহর হক সমূহও আদায় করে সে দ্বিগুণ সওয়াবের যোগ্য হয়। কারণ, এতে বিরাট কষ্ট মেহনত হয়। এতে রাত দিন মনিবের খেদমতে রত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর হক থেকে উদাসীন হয়নি।

এ অবস্থাই তৃতীয় ব্যক্তির। প্রথমতো বাঁদীকে শিক্ষাদান ও আদব শিখানো কষ্টের কাজ। এরপর তাকে বিয়ে করাও বড় মুজাহাদার কাজ। কারণ, এটাকে খুবই দোষনীয় মনে করা হয়। মোটকথা, লোকজনের সমালোচনা ও ভর্ৎসনার পরোয়া না করা ও বাঁদীকে সমান অধিকার দেয়া অনেক বড় মুজাহাদার কাজ। এ জন্য এর উপর দ্বিগুণ সওয়াবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

أمن بنبيه

একটি প্রশ্ন ঃ এটি ইয়াহুদীদেরকেও অন্তর্ভূক্ত করে। অথচ মূসা আ. এর প্রতি ইয়াহুদীদের ঈমান সওয়াবযোগ্য নয়। কারণ, ইয়াহুদীরা হযরত ঈসা আ.কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তাদের ধারণানুযায়ী তাঁকে শুলিতে চড়িয়েছে। মূলনীতি হল, এক নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে অন্য নবীদের প্রতিও আর ঈমান থাকে না। অতএব হযরত ঈসা আ.কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ফলে হযরত মূসা আ.এর প্রতি ঈমানও বাতিল হয়ে যায়। অতএব এর উপর সওয়াব কিরূপে?

উত্তর ঃ কেউ কেউ এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যে, নবী দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত ঈসা আ.। আর আহলে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য খ্রিষ্টান।

কিন্তু হাফিজ র. ব্যাপকতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাছাড়া হাদীসে বিশেষত্বকে মেনে নেয়া হলেও- أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ এবং يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِه আয়াতদ্বয় সমস্ত আহলে কিতাবকে অন্তর্ভূক্ত করে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. ও তাঁর ন্যায় সাহাবায়ে কিরাম রা. সম্পর্কে এসব আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁরা ছিলেন ইয়াহুদী।

২. বিশুদ্ধ উত্তর দুটি ভূমিকার উপর নির্ভরশীল।

প্রথম ভূমিকা। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত সমস্ত মানবজাতির জন্য ব্যাপক। অন্যান্য নবীর নবুওয়াত কোন খাস গোত্র বা বিশেষ অঞ্চলের দিকে হত। যেমন, ইরশাদে নববী রয়েছে-

كان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة. بخاري : ٦٢/١.

দ্বিতীয় ভূমিকা। এক এলাকা অথবা এক সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত নবীর দাওয়াত যদি অন্য সম্প্রদায় অথবা অন্য এলাকা পর্যন্ত পৌছে তবে তাদের উপর তাওহীদের স্বীকারোক্তি এবং নবীর প্রতি সত্যায়ন ও ঈমান আনয়ন আবশ্যক হয়। কিন্তু আনুগত্যকে আবশ্যক করে নেয়া জরুরী নয়। যদি তারা অন্য আসমানী দীনের উপর আমল করে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. এর পিতা প্রপিতাগণ মূলতঃ শামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁরা হযরত ইউসুফ আ. এর সন্তান।

বুখতে নাসসার যখন শামে আক্রমণ করে তখন তারা হিজাযের দিকে এসে যান। বনী ইসরাঈলের সাথে সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বস্তুতঃ হযরত ঈসা আ. ছিলেন, বনী ইসরাঈলের নিকট প্রেরিত।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, হযরত ঈসা আ. এর কিছু সাহাবী ও মুখলিস অনুসারী ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে রোম, তুর্কি ও এনতাকিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মদীনা মুনাওয়ার আশে পাশে পৌঁছাও প্রমাণিত হয়। তবে তাদের দাওয়াত মদীনায় পৌঁছেছে বলে প্রমাণিত নয়। আর যদি মদীনায় পৌঁছেছে বলে মেনে নেয়া হয়, তবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. এর মিথ্যা প্রতিপন্নতা প্রমাণিত নয়। হতে পারে, তিনি হযরত ঈসা আ. এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, কিন্তু আনুগত্য আবশ্যক করে নেননি। যা তার দায়িত্বে জরুরীও ছিল না।

২. قال الطيبي رحمه الله يحتمل اجراء الحديث على عمومه اذ لا يبعد ان يكون طريان الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم سببا لقبول تلك الاديان وان كانت مفتوحة.

অর্থাৎ, হাদীসে উল্লেখিত আহলে কিতাব দ্বারা ব্যাপক উদ্দেশ্য এবং ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান উভয়কে অন্তর্ভূক্ত রাখা হবে। কারণ, ইয়াহুদী খ্রিষ্টানদের কারো ঈমান সত্ত্বাগতভাবে ধর্তব্য ও উপকারী ছিল না। কিন্তু হতে পারে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমানের বরকতে আল্লাহ তা'আলা রহিত দীনের উপরও সওয়াব দিয়ে দিবেন। যেমন, কিতাবুল ঈমানে একটি মাসআলা এসেছে যে, কাফির কুফরী অবস্থায় যদি নেক কাজ করে থাকে তবে মূলনীতির আলোকে সে নেক কাজ সম্পূর্ণ বেকার ও নাস্তির পর্যায়ভূক্ত। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের ফলে যদি ঈমান ও ইসলামের বরকতে কুফরী অবস্থার নেকীর উপর সওয়াব লাভ হয় তবে এটা মূলনীতি পরিপন্থী নয়। এমনিভাবে ইয়াহুদী খ্রিষ্টানদের ঈমান যদিও ধর্তব্য ও উপকারী ছিল না, কিন্তু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমানের বরকতে সেটাও ধর্তব্য হয়ে গেছে। এর রহস্য হল, যে ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়ন করে সে হযরত মূসা ও ঈসা আ. এর প্রতিও যথার্থ ঈমান আনে। এজন্য তার পূর্বেকার ঈমানও সম্মানজনক এবং বিশুদ্ধ হয়ে গেছে।

প্রশ্ন ঃ আহলে কিতাব দীন বিকৃত করেছিল, তারা বহু উপাস্যে বিশ্বাসী ছিল, কতগুলো মনগড়া আকীদা তৈরি করে রেখেছিল। অতএব তাদের নবীদের প্রতি ঈমান সওয়াবের যোগ্য কিভাবে হতে পারে?

উত্তর ঃ আল্লামা তীবী র. এর উপরোক্ত উক্তি দ্বারা এর উত্তর হয়ে গেছে। সেটি হল, তাদের নবীর প্রতি ঈমান যদিও সত্ত্বাগতভাবে ধর্তব্য ছিল না, তা সত্ত্বেও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমানের বরকতে সেটিও ধর্তব্য হয়ে যায়। যেমন, কুফর অবস্থার নেক কাজগুলো ধর্তব্য নয়, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের বরকতে কুফর অবস্থার নেক কাজগুলোর ফলেও সওয়াব পাবে।

মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী র. এর সুক্ষ্ম হিকমত ঃ

তিনি বলেন, আহলে কিতাবের যে ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়ন করে, তার মধ্যে সর্বদা দুটি ঈমান থাকে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের পূর্বে আহলে কিতাবের ঈমান স্বীয় সাবেক নবীর প্রতি ছিল স্বতন্ত্রভাবে। আর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ছিল অধীনস্থরূপে। কারণ, পূর্ববর্তী নবীগণ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভসংবাদ দিয়েছেন। যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছে তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান হয়েছে স্বতন্ত্র। পূর্ববর্তী নবীর প্রতি ঈমান হয়েছে অধীনস্থরূপে। যেহেতু তার ঈমান সর্বদা দুটি এজন্য তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দেয়া হয়। -ইরশাদুল কারী।

ثم قال عامر اعطيناكها الخ আমির শা'বী র. তাবিঈ। اعطيناكها শব্দে সম্বোধন কাকে করেছেন?

আল্লামা কিরমানী র. বলেন, আমির শা'বী র. আপন শিষ্য সালিহকে বলেছেন, তবে এটা ঠিক নয়। বিশুদ্ধ হল, এ সম্বোধন হয়েছে এক খোরাসানী ব্যক্তির দিকে। যিনি শা'বী র.কে বলেছেন যে, আমাদের এলাকায় বলা হয়, স্বীয় বাঁদীকে মুক্ত করে যে তাকে বিয়ে করে সে হল কুরবানীর উটের উপর বিনা ওযরে আরোহনকারীর মত খারাপ। এমনিভাবে এ বিয়েটিও খারাপ।

হযরত শা'বী র. উত্তর দিলেন, তারা ভুল বলে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ইরশাদ করেছেন, এরূপ ব্যক্তি দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। দ্রষ্টব্য ঃ বুখারী ঃ ১/৪৯০, মুসলিম, কিতাবুল ঈমান।

بغير شيئ ঃ অর্থাৎ, মুফত ঘরে বসে এ হাদীস তোমাকে শুনিয়ে দিলাম।

٧٤. بَاب عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

৭৪. পরিচ্ছেদঃ আলিম কর্তৃক মহিলাদের নসীহত করা ও (দীনি ইলম) শিক্ষা দেয়া।

যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন, পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে খাস তা'লীমের আলোচনা ছিল। তথা প্রতিটি ব্যক্তি নিজের পরিবারের লোকজনকে শিক্ষা দিবে। চাই স্বাধীন হোক, যেমন, স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি অথবা বাঁদী হোক।

শিক্ষার ব্যাপকতার দাবী এটাই। এবার এ অনুচ্ছেদে সাধারণ শিক্ষার আলোচনা রয়েছে। তথা মুসলিম শাসক ও রাষ্ট্রনায়ক মহিলা শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। কারণ, প্রতিটি স্বামী শিক্ষিত হয় না। অতএব রাষ্ট্রনায়ক ও শাসকের দায়িত্ব হল নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

২. হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী র. বলেন, পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে এবং মালিক কর্তৃক বাঁদীর শিক্ষাদানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা চাই। এবার বলতে চান যে, শুধু স্বামী ও মনিবেরই শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য নয় বরং যুগের শাসক, রাষ্ট্রনায়ক অথবা তার স্থলাভিষিক্তেরও এর জন্য ব্যবস্থা করা ও এর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা উচিত।

ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য, ইমাম মহিলা সমাবেশে উপদেশ শুনাবেন, দীনের জরুরী বিষয় শিখাবেন।

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته অবশ্য মহিলা শিক্ষা পুরুষদের চেয়ে আলাদা হওয়া উচিত। সহ শিক্ষা ফিতনা ও ক্ষতি থেকে শূণ্য নয়।

٩٦. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رض ــــ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ عَطَاءٌ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ وَبِلَالٌ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءٍ وَقَالَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৯৮. সুলায়মান ইবনে হারব র. ...... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সাক্ষ্য রেখে বলছি, অথবা পরবর্তী বর্ণনাকারী 'আতা র. বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস রা. কে সাক্ষী রেখে বলছি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঈদের দিন পুরুষের কাতার থেকে) বের হলেন আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন হযরত বিলাল রা.। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে করলেন যে, দূরে থাকার কারণে তাঁর আওয়াজ মহিলাদের কাছে পৌঁছেনি। তাই তিনি (পুনরায়) তাঁদের নসীহত করলেন এবং দান-খয়রাত করার উপদেশ দিলেন। তখন মহিলারা কানের দুল ও হাতের আংটি দিয়ে দিতে লাগলেন। আর বিলাল রা. সেগুলো তাঁর কাপড়ের আঁচলে নিতে লাগলেন ইসমাঈল র. আতা র., সূত্রে বলেন যে, ইবনে আব্বাস রা. বলেন ঃ আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সাক্ষী রেখে বলছি (এতে কোন সন্দেহ নেই)।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল فوعظهن وامرهن بالصدقة বাক্যে স্পষ্ট

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ইলম ঃ ২০, ১১৯, ১৩১, খুরূজুস সিবয়ান ঃ ১৩৩, আল ইলম বিল মুসল্লী ঃ ১৩৩, মাওইজাতুল ইমামিন নিসা ঃ ১৩৩, সালাত কাবলাল ঈদ ঃ ১৩৫, যাকাত ঃ ১৯২, ১৯৫, তাফসীর ঃ ৭২৭, নিকাহ ঃ ৭৮৯, লিবাস ঃ ৮৭৩, কালাইদ ওয়াস সাখাব ঃ ৮৭৩, আল কুরত লিন নিসা ঃ ৮৭৪, আল ই'তিসাম ঃ ১০৮৯।

ব্যাখ্যা ঃ خرج ومعه بلال রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের সময় যখন নামায ও খুতবা থেকে অবসর হন তখন মনে হল, মহিলারা পিছনে বসে আছে। সম্ভবত তাদের নিকট আমার আওয়াজ পৌঁছেনি। তখন তিনি হযরত বিলাল রা.কে সাথে নিয়ে পুরুষদের কাতার থেকে বেরিয়ে মহিলা সমাবেশে তাশরীফ নেন।

আল্লামা আইনী র. বলেন- ای خرج من بین صفوف الرجال الی صف النساء. عمدة : ۱۲۳/۲. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ওয়াজ করলেন ও তা'লীম দিলেন। উপদেশের শব্দরাজি অন্যান্য রেওয়ায়াতে আছে- "আমি তোমাদেরকে পারস্পরিক অভিশম্পাত এবং স্বামীর অবাধ্যতার কারণে জাহান্নামে বেশি দেখেছি। ওয়াজের উদ্দেশ্য হয় আখিরাতের ধ্যান প্রবল হয়ে যাওয়া। ওয়াজ দ্বারা উদ্দেশ্য নসীহত। আর আমর দ্বারা উদ্দেশ্য আহকাম শিক্ষা দান। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম বাণী হল উপদেশ, আর দ্বিতীয়টি হল শিক্ষাদান। তাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে সদকা খয়রাতের নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে মহিলারা স্বীয় কানের দুল (অথবা রিং) এবং হাতের অলঙ্কারাদি খুলে দিতে লাগল। আর হযরত বিলাল রা. কাপড়ে সেগুলো জমা করতে লাগলেন।

قُرْطٌ যে সব জিনিস কানে পরা হয়। যেমন, রিং, দুল, বালি, বন্ধকি।

যেহেতু মহিলারা স্বামীর অকৃতজ্ঞতা বেশী করে সেহেতু আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকা খয়রাতের নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ-

الصدقة تطفئ غضب الرب وان الصدقة تمحو كثيرا من الذنوب التي تدخل النار.

قال اسماعيل الخ এখান থেকে ইমাম বুখারী র. তা'লীকরূপে বর্ণনা করেন যে, এ হাদীসটি ইসমাঈল ইবনে উলাইয়্যা আইয়ূব সাখতিয়ানী র. এর নিকট বর্ণনা করেছেন, আইয়ূব বর্ণনা করেছেন, আতা ইবনে আবূ রাবাহ এর নিকট যে, হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন- اشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم এতে নিঃসন্দেহে বর্ণনা হয়েছে। কিন্তু প্রথম রেওয়ায়াতে সন্দেহ ছিল اشهد শব্দ আতা এর, না ইবনে আব্বাস রা. এর। এ তা'লীক দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইবনে আব্বাস রা. اشهد বলেছেন। অর্থাৎ, আতার শব্দ নয়। অবশ্য কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আতা ও ইবনে আব্বাস রা. উভয়েই اشهد শব্দে বর্ণনা করেছেন।

৭৫. بَاب الْحِرْصِ عَلَى الْحَدِيثِ

৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ হাদীসে নববীর প্রতি আগ্রহ।

যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য ঃ একটি হল, তলব, আরেকটি হল, حرص এটি তলবের তুলনায় খাছ। حرص এ কখনো তুষ্টি হয় না। এজন্য ইমাম বুখারী র. حرص শব্দ রেখে ইঙ্গিত করে দিলেন যে, ইলমে হাদীস

অন্বেষনে এরূপ লোভী হয়ে যাও যে, সর্বদা প্রতি মুহূর্তে আরো চাই আরো চাই শ্লোগান দিতে থাক। কারণ, ইলমের সমুদ্র অকূল।

পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে খাস সম্বোধনের উল্লেখ ছিল মহিলাদের প্রতি। এবার এ অনুচ্ছেদেও বিশেষ সম্বোধনের উল্লেখ রয়েছে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর প্রশ্নের উপর শুধু তাকে সম্বোধন করেছেন।

তাছাড়া পূর্বের অনুচ্ছেদে ব্যাপক শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপের বিবরণ ছিল। এবার এ অনুচ্ছেদে বিশেষভাবে হাদীস শাস্ত্রের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। যেন এটা হল, ব্যাপকের পর বিশেষ আলোচনা।

٩٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضـــ أَنَّهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ

৯৭. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ্ র. ...... হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামতের দিন আপনার সুপারিশ লাভে কে সবচেয়ে বেশি ভাগ্যবান হবে? (কার ভাগ্যে এ নেয়ামত হবে?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আবু হুরায়রা! আমি ধারণা করেছিলাম, এ বিষয়ে তোমার আগে আমাকে আর কেউ প্রশ্ন করবে না। কারণ, আমি দেখেছি, হাদীসের প্রতি তোমার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। (শুনে রাখ) কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভে সবচেয়ে ভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি যে আন্তরিকভাবে لا إله الا الله (محمد رسول الله) (পূর্ণ কালিমা তাইয়্যিবা) বলবে।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল لما رأيت من حرصك على الحديث. বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ইলম ঃ ২০, রিকাক ঃ ৯৭২।

ব্যাখ্যা ঃ قيل يا رسول الله الخ এখানে قيل শব্দ আছে, যদ্দারা বুঝা যায়, প্রশ্নকারী হযরত আবূ হুরায়রা রা. ছাড়া অন্য কোন সাহাবী। কিন্তু কোন কোন কপিতে قيل শব্দ নেই। হাফিজ আসকালানী র. বলেন, وهو الصواب তথা এটাই ঠিক। -ফাতহুল বারী।

আল্লামা আইনী র. বলেন- قال القاضي عياض قوله قيل وهم، الصواب سقوط قيل لما جاء عند الاصيلي والقابسي لان السائل هو ابو هريرة رضي الله عنه نفسه. عمدة.

সারকথা হল, প্রশ্নকারী স্বয়ং আবূ হুরায়রা রা.। যেমন, পরবর্তী বাক্য তা স্পষ্ট করে দিচ্ছে। لقد ظننت يااباهريرة! الخ তাছাড়া এ হাদীসটি ৯৭২ পৃষ্ঠায় আসছে সেখানে قيل শব্দের স্থলে قلت রয়েছে। এর দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, এখানে قيل শব্দ কোন বর্ণনাকারীর হস্তক্ষেপ।

ان لا يسألني عن هذا الحديث : يسألني এর লামের উপর পেশ ও যবর উভয়টি হতে পারে। কারণ, ان শব্দটি ظن এর পরে আসলে তাতে দুটি ছুরত তথা পেশ ও যবর উভয়টি জায়িয আছে।

احد এতে পেশসহকারে يسألني এর ফায়েল।

اول منك তাতে পেশ ও যবর উভয়টি হতে পারে। পেশ হবে احد এর صفت হিসেবে, অথবা বদলরূপে। আর যবর হবে ظرفية হিসেবে। -উমদা।

اسعد الناس بشفاعتي الخ কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ দ্বারা সে ব্যক্তি বেশি সফল ও সৌভাগ্যবান হবে যে ব্যক্তি অন্তর থেকে অথবা স্বীয় আন্তরিক খুলূসিয়্যাতের সাথে لا اله الا الله বলবে।

শাফা'আতের প্রকারভেদ ঃ

কিয়ামত দিবসে যে সব ঘটনা ও অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে, সেগুলোতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশের বিভিন্ন প্রকার হবে।

আল্লামা নববী র. লিখেছেন যে, সুপারিশ হবে পাঁচ প্রকার। -শরহে মুসলিম ঃ ১/১০৪, উমদা ঃ ২/১২৭।

১. হাশরের ময়দানের ভয়াবহতা থেকে মুক্তির। এ সুপারিশ হবে সমস্ত মানুষের জন্য। চাই মুমিন হোক বা কাফির, মুশরিক বা মুনাফিক সবার জন্য ব্যাপক থাকবে। যাতে দ্রুত হিসাব কিতাবের পর ভয়ঙ্কর কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ হয়।

২. কিছু সংখ্যক লোককে বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য সুপারিশ করবেন।

৩. কোন কোন জাহান্নাম উপযোগী ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবেন, তাদেরকে আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য।

৪. কোন কোন কাফিরের (যেমন, আবু তালিব) এর আযাব হালকা করার জন্য সুপারিশ।

৫. জান্নাতের যোগ্য কোন কোন ব্যক্তির দরজা বুলন্দ করার জন্য সুপারিশ। ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রশ্ন ঃ এ হাদীসে রয়েছে যে, প্রতিটি মুখলিস মুমিন আমার শাফা'আতের সৌভাগ্য অর্জন করবে। অন্য রেওয়ায়াতে আছে- شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. ترمذي : ٢/٦٦ باب ماجاء في الشفاعة.

বাহ্যত এ দুটি রেওয়ায়াতের মাঝে বিরোধ রয়েছে। কারণ, তিরমিযীর রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, কবীরা গুনাহকারীদের জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ হবে।

উত্তর ঃ বস্তুতঃ কোন বিরোধ নেই। বিরোধ তখন হত যদি তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়াতে সীমাবদ্ধতাবোধক কোন শব্দ হত। অথচ এমন কোন শব্দ নেই। অতএব বলা যাবে, এ অনুচ্ছেদের হাদীসের উদ্দেশ্য হল, যে ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে কালিমা পড়েছে, শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তি মূলক নয়, এরূপ সবার জন্য আমার শাফা'আত হবে।

পক্ষান্তরে شفاعتي لاهل لاكبائر من امتي এর অর্থ হল, আমার সুপারিশের উপকারিতা কবীরা গুনাহকারীদের ক্ষেত্রে বেশি স্পষ্ট হবে। কারণ, তারা স্বীয় বদ আমলের কারণে জাহান্নামে তড়পাতে থাকবে। শুধু মাত্র সিজদার স্থানগুলো ছাড়া তাদের পূর্ণ দেহ কালো কয়লার মত হয়ে যাবে। অতঃপর আমার সুপারিশের পর জাহান্নাম থেকে বের করে প্রথমে নহরুল হায়াতে ঢুকিয়ে তাদের দেহ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও স্পর্শকাতর বানিয়ে জান্নাতে ঢুকানো হবে। অতএব সুপারিশের প্রভাব তাদের ক্ষেত্রে বেশি স্পষ্ট হবে।

হযরত গাঙ্গুহী র. বলেন, তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়াতের অর্থ হল, আমার শাফা'আত কবীরা গুনাহকারীদের জন্যও হবে। (আল কাওকাবুদ দুররী ঃ ২/২৮২) অর্থাৎ, এ অর্থ নয় যে, কবীরা গুনাহকারীদের জন্যই কেবল সুপারিশ হবে। অতএব কোন বিরোধ রইল না।

হতে পারে যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার সুপারিশ প্রতিটি মুখলিস মুমিনের জন্য হবে, তখন কারো ধারনা হয়ে গেছে যে, যে মুমিন মুখলিস হবে সে কবীরা গুনাহকারী হতে পারে না। এজন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আমার শাফা'আত কবীরা গুনাহকারীর জন্যও হবে। والله اعلم

উপকারিতা ঃ কাযী ইয়ায র. বলেন, পূর্ববর্তী মহামনীষীগণ ও আহলে সুন্নতের ঐকমত্য রয়েছে যে, জাহান্নাম থেকে বের করার জন্য গুনাহগার পাপী তাপী ও কবীরা গুনাহকারীদের জন্য সুপারিশ হবে। কুরআনের অনেক আয়াত এবং অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির অনেক হাদীস দ্বারা এটি প্রমাণিত। খারিজীরা এবং কোন কোন মু'তাযিলা দরজা বুলন্দির জন্য শাফা'আত স্বীকার করেছে, কিন্তু জাহান্নাম থেকে বের করার শাফা'আত স্বীকার করেনি।

তাদের প্রমাণ- مَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَلَا شَفِيْعٍ يُطَاعُ এবং فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ ইত্যাদি।

অথচ এধরণের আয়াতগুলো কাফিরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ। হাদীস সমূহে সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, অনেক পাপী জাহান্নামে যাবে এবং সুপারিশের কারণে জাহান্নাম থেকে তাদের মুক্তি হবে। -ইমদাদুল কারী।

٧٦. بَاب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْتُبْهُ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ وَلَا تَقْبَلْ إِلَّا حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْتُفْشُوا الْعِلْمَ وَلْتَجْلِسُوا حَتَّى يُعَلَّمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا

৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ কিভাবে ইলম তুলে নেয়া হবে

বুখারী ঃ ২০

খলীফা হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র. মদীনা মুনাওয়ারার বিচারপতি আবূ বকর ইবনে হাযম র.-এর কাছে এক পত্রে লিখেন ঃ খোঁজ কর, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যে হাদীস পাও তা লিখে নাও। আমি ইলম লোপ পাওয়ার এবং আলিমদের বিদায় নেয়ার আশংকা করছি। জেনে রাখ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করা হবে না এবং প্রত্যেকের উচিত ইলমের প্রচার-প্রসার করা, আর তারা যেন একত্রে বসে (ইলমের চর্চা করে), যাতে যে জানে না সে শিক্ষা লাভ করতে পারে। কারণ, ইলম গোপন করলেই নষ্ট হয়ে যায় বিলুপ্ত হবে না।

যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য ঃ

পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে হাদীসের প্রতি লালায়িত হওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। হাদীস হল সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। এবার এ অনুচ্ছেদে ইলমের বুলন্দ মর্তবার বিবরণ রয়েছে। উভয়ের মধ্যে মুকাবিলা রয়েছে এবং এ হিসেবে উভয়ের মধ্যে মিল রয়েছে। -উমদা।

২. অথবা বলা হবে, পূর্বের অনুচ্ছেদে হাদীস অর্জনে লালায়িত হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যার উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, এ পন্থায় ইলম দুনিয়াতে অবশিষ্ট থাকতে পারে। এবার এ অনুচ্ছেদে ইলম টিকে থাকার অতিরিক্ত পন্থার বিবরণ রয়েছে। সেগুলো হল, শিক্ষাধারা কায়েম ও অব্যাহত রাখা। ইলমী মজলিস ও প্রচুর শিক্ষাকেন্দ্র কায়েম করা। দীন প্রচারে তনুমন দিয়ে উলামায়ে কিরামের প্রস্তুত থাকা।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র. ঃ

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র.এর বিস্তারিত জীবনী ভূমিকায় এসেছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

সারকথা, ৮৪ বছর বয়সে ১০১ হিজরীতে তাঁর ওফাত হয়েছে।

الى بكر بن حزم الخ তিনি হলেন আবূ বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযম। তার নাম হল, আবূ বকর, উপনাম আবূ মুহাম্মদ। তিনি তাবিঈ। তৎকালীন খলীফা হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র. এর পক্ষ থেকে মদীনা তাইয়্যিবার শাসক ও বিচারপতি ছিলেন। এ কারণে তাকে বিশেষভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সংকলনের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর ওফাত হয়েছে ১২০ হিজরীতে হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের শাসনামলে। বাকী বিস্তারিত আলোচনার জন্য ভূমিকায় 'হাদীস সংকলন' শিরোনামে দ্রষ্টব্য।

٩٨. حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِذَلِكَ يَعْنِي حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى قَوْلِهِ ذَهَابَ الْعُلَمَاءِ

৯৮. আলা' ইবনে আবদুল জব্বার র. .... আবদুল্লাহ্ ইবনে দীনার র.-এর সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতে উমর ইবনে আবদুল আযীয র.-এর উপরোক্ত হাদীসে আলিমগণের বিদায় নেয়া পর্যন্ত বর্ণিত আছে।

অবশ্য এখানে পরবর্তী বাক্য لايقبل الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم উমর ইবনে আবদুল আযীয র. এর বাক্য এবং 'আলার রেওয়ায়াতে না থাকার সম্ভাবনা আছে, ইমাম বুখারী র. অন্য কোন সনদে তা জানতে পেরেছেন। আবার হতে পারে একদম শুরু থেকেই এটি হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র. এর বাক্য নয়। এটাই স্পষ্টতর। হাদীস সংকলনে ভূমিকায় সবিস্তারে আলোচনা এসেছে।

٩٩. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضـــ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا قَالَ الْفِرَبْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ

৯৯. ইসলামঈল ইবনে আবূ উয়াইস র. ...... হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার অন্তর থেকে ইলম বের তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার অন্তর থেকে ইলম বের করে উঠিয়ে নেবেন না; বরং আলিমদের তুলে নেয়ার মাধ্যমেই ইলম উঠিয়ে নেবেন। যখন কোন আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা জাহিলদেরই নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। তাদের জিজ্ঞেস করা হবে, তারা না জেনেই ফতওয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে, আর অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে।

ফিরাবরী র. বলেন, বুখারীর রাবী আব্বাস-কুতাইবা-জারীর র. ..... হিশাম সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ولكن يقبض العلم بقبض العلماء বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ইলম ঃ ২০, ই'তিসাম ঃ ১০৮৬, মুসলিম।

আলিমদের স্থলাভিষিক্ত জাহিল হওয়া ইলম উঠে যাওয়ার নিদর্শন ঃ

ইমাম বুখারী র. ইলম তুলে নেয়ার উপর আরেকটি প্রমাণ পেশ করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. এর রেওয়ায়াত দ্বারা। তিনি বলেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন, আল্লাহ তা'আলা এভাবে ইলম তুলে নিবেন না যে, উলামায়ে কিরামের বক্ষ থেকে ইলম বের করে ফেলবেন বরং এর পন্থা হবে, উলামা শেষ হয়ে যাবেন এবং তাদের শূণ্যস্থান পূর্ণ করার জন্য উলামা জন্ম নিবেন না। জাহিলরা আলিমদের স্থানে বসবে এবং গোমরাহী ছড়াবে।

এ হাদীসের সারমর্ম হল, অন্তরের অর্জিত ইলম ছিনিয়ে নেয়া হবেনা বরং এর পন্থা হবে উলামা মরে যাবেন এবং তাদের সাথে সাথে তাদের ইলমও শেষ হতে থাকবে।

এ আফসোসজনক মহাদুর্ঘটনা আজকাল পরিলক্ষিত হচ্ছে। বড় বড় ভাল ভাল আলিম নিজের সন্তানদেরকে বি. এ, এম. এ, পড়াচ্ছেন। সন্তান মেট্রিক পাশ করে দাড়ি কামায়, সাথে থাকে, খানাপিনা খায়, আলিম সাহেব তার প্রশংসায় পঞ্চমূখ। অথচ এক মুষ্ঠি পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব। যে দাড়ি কামায় সে প্রকাশ্য ফাসিক, কিন্তু উচ্চ পর্যায়ের আলিম তাকে বলা হয়। লম্বা লম্বা তাকরীর ছাড়েন, কিন্তু সন্তানদেরকে ইলমে দীন থেকে বঞ্চিত রেখে বে-আমল ও বদ আমল দেখেও তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন না, সতর্কও করেন না। আরো মারাত্মক কথা হল, আপন কন্যাদেরকেও বি. এ, এম. এ, পর্যন্ত পড়ান। আত্মীয়তার সম্পর্কের জন্য এরূপ ফাসিকদেরই তালাশ করেন। আশ্চর্যের বিষয়!

মুসনাদে আহমদ ও তাবারানীতে হযরত আবূ উমামা রা. সূত্রে একটি হাদীস রয়েছে, বিদায় হজ্বে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- خذوا العلم قبل ان يقبض তথা ইলম তুলে নেয়ার পূর্বে তা অর্জন কর। এতদশ্রবণে এক বেদুঈন আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইলম কিভাবে তুলে নেয়া হবে? তিনি ইরশাদ করলেন- الا ان ذهاب العلم ذهاب حملته তথা মনে রেখ! ইলম উঠে যাওয়া মানে ইলমের ধারক বাহকগনের ওফাত। একথাটি তিনি তিনবার বললেন।

ইবনুল মুনাইয়্যির র. বলেন-

محو العلم من الصدور جائز في القدرة الا ان هذا الحديث دل على عدم وقوعه. عمدة

আল্লাহ তা'আলা ইলম বক্ষ থেকে বের করতে সক্ষম, কিন্তু এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তা করবেন না।

প্রশ্ন ঃ উপরোক্ত রেওয়ায়াত দ্বারা এটাই স্পষ্ট যে, ইলম সিনা থেকে বের করা হবে না, কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায়, কুরআনে কারীম বক্ষ থেকে বের করা হবে। অতএব উভয়ের মাঝে বিরোধ হয়ে গেল।

উত্তর ঃ তত্ত্বজ্ঞানীদের রায় হল, উভয় রেওয়ায়াতের মাঝে কোন বিরোধ নেই। কারণ, প্রথম দিকে ইলম তুলে নেয়ার পন্থা এই হবে যে, আলিমগণ বিদায় নিতে থাকবেন। তাদের সাথে সাথে ইলমও শেষ হতে থাকবে। আর ইবনে মাজাহ প্রমুখের রেওয়ায়াত দ্বারা যে বুঝা যায়, ইলম মিটিয়ে দেয়া হবে। সেটা আকস্মিকভাবে কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হবে। কারণ, কিয়ামত ততক্ষন পর্যন্ত কায়েম হবে না, যতক্ষন

পর্যন্ত কোন মুমিন বাকী থাকবে। সারকথা, উভয় ছুরত দুটি আলাদা আলাদা সময়ে হবে। কাজেই কোন বিরোধ নেই।

◆ শাইখুল হাদীস র. বলেন, ইমাম বুখারী র.এর মূলনীতি হল, যে রেওয়ায়াত তাঁর মতে সহীহ হয় না, তা প্রত্যাখ্যানের দিকে ইঙ্গিত করে দেন। যেহেতু অন্তর থেকে (ইলম) মিটিয়ে দেয়ার রেওয়ায়াত ইমাম বুখারী র. এর মতে সহীহ নয়, সেহেতু كيف يقبض العلم শিরোনাম কায়েম করে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর রেওয়ায়াত এনে ইঙ্গিত করেছেন যে, ইলম তুলে নেয়ার পন্থা এই হবে। দ্বিতীয় রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়। والله اعلم

قال الفربري وهو ابو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر. عمدة.

ইনি আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ফিরাবরী র.। ইমাম বুখারী র. এর শিষ্য এবং সহীহ বুখারীর রাবী। আর যেহেতু তিনি ইমাম বুখারী র. থেকে সহীহ বুখারী কিতাব দু বা তিনবার অধ্যয়ন করেছেন এবং ইমাম বুখারী র. এর ইনতিকালের পর ৬৪ বছর পর্যন্ত আমৃত্যু সহীহ বুখারী শরীফের দরস দিয়েছেন, এজন্য তাঁর কপি সবচেয়ে বেশি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ।

তাঁর অর্থাৎ, আল্লামা ফিরাবরী র. এর রীতি হল যে, যখন কোন হাদীস অনুচ্ছেদের সমর্থনে ইমাম বুখারী র. ছাড়া অন্য কোন ইমামর সাথে মিলে, তবে তিনি তাও বর্ণনা করেন। এই রেওয়ায়াতও সেসব হাদীসের অন্তর্ভূক্ত, যা ফিরাবরী র. ইমাম বুখারী র. থেকেও শুনেছেন এবং অন্য শায়খ থেকেও শুনেছেন এজন্য তাও তিনি এখানে বর্ণনা করেছেন।

٧٧. بَاب هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ

৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ ইলম শিক্ষার জন্য মহিলাদের ব্যাপারে কি বিশেষ দিন নির্ধারণ করা যায়?

অর্থাৎ, ইমামের জন্য মহিলা শিক্ষার জন্য কোন দিন নির্ধারণ করা সমীচীন কিনা?

যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য ঃ পূর্বের অনুচ্ছেদে ইলম তুলে নেয়ার ধরণের বিবরণ ছিল, যার উপকারিতায় ইলম প্রসারে উদ্বুদ্ধ করণ ও ইলমী মজলিস কায়েম করার তাকিদ রয়েছে। এবার ইমাম বুখারী র. এ অনুচ্ছেদে এরূপ হাদীস বর্ণনা করছেন, যাতে ইলমের হেফাজত ও প্রসারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। স্পষ্ট বিষয় যে, তা'লীমে ব্যাপকতা উদ্দেশ্য। বিশেষত মাতৃস্নেহকোল শিশুদের প্রথম শিক্ষাক্ষেত্র। সেহেতু নারী শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য মহিলারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আরয করল যে, তাদের শিক্ষার জন্য যেন আলাদা দিন নির্ধারণ করা হয়। কারণ, মহিলারা স্বীয় বিশেষ মাসআলা মাসায়িল জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে লজ্জা অনুভব করবে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আবেদনে নির্ধারিত দিনে তাশরীফ আনয়নের প্রতিশ্রুতি দেন এবং তাদের জন্য স্বতন্ত্র সময় নির্ধারণ করেন।

١٠٠. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضـــ قَالَتْ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ

فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاثْنَتَيْنِ فَقَالَ وَاثْنَتَيْنِ

১০০. আদম র. ..... আবূ সাঈদ খুদরী র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মহিলারা একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলল, পুরুষেরা আপনার কাছে আমাদের চেয়ে (উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে) প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তাই আপনি নিজে আমাদের জন্য একটি (বিশেষ) দিন ধার্য করে দিন। তিনি তাদের বিশেষ একটি দিনের ওয়াদা করলেন; সে দিন তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের ওয়াজ-নসীহত করলেন ও নির্দেশ দিলেন। তিনি তাদের যা যা বলেছিলেন, তার মধ্যে একথাও ছিল যে, তোমাদের মধ্যে যে মহিলা তিনটি সন্তান আগেই পরকালে পাঠাবে, তারা তার জন্য (আখিরাতে) জাহান্নামের পর্দাস্বরূপ হয়ে থাকবে। তখন এক মহিলা বলল, আর দু'টি পাঠালে? তিনি বললেন ঃ দু'টি পাঠালেও তা হবে।

١٠١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضـــ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ

১০১. মুহাম্মদ ইবনে বাশশার র. ..... হযরত আবূ সাঈদ রা. সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (অন্য সনদে) আবদুর রহমান আল-আসবাহানী র. ...... হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এরূপ তিন সন্তান, যারা এখনো সাবালক হয়নি।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল فوعدهن يوما لقيهن فيه বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ইলম ঃ ২০, ২১, জানায়িয ঃ ১৬৭, ই'তিসাম ঃ ১০৮৭।

উপকারিতা ঃ ইমাম বুখারী র. সহীহ বুখারীতে অধিকাংশ সময় প্রতিটি অনুচ্ছেদে একটি রেওয়ায়াত আনেন। কিন্তু কখনো কোন বিশেষ স্বার্থে একাধিক রেওয়ায়াতও উল্লেখ করেন। এ অনুচ্ছেদেও প্রথম রেওয়ায়াতের পর দ্বিতীয় রেওয়ায়াতটি এনেছেন দুটি কারণে।

১. প্রথম রেওয়ায়াতে ابن الاصبهاني অস্পষ্ট ছিল। দ্বিতীয় রেওয়ায়াতে এ অস্পষ্টতা দূরে করে দিয়েছে যে, এটি দ্বারা عبد الرحمن بن الاصبهاني উদ্দেশ্য।

২. প্রথম রেওয়ায়াতে তিনটি শিশুর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু না বালিগ হওয়ার শর্ত নেই। দ্বিতীয় রেওয়ায়াতে হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর সূত্রে এই শর্ত রয়েছে যে, তারা বালিগ হয়নি। যদ্দারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হাদীসের বর্ণিত সুসংবাদ তার জন্য, যার না বালিগ বাচ্চাদের ইনতিকাল হয়েছে এবং সে ধৈর্য্যধারণ করেছে।

প্রশ্ন ঃ لم يبلغوا الحنث বন্ধন দ্বারা প্রশ্ন হয় যে, বালিগ ও যুবক হয়ে মরলে এ সওয়াব পাবে না, অথচ বালিগ কর্মক্ষম হয়ে মরলে কষ্ট বেশি হয়।

উত্তর ঃ

১. না বালিগ বাচ্চা থেকে মা বাবার অবাধ্যতা কল্পনা হয় না। ফলে তার মৃত্যুর বেদনা বেশি হয়।

২. বিশুদ্ধতম উত্তর হল, এখানে দুটি স্বতন্ত্র বিষয় রয়েছে।

১. মুসিবত কাফফারা হওয়া।

২. সুপারিশের।

নিঃসন্দেহে যুবক সন্তানের (মৃত্যুর ফলে) যে কষ্ট হয়, তদ্বারা অবশ্যই গুনাহ মাফ হবে, তবে এটি কাফফারার অন্তর্ভূক্ত। কারণ, মুমিনের কোন মনোকষ্ট বা মুসিবত হলে তা গুনাহের জন্য কাফফারা হয়।

মোটকথা, কাফফারার হুকুম এটাই যে, কষ্ট যত বেশি হবে, সে পরিমাণ গুনাহের কাফফারা হবে। আর এই মাগফিরাতের প্রতিশ্রুতি মাতা-পিতা উভয়ের জন্যই। শুধু মায়ের জন্য নয়। এজন্য সহীহ বুখারীর কিতাবুল জানায়িযে আছে- ما من الناس من مسلم এসব হাদীসে সুপারিশের বিবরণ রয়েছে। যেমন, অন্য হাদীসে এসেছে, বাচ্চা আল্লাহ তা'আলার সামনে চিৎকার করতে আরম্ভ করবে, জিদ করতে শুরু করবে যে, আমি একা জান্নাতে যাব না। আমার মাতা-পিতাকে আমার সাথে পাঠাও। এটা বড়দের থেকে হতে পারে। এজন্য শিশু হওয়া শর্ত। এজন্য পার্থিব জগতেও দেখা যায়, মাতা-পিতা বাচ্চার জিদ এক দু বার নয় বরং শতবার পূর্ণ করেন এবং বাচ্চাদেরকে খারাপ মনে হয় না। কিন্তু এর পরিপন্থী বড় যুবক যদি বাচ্চাদের ন্যায় জিদ ধরতে আরম্ভ করে তবে তার পরোয়া করবে কে? বরং সবাই তার এই অসমীচীন আচরণে হাসবে।

তাছাড়া যুবক বালিগ তো নিজের হিসাব কিতাবের চিন্তায় থাকবে। নিজেকে নিয়ে ফিকির করবে। সে কি সুপারিশ করবে?

ব্যাখ্যা ঃ وعن عبد الرحمن بن الاصبهاني এটি তা'লীক নয়, বরং মুত্তাসিল রেওয়ায়াত। এর عطف পূর্বেকার عبد الرحمن এর উপর। উদ্দেশ্য হল, শু'বা এ রেওয়ায়াতটি আবদুর রহমান আসবাহানী থেকে দু ভাবে বর্ণনা করেন। প্রথম সনদ হল-

عن عبد الرحمن بن الاصبهاني عن ذكوان عن ابي سعيد الخ

আর দ্বিতীয় সনদ হল-

شعبه عن عبد الرحمن بن الاصبهاني قال سمعت ابا حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه

অতএব হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর রেওয়ায়াত মুত্তাসিল, তা'লীক নয়। -ইমদাদুল বারী।

٧٨. بَاب مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَفْهَمْهُ فَرَاجَعَ فِيهِ حَتَّى يَعْرِفَهُ

৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ কোন কথা শুনে না বুঝলে জানার জন্য পুনরায় জিজ্ঞেস করা।

যোগসূত্র ঃ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে নারী শিক্ষা ও তাদের ওয়াজের উল্লেখ ছিল। মহিলা সাধারণত কম জ্ঞান সম্পন্ন হয়। ফলে বুঝ কম থাকার কারণে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হয়। আর এ অনুচ্ছেদেও বুঝার উদ্দেশ্যে স্বীয় উস্তাদ ও শায়খের নিকট দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করার কথা রয়েছে। অর্থাৎ, বুঝার জন্য দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করা যায়।

উদ্দেশ্য ঃ ইমাম বুখারী র.এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট। যদি ছাত্র উস্তাদের কথা ভালরূপে না বুঝে তবে না বুঝে মজলিস থেকে যাবে না, বরং পূনরায় জিজ্ঞেস করে প্রশান্তি লাভ করবে।

২. এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, পূনরায় জিজ্ঞেস করলে এতে আলিমের সাথে বে আদবী এবং ছাত্রের জন্য হেয়তার বিষয় নয়। এজন্য আলিমেরও তা অপছন্দ না করা উচিত। না ছাত্রের সংকোচ মনে করা সমীচীন। -উমদাহ। والله اعلم

١٠٢. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رضــ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيْئًا لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ قَالَتْ عَائِشَةُ رضــ فَقُلْتُ أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا قَالَتْ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْضُ وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ

১০২. সাঈদ ইবনে আবূ মারইয়াম র. ...... হযরত ইবনে আবূ মুলাইকা র. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী ‘হযরত আয়েশা রা. কোন কথা শুনে বুঝতে না পারলে ভালভাবে না বুঝা পর্যন্ত বারবার প্রশ্ন করতেন। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “(কিয়ামতের দিন) যার হিসাব নেয়া হবে তাকে আযাব দেয়া হবে।” হযরত আয়েশা রা. বলেন ঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্ তা‘আলা কি ইরশাদ করেননি-

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا

(তার হিসাব সহজেই নেয়া হবে) (ইনশিক্বাক্ব ঃ ৮)। তখন তিনি বললেন ঃ এটা হিসাব নয়, এটা তো কেবল হিসাব পেশ করা। কিন্তু যার হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নেয়া হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه. বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ইলম ঃ ২১, তাফসীর ঃ ৭৩৬, রিকাক ঃ ৯৬৭, ৯৬৮।

ব্যাখ্যা ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা.এর রীতি ছিল, যদি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কথা না বুঝতেন তবে পুণরায় জিজ্ঞেস করতেন। যতক্ষন পর্যন্ত পূর্ণরূপে বুঝে না আসত রীতিমত জিজ্ঞেস করতে থাকতেন। একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- من حوسب عذاب কিয়ামতের দিন যার কাছ থেকে হিসাব নেয়া হবে সে আযাবে পতিত হবে। হযরত আয়েশা রা. একথাটি বুঝতে পারেননি। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) আল্লাহ তা‘আলা কি فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا বলেননি? রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ইরশাদ ও কুরআনে হাকীমের সুস্পষ্ট নসে হযরত আয়েশা রা. এর নিকট বিরোধ মনে হয়েছে। সূরা ইনশিকাকে ইরশাদে রব্বানী রয়েছে-

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَه بِيَمِيْنِه فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِه مَسْرُوْرًا. جزء ٣٠

যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, তার থেকে সহজ হিসাব নেয়া হবে, সে তার পরিবার ও সংশ্লিষ্টজনের নিকট আনন্দিত ও প্রফুল্ল অবস্থায় ফিরে আসবে।

সহজ হিসাব হল, কথায় কথায় ধরা হবে না। শুধু আমলনামা পেশ হবে। কোন তর্ক বিতর্কে ফেলা হবেনা। না শাস্তির ভয় থাকবে, না ক্রোধের ভয়। নেহায়েত নির্ভয় ও প্রশান্তির সাথে নিজের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও মুসলমান ভাইদের কাছে আনন্দ ফুর্তি করতে করতে আসবে।

বিরোধের কারণ ছিল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাপক আকারে من حوسب عذب বলেছেন। আর কুরআনে হাকীম দ্বারা বুঝা যায়, ডান হস্তে আমলনামা প্রাপ্ত কোন কোন ব্যক্তি থেকে সহজ হিসাব নেয়া হবে। এজন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদের ব্যাপকতা হযরত আয়েশা রা. এর জন্য প্রশ্নের কারণ হয়েছে। এধরণের একটি ঘটনা রেওয়ায়াত সমূহে আছে। যখন-

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ. سورة الانعام ٨٢

(যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা আর তারাই সুপথপ্রাপ্ত।) আয়াত নাযিল হয়, তখন সাহাবায়ে কিরাম রা. এর নিকট এটি অত্যন্ত ভারি মনে হয় এবং প্রশ্ন হয়। এজন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করেন, اينا لم يظلم؟ আমাদের কে আছে যে জুলুম করেনি? তাহলে তো আমরা সবাই আল্লাহর আযাব থেকে অনিরাপদ, হেদায়াত থেকেও বঞ্চিত হয়ে গেলাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এ আয়াতে জুলুম দ্বারা উদ্দেশ্য শিরক, সাধারণ গুনাহ নয়। বুখারী ঃ ১/১০।

মোটকথা, হযরত আয়েশা রা. এর মনে من حوسب عذب এর ব্যাপারে প্রশ্ন এসেছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে ইরশাদ করেছেন- انما ذلك العرض এটাতো কেবল আমল নামা পেশ করা হবে। অর্থাৎ, اى عرض افعال العبد عليه مع التبشير بالغفران উদ্দেশ্য হল, কিয়ামতের দিন বিভিন্ন ধরণের হিসাব হবে, এক হিসাব তো হল, আমলনামা সামনে পেশ করা হবে, কোন প্রকার পাকড়াও ও জিজ্ঞাসাবাদ হবে না যে, সিনেমা কেন দেখেছ? পরনিন্দা কেন করেছ? সম্পূর্ণ বিতর্ক ছাড়া ক্ষমার সুসংবাদ সহ বান্দার সামনে তার গুনাহ-খাতাগুলো পেশ করা হবে। এই সহজ হিসাব হল, عرض বা আমল পেশ করা। আরেক হিসাব হল, তাতে বিতর্ক হবে, তখন মুক্তি পাওয়া কঠিন হবে। এ জিজ্ঞাসাবাদটিই একটি আযাব, যার ফলে মানুষ হুশ হারিয়ে ফেলবে।

٧٩. بَاب لِيُبَلِّغْ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رض عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে ইলম পৌঁছে দেবে হযরত ইবনে আব্বাস রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তা বর্ণনা করেন।

যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন, পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদে উস্তাদ থেকে শ্রুত বিষয় বুঝা এবং সংরক্ষন করার জন্য ছাত্র অথবা শ্রোতা কর্তৃক উস্তাদের নিকট বারবার জিজ্ঞেস করার উল্লেখ রয়েছে। فكان المراجع كان كالغائب عند سماعه অর্থাৎ, مراجع اليه তথা উস্তাদ ও শায়েখের পক্ষ থেকে مراجع তথা ছাত্র ও শ্রোতাকে তাবলীগ করা হয় এবং তার মর্যাদা ও অনুপস্থিত ব্যক্তির মতই ছিল। কারণ, মজলিসে বাহ্যত উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সে শুনে বুঝতে পারেনি। এজন্য পূনরায় জিজ্ঞেস করার সুযোগ এসেছে। অতএব উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যেন মজলিস থেকে অনুপস্থিত।

ইমাম বুখারী র. এবার এ অনুচ্ছেদেও একথা বর্ণনা করছেন যে, উপস্থিত ব্যক্তির দায়িত্ব হল, অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে দীনের কথা পৌঁছে দেয়া। এ অনুচ্ছেদ দ্বারা ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য একটি বিরাট সংশয়ের অপনোদন। সন্দেহটি হল, হাদীস শরীফে আছে- بلغوا عني ولو اية এর দ্বারা বহ্যত বুঝা যায় তাবলীগ বা প্রচার শুধু কুরআনের আয়াতের সাথে বিশেষিত। ইমাম বুখারী র. ليبلغ العلم শিরোনাম কায়েম করে ইঙ্গিত করেছেন যে, উদ্দেশ্য হল, ইলমের প্রচার। চাই কুরআনের আয়াত হোক অথবা হাদীস শরীফ ।

قال له ابن عباس الخ هو طرف من حديث وصله في الحج في باب الخطبة ايام منى ٢٣٤.

এটি হল হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের একটি অংশ। এটিকে তিনি কিতাবুল হজ্বে ٢٣٤. باب الخطبة في ايام منى صـــ এ মাওসূলরূপে উল্লেখ করেছেন।

١٠٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ رضـــ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ عَمْرٌو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ

১০৩. আবদুল্লাহ্ ইবনে ইউসুফ র. .... হযরত আবূ শুরাইহ্ র. থেকে বর্ণিত যে, তিনি 'আমর ইবনে সাঈদ (ইয়াযীদের পক্ষ থেকে মদীনার শাসক)-কে বললেন, যখন তিনি মক্কায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করছিলেন- 'হে আমীর! আমাকে অনুমতি দিন, আমি আপনাকে এমন একটি হাদীস শুনাব, যা মক্কা বিজয়ের পরের দিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন। আমার দু' কান তা শুনেছে, আমার অন্তর তা স্মরণ রেখেছে, আর আমার দু' চোখ তা দেখেছে। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করে বললেন ঃ মক্কাকে আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করেছেন, কোন মানুষ তাকে হারাম করেনি। (এই আদব-ইহতিরাম আল্লাহর হুকুমেই) তাই যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য সেখানে রক্তপাত করা এবং সেখানকার কোন গাছপালা কাটা হালাল নয়। কেউ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর (সেখানকার) লড়াইকে ছুতা হিসেবে পেশ করে তবে তোমরা বলে দিও যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে এর অনুমতি দিয়েছিলেন; কিন্তু তোমাদের অনুমতি দেন নি। (রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,) আমাকেও সে দিনের কিছু সময়ের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। তারপর আগের (মক্কা বিজয়ের পূর্বের) মত আজ আবার এর নিষেধাজ্ঞা ফিরে এসেছে। উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে (এ বাণী) পৌঁছে দেয়।' তারপর আবূ শুরাইহ্ র.-কে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার এ হাদীস শুনে আমর কি বলল?' (আবু শুরাইহ্ র. উত্তর দিলেন) সে বলল ঃ 'হে আবূ শুরাইহ্! (এ বিষয়ে) আমি আপনার চেয়ে

ভাল জানি। মক্কা কোন বিদ্রোহীকে, কোন চুরি বা খুনের পলাতক আসামীকে এবং কোন সন্ত্রাসীকে আশ্রয় দেয় না।'

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল وليبلغ الشاهد الغائب বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ইলম ঃ ২১, তাফসীর ঃ ৭৩৬, রিকাক ঃ ৯৬৭, ৯৬৮।

ব্যাখ্যা ঃ عن ابي شُرَيح শব্দটির শীনের উপর পেশ রা এর উপর যরব ও শেষে হা হবে। তিনি হলেন খুওয়াইলিদ ইবনে আমর ইবনে সাখ্‌র খুযাঈ কা'বী সাহাবী। তাঁর ওফাত ৬৮হিজরীতে। বুখারীতে তাঁর ৩টি হাদীস রয়েছে। -কাসতাল্লানী।

হযরত আবূ শুরাইহ রা. একজন সুমহান সাহাবী। মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ওয়াকিদী র. বলেন, আবূ শুরাইহ রা. ছিলেন মদীনার অন্যতম একজন জ্ঞানী ব্যক্তি। -উমদাহ।

انه قال لعمرو بن سعد আমর শব্দটির আইনের উর যবর। আল্লামা আইনী র. বলেন, তিনি হলেন, আমর ইবনে সাঈদ ইবনে 'আস ইবনে উমাইয়্যা কুরাশী উমাবী। আশদাক্ব নামে পরিচিত। তিনি সাহাবী নন এবং ভাল তাবিঈদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না। মানে সাহাবীতো সুনিশ্চিতরূপেই নন, তবে তাবিঈ হলেও কিন্তু ভাল তাবিঈ নন। কোন কোন আকাবির 'শয়তান ফাসিক'ও লিখেছেন।

মোটকথা, এখানে সহীহ বুখারীতে তার আলোচনা অধীনস্থরূপে এসে গেছে। হাদীসের বর্ণনাকারী হিসেবে নয়। কারণ, কেউ ভুলে এই ফাসিককে বুখারীর একজন রাবী মনে করতে পারেন।

ইমাম বুখারী র. ইলমের প্রচারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রসিদ্ধ ঘটনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। এর সম্পর্ক সিফফীন যুদ্ধের সাথে। লেখকও প্রয়োজন মত নাসরুল বারী কিতাবুল মাগাযীতে এর বিবরণ দিয়েছেন। দ্রষ্টব্য ঃ নাসরুল বারী, কিতাবুল মাগাযী ঃ ১৬৫।

ঘটনা এই ছিল যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতি সাইয়্যিদিনা ইমাম হাসান রা. হযরত মুআবিয়া রা. এর সাথে সন্ধি করে ফেলেন। খিলাফত তাঁর হাতে অর্পন করেন। অতঃপর মুসলমানদের ঐক্য হয়ে যায়। ইসলামী বিজয়ের ধারা যা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তা আবার শুরু হয়। হযরত মুআবিয়া রা.কে উপদেষ্টাগণ বুঝালেন, বর্তমানে আপনি সর্বসম্মতিক্রমে মুসলমানদের খলীফা। আপনি যদি স্বীয় জীবদ্দশায় কাউকে শাসক বানিয়ে না যান তাহলে আপনার ইনতিকালের পর মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ হবে খুনাখুনি ও যুদ্ধ পরিস্থিতিও সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য আপনার জীবদ্দশায় ইয়াযীদকে শাসক বানানো সমীচীন। যদিও শাসক নির্ধারণের এই পদ্ধতি ইসলামী নয় (এ বক্তব্য সঠিক নয়। বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন আমীর মুয়াবিয়া আওর তারিখী হাকায়েক বা এর অনুবাদ ইতিহাসের কাঠগড়ায় আমীর মুয়াবিয়া রা.। -অনুবাদক।) এবং ইয়াযীদের আভ্যন্তরীন অবস্থা হযরত মুআবিয়া রা. জানতেন না, সেহেতু খুনাখুনি ও যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং বাকবিতণ্ডা ও বিচ্ছিন্নতা থেকে বাচার জন্য হযরত মুআবিয়া রা. ইয়াযীদকে শাসক নিযুক্ত করেন। যেন এখান থেকে শাসক নিযুক্তির প্রথা শুরু হয়। ফলে অনেক লোক যাঁদের মধ্যে ইসলামী অঞ্চলের গভর্ণরগণও ছিলেন। ইয়াযীদের শাসকত্ব মেনে নেন। কিন্তু সাইয়্যিদিনা ইমাম হুসাইন, মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর, ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এই খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেননি। -আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ঃ ৮/৭৯।

হযরত মুআবিয়া রা. এর ওফাতের পর যখন ইয়াযীদ সিংহাসনে আরোহন করে তখন সে মদীনাবাসীদের থেকে বাইআত নিতে চায়। বিশেষত সে সব মনীষী থেকে হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর তো প্রথমেই আমীর মুয়াবিয়া রা. এর জীবদ্দশাতেই ওফাত লাভ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রা. ও

ইবনে উমর রা. হযরত আমীরে মুআবিয়া রা. এর পর বাইআত হয়ে যান। হযরত হুসাইন রা. কুফাবাসীর দাওয়াতে কুফা অভিমুখে রওয়ানা হন। এরপর তার সাথে যে সব (হৃদয় বিদারক) ঘটনা ঘটেছে তা তো প্রসিদ্ধ। যদিও তাতে অতিরঞ্জিত কথাবার্তাও রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. মদীনা তাইয়্যিবা ছেড়ে মক্কা মুয়াজ্জামায় (হেরেমে) আশ্রয় গ্রহণ করেন। এজন্য তাঁকে عائذ البيت তথা বাইতুল্লাহয় আশ্রয়গ্রহণকারী বলা হয়। তিনি মক্কা মুয়াজ্জামায় পৌঁছে সব কিছু সামলে নেন। ইয়াযীদ ক্রুদ্ধ হয়। সে মক্কার গভর্ণর ইয়াহইয়া ইবনে হাকীমকে লিখে যে, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. থেকে আমার বাইয়াত নিন। মক্কা মুয়াজ্জামার শাসক আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. থেকে বাইআত নিয়ে ইয়াযীদকে অবহিত করে। তখন ইয়াযীদ বলে, আমি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর বাইআত ততক্ষন পর্যন্ত গ্রহণ করবো না যতক্ষন না তিনি আমার নিকট গ্রেফতার হয়ে আসবেন। যখন মক্কার শাসক আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.কে ইয়াযীদের নির্দেশনামা শুনান, তখন আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. বললেন, আমি তো হেরেমে আশ্রয় নিয়েছি, তাহলে আমাকে গ্রেফতার করা হল কিভাবে? -উমদা।

উমদাতুল কারীর উপরোক্ত ইবারত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. মক্কা মুয়াজ্জামায় পৌঁছার পর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেননি। সে অহংকারী ইয়াযীদের জিদ ছিল তিনি যেন আমার কাছে হাত কড়া ও বেড়ি পরে আসেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. আশংকা করছিলেন, এজন্য তিনি বলেন, আমি তো হেরেমে আশ্রয় নিয়েছি। আমি এখান থেকে যেতে চাইনা। অতঃপর ইয়াযীদ মদীনার শাসক আমর ইবনে সাঈদকে লিখে। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মক্কায় সৈন্য পাঠাও।

وهو يبعث البُعوث - بَعْثٌ এর বহুবচন। اي يرسل الجيوش অর্থাৎ, আমর ইবনে সাঈদ মক্কা মুকাররামায় সৈন্য পাঠাচ্ছিলেন তখন সাহাবী আবূ শুরাইহ রা. বললেন, হে আমীর! আমাকে অনুমতি দিন, আমি আপনাকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস শুনিয়ে দেই। যেটি তিনি মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিন ইরশাদ করেছিলেন। এটি ছিল নেহায়েত শিষ্টাচার ও সভ্যতাপূর্ণ সম্বোধন। দাওয়াত ও তাবলীগের একটি মূলনীতি হল, শাসক ও রাজা বাদশাহদের দীনের কথা পৌঁছাতে এরূপ শিরোনাম অবলম্বন করা যাতে নম্রতা ও আকর্ষন থাকে। বিশেষত সে সব কাজে যেগুলোকে তারা নিজেদের অধিকারে দখলদারিত্ব মনে করে। তাছাড়া এভাবে কথা বললে তা গ্রহণের অধিক আশা করা যায়।

الغد من يوم الفتح ২০ই রমযানুল মুবারক ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় হয়েছিল। ফাতহে মক্কার দ্বিতীয় দিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিয়েছেন। তাতে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী ছিল।

سمعته اذناي الخ আমার কর্ণদ্বয় শুনেছে। উদ্দেশ্য হল, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছিলেন, তখন আমার গোটা দেহ যেন কর্ণ হয়ে ছিল। অন্তর তা সংরক্ষন করেছে। অর্থাৎ, বিষয়টি পরিপূর্ণরূপে সংরক্ষিত।

ان مكة حرمها الله الخ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা মক্কা মুয়াজ্জামাকে হেরেম বানিয়েছেন। এটা কোন মানুষের বানানো হেরেম নয়। এজন্য কোন মানুষের জন্য এর হুরমত খতম করে দেয়া জায়িয নেই।

প্রশ্ন ঃ এক রেওয়ায়াতে আছে- ان ابراهيم حرم مكة وانا احرم ما بين لابتي المدينة আর এ রেওয়ায়াতে আছে- لم يحرمها الناس উভয়ের মধ্যে বাহ্যত বিরোধ রয়েছে।

উত্তর ঃ হযরত ইবরাহীম আ. এর দিকে হেরেম বানানোর সম্বোধন রূপকার্থে। বরং মক্কা মুয়াজ্জামার হুরমত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং চিরস্থায়ী। হযরত নূহ আ. এর তুফানের ফলে এর নিদর্শনাবলী ও চিহ্নগুলো মিটে গিয়েছিল। হেরেমের সীমাগুলো গোপন ছিল। হযরত ইবরাহীম আ. আল্লাহর নির্দেশে এর

সীমা নির্ধারণ করেছেন যে, এটা হল হেরেমের অংশ। অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম আ. এটা হেরেম হওয়ার ঘোষণা দেন। অন্যথায় মূলত মক্কা মুয়াজ্জামাকে হেরেম বানিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা। এজন্য কোন মানুষের জন্য এর হুরমত খতম করা জায়িয নেই। অতএব কোন ঈমানদারের জন্য সেখানে খুনাখুনি করা সুনিশ্চিতরূপে না জায়িয। খুনাখুনি করা তো অনেক মারাত্মক ব্যাপার। সেখানকার গাছ কাটাও জায়িয নেই। আল্লাহ তা'আলা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুনির্দিষ্ট একটি সময় (সূর্যাদয় থেকে আসর) পর্যন্ত এর জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন।

হেরেমের মাসায়িল ও ইমামগণের উক্তি ঃ

এখানে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে।

১. যদি কেউ হেরেমে মক্কাতেই কাউকে হত্যা করে বা আহত করে তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার কিসাস হেরেমে নেয়া যেতে পারে।

২. যদি কেউ হেরেমের বাইরে কাউকে আহত করে। যেমন, হাত কেটে ফেলল, নাক কেটে দিল তবে এমতাবস্থায়ও সমস্ত ইমামগণের ঐকমত্য রয়েছে যে, তার কিসাস হেরেমে নেয়া যেতে পারে।

৩. যদি হেরেমের বাইরে কাউকে হত্যা করে অতঃপর হেরেমে ঢুকে আশ্রয় নেয়, এমতাবস্থায় ইমামগণের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে।

◆ ইমাম মালিক ও শাফিঈ র. এর মতে তার কাছ থেকে হেরেমে কিসাস নেয়া যেতে পারে।

◆ ইমাম আজম আবূ হানীফা ও আহমদ র. এর মতে তার কাছ থেকে হেরেমে কিসাস নেয়া যায় না, বরং ঘাতককে এরূপভাবে সংকীর্ণতায় ফেলতে হবে, তার সাথে বয়কট করা হবে, খাদ্য পানীয়, লেন-দেন সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া হবে। যাতে সে বাধ্য হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। এরপর তার থেকে কিসাস নেয়া হবে।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস হানাফী মতের সমর্থন করে।

অবশ্য ইমাম মালিক ও শাফিঈ র. ان الحرم لا تعيذ عاصيا ولا فارا بدم الخ বাক্য দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন।

◆ হানাফীগণ এর উত্তরে বলেন, এটি কোন হাদীস নয়, বরং আমর ইবনে সাঈদ এর উক্তি। সে কোন সাহাবী নয়, বরং ইয়াযীদের গভর্ণর ছিল এবং ভাল তাবিঈও ছিল না। তাকে لطيم الشيطان (শয়তানের চর খাওয়া লোক) নামে আখ্যায়িত করা হয়। ইবনে হাযম র. বলেন, ولا كرامة للطيم الشيطان ان يكون اعلم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولا يعضد بها شجرة হেরেমে মক্কার উদ্ভিত তিন প্রকার-

১. যে গুলো কেউ নিজে পরিশ্রম করে উৎপন্ন করেছে সেগুলো কাটা সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয।

২. যে গুলো কেউ উৎপন্ন করেনি কিন্তু এগুলো উদ্ভিত জাতীয় জিনিস। যেগুলো লোকজন সাধারণত উৎপন্ন করে থাকে। এই দ্বিতীয় প্রকার উদ্ভিতও কর্তন করা ও উপড়ে ফেলা জায়িয আছে।

৩. নিজে নিজে উৎপন্ন ঘাস ইত্যাদি। এতে শুধু ইযখির (এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঘাস) কাটা এবং উপড়ে ফেলা জায়িয আছে। তাছাড়া নিজে নিজে উৎপন্ন কোন চারা সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে বা জ্বলে গেলে বা ভেঙ্গে তা কাটাও জায়িয আছে।

সারকথা হল, لا يعضد بها شجرة বাক্যে شجرة দ্বারা উদ্দেশ্য সে সব ঘাস ও চারা যেগুলো নিজে নিজে উৎপন্ন হয়। মানুষের উৎপন্ন জাতীয় নয়, ভাঙ্গাচুড়াও নয়, জ্বলে পুড়ে যাওয়াও নয়, শুকিয়ে যাওয়াও নয়, তাছাড়া ইযখিরও নয় এরূপ চারা, ঘাস ইত্যাদি কাটা জায়িয নেই। কাটলে এর বদল দেয়া ওয়াজিব।

١٠٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضــ ذُكِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ذَلِكَ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ

১০৪. আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব র. .... হযরত আবূ বাকরা রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর কথা উল্লেখ করে বলেন, তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের জান, তোমাদের মাল-বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনে সীরীন র. বলেন, 'আমার মনে হয়, তিনি বলেছিলেন ঃ এবং তোমাদের মান-সম্মান (অন্য মুসলমানের জন্য) এ শহরে এ দিনের মতই মর্যাদাসম্পন্ন। শোন, (আমার এ বাণী যেন) তোমাদের মধ্যে উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়। বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনে সীরীন র. বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য বলেছেন, তা-ই (তাবলীগ) হয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার করে বললেন, হে লোক সকল! 'আমি কি তোমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছি?'

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল الا ليبلغ الشاهد منكم الغائب বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ইলম ঃ ১৬, ২১, ২৩৪, ২৩৫, ৬৩২, ৬৭২, ৮৩৩, ১১০৯।

উপকারিতা ঃ আমাদের ভারতীয় কপিগুলোর সনদে আছে عن محمد عن ابي بكرة الخ

মুহাম্মদ দ্বারা উদ্দেশ্য মুহাম্মদ ইবনে সীরীন তাবিঈ। হযরত আবূ বাকরা রা. থেকে তার শ্রবণ প্রমাণিত নয়।

হাফিজ আসকালানী র. বলেন, فصار منقطعا لان محمدا لم يسمع عن ابي بكرة. فتح الباري : ١/ ١٦١، مطبوعة بيروت.

আল্লামা আইনী র. বলেন, কোন কোন কপিতে আছে- عن محمد عن ابي بكرة আর কোন কোন কপিতে عن শব্দটিকে ابن দ্বারা পরিবর্তন করে عن محمد بن ابي بكرة শব্দ আছে। অথচ উভয়টি মারাত্মক ভুল। - উমদাহ ঃ ২/১৪৫।

সারকথা হল, অধিকাংশ কপিতে আছে- عن محمد عن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة الخ

আর এটাই বিশুদ্ধ। সহীহ বুখারীর কিতাবুল ইলমে ১৬ পৃষ্ঠায় আছে-

عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه الخ

তাছাড়া উমদাতুল কারী, ফাতহুল বারী ও ইরশাদুস সারী সহ সমস্ত নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাসমূহে অনুরূপই আছে। والله اعلم

ব্যাখ্যা ঃ هل بلغت তরজমা هل কে قد এর অর্থ নিয়ে করা হয়েছে। আর যদি هل কে استفهام এর অর্থে ধরা হয়, তবে এমতাবস্থায় অর্থ হবে الا হরফে তাম্বীহ। মানে খুব গভীরভাবে শুন এবং উত্তর দাও। আমি কি তাবলীগ বা প্রচারের দায়িত্ব আদায় করেছি? আমি কি يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك এর উপর আমল করেছি?

অবশিষ্ট্য ব্যাখ্যার জন্য ৬৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

٨٠. بَاب إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৮০. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি মিথ্যারোপ করার গুনাহ। বুখারী ২১

যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য ঃ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে ইলমের প্রচারের উল্লেখ ছিল। যাতে ইলম নিজের সত্ত্বা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না রাখা হয়, বরং দীনি ইলম যা কিছু শিখবে অন্যদের নিকট পৌঁছানোর জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা করবে।

এ অনুচ্ছেদ দ্বারা ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য হল, এটা সম্পূর্ণ ঠিক যে, তাবলীগ ও তা'লীম উলামায়ে কিরামের স্বতন্ত্র দায়িত্ব। অতএব প্রচারকার্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করা উচিত। তবে এ গুরুত্বারোপের সাথে সাথে এ সতর্কতাও অবলম্বন করা উচিত, যাতে প্রচার কার্যের আগ্রহে পড়ে কোন গলদ কথা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্বন্ধযুক্ত না হয়।

١٠٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا رضـ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ.

১০৫. আলী ইবনুল জাদ র....... আলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ (দেখো,) তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ করো না। কারণ, আমার প্রতি যে মিথ্যারোপ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল لا تكذبوا علي فانه من كذب علي فليلج النار বাক্যে স্পষ্ট। অর্থাৎ, হাদীস শরীফে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেটি গুনাহকে আবশ্যক করে। আর গুনাহ আবশ্যক করে জাহান্নামে প্রবেশকে। আর শিরোনামে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপের গুনাহের বিবরণ রয়েছে। -উমদা।

রিবঈ ইবনে হিরাশ ঃ

رِبْعِي শব্দটির রা এর নিচে যের, বা সাকিন, আইনের নিচে যের ও ইয়াতে তাশদীদ।

ابن حِراش হা এর নিচে যের, রা এর উপর তাশদীদ নেই। -উমদাহ।

تابعي ثقة لم يكذب كذبة قط. تهذيب التهذيب جلد ٣

"তিনি নির্ভরযোগ্য তাবিঈ। জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলেননি।" -তাহযীবুত তাহযীব ঃ ৩য় খণ্ড।

জীবনে তিনি কোন সময় মিথ্যা কথা বলেননি। তাঁর দুই ছেলে জালিম হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ও বিরোধী ছিলেন এবং আত্মগোপন করে ছিলেন। লোকজন হাজ্জাজকে বলল, তাঁর পিতা কখনো মিথ্যা কথা বলেন না। তাঁর নিকট লোক পাঠিয়ে খবর জানুন। হাজ্জাজ হযরত রিবঈ র. এর নিকট লোক পাঠাল। হাজ্জাজের প্রেরিত লোকজন জিজ্ঞেস করল, আপনার দুই ছেলে কোথায়? রিবঈ বললেন- هما في البيت -তারা দুজন ঘরে আছে। এতদশ্রবণে হাজ্জাজ খুবই প্রভাবিত হল। সে বলল, قد عفونا عنهما لصدقك -আপনার সত্যবাদিতার কারণে তাদের দুজনকে আমি ক্ষমা করে দিলাম।

তিনি কসম খেয়েছিলেন, ততক্ষন পর্যন্ত হাসব না ততক্ষন না জানা যাবে যে, আমার ঠিকানা জান্নাত না জাহান্নাম। সত্যিই তিনি জীবনে কখনো হাসেননি। মৃত্যুর পর কেবল মুসকি হাসছিলেন। توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة ١٠١هـ وقيل توفي سنة ١٠٤هـ. তথা হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র. এর যুগে ১০১ হিজরীতে ওফাত লাভ করেছেন। আর কারো কারো উক্তি মতে তিনি ওফাত লাভ করেছেন ১০৪ হিজরীতে।

হযরত আলী রা. ঃ

নাম আলী, উপনাম আবুল হাসান ও আবু তুরাব। হায়দার ও আসাদুল্লাহ তাঁর উপাধি। আবূ তালিবের সর্বকনিষ্ঠ ছেলে। আবূ তালিবের প্রসিদ্ধ নাম ছিল আবদে মানাফ। হযরত আলী রা. এর আসল উপনাম ছিল আবুল হাসান। কিন্তু তাঁর নিজের কাছে স্বীয় উপনাম আবূ তুরাব ছিল সবচেয়ে পছন্দনীয়। কারণ, এ উপনাম দিয়েছিলেন স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

ঘটনা এই হয়েছিল যে, কোন কারণে তাঁর মধ্যে ও সাইয়্যিদিনা হযরত ফাতিমা রা. এর মধ্যে কিছুটা মনোমালিন্য হয়েছিল। ফলে তিনি মসজিদে গিয়ে শুয়ে পড়েন। ঘটনাক্রমে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনে হযরত আলী রা.কে না পেয়ে তালাশ করালেন। জানতে পারলেন, তিনি মসজিদে শুয়ে আছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনে দেখলেন, তার পিঠে মাটি লেগে আছে। তখন তিনি বললেন- قم يا ابا تراب؟ হে আবু তুরাব! উঠ। অতঃপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাঁর ধুলোবালি ঝাড়তে লাগলেন।

নবুওয়াত ঘোষনার দশ বছর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। শিশুদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম ঈমান এনেছেন। তাঁর প্রতিপালন ঘটেছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সবচেয়ে প্রিয়কন্যা হযরত ফাতিমা রা. কে তাঁর নিকট বিয়ে দেন। এক রেওয়ায়াতে আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- ফাতিমা! আমি আমার খান্দানের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট তোমাকে বিয়ে দিয়েছি। -তাবাকাতে ইবনে সা'দ ঃ ৮/২৪।

আল্লামা আইনী র. বলেন-

اول خليفة من بني هاشم واحد العشرة المبشرة بالجنة واحد الستة اصحاب الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض واحد الخلفاء الراشدين واحد العلماء الربانيين واحد الشجعان المشهورين. عمدة : ١٤٧/٢.

হযরত উসমান রা. এর শাহাদাতের পর তৃতীয় দিন সমস্ত মুজতাহিদীনের সর্বসম্মতিক্রমে ৩৫ হিজরীতে যিলহজ্ব মাসে খলীফা নির্বাচিত হন। কয়েক দিন কম তিন মাস পাঁচ বছর পর্যন্ত খিলাফতের আসনে সমাসীন ছিলেন। ১৮ই রমযান ৪০ হিজরীতে ফজরের নামাযের জন্য যাচ্ছিলেন কুফার মসজিদে। পথিমধ্যে আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম বিষাক্ত একটি তলোয়ারের আঘাত হানে। এর তৃতীয় দিনেই রবিবার রাতেই তিনি শাহাদত লাভ করেন। ইমাম হুসাইন রা. জানাযা নামায পড়ান এবং কুফার একটি কবরস্থানে তাঁকে দাফন করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর।

রাসূলে আকরাম সা. এর প্রতি মিথ্যারোপ সবচেয়ে মারাত্মক কবীরা গুনাহ ঃ

নিঃসন্দেহে মিথ্যা বলা সাধারণত না জায়িয ও কবীরা গুনাহ। চাই দীন সংক্রান্ত হোক বা দুনিয়া সংক্রান্ত, ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক বা লেন-দেনের সাথে। ব্যাপক আকারে মিথ্যা বলাও হারাম। রাসূলে

আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপ সবচেয়ে মারাত্মক কবীরা গুনাহ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- ان كذبا علي ليس ككذب على الناس তথা আমার প্রতি মিথ্যারোপ অন্যদের প্রতি মিথ্যারোপের মত নয়।

◆ সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে ইসলামের মতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইচ্ছাকৃত মিথ্যারোপ করা ব্যাপক আকারে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ ও হারাম। তবে হালাল মনে করে তা না করলে কাফির হবে না।

◆ শুধু মাত্র শাফিঈ মাযহাব পন্থী আবুল মা'আলী ইমামুল হারামাইনের পিতা আবূ মুহাম্মদ জুয়াইনী র. এবং ইবনুল মুনাইয়্যির র. মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীকে কাফির বলেছেন। কিন্তু ইমামুল হারামাইন র. তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেছেন, সে কাফির হবে না, বরং ফাসিক হবে। মোটকথা, সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে ইসলামের ফতওয়া ও ফয়সালা এটাই যে, কাফির বলা ইসলামী মূলনীতির পরিপন্থী। হ্যাঁ, গুনাহে কবীরা বরং সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহকারী বলেন।

ইমাম বুখারী র. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কোন বিষয় সম্বন্ধ করার ক্ষেত্রে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনের জন্য পাঁচটি রেওয়ায়াত পেশ করেছেন। যেগুলো পাঁচজন সাহাবী থেকে বর্ণিত। এ রেওয়ায়াতগুলোকে উৎকৃষ্টভাবে বিন্যস্ত করেছেন।

প্রথম রেওয়ায়াত হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত। তাতে মিথ্যারোপ করতে সুস্পষ্টভাষায় নিষেধ করা হয়েছে এবং মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীর জন্য জাহান্নামের সতর্কবাণী শুনানো হয়েছে।

দ্বিতীয় রেওয়ায়াত হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম রা. থেকে বর্ণিত।

١٠٦. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ رضــ إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحَدِّثُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أُفَارِقْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

১০৬. আবুল ওয়ালীদ র. .....হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আমার পিতা যুবাইর রা.কে বললাম ঃ আমি তো আপনাকে অমুক অমুকের ন্যায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস বর্ণনা করতে শুনি না। তিনি বললেন ঃ 'জেনে রাখ, আমি তাঁর থেকে দূরে থাকিনি, কিন্তু (হাদীস বর্ণনা করি না এজন্য যে,) আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।'

١٠٧. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ أَنَسٌ رضــ إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

১০৭. আবূ মা'মার র. ...... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এ কথাটি তোমাদেরকে বহু হাদীস বর্ণনা করতে আমাকে বাধা দেয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।

١٠٨. حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رضــ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

১০৮. মাক্কী ইবনে ইবরাহীম র. ..... হযরত সালামা ইবনে আকওয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আমার প্রতি এরূপ কথা আরোপ করে যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।'

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল স্পষ্ট।

١٠٩. حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضـــ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

১০৯. মূসা র. ..... হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আমার নামে তোমরা নাম রেখ; কিন্তু আমার উপনামে (কুনিয়াতে) তোমরা উপনাম রেখ না। আর যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে ঠিক আমাকেই দেখে। কারণ, শয়তান আমার আকৃতির ন্যায় রূপ ধারণ করতে পারে না। যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।'

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল স্পষ্ট।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ইলম ঃ ২১, মানাকিব ঃ ৫০১, আদব ঃ ৯১৪, ৯১৫।

قوله من راني في المنام فقد راني فان الشيطان لا يتمثل في صورتي، هو حديث آخر جمعها الراوي بهذ الاسناد يأتي في الادب في باب من سمى باسماء الأنبياء . صــ ٩١٥.

مقرون كذلك ويأتي هذا الحديث فقط في التفسير في باب من راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. صــ ١٠٣٥.

ব্যাখ্যা ঃ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বীয় পিতা হযরত যুবাইর রা.এর নিকট আরয করলাম, আমি তো আপনাকে অমুক অমুকের ন্যায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করতে শুনি না।

كما يحدث فلان فلان ঃ এক فلان দ্বারা উদ্দেশ্য ইবনে মাজাহ এর রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা., আর দ্বিতীয় فلان দ্বারা কে উদ্দেশ্য জানা নেই তবে হতে পারে হযরত আবূ হুরাইরা রা. উদ্দেশ্য।

قال اما اني لم افارقه الخ ঃ আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিচ্ছিন্ন হইনি। এর উদ্দেশ্য কখনো এই নয় যে, সফর ও মুকীম অবস্থায় সর্বদা সাথে থেকেছেন। কারণ, হিজরতের সফরে হযরত যুবাইর রা. সাথে ছিলেন না। তাছাড়া যখন হযরত যুবাইর রা. হাবশার দিকে হিজরত করেছেন তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন। এজন্য উদ্দেশ্য শুধু অধিক সময় তার সান্নিধ্যে থাকা এবং বেশির ভাগ সময় সোহবত ও উপস্থিতির বিবরণ দান। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, হযরত যুবাইর রা. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে স্বীয় আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা আগে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবতে বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছি। আমার নিকটও প্রচুর হাদীস মুখস্থ আছে

কিন্তু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ শুনেছি "যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে সে নিজ ঠিকানা জাহান্নামে তৈরি করে নিবে" -এ জন্য সতর্কতা অবলম্বন করছি। তৃতীয় রেওয়ায়াতটি হযরত আনাস রা.এর। তরজমা প্রথমেই হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ হযরত আনাস রা. অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের অন্তর্ভূক্ত। তাঁর সূত্রে ২২৮৬ টি হাদীস বর্ণিত আছে। -উমদা ঃ ১/১৪০।

তাহলে তাঁর এ উক্তি কিভাবে সহীহ হবে?

উত্তর ঃ হযরত আনাস রা. এর উদ্দেশ্য হল, আমার যত হাদীস মুখস্থ আছে যেগুলোর সব বর্ণনা করছি না। হযরত আনাস রা. নিজ থেকে খুব কম হাদীস বর্ণনা করতেন। কিন্তু যেহেতু দশ বছর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবতে থেকেছি এবং বয়সও দীর্ঘ হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম রা. এর আখিরী যমানা পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। প্রায় সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম রা. দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন শুধু দু'চার জন জীবিত ছিলেন। এজন্য জনসাধারণ ব্যাপকরূপে তাঁর শরনাপন্ন হতেন। অতএব হযরত আনাস রা.এর নিকট প্রচুর জিজ্ঞাসার কারণে রেওয়ায়াত অধিক হয়েছে। কারণ, জিজ্ঞাসার পর ইলম গোপন রাখার ব্যাপারে সতর্কবাণী বর্ণিত আছে। ইরশাদে নববী রয়েছে-

من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من النار. ابن ماجه ٢٣.

"যার নিকট ইলমী কোন কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছে অতঃপর সে তা গোপন করে রেখেছে। তাহলে কিয়ামত দিবসে তার মুখে আগুনের লাগাম পরানো হবে।" -ইবনে মাজাহ ঃ ২৩।

حدثنا المكي بن ابراهيم الخ এটি এ অনুচ্ছেদের চতুর্থ হাদীস। সহীহ বুখারী শরীফের ২২টি সুলাসী (৩ সূত্রে বর্ণিত) হাদীস থেকে এটি হল প্রথম। তাতে ইমাম বুখারী র. থেকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত শুধু তিনটি মাধ্যম রয়েছে। প্রথম সূত্র মক্কী ইবনে ইবরাহীম। যিনি বুখারী র. এর শীর্ষস্থানীয় একজন উস্তাদ। তিনি ইমাম আজম আবূ হানীফা র.এর একজন হাদীসের ছাত্র। এর সুস্পষ্ট বিবরণ স্বয়ং আসকালানী শাফিঈ র. দিয়েছেন মক্কী ইবনে ইবরাহীম র. এর জীবনীতে। -তাহযীবুত তাহযীব ঃ ১০/২৯৪।

হযরত শায়খুল হাদীস সাহারানপুরী র. লিখেছেন, ইমাম বুখারী র. এর ২২টি সুলাসীর মধ্য থেকে ২০টির সূত্র মাশায়েখে হানাফী। যেন সহীহ বুখারী শরীফের সনদে উচ্চতা ও শীর্ষত্ব ইমাম আজম র. এর ছাত্র অথবা ছাত্রের ছাত্রদের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে।

চরম বিস্ময়ের ব্যাপার হল, যাকে ইমাম বুখারী র.এর উস্তাদগণ ইমাম মেনেছেন, তাঁর ইমামত কেন স্বীকার করছেন না?

অর্থগত বিবরণ ঃ

চতুর্থ হাদীস হল, হযরত সালামা ইবনে আকওয়া রা. এর। তাতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী لم يقل علي ما لم اقل এ قول শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ কারণে কেউ কেউ অর্থগত বিবরণকে না জায়িয বলেন। কারণ, অর্থগত রেওয়ায়াতের ছুরতে ইরশাদে নববীতে শাব্দিক পরিবর্তন হয়ে যায়। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে অর্থগত বিবরণ জায়িয আছে। এজন্য আল্লামা আইনী র. বলেন-

واجيب من جهة المجوزين بان المراد النهي عن الاتيان بلفظ يوجب تغيير الحكم على ان الاتيان باللفظ اولى بلا شك.

◆ যারা অর্থগত রেওয়ায়াত জায়িয সাব্যস্ত করেন, তাদের পক্ষ থেকে উত্তর দেয়া হয়েছে যে, এর দ্বারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ সমূহে এরূপ শব্দ আনয়ন নিষেধ করা উদ্দেশ্য যা হুকুম পরিবর্তন করে দেয়। অবশ্য হুবহু শব্দে বর্ণনা করা বিনা মতানৈক্যে সবার মতে উত্তম।

হযরত সালামা ইবনে আকওয়া রা. ঃ

তার উপনাম আবূ সালামা, কারো কারো মতে আবূ আমির, আর কেউ কেউ বলেছেন, আবূ আয়াস। তিনি বড় বীর বাহাদুর ও বিশেষজ্ঞ তীরান্দাজ সাহাবী ছিলেন। অনেক গুণ-কামাল ও বদান্যতার অধিকারী ছিলেন। দ্রুত পায়দল হাটলেও আরোহীদের আগে চলে যেতেন। বাইআতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণ করেছেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সেদিন তিনি তিনবার বাইআত হয়েছেন। শুরুতে, মধ্যখানে ও শেষে।

তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা আল্লামা আইনী র. প্রমুখ এই বর্ণনা করেছেন- তিনি নিজে বর্ণনা করেন, আমি দেখলাম, একটি বাঘ একটি হরিণ ধরেছে। আমি বাঘটির পিছু ধাওয়া করলাম এবং সেটির কাছ থেকে হরিণটিকে ছিনিয়ে আনলাম। তখন বাঘটি বলতে লাগল, তোমার অনিষ্ট হোক, আমার ব্যাপারে তোমার কি সম্পর্ক? তুমি নাক গলাতে এসেছো? আল্লাহ আমাকে একটি রিযিক দিয়েছিলেন আর তুমি তা ছিনিয়ে নিয়েছ। অথচ এটি তোমার সম্পদ ছিল না। তা সত্ত্বেও তুমি আমার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিয়েছ। আমি ভীষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বললাম, হে লোকজন! দেখ, কি আশ্চর্যের ব্যাপার, বাঘ কথোপকথন করছে! তখন বাঘটি বলল, এর চেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হল, আল্লাহর রাসূল খেজুর বাগান বিশিষ্ট শহরে (মদীনা তাইয়্যিবায়) তোমাদেরকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবান করছেন, অথচ তোমরা প্রতিমা পূজায় অটল। হযরত সালামা রা. বলেন, আমি একথা শুনে সোজা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণ করি।

এরূপভাবে বাঘের কথোপকথনের একটি ঘটনা মিশকাত শরীফেও আছে। যার সারকথা হল, এক ইয়াহুদী রাখাল বাঘের কথা শুনেছে এবং সে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। -মিশকাত ঃ ৫৪১, অনুচ্ছেদ ঃ মু'জিযা, ২য় পরিচ্ছেদ।

হযরত সালামা রা. ৭৪হিজরীতে ৮০ বছর বয়স পেয়ে ওফাত লাভ করেন।

حدثنا موسى الخ এটি হল পঞ্চম হাদীস। অর্থাৎ, এ অনুচ্ছেদের শেষ হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত।

قال تَسَمَّوا باسمي তা এর উপর যবর, সিনের উপর যবর, মীম তাশদীদযুক্ত। বহুবচনের নির্দেশসূচক শব্দ। باب تفعل থেকে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার নামে নাম রাখ, কিন্তু আমার উপনামে তোমাদের উপনাম রেখোনা।

হাদীস বিবরণের ঘটনা বা প্রেক্ষাপট ঃ

এ হাদীস বিবরণের প্রেক্ষাপট হল, একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারে যাচ্ছিলেন। কেউ ডাক দিল, হে আবুল কাসিম! প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে করলেন, আমাকে ডেকেছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে ফিরলে লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে নয়, বরং অমুককে ডেকেছি। এই বিভ্রান্তি লাগার কারণে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উপনাম রাখতে নিষেধ করেছেন। যেহেতু সাধারণত স্বনামে ডাকা হয় না সেহেতু নামের ব্যাপারে নিষেধ করেননি।

আরেকটি উক্তি হল, ইয়াহুদীরা আবূল কাসিম উপনাম রাখত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়ার জন্য। যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখত তখন আবূল কাসিম বলে ডাকত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফিরতেন তখন বলত আপনাকে ডাকিনি, অমুককে ডেকেছি। এজন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূল কাসিম উপনাম রাখতে নিষেধ করেছেন।

আল্লামা আইনী র. বলেন, কোন নাম দ্বারা যদি প্রশংসা বা নিন্দা স্পষ্ট হয়, তবে সেটাকে উপাধি বলে। যেমন, হাকীমুল উম্মত, শায়খুল ইসলাম। অন্যথায় যদি এর শুরুতে اب অথবা ام (বাপ বা মা) থাকে তবে সেটাকে বলে উপনাম। যেমন, আবূ বকর, উম্মুদ দারদা। অন্যথায় নাম। যেমন, উমর, উসমান।

অতএব রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুবারক মুহাম্মদ, উপনাম আবূল কাসিম, উপাধি রাসূলুল্লাহ, সাইয়্যিদুল মুরসালীন, খাতিমুন নাবিয়্যীন।

সম্মানিত নাম ও উপনামের হুকুম ঃ

হযরত আবূ হুরায়রা রা.এর এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আবূল কাসিম উপনাম রাখা জায়িয নেই, কিন্তু মুহাম্মদ বা আহমদ নাম রাখা জায়িয আছে। কিন্তু আবূ দাউদের একটি রেওয়ায়াত হল-

من تمسي باسمي فلا يكنى بكنيتي ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. ابو داود : ٦٧٨/٢، كتاب الادب.

"যে আমার নামে নাম রাখবে, সে আমার উপনাম রাখবে না, আর যে আমার উপনাম রাখবে, সে আমার নাম রাখবে না।"

তাছাড়া তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে-

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجمع احد بين اسمه وكنيته ويسمى محمدا ابا القاسم. ترمذي : ٢ /ابواب الادب ١٠٧.

"নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় নাম ও উপনাম একত্রে রাখতে নিষেধ করেছেন এবং যার নাম মুহাম্মদ তার উপনাম আবূল কাসিম রাখতেও নিষেধ করেছেন।"

◆ এসব রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় নাম ও উপনাম উভয়টি একত্রিত করা নিষিদ্ধ। শুধু মুহাম্মদ নাম রাখা অথবা শুধু আবূল কাসিম উপনাম রাখা নিষেধ ছিল না। কেউ কেউ এজন্য এরই প্রবক্তা।

◆ সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হল, এ ধরণের নিষেধাজ্ঞার হুকুম সীমাবদ্ধ ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর এ হুকুম রহিত। নাম ও উপনাম উভয়টি একত্রিত করা স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি দ্বারা প্রমাণিত।

আবূ দাউদ শরীফে মুহাম্মদ ইবনুল হানাফীয়া র. থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আলী রা. বলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলাম যদি আপনার পর আমার কোন ছেলে হয়, তবে তার নাম আপনার এবং তার উপনাম আপনার উপনাম রাখব? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ অনুমতি আছে। একারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর হযরত আলী রা. ইবনুল হানাফীয়ার নাম রাখেন মুহাম্মদ, আর উপনাম রাখেন আবূল কাসিম। এতে বুঝা গেল যে, এখন আর এ দুটি একত্রে রাখাতে কোন অসুবিধে নেই। আর কোন একটিতেও কোন অসুবিধে নেই। কারণ, নিষেধের আলামত উঠে গেছে।

قوله من راني في المنام فقد راني فان الشيطان لم يتمثل في صورتي.

যে আমাকে স্বপ্নে দেখল সে আমাকেই দেখল। অর্থাৎ, অন্য কোন কিছুর ধারণা করবে না। কারণ, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। (শয়তানের শক্তি নেই আমার রূপ ধারণ করার।)

স্বপ্নের বিভিন্ন প্রকার ঃ

হাফিজ আসকালানী র. কিতাবুর রুইয়া নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা লিখেছেন। তিনি বলেন, স্বপ্ন তিন প্রকার।

১. কখনো হুবহু মূল জিনিস পরিদৃষ্ট হয়। অর্থাৎ, স্বপ্ন কোন যথার্থ ঘটনার মুখপত্র হয়।

২. কখনো শয়তান আসল রূপ ধারণ করে নজরে আসে।

৩. কখনো কল্পনা শক্তিতে যে সব জিনিস থাকে ধারণা শক্তি সেগুলোকে সামনে দাড় করিয়ে দেয়।

অতএব রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শয়তান আমার রূপ ধারণ করে আসতে পারে না। শয়তানের এই ক্ষমতা নেই যে, এসে বলবে, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

স্বপ্নযোগে রাসূল সা. এর দর্শন ঃ

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখা সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়াত রয়েছে।

১. من راني في المنام فقد راني فان الشيطان لا يتمثل في صورتي.

২. من راني في المنام فقد راى الحق.

৩. من راني في المنام فسيراني في اليقظة او لكانما راني في اليقظة. مسلم : ٢/٢٤٢.

ইমাম মুসলিম র. সবগুলো হাদীস একত্রিত করেছেন। -মুসলিম ঃ ২/২৪২।

যেখানে সুফিয়ায়ে কিরাম فقد راى الحق এর অর্থ বর্ণনা করেছেন, যে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছে, সে আল্লাহকে দেখেছে। এটা সুস্পষ্ট ইলহাদ ও বে-দীনি। এর অর্থ হল, যে স্বপ্নে আমাকে দেখেছে সে যেন কোন ভুল ধারণায় না পড়ে। সে ঠিকই আমাকে দেখেছে।

কোন কোন আলিম فسيراني রেওয়ায়াতটিকে মূল সাব্যস্ত করে এই অর্থ বর্ণনা করেছেন, যে স্বপ্নযোগে আমার দর্শন লাভ করল, সে আখিরাতে আমাকে দেখবে।

প্রশ্ন ঃ এর উপর একটি প্রশ্ন হয় যে, পরকালে তো রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন সমস্ত মুমিনেরই লাভ হবে। তবে এ বিশেষত্বের কারণ কি?

উত্তর ঃ এর উত্তর এই দেন যে, এ ব্যক্তি বিশেষ ধরণের দর্শন লাভ করবে। তার প্রতি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ নজর হবে।

আর যেসব রেওয়ায়াতে অতীতকাল বোধক শব্দ আছে, সেগুলো সম্পর্কে বলেন, যে নিশ্চিত হওয়ার কারণে অতীতকাল বোধক শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী- وسيق الذين كفروا ইত্যাদি।

◆ কেউ কেউ এ হাদীসের অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, এ হুকুম রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশার সাথে বিশেষিত ছিল। অর্থাৎ, আমার জীবদ্দশায় যে আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে আমার নিকট পৌছে আমার দর্শন লাভ করবে।

◆ আর কেউ কেউ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ জীবনের পরের কালটিকেও অন্তর্ভূক্ত বলেছেন। এভাবে যে, যে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখল, সে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারক যিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করবে।

◆ কিন্তু এসব ব্যাখ্যা এজন্য বিশুদ্ধ নয় যে- فان الشيطان لا يتمثل في صورتي এগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে।

◆ অতএব এ রেওয়ায়াতের বিশুদ্ধ অর্থ হল সুস্পষ্ট যেটি সেটিই। অর্থাৎ, যে আমাকে স্বপ্নযোগে দেখল সে যেন এরূপ ধারণা না করে যে, হয়ত শয়তান তাঁর রূপ ধারণ করে এসেছে। বরং তার নিশ্চিত বিশ্বাস রাখা উচিত যে, সে আমার দর্শনই লাভ করেছে।

◆ هل يلزم ان تكون رويته صلى الله عليه وسلم في صورته الاصلية؟ এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে যে, স্বপ্নযোগে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসল রূপ ও প্রকৃত ছুরত দেখা আবশ্যক কি না?

◆ শাহ রফীউদ্দীন এবং শীর্ষ স্বপ্ন ব্যাখ্যাতা ইবনে সীরীন ও কাযী ইয়ায র. এর মাযহাব হল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসল রূপ দেখা জরুরী।

স্বপ্ন ব্যাখ্যা শাস্ত্রে হযরত সিদ্দীকে আকবার রা. এর পর ইবনে সীরীন র. এর সমান মর্যাদা আর কারো নেই। তাঁর নিকট যদি কেউ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দর্শনের স্বপ্ন বর্ণনা করত, তখন তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূপ ও নিদর্শনাদি জিজ্ঞেস করতেন। যদি তার বাতানো নিদর্শনাদি সীরাত গ্রন্থরাজিতে বর্ণিত নিদর্শনাদির সাথে মিলত, তবে গ্রহণ করতেন। অন্যথায় প্রত্যাখ্যান করতেন।

فان الشيطان لا يتمثل في صورته দ্বারাও এর সমর্থন হয়। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দিষ্ট রূপ যদি দেখে, তবে ইয়াকীন হবে যে, এটি শয়তানের আকৃতি নয়।

◆ তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম, শাহ আবদুল আযীয ও ইমাম গাযযালী র. এর মাযহাব হল, হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল নিদর্শনাদি দেখা জরুরী নয়। শুধু এতটুকু যথেষ্ট যে, দর্শক দর্শনকালে এতটুকু ইয়াকীন রাখবে যে, এটি হল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকৃতি।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচিত্র ছুরতে পরিদৃষ্ট হওয়া কখনো দর্শকের অন্তরের প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকে। যেমন, সুদর্শনরূপে পরিদৃষ্ট হওয়া দর্শকের আন্তরিক পরিচ্ছন্নতার প্রমান। আর কোন না জায়িয আকৃতি বা অবৈধ পোশাকে দেখা দর্শকের গুনাহের দিকে ইঙ্গিত হয়ে থাকে। আবার কখনো দর্শকের অবস্থার দিকে ইঙ্গিত হয় না, বরং কোন ব্যাপক অবস্থা অভিব্যাক্তি হয়ে থাকে। যেমন, মাদরাসা আবদুর রবের মুদাররিস মাওলানা আবদুল আলী সাহেব স্বপ্নে দেখেছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোট প্যান্ট পরে আছেন। এ স্বপ্ন দেখে তিনি খুব পেরেশান হন। হযরত গাঙ্গুহী র. এর খেদমতে বিষয়টি লিখে পাঠান। উত্তরে তিনি লিখেন, এতে আপনার কোন মন্দের দিকে ইঙ্গিত নয়, বরং ধর্মের উপর খ্রিষ্টবাদের প্রবলতার দিকে ইঙ্গিত।

◆ স্বপ্নযোগে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণ নয়। যদি শরীয়ত পরিপন্থী হয় তাহলে তা গ্রহণ করা যাবে না।

◆ এর কারণ এই বর্ণনা করা হয় যে, যদিও শয়তান রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূপ ধারণ করতে পারে না। কিন্তু এটা কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় যে, শয়তান রাসূলে আকরাম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বরের সাথে নিজের স্বর মিলাতে পারে না। দর্শক যা কিছু শুনেছে তাতে শয়তানের সংমিশ্রনের সম্ভাবনা আছে। এজন্য প্রমাণ নয়।

◆ কিন্তু ফাতহুল মুগীসে আল্লামা সাখাবী র. বলেন, স্বপ্নযোগে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ প্রামাণ্য না হওয়ার উপরোক্ত কারণ বর্ণনা করা সমীচীন নয়। বিশুদ্ধ কারণ হল, ঘুমের অবস্থা হল, গাফিলতির অবস্থা। আর গাফিল ব্যক্তির রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয় ঘুমে গাফিলতির কারণে শব্দের পরিবর্তন ও ভুল বিস্মৃতির সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে।

◆ হযরত শায়খ আবদুল হক দেহলভী র. বলেন, মহান শায়খ আবদুল ওয়াহহার মুত্তাকী র. থেকে একটি ঘটনা শুনেছি, পাশ্চাত্যের এক ফকীর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নযোগে দেখে। তিনি তাকে মদ পানের নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি তৎকালীন যুগের মাশায়িখের নিকট জিজ্ঞেস করলেন, প্রকৃত অবস্থা কি? প্রত্যেক শায়খ তাঁকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন। মদীনা মুনাওয়ারায় এক প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন যুগের একজন প্রসিদ্ধ শায়খ। তাঁকে বলা হত, শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইরাকী। তিনি ছিলেন, শীর্ষ পর্যায়ের দীনের অনুসারী ও শরীয়তের উপর অটল মনীষী। এই ফতওয়া যখন তাঁর নযরে এল তখন তিনি বললেন, এসব কিছুই নয়। মূলত সে লোকটির শ্রবণশক্তিতে ত্রুটি হয়েছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- لا تشرب الخمر আর সে এটাকে শুনেছে اشرب

হযরত শাহ সাহেব র. এর মত হল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়ত اشرب الخمر ধমক রূপে বলেছেন।

رويته صلى الله عليه وسلم تكون بالجسد المثالي؟

এখানে আরেকটি মত বিরোধ হল, স্বপ্নযোগে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন মিসালী দেহে হয় , না প্রকৃত দেহে?

এভাবে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারক ও দর্শকের মধ্যখান থেকে আড়াল তুলে দেয়া হয়।

ইমাম গাযযালী ও সুয়ূতী র. মিসালী দর্শনের প্রবক্তা। কোন কোন রেওয়ায়াতে فكانه رآني শব্দও এর সমর্থন করে। কোন কোন ওলী আল্লাহ জাগ্রত অবস্থায়ও কাশ্‌ফ আকারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ করে থাকেন। এ অবস্থাতেও তাঁর উক্তি প্রমাণ নয়।

একটি সুক্ষ্ম হিকমত ঃ

যেহেতু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু হেদায়াতের প্রতিচ্ছবি ছিলেন, আর শয়তান হল শুধু গোমরাহীর প্রতিচ্ছবি। আর আল্লাহ তা'আলা হেদায়াতদাতা এবং গোমরাহকারীও। সেহেতু শয়তান রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূপ ধারণ করতে পারে না। যদি কেউ আল্লাহ তা'আলাকে স্বপ্নে দেখে তবে হতে পারে সেটি শয়তান। অথচ দর্শক তাকে আল্লাহ তা'আলা মনে করছে।

-ইরশাদুল কারী।

نقل في الدر المختار عن امامنا الاعظم رحمه الله تعالى انه راى ربه في المنام مائة مرة وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى لرؤيته تعالى في المنام قصة مشهورة ذكرها الحافظ النجم الغيطي وهي ان الامام الاعظم رحمه الله تعالى قال رايت رب العزة في المنام تسعا وتسعين مرة فقلت في نفسي ان رايته تمام المائة لاسئلنه بم ينجو

الخلائق من عذابه يوم القيامة قال فرأيته سبحانه وتعالى فقلت يا رب عز جارك وجل ثنائك وتقدست اسمائك بم ينجو عبادك يوم القيامة من عذابك؟ فقال سبحانه وتعالى من قال بعد الغداة والعشي سبحان الابدي الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغير عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد سبحان من قسم الرزق و لم ينس احد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد، نجا من عذابي. رد المحتار : ٤٨/١.

ইরশাদুল কারীর বরাত সম্ভবত মিসরী কপির। তবে দেওবন্দের ছাপা শামী দেখতে পারেন। -১/৩৫।

হাদীসের অংশগুলোর পারস্পারিক যোগসূত্র ঃ এ হাদীসে চারটি জিনিস বর্ণনা করা হয়েছে।

১. তাঁর নামে নাম রাখা। ২. তাঁর উপনাম রাখা। ৩. স্বপ্নযোগে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত নসীব হওয়া। ৪. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইচ্ছাকৃত মিথ্যারোপ করা।

এবার প্রশ্ন হয়, হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর বিভিন্ন অংশে পারস্পরিক যোগসূত্র কি?

উত্তর ঃ আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী র. বলেন, দ্বিতীয় হুকুমটি প্রথম হুকুমের পর ইরশাদ করেছেন। এটা তো স্পষ্ট। কারণ, নাম ও উপনাম দুটি একই ময়দানের বিষয়। এরূপভাবে চতুর্থ হুকুমটিকে তৃতীয় হুকুমের পরে আনাও স্পষ্ট। কারণ, اذا كذب عليه لانه راه في المنام الخ অর্থাৎ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপ (যে সে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছে) চাই জাগ্রত অবস্থার ব্যাপারে হোক অথবা স্বপ্নের ব্যাপারে, উভয়টি হারাম এবং উপরোক্ত সতর্কবাণীর আওতাভূক্ত।

তৃতীয় হুকুমটিকে দ্বিতীয় হুকুমের পর আনার মধ্যে কি যোগসূত্র ?

এর বিশদ বিবরণ আল্লামা আইনী র. বোধহয় ভবিষ্যতের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। অতঃপর তা পূর্ণাঙ্গ করতে পারেন নি।

কোন কোন আলিম রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্বপ্নযোগে দর্শনকে তাসমিয়া নামে ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ, আমার নামে (মুহাম্মদ ও আহমদ) নাম রাখ। আমার উপনাম আবূল কাসিম রেখোনা। যে স্বপ্নযোগে আমাকে দেখেছে সে প্রকৃত পক্ষে আমার দর্শনই লাভ করেছে। অর্থাৎ, স্বপ্নযোগেও যে জিনিসে আমার নাম আসবে এভাবে যে, অন্তর সাক্ষী দিবে বা বলবে যে, তিনিই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সেখানে মনে করবে আমিই।

٨١. بَاب كِتَابَةِ الْعِلْمِ

৮১. পরিচ্ছেদ ঃ ইলম লিপিবদ্ধ করা। বুখারী ২১

পূর্বের সাথে যোগসূত্র ঃ পূর্বের অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে তা'লীম ও তালকীন ছিল যে, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপ গুনাহ বরং সবচেয়ে মারাত্মক কবীরা গুনাহ। এজন্য হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী। এবার এ অনুচ্ছেদে এ সতর্কতার পন্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এর উত্তম ছুরত হল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

বাণীগুলো লিপিবদ্ধ করা। এজন্য ইমাম বুখারী র. হাদীসের ব্যাপারে সতর্কতা ও মিথ্যারোপ থেকে বাঁচার আলোচনা করার পর হাদীস লেখা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন।

উদ্দেশ্য ঃ শিরোনাম দ্বারা উদ্দেশ্য হল, হাদীস ও ইলমে দীন লেখা বিদ'আত নয়, বরং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। বিস্তারিত জানার জন্য ভূমিকার শুরুতে হাদীস সংকলণের বিষয়টি দ্রষ্টব্য।

২. হযরত গাঙ্গুহী র. বলেন, লেখা বারণ সংক্রান্ত হাদীসগুলো দ্বারা নিষেধ বুঝা যেতে পারত, এজন্য ইমাম বুখারী র. এ অনুচ্ছেদ কায়েম করে এই সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছেন যে, নিষেধাজ্ঞা ছিল শুরুতে। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেখার অনুমতি দিয়েছেন। -ইমদাদুল বারী-লামি'।

١١٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رض۔ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قَالَ لَا إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ قُلْتُ فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

১১০. মুহাম্মদ ইবনে সালাম র. ...... আবূ জুহাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি হযরত আলী রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের কাছে কি লিখিত কিছু আছে? তিনি বললেন ঃ 'না, কেবলমাত্র আল্লাহর কিতাব রয়েছে, আর সেই বুদ্ধি-বিবেক, যা একজন মুসলিমকে দান করা হয়। এ ছাড়া যা কিছু এ পত্রটিতে লেখা আছে।' আবূ জুহাইফা রা. বলেন, আমি বললাম, এ পত্রটিতে কী (লেখা) আছে? তিনি বললেন, 'দিয়াতের (আর্থিক ক্ষতিপূরণ) ও বন্দী মুক্তির বিধান, আর এ বিধানটিও যে, 'মুসলিমকে যেন কাফিরের বিনিময়ে হত্যা করা না হয়।'

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল وما في هذه الصحفية বাক্যে। لان الصحيفة هي الورقة المكتوبة. কারণ, সহীফা তো লিখিত পাতার নামই।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ইলম ঃ ২১, জিহাদ ঃ ৪২৮, দিয়াত ঃ ১০২০, ১০২১।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম বুখারী র. এ অনুচ্ছেদের আওতায় চারটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। এ সবগুলোতেই উলূমে নবুওয়াত লিপিবদ্ধ করার প্রমাণ রয়েছে। এটাই হল আবূ জুহাইফা রা.এর হাদীস।

عن ابي جُحَيفة জীমের উপর পেশ, হা এর উপর যবর। তাঁর নাম ওয়াহাব ইবনে আবদুল্লাহ সুওয়াঈ তিনি ছিলেন কুফার অধিবাসী। ছোট সাহাবী। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত কালে তিনি বালিগও হননি। তিনি হযরত আলী রা. এর প্রিয় ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। হযরত আলী রা. তাকে কুফার বাইতুল মালের কোষাধক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন। ৭২ হিজরীতে তিনি ওফাত লাভ করেন। -উমদাহ।

هل عندكم كتاب قال لا الخ হযরত আবূ জুহাইফা রা. বলেন, আমি হযরত আলী রা.কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কাছে কি অন্য কোন (লিখিত) কিতাব আছে? অর্থাৎ, অন্যান্য মুসলমানের কাছে যে কুরআনে কারীম আছে এ ছাড়াও আপনার কাছে কোন বিশেষ লিখিত গ্রন্থ আছে, যা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে আপনার জন্য লিখিয়েছেন?

প্রশ্নের কারণ?

হযরত আলী রা. এর যুগেই রাফিজী শিয়ারা বলতে আরম্ভ করে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে হযরত আলী রা. এর নিকট কোন বিশেষ লিপিবদ্ধ গ্রন্থ আছে। যার জ্ঞান অন্য কারো নেই।

সে যুগেই ইয়াহুদী আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মুসলমানদের মধ্যে ভ্রান্ত আকাইদ বা ধর্ম বিশ্বাসের প্রচার শুরু করে। যেমন, আসল কুরআন তো হযরত আলী রা. এর নিকট সংরক্ষিত। আর এর দশ পারাতে রয়েছে নবী পরিবারের মর্যাদার বিবরণ। মানুষের হাতে যে কুরআন আছে, এটি আসল ও পরিপূর্ণ কুরআন নয়। এ হল, হযরত উসমান রা. কর্তৃক লিপিবদ্ধ কুরআন।

রাফিজীরা এই অপপ্রচারও করছিল যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রা.কে বিশেষভাবে ওহীর কিছু জ্ঞান দান করেছেন। যা বক্ষ থেকে বক্ষ হয়ে শুধু আহলে বাইত তথা নবী পরিবারের দিকে স্থানান্তরিত হতে থাকবে।

এ ধরনের কথায় প্রভাবিত হয়ে হযরত আবূ জুহাইফা রা. এবং নাসাঈ এর রেওয়ায়াত অনুযায়ী কায়েস ইবনে উবাদা, আশতার নাখঈ এবং আরো অনেক লোক হযরত আলী রা. এর নিকট জিজ্ঞেস করল, আপনার নিকট কি বিশেষ কোন বিধি-বিধান বিশিষ্ট ওহী আছে?

যে হাদীসে ওহী সংক্রান্ত প্রশ্নের সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে, এটি বুখারী ১/৪২৮ এ আসবে। এর শব্দরাজি হল- هل عندكم شيئ من الوحي الخ

মোটকথা, হযরত আলী রা. উত্তর দিলেন, لا الا كتاب الله اوفهم اعطيه رجل مسلم. তথা না। আল্লাহর কিতাব ছাড়া ......। অর্থাৎ, আমার নিকট বিশেষ কোন লিপিবদ্ধ গ্রন্থ নেই। যেন হযরত আলী রা. শিয়াদের এ ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করে দিলেন।

উদ্দেশ্য হল, আমার কাছে কোন বিশেষ গ্রন্থ আছে- এরূপ কথা ভ্রান্ত। যারা এরূপ বলে, তাদের কথা ঠিক নয়। আমার নিকট আর কিছু নেই। শুধু আল্লাহর কিতাব আছে যা সবার কাছে আছে। আর আছে নিরাপদ ও সুস্থ বিবেক। যা আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার ব্যক্তিকে দান করেন (অর্থাৎ, এটাও আমার কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য নয়) আর সে বিবেক কিতাবুল্লাহতে চিন্তা ফিকির করে হাকীকত, মারিফত এবং অনেক বিষয় জেনে নেয়, যেগুলোর সুস্পষ্ট উল্লেখ আল্লাহর কিতাবে নেই।

الا كتاب الله اوفهم এই বাক্যের استثناء সম্পর্কে ইখতিলাফ আছে। এটি কি মুত্তাসিল না মুনকাতি'।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ও হাফিজ ইবনে হাজার র. বলেন, এখানে ইসতিসনা মুনকাতি'।

মুহাদ্দিস ইবনে মুনাইয়্যির ও আবুল হাসান সিন্দী র. এর মতে মুত্তাসিল।

মুহাদ্দিস ইবনে মুনাইয়্যির র. বলেন- الا كتاب الله اوفهم পেশ সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। لو كان الاستثناء من غير الجنس لكان منصوبا. فتح. অর্থাৎ, যদি ইসতিসনা মুনকাতি' হত, তবে পেশের স্থলে যবর হত। -ফাতহুল বারী।

এমতাবস্থায় রেওয়ায়াতের অর্থ হবে, আমার নিকট দুটি জিনিস লিপিবদ্ধ আছে- ১. আল্লাহর কিতাব, ২. আল্লাহর প্রদত্ত বুঝ দ্বারা উৎসারিত মাসায়িল। তাঁর বাণী اوفهم اعطيه رجل مسلم. দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। -উমদাহ।

আল্লামা আইনী ও হাফিজ র. এর বাণী ঃ

আল্লামা আইনী ও ইবনে হাজার র. এর ঝোক হল, হযরত আলী র. এর নিকট ইজতিহাদী মাসায়িল লিপিবদ্ধ আকারে ছিল না। অর্থাৎ, ইসতিসনা মুনকাতি' সাব্যস্ত করার জন্য দুটি প্রমাণ পেশ করেছেন-

১. ইমাম বুখারী র. কর্তৃক আনিত কিতাবুদ দিয়াতের হাদীস-

ما عندنا الا ما في القرآن الا فهما يعطي رجل في كتابه. صـــ ١٠٢٠.

এখানে প্রথম প্রমাণ হল, استثناء مفرغ দ্বিতীয়টি হল استثناء منقطع। অর্থাৎ, আমার নিকট শুধু আল্লাহর কিতাব লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু যদি আল্লাহ তা'আলা কাউকে স্বীয় গ্রন্থ কুরআনে হাকীমের বিশেষ বুঝ দান করেন, তবে সে কুরআনে কারীমের যে সব সুস্পষ্ট বিষয় আছে সেগুলো ছাড়া অন্যান্য বিষয় উৎসারণ করার ক্ষমতা লাভ করেন। فتحصل عنده الزيادة بذلك الاعتبار. فتح : ١٦٥/١.

দ্বিতীয় প্রমাণ, যেটি সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট সেটি হল, ইমাম আহমদ র. তারিক ইবনে শিহাব সূত্রে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন-

شهدت عليا على المنبر وهو يقول والله ما عندنا كتاب نقرءه عليكم الا كتاب الله وهذه الصحيفة. عمدة صـــ ١٦٠.

আমি হযরত আলী রা. কে মিম্বরের উপর দেখেছি, তিনি বলছেন, আল্লাহর শপথ! আমার নিকট এরূপ কোন কিতাব নেই, যা পড়ে আমি তোমাদের শুনাব। শুধু মাত্র আল্লাহর কিতাব ও এই সহীফা ছাড়া।

এর দ্বারা পরিস্কার বুঝা গেল, فهم শব্দ দ্বারা হযরত আলী রা. এর উদ্দেশ্য কোন লিপিবদ্ধ জিনিস নয়। যদি কিছু ইজতিহাদী মাসায়িল লিপিবদ্ধ থাকত, তবে সেগুলো অবশ্যই তিনি উল্লেখ করতেন।

সে সহীফায় কি ছিল?

হযরত আবূ জুহায়ফা রা.বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ সহীফায় কি লিপিবদ্ধ আছে? হযরত আলী রা. বললেন, العقل وفكاك الاسير ولا يقتل مسلم بكافر. অর্থাৎ, এই সহীফাতে দিয়তের মাসায়িল এবং কয়েদী মুক্তকরণ সংক্রান্ত আহকাম রয়েছে, আরো আছে এ হুকুম যে, কোন মুসলমানকে কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা যাবেনা।

قوله العقل اي الدية وانما سميت به لانهم كانوا يعطون فيها الابل ويربطونها بفناء دار القتول بالعقال وهو الحبل ورفع في رواية ابن ماجه بدل العقل الديات والمراد احكامها ومقاديرها واصنافها. فتح : ١٦٥/١ -١٦٦.

আকল দ্বারা উদ্দেশ্য দিয়ত বা রক্তপনের বিধি-বিধান পরিমান ও প্রকার ভেদ। অর্থাৎ, দিয়ত কত প্রকার? এর ওয়াজিব হওয়ার কি ছুরত? কিভাবে তা আদায় করা হয়?

لا يقتل مسلم بكافر এটি একটি বিরাট বিতর্কিত বিষয়। যদি কোন মুসলমান কোন কাফিরকে হত্যা করে, তাহলে সে ঘাতক মুসলমানকে নিহত কাফিরের পরিবর্তে কিসাস রূপে হত্যা করা যাবে কি না?

নিহত কাফিরের তিনটি ছুরত রয়েছে- ১. হরবী (শত্রুরাষ্ট্রের কাফির)। ২. নিরাপত্তাকামী (সংখ্যালঘু) শান্তি চুক্তিকারী। ৩. যিম্মী (ইসলামে রাষ্ট্রে বশ্যতা স্বীকার করে তাতে বসবাসকারী বিধর্মী)।

হরবী কাফির সম্পর্কে কোন মতবিরোধ নেই। কারণ, সবার মতে তাকে হত্যা করা বৈধ। এজন্য একজন হরবী কাফিরকে হত্যা করলে সর্বসম্মতিক্রমে সে মুসলমান থেকে কিসাস নেয়া যাবে না।

১. শান্তি চুক্তিকারী নিরাপত্তাকামী এবং যিম্মী সম্পর্কে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে।

ইমামত্রয় বলেন, মুসলমান থেকে কিসাস নেয়া যাবে না। অবশ্য যিম্মী ও নিরাপত্তাকামীর ব্যাপারে রক্তপন আবশ্যক হবে। তাঁরা বলেন, চুক্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনার ফলে যদিও হেফাজত আবশ্যক হয়ে গেছে

কিন্তু হত্যা হালাল হওয়ার জন্য মূল কারণ রীতিমত অবশিষ্ট আছে। সুতরাং একজন মুসলমানের প্রাণ তার বিনিময়ে নেয়া যাবে না। এমতই পোষন করেন, আওযাঈ, লাইছ, সাওরী ও ইসহাক র. প্রমুখ। -উমদা।

◆ ইমামত্রয় প্রমুখ আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস لا يقتل مسلم بكافر দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। তারা বলেন, মুসলিম শব্দটিও নাকিরা আর কাফির শব্দটিও নাকিরা। মূলনীতি হল, نفي এর অধীনে নাকিরা ব্যাপকতার ফায়দা দেয়। অতএব হাদীস শরীফের অর্থ হল, কোন মুসলমানকে কোন কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না। চাই সে কাফির হরবী হোক বা যিম্মী।

◆ হানাফী ইমামগণের মত হল, যদি মুসলমান কোন যিম্মীকে হত্যা করে, তবে সে কাফির যিম্মীর পরিবর্তে মুসলমান থেকে কিসাস নেয়া যাবেনা। এটাই হল, নাখঈ, শা'বী, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, মুহাম্মদ ইবনে আবূ লাইলা, উসমান আল বাত্তী প্রমুখের মত। এটি হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা., আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. ও উমর ইবনে আবদুল আযীয র. এর একটি রেওয়ায়াত। ইমাম মালিক ও লাইছ ইবনে সা'দ র. বলেন, যদি মুসলমান ধোকা দিয়ে কোন যিম্মীকে হত্যা করে তবে সে মুসলমানের উপর কিসাস আসবে। আর যদি অন্য কোন পন্থায় হত্যা করে তবে কিসাস আসবে না। -উমদা।

হানাফী ইমামগণের প্রমাণাদি ঃ

১. কিসাস সংক্রান্ত কুরআনের নসগুলো শর্তহীন। যেমন,

১. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ الخ. سورة البقرة : ١٧٨.

২. كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ الخ. سورة المائدة : ٤٥.

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে যিম্মীকে ব্যতিক্রমভূক্ত করা হয়নি।

৩. وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اِلاَّ بِا لْحَقِّ. سورة الفرقان : ٦٨.

এ আয়াতে প্রাণ হারাম হওয়ার বিষয়টি যিম্মীকেও অন্তর্ভূক্ত করে। অতএব তার ঘাতকের উপরও কিসাস ওয়াজিব হওয়া উচিত।

৪. وقال بعض الحنفية وقع الاجماع على ان المسلم تقطع يده اذا سرق من مال الذمي فكذا يقتل اذا قتله الخ. عمدة

অর্থাৎ, যদি কেউ যিম্মীর মাল চুরি করে তবে তার উপর সর্ব সম্মতিক্রমে হাত কর্তনের শাস্তি রয়েছে। এর উপর কিয়াস করলে বুঝা যায় যিম্মীর ঘাতকের উপর উত্তম রূপেই কিসাস ওয়াজিব হওয়া উচিত। কারণ, প্রাণ হত্যার বিষয়টি মাল চুরির তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

হানাফীদের পক্ষ থেকে উত্তর ঃ

ইমাম ত্বাহাবী র. উত্তর দিয়েছেন- لا يقتل مسلم بكافر

হাদীসে কাফির দ্বারা হরবী কাফির উদ্দেশ্য। এর প্রমাণ হল, কোন কোন রেওয়ায়াতে لا يقتل مسلم بكافر এর পর ولا ذوعهد بعهده শব্দও রয়েছে। كما في ابي داود :٦٢٣/٢، وأيضا طحاوي : ٩٣/٢، باب المؤمن يقتل الكافر متعمدا. এতে واو عاطفة রয়েছে। যার আতফ হয়েছে مسلم শব্দের উপর। অতএব অর্থ হল, কোন মুসলমান এবং যিম্মী কোন কাফিরের মুকাবিলায় হত্যা করা যাবে না। অতএব যিম্মী ও কাফিরের মুকাবিলা দ্বারা বুঝা গেল, কাফির দ্বারা উদ্দেশ্য হরবী।

২. কেউ কেউ উত্তর দিয়েছেন- لا يقتل مسلم বাক্যে মুসলমান এবং মুসলমানের পর্যায়ভূক্ত লোক উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, মুসলিম শব্দটি প্রকৃত ও হুকমী উভয়টিকে অন্তর্ভূক্ত করে। হুকমী মুসলিম দ্বারা উদ্দেশ্য যিম্মী। কারণ, তারা মাল এবং সত্ত্বা উভয়টির জন্য জিযিয়া গ্রহণ করে নিয়েছে।

١١١. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضـ أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ أَوْ الْفِيلَ

قَالَ أَبُو عَبْد.اللَّه كَذَا قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ وَاجْعَلُوهُ عَلَى الشَّكِّ الْفِيلَ أَوْ الْقَتْلَ وَغَيْرُهُ يَقُولُ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي أَلَا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اكْتُبُوا لِأَبِي فُلَانٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْخِرَ إِلَّا الْإِذْخِرَ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ يُقَالُ يُقَادُ بِالْقَافِ فَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَيُّ شَيْءٍ كَتَبَ لَهُ قَالَ كَتَبَ لَهُ هَذِهِ الْخُطْبَةَ

১১১. আবূ নুআইম ফযল ইবনে দুকাইন র. .... হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয় কালে খুযা'আ গোত্র লাইস গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। এ হত্যা ছিল তাদের এক নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ স্বরূপ, যাকে পূর্বে লাইস গোত্রের লোক হত্যা করেছিল। অতঃপর এ সংবাদ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছল। তিনি তাঁর উটের উপর আরোহণ করে খুতবা দিলেন, তিনি বললেন, ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মক্কা থেকে 'হত্যা'-কে (অথবা বর্ণনাকারী বললেন) 'হাতী'-কে রোধ করেছেন।

ইমাম বুখারী র. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হত্যা' বলেছেন না 'হাতী' বলেছেন এ ব্যাপারে বর্ণনাকারী আবূ নুআইম সন্দেহ পোষণ করেন। অন্যেরা শুধু 'হাতী' শব্দ (নিঃসন্দেহে) উল্লেখ করেছেন। (প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,) অবশ্য মক্কাবাসীদের উপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুমিনগণকে (যুদ্ধের মাধ্যমে) বিজয়ী করা হয়েছে। জেনে রাখ, আমার পূর্বে কারো জন্য মক্কা (নগরীতে লড়াই করা) হালাল করা হয়নি এবং আমার পরও কারো জন্য হালাল হবে না। জেনে রাখ, তাও আমার জন্য দিনের কিছু সময় মাত্র হালাল করা হয়েছিল। আরো জেনে রাখ যে, আমার এই কথা বলার মুহূর্তে আবার তা হারাম হয়ে গেছে। সেখানকার কোন কাঁটা ও কোন (নিজে নিজে উৎপন্ন) গাছপালা কাটা যাবে না এবং সেখানে পড়ে থাকা কোন বস্তু কুড়িয়ে নেয়া যাবে না। তবে ঘোষণা করার নিয়তে নিতে পারবে। আর যদি কেউ নিহত হয়, তবে তার আপনজনের জন্য দুটি ব্যবস্থার যে কোন একটির অধিকার রয়েছে। হয় তার 'দিয়ত নিবে, নয় 'কিসাস' গ্রহণ করবে। এরপর ইয়ামানবাসী এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! (এ কথাগুলো) আমাকে লিখে দিন। তিনি (সাহাবীদের) বললেন ঃ তোমরা

তাকে (আবূ শাহকে) লিখে দাও। তারপর একজন কুরাইশী [হযরত আব্বাস রা.] বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! গাছপালা কাটার নিষেধাজ্ঞা হতে ইযখির বাদ রাখুন। কারণ, তা আমরা আমাদের ঘরে ও কবরে ব্যবহার করি।' নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, 'ইযখির ছাড়া, ইযখির ছাড়া অর্থাৎ, তা কাটা যাবে।'

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল اكتبوا لابي فلان বাক্যে স্পষ্ট। এর দ্বারা পরিষ্কার জানা গেল যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে হাদীস লেখা আরম্ভ হয়েছে। যেহেতু আবূ শাহ রা. অন্ধ ছিলেন, সেহেতু তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লেখানোর দরখাস্ত করছেন।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ইলম ঃ ২১, লুকতা ঃ ৩২৮, ইয়াহইয়া ইবনে মূসা সূত্রে, দিয়াত ঃ ১০১৬।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে দুটি হত্যার উল্লেখ রয়েছে। যার বিস্তারিত বিবরণ হল এই-

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে বনূ খুযাআ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিত্র হয়ে গিয়েছিল। আর বনু বকর বা বনু লাইস (সংশয় সহকারে) কুরাইশের মিত্র হয়ে যায়। পারস্পরিক চুক্তি হয়েছিল, দশ বছর পর্যন্ত কেউ কারো উপর আক্রমণ করবে না। বনু লাইস বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং খুযাআর এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। কুরাইশের কাফিররা গোপনে বনু লাইসের সাহায্য করে। তখন বনু খুযাআ এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য এবং সাহায্য প্রার্থনার উদ্দেশ্যে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে একটি প্রতিনিধি দল পাঠায়। কারণ তারা ছিল রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিত্র। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন হযরত মাইমূনা রা. এর ঘরে তাশরীফ রাখছিলেন। তিনি তখন আসরের অযু করছিলেন। সে প্রতিনিধি দল পৌঁছার আগেই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- لبيك لبيك نصرت نصرت نصرت হযরত মাইমূনা রা. সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কার সাথে কথা বলছেন? তিনি ইরশাদ করলেন, বনু খুযাআর প্রতিনিধি দল সাহায্য প্রার্থনার জন্য আসছে। বনু লাইস তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এর সামান্য কিছুক্ষন পরই সে প্রতিনিধি দল এসে পৌঁছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সান্তনা দেন এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এ ঘটনাই হুদাইবিয়ার চুক্তি ভঙ্গের কারণ হয়। মধ্যবর্তী ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের জন্য নাসরুল বারী, কিতাবুল মাগাযী, মক্কা বিজয় ঃ ৩৩০-৩৩১ দ্রষ্টব্য।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আক্রমন করেন। মক্কা বিজিত হয়। এরপর তিনি নিরাপত্তার ঘোষনা দেন। যেহেতু বনু খুযাআ স্বীয় লোক নিহত হওয়ার ফলে হিংসায় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল। এজন্য তারা বনু লাইসের সে ঘাতককে দেখামাত্র তৎক্ষনাৎ তার উপর আক্রমন করে বসে। খিরাস ইবনে উমাইয়্যা খুযাঈ তাকে হত্যা করে ফেলেন। এই খিরাস ইবনে উমাইয়া মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমান হয়েছিলেন এবং নিরাপত্তা ঘোষনার পর হত্যা করেছিলেন। এতে প্রমাণিত হল, একজন মুসলমান একজন যিম্মীকে হত্যা করেছেন।

এবার লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি হুকুম জারি করেছেন। এর উত্তর এ হাদীসে সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন মুসলমান কর্তৃক যিম্মীকে হত্যার সংবাদ দেয়া হয়, তখন তিনি স্বীয় উটনীর উপর আরোহন করে বক্তব্য দিয়েছেন। বিভিন্ন কথার সাথে নিম্নোক্ত ইরশাদও করেছেন- فمن قتل فهو بخير النظرين اما ان يعقل واما ان يقاد. তথা

যাকে হত্যা করা হবে তার উত্তরাধিকারীদের দুটির যে কোন একটি এখতিয়ার থাকবে। হয়ত রক্তপণ নিবে অথবা কিসাস। এই কানূন বর্ণনা করে দিলেন যে, যিম্মীর বদলে মুসলমানকে হত্যা করা যায়।

ان الله حبس عن مكة الخ. নিরাপত্তা ঘোষনার পর খুযাঈর হত্যার সংবাদে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটনীর উপর আরোহন করে ইরশাদ করেছেন- আল্লাহ তা'আলা মক্কা থেকে কতল অথবা হস্তিকে বারণ করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قتل শব্দ বলেছেন অথবা فيل শব্দ। ইমাম বুখারী র. বলেন, এটাকে সন্দেহের উপরই থাকতে দেয়া হোক। কারণ, আমার উস্তাদ আবূ নুআইম র. আমার নিকট এরূপ দোদুল্যমানতার সাথেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ রেওয়ায়াতের দ্বিতীয় বর্ণনাকারী যেমন উবাইদুল্লাহ ইবনে মূসা, শায়বানের ছাত্র প্রমুখ সুনির্দিষ্ট রূপে الفيل বলেন। যেন القتل এবং الفيل এর সন্দেহ শুধু আবু নুআইমের পক্ষ থেকে।

যদি قتل শব্দ হয়, তবে অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা মক্কায় কতলকে বারণ করেছেন। হারাম করে দিয়েছেন। আর যদি فيل শব্দ হয়, তবে এটি সূরা ফীলে উল্লেখিত হস্তিবাহিনীর ঘটনার দিকে ইঙ্গিত হবে। এঘটনা ঘটেছিল রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের কয়েকদিন পূর্বে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সূরা ফীলের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

لا تلتقط ساقطتها الا لمنشد সেখানের পড়ে থাকা জিনিস যেন কেউ না উঠায়, তবে সে তুলতে পারবে যে মালিক তালাশ করে সেখানে পৌছে দিতে চায়। মূলত انشاد শব্দের অর্থ হল, স্বর উচু করা অর্থাৎ, মালিক পর্যন্ত পৌছানোর ইচ্ছা ঘোষনা করা।

বাহ্যত বিশেষিতকরণের বিষয়টি অনর্থক মনে হচ্ছে। কারণ, সমস্ত জায়গার হুকুম এটাই। কোন জায়গাতেই পড়ে থাকা জিনিস তুলে নেয়া এরূপ ঘোষক ছাড়া অন্য কারো জন্য জায়িয নেই।

◆ শাফিঈগণ বিশেষিতকরণের এই কারণ বর্ণনা করেন যে, হেরেমে মক্কার পড়ে থাকা জিনিসের ঘোষনা চিরস্থায়ী বলা উদ্দেশ্য। এর পরিপন্থী অন্য স্থানে পড়ে থাকা জিনিস। কারণ, সেগুলোর জন্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ঘোষনা করবে এরপর ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু মক্কা মুকাররামায় পড়ে থাকা জিনিস ব্যবহার করতে পারবে না। সর্বদা ঘোষনা দিতেই থাকবে।

◆ হানাফীদের মতে মক্কা মুয়াজ্জামার পড়ে থাকা জিনিসের হুকুম তাই। যা সাধারণ পড়ে থাকা জিনিসের। তাহলে বিশেষভাবে এর উল্লেখের কারণ কি?

আসলে এর কারণ হল, এখানে মালিক পাওয়া খুব মুশকিল। কারণ, হজ্বের মওসুমে বিশ্বের দিক দিগন্ত থেকে লোকজন একত্রিত হয়, তা ছাড়া লোকজন সেখানে এক স্থানে অবস্থান করে না। এ জন্য সম্ভাবনা ছিল হয়ত পড়ে থাকা জিনিস যে তুলে নিবে সে ঘোষনাকে অনর্থক মনে করে এতে শিথিলতা প্রদর্শন করতে পারে যে, লাখ লাখ মানুষের ভিড়ে মালিক পাওয়ার আশা নাই। অতএব চল নিজেই ব্যবহার করি। এজন্য তাকিদ দিয়েছেন যে, মক্কার পড়ে থাকা জিনিস সেই উঠাবে যে ঘোষনা করবে।

فمن قتل فهو بخير النظرين এখানে তো এমনই আছে। এখানে কিছু উহ্য রয়েছে। এর বিবরণ ইমাম বুখারী র.এর দিয়াতের রেওয়ায়াতে রয়েছে- فمن قتل له قتيل. فتح অর্থাৎ, যাকে হত্যা করা হয় তার (ওয়ারিসদের) দুটির একটি এখতিয়ার আছে- হয়ত রক্তপণ নিবে, নয়ত কিসাস। هو যমীর দ্বারা নিহতের ওয়ারিস বা নিহতের অভিভাবকের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, নিহত ব্যক্তি তো মরেই গেছে। তাকে এ দুটির এখতিয়ার দেয়ার প্রশ্নই আসে না।

اما ان يعقل واما ان يقاد এটি দুই এখতিয়ারের তাফসীর ও বিস্তারিত বিবরণ। অর্থাৎ, নিহতের ওয়ারিসদের দুটির একটি এখতিয়ার থাকবে। দিয়ত বা কিসাস। যে কোন একটি বেছে নিতে পারে।

এ ব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধ আছে। শাফিঈ ও হাম্বলীগণের মতে শুধু নিহতের উত্তরাধিকারীর এখতিয়ার আছে। অর্থাৎ, রক্তপণের ক্ষেত্রে ঘাতকের সম্মতির শর্ত নেই। তারা আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যে, এতে ঘাতকের সম্মতির উল্লেখ নেই।

হানাফী ও মালিকীগণের মতে ঘাতকের সম্মতির শর্ত আছে। এটাই ইমাম আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, ইবরাহীম নাখঈ ও সাওরী র. প্রমুখের মত। -উমদাহ।

অর্থাৎ, ঘাতকের অভিভাবকের হত্যার বা ক্ষমা করার অধিকার আছে। তবে রক্তপণের অধিকার ঘাতকের সম্মতি ব্যতীত নয়। ইচ্ছাকৃত হত্যার মূল দাবী হল কিসাস। যেমন, কুরআনে হাকীমে এসেছে- وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الخ ও كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الخ.

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস হানাফীদের পরিপন্থী নয় ঃ

◆ হযরত শাহ সাহেব র. বলেছেন, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস আমাদের পরিপন্থী নয়। কারণ, এখানে হাদীসে নিহতের অভিভাবককে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। কিসাসও নিতে পারে, রক্তপণও নিতে পারে। এটাকে আমরাও মানি। বাকী রইল এখানে ঘাতকের সম্মতির উল্লেখ নেই। এর কারণ হল, স্বীয় জান এরূপ মূল্যবান জিনিস দেয়ার পরিবর্তে অর্থ দেয়ার ব্যাপারে সম্মতি স্পষ্ট বিষয় ছিল। যা কিছু জটিলতা বাহ্যত হয়ে থাকে, তা নিহতের অভিভাবকদের সম্মতিতে হয়ে থাকে। কারণ, তারা জানের বদলে রক্তপণ নিলে যেন নিম্নস্তরের জিনিসের উপর সম্মত হয়ে গেল।

◆ হাফিজ আইনী র. بخير النظرين এর উপর লিখেছেন, এটি নিহতের অভিভাবকদের জন্য এখতিয়ার নয়, বরং তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যে, উত্তম ও উপকারী পন্থা অবলম্বন করলে ভাল। এর দ্বারা এ কথা বুঝা হাদীসে নববীর উদ্দেশ্য নয় যে, তাদেরকে স্বতন্ত্রভাবে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। অথবা তাদের জন্য ঘাতকের সম্মতিরও প্রয়োজন নেই। -আনওয়ারুল বারী।

আরো বিস্তারিত বিবরণ কিতাবুদ দিয়াতে ইনশাআল্লাহ আসবে।

١١٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضـــ يَقُولُ مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

১১২. আলী ইবনে আবদুল্লাহ্ র. .... হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেন ঃ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রা. ছাড়া আর কারো কাছে আমার চেয়ে বেশি হাদীস নেই। কারণ, তিনি লিখে রাখতেন, আর আমি লিখতাম না। মা'মার র. ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ এর মুতাবাআত রয়েছে। তিনি হাম্মাম র. সূত্রে আবূ হুরায়রা রা. থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল فانه كان يكتب الخ. বাক্যে স্পষ্ট। অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হাদীস লিখতেন। আল্লামা আইনী র. বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত আছে, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রুত হাদীসগুলো লেখার অনুমতি চেয়েছিলাম। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।

অতএব সাহাবীর আমল এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিতে হাদীস লেখার কাজ প্রমাণিত হল।

ব্যাখ্যা ঃ ما من اصحاب الخ - ما مشبه بليس এর ইসম হল احد আর اكثر حديثا তার খবর। এ কারণে اكثر কে যবরসহ পড়া হবে। আর এটাই প্রধান মত। আর اكثر এ পেশ পড়াও সহীহ আছে। এ ছুরতে احد এর সিফাত হবে। -উমদাহ।

فانه كان يكتب ولا يكتب 'তিনি লিখতেন, আমি লিখতাম না।' হযরত আবূ হুরায়রা রা. একথাটি নিজের ধারনা ও আন্দাজ অনুযায়ী বলেছেন। অন্যথায় বাস্তবতা হল, উম্মতে মুহাম্মাদী হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বেশি হাদীস পেয়েছেন। আবার এটাও হতে পারে যে, হাদীস ভাণ্ডার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. এর নিকট বেশি ছিল। কিন্তু রেওয়ায়াতের সুযোগ তার কম হয়েছে। নিজে হাদীস বেশি বর্ণনা করেননি। হাদীসের স্বল্প বিবরণ এর প্রমাণ নয় যে, তার নিকট হাদীস ভাণ্ডার কম ছিল। খলীফা চতুষ্টয় বিশেষত হযরত সিদ্দীকে আকবার র. সূত্রে বর্ণিত হাদীস খুবই কম। এটা কি সম্ভব, কেউ বলবে যে, হযরত সিদ্দীকে আকবার রা. এর নিকট হাদীস কম জানা ছিল? যিনি সর্বপ্রথম মুমিন প্রকাশ্যে ও অন্তরঙ্গ পরিবেশে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এরূপভাবে সর্বদা সহচর রূপে থাকেন যে, গারের সঙ্গী একটি বাগধারাই হয়ে গেছে। বৈশিষ্ট্যের উল্লেখের বা কি আছে? হযরত সিদ্দীকে আকবার রা. ও ফারুকে আজম রা. উভয়ে ছিলেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন্ত্রী ও বিশেষ পরামর্শদাতা-উপদেষ্টা। এক মিনিটের জন্য এ কল্পনা করা যায় না যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী ও বাণী তাদের নিকট হযরত আবূ হুরায়রা রা. অপেক্ষা কম পৌছেছে। এটা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর রেওয়ায়াতাধিক্যের কারণ

আল্লামা আইনী র. প্রমুখ লিখেন, হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর রেওয়ায়াতাধিক্যের একটি কারণ অবস্থানস্থলও ছিল। বিভিন্ন শহর ও দেশ বিজয়ের পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. এর বসবাস অধিকাংশ সময় ছিল তায়েফ ও মিসরে। এ সব স্থান ইলমী দিক দিয়ে কোন কেন্দ্রীয় ছিল না। এর পরিপন্থী হযরত আবূ হুরায়রা রা.। তিনি মদীনা মুনাওয়ারাকে স্বীয় আবাস বানিয়ে নিয়েছেন। মদীনা মুনাওয়ারা ছিল সর্বদিক দিয়ে মুসলমানদের মনযিলে মাকসূদ।

মদীনা তাইয়্যিবা ইলমী কেন্দ্র হওয়ার ফলে আগতদের সংখ্যা অনেক বেশী হত। হযরত আবূ হুরায়রা রা. জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মদীনা মুনাওয়ারায় ফতওয়া ও হাদীস বর্ণনায় রত ছিলেন। প্রচুর পরিমাণ লোক তাঁর কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। যার ফলে তার রেওয়ায়াত সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। তিনি ৫৩৭৪টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. এর হাদীস সংখ্যা ৭০০ এর বেশি নয়। ইমাম বুখারী র. বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে ৮০০ তাবিঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় কারণ হল, রাসূলে আকরাম সা. এর দু'আ ঃ

একবার হযরত আবূ হুরায়রা রা. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আরয করলেন। বিস্মৃতির কারণে হাদীস বেশি হারিয়ে ফেলি, ভুলে যাই। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে তাঁর জন্য না ভুলে যাওয়ার দু'আ করলেন। এটি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দু'আরই ফয়েয ছিল যে, উম্মতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উলূমে হাদীসের বিরাট অংশ হযরত আবূ হুরায়রা রা.এর কাছ থেকে পেয়েছে।

হরযত আবূ হুরায়রা রা. এর জন্য দু'আ সংক্রান্ত রেওয়ায়াতটি باب حفظ العلم এ আসছে।

তৃতীয় কারণ এই বর্ণিত হয়েছে যে, শামে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. আহলে কিতাবের গ্রন্থাবলীর একটি ভাণ্ডার পেয়েছিলেন। তিনি তা অধ্যয়ন করতেন। তন্মধ্য থেকে কোন কোন রেওয়ায়াতও বর্ণনা করতেন। এ কারণে অনেক তাবিঈ তাঁর থেকে হাদীস নিতে পরহেয করতেন। কারণ, হতে পারে এটি ইসরাঈলী।

চতুর্থ কারণ, হাফিজ ইবনে হাজার র. লিখেছেন- ان عبد الله كان مشتغلا بالعبادة اكثر من اشتغاله التعليم. فتح অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. তা'লীম ও শিক্ষা দানের তুলনায় ইবাদতে বেশি সময় রত থাকতেন। এর বিপরীত হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর স স্বাভাবিক ঝোক ইলমী ব্যস্ততার দিকে বেশি ছিল। এজন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. এর তুলনায় হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর রেওয়ায়াত সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়।

١١٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضــ قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ قَالَ ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ قَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا فَاخْتَلَفُوا وَكَثُرَ اللَّغَطُ قَالَ قُومُوا عَنِّي وَلَا يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ كِتَابِهِ

১১৩. ইয়াহইয়া ইবনে সুলায়মান র. ...... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রোগ যখন বেড়ে গেল তখন তিনি বললেন ঃ 'আমার কাছে কাগজ কলম নিয়ে এস, আমি তোমাদের এমন কিছু লিখে দিব যাতে পরবর্তীতে তোমরা আর বিভ্রান্ত না হও।' হযরত উমর রা. বললেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রোগ-যন্ত্রণা প্রবল হয়ে গেছে (এমতাবস্থায় কিছু বলতে বা লিখতে তাঁর কষ্ট হবে)। আর আমাদের কাছে তো আল্লাহর কিতাব রয়েছে, যা আমাদের জন্য যথেষ্ট।' এতে সাহাবীগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল এবং হট্টগোল বেড়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা আমার কাছ থেকে উঠে যাও। আমার কাছে ঝগড়া-বিবাদ করা ঠিক নয়।' এ পর্যন্ত বর্ণনা করে হযরত ইবনে আব্বাস রা. (যেখানে বসে হাদীস বর্ণনা করছিলেন সেখান থেকে) এ কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন যে, 'হায় বিপদ, সাংঘাতিক বিপদ! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর লেখনীর মধ্যে যা প্রতিবন্ধক হয়েছে তথা লেখাতে দেয়নি।'

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا الخ বাক্যে স্পষ্ট। অর্থাৎ, পিছনের তিনটি রেওয়ায়াতে কোথাও স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর লেখার ইচ্ছার আলোচনা নেই। এজন্য এবার এ অনুচ্ছেদে চতুর্থ ও সর্বশেষ রেওয়ায়াত এনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর লেখার ইচ্ছার প্রমাণও পেশ করেছেন। এটাকে বলে حديث القرطاس

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ইলম ঃ ২২, জিহাদ ঃ ৪২৯, ইখরাজুল ইয়াহুদ ঃ ৪৪৯, মাগাযী ঃ ৬৩৮, কিতাবুল মারযা ঃ ৮৪৬, ই'তিসাম ঃ ১০৯৫।

সতর্কবাণী ঃ এ হাদীসুল কিরতাসের মোটামুটি বিস্তারিত বিবরণ অধম নাসরুল বারী কিতাবুল মাগাযীতে বর্ণনা করেছে। দ্রষ্টব্য ঃ নাসরুল বারী, কিতাবুল মাগাযী ঃ ৫২২-৫২৭।

এবার এখানে হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমদ র. এর সুক্ষ্ম রচনা ইরশাদুল কারী থেকে বর্ণনা করে দেয়া যথেষ্ট মনে করি। তাতে ছাত্রগণ এ যুগের বড় মুহাদ্দিসের বক্তব্য দ্বারাও উপকৃত হতে পারে।

কাগজের ঘটনা

এটি কাগজের ঘটনা নামে প্রসিদ্ধ। এর বিস্তারিত বিবরণ হল নিম্নরূপ-

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় আখেরী অসুস্থতার সময় ওফাতের চারদিন পূর্বে বৃহস্পতিবার দিন স্বীয় সাহাবায়ে কিরাম রা.কে বলেছিলেন, তোমরা কাগজ আন, আমি একটি লেখা লিখে দিব। তারপর তোমরা কখনো পথ ভ্রষ্ট হবে না। হযরত উমর রা. বললেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এখন রোগের কষ্ট বেশি। অতএব তাঁকে এখন কষ্ট না দেয়া উচিত। জরুরী আহকামের জন্য আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট। আর নাম না জানা কোন কোন লোকের রায় হল, লেখিয়ে নেয়া উচিত। ইতোমধ্যে কিছুসংখ্যক লোক, যাদের নাম কোন রেওয়ায়াতে উল্লেখ নেই, তাঁরা বললেন, اهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم استفهموه তথা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিচ্ছেদের সময় এসে গেছে? তাঁকে জিজ্ঞেস কর। অতঃপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে কাগজ লেখানোর সুনিশ্চিত কোন নির্দেশ দেননি এবং না এর পর অন্য কোন সময় এ সম্পর্কে কিছু বলেছেন। অথচ এরপর চার দিন পর্যন্ত তিনি এ দুনিয়াতে জীবিত ছিলেন।

ঘটনাতো শুধু এতটুকুই যা উপরে বর্ণিত হল, কিন্তু শিয়ারা অত্যন্ত ধৃষ্টতার সাথে এ ঘটনায় হযরত উমর রা. এর বিরুদ্ধে তিনটি প্রশ্ন অত্যন্ত জোরালোভাবে উত্থাপন করে।

১. হযরত উমর রা. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেছেন, নাউযুবিল্লাহ তিনি বাজে প্রলাপোক্তি করেন। هجر শব্দের অর্থ বাজে প্রলাপোক্তি করা। তারা এটাকে হযরত উমর রা. এর উক্তি সাব্যস্ত করেন।

২. এরূপ জরুরী লেখা যার পর কিয়ামত পর্যন্ত পথভ্রষ্টতার আশংকাই থাকত না, হযরত উমর রা. তা লিখতে দেননি। এতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অবাধ্যতাও হয়েছে এবং ক্ষতি হয়েছে গোটা মুসলিম জাতির।

৩. হযরত ওমর রা. حسبنا كتاب الله বলেছেন, যার অর্থ হল হাদীসের কোন প্রয়োজন নেই।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর ঃ هجر। শব্দটি হযরত উমর রা. এর উক্তি নয়। আহলে সুন্নতের কোন একটি সহীহ রেওয়ায়াতও এই অপবাদের প্রমাণে পাওয়া যাবে না। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী র. ফাতহুল বারীতে লিখেন যে, কোন রেওয়ায়াতে এটি নেই যে, এ শব্দটি হযরত উমর রা. এর উক্তি। শাহ আবদুল আযীয র.ও তোহফায়ে ইসনা আশারিয়্যায় এটাই লিখেছেন। শীয়া আলিমরাও যারা গোয়েন্দাগিরী ও ছিদ্রান্বেষণে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন, তাদের ডজনকে ডজন লোক কয়েকশ বছর পর্যন্ত এরূপ রেওয়ায়াত অন্বেষণে লিপ্ত। কিন্তু বহু দাবী সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কোন রেওয়ায়াত পেশ করতে পারেননি। অতএব যদি কোন হকপন্থী আলিম এটাকে উমর রা. এর উক্তি স্বীকার করেও নেন, তাহলে তাদের ধোঁকা হয়েছে। কারণ, শিয়ারা তাদের মিথ্যা অপবাদগুলোকে এরূপ প্রসিদ্ধ করেছে এবং জনসাধারণ্যে এরূপ ছড়িয়েছে, যার ফলে এই ব্যাপক প্রসিদ্ধির কারণে কোন কোন বিশেষ ব্যক্তিও ধোঁকায় পড়েছেন। যার অনেক নজির রয়েছে যেমন, ইমাম মালিক র. এর মাযহাবে মুত'আ বিয়ের বৈধতা এরূপ প্রসিদ্ধ করা হয়েছে যে, হিদায়া গ্রন্থকারের ন্যায় মুহাক্কিক আলিমও ধোঁকায় পড়েছেন। কোন বড় অপেক্ষা বড় আলিমেরও ধোঁকায় পড়ে

যাওয়া অযৌক্তিক নয়। এজন্য আমরা দাবী করেছি, কোন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত সহীহ সনদে পেশ করুন। প্রথমত প্রতিটি ব্যক্তির 'সনদ বিহীন' বলে দেয়ার ফলে একটি রেওয়ায়াত মুয়াল্লাক হতে পারে না। মুয়াল্লাক বলা হয়, কোন মুহাদ্দিস কর্তৃক রেওয়ায়াত করার সময় সনদ উল্লেখ করা ব্যতীত এমনিই কোন কিছু বর্ণনা করে দেয়াকে। অতঃপর প্রতিটি মুয়াল্লাক রেওয়ায়াত সহীহ হওয়াও ভুল। অন্যথায় সনদ তো একটি নিরর্থক বস্তু হয়ে দাঁড়াবে। মাওলানা আবদুল হাই র. জাফরুল আমানীতে বলেন-

تلك الاخبار لا يعتبر بها ما لم يعلم سندها ومخرجها الى ان قال المرسل انما هو ما ارسله راوي الحديث وترك الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا مجرد قول كل من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والا لزم ان يكون قول العوام والصوفية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا مرسلا.

والوجه فيه ان الارسال والانقطاع ونحو ذلك من صفات الاسناد ويتصف الحديث به بواسطة فحيث لا اسناد فلا ارسال ولا انقطاع ولا اتصال وانما هو مجرد نقل اعتمادا على الغير ومن المعلوم ان صاحب الهداية وغيره من اكابر الفقهاء ومؤلف احياء العلوم وغيره من اجلة العرفاء ليسوا من المحدثين ولا من المخرجين وان كانوا في الفقه اوالتصوف وغيرهما من الكاملين.

২. هجر । শব্দটির অর্থ শুধু প্রলাপোক্তি নয় বরং এ শব্দটি বিচ্ছিন্নতার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- واهجرهم هجرا جميلا তথা সৌজন্যের সাথে তাদের বর্জন করুন।

এই অর্থটি অভিধান ছাড়া হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণও লেখেন। -ফাতহুল বারী ঃ ৮/১০১ এ আছে-

ويحتمل ان يكون قوله اهجر فعلا ماضيا من الهجر بفتح الهاء وسكون الجيم والمفعول محذوف اي الحياة وذكره بلفظ الماضي مبالغة لما راى من علامات الموت.

অর্থাৎ, هجر শব্দটি অতীত ক্রিয়া هجر ও হতে পারে। এর মাফউল উহ্য। অর্থাৎ, তিনি পার্থিব জীবন সমাপ্ত করে ফেলেছেন। অতীত ক্রিয়ার শব্দ উল্লেখ করেছেন ওফাতের আমালত দেখে আতিশয্য বুঝানোর জন্য। আল্লামা মুহাম্মদ তাহির গুজরাটি র মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার (এটি বিশেষভাবে হাদীস সংক্রান্ত অভিধান) নামক গ্রন্থে বলেন-

ويحتمل ان يكون معناه هجركم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجر ضد الوصل.

বরং তাহকীক হল, এই শব্দটির আসল অর্থ বিচ্ছিন্নতাই। প্রলাপোক্তির অর্থেও এই সম্পর্কের কারণে ব্যবহৃত হয় যে, তাতে বিবেক থেকে বিচ্ছিন্নতা হয়। আর এ অর্থটিই বেশি প্রসিদ্ধ ও বিবেক সেদিকে বেশি পরিমাণ অগ্রসর হয়। উর্দু ভাষায়ও هجر শব্দটি وصل শব্দের বিপরীতে বলা হয়। কাগজ সংক্রান্ত হাদীসে এ অর্থটি বেশি খাপ খায়। প্রলাপোক্তির অর্থ সেখানে দুই কারণে হতে পারে না।

১. প্রলাপোক্তির সন্দেহ হয় বিবেক পরিপন্থী বিষয়ে। একজন রাসূল স্বীয় শেষ সময়ে বলেছেন যে, কাগজ হাজির কর, আমি একটি জরুরী দিক নির্দেশনা পত্র লিখে দিচ্ছি। এতে কোন বিষয়টি বিবেক বিরোধী যাকে প্রলাপোক্তি বলা যেতে পারে?

২. রেওয়ায়াতে هجر শব্দের পর استفهموه শব্দটি আছে। অর্থাৎ, তাঁকে জিজ্ঞেস কর। যদি هجر প্রলাপোক্তির অর্থে গ্রহণ করা হয়, তাহলে استفهموه শব্দের সাথে যোগসূত্র সম্পূর্ণ ভুল হয়ে যায়। কারণ, যার প্রলাপোক্তি হয়ে গেছে, এরপর তাকে কিছু জিজ্ঞেস করা বিবেক পরিপন্থী কাজ। এবার দেখুন, বিচ্ছিন্নতার

অর্থ কত সুন্দরভাবে মিলে যায়। যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগাক্রান্ত অবস্থায় দিকনির্দেশনাপত্র লেখানোর কথা বলেছিলেন, তখন সাহাবায়ে কিরাম রা. এর অন্তরে এটি বিদ্যুতের মতো প্রভাব সৃষ্টি করল, যেন কিয়ামতের সময় এসে গেল।

حيف در جشم زدن صحبت يار آخر شد ÷ روئي كل سيرنديدم وبهار آخر شد.

আফসোস! চোখের পলকে বন্ধুর সংসর্গ শেষ হয়ে গেল, তৃপ্তি সহকারে ফুলের চেহারা দেখতে পেলাম না, এমনিতেই বসন্ত শেষ হয়ে গেল!

কারণ, এরূপ লেখা সর্বশেষে লেখানো হয়। অতএব তাঁরা বললেন اهجر استفهموه অর্থাৎ, হযরত কি এবার আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন? তাঁকে জিজ্ঞেস কর তো। এই হাজার শব্দটি যিনিই বলেছেন, পরিপূর্ণ ভালবাসা এবং ইশকের আবেগে বলেছেন। কিন্তু যাদের অন্তর মহব্বতের দরদ থেকে অপরিচিত তারা এর কি কদর করবে?

جو دل بمهر نكاري نه بسته ايم ÷ ترازسوزدرون ونيازماجه خبر.

প্রেমিক প্রেমাস্পদের ন্যায় আন্তরিক সম্পর্ক যতক্ষণ পর্যন্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অন্তর্জালা ও আশা আকাঙ্খা সম্পর্কে কি জানবে?

অসম্ভবকেও যদি মেনে নিয়ে هجر শব্দের অর্থ প্রলাপোক্তি হয়, তাহলে এটি হামযায়ে ইসতিফহামের (প্রশ্নবোধক অব্যয়) সাথে রয়েছে এবং প্রশ্নও অস্বীকারমূলক। সম্ভবত এই উক্তিটি সে দলের, যারা লেখাটি লেখানোর সহায়ক ছিলেন। তিনি স্বীয় রায়কে শক্তিশালী করার জন্য বলেছিলেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হুকুম তামিলে দেরি কেন করছ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে নাউযুবিল্লাহ প্রলাপোক্তি হয়ে গেছে? অর্থাৎ, প্রলাপোক্তি হয়নি। এ অর্থটিও হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন। বুখারীতে এ রেওয়ায়াতটি সাত জায়গায় আছে। কিতাবুল জিহাদ ছাড়া বাকী ছয় জায়গায় এ শব্দটি হামযায়ে ইসতিফহাম সহকারে এসেছে। আর বুখারী ছাড়া অন্যান্য কিতাবেও হামযা আছে। অতএব যদি একটি রেওয়ায়াতে হামযা না থাকে তাহলে অসুবিধা নেই। একই ঘটনার বিভিন্ন সনদে যদি একটি শব্দ কোন রেওয়ায়াতে থাকে, পরবর্তীতে না থাকে তাহলে সুনিশ্চিতরূপে এটাই মনে করা হবে যে, যেখানে নেই সেখানে বর্ণনাকারী থেকে শব্দটি ছুটে গেছে। এ কারণেই হাফিজ র. ফাতহুল বারী (৮/১০১) তে বলেন, হামযা থাকার বিষয়টি প্রধান। তাছাড়া ইসতিফহামের অক্ষর ছাড়াও ইসতিফহাম হয়।

◆ উপরোক্ত তিনটি উত্তরের সারমর্ম হল- প্রথমত هجر শব্দটি হযরত উমর রা. এর উক্তি নয়। দ্বিতীয়ত যদি মেনে নেয়া হল, তাহলে هجر শব্দের অর্থ নিরর্থক কথা নয়, বরং বিচ্ছেদের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষভাবে এটি ভালবাসা বুঝানোর একটি শব্দ, বেয়াদবীমূলক শব্দ নয়। তৃতীয়ত যদি মেনে নেই هجر শব্দের অর্থ নিরর্থক ফালতু কথাবার্তা, তাহলে হামযা ইসতিফহামের সাথে আছে। আর এই ইসতিফহাম প্রত্যাখ্যানমূলক। এবার জ্ঞানীগণ একটু চিন্তা করুন, এই প্রশ্নের কোন প্রাণ অবশিষ্ট রয়েছে? যতক্ষণ পর্যন্ত শিয়া এই তিনটি কথার উত্তর না দিবে, অর্থাৎ, কোন রেওয়ায়াতে এটা হযরত উমর রা. এর উক্তি বলে দেখাবে, অতঃপর প্রমাণ করবে যে, هجر এর অর্থ নিরর্থক ছাড়া আর কিছু নয়, অথবা এই শব্দটি হামযায়ে ইসতিফহামের সাথে নয়, এই ইসতিফহাম ইনকারের জন্য হতে পারে না, ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রশ্নের নাম উচ্চারণ করাও মারাত্মক আত্মমর্যাদাবোধহীনতার কথা।

(দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর) এই উত্তরের পূর্বে চিন্তা করারও মতো কয়েকটি বিষয় রয়েছে।

১. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

'আজ তোমাদের জন্য দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।' -সূরা ঃ মায়িদা ঃ ৩।

এই আয়াতটি সর্বসম্মতিক্রমে কাগজের ঘটনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। অতএব প্রশ্ন হল, যদি এরূপ কোন জরুরী বিষয় বাকী থাকে তাহলে দীন কখনো পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না, বরং এ আয়াত (নাউযুবিল্লাহ) ভুল প্রমাণিত হবে।

২. কাগজের ঘটনা বৃহস্পতিবার দিন ঘটেছিল এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত হয়েছিল সোমবার দিন। অতএব চারদিন পর্যন্ত এ ঘটনার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জগতে জীবিত ছিলেন। কাজেই যদি এরূপ কোন জরুরী বিষয় অবশিষ্ট থাকত তাহলে তা লেখানোর জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যথেষ্ট সুযোগ ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি লেখালেন না, এটি একটি বড় ও মারাত্মক অভিযোগ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত হবে। (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক) হযরত উমর রা. এর নিষেধ করার কারণে, অথবা, তার ভয়ে না লেখানোর কথা কোন মুসলমান বিশ্বাস করতে পারে না। বরং এরূপ ভয়ের কারণে যদি আম্বিয়ায়ে কিরাম আ. ধর্ম প্রচার হতে বিরত হয়ে যান, তাহলে দীনের নিরাপত্তাই খতম হয়ে যাবে। আর নবুওয়াত হবে শিশুদের একটি খেলনার বিষয়। মনে করুন, যখন কাফিররা তাকে বলেছিল, যদি আপনার রাজত্বের মনোবৃত্তি হয়, অথবা কোন সুন্দরী রমণী চান, তাহলে রাজত্ব আর গোটা আরবের সুন্দরী রমনী আপনাকে এনে দিচ্ছি। কিন্তু আপনি আমাদের উপাস্যদের মন্দ বলবেন না। কাফিরদের বয়কটের সময় আবূ তালিব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পয়গাম পৌছালেন এবং বুঝালেন, ভাতিজা! তুমি এই ধর্ম প্রচার থেকে ফিরে এসো, আমি একা গোটা আরবের মুকাবিলা করতে সক্ষম নই। তখন তিনি বললেন, চাচা! যদি আমার এক হাতে সূর্য আর অপর হাতে চন্দ্র রেখে দেয়া হয়, তবেও এই সত্য কালিমা থেকে কখনও আমি বিরত হব না।

মোটকথা, যে দিন তিনি সমস্ত আরবের সাথে দীনের খাতিরে প্রকাশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তখন তো তিনি জরুরিয়াতে দীন বর্জন করেননি। অথচ এখন এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিরূপে বর্জন করতে পারলেন? তাছাড়া এই ৪/৫ দিনে রাত অথবা দিনের কোন সময়তো হযরত উমর রা. সেখান থেকে উঠে গিয়ে থাকবেন, তখন তিনি লিখিয়ে দিতেন!

৩. এত জরুরী লেখা লেখতে যদি হযরত উমর রা. নিষেধ করে থাকেন, তাহলে হযরত আলী রা. এবং অন্যান্য সাহাবীর দায়িত্ব ছিল তা লেখিয়ে দেয়া, কিন্তু কেউ এ দিকে মনোযোগ দিলেন না? কাজেই হযরত উমর রা. অপেক্ষা বেশি অভিযোগ উত্থাপিত হবে হযরত আলী রা.এর বিরুদ্ধে। কারণ, শিয়াদের ধারণা মতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তাঁর ঘনিষ্টতা ছিল বেশি। তাছাড়া এরূপ হুকুম সাধারণত পরিবারের লোকজনকেই করা হয়ে থাকে। যার ফলে স্পষ্টত হযরত আলী রা. কেই এর নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকবে। যার তামিল তিনি করেননি। উপরন্তু মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়াতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, এই সম্বোধন করা হয়েছিল হযরত আলী রা.কে।

৪. এত বড় ঘটনা অথচ সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম রা. থেকে একজনও হযরত ইবনে আব্বাস রা. ছাড়া এই রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করেননি। তাছাড়া হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর শত সহস্র শিষ্যের মধ্যে শুধু তাঁর ছেলে উবাইদুল্লাহ এবং সাঈদ ইবনে জুবাইর এর বর্ণনাকারী।

৫. এই কাগজের ঘটনার অনেক পূর্বে সাকালাইন তথা জিন ইনসানের হাদীস বর্ণিত হয়েছিল। তাতে স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন- আমি তোমাদের মাঝে দুটি মূল্যবান জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা এগুলো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। অতএব যদি এই কাগজের ঘটনা সংক্রান্ত লেখা কোন জরুরী বিষয় মেনে নেয়া হয়, তাহলে হাদীসে সাকালাইনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়। অবশ্যই এসব বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার ফলে সুস্থ বিবেক দুটি বিষয়ের একটি মেনে নিতে বাধ্য হয়ে যায়।

১. হয়তো এ ঘটনাটি সম্পূর্ণ গলদ, দীন পরিপূর্ণ হয়েছিল, কখনো এরূপ জরুরী বিষয় অবশিষ্ট ছিল না এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কুরআনের আয়াত পরিপন্থী কোন লেখা লিপিবদ্ধ করানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। এই ঘটনাটি ভিত্তিহীন এবং দীনের শত্রুদের সৃষ্ট জাল। শুধু এজন্যই মনগড়া বানিয়ে নেয়া হয়েছিল যাতে اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ الخ আয়াত ও হাদীসে সাকালাইন মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরুদ্ধেও রিসালাতের প্রচারে ত্রুটির অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে গোটা দীন সন্দেহজনক হয়ে পড়ে। কিন্তু ইমাম বুখারী র. এর ন্যায় মুহাদ্দিসীনের বিবরণ এই মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে।

২. অথবা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবায়ে কিরাম রা. এর পরীক্ষা নেয়ার জন্য বলেছিলেন। দোয়াত কলম এবং কাগজ নাও। যাতে আমি এরূপ একটি জরুরী ও উপকারী জিনিস লিখে দিতে পারি। যার পর কখনো তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। মূলত এরূপ কোন জরুরী লেখা অবশিষ্ট ছিল না এবং বাস্তবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্য ছিল শুধু সাহাবায়ে কিরাম রা. কে পরীক্ষা করা যে, এরা ঈমানে কতটুকু দৃঢ়পদ। যদি আল্লাহ না করুন, বড় বড় সাহাবায়ে কিরাম রা. এ লেখা লিপিবদ্ধ করানোর জন্য প্রস্তুত হতেন তাহলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ কষ্ট পেতেন এবং তৎক্ষনাৎ বলতেন- اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ الخ আয়াত অবতীর্ণ হবার পর এখনো তোমরা কোন লেখার জন্য অপেক্ষমান এবং দীনকে পূর্ণাঙ্গ মনে কর না? কিন্তু আল হামদুলিল্লাহ! সাহাবায়ে কিরাম রা. এই পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। আর এই সফলতায় গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল হযরত উমর ফারুক রা. এর। কিছু সংখ্যক নাম অজানা লোক লেখানোর জন্য সহযোগিতা করেছিলেন। শক্তিশালী সম্ভাবনা হল, এরা নতুন মুসলমান হবেন। সাহাবায়ে কিরাম রা. থেকে যদি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই উক্তি করতেন, তবে তাঁদের নাম অবশ্যই রেওয়ায়াতে উল্লেখ হত। যেমন, এটাই স্পষ্ট মুহাদ্দিসীনে কিরামের স্বভাব থেকে। অতএব সে নওমুসলিমদের মতানৈক্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পছন্দ হয়নি। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন قوموا عني তথা আমার কাছ থেকে তোমরা সরে যাও, বক্তব্যের মাধ্যমে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণী ছিল পরীক্ষামূলক। এর বড় শক্তিশালী দুটি প্রমান হল-

১. যখন اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ الخ আয়াতে দীন পূর্ণাঙ্গ হওয়া এবং নেয়ামত পরিপূর্ণ করে দেয়ার সংবাদ দিয়েছিল, তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এরপর কোন লেখার প্রয়োজন প্রকাশ করে দীনকে অসম্পূর্ণ ও আল্লাহর নেয়ামতকে অপূর্ণাঙ্গ সাব্যস্ত করা ছিল অসম্ভব।

২. তিনি কাগজ সংক্রান্ত লেখার যে গুণ বর্ণনা করেছেন, সে গুণের দুটি জিনিস যখন তিনি উম্মতের হাতে দিয়েছিলেন (যেগুলোর আলোচনা হাদীসে সাকালাইনে করা হয়েছে), অতএব এবার এ লেখার কি

প্রয়োজন ছিল? এর প্রয়োজন তো তখন হতে পারতো, যখন দুটো জিনিসের মধ্যে তা না থাকত। অতএব রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক স্বীয় হাদীস পরিপন্থী এরূপ কথা বলা অসম্ভব।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া র. প্রমুখের ধারণা ছিল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সিদ্দীকে আকবার রা. এর জন্য খিলাফতনামা লেখাতে চেয়েছিলেন এবং তিনি বুখারী, মুসলিমের এই রেওয়ায়াতটিকে নিজের ধারণার স্বপক্ষে প্রমাণ বলে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্বীয় এই সর্বশেষ রোগে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. কে বলেছিলেন- তোমার পিতা এবং ভ্রাতাকে ডেনে আন, যাতে আমি আবূ বকরের জন্য একটি লেখা লিপিবদ্ধ করে দিতে পারি। যাতে আমার পর লোকজন মতবিরোধ না করে। এরপর তিনি বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, বাদ দাও, আল্লাহ এবং মুমিনগণ আবূ বকর রা. ভিন্ন অন্য কারো জন্য তা প্রত্যাখ্যান করেন। অতএব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহীর মাধ্যমে প্রশান্ত করে দেয়া হয়েছিল। এ কারণে তিনি এ ইচ্ছা পরিহার করেছিলেন। যদি তা মেনে নেয়া হয় যে, তিনি প্রশান্ত হওয়ার পরও সিদ্দীকে আকবার রা. এর খিলাফত লেখাতে চেয়েছিলেন, যাতে লোকজন মতবিরোধ না করেন, তাহলে পরবর্তীতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নীরবতা হযরত উমর রা. এর অনুকূল ছিল। যাতে এও রহস্য ছিল, খলীফা নির্বাচনের বিষয়টি মুজতাহিদদের নিকট সোপর্দ করার সোনালী মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করা, যাতে রাষ্ট্রপ্রধানের জাহিলী প্রথার কল্পনা ইসলামে অবশিষ্ট না থাকে। কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি ওহীয়ে ইলাহীর পর হযরত উমর রা. এর পক্ষ অবলম্বন করেছেন। এ স্থানেও তাঁর নীরবতা এবং হযরত উমর রা. এর আনুকূল্যে ওহীয়ে ইলাহীর মাধ্যমে ছিল। এটা শিয়ারাও স্বীকার করে। এ কারণে শিয়াদের গ্রন্থাবলীর মধ্যে থেকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ ফালাকুন নাজাতে (১/৩২৬) এ শব্দগুলো বিদ্যমান আছে-

واما سكوته عليه السلام بعد التنازع فما كان من عنده بل كان بوحى.

অর্থাৎ, বিতর্কের পর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নীরবতা নিজের পক্ষ থেকে ছিল না, বরং তা ছিল ওহীর কারণে।

ابني من مين دوب كر باجا سراغ زندي ÷ تو اكر ميرا هين بنتا نه بن ابنا توبن.

'আপন মনে ডুবে যেয়ে জীবনের সন্ধান পেয়ে যাও, তুমি আমার না হলে, না হও, অন্তত নিজের জন্য হয়ে যাও।'

অতএব হযরত উমর রা. এর এই মতানৈক্য যদি আল্লাহ তা'আলার ইলহামের কারণে হয়ে থাকে যেমন, বিভিন্ন স্থানে হয়েছে, তবে এটা তাঁর স্বতঃসিদ্ধ মর্যাদার বিষয়, আর যদি ভীষণ রোগ এবং তাঁর কষ্টের প্রতি লক্ষ্য করে হযরত উমর রা. এর এ মতবিরোধ হয়ে থাকে, তবে এর প্রকার সম্পূর্ণ হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে "রাসূলুল্লাহ" শব্দ মিটিয়ে দেয়ার ব্যাপারে হযরত আলী রা. এর অস্বীকৃতির মতোই হবে। যেটাকে শিয়ারা হযরত আলী রা. এর ফযীলতের মধ্যে গণ্য করে ।

◆ তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর হল, এটা সরাসরি সেই উক্তি যা স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্বে এ তিন মাস পূর্বে লাখ লোকের সমাবেশে ইরশাদ করেছিলেন- لن تضلوا ما تمسكتم به. অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তা আঁকড়ে ধরবে কখনো পথভ্রষ্ট হবেনা। হযরত উমর রা. কর্তৃক আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব যথেষ্ট বলার অর্থ যদি এই হয়, তাহলে কুরআনে আছে আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট, কাজেই এর অর্থ এটাই হওয়া উচিত যে, আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট। রাসূলের প্রয়োজন নেই। কাজেই এখানে তোমাদের যে উত্তর সে উত্তর আমাদেরও। সত্য কথা হল, এই সোনালী উক্তি حسبنا كتاب

ﷺ হচ্ছে ঈমানের প্রানের স্পন্দন। আর ফারুকে আজম রা. সে সব গুণাবলীর দর্পণ, যেগুলোর নমুনা এই সুবিশাল আসমানও কখনো প্রত্যক্ষ করেনি।

মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বলে হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত আছে-

قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل به امته من بعده قال فخشيت ان تفوتني نفسه قال قلت اني احفظ واعي قال اوصي بالصلوة والزكوة وما ملكت ايمانكم.

এ হাদীস দ্বারা কয়েকটি জিনিস প্রমাণিত হল,

১. হযরত আলী রা. এর একথা খেয়াল ছিল না যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য খিলাফতের ওসিয়ত লিখবেন। যদি তাঁর অন্তরে সামান্যতমও এরূপ খেয়াল হত, তবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফরমানের কারণে তৎক্ষনাৎ তা লেখানোর চেষ্টা করতেন।

হযরত আলী রা. এর ব্রেনে এরূপ ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে, তখনও তিনি এ আশা করেন নি যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তদানুযায়ী ওসিয়ত করবেন। এ জন্য সহীহ বুখারীর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আব্বাস রা. হযরত আলী রা.কে বললেন-

اذهب بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسئلنه فيمن هذا الامر ان كان فينا علمنا ذلك وان كان في غيرنا علمناه فاوصى بنا فقال علي انا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعنا ها لا يعطينا ها الناس بعده واني والله لا أسئلها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

২. উপরোক্ত হাদীসে সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায, যাকাত এবং তাদের হাত যে সব কিছুর মালিক হবে (গোলাম, বাঁদী) সম্পর্কে ওসিয়ত লেখাতে চেয়েছিলেন, হযরত আলী রা. এর জন্য (নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তৎক্ষনাৎ পরেই) খেলাফতের বিষয় নয়।

৩. এ স্থলে হযরত আলী রা. কোন স্বার্থের ভিত্তিতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইরশাদ সত্তেও লেখার ব্যবস্থা করেননি? এমনিভাবে হযরত উমর রা. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে ওসিয়ত লেখাননি। অতএব যদি হযরত আলী রা. এর বিরুদ্ধে প্রশ্ন হতে না পারে, তাহলে হযরত উমর রা.কে অভিযোগের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করা কিভাবে বৈধ হবে?

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاَخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ. امين.

قوله فخرج ابن عباس رضـــ الخ হযরত ইবনে আব্বাস রা. (যখন এ হাদীস বর্ণনা করেন তখন এই) বলে বের হলেন- ان الرزية كل الرزية الخ অর্থাৎ, হায় মসিবত! হায় বিপদ! যে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ পত্র লেখাতে দিল না।

এর অর্থ এই নয় যখন এ ঘটনা ঘটেছিল তখন ইবনে আব্বাস রা. এই বলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। তখন তো ইবনে আব্বাস রা. খুব কম বয়স্ক ছিলেন এর যথার্থ অর্থ হল, অনেক দিন পর একদিন ইবনে আব্বাস রা. এ ঘটনা উবাইদুল্লাহ তাবিঈ র. এর নিকট বর্ণনা করে আফসোস প্রকাশ করে এ বলে স্বীয় স্থান থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন।

٨٢. بَاب الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ

৮২. পরিচ্ছেদ ঃ রাতে ইলম শিক্ষাদান এবং ওয়াজ-নসীহত করা।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র ঃ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে ইলমী বিষয়াবলী লেখার বিবরণ ছিল। আর ইলমী বিষয় লেখা সংরক্ষন, মেহনত ও পরিশ্রম প্রমাণ করে। যার ফলে ইলম সফীনায় (নৌকায়) সংরক্ষিত হয়ে যায়। এবার এ অনুচ্ছেদে রাতের বেলায় ওয়াজ ও শিক্ষাদানের উল্লেখ রয়েছে যা ভীষণ কষ্টের প্রমাণ। সীনায় সংরক্ষিত হয়ে যায়। যেন ইমাম বুখারী র. সফীনায় হেফাজতের পর সীনায় হেফাজতের মাধ্যম বাতলাতে চান। প্রসিদ্ধ আছে, রাতের পড়া অন্তরে চিত্রিত হয়ে যায়।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ এ অনুচ্ছেদ দ্বারা ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য একটি সন্দেহেরে অপনোদন। সন্দেহ হল, তিরমিযী শরীফে একটি রেওয়ায়াত আছে-

كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.

"নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো এবং ইশার পর কথাবার্তা বলা অপছন্দ করতেন।" -তিরমিযী ঃ ১/২৪, বুখারী ঃ ১/৮০।

এ হাদীস দ্বারা সন্দেহ হতে পারত যে, ওয়াজ-নসীহত ও শিক্ষাদান ইশার পরে নিষিদ্ধ। ফলে ইমাম বুখারী র. এ অনুচ্ছেদ দ্বারা সে সন্দেহ দুর করে দিলেন এবং বলে দিলেন যে, ইশার পর পার্থিব ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা নিষিদ্ধ। যেগুলো ভাল কল্যাণকর ও দীনি কাজের অন্তর্ভূক্ত নয়।

কিন্তু শিক্ষা দান ও ওয়াজ-নসীহত যেগুলো সহীহ দীনি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সেগুলো নিঃসন্দেহে জায়িয বরং প্রয়োজন হলে ঘুমন্তদেরও জাগানো যেতে পারে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- ايقظوا صواحب الحجر তথা হুজরার মেয়েদেরকে জাগিয়ে দাও।

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী র. বলেন-

واراد المصنف التنبيه على ان النهي عن الحديث بعد العشاء مخصوص بما لا يكون في الخير. فتح : ١/١٧٠.

١١٤. حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَمْرٍو وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضــ قَالَتْ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنْ الْفِتَنِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنْ الْخَزَائِنِ أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ

১১৪.সাদাকা, আমর ও ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ র. ..... উম্মে সালাম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক রাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জেগে বলেন ঃ সুবহানাল্লাহ! এ রাতে কতই না বিপদাপদ নেমে আসছে এবং কতই না ভাণ্ডার খুলে দেয়া হচ্ছে! (হে লোক সকল!) অন্য সব ঘরের মহিলাগণকেও জাগিয়ে দাও, 'বহু মহিলা যারা দুনিয়ার বস্ত্র পরিহিতা, তারা আখিরাতে হবে বস্ত্রহীনা অর্থাৎ, অপদস্থ হবে।'

শিরোনামের সাথে মিল ঃ এ শিরোনামের দুটি অংশ রয়েছে- ১. ইলম, ২. নসীহত।

انزل الليلة দ্বারা প্রথমাংশ প্রমাণিত হল যে, এ সব বিষয়ের জ্ঞান রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদান করা হয়েছে। আর ايقظوا صواحب الحجر. দ্বারা দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ, ওয়াজ নসীহত প্রমাণিত হল। অনুচ্ছেদের দুটো অংশের সাথে হাদীসের মিল হয়ে গেল।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ইলম ঃ ২২, কিতাবুত তাহাজ্জুদ ঃ ১৫১, ১৫২, লিবাস ঃ ৮৬৯, আদব ঃ ৯১৮, ফিতান ঃ ১০৪৭।

শব্দ বিশ্লেষন ঃ استيقظ মানে জাগ্রত হয়েছে। এখানে س কামনার অর্থে ব্যবহৃত নয়। যেমন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসে আছে- اذا استيقظ احدكم من منامه এর অর্থ হল, জাগ্রত হয়েছে। তিনি বললেন- سبحان الله এ শব্দটি পবিত্রতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আরবরা বিস্ময়ের ক্ষেত্রে এ শব্দটি ব্যবহার করে।

ماذا শব্দের তাত্তিক বিশ্লেষন ঃ

আল্লামা আইনী র. বলেন, এতে কয়েকটি সুরত রয়েছে-

১. ما হবে ইসতিফহামের জন্য আর ذا হবে ইশারার জন্য। যেমন, ماذا الوقوف

২. ما ইসতিফহাম ও ذا - موصولة এর জন্য। মানে الذي

৩. ماذا যুক্ত অবস্থায় ইসতিফহামের শব্দ। যেমন- لماذا جئت

৪. ما - نكرة موصوفة মানে شيئ

৫. ما অতিরিক্তি ذا ইশারার জন্য।

৬. ما ইসতিফহামের জন্য ذا অতিরিক্ত। -উমদা।

ব্যাখ্যা ঃ ماذا انزل الليلة من الفتن কি পরিমাণ ফিতনা আজ রাত্রে অবতীর্ণ করা হয়েছে?

আল্লামা আইনী র. বলেন, انزال রূপকার্থে অবহিত করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, اعلم الله الملائكة بامر المقدر الخ. عمدة অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে ভবিষ্যতে নির্ধারিত তাকদীরি বিষয়াবলীর জ্ঞান দান করেছেন। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও সেদিন ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে সব ফিতনা উম্মতের উপর পরবর্তীতে আসন্ন ছিল।

আল্লামা উসমানী র. বলেন, মিসাল জগতে সমস্ত জিনিসের অস্তিত্ব আছে। অতএব ফিতনাগুলোর মিসালী অস্তিত্ব তাঁর নিকট স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

নিঃসন্দেহে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর হযরত উসমান রা. এর শেষ যুগ থেকে প্রচুর ফিতনা প্রকাশিত হয়। দুনিয়ার প্রচুর ধন ভান্ডারও হস্তগত হয়। কারণ, রোম পারস্য বিজিত হয়। এটা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মু'জিযার অন্তর্ভূক্ত যে, তিনি যেমন সংবাদ দিয়েছেন তেমনি প্রকাশিত হয়েছে।

الخزائن এর দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর রহমত ও বরকত। যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ রয়েছে-

اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ. سورة ص

قُلْ لَوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْ. سورة بني اسرائيل

এ দুটি তথা বিজয় ও বরকত তাছাড়া ফিতনা প্রকাশের দাবী হল, আল্লাহর দিকে মনোযোগী হওয়া। এজন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র স্ত্রীগণকে জাগিয়ে তুলেছেন।

ايقظوا صواحب الحجر হুজরার মেয়েদেরকে জাগিয়ে দাও (উদ্দেশ্য পবিত্র স্ত্রীগণ। কেননা, তাঁরা মওজুদ ছিলেন।) কারণ, সে সময়টি ছিল দু'আ কবুল হওয়ার।

فرب كاسية في الدنيا عارية في الاخرة এখানে رب শব্দটি হরফে জর। বাক্যের পূর্বাপরের দিকে লক্ষ্য করে কম বা বেশি বুঝায়। এখানে আধিক্য বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন তরজমা দ্বারা স্পষ্ট।

كاسية ইসমে ফায়েল। كسا يكسو كسوا এর অর্থ হল কাপড় পরানো। কিন্তু এখানে অর্থ হল, কাপড় পরিহিত। যেমন, কুরআন শরীফে عيشة راضية এর অর্থ হল, مرضية (সন্তোষজনক)।

হাদীসের বাক্য فرب كاسية এর কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে।

১. اللاتي تلبس رقيق الثياب الخ অর্থাৎ, অনেক মহিলা দুনিয়াতে ভীষন পাতলা কাপড় পরিধান করে। যেগুলো সতর ঢাকে না। ভিতর থেকে শরীর দেখা যায়। এরূপ মহিলাকে পরকালে উলঙ্গপনার শাস্তি দেয়া হবে। তারা সে শাস্তি ভোগ করবে। নেহায়েত টাইট ফিট পোশাকের হুকুমও তাই।

২. দুনিয়াতে ধন-সম্পদের আধিক্যের ফলে নেহায়েত মূল্যবান উত্তম পোশাক পরিধান করত। কিন্তু তাকওয়ার পোশাক তথা পরকালের আমল থেকে শূণ্য থাকত। এজন্য আখিরাতে সওয়াবশূণ্য হবে। তাদের উচিত ছিল দুনিয়াতে অপচয় ও অপব্যয় থেকে বেচে যতটুকু যথেষ্ট হয় শুধু ততটুকু দ্বারা কাজ নেয়া এবং কিছু বাঁচিয়ে সদকা করে দেয়া। কারণ, আখিরাতে তাকওয়ার পোষাক নেক আমলই কাজে আসবে।

٨٣. بَاب السَّمَرِ فِي الْعِلْمِ

৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ রাতে ইলমের আলোচনা করা।

বুখারী ঃ ২২

السَّمَرُ সীনের উপর ও মীমের উপর যবর। আর কেউ কেউ বলেছেন, সঠিক হল, মীমের উপর জযম। কারণ, এটি ইসমে ফেল। এর অর্থ হল, ঘুমের আগে রাতের কথাবার্তা। এজন্য এ শিরোনাম তৎপরবর্তী শিরোনামের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেল। -ফাতহুল বারী। অর্থাৎ, سمر এর অর্থ রাত্রে শোয়ার পূর্বে কথাবার্তা বলা (গল্পগুজব করা)।

যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য ঃ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছিল যে, শোয়ার পরে রাতের কোন অংশে জাগ্রত হয়ে তা'লীম ও ইলমী আলোচনা প্রমাণিত আছে। এবার এ অনুচ্ছেদে বলতে চান যে, ইশার পর শোয়ার পূর্বেও দীনি কথাবার্তা এবং ওয়াজ-নসীহত করতে পারেন।

ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য হল, নিরর্থক কথাবার্তা ও গল্পগুজব নিষিদ্ধ। যদি কোন ইলমী আলোচনা হয়, কুরআনে হাকীম অথবা হাদীস শরীফের দরস হয়, তবে তা সুনিশ্চিতরূপে নিষিদ্ধ নয়। আল্লামা আইনী র. বলেন- واما السمر بالخير فليس بمنهي بل هو مرغوب. عمدة তথা রাতে কল্যাণমূলক কথাবার্তা নিষিদ্ধ নয়, বরং আকর্ষনীয়।

١١٥. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضـ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ.

১১৫. সাঈদ ইবনে উফাইর র. ..... হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের শেষের দিকে আমাদের নিয়ে ইশার নামায আদায় করলেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি দাঁড়িয়ে বললেন ঃ তোমরা কি এ রাত সম্পর্কে জান? (বিষয়টি মনে রেখো) বর্তমানে যারা পৃথিবীতে রয়েছে, একশ বছরের মাথায় তাদের কেউ আর দুনিয়াতে জীবিত ও অবশিষ্ট থাকবে না।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة بهذا الحديث بعد صلوة العشاء وهو سمر بالعلم. عمدة

অর্থাৎ, হাদীস শরীফে সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে- قام فقال الخ তথা ইশার নামাযের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম রা.কে সম্বোধন করলেন এবং হাদীস বর্ণনা করলেন। এটা হল রাতে ইলমী আলোচনা।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ইলম ঃ ২২, মাওয়াকীতুস সালাত ঃ ৮০, ৮৪।

فقال ارايتكم - ارايتكم এর শাব্দিক অর্থ অনুবাদের অধীনে করা হয়েছে। বাগধারায় এর উদ্দেশ্য মূলক অনুবাদ হল, اخبروني তথা তোমরা আমাকে বল।

যেহেতু দর্শন ইলমের কারণ ও মাধ্যম, আর জ্ঞানের সাথেই সংবাদ দানের সম্পর্ক, সেহেতু যখনই বর্ণনাযোগ্য কথা দেখা যায়, তখন এর গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য এরূপ বলা হয়। উদ্দেশ্য এই হয় যে, তোমরাও এরূপ বিষয় দেখলে অবশ্যই বর্ণনা করতে।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, শেষ বয়সে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামায পড়ান। তিনি যখন সালাম ফেরান তখন দাড়িয়ে ইরশাদ করেন- ارايتكم ليلتكم الخ এ রেওয়ায়াতে নিঃশর্তভাবে শেষ বয়সের উল্লেখ রয়েছে। হযরত জাবির রা. এর রেওয়ায়াতে সুস্পষ্টভাষায় বিবরণ রয়েছে যে, এ ঘটনা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের এক মাস পূর্বেকার। -মুসলিম ঃ ২/৩১০।

উদ্দেশ্য হল, এখন যত লোক দুনিয়াতে বিদ্যমান রয়েছে একশত বছরের মধ্যে সবাই মারা যাবে।

এ হাদীসের আলোকে বুঝা গেল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই ভবিষ্যত বাণী ১১ হিজরীর। কারণ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত হয়েছে ১১ হিজরীতে রবিউল আউয়াল মাসে। এর ১০০ বছর পর কোন সাহাবী জীবিত থাকেন নি।

হযরত খিযির আ. এর জীবন সংক্রান্ত আলোচনা ঃ

এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনার জন্য লেখকের গ্রন্থ নাসরুল বারী, কিতাবুত তাফসীর ঃ ৩৭০ দ্রষ্টব্য। আল্লামা নববী র. বলেন-

وقد احتج بهذا الاحاديث من شذ من المحدثين فقال الخضر عليه السلام ميت والجمهور على حياته كما سبق في باب فضائله. نووي شرح مسلم صـــ ٣١٠.

ইমাম নববী র. বলেন-

وقال الشيخ ابو عمرو بن صلاح هو (اي الخضر عـــ) حى عند جماهير العلماء والصالحين والعامة معهم في ذلك قال وانما شذ بانكاره بعض المحدثين. نووي شرح مسلم : ٢/٢٦٩.

١١٦. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رضـ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ ثُمَّ قَالَ نَامَ الْغُلَيِّمُ أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

১১৬. আদম র. ...... ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমাব খালা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী মায়মূনা বিনতে হারিস রা.-এর ঘরে এক রাত্রি যাপন করছিলাম। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পালার রাত্রে সেখানে ছিলেন। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মসজিদে) ইশার নামায আদায় করে তাঁর ঘরে চলে আসলেন এবং চার রাক'আত নামায পড়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর উঠে বললেন ঃ পিচ্ছিটি কি ঘুমিয়ে গেছে? বা এ ধরণের কোন কথা বললেন। তারপর (নামাযে) দাঁড়িয়ে যান, আমিও তাঁর বাঁ দিকে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে তাঁর ডান দিকে এনে দাঁড় করালেন। তারপর তিনি পাঁচ রাক'আত নামায আদায় করলেন। পরে আরো দু' রাক'আত আদায় করলেন। এরপর শুয়ে পড়লেন। এমনকি আমি তাঁর خطيط বা غطيط তথা নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। এরপর উঠে তিনি (ফজরের) নামাযের জন্য বের হলেন।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন, ইবনে মুনাইয়্যির র. এর মতে সুমহান বাণী نام الغليّم (পিচ্ছি ঘুমিয়ে গেছে?) শিরোনামের ক্ষেত্র। কারণ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মাইমুনা রা. কে সম্বোধন করে এ বাক্যটি ইরশাদ করেছিলেন এবং তা বলেছিলেন, ইশার নামাযের পর। অতএব রাতের ইলমী আলোচনা প্রমাণিত হল।

তাছাড়া আল্লামা আইনী র., হাফিজ আসকালানী ও আল্লামা কিরমানী র. প্রমুখ থেকেও বিভিন্ন উক্তি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাফিজ আসকালানী র. তা পছন্দ করেননি। তিনি বলেন-

والاولى من هذا كله ان مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث بعينه من طريق اخرى الخ. فتح الباري.

হাফিজ আসকালানী র. শিরোনামের সাথে মিলের জন্য নিজস্ব তাত্ত্বিক বিশ্লেষন পেশ করেন। সেটি হল, সর্বোত্তম কথা হল, ইমাম বুখারী র. এ হাদীসটি কিতাবুত তাফসীর ঃ ৬৫৭ এবং কিতাবুত তাওহীদ ঃ ১১১০ এ عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه সূত্রে এনেছেন। সেখানে নিম্নোক্ত বাক্যটি বিদ্যমান রয়েছে-

فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اهله ساعة ثم رقد

তথা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিতা স্ত্রীর সাথে কিছুক্ষন আলোচনা করে শুয়ে পড়েন।

হাফিজ র. বলেন- فصحت الترجمة بحمد الله تعالى من غير حاجة الى تعسف فلا رجم بالظن. فتح

নিঃসন্দেহে ইমাম বুখারী র. এর মূলনীতি শিরোনামের সম্পূর্ণ অনুকূল। কারণ, হাদীসের তাফসীর হাদীস দ্বারা করা তাতে আন্দাজ অনুমান করে তাহকীক পেশ করার চেয়ে উত্তম।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ইলম ঃ ২২, কিতাবুল ওযু ঃ ২৫, ৩০, আযান ঃ ৯৭, ১০০, ১০১, ১১৮-১১৯, আবওয়াবুল বিতর ঃ ১৩৫, তাহাজ্জুদ ঃ ১৫৯, তাফসীর ঃ ৬৫৭, লিবাস ঃ ৮৭৭, আদব ঃ ৯১৮, দাওয়াত ঃ ৯৩৪-৯৩৫, তাওহীদ ঃ ১১১০।

بِتُّ শব্দের তাত্ত্বিক বিশ্লেষন ও তা'লীল ঃ

রা এর নিচে যের, তা এর উপর তাশদীদ। ওয়াহিদ মুতাকাল্লিম। بيتوتة থেকে। আসলে ছিল بَيَتُّ ইয়া মুতাহাররিক তার পূর্বে যবর হওয়ার কারণে ইয়াকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তখন হয়েছে- باتُّ দুই সাকিন একত্রিত হওয়ার ফলে আলিফ ফেলে দেয়া হয়েছে। উহ্য ইয়া বুঝানোর জন্য বা এর যবরকে যের দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। ফলে بِتُّ হয়ে গেছে।

خالتي ميمونة মাইমুনা خالتي শব্দ থেকে আতফে বয়ান।

غطيطه او خطيطه এটি বর্ণনাকারীর সন্দেহ যে, হযরত ইবনে আব্বাস রা. غطيطه নাকি خطيطه শব্দ বলেছেন।

غطيط و خطيط উভয়টি সমার্থক। অর্থাৎ, শোয়ার পরে শ্বাসের আওয়াজ। এক কথায় নাক ডাকার আওয়াজ।

ব্যাখ্যা ঃ فصلى اربع ركعات কেউ কেউ বলেছেন, এখানে বর্ণনাকারী সংক্ষেপ করেছেন। মূলতঃ এটাও তাহাজ্জুদের রাকআত। কিন্তু বাহ্যত এই রেওয়ায়াত দ্বারা এদিকেই মন দ্রুত যায় যে, ইশার পরবর্তী চার রাকআতে দু রাকআত মুয়াক্কাদাহ ও দু রাকআত মুয়াক্কাদা নয়।

نام الغليّم এটি غلام শব্দের تصغير (ক্ষুদ্রার্থবোধক শব্দ) মানে পিচ্ছি। এখানে প্রসিদ্ধ উক্তি এটাই যে, همزة استفهام উহ্য। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মাইমুনা রা.কে জিজ্ঞেস করলেন, পিচ্চি কি ঘুমিয়ে পড়েছে? অবশ্য এটি খবরেরও সম্ভাবনা রাখে। তথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মাইমুনা রা.কে বললেন, ইবনে আব্বাস ঘুমিয়ে পড়েছে। ইবনে আব্বাস রা. এজন্য নীরবতা অবলম্বন করলেন, যাতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অকৃত্রিমভাবে নিজের মামূলগুলো আদায় করতে পারেন।

فقمت عن يساره ইবনে আব্বাস রা. শিষ্টাচার রক্ষার্থে বাম দিকে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায অবস্থাতেই ডান দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন।

قوله فصلى خمس ركعات এগুলোর মধ্যে দু রাকআত নফল এবং তিন রাকআত বিতরের। উভয়টিকে মিলিয়ে বর্ণনা করার কারণ হল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে রাত্রে রাতের নামায মোট তের রাকআত পড়েছেন। এর ক্রমধারা ছিল, প্রথমে ইশার পর চার রাকআত, অতঃপর রাতের নামাযের আট রাকআত পড়ে কিছুক্ষন বিশ্রাম নেন। যেমন আবূ দাউদের এক রেওয়ায়াতে আছে-

قال فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثماني ركعات ثم اوتر بخمس لم يجلس بينهن. ابو داود باب في صلوة الليل صـــ ١٩٢ مطبوعة رشيدية دهلي.

কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে- প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি দু রাকআত পর বিশ্রাম নিতেন। অতঃপর দু রাকআত পড়ে সাথে সাথেই বিতরের তিন রাকআত আদায় করেন। এর পর ফজরের দু

রাকআত সুন্নত পড়েন। তারপর রাতের নামাযের মধ্য থেকে যেহেতু সর্বশেষ দু রাকআতের পর সাথে সাথেই বিতর আদায় করতেন, সেহেতু বর্ণনাকারী এদুটোকে মিলিয়ে বর্ণনা করেছেন।

قوله ثم صلى ركعتين. এর দ্বারা উদ্দেশ্য ফজরের দু রাকআত সুন্নত।

٨٤. بَاب حِفْظِ الْعِلْمِ

৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ ইলম মুখস্থ করা। বুখারী ঃ ২২

যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য ঃ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে রাতের বেলায় ইলমী আলোচনা ও ইলমী ব্যস্ততার বিবরণ ছিল। যার সম্পর্ক ছিল ইলম শেখা ও অর্জনের সাথে। এবার এ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করতে চান যে, ইলম অর্জনের পর এর হেফাজত ও তা মুখস্থ রাখার চেষ্টা রাখাও জরুরী।

١١٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رض قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ رض وَلَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا ثُمَّ يَتْلُو إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى إِلَى قَوْلِهِ الرَّحِيمُ إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِبَعِ بَطْنِهِ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ

১১৭. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ র. .... আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ লোকে বলে, আবূ হুরায়রা রা. অনেক বেশি হাদীস বর্ণনা করে। (জেনে রাখ,) আল্লাহর কিতাবে দু'টি আয়াত যদি না থাকত, তবে আমি একটি হাদীসও বর্ণনা করতাম না। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَ الْهُدٰي مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ اُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ . اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَأُولٰئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمِ .

'আমি সেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নত দেন এবং অভিশাপকারীগণও তাদেরকে অভিশাপ দেয়, কিন্তু যারা তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, ওরাই তারা, যাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (২ ঃ ১৫৯-১৬০) (প্রকৃত ঘটনা এই যে,) আমার মুহাজির ভাইয়েরা বাজারে কেনাবেচায় এবং আমার আনসার ভাইয়েরা জমি-জমার কাজে মশগুল থাকত। আর আবূ হুরায়রা রা. (এর কোন ব্যবসা বা পেশা ছিল না। ফলে খেয়ে না খেয়ে) তুষ্ট থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে লেগে থাকত। ফলে তারা যখন উপস্থিত থাকত না, তখন সে উপস্থিত থাকত এবং তারা যা মুখস্থ করত না সে তা মুখস্থ করে ফেলত।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ويحفظ ما لا يحفظون বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ইলম ঃ ২২, বুয়ূ ঃ ২৭৪, আল হারস ওয়াল মুযারাআ ঃ ৩১৬, আলামাতুন নবুওয়াত ঃ ৫১৫, আল ই'তিসাম ঃ ১০৯৩।

قوله اكثر ابو هريرة رضـ যেহেতু আবূ হুরায়রা রা. অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে শীর্ষ ব্যক্তি, তাঁর সূত্রে ৫৩৭৪ টি হাদীস বর্ণিত আছে। এ আধিক্যের ফলে লোকজনের বিস্ময় হত যে, আবূ হুরায়রা রা. তো শুধু চার বছরের কাছাকাছি সময় বরকতময় সংসর্গে থাকার সুযোগ পেয়েছেন। তা সত্ত্বেও এত বেশি হাদীস কিভাবে বর্ণনা করছেন, অথচ বড় বড় মুহাজির ও আনসারী সাহাবী যারা তাঁর চেয়ে অনেক বছর বেশি সোহবত লাভে ধন্য হয়েছেন। তারা তো এত হাদীস বর্ণনা করেননি।

হযরত আবূ হুরায়রা রা. এখানে দুটি কারণ বর্ণনা করেছেন।

১. ইলম গোপন করার ব্যাপারে সতর্কবাণী এসেছে-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ الخ. سورة البقرة : ١٥٩ - ١٦٠.

তথা নিঃসন্দেহে যারা সুস্পষ্ট বিষয়াবলী এবং আমার নাযিলকৃত হেদায়াতের কথা তার প্রতি অবতীর্ণ করার পর গোপন করে, অথচ আমি তাদের জন্য কিতাবে বর্ণনা করে দিয়েছি, এরূপ লোকের প্রতি আল্লাহ তা'আলা এবং সমস্ত অভিশম্পাতকারী লা'নত করে, তবে যারা তওবা করে এবং নিজের অবস্থা ভাল করে এবং বিধি-বিধান স্পষ্ট আকারে বর্ণনা করে দেয়, আমি তাদের ত্রুটি মাফ করে দেই। বস্তুত আমি হলাম বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

১. হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেন, যদি এ দু আয়াত না হত, তবে আমি কোন হাদীস বর্ণনা করতাম না। কিন্তু যেহেতু ইলম গোপন রাখা হারাম, সেহেতু হাদীসের প্রচার ও প্রকাশ করা ওয়াজিব।

২. হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেন, আমাদের দীনি ভাই (মুহাজির ও আনসার) দের বিভিন্ন ব্যস্ততা ছিল। মুহাজিরগণ বাণিজ্যিক দায় দায়িত্বে ব্যস্ত থাকতেন আর আনসারীগণ ক্ষেত খামার ও কৃষি কাজে রত থাকতেন। আমার অবস্থা ছিল এই যে, না ছিল কৃষি কাজ, না ছিল ব্যবসা বাণিজ্য। কারণ, আমার দায়িত্বে কারো কোন অধিকার ছিল না। না ছিল আমার সম্পদ কামানোর ফিকির। এজন্য শুধু পেট ভরার উপরই সন্তুষ্ট থাকতাম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে সে সব ভাইয়ের তুলনায় আমি বেশি থাকতাম। এজন্য আমি নববী ইরশাদের এরূপ ভাণ্ডার মুখস্থ করে ফেলেছি যা মুখস্থ করার সুযোগ তাদের হয়নি।

بِشَبَعِ بطنه এক কপিতে আছে- لِشِبَعِ بطنه আর বা ও লাম উভয়টি কারণ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। -উমদা, কাসতাললানী।

এর অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন সম্ভাবনা রয়েছে।

১. এ অর্থ অনুবাদ দ্বারা স্পষ্ট যে, শুধু এক পেট রুটি যথেষ্ট ছিল। কারণ, কারো অধিকার আমার দায়িত্বে ছিল না। অতএব এক পেট পুরলে এটাকে যথেষ্ট মনে করে সর্বদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে পড়ে থাকতাম।

২. দ্বিতীয় অর্থ হল, আমার তো কোন কাজ ছিল না, না কৃষি কাজ, না ব্যবসা বাণিজ্য, এজন্য পেট ভরে মানে মন ভরে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত থাকতাম। যেমন, বাগধারায় আছে- فلان يحدث بشبع بطنه -অমুক লোক পেট ভরে অর্থাৎ, মন ভরে কথা বলে। فلان يسافر بشبع بطنه -অমুক ব্যক্তি মন ভরে সফর করে। এ অর্থ সর্বোত্তম মনে হয়। তবে এটি কারণ বর্ণনার জন্য সমীচীন নয়। মোটকথা, হযরত আবূ হুরায়রা রা. নববী হাদীস সমূহ মুখস্থ করার জন্য অন্য চেষ্টাও করতেন। যেমন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দু'আ করানো, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাতলানো মূল্যবান ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার করা যেমন পরবর্তী রেওয়ায়াতে আসছে।

হযরত আবূ হুরায়রা রা. ঃ

হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর নাম ইসলাম পূর্বে জাহিলিয়াত যুগে ছিল আবদে শামস। ইসলাম পরবর্তী যুগে হয়েছে আবদুর রহমান ইবনে সাখর। আবূ হুরায়রা হল উপনাম। তিনি উপনামেই প্রসিদ্ধ। এ উপনাম সম্পর্কে স্বয়ং হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর নিজ বিবরণ বর্ণিত আছে যে, আমি নিজ পরিবারের বকরী চড়াতাম। আমার একটি ছোট বিড়াল ছিল। এটিকে আমি রাত্রে গাছের উপর রেখে দিতাম, আর দিনের বেলায় আমার সাথে নিয়ে যেতাম, তার সাথে খেলা করতাম। পরে লোকজন আমার উপনাম রেখে দেয় আবূ হুরায়রা। -তিরমিযী ঃ ২, মানাকিব ২২৪।

সমস্ত মুহাদ্দিসীন আবূ হুরায়রা গাইরে শব্দটিকে মুনসারিফ পড়েন। আল্লামা আইনী র. বলেন-

وهو اول من كنى بهذه الكنية لهرة كان يلعب بها كناه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقيل والده.
عمدة : ١/١٢٤ باب امور الايمان.

হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর জননীর নাম ছিল মাইমুনা। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। হযরত আবূ হুরায়রা রা.এর আবেদনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করলে তিনি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মোটকথা, আবূ হুরায়রা রা. ছিলেন একজন সুমহান সাহাবী। সমস্ত সাহাবী অপেক্ষা বেশি হাদীস তার থেকে বর্ণিত। অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সবচেয়ে বেশি রেওয়ায়াত মুখস্থকারী ছিলেন। ৭ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ৭৮ বছর বয়সে ৫৯ হিজরীতে ওফাত লাভ করেছেন। তাঁকে বাকী' এ দাফন করা হয়েছে।

١١٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْسَاهُ قَالَ ابْسُطْ رِدَاءَكَ فَبَسَطْتُهُ قَالَ فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ ضُمَّهُ فَضَمَمْتُهُ فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ

১১৮. আবূ মুসআব আহমদ ইবনে আবূ বকর র. ..... হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার কাছ থেকে বহু হাদীস শুনি কিন্তু ভুলে যাই।' তিনি বললেন ঃ তোমার চাদর খুলে ধর। আমি তা খুলে ধরলাম। তিনি দু'হাত অঞ্জলী ভরে তাতে কিছু ঢেলে দেয়ার মত করে বললেন ঃ এটা তোমার (বুকের) সাথে মিলিয়ে ধর। আমি তা বুকের সাথে লাগালাম। এরপর আমি আর কিছুই ভুলিনি।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ مطابقة الحديث للترجمة بطريق الالتزام. عمدة শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল আবশ্যিক পদ্ধতিতে হয়েছে। -উমদাহ।

অর্থাৎ, এ হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা রা. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ভুলে যাওয়ার অভিযোগ করলেন। ভুলে যাওয়া মুখস্থ রাখার পরিপন্থী। মূলনীতি হল, وبضدها تتبين الاشياء. (একটি জিনিসের বিপরীত দ্রব্যের উল্লেখ স্বয়ং তার স্পষ্টের কারণ হয়) অতএব এভাবে শিরোনাম প্রমাণিত হল। ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য হল, হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর অধিক রেওয়ায়াত এবং স্মরণশক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দু'আর বরকত।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ইলম ঃ ২২, বুয়ূ ঃ ২৭৪-২৭৫, আল হারসু ওয়াল মুযারাআ ঃ ৩১৬, মানাকিব ঃ ৫১৪-৫১৫, ১০৯৩।

প্রশ্ন ঃ এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, কিতাবুল ইলমের এ রেওয়ায়াতে আছে- فما نسيت بعد شيئا. আর এই রেওয়ায়াতটিই কিতাবুল বুয়ূ ২৭৪-২৭৫ পৃষ্ঠায় আসছে। যার শব্দরাজি হল- فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيئ কিতাবুল বুয়ূল এ রেওয়ায়াতের অর্থ হল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন যা কিছু ইরশাদ করেছিলেন, তম্মধ্য থেকে কোন কিছুই আমি আর ভুলিনি। বস্তুত আলোচ্য অনুচ্ছেদের রেওয়ায়াত দ্বারা স্পষ্ট হল, এ দু'আর পর হযরত আবূ হুরায়রা রা. কিছুই ভুলেননি। বাহ্যত উভয় রেওয়ায়াতে বিরোধ রয়েছে। আল্লামা আইনী র. এবং হাফিজ আসকালানী র. বলেন- ويحتمل ان تكون وقعت له قضيتان অর্থাৎ, হতে পারে বিভিন্ন ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

তবে এর উপর প্রশ্ন হল, উভয়ের পূর্বাপর বিষয়ের দাবী হল, ঘটনা একটি হওয়ার।

২. হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া র. এর রায় হল, বেচা-কেনা পর্বের রেওয়ায়াতটিতে من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ইবারতে যে من আছে এটি কারণের অর্থে ব্যবহৃত। উদ্দেশ্য হল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ দু'আর বরকতে ও এর কারণে এর পর আমি আর কিছুই ভুলিনি। -তাকরীরে বুখারী ঃ ১/১৯৯।

١١٩. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ بِهَذَا أَوْ قَالَ غَرَفَ بِيَدِهِ فِيهِ.

১১৯. ইবরাহীম ইবনুল মুনযির র. ...... ইবনে আবূ ফুদাইক র. (ইবনে আবু যিব থেকে তাঁর) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন এবং তাতে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত দিয়ে (অঞ্জলী ভরে) সে চাদরের মধ্যে (কিছু) দিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ ১১৮ নং হাদীস অন্য সনদে বর্ণিত। অবশ্য মূলপাঠের শব্দাবলীতে কিছু পার্থক্য আছে। প্রথম সনদে بيديه দ্বিবচনের শব্দ এবং তাতে فيه নেই। আর দ্বিতীয় সনদে অর্থাৎ, ১১৯ নং হাদীসের সনদে আছে- بيده একবচন এবং তাতে فيه শব্দ অতিরিক্ত আছে।

ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য আরেকটি সনদ পেশ করা।

আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী র. বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেছেন, এ ছাড়া রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দ্বিতীয় আরেকটি বিশেষ দৃষ্টিও আমার প্রতি ছিল যে, তিনি স্বীয় দস্ত মুবারকে আমার চাদরে কিছু দিয়েছিলেন। বাহ্যত হাত শূণ্য ছিল, কিন্তু তাতে ছিল ইলমের ভাণ্ডার। এর উপকার এই হল যে, এর পর থেকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোন কথা আমি ভুলতাম না। এজন্য আমার নিকট হাদীস ভাণ্ডার ছিল অনেক। এগুলো গোপন করা নিষেধ ছিল। এজন্য আমি সব কিছু উম্মতকে পৌঁছে দিয়েছি। -দরসে বুখারী, ছাপা ডাবিল, গুজরাট।

١٢٠. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضـــ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ.

১২০. ইসমাঈল র. .... আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইলমের দুটি পাত্র (দু ধরনের ইলম) মুখস্থ করে রেখেছিলাম। তার একটি পাত্র আমি বিতরণ করে দিয়েছি। আর অপরটি প্রকাশ করলে আমার কণ্ঠনালী কেটে দেয়া হবে। আবূ আবদুল্লাহ্ র. বলেন, হাদীসে উল্লেখিত اَلْبُلْعُوم শব্দের অর্থ খাদ্যনালী (যদ্বারা খাদ্য প্রবেশ করে)।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين. বাক্যে স্পষ্ট। অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দু প্রকার ইলম অর্জন করেছি। এক প্রকার ইলম আমি ব্যাপক করে দিয়েছি, ছড়িয়ে দিয়েছি, যেগুলোর সম্পর্ক ছিল আকাইদ, বিধি বিধান ও হালাল হারামের সাথে। দ্বিতীয় প্রকার ইলমগুলো আমি প্রকাশ করিনি। এতটুকু তো সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে, এ দ্বিতীয় প্রকারের সম্পর্ক শরীয়তের আহকাম ও হালাল হারামের সাথে ছিল না। অন্যথায় তা গোপন করা না জায়িয হত না। এবার প্রশ্ন হল, এ দ্বিতীয় প্রকার দ্বারা উদ্দেশ্য কি? কোন ধরণের ইলম ছিল? এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে।

একটি উক্তি হল, সেগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তাসাওউফের গোপন রহস্য ও হাকীকত। যেগুলো মধ্যম পর্যায়ের বিবেকের উর্ধ্বে। সাধারণ লোক সে সব গোপন রহস্য বরদাশত করতে পারবে না। এ সব গোপন রহস্য বুঝার জন্য প্রয়োজন ভালবাসার দরদ। যেমন, আল্লাম রুমী র. বলেছেন-

درد دل دردرون خود بیفزه درداں ÷ تابيني سبز و سرخ درداں

দ্বিতীয় উক্তি হল, অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও তত্ত্বজ্ঞানীর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। দ্বিতীয় পাত্র দ্বারা উদ্দেশ্য সে সমস্ত হাদীস যেগুলোতে ফিতনা সম্পর্কীয় বিস্তারিত বিবরণ ও কোন কোন জালিম শাহীর নাম নির্ধারণ ও তাদের জীবনী রয়েছে। এ ব্যাপারে হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর ইরশাদ রয়েছে-

قال ابو هريرة رضي الله عنه ان شئت اسم بني فلان بني فلان. بخاري : ١/٥٠٩.

কোন কোন জালিম শাসকের কথা ইশারা ইঙ্গিতে উল্লেখও করতেন। যেমন-

اعوذ بالله من رأس الستين وامارة الصبيان.

'আমি ৬০ হিজরী থেকে এবং ছোকরাদের শাসন থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করি।' এটি ছিল ইয়াজিদের খেলাফতের দিকে ইঙ্গিত। কারণ সে বছরই ইয়াজিদ সিংহাসনে আরোহন করে। হযরত আবূ হুরায়রা রা. সে সব ফিতনা ও দুর্ঘটনা থেকে বাচার জন্য দু'আও করেছিলেন-

اللهم اقبضني اليك قبل الستين.

'আয় আল্লাহ! ৬০ হিজরীর পূর্বেই আমাকে তোমার কাছে তুলে নাও।'

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'আ কবুল করলেন এবং ইয়াজিদের শাসনামলের এক বছর পূর্বে তথা ৫৯ হিজরীতে ইনতিকাল করেন।

মোটকথা, বাস্তবতা এটাই যে, জালিম বাদশাহদের নাম এবং অবস্থার প্রতিই ইঙ্গিত। যদি আমি তাদের নাম ঠিকানা বর্ণনা করে দেই তাহলে তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।

৮৫. بَاب الْإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ

৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ আলিমদের (কথা শোনার) জন্য লোকদের চুপ করানো।

যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য ঃ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে ইলমী বিষয় মুখস্থ করার প্রতি গুরুত্বারোপের উল্লেখ ছিল। আর এ অনুচ্ছেদে ইলম হিফজ করার এক বিশেষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আলিম যখন কোন বিষয় বর্ণনা করবে তখন তনুমন দিয়ে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শুনবে। আর যদি শুনার সময় মনোযোগ না থাকে তবে মুখস্থ করবে কি?

ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য হল, যদি কোন আলিম কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করতে চান, তখন লোকজনকে নীরব করে তা বর্ণনা করতে পারেন।

١٢١. حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَرِيرٍ رضـــ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتْ النَّاسَ فَقَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

১২১. হাজ্জাজ র. .... জারীর রা. থেকে বর্ণিত যে, বিদায় হজ্জের সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি লোকদেরকে নীরব করিয়ে দাও (হযরত জারীর রা. লোকজনকে নীরব করালে) তারপর তিনি বললেন ঃ (হে জনতা!)'আমার পরে তোমরা কাফির (এদের মত) হয়ে যেও না যে, একে অপরের গর্দান কাটবে।'

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল استنصت الناس বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী ঃ ২৩, মাগাযী ঃ ৬৩২, দিয়াত ঃ ১০১৫, ফিতান ঃ ১০৪৮।

প্রশ্ন ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবনে আব্বাস রা. কে ইরশাদ করেছিলেন-

لا الفينك تاتي القوم وهم في حديثهم فتقطع عليهم حديثهم.

অর্থাৎ, আমি যেন তোমাদেরকে এমন অবস্থায় না পাই যে, তোমরা কোন সম্প্রদায়ের নিকট যাও, আর তারা তাদের কথায় রত থাকে অথচ তোমরা তাদের কথায় বিঘ্ন সৃষ্টি কর।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, যখন মানুষ কথাবার্তায় রত থাকবে, তখন তাদের কথা বন্দ করে দেয়া নিষেধ। কারণ, এটা বিরক্তি ও কষ্টের কারণ হতে পারে। এর বাহ্যিক অর্থ ও ব্যাপকতা দ্বারা ধারণা সৃষ্টি হয় যে, লোকজনকে নীরব করে ইলমী ও দীনি বিষয়াবলীর প্রতি মনোযোগী করা নিষিদ্ধ হবে।

ইমাম বুখারী র. এ অনুচ্ছেদ কায়েম করে প্রমাণ করেছেন যে, তা'লীম ও তাবলীগের প্রয়োজনের সময় নীরব করা বৈধ ও ভাল। দেখুন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের ময়দানে যখন লোকজন তালবিয়া ও যিকির তিলাওয়াতে রত ছিল, তখন ইলমী কথা শুনানোর জন্য তাদেরকে নীরব করিয়েছেন। এর দ্বারা পরিস্কার বুঝা গেল যে, একাকি যিকির আযকার থেকে বড় কাজ হল, উলামায়ে রাব্বানীর ওয়াজ-নসীহত শ্রবণ। অবশ্য বিনা প্রয়োজনে কারো কথায় দখল দেয়া ও ব্যাঘাত সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ হবে।

قال سفيان الثوري وغيره اول العلم الاستماع ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر.

ব্যাখ্যা ঃ হাদীস শরীফে استنصت الناس এর সম্পর্ক যদিও রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মানিত সত্ত্বার সাথে, কিন্তু العلماء ورثة الانبياء হাদীসের বিষয় উলামায়ে রাব্বানির সাথে সংশ্লিষ্ট হুকুমই এটাই। এ উদ্দেশ্যের খাতিরে ইমাম বুখারী র. এ হাদীসের উপর انصات العلماء শিরোনাম কায়েম করেছেন।

لا ترجعوا بعدي كفارا الخ তিনি বলেছেন, আমার পর তোমরা কাফিরদের মত হয়ো না যে, একজন অপরজনের গরদান মারতে আরম্ভ কর। অর্থাৎ, এখানে কাফিরদের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে যে, যেরূপভাবে তারা পরস্পরে খুনাখুনি করে এমনিভাবে তোমরা আমার পর একজন অপরজনকে হত্যা করো

না। اي لا تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم الخ উদ্দেশ্য পরিষ্কার। তোমরা যদি পরস্পরে খুনাখুনি ও লড়াই কর, তবে কাফিরদের কাজে লিপ্ত হয়ে যাবে। তাছাড়া كفر دون كفر ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়।

৩. কোন কোন রেওয়ায়াতে كفارا এর স্থলে ضلالا এসেছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে যায় এবং জানা যায় যে, শুধু হত্যার কারণে ইসলাম থেকে বের হয় না। যেমন, قتاله كفر বাক্যে তা'বীল বা সদার্থ করেন। হ্যাঁ, যদি মুমিনকে বৈধ মনে করে হত্যা করে তবে নিঃসন্দেহে কাফির হয়ে যাবে।

٨٦. بَاب مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ

৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ আলিমের জন্য মুস্তাহাব হল, তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হয় ঃ সবচাইতে জ্ঞানী কে? তখন তিনি তা আল্লাহর উপর ন্যস্ত করবেন।

যোগসূত্র ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন-

وجه المناسبة بين البابين من حيث ان المذكور في الباب الاول لزوم الانصات وكول الامر الى الله تعالى اذا سئل عن الاعلم:

অর্থাৎ, পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে আলিমের জন্য নীরব করানোর আবশ্যকতার বিবরণ ছিল। আর এ নীরবতা মূলত নিজের বিষয়কে আলিমের হাওয়ালা বা ন্যাস্ত করার নামান্তর। এমনিভাবে এ অনুচ্ছেদে আছে- যখন আলিমের নিকট তার চেয়ে বড় আলিমের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় তখন তার উপর আবশ্যক হল, এটাকে আল্লাহ তা'আলার উপর সোপর্দ করা।

উদ্দেশ্য ঃ এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য হল বড় বড় আলিমদের বিনয় অবলম্বন করা উচিত। সাধারণত দেখা যায় যে, মানুষ যখন এ পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য ও প্রসিদ্ধ হয়ে যান যে, লোকজন তার কথা শুনার জন্য নীরব হয়ে যায় এবং তার কথা শুনানোর জন্য লোকজনকে নীরব ও আকৃষ্ট করা হতে শুরু করে, এমতাবস্থায় সাধারণত মানুষ আত্মগর্ব ও অহংকারে লিপ্ত হয়ে যায়, এ জন্য ইমাম বুখারী র. এ অনুচ্ছেদ কায়েম করে সতর্ক করলেন যে, মানুষ যখন ইলমের উচু স্তরে পৌঁছে যায় তখন তার উচিত বিনয় অবলম্বন করা। যেমন শেখ সাদী র. বলেন-

عـــ نهد شاخ برميوه سر برزمين.

١٢٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رضـــ إِنَّ نَوْفًا الْبَكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيل إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّه حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْب عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْه فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْه أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ بِهِ فَقِيلَ لَهُ احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ

فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ وَحَمَلَا حُوتًا فِي مِكْتَلٍ حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا وَنَامَا فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنْ الْمِكْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى مَسًّا مِنْ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ قَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا

فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى بِثَوْبٍ أَوْ قَالَ تَسَجَّى بِثَوْبِهِ فَسَلَّمَ مُوسَى فَقَالَ الْخَضِرُ وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ فَقَالَ أَنَا مُوسَى فَقَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ عَلَّمَكَهُ لَا أَعْلَمُهُ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا فَعُرِفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ الْخَضِرُ يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هَذَا الْعُصْفُورِ فِي الْبَحْرِ فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فَكَانَتْ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا.

فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ مُوسَى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَهَذَا أَوْكَدُ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا . قال محمد بن يوسف ثنابه علي بن خشرم قال ثنا سفيان بن عيينة بطوله .

১২২. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ আল-মুসনাদী র. ..... সাঈদ ইবনে জুবাইর র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি হযরত ইবনে আব্বাস রা.-কে বললাম, নাওফ আল-বিকালী দাবী করেন যে, মূসা আ. [যিনি খিযির আ.-এর নিকট গিয়েছিলেন তিনি] বনী ইসরাঈলের মূসা নন বরং তিনি অন্য এক মূসা। (একথা শুনে) তিনি বললেন ঃ আল্লাহর দুশমন মিথ্যে বলেছে। উবাই ইবনে কাব রা. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইরশাদ করেন ঃ একবার হযরত মূসা আ. বনী ইসরাঈলের মধ্যে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন। তখন তাঁকে (হযরত মূসা আ. কে) জিজ্ঞেস করা হল, সবচেয়ে জ্ঞানী কে? তিনি বললেন, 'আমি সবচেয়ে জ্ঞানী।' মহান আল্লাহ তাঁকে সতর্ক করে দিলেন। কেননা, তিনি ইলমকে আল্লাহর প্রতি ন্যাস্ত করেন নি। তারপর আল্লাহ্ তাঁর নিকট এ ওহী পাঠালেন ঃ (পারস্য ও রোমের) দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে আমার বান্দাদের মধ্যে এক বান্দা রয়েছে, যে তোমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী। তিনি বলেন, হে প্রভু! কিভাবে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে?' তখন তাঁকে বলা হল, থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নাও। এরপর যেখানে সেটি হারিয়ে ফেলবে সেখানেই তাকে পাবে।

তারপর তিনি রওয়ানা হলেন এবং ইউশা' ইবনে নূন নামক তাঁর একজন খাদেমও তাঁর সাথে চলল। তাঁরা থলের মধ্যে একটি মাছ নিলেন। চলার পথে তাঁরা একটি বড় পাথরের কাছে এসে সেখানে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। তারপর মাছটি (জীবিত হয়ে) থলে থেকে বেরিয়ে গেল এবং সুড়ঙ্গের মত পথ করে সমুদ্রে চলে গেল। এ ব্যাপারটি হযরত মূসা আ. ও তাঁর খাদেম-এর জন্য ছিল বিস্ময়কর বিষয়। এরপর তাঁরা তাঁদের বাকী রাতটুকু এবং পরের দিনভর চলতে থাকলেন। পরে ভোরে হযরত মূসা আ. তাঁর খাদেমকে বললেন, 'আমাদের নাশতা নিয়ে এস, আমরা আমাদের এ সফরে ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে পড়েছি, আর হযরত মূসা আ.-কে যে স্থানের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, সে স্থান অতিক্রম করার পূর্বে তিনি ক্লান্তি অনুভব করেননি। তারপর তাঁর খাদেম তাঁকে বলল, 'আপনি কি লক্ষ্য করছেন, আমরা যখন পাথরের পাশে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছি?' মূসা আ. বললেন, 'আমরা তো সেই স্থানটিই খুঁজছিলাম।' তারপর তাঁরা তাঁদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। তাঁরা সেই পাথরের কাছে পৌঁছে, কাপড়ে আবৃত (বর্ণনাকারী বলেন,) কাপড় মুড়ি দেয়া এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। মূসা আ. তাঁকে সালাম দিলেন। তখন খিযির বললেন, এ দেশে সালাম কোথা থেকে এল! তিনি বললেন, 'আমি মূসা।' খিযির জিজ্ঞেস করলেন, 'বনী ইসরাঈলের মূসা আ.?' তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি আরো বললেন, 'আমি কি আপনাকে অনুসরণ করতে পারি এ শর্তে যে, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিবেন?' খিযির বললেন, 'আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। হে মূসা আ.! আল্লাহর ইলমের মধ্যে আমি এমন এক (প্রকার) ইলম নিয়ে আছি যা তিনি আমাকেই শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানেন না। আর আপনি এমন ইলমের অধিকারী, যা আল্লাহ্ আপনাকেই শিক্ষা দিয়েছেন, তা আমি জানি না।' মূসা আ. বললেন, 'ইনশাআল্লাহ্ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার আদেশ অমান্য করব না।

তারপর তাঁরা দুজন সমুদ্র তীর দিয়ে চলতে লাগলেন, তাঁদের কোন নৌকা ছিল না (যাতে সমুদ্র পার হতে পারেন)। ইতিমধ্যে তাঁদের কাছ দিয়ে একটি নৌকা যাচ্ছিল। তাঁরা নৌকাওয়ালাদের সঙ্গে তাদের আরোহণ করে নেয়ার কথা বললেন। তারা খিযিরকে চিনতে পারল এবং বিনা ভাড়ায় তাঁদের নৌকায় তুলে নিল। তখন একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার এক প্রান্তে বসে দুই-একবার সমুদ্রে তার ঠোঁট মারল। খিযির আ. বললেন, 'হে মূসা আ.! আমার ইলম এবং তোমার ইলম (সব মিলেও) আল্লাহর ইলম থেকে সমুদ্র থেকে চড়ুই পাখির ঠোঁটে যতটুকু পানি এসেছে ততটুকু পরিমাণও কমাতে পারবে না।' এরপর খিযির নৌকার তক্তাগুলোর মধ্য একটি কুলে ফেললেন। মূসা আ. বললেন, এরা আমাদের ভাড়া ছাড়া আরোহণ করিয়েছে, আর আপনি আরোহীদের ডুবিয়ে দেয়ার জন্য নৌকায় ফাটল সৃষ্টি করলেন?' খিযির আ. বললেন, 'আমি কি

বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধরতে পারবেন না?' হযরত মূসা আ. বললেন, 'আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না এবং আমার ব্যাপারে অধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।' বর্ণনাকারী বলেন, এটা হযরত মূসা আ.-এর প্রথমবারের ভুল।

তারপর তাঁরা উভয়ে (নৌকা থেকে নেমে) চলতে লাগলেন। (পথে) একটি বালক অন্যান্য বালকের সাথে খেলছিল। খিযির তার মাথার উপর দিক দিয়ে ধরলেন এবং হাত দিয়ে তার মাথা ছিদ্র করে ফেললেন। হযরত মূসা আ. বললেন, 'আপনি কি একটি নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন কোন হত্যার অপরাধ ছাড়াই?' খিযির আ. বললেন 'আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে কখনো ধৈর্য ধরতে পারবেন না?' ইবনে উয়ায়না র. বলেন, এটা ছিল পূর্বের চেয়ে বেশি জোরালো।

তারপর আবারো চলতে লাগলেন; চলতে চলতে তারা এক গ্রামের অধিবাসীদের কাছে পৌছে তাদের কাছে খাবার চাইলেন, কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। তারপর সেখানে তাঁরা এক পতনোন্মুখ একটি প্রাচীর দেখতে পেলেন। খিযির আ. তাঁর হাত দিয়ে সেটি খাড়া করে দিলেন। হযরত মূসা আ. বললেন, 'আপনি ইচ্ছে করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।' তিনি বললেন, 'এখানেই আপনার আর আমার মধ্যে সম্পর্কের অবসান।' প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আ. এর প্রতি রহম করুন। আমাদের কতই না মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হত যদি তিনি সবর করতেন, তাহলে আমাদের কাছে তাঁদের আরো ঘটনাবলী বর্ণনা করা হত।

মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আলী ইবনে খাশরাম সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না র. এ দীর্ঘ হাদীসটি বিশদভাবে বর্ণনা করেন।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল فسئل اى الناس اعلم الخ বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ইলম ঃ ১৭, ২৩, ৩০২, ৩৭৭, ৪৬৩, ৪৮১, ৪৮২-৪৮৩, ৬৮৭-৬৮৮, ৬৯০, ৯৮৭, ১১১৪।

সনদ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ঃ তিনি হলেন, জু'ফী মুসনিদী। তাকে মুসনিদীর বলার কারণ হল, তিনি গুরুত্বের সাথে মুসনাদ রেওয়ায়াতই তালাশ করতেন।

সুফিয়ান ঃ তিনি হলেন ইবনে উয়াইনা, সাওরী নন।

আমর ঃ তিনি হলেন ইবনে দীনার।

নাওফ বিকালী ঃ নূনের উপর যবর ওয়াও সাকিন শেষে ফা। بكالي বা এর নিচে যের কাফ তাশদীদ বিহীন। বনী বিকালের দিকে সম্বন্ধযুক্ত। এটি হিমইয়ারের একটি শাখা। তিনি দামেশকের বড় জ্ঞানী গুণী তাবিঈ আলিম ছিলেন। কা'ব আহবারের স্ত্রীর ছেলে ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন কা'ব আহবারের ভাতিজা।

সাঈদ ইবনে জুবাইর ঃ বড় তাবিঈ আলিম। হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর শিষ্য।

প্রশ্ন ঃ এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় মতানৈক্য মূসা আ. সম্পর্কে ছিল। অর্থাৎ, যে মূসা হযরত খিযির আ. এর কাছে গিয়েছিলেন, তিনি কি বনী ইসরাঈলের নবী হযরত মূসা ইবনে ইমরান তথা মূসা কালীমুল্লাহ ছিলেন, না কি মূসা ইবনে মীশা?

এর পূর্বে ১৭ পৃষ্ঠায় ما ذكر في ذهاب موسى في البحر অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা জানা গেল মতানৈক্য মূসা আ. এর সঙ্গী সম্পর্কে ছিল যে, তিনি হযরত খিযির আ., না অন্য কেউ। বাহ্যত বিরোধ বুঝা যায়।

উত্তর ঃ হযরত মূসা আ. ও খিযির আ. এর ঘটনা সংক্রান্ত দুটি বিষয়ে মত পার্থক্য হয়েছে। একটি মতবিরোধ ما ذكر في ذهاب موسى في البحر অনুচ্ছেদের অধীনে ৫৮ পৃষ্ঠার হাদীসে রয়েছে। সে ইখতিলাফ

দুই সাহাবীর মাঝে। অর্থাৎ, হযরত ইবনে আব্বাস ও হুর ইবনে কায়েস রা. এর মাঝে মূসা আ. এর সাথী সম্পর্কে মতবিরোধ হয়েছে যে, তিনি কি খিযির আ. না অন্য কেউ?

দ্বিতীয় মতবিরোধ হল, এখানে ৮৬ নং অনুচ্ছেদের অধীনস্থ হাদীসে যে মতবিরোধের উল্লেখ রয়েছে, সেটি হল, দুজন তাবিঈ এর মধ্যকার ইখতিলাফ। অর্থাৎ, নাওফ বিকালী ও সাঈদ ইবনে জুবাইর র. এর মাঝে মতবিরোধ হয়েছে যে, হযরত খিযির আ. এর নিকট যে মূসা আ. গিয়েছেন, তিনি কে? নাওফ বিকালী র. এর মত ছিল তিনি বনী ইসরাঈলের পয়গম্বর হযরত মূসা কালীমুল্লাহ নন, বরং হযরত ইউসুফ আ. এর নাতি মূসা ইবনে মীশা। অতএব উভয় মতানৈক্যের আলোচ্য বিষয় স্বতন্ত্র। ইখতিলাফকারীগণও আলাদা আলাদা। কাজেই মতবিরোধ নেই।

ব্যাখ্যা ঃ كذب عدو الله নাওফ বিকালী ঈমানদার ছিলেন। জ্ঞানী গুনী আলিম ও দামেশকবাসীর ইমাম ছিলেন। তাহলে হযরত ইবনে আব্বাস রা. তাকে আল্লাহর দুশমন কিভাবে বললেন?

উত্তর ঃ এটি শুধু ধমক ও সতর্কবাণী রূপে বলেছেন, প্রকৃত অর্থে প্রযোজ্য নয়।

এর দ্বারা একটি মাসআলাও প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন আলিম কারো কোন মন্দ আচরণ দেখেন অথবা সুস্পষ্ট হাদীসের পরিপন্থী কারো কোন উক্তি শুনেন, তবে মারাত্মক সংকোচ এবং দীনি সহমর্মিতা ও পক্ষপাতিত্বের কারণে এ ধরণের কঠোর শব্দ উচ্চারণের অবকাশ রয়েছে।

وكان لموسى وفتاه عجبا অর্থাৎ, ইউশা আ. তখন বিস্ময় বোধ করলেন এবং হযরত মূসা আ. বিস্ময়াভিভূত হয়েছেন ইউশা আ. থেকে মাছের ঘটনা শুনার পর। কিন্তু যেহেতু বিস্ময়ের কারণগুলো যৌথ ছিল এজন্য সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে একই শব্দে উভয়ের তাজ্জবের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

فانطلقا بقية ليلتها ويومهما এ শব্দগুলোতে উলট পালট হয়ে গেছে। অর্থাৎ, এখানে يومهما - ليلتهما এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশুদ্ধ ক্রমানুপাতে রয়েছে সহীহ বুখারীর কিতাবুত তাফসীরে। সেখানে আছে- فانطلقا بقية يومهما وليلتهما অর্থাৎ, দুপরে শোয়ার পর যখন জাগ্রত হলেন, তখন ইউশা আ. হযরত মূসা আ.কে মাছের ইতিবৃত্ত শুনাতে ভুলে গেছেন। উভয়ে দিনের অবশিষ্ট সময় এবং পরবর্তী রাত চলতে থাকেন।

فلما اصبح স্পষ্ট বিষয়, সারারাত চলার পর সকাল হয়। এভাবে فلما اصبح বাক্যটির সাথে পূর্বের যোগসূত্র হয়ে যায়। তাছাড়া মুসলিম শরীফ ঃ ২/২৬৯ এও يوم আগে ও ليلة শব্দটি পরে আছে।

قوله حَتّٰى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا

এতে প্রশ্ন হল, اهل শব্দটিকে পুনরায় কেন নেয়া হল?

যমীরের ক্ষেত্রে ইসমে জাহির রাখার হিকমত কি?

উত্তর ঃ সে জনপদে দুজন নবী তাশরীফ এনেছেন এবং তাদের মেহমান হয়েছেন। অতঃপর কোন অপরিচিত পর ব্যক্তির কাছে বরং সে জনপদবাসীর নিকটই খাদ্য চেয়েছেন। আর তারা সে জনপদের বাসিন্দা হওয়ার কারণে এসবে পূর্ণ সক্ষমও ছিল। তা সত্ত্বেও তাদের মেহমানদারীর তাওফীক হয়নি। অতএব তাদের মন্দ অবস্থা বুঝানোর জন্য اهل শব্দটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

উপকারিতা ঃ বাকী ব্যাখ্যার জন্য ১ম খণ্ডের ৫৮ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। তাছাড়া গ্রন্থকার নাসরুল বারী কিতাবুত তাফসীরেও সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। দেখুন, নাসরুল বারী, কিতাবুত তাফসীর ঃ ৩৯০-৩৯৩।

উৎসারিত মাসায়িল ঃ আল্লামা আইনী র. এ হাদীস থেকে অনেক মাসায়িল উৎসারণ করেছেন।

১. ইলম অর্জনের জন্য সফর করা মুস্তাহাব।

২. সফরের জন্য পাথেয় তথা খাদ্য পানীয় আসবাব পত্র সাথে নেয়া জায়িয আছে।

৩. তালিবে ইলমের ফযীলত, আলিমের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণ, বুযুর্গ মাশায়েখের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাদের প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন থেকে দূরে থাকা, মাশায়েখের যে সব কথা বুঝে না আসে সেগুলোর সদার্থ করা, তাদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা, যদি তাতে ত্রুটি হয়ে যায় তো ওযর পেশ করা।

৪. বেলায়েত সহীহ। আউলিয়ায়ে কিরামের কারামত সত্য।

৫. প্রয়োজনের সময় খাদ্য চাওয়া জায়িয আছে।

৬. পারিশ্রমিক নিয়ে কোন জিনিস দেয়া জায়িয আছে।

৭. নৌকা অথবা অন্য কোন সওয়ারীতে পারিশ্রমিক ছাড়া আরোহন করা জায়িয আছে। তবে শর্ত হল মালিকের সম্মতি থাকতে হবে।

৮. كذب তথা মিথ্যাচার হল, অবাস্তব ঘটনার সংবাদ দান। চাই ইচ্ছাকৃত হোক অথবা ভুলক্রমে। এর পরিপন্থী মু'তাযিলা সম্প্রদায়।

৯. যখন দুটি ফাসাদ এবং দুটি অনিষ্ট পরস্পর বিরোধী হয়, তবে বড় অনিষ্টকে প্রতিহত করার জন্য নিম্নস্তরের অনিষ্ট বরদাশত করে নেয়া উচিত। যেমন, নৌকা বিদীর্ণ করে দেয়ার ফলে তা ছিনিয়ে নেয়ার মুসিবত প্রতিহত হয়ে যায়। اذا ابتليت ببليتين فاختراهو نهما.

১০. একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক কথা জানা গেল যে, শরীয়তের সমস্ত আহকাম স্বীকার করে নেয়া ও এগুলোর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা ওয়াজিব। চাই তার হিকমত বুঝে আসুক বা না আসুক। ইত্যাদি।

৮৭. بَاب مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا

৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ আলিমের বসা থাকা অবস্থায় কারো দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করা। বুখারী ঃ ২৩

যোগসূত্র ঃ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদেও আলিমের নিকট প্রশ্নের আলোচনা ছিল এ অনুচ্ছেদেও আলিমের নিকট প্রশ্নের আলোচনা রয়েছে। অতএব উভয়ের মাঝে মিল স্পষ্ট।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য হল, যদি কোন মজলিস নিয়মতান্ত্রিক দীনি তা'লীমের জন্য না হয়। যেমন, সফরের অবস্থা এবং প্রশ্নকারীর দীনি মাসআলা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন এসে যায়, তখন আলিমের নিকট যেয়ে দাড়িয়ে দাড়িয়েও প্রশ্ন করতে পারে। অর্থাৎ, দাড়িয়ে দাড়িয়ে প্রশ্ন করা আদব পরিপন্থী হলেও প্রয়োজনে জায়িয আছে।

২. পিছনের অনুচ্ছেদগুলোর একটিতে গেছে من برك على ركبتيه عند الامام او المحدث যদ্দারা বুঝা যায়, ইলম অর্জনের জন্য আদব ও প্রশান্তিমূলক বৈঠক অবলম্বন করা উচিত। এর দ্বারা ধারনা হতে পারে যে, বসাই জরুরী।

এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য, বসার হুকুম মুস্তাহাব, ওয়াজিবমূলক নয়। প্রয়োজনের মুহুর্তে দাড়িয়ে দাড়িয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে পারে।

١٢٣. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رض قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ

غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالَ وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

১২৩. উসমান র. ..... হযরত আবূ মূসা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কোনটি? কারণ, আমাদের কেউ লড়াই করে রাগের বশীভূত হয়ে, আবার কেউ যুদ্ধ করে (ব্যক্তি, সম্প্রদায় রাষ্ট্রীয় আত্মমর্যাদাবোধ ও) প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য। তিনি তার দিকে মাথা তুলে তাকালেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর মাথা তোলার কারণ ছিল যে, সে ছিল দাঁড়ানো। এরপর তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহর কালিমা তথা দীনকে বুলন্দ করার জন্য যে লড়াই করে সেই আল্লাহর রাস্তায়।'

শিরোনামের সাথে ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল .وما رفع اليه رأسه الا انه كان قائما বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ইলম ঃ ২৩, জিহাদ ঃ ৩৯৪, ৪৪০, তাওহীদ ঃ ১১১১।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটি জাওয়ামিউল কালিমের অন্তর্ভূক্ত। যদি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি শাখাগত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ দিতেন তবে কথা অনেক দীর্ঘ হয়ে যেত। কারণ, গোস্বা যদি দীনের জন্য হয়, তবে সেটাকে বলবে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ। এমনিভাবে আত্মমর্যাদাবোধ যদি দীনের জন্য হয়, তবে নিঃসন্দেহে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ হবে। কিন্তু যদি ক্রোধ ও আত্মমর্যাদা বোধ কোন খারাপ নিয়তে হয়, তবে অবশ্যই জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ নয়।

তাছাড়া কোন কোন রেওয়ায়াতে প্রশ্নকারীর প্রশ্নে লড়াইয়ের অন্যান্য কারণ রয়েছে। যেমন, কিতাবুল জিহাদের শব্দ হল-

الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله. بخاري صـــ ٣٩٤.

এসব বিষয়ের উত্তরে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেহায়েত সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক উত্তর দিয়েছেন। যার ফলে সমস্ত প্রশ্নের উত্তরও হয়ে গেছে এবং মূললক্ষ্য উদ্দেশ্য স্পষ্টও হয়ে গেছে। সেটি হল, আল্লাহর দীন বুলন্দ হলে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ হবে। আর যে লড়াই দ্বারা শুধু ধন-সম্পদ কামাই করা এবং স্বীয় সুখ্যাতি ও প্রসিদ্ধি মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হয় সেটি জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ হতে পারে না।

٨٨. بَاب السُّؤَالِ وَالْفُتْيَا عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ কংকর মারার সময় কোন মাসআলা ও ফতওয়া জিজ্ঞেস করা। বুখারী ঃ ২৩

যোগসূত্র ঃ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের সাথে যোগসূত্র ও মিল স্পষ্ট। কারণ, পূর্বের অনুচ্ছেদে প্রশ্নোত্তরের আলোচনা রয়েছে, আর এ অনুচ্ছেদেও প্রশ্নোত্তরের আলোচনা রয়েছে।

শিরোনামের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ঃ এই শিরোনামটি কায়েম করার উদ্দেশ্য হল, যদি কোন আলিম এরূপ ইবাদতে রত হন, যাতে অন্য দিকে মনোযোগ দান এবং কথা বলার অনুমতি রয়েছে, এমতাবস্থায় সে আলিমের নিকট ইলমী কথা জিজ্ঞেস করতে পারেন, আলিমও উত্তর দিতে পারেন। বিশেষত যখন মাসআলার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে তৎক্ষনাৎ জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হয়, তখন সে সময়েই প্রশ্ন করা জায়িয আছে। কারণ, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কংকর নিক্ষেপের সময়

মাসআলা বলেছেন। অবশ্য যদি আলিম এরূপ ইবাদতে রত হন, যাতে কথাবার্তা বলা জায়িয নেই, বরং নিষিদ্ধ, কথাবার্তা বললে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে, তবে এমতাবস্থায় দীনি মাসআলাও বলা জায়িয হবে না।

١٢٤. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضــ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَهُوَ يُسْأَلُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ آخَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ قَالَ انْحَرْ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ

১২৪. আবূ নুআইম র. ...... হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখলাম, জামরার নিকট তাঁকে মাসআলা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি কংকর মারার আগেই (ভুলে) কুরবানী করে ফেলেছি।' তিনি বললেন ঃ 'কংকর মার, তাতে কোন গুনাহ নেই।' অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কুরবানী করার পূর্বেই মাথা মুড়ে ফেলেছি।' তিনি বললেন ঃ 'কুরবানী করে নাও, কোন গুনাহ নেই।' বস্তুতঃ আগে পিছু করার যে কোন প্রশ্নই তাঁকে করা হচ্ছিল, তিনি বলছিলেন ঃ 'কর, গুনাহ নেই।'

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল

عند الجمرة وهو يسأل وهذا من جانب المستفتي وقوله ارم ولا حرج وافعل ولا حرج من جهة المفتي فطابق للترجمة بجزئيها. عمدة

বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ইলম ঃ ২৩-২৪, ২৩৪, ৯৮৬।

ব্যাখ্যা ঃ

عند الجمرة - اللام للجنس فيشتمل كل جمرة كانت من الجمرات الثلاث او للعهد فالمراد بالجمرة العقبة لانها اذا اطلقت كانت هي المرادة. عمدة : ١٩٨/٢.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জামরায়ে আকাবার পাশে দেখলাম, তার নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। এ হাদীসটি ইতোপূর্বে باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة او غيرها এর অধীনে এসেছে। ৮২ নং হাদীসের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

٨٩. بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আল বাণী, বুখারী ঃ ২৪

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

'তোমাদেরকে অতি অল্পই ইলম দেয়া হয়েছে ।'

যোগসূত্র ঃ

وجه المناسبة بين البابين من حيث ان كلا منهما مشتمل على سوال عن عالم غير ان المسئول قد بين في الاول لكونه مما يحتاج الى عمله السائل ولم يبين في هذا لعدم الحاجة الى بيانه لكونه مما اختص الله سبحانه فيه. عمدة.

অর্থাৎ, পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদেও আলিমের নিকট প্রশ্নের আলোচনা ছিল, এ অনুচ্ছেদেও তাই। এ হিসেবে উভয়ের মাঝে মিল স্পষ্ট। কিন্তু উভয় শিরোনামে সামান্য পার্থক্য আছে। সেটি হল, পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে, আর এ অনুচ্ছেদে প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়নি। কারণ, প্রথমে জরুরতের প্রশ্ন ছিল, এজন্য তা বাতলে দেয়া হয়েছে। আর এ অনুচ্ছেদে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। বস্তুত রুহের হাকীকত জানা জরুরী নয়। তাছাড়া রুহের হাকীকত-তাৎপর্য আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারো জানা নেই। এজন্য এর উত্তর দেয়া হয়নি। অর্থাৎ, রুহের প্রকৃত তাৎপর্য বলা হয়নি। এতে বুঝা গেল প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া জরুরী নয়।

শিরোনামের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ঃ এ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য হল, যেহেতু আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ রয়েছে- مَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً

সেহেতু কারো নিজের জ্ঞানের উপর অহংকার না করা চাই, ধোকায় না পড়া চাই। চাই সে তাকে যুগের বড় আলিমই বলা হোক না কেন? কারণ, আল্লাহ তা'আলার বাণী অনুযায়ী সমস্ত মাখলূকের ইলম কম। কাজেই তাদের মধ্য থেকে একজনের ইলম নিতান্তই সবচেয়ে কম হবে।

কোন বৃদ্ধা এক আলিমকে মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বললেন, আমি জানিনা। বৃদ্ধা অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, কিসের বেতন নাও? আলিম উত্তর দিলেন, আমি আমার জানা জিনিসের বেতন নেই। যদি অজানা জিনিসেরও বেতন নিতে আরম্ভ করি, তবে কারূনের ধন-ভাণ্ডারও যথেষ্ট হবে না।

হযরত শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া র. বলেন, আমার মতে এ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য একটি দেওবন্দী মাসআলা প্রমাণ করা। সেটি হল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলিমুল গায়িব ছিলেন না। কারণ, ما اوتيتم সম্বোধনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অন্তর্ভূক্ত। এখানে قل ما اوتيتم বলেন নি। কারণ, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মর্তবা সর্বাবস্থাতেই আল্লাহর পরে। অতএব আলিমুল গায়িব তো শুধু আল্লাহ তা'আলা। বাকী যত লোক রয়েছে চাই নবী হোন বা ওলী কেউ ইলমে গায়েব জানেনা। -তাকরীরে বুখারী ঃ ১/২০২।

١٢٥. حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضـ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَرِبِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ لَا يَجِيءُ فِيهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنَسْأَلَنَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَسَكَتَ فَقُلْتُ إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقُمْتُ فَلَمَّا انْجَلَى عَنْهُ قَالَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ الْأَعْمَشُ هَكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا

১২৫. কায়েস ইবনে হাফস র. .... হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে মদীনার বসতিহীন অনাবাদি এলাকা দিয়ে বা ক্ষেতে চলছিলাম। তিনি একটি খেজুরের ডালে ভর দিয়ে একদল ইয়াহূদীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তারা একজন অন্যজনকে বলতে লাগল, 'তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর।' আর একজন বলল, 'তাঁকে কোন প্রশ্ন কর না, হয়ত এমন কোন উত্তর দিবেন যা তোমাদের অপসন্দ নয়।' আবার তাদের কেউ কেউ বলল, 'তাঁকে আমরা অবশ্যই প্রশ্ন করব।' তারপর তাদের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আবুল কাসিম! রূহ কী?' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ করে রইলেন, আমি মনে মনে বললাম, তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছে। তাই আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর যখন সে অবস্থা কেটে গেল তখন তিনি বললেন ঃ

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

'তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত আর তাদেরকে সামান্যই জ্ঞান দান করা হয়েছে।' (বনী ইসরাঈল ঃ ৮৫)

আ'মাশ র. (তাঁর নাম সুলাইমান ইবনে মিহরান) বলেন, এভাবেই আয়াতটিতে আমাদের কিরাআতে اوتيتم এর স্থলে اوتوا পড়া হয়েছে (অর্থাৎ, গায়েবের সীগায় وما اوتيتم নেই)।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল স্পষ্ট। কারণ, শিরোনামে আয়াতে কারীমার টুকরো রয়েছে। আর হাদীস শরীফে শানে নুযূলের সাথে সাথে পূর্ণ আয়াত বিদ্যমান।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ইলম ঃ ২৪, তাফসীর ঃ ৬৮৬, ই'তিসাম ঃ ১০৮৪, তাওহীদ ঃ ১১১১-১১১২।

হাদীসের শব্দ বিশ্লেষন ঃ خَرَب খা এ যবর ও রা এর নিচে যের। আর কেউ কেউ বলেছেন, এর উল্টো অর্থাৎ, খা এর নিচে যের রা এর উপর যবর। এটি خربة এর বহুবচন অর্থ অনাবাদি-বিরাণ ভূমি। কিতাবুত তাফসীরে في حرث المدينة শব্দ আছে। এজন্য ব্রাকেটে এর তরজমা লিখে দেয়া হয়েছে।

عَسِيب আইন এর উপর যবর সীনের নিচে যের অর্থ খেজুরের ডাল। যার পাতা ফেলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, খেজুরের ডালের ছড়ি।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মদীনার ক্ষেতে চলছিলাম। তাঁর হাতে ছিল একটি ছড়ি। যার উপর ভর করে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলছিলেন। হঠাৎ মদীনার কিছু সংখ্যক ইয়াহুদীর সামনে দিয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিক্রম করছিলেন। সে ইয়াহুদীদের কেউ বলল, তাকে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হোক, কেউ বলল, জিজ্ঞেস কর না। এমন যেন না হয় যে, তিনি এরূপ কথা বলবেন যা তোমাদের অপছন্দ হবে।

ইয়াহুদীদের জানা ছিল যে, দার্শনিকরা অনুমান করে রুহের হাকীকত বর্ণনায় লেগে যান। কিন্তু নবীগণ থেকে যখন কোন কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় তখন তারা নিজেরা বলেন না। বরং আল্লাহর ইলমের হাওয়ালা করেন। এবার যদি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আল্লাহর ইলমের উপর ন্যাস্ত করেন, তবে লোকজনের উপর নবুওয়াতের আরেকটি প্রমাণ কায়েম হয়ে যাবে। যা তারা পছন্দ করত না। তারা জানত যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই উত্তর দিবেন যা তাওরাতে আছে।

ইয়াহুদীরা সর্বদা চেষ্টা করেছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য কোন কিছু হাতে আসে কিনা? এবার যদি রুহ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরও তাই পাওয়া যেত যা হযরত মূসা আ. বর্ণনা করেছিলেন তবে এ উত্তর হত নবুওয়াতের প্রমাণ।

এরপর এক ইয়াহুদী দাড়িয়ে বলতে লাগল, হে আবূল কাসিম! রুহ কি জিনিস? অর্থাৎ, যে রুহ দেহ নিয়ন্ত্রন করে, যার কারণে মানবিক সমস্ত অঙ্গ প্রতঙ্গ স্ব স্ব স্থানে গতিশীল। এতদশ্রবণে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব হয়ে যান। আমি বুঝতে পারলাম, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ওহী আসছে। আমি আলাদা দাড়িয়ে রইলাম। যখন ওহী নাযিল হওয়ার অবস্থা ও ধরণ কেটে গেল, তখন তিনি সূরা বনী ইসরাঈলের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন-

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً.

'লোকজন আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে, আপনি বলুন, রূহ আমার প্রভুর আদেশ ঘটিত বিষয়। আর তোমাদেরকে খুবই কম জ্ঞান দান করা হয়েছে।'

রূহ সম্পর্কে এ উত্তরই তাওরাতে ছিল। এবার কোন কিছুই বলার অবকাশ থাকেনি। ফলে নীরব হতে হয়েছে।

হযরত শাহ আবদুল কাদির দেহলভী র. মু'যিহুল কুরআনে বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরীক্ষা করার জন্য ইয়াহুদীরা জিজ্ঞেস করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বিশদ ব্যাখ্যা দেননি। কারণ, তাদের অনুধাবনের যোগ্যতা ছিল না। পরে পয়গম্বরগণও মাখলূকের নিকট এরূপ সুক্ষ্ম কথা বলেননি। এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার হুকুমে একটি জিনিস এসে পড়েছে। সেটি প্রাণ বিশিষ্ট হয়ে গেছে। যখন এটি বের হয়ে গেছে তখন মরে গেছে। এর বিস্তারিত বিবরণ দেখার জন্য দ্রষ্টব্য নাসরুল বারী, কিতাবুত তাফসীর ৩৭০-৩৭১।

٩٠. بَاب مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الِاخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ

৯০. পরিচ্ছেদ ঃ কোন কোন মুস্তাহাব কাজ এই আশঙ্কায় ছেড়ে দেয়া যে, কিছু লোকে ভুল বুঝতে পারে এবং তারা এর চেয়ে মারাত্মক বিভ্রান্তিতে পড়তে পারে। বুখারী ঃ ২৪

অর্থাৎ, বৈধ বিষয়াবলীতে প্রধানটি সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও দুর্বল দিকের উপর আমল করা জায়িয আছে কোন স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করে। যেমন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ শরীফের ভিত্তিকে হযরত ইবরাহীম আ. এর ভিত্তির উপর ফিরিয়ে আনার বৈধ ও ইখতিয়ারী বিষয়টিকে (জাতীয়) স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করে বর্জন করেছেন।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন, পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে হিকমতের দাবীর কারণে প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর না দেয়ার উল্লেখ ছিল। এ অনুচ্ছেদে হিকমত ও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করে কোন কোন পছন্দনীয় বিষয় পরিহার করার আলোচনা করা হচ্ছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ উপরোক্ত যোগসূত্রের আলোকেই ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট। সেটি হল, কোন পছন্দনীয় কাজের উপর আমল করলে যদি লোকজনের বড় ফিতনা ও গুনাহে লিপ্ততার আশংকা হয় তবে সে পছন্দনীয় ও প্রধান বিষয়টিকে পরিহার করা উচিত।

আল্লামা উসমানী র. বলেন, এই শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী র. সতর্ক করছেন যে, আলিমের জন্য প্রজ্ঞাবান হওয়া উচিত এবং সংশোধনের সময় লোকজনের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত। যাতে ক্ষুদ্র বিষয়ের সংশোধনের ফলে কোন বড় মারাত্মক অনিষ্টে পতিত হতে না হয়। -দরসে বুখারী।

١٢٦. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ الزُّبَيْرِ رضـ كَانَتْ عَائِشَةُ رضـ تُسِرُّ إِلَيْكَ كَثِيرًا فَمَا حَدَّثَتْكَ فِي الْكَعْبَةِ قُلْتُ قَالَتْ لِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ لَوْلَا قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِكُفْرٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ

১২৬. উবায়দুল্লাহ্ ইবনে মূসা র. ..... আসওয়াদ র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ হযরত ইবনে যুবাইর রা. আমাকে বললেন, হযরত আয়েশা রা. তোমাকে অনেক গোপন কথা বলতেন। বল তো কা'বা সম্পর্কে তোমাকে কী বলেছেন? আমি বললাম, (হ্যাঁ) তিনি আমাকে বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'আয়েশা! তোমার সম্প্রদায় যদি নতুন ইসলাম গ্রহণকারী না হত, (জাহিলী যুগের নিকটবর্তী না হত, ইসলাম গ্রহণের পর অনেক দিন অতিক্রম করত।) হযরত ইবনে যুবাইর বলেন ঃ কুফর থেকে নিকটবর্তী না হত; তবে আমি কা'বা ঘর ভেঙ্গে তার দু'টি দরজা বানাতাম। এক দরজা দিয়ে লোকজন প্রবেশ করত আর এক দরজা দিয়ে বের হত। (পরবর্তীকালে মক্কার শাসক হয়ে নিজ শাসনামলে) তিনি এরূপ করেছিলেন।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হাদীসের অর্থ দ্বারা সম্পূর্ণ স্পষ্ট। কারণ, কুরাইশ বাইতুল্লাহর প্রতি নেহায়েত সম্মান প্রদর্শন করত। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আশংকা হল, যদি আমি নিজের ইখতিয়ারকে কাজে লাগাই তাহলে কুরাইশ নব মুসলিম হওয়ার কারণে এটাকে স্বতন্ত্র অহংকার এবং সুখ্যাতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে একটি বড় ফিতনায় পড়তে পারে। এজন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দনীয় বিষয়টি পরিহার করলেন।

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ইলম ঃ ২৪, হজ্ব ঃ ২১৫, ৪৭৭, তাফসীর ঃ ৬৪৪, ১০৭৫-১০৭৬।

ব্যাখ্যা ঃ عن الاسود আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ একজন শীর্ষস্থানীয় তাবিঈ। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ফকীহ ইবরাহীম নাখঈ র. এর মামা। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর শিষ্য। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর বিশিষ্ট ছাত্র। তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগ পেয়েছেন, কিন্তু তাঁকে দর্শনের সৌভাগ্য হয়নি। ৭৫হিজরীতে ওফাত লাভ করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. ও আসওয়াদ র উভয়ে এহাদীসটি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. থেকে শুনেছেন। যেমন, হযরত সাঈদ ইবনে মীনা র. থেকে বর্ণিত-

سمعت عبد الله بن زبير رضـ يقول حدثتني خالتي يعني عائشة رضـ قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لو لا ان قومك حديثوا عهد بشرك لهدمت الكعبة الخ. مسلم شريف : ١/٤٣٠.

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদের শ্রবণ স্পষ্ট।

এতে বুঝা গেল, হযরত আয়েশা রা. স্বীয় ভাগিনা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.কেও এ হাদীসটি বলেছিলেন এবং তাঁরও স্মরণ ছিল। কিন্তু বেশি তাহকীক ও দৃঢ়তার জন্য হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ র. থেকেও জিজ্ঞেস করছেন। যাতে কা'বা ঘর নতুনভাবে নির্মাণ করার ক্ষেত্রে লোকজনের প্রশ্ন থেকে না যায়।

قال ابن الزبير بكفر **হযরত ইবনে যুবাইর রা. যখন আসওয়াদ র. কে জিজ্ঞেস করেন যে, হযরত আয়েশা রা. কা'বা সম্পর্কে তোমার নিকট কি বর্ণনা করেছেন? তখন আসওয়াদ র. বললেন-**

حدثني حديثا كثيرا نسيت بعضه وانا اذكره بعضه قال اي ابن الزبير ما نسيت اذكرتك قلت قالت. فتح : ١٨١/١.

আসওয়াদ হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে যখন حديث عهدهم শব্দ পর্যন্ত পৌঁছেন তখন হয়ত بكفر বলতে ভুলে গেছেন এবং ইবনে যুবাইর রা. লোকমা দিয়েছেন যে, حديث عهدهم بكفر বল। অথবা আসওয়াদ حديث عهدهم পর্যন্ত পৌঁছে بكفر থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ভুলে গেছেন। আর ইবনে যুবাইর রা. পূর্ণ হাদীস পড়েছেন।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা ঘরে তিনটি কাজ করতে চেয়েছিলেন।

১. হাতিমকে বাইতুল্লাহতে অন্তর্ভূক্ত করা।

২. বাইতুল্লাহর দরজা যেটি যমিন থেকে সাড়ে চার হাত উঁচু সেটিকে যমিনের সাথে মিলিয়ে দেয়া।

৩. দুটি দরজা বানানো। অর্থাৎ, পূর্ব দরজার বিপরীতে পশ্চিমদিকেও যেন একটি দরজা হয়। যাতে লোকজন এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করে অপর দরজা দিয়ে বের হতে পারে।

বাইতুল্লাহ নির্মাণ ঃ

ইমাম নববী র. বলেন-

قال النووى رحمه الله قال العلماء بني البيت خمس مرات بنته الملائكة ثم ابراهيم عليه السلام ثم قريش في الجاهلية وحضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا البناء وله خمس وثلاثون سنة وقيل خمس وعشرين وفيه سقط على الارض حين وقع ازاره ثم بناه ابن الزبير رضي الله عنهما ثم الحجاج بن يوسف واستمر الى الآن على بناء الحجاج وقيل بني مرتين اخريين او ثلاثا وقد اوضحته في كتاب ايضاح المناسك الكبير. شرح مسلم : ٤٢٩/١.

তৃতীয় নির্মাণ করেছেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়াতের পাঁচ বা পনের বছর পূর্বে মক্কার কুরাইশরা। যাতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, সম্পূর্ণ হালাল মালই তাতে খরচ করা হবে। হালাল মাল জমা করা হলে বাইতুল্লাহর পূর্ণাঙ্গ নির্মাণের জন্য তা যথেষ্ট হয়নি। এজন্য হাতিমের অংশ ছেড়ে দেন। আর দরজা শুধু একটি রাখেন। তাও যমিন থেকে উপরে। যাতে বাইতুল্লাহয় প্রবেশের বিষয়টি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রন রাখতে পারেন। যাকে ইচ্ছা প্রবিষ্ট করতে পারেন, যাকে ইচ্ছা বারণ করতে পারেন।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনের জন্য যাতে সহজ হয় এ জন্য তিনটি কাজ করতে চেয়েছিলেন। স্পষ্ট বিষয় এই কাজটি কোন ওয়াজিব ছিল না। শুধু উত্তম ছিল। কিন্তু এই নতুন নির্মাণে আশংকা ছিল, কুরাইশ নব মুসলিম, তাদের পৈতৃক নির্মাণের সাথে নিজেদের ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে। অতএব এতে পরিবর্তন তাদের জন্য ফিতনার কারণ হতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. তাঁর যুগে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাহিদা অনুযায়ী বাইতুল্লাহ নির্মাণ করেছেন। কিন্তু ইবনে যুবাইর রা. এর শাহাদতের পর হাজ্জাজ আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নির্দেশে পূনরায় আগের মত নির্মাণ করে দেয়। পরবর্তীতে হারূন রশীদ ইমাম মালিক র. থেকে পরামর্শ নেন যে, সমীচীন হলে আমি আবার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আকাংখা অনুযায়ী বাইতুল্লাহ নির্মাণ করব। ইমাম মালিক র. বললেন, বাইতুল্লাহকে বারবার

ভাঙ্গা, গড়া সমীচীন নয়। এর ফলে বাইতুল্লাহর মর্যাদা বিনষ্ট হবে এবং যে আসবে সেই নতুনভাবে নির্মাণ করবে। সে হিসেবে রাজা বাদশাহদের একটি খেলার বস্তুতে পরিণত হবে। অর্থাৎ, শাসকরা এটিকে লক্ষ্য বস্তু বানাবেন এবং প্রত্যেকে তাতে পরিবর্তন সাধন করবেন।

প্রশ্ন ঃ হাতিম বাইতুল্লাহর অংশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, শুধু হাতিমকে সামনে রাখলে নামায সহীহ হবে না। এর কারণ কি?

উত্তর ঃ নামাযে বাইতুল্লাহকে সামনে রাখার হুকুম কুরআনের নস দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার কারণে অকাট্য। পক্ষান্তরে হাতিম বাইতুল্লাহর অংশ হওয়া খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার কারণে ধারণা নির্ভর। তাছাড়া এতে মতবিরোধ রয়েছে যে, পূর্ণ হাতিম বাইতুল্লাহর অংশ, না এর কিছু অংশ। সহীহ হল, কিছু অংশ বাইতুল্লাহর, আর বাকী অংশ ছিল হযরত হাজেরা রা. এর বকরীর বাথান।

এ বিষয়েও রেওয়ায়াত বিভিন্ন রকম যে, হাতিমের কতটুকু বাইতুল্লাহ শরীফের অংশ? চার, পাঁচ, ছয়, সাড়ে ছয় এবং সাত গজের রেওয়ায়াত আছে।

এগুলোতে সামঞ্জস্য বিধান এভাবে করা হয়েছে যে, প্রশস্ত অংশ ছেড়ে চার এবং পাঁচ গজের মধ্যবর্তী। আর প্রশস্ত অংশ সহ সাড়ে ছয় গজ। অতএব ভাংতিটুকু উহ্য করে দিলে অথবা পূর্ণ করে দিলে রেওয়ায়াতে বিরোধ দূরিভূত হয়ে যায়। মোটকথা, হাতিম সামনে নিলে বাইতুল্লাহ শরীফকে বাস্তবে সামনে নেয়া নিশ্চিত নয়, এজন্য নামায হবে না।

৯১. بَاب مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا وَقَالَ عَلِيٌّ حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

৯১. পরিচ্ছেদ ঃ বুঝতে না পারার আশংকায় ইলম শিক্ষায় কোন এক সম্প্রদায় বাদ দিয়ে আর এক কওম বেছে নেয়া (প্রত্যেককে তার বুঝ জ্ঞান অনুপাতে শিক্ষা দান করা)।

হযরত আলী রা. বলেন, 'মানুষের কাছে সে ধরনের কথা বল, যা তারা বুঝতে সক্ষম। তোমরা কি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হোক তা পসন্দ কর?

পূর্বের সাথে যোগসূত্র ঃ পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, আলিমের উচিত লোকজনের বুঝের ক্রুটির আশংকার ফলে নিজের পছন্দনীয় কোন কোন কাজ পরিহার করা। এবার এ অনুচ্ছেদে বলা হচ্ছে, কিছু ইলম এবং হাকীকত সমঝদার লোকদের জন্য বিশেষিত করে বুঝের ক্রুটির আশংকায় কোন কোন লোককে যেন পরিহার করা হয়।

আল্লামা আইনী র. বলেন, উভয় শিরোনাম কাছাকাছি। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে সে হিকমতের আলোচনা ছিল যেটি কাজ পরিহারের সাথে সংশ্লিষ্ট। বস্তুত এখানে সে হিকমতের আলোচনা রয়েছে যেটি উক্তি পরিহারের সাথে সংশ্লিষ্ট। কা'বাকে না ভাঙ্গা হল কর্ম পরিহার। আর সম্বোধনকালে এরূপ কথা মুখ থেকে বের না করা, যা শ্রোতাদের অনুধাবণের উর্ধ্বে এটা হল, উক্তি পরিহার।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ হযরত শায়খুল হিন্দ র. বলেন, শিরোনামের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। সেটি হল, আলিমদের উচিত তা'লীম ও তাবলীগের ক্ষেত্রে শ্রোতা ও ছাত্রদের অবস্থার প্রতি পরিপূর্ণ রূপে লক্ষ করা। যে সব কথা শ্রোতাদের অনুধাবনের উর্ধ্বে সেগুলো না বলা চাই। শ্রোতা যে পর্যায়ের সে পর্যায়ের কথা বলা উচিত। যেমন, হযরত আলী রা. এর ইরশাদ রয়েছে-

حدثوا الناس بما يعرفون اي كلموا الناس على قدر عقولهم.

١٢٧. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ رضـــ عَنْ عَلِيٍّ رضـــ بِذَلِكَ

১২৭. এ হাদীস উবায়দুল্লাহ্ ইবনে মূসা র. .... হযরত আলী রা. থেকে বর্ণনা করেন।

ইমাম বুখারী র. শিরোনামে হযরত আলী রা. এর বাণী উল্লেখ করেছেন। অতঃপর এর সনদ পেশ করেছেন। এটি সে সব রেওয়ায়াতের অন্তর্ভূক্ত যেগুলোতে ইমাম বুখারী র. এর সনদ উঁচু পর্যায়ের। অর্থাৎ, বুখারীর ছুলাছিয়্যাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। -উমদাহ।

ছুলাছী সে সনদ যাতে তৃতীয় বর্ণনাকারী সাহাবী হন। এতে তৃতীয় রাবী হযরত আবুত তোফাইল আমির ইবনে ওয়াসিলা রা. সাহাবী। তিনি উহুদ যুদ্ধের বছর তৃতীয় হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেছেন। বিশুদ্ধ উক্তি অনুযায়ী তাঁর ওফাত হয়েছে ১১০ হিজরীতে। সাহাবায়ে কিরাম রা. এর মধ্যে সর্বশেষে তিনিই ওফাত লাভ করেছেন।

প্রশ্ন ঃ এখানে প্রশ্ন হয়, ইমাম বুখারী র. হযরত আলী রা. এর বাণীর মূলপাঠ পূর্বে উল্লেখ করেছেন এর সনদ পেশ করেছেন পরে। এর কারণ কি?

আল্লামা আইনী র. বলেন, আল্লামা কিরমানী র. এর কয়েকটি উত্তর দিয়েছেন।

১. হাদীসের সনদ ও আছরের সনদে পার্থক্য করার জন্য।

২. উদ্দেশ্য ছিল আছরের মূলপাঠকে শিরোনামের অধীনে আনা।

৩. এ সনদে একজন বর্ণনাকারী মা'রূফ ইবনে খাররাবূয র. ছিলেন দুর্বল। অতএব সনদকে পিছনে এনে সনদের দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

৪. ইমাম বুখারী র. এর বৈচিত্র্য যে, উভয় ছুরত জায়িয। এজন্য কোন কোন কপিতে সনদ মূল পাঠের আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লামা আইনী র. আল্লামা কিরমানী র. এর উত্তর উল্লেখ করার পর নিজের পক্ষ থেকে একটি উত্তর উল্লেখ করেছেন। সেটি হল, হতে পারে ইমাম বুখারী র. উপরোক্ত আছর তা'লীক রূপে উল্লেখ করার পর সনদ পেয়েছেন। -উমদাহ

١٢٨. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضـــ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًا قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا قَالَ إِذًا يَتَّكِلُوا وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا.

১২৮. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম র. .... হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, একবার হযরত মু'আয রা. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে সওয়ারীতে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন তিনি তাকে ডাকলেন, হে মু'আয ইবনে জাবাল! মু'আয রা. উত্তর দিলেন, 'আমি হাজির ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এবং

(আপনার আদেশ পালনের জন্য) প্রস্তুত। তিনি ডাকলেন, মু'আয! মু'আয রা. উত্তর দিলেন, আমি হাজির, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এবং প্রস্তুত।' তিনি আবার ডাকলেন, মু'আয! তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি হাজির ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এবং প্রস্তুত'। এরূপ তিনবার করলেন। এরপর বললেন ঃ যে কোন বান্দা আন্তরিকতার সাথে এ সাক্ষ্য দেবে যে, 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল- তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম হারাম করে দেবেন। মু'আয রা. বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি মানুষকে এ সংবাদ দেব না, যাতে তারা সুসংবাদ পেতে পারে?' তিনি বললেন, 'তাহলে তারা এর উপর ভরসা করে বসে থাকবে।' মু'আয রা. (সারা জীবন এ হাদীসটি বর্ণনা করেন নি) মৃত্যুর সময় এ হাদীসটি বর্ণনা করে গেছেন যাতে (ইলম গোপন রাখার) গুনাহ্ না হয়।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ

من حيث المعنى وهو انه عليه السلام خص معاذا رضـــ بهذه البشارة العظيمة دون قوم آخرين مخافة ان يقصروا في العمل متكلين على هذه البشارة. عمدة

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল অর্থগত দিক দিয়ে। সেটি হল, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কওমকে উপরোক্ত সুসংবাদ না দিয়ে বিশেষভাবে শুধু হযরত মু'আয রা.কে এই মহা সুসংবাদ দিয়েছেন। কারণ, তিনি আশংকা করছিলেন তারা এই সুসংবাদের উপর নির্ভর করে আমলে ক্রটি করবে।

হাদীসের পূণরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ইলম ঃ ২৪, এটি পরবর্তীতে সাথে সাথেই সংক্ষিপ্ত আকারে আসছে।

হাদীসের শব্দ বিশ্লেষন ঃ رديف পিছনে আরোহী। باب نصر থেকে। আর باب سمع থেকে رِدْفا অর্থ পিছনে হওয়া। ইমাম নববী র. বলেন, رِدْف এর অর্থ হল, একজন আরোহীর পিছনে আরোহনকারী। -শরহে মুসলিম ঃ ১/৪৪।

মূলত ردف এর অর্থ হল নিতম্ব। এজন্য পিছনে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে رديف বলা হয়।

لبيك يا رسول الله! و سعديك আল্লামা আইনী র. বলেন, لبيك লামের উপর যবর لب এর দ্বিবচন। এর অর্থ হল, ডাকে সাড়া দেয়া। উদ্দেশ্য হল, আপনার ডাকে আমি উপস্থিত, আপনার দরবারে আমি হাযির।

سعديك আল্লামা আইনী র. বলেন, এর সীনের উপর যবর سعد এর দ্বিবচন। অর্থাৎ, আমি আপনার আনুগত্যে বারবার সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। দ্বিবচন নেয়া হয়েছে তাকীদের জন্য। যেমন, لبيك এর ক্ষেত্রে। -উমদা ঃ ২/২০৬।

এই দুটি শব্দকে দ্বিবচন নেয়ার কারণ হল, যাতে তাকীদ ও আধিক্যের অর্থ অর্জিত হয়। এবার لبيك و سعديك এর অর্থ হল, আপনার দরবারে আমি বারবার হাযির। আপনার হুকুম পালনার্থে আমি প্রস্তুত। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করার জন্য এবং তনুমন দিয়ে শুনার জন্য তিনবার ডেকেছেন। যাতে পূর্ণরূপে তিনি মনোযোগী হন। হযরত মু'আয রা. পরিপূর্ণরূপে মনোযোগী হলে তিনি ইরশাদ করেন- ما من احد يشهد الخ

যে ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে আন্তরিকভাবে لا اله الا الله محمد رسول الله স্বীকারোক্তি করেছে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দিবেন।

এ বিষয়ের আরো অনেক হাদীস রয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা, উসমান রা. ও অন্যান্য সাহাবী রা. থেকে এরূপ রেওয়ায়াত এসেছে।

প্রশ্ন ঃ এই রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, কালিমায় স্বীকারোক্তিকারী মুমিন জাহান্নামে যাবে না। শুধু সাক্ষ্যের কারণে জাহান্নাম হারাম হয়ে যায়। অথচ অন্যান্য রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায়, কিছু সংখ্যক গুনাহগার মুসলমান জাহান্নামে যাবে। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুপারিশ ও আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমতে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে জান্নাতে প্রেরিত হবে। বাহ্যত উভয় প্রকার রেওয়ায়াতে বিরোধ মনে হয়।

উত্তর ঃ ১. কেউ কেউ উত্তর দিয়েছেন যে, এটি ফরয ও আহকাম সমূহ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার হাদীস।

এ উত্তরটি এজন্য বিশুদ্ধ নয় যে, সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা রা. এবং মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বলে হযরত আবূ মূসা রা. থেকেও এ বিষয়ে রেওয়ায়াত আছে। অথচ তাদের উভয়ের সোহবত অধিকাংশ ফরয অবতীর্ণ হওয়ার পরের। তারা উভয়ে সপ্তম হিজরীতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়েছেন।

২. এতে অধিকাংশ হুকুমের বিবরণ রয়েছে। কারণ, প্রবল হল, কালিমায় স্বীকারোক্তিকারী মুমিন নেক আমল করে এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে।

৩. জাহান্নামে দুটি স্তর রয়েছে। একটি খাস কাফিরদের জন্য, আরেকটি গুনাহগার মুমিনদের জন্য। এখানে জাহান্নাম হারাম করা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, নরকের সে স্তর যেটি কাফিরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

৪. জাহান্নামের উপর হারাম করা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, পরিপূর্ণ দেহকে হারাম করা। কারণ, মুসলমানের সিজদার স্থল এবং যবান যা কালিমায়ে তাওহীদ স্বীকার করত সে সব অংশ জাহান্নাম থেকে নিরাপদ থাকবে।

৫. জাহান্নামে প্রবেশ হওয়া নয়, বরং চিরস্থায়ীভাবে থাকা হারাম। অর্থাৎ, মুমিন সর্বদা জাহান্নামে থাকবে না।

৬. এটি সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রজোয্য যে ঈমান আনয়নের পর তৎক্ষনাৎ মৃত্যুলাভ করেছে। সে আমলের কোন সুযোগই পায়নি।

৭. আম্বিয়ায়ে কিরাম আ. একক জিনিসগুলোর ক্রিয়া বর্ণনা করেন। যুক্ত জিনিসগুলোর ক্রিয়ার বহিপ্রকাশ ঘটবে মীযানে (পরিমাপ যন্ত্রে) মাপার সময়। অতএব এ হাদীসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বতন্ত্র অবস্থায় কালিমায়ে তাইয়্যিবার ক্রিয়া বর্ণনা করেছেন। তথা এটি নরককে হারাম করে দেয়। কিন্তু এর সাথে গুনাহ যুক্ত হলে তার ক্রিয়া পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

হযরত নানূতবী র. আবে হায়াতে বলেন, ঈমানের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হল, আগুন থেকে মুক্তিদান। কিন্তু গুনাহের উষ্ণতার কারণে ঈমান উত্তপ্ত হয়ে যায়, তাহলে এরূপ মনে করো না যে, ঈমানের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য চলে যায়। যেমন, পানির স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হল ঠাণ্ডা হওয়া। আগুনের উপর রাখলে যখন উৎরাতে শুরু করে তখন বাহ্যত মনে হয় এর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য খতম হয়ে গেছে। কিন্তু হাকীকত অনুরূপ নয়। এ হাকীকত এভাবে স্পষ্ট হবে যে, উৎরানো পানি জলন্ত আগুনে নিক্ষেপ কর, তৎক্ষনাৎ আগুন নিভে যাবে। বুঝা গেল যে, পানিতে উষ্ণতা একটি যৌগিক বস্তু। এর ফলে এর মূল ঠাণ্ডা হারিয়ে যেতে পারে না। এটাই ঈমানের অবস্থা। এর বৈশিষ্ট্য মুমিনের অন্তরে এভাবে প্রবিষ্ট হয় যে, এর ক্রিয়া কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না।

স্বর্ণকে আগুনে ফেলে পরিচ্ছন্ন করা হয় ঃ

স্বর্ণের ময়লা অলংকারাদিকে স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা আগুনে নিক্ষেপ করে। কিন্তু আগুণে ফেলার দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু পরিষ্কার করা। যাতে আগুন দ্বারা ময়লা পরিষ্কার হয়ে সোনা চমকে উঠে। ঠিক অনুরূপ মুমিনকে

জাহান্নামে ধ্বংস করার জন্য নিক্ষেপ করা হবে না, বরং পাক পবিত্র করে জান্নাতের উপযোগী- বানানোর জন্য এরূপ করা হবে। যখন পরিষ্কার হয়ে যাবে তখন আগুন থেকে বের করা হবে। একারণেই মুমিন জাহান্নামে প্রবেশ করবে কিন্তু চিরস্থায়ীভাবে থাকতে পারে না। ঈমানের স্বভাবজাত ক্রিয়া অবশেষে প্রকাশিত হয়ে তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবে।

قوله يَتَّكِلُوا এটি জাযা, শর্ত উহ্য। অর্থাৎ, ان اخبرتم يتكلوا যদি তোমরা লোকজনকে সংবাদ দাও তবে ঈমানের কালিমার উপর ভরসা করে বসে যাবে।

واخبر معاذ عند موته تأثما অর্থাৎ, ইলম গোপনের গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

عند موته তথা হযরত মু'আয রা. এর মৃত্যুকালে।

প্রশ্ন ঃ এখানে প্রশ্ন হয়, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু হযরত মু'আয রা.কে এ হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ করেছিলেন, সেহেতু তিনি কেন বর্ণনা করলেন?

উত্তর ঃ ১. নিষেধাজ্ঞা হারামের জন্য ছিল না, বরং স্বার্থের ভিত্তিতে নিষেধাজ্ঞা ছিল তানযীহী। যদি হযরত মু'আয রা. নিষেধকে হারাম মনে করতেন তবে পরবর্তীতেও নিশ্চয়ই কারো কাছে বর্ণনা করতেন না।

২. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিষেধের সম্পর্ক ছিল জনসাধারণের সাথে, যাদের থেকে এর উপর নির্ভর করে বসে থাকার আশংকা ছিল, বিশেষ লোকদের সাথে নয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও হযরত মু'আয রা.কে সংবাদ দিয়েছেন, যিনি আহলে মারিফাত ও বিশিষ্টদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে কালিমায়ে ঈমানের উপর বসে থাকার আশংকা ছিল না। ফলে হযরত মু'আয রা.ও ওফাতকালে ব্যক্তি বিশেষদেরকে একত্রিত করে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৩. শুরুতে এর বিবরণে নিষেধাজ্ঞা ছিল পরবর্তীতে যখন মু'আয রা. জানতে পারলেন যে, স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বর্ণনা করেছেন সেহেতু তিনিও বর্ণনা করেছেন।

١٢٩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضـ قَالَ ذُكِرَ لِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ أَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ لَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا

১২৯. মুসাদ্দাদ র. ...... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আয রা.-কে বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কোনরূপ শিরক না করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (এতদ্শ্রবনে) হযরত মু'আয রা. বললেন, 'আমি কি লোকদের সুসংবাদ দেব না?' তিনি বললেন, 'না, আমার আশংকা হচ্ছে যে, তারা এর উপরই ভরসা করে বসে থাকে কি না।'

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল স্পষ্ট। পূর্বোক্ত হাদীসের মিলের ন্যায়।

মু'আয ইবনে জাবাল রা. ঃ

হযরত মু'আয রা. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ঈমান পর্বের শুরুতে এসেছে।

٩٢. بَاب الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضــ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ.

৯২. পরিচ্ছেদ ঃ ইলম শিক্ষা করতে লজ্জাবোধ করা

মুজাহিদ র. বলেন, 'লাজুক এবং অহঙ্কারী ব্যক্তি ইলম হাসিল করতে পারে না। হযরত আয়েশা রা. বলেন, 'আনসারদের মহিলারাই উত্তম। লজ্জা তাদের দীনের জ্ঞান থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি।

পূর্বের যোগসূত্র ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন, পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে কোন কোন ইলমী বিষয় একদল (সমঝদার) লোকদের জন্য বিশেষভাবে বর্ণনা করার উল্লেখ ছিল। এ অনুচ্ছেদে ইমাম বুখারী র. সতর্ক করতে চান যে, ইলমকে কোন বিশেষ দলের জন্য বিশেষিত মনে করে প্রশ্ন থেকে সংকোচ না করা চাই। বরং ইলমী প্রয়োজন এলে চাই দীনি ব্যাপারে হোক বা দুনিয়াবী ব্যাপারে তা জিজ্ঞেসের ক্ষেত্রে সংকোচ যেন প্রতিবন্ধক না হয়।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ হাদীসে এসেছে- الحياء شعبة من الايمان মুসলিমের এক রেওয়ায়াতে আছে- الحياء لا يأتي الا بالخير. مسلم : ٤٨/١. আরেক রেওয়ায়াতে আছে الحياء كله خير

ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য হল, লজ্জা নিঃসন্দেহে ঈমানের একটি শাখা ও কল্যাণকর। কিন্তু তার ব্যবহার এরূপ স্থানে যেন না করা হয়, যার ফলে কল্যাণ থেকে বঞ্চনার কারণ হয়। ইমাম বুখারী র. ছাত্রদেরকে সতর্ক করতে চান যে, ইলমী কোন বিষয় বুঝে না আসলে কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হলে পুনরায় জিজ্ঞেস করে নাও। ইলমের ক্ষেত্রে লজ্জা প্রতিবন্ধক না হওয়া চাই। কারণ, যে সংকোচ ইলমের প্রতিবন্ধক সেটি মূলত লজ্জা নয়, বরং দুর্বলতা ও কাপুরুষতা।

١٣٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ رضــ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضــ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ رضــ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَعْنِي وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا.

১৩০. মুহাম্মদ ইবনে সালাম র. ..... হযরত উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হযরত উম্মে সুলাইম রা. এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ হক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ হলে কি গোসল করতে হবে? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'হ্যাঁ, যখন সে বীর্য দেখতে পাবে।' তখন হযরত উম্মে সালামা (লজ্জায়) তার মুখ ঢেকে নিয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! স্ত্রীলোকের কি স্বপ্নদোষ হয়?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার ডান হাতে মাটি পড়ুক! (তা না হলে) তার সন্তান তার আকৃতি লাভ করে কিভাবে?'

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল হযরত উম্মে সুলাইম রা. এর উক্তি ان الله لا يستحيي الخ তে স্পষ্ট। এ বাণী দ্বারা উম্মে সুলাইম রা. এর উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলা হক কথা

বলতে বিরত হন না। অতএব আমিও ইলমী প্রশ্ন থেকে বিরত হই না। যদিও সে প্রশ্নটি এরূপ। যা থেকে সাধারণত মেয়েরা সংকোচবোধ করে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ইলম ঃ ২৪, গোসল ঃ ৪২, কিতাবুল আম্বিয়া ঃ ৪৬৮, ৯০০, ৯০৪।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস শরীফ দ্বারা পরিস্কার বুঝা গেল, যে ব্যক্তি কারো কাছে অধ্যয়নকালে প্রশ্ন ও সংশয় থাকা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করবে সে ইলম থেকে বঞ্চিত থাকবে।

হযরত ইমাম আজম র. এর নিকট কেউ জিজ্ঞেস করল, আপনি এত বড় জবরদস্ত আলিম কিভাবে হলেন?

তিনি বললেন, আমার যা জানা ছিল তা বলতে কার্পন্য করিনি। যা অজানা অজানা ছিল তা জানতে লজ্জা করিনি।

হযরত যায়নাব বিনতে উম্মে সালামা রা. ঃ

তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা রা. এর কন্যা ছিলেন। তৎকালীন যুগের মহিলাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অনেক বড় আলিমা ও ইসলামী আইনবিদ। তিনিই হলেন যায়নাব বিনতে আবু সালামা আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদ। কিন্তু মর্যাদা ও আভিজাত্যের জন্য মা উম্মে সালামা রা. এর দিকে সম্বন্ধ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ, হযরত উম্মে সালামা রা. যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তখন যায়নাব নামক এ কন্যাকে নিয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলেন। অতএব তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটই প্রতিপালিত হয়েছিলেন।

হাফিজ আসকালানী র. বলেন-

نسبت الى امها تشريفا لكونها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فتح

তাঁর ওফাত হয়েছে ৭৩ হিজরীতে। -উমদাহ।

توفيت قريبا من سنة اربع وستين. سير اعلام النبلاء جـ٣

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা রা. ঃ

তাঁর বরকতময় নাম হল হিন্দ। আল্লামা শামসুদ্দীন যাহাবী র. বলেন- وقد وهم من سماها رملة. سير اعلام النبلاء : ٢٠٢/٢. অর্থাৎ, যারা হযরত উম্মে সালামা রা. এর নাম রামলা বলেছেন, তাদের এ উক্তি ভুল। বাকী জীবনীর জন্য দেখুন -নাসরুল বারী, কিতাবুত তাফসীর ঃ ৬২৪।

হযরত উম্মে সুলাইম রা. ঃ

তাঁর কয়েকটি নাম রয়েছে। ১. রুমাইসা- رُمَيصاء ২. রুমাইছা- رُمَيثاء ৩. গুমাইসা- غُمَيصاء بنت مِلْحان হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. এর জননী। হযরত আবূ তালহা রা. এর অর্ধাঙ্গিনী। প্রসিদ্ধ মহিলা সাহাবীয়া। বুখারী, মুসলিম ইত্যাদিতে তাঁর সূত্রে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। বর্বতার যুগে তাঁর স্বামী ছিলেন মালিক ইবনে নযর। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাকেও ইসলাম গ্রহণের জন্য আহবান করেছেন। তিনি নারাজ হয়ে শামে চলে যান। সেখানেই মৃত্যু লাভ করেন। এরপর হযরত উম্মে সুলাইম রা.কে হযরত আবূ তালহা রা. বিয়ের প্রস্তাব দেন। যেহেতু তখন তিনি মুশরিক ছিলেন, সেহেতু উম্মে সুলাইম রা. তা প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, ইসলাম ছাড়া বিয়ে হবে না। ফলে তিনি মুসলমান হয়ে তাঁকে বিয়ে করেন। হযরত উম্মে সুলাইম রা. বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য বড়

ভাল দু'আ করেছিলেন। এর চেয়ে বেশি আমার কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। -তাহরীরুত তাহযীব ঃ ১২/৪৭১।

١٣١. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضـــ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِيَ مَثَلُ الْمُسْلِمِ حَدِّثُونِي مَا هِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَادِيَةِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخْلَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَحَدَّثْتُ أَبِي بِمَا وَقَعَ فِي نَفْسِي فَقَالَ لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا.

১৩১. ইসমাঈল র. ...... হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ বৃক্ষের মধ্যে এমন এক বৃক্ষ আছে, যার পাতা ঝরে পড়ে না এবং তা হল মুসলিমের দৃষ্টান্ত। তোমরা আমাকে বল তো সেটা কোন বৃক্ষ? তখন লোকজনের খেয়াল জঙ্গলের গাছপালার প্রতি গেল। আর আমার মনে হতে লাগল যে, তা হল খেজুর বৃক্ষ। হযরত আবদুল্লাহ্ রা. বলেন, 'কিন্তু আমি লজ্জাবোধ করলাম।' সাহাবায়ে কিরাম রা. বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনিই আমাদের তা বলে দিন।' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'তা হল খেজুর বৃক্ষ।' আবদুল্লাহ্ রা. বলেন, 'তারপর আমি আমার পিতাকে আমার মনে যা এসেছিল তা বললাম।' তিনি বললেন, 'তুমি তখন তা বলে দিলে অমুক অমুক জিনিস অর্জনের চেয়ে আমি বেশি খুশী হতাম।'

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল قال عبد الله فاستحييت والحديث ههنا في العلم. বাক্যে স্পষ্ট।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ইলম ঃ ১৪, ২৪, ১৬-১৭, ২৯৪, ৬৮১, ৮১৯, ৯০৪, ৯০৭।

ব্যাখ্যা ঃ যেহেতু হযরত উমর রা. ফযীলত অর্জনে প্রতিবন্ধক লজ্জার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন সেহেতু ইলম অর্জনে প্রতিবন্ধক লজ্জা উত্তম রূপেই নিন্দনীয় এবং অবশ্য বর্জনীয় হবে। এ হাদীসটি দুবার এসেছে। ৫৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

٩٣. بَاب مَنْ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

৯৩. রিচ্ছেদ ঃ নিজে লজ্জাবোধ করলে অন্যকে প্রশ্ন করতে বলা বুখারী ঃ ২৪

পূর্বের সাথে যোগসূত্র ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন, وجه المناسبة بين البابين ظاهر لان كلا منهما مشتمل على الحياء. তথা উভয় অনুচ্ছেদে মিল স্পষ্ট। কারণ, উভয়টিতে লজ্জার কথা রয়েছে।

২. পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদ ছাড়া বাহ্যত লজ্জা মন্দ বলে প্রমাণিত হয়। অতএব এ অনুচ্ছেদে এর বিস্তারিত বিবরণ উদ্দেশ্য যে, লজ্জা যদি উদ্দিষ্ট বিষয় অর্জনে প্রতিবন্ধক না হয় তবে সেটা কোনরূপ মন্দ নয়।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী র. এর উদ্দেশ্য হল, যে লজ্জা ইলম অর্জনে প্রতিবন্ধক সেটি নিন্দনীয়। যদি কোন কারণে নিজে জিজ্ঞেস করতে না পারে এবং লজ্জার স্থান হয় তবে এরূপ কোন পন্থা অবলম্বন করবে, এরূপ মাধ্যম তালাশ করবে যাতে লজ্জার বিষয়টির প্রতিও লক্ষ্য থাকে,

আবার ইলমী বিষয় থেকে বঞ্চিতও না হতে নয়। যেমন, হযরত আলী রা. একটি বিশেষ কারণে লজ্জা অনুভব করেছেন, ফলে তিনি অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করতে বলেছেন।

١٣٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رض‍ـــ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ.

১৩২. মুসাদ্দাদ র. ...... হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার অধিক পরিমাণে 'মযী' বের হত। তাই এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করার জন্য মিকদাদ রা. কে বললাম। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'এতে কেবল ওযূ করা আবশ্যক হয়।'

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের পূর্ণ মিল বুঝা যায় না। কারণ, শিরোনামে দুটি জিনিসের কথা উল্লেখিত হয়েছে- ১. লজ্জা সংকোচ, ২. অন্যকে প্রশ্ন করার নির্দেশ দান। কিন্তু আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে শুধু একটি জিনিস তথা অন্যদের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করানোর উল্লেখ রয়েছে, লজ্জার উল্লেখ নেই। কিন্তু ইমাম বুখারী র.এর দৃষ্টি হাদীস ভাণ্ডারগুলোতে পৌঁছে যায়। এ হাদীসটি কিতাবুল ওযুতে ৩০ নং পৃষ্ঠায় আসছে। এতে রয়েছে-

قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرت المقداد رض‍ـــ الخ.

এতে লজ্জার সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ইলম ঃ ২৪, ৩০, ৪১।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, হযরত আলী রা. হযরত মিকদাদ রা.কে বলেছিলেন। আবার কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায়, হযরত আলী রা. হযরত আম্মার রা.কে বলেছিলেন। আবার কোনটিতে আছে, হযরত আলী রা. স্বয়ং জিজ্ঞেস করেছিলেন। বাহ্যত বিরোধ মনে হয়। অতএব সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা কি?

উত্তর ঃ সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা হল, প্রথমত লজ্জার কারণে হযরত আলী রা. হযরত মিকদাদ ও আম্মার রা. উভয়কে হয়ত বলেছেন আর যখন হযরত মিকদাদ রা. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছেন তখন হযরত আম্মার রা.ও মজলিসে এসে পৌঁছেন। বস্তুত হযরত আলী রা. এর দিকে জিজ্ঞাসার সম্পর্ক রূপকার্থে। কারণ, তিনি ছিলেন নির্দেশদাতা।

এ হাদীসের উপর বিস্তারিত আলোচনা কিতাবুল ওযুতে ইনশাআল্লাহ আসবে। এখানে শুধু এতটুকু মনে রাখা চাই যে, উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, মযীর কারণে গোসল ওয়াজিব হয় না, আর এ ব্যাপারেও একমত যে, মযী নাপাক। যেমনিভাবে পেশাবের পর ওযু করা জরুরী এমনিভাবে মযী নির্গত হওয়ার পরেও ওযু জরুরী।

٩٤. بَاب ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتْيَا فِي الْمَسْجِدِ

৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে ইলম ও মাসআলা-মাসাইলের আলোচনা করা। বুখারী ঃ ২৫

পূর্বের সাথে যোগসূত্র ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন-

وجه المناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل منهما على السؤال اما في الاول فلانه فيه سؤال مقداد عن حكم المذي وفي هذا الباب سوال ذاك الرجل في المسجد عن حكم الاهلال للحج وكل منهما عن امر ديني. عمدة القاري.

সারকথা হল, এ অনুচ্ছেদেও পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের ন্যায় প্রশ্ন রয়েছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে মযীর হুকুম সংক্রান্ত হযরত মিকদাদ রা. এর প্রশ্নের উল্লেখ ছিল, আর এ অনুচ্ছেদে মসজিদে ইহরাম বাধা সংক্রান্ত প্রশ্নের উল্লেখ রয়েছে। স্পষ্ট বিষয় যে, উভয়টিই দীনী ব্যাপার।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ যেহেতু মসজিদে উচ্চ স্বরে কথা বলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, সেহেতু সন্দেহ হতে পারত যে, মসজিদে ফতওয়া দান এবং ইলমী আলোচনাও হয়ত জায়িয হবে না। কারণ, এতেও উচ্চ স্বরে কথা বলতে হয়। এজন্য ইমাম বুখারী র. এ অনুচ্ছেদ কায়েম করে এ সন্দেহ দূর করে দিয়েছেন যে, মসজিদে ইলমী কথা বলা ও ফতওয়া দান জায়িয আছে। যখন কারো নামাযে ব্যাঘাত না ঘটে।

١٣٣. حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضـ أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنْ الْجُحْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَمْ أَفْقَهْ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৩৩. কুতায়বা ইবনে সাঈদ র. ...... হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি মসজিদে দাঁড়িয়ে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের কোথা থেকে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দেন?'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ মদীনাবাসী ইহরাম বাঁধবে 'যুল-হুলায়ফা' থেকে, সিরিয়াবাসী ইহরাম বাঁধবে 'জুহফা' থেকে এবং নজদবাসী ইহরাম বাঁধবে 'করণ' থেকে। ইবনে উমর রা. বলেন, অন্যরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনও বলেছেন ঃ এবং ইয়ামানবাসী ইহরাম বাঁধবে 'ইয়ালামলাম' থেকে।' হযরত ইবনে উমর রা. বলেছেন, 'এ কথাটি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বুঝে নিতে পারিনি।'

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল ان رجلا قام في المسجد فقال يارسول الله! من اين تامرنا ان نهل الخ. বাক্যে স্পষ্ট।

অর্থাৎ, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট প্রশ্ন এবং তাঁর পক্ষ থেকে উত্তরের উল্লেখ ছিল সুস্পষ্ট আকারে। যদ্বারা পরিস্কার বুঝা গেল, মসজিদে ইলমী

আলোচনা এবং আলিমদের নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করা এবং তাদের ফতওয়া দান জায়িয আছে। অবশ্য দুনিয়াবী কথাবার্তা নিষিদ্ধ।

হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ইলম ঃ ২৫, মাওয়াকীতুল হজ্ব ওয়াল উমরা ঃ ২০৬, মুহাল্লু আহলে মক্কা ঃ ২০৬, মীকাতু আহলিল মদীনা ঃ ২০৬, মুহাল্লু আহলিশ শাম ঃ ২০৬-২০৭, ই'তিসাম ঃ ১০৯১।

হযরত ইবনে উমর রা. এর সতর্কতা ঃ

قال ابن عمر رضـ ويزعمون الخ হযরত ইবনে উমর রা. বলেন, লোকজনের ধারণা, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানবাসীর জন্য ইয়ালামলামকে মীকাত সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একথাটি পরিস্কারভাবে শুনিনি। এর ফলে রেওয়ায়াত সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর সতর্কতা ও তাকওয়ার অনুমান হয়। কারণ, যা কিছু নিজে শুনেছেন তা নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার সাথে বর্ণনা করেছেন। আর অন্যদের কথা তাদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৯৫. بَاب مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ

৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ প্রশ্নকারীর প্রশ্নের চেয়ে বেশি উত্তর দেয়া। বুখারী ঃ ২৫

পূর্বের সাথে যোগসূত্র ঃ আল্লামা আইনী র. বলেন-

وجه المناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل منهما على السوال والجواب وهو ظاهر. عمدة.

অর্থাৎ, পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের ন্যায় এ অনুচ্ছেদেও প্রশ্নোত্তর রয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য ঃ একটি হাদীসে রয়েছে- من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه এর দ্বারা সন্দেহ হতে পারত যে, প্রশ্নকারীর শুধু প্রশ্নের উত্তর দেয়া উচিত। কারণ, প্রশ্নকারী যখন নিজের প্রশ্নে উদ্দেশ্যের সুস্পষ্ট বিবরণ দিচ্ছে, অতএব উত্তরের বেশী কথা বলা যেন নিরর্থকের সমার্থক।

ইমাম বুখারী র. এ অনুচ্ছেদ কায়েম করে বলে দিয়েছেন যে, যদি অতিরিক্ত কথা প্রশ্নকারীর জন্য উপকারী ও প্রয়োজনীয় হয়, তবে প্রশ্নের অতিরিক্ত উত্তর দেয়া জায়িয আছে। যেমন আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত হয়। আর অনর্থক বিষয়ে কখন হবে, যখন নিস্প্রয়োজনে ও অনুপকারী ও অতিরিক্ত হয়।

١٣٤. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضـ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضـ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوْ الزَّعْفَرَانُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ.

১৩৪. আদম র. .... হযরত ইবনে উমর রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'মুহরিম কি কাপড় পরবে? তিনি বললেন ঃ 'জামা পরবে না, পাগড়ি

পরবে না, পায়জামা পরবে না, টুপি পরবে না এবং কুসুম বা জাফরান রঙ্গে রঞ্জিত কোন কাপড় পরবে না। জুতা না থাকলে চামড়ার মোজা পরতে পারে, তবে এমনভাবে কেটে ফেলতে হবে যাতে মোজা দু'টি পায়ের গিরার নিচে থাকে।

শিরোনামের সাথে মিল ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল فان لم يجد النعلين فليلبس الخفين الخ. বাক্যে। সারকথা হল, এই বাণী প্রশ্নের পরিমাণ থেকে অতিরিক্ত। আর এটাই হল শিরোনাম। عمدة القاري.

হাদীসের পূনরাবৃত্তি ঃ বুখারী, ইলম ঃ ২৫, সালাত ঃ ৫৩, মানাসিক ঃ ২০৮-২০৯, আবওয়াবুল উমরা ঃ ২৪৮, লিবাস ঃ ৮৬২, ৮৬৩-৮৬৪, ৮৬৯, ৮৭০।

بُرْنُس অর্থাৎ, সে সব কাপড় যাতে মাথার উপর দেয়ার অংশ জুড়ে দেয়া থাকে। অর্থাৎ, সাথে টুপি থাকে। আর কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হল লম্বা টুপি। যা লোকজন ইসলামের প্রথম যুগে পরিধান করত। -উমদা।

সারকথা, برنس সে পোশাক যাতে টুপি সংযুক্ত থাকে। জুব্বা হোক বা জামা। বৃষ্টি মৌসুমের পোশাক।

وَرْس এটি এক প্রকার হলুদ রংএর ঘাস। এগুলো শুধু ইয়ামানে হয়ে থাকে। চোহারায় তিল পড়লে তার প্রলেপ উপকারী।

فليلبس الخفين وليقطعهما যদি কোন মুহরিমের নিকট জুতা না থাকে বরং মোজা থাকে তবে উভয় মোজা টাখনুর নিচ থেকে কেটে দিবে।

الكعبين এখানে পায়ের পাতার মধ্যখানের হাড় উদ্দেশ্য। ওযুতে টাখনু উদ্দেশ্য, মাঝখানের হাড্ডি উদ্দেশ্য নয়। মোটকথা, মুহরিম সেলাইকৃত পোশাক পড়বে না, মাথা ও পা ঢাকবে না।

ইঙ্গিতপূর্ণ শুভসমাপ্তি ঃ

আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ইমাম বুখারী র. কিতাবুল ইলম আরম্ভ করেছেন- رب زدني علما আয়াত দ্বারা, আর সমাপ্ত করেছেন باب من اجاب السائل اكثر مما سأله এর উপর। কারণ, শুরুতে ইলম বৃদ্ধির দু'আ ছিল আর শেষে প্রশ্ন দ্বারা ইলম বৃদ্ধির কথা শিখনো প্রমাণ করে দিলেন। -মাওলানা ফখরুদ্দীন আহমদ র.।

এটাকে ইলমে বালাগাতে العود على البدء বলতে পারেন। এ হল অনুচ্ছেদগুলোর براعة الاختتام তথা ইঙ্গিতপূর্ণ শুভসমাপ্তি। আর পর্বের براعة الاختتام তথা ইঙ্গিতপূর্ণ শুভসমাপ্তি, হাফিজ ইবনে হাজার র. এর মতানুযায়ী এই যে, হাদীসের শেষে আছে- وليقطعها حتى يكونا تحت الكعبين মোযাগুলো টাখনুর নিচ থেকে কেটে দিবে। এবার ইলম পর্ব قطع তথা সমাপ্ত হয়ে গেছে। অতএব এবার অন্য পর্বের জন্য প্রস্তুত থাক।

হযরত শায়খ যাকারিয়া র. এর মতানুযায়ী কিতাবুল ইলম সমাপ্ত হয়েছে তাই নিজের জীবন শেষ হওয়ার কথা স্মরণ করুন। এজন্য ইহরামের পোশাক সংক্রান্ত হাদীস এনেছেন। এসব পোশাক তোমাদের কাফনের কাপড়ের মত। والله اعلم بالصواب -ইমদাদুল বারী।

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

আল হামদুলিল্লাহ নাসরুল বারী শরহে বুখারী -১ম খণ্ড ১৭ রবিউল আউয়াল সোমবার ১৪১৭হিজরীতে সমাপ্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এটিকে মূল গ্রন্থের ন্যায় কবূল করুন। আমীন! সুম্মা আমীন!! ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় খণ্ড অযু পর্ব থেকে শুরু হবে।

মুহাম্মদ উসমান গণী বিহারী
মাদরাসা মাজাহিরুল উলূম
(ওয়াকফ) সাহারানপুর।

سبحانك اللهمّ لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين.

আল হামদুলিল্লাহ নাসরুল বারী ১ম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত হল। তারিখ ঃ ২৮/০৩/২৮হিজরী, ১৮/০৩/২০০৭ইং।

নোমান আহমদ
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
সাত মসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।